আধুনিক ভারত ঃ ১৮৮৫-১৯৪৭

আধুনিক ভারত

১৮৮৫-১৯৪৭

সুমিত সরকার

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলিকাতা

First Published 1960
(ISBN 81-7074-134-3)
[A Bengali translation of *Modern India : 1885-1947*
by Sumit Sarkar. Complete and unabridged.
সর্বস্বত্ব : সুমিত সরকার
অনুবাদস্বত্ব : প্রকাশক

K P Bagchi & Company and Sumit Sarkar all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronics, mechanical, photo copying, recording or otherwise, without the prior permission of The MACMILLAN INDIA LIMITED.

অভিনব মুদ্রণ, ৭২, শরৎ বসু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৬৫ থেকে মুদ্রিত ও কে পি বাগচী
অ্যান্ড কোম্পানী, ২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০১২ থেকে প্রকাশিত।

উৎসর্গ

তনিকাকে

সূচীপত্র

ভূমিকা সাত

সম্পাদকের নিবেদন নয়

প্রতিশব্দসূচি এগারো

১ সূচনা

পরিবর্তন ও পরম্পরা ১

পুরনো ও নতুন পরিমার্গ ৪

২ রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কাঠামো ১৮৮৫-১৯০৫

সাম্রাজ্যের কাঠামো ও নীতি ১০

বড়লাটী মনোভাব ১১ বিদেশনীতি ১২ সেনাবাহিনী ১৩ আর্থিক ও প্রশাসনিক চাপ ১৪ স্থানীয় আত্মশাসন ও কাউন্সিল সংস্কার ১৬ বিভেদ ও শাসন ১৭ শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষবাদ ১৮

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ২০

সম্পদ নির্গম ২১ শিল্পায়ন-রোধ ২৪ কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ ২৫ ভূমি-সম্পর্ক / ২৭ কৃষিজ উৎপাদন /৩০ বিদেশী পুঁজি /৩১ ভারতীয় পুঁজিবাদী বিকাশ ৩২

৩ সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ১৮৮৫-১৯০৫

'তলা থেকে ইতিহাস'-এর দিকে ৩৬

জনগোষ্ঠীয় আন্দোলন ৩৭ ফড়কে ৪০ মোপলা ৪১ ডেকানের দাঙ্গা-হাঙ্গামা ৪২ পাবনা ৪২ রাজস্ব বন্ধ আন্দোলন ৪৪ জাতপাতের চেতনা ৪৫ সাম্প্রদায়িক চেতনা ৪৯ শ্রমিক ৫০

ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও উঁচুশ্রেণীর দল ৫৩

রাজন্যবর্গ ও জমিনদারকূল ৫৩

'মধ্যশ্রেণী'-চেতনা ও রাজনীতি ৫৫

বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর সামাজিক ভিত ৫৫ হিন্দু সংস্কার ও পুনরুত্থান ৫৯ ভারতীয় ইসলামের বিবিধ প্রবণতা ৬৩ সাহিত্যে স্বাদেশিকতা ৬৯ জাতীয়তাবাদী আর্থনীতিক তত্ত্ব ৭১ জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ৭৩ নরমপন্থী কংগ্রেস : লক্ষ ও পদ্ধতি ৭৪ নরমপন্থী রাজনীতির নানা পর্ব ৭৭ চরমপন্থার বিভিন্ন উৎস ৮০

৪ রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন ১৯০৫-১৯১৭

কার্জন যখন বড়লাট ৮৫

বৈদেশিক নীতি ৮৫ প্রশাসনিক সংস্কার ৮৬ কার্জন ও জাতীয়তাবাদীরা ৮৮ বঙ্গভঙ্গ ৮৯

বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলন : ১৯০৫-১৯০৮ ৯৪

নানা প্রবণতা ৯৫ বয়কট ও স্বদেশী ৯৭ জাতীয় শিক্ষা ৯৯ শ্রমিক বিক্ষোভ ১০০ সমিতি ১০১ হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ১০২ দিক-পরিবর্তন : সন্ত্রাসবাদের অভিমুখে ১০৪

অন্যান্য প্রদেশে চরমপন্থা : ১৯০৫-১৯০৮ ১০৬

পাঞ্জাব ১০৭ মাদ্রাজ ১০৯ মহারাষ্ট্র ১১১ কংগ্রেসে ভাঙন ১১৪

নিপীড়ন, রফা এবং ভেদ ও শাসন : ১৯০৯-১৯১৪ ১১৬

মর্লি ও মিন্টো ১১৬ সিমলা প্রতিনিধি দল ও মুসলীম লীগ ১১৯ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ১২২

যুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি ১২৪

বিপ্লবী কাজকর্ম ১২৫ লখনউ-ঐক্য ১২৭ হোম রুল বিক্ষোভ ১২৮

তলার থেকে আন্দোলন : ১৯০৫-১৯১৭ ১৩০

জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহ ১৩০ কৃষক আন্দোলন ১৩১ সাম্প্রদায়িকতা ১৩২ জাতপাতের আন্দোলন ১৩৩ আঞ্চলিক ভাবাবেগ ও ভাষা ১৩৭

৫ গণজাতীয়তাবাদ—উন্মেষ ও সমস্যাবলি ১৯১৭-২৭

যুদ্ধ , সংস্কার ও সমাজ ১৪০

মণ্টফোর্ড সংস্কার ১৪০ যুদ্ধের অভিঘাত ১৪৩

মহাত্মা গান্ধী ১৫১

গান্ধীর আবেদন ১৫১ গুজরের ভূমিকা ১৫৪ চম্পারন, খেড়া, আহ্‌মেদাবাদ ১৫৫

রাওলাট সত্যাগ্রহ ১৫৯

১৯১৯-১৯২০ : নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ ১৬৬

গান্ধী, খিলাফত ও কংগ্রেস ১৬৬ তলার থেকে চাপ ১৬৮

১৯২১-১৯২২ : অসহযোগ ও খিলাফত ১৭৪

সর্বভারতীয় আন্দোলন ১৭৪ সামাজিক বিন্যাস ১৭৫ আঞ্চলিক তারতম্য ১৭৯ চৌরীচৌরা ১৯১

১৯২২-১৯২৭ : অবনতি ও বিখণ্ডন ১৯৩

পরিবর্তন-বিরোধী ও স্বরাজী ১৯৩ নাগপুর, বোরসাড ও বাইকেম ১৯৪

গঠনমূলক কাজ ১৯৬ স্বরাজী রাজনীতি ১৯৭ সাম্প্রদায়িকতা ১৯৯

নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব ১৯২২-১৯২৭ ২০২

রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক টানাপোড়েন ২০২ জনগোষ্ঠীয় ও কৃষক আন্দোলন ২০৪ জাত-ভিত্তিক আন্দোলন ২০৭ শ্রমিক ২০৯ কমিউনিস্টদের উদ্ভব ২১১ বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ ২১৪ সুভাষ ও জওহরলাল ২১৬

৬ জাতীয়তাবাদী অগ্রগতি ও আর্থনীতিক মন্দা ১৯২৮-১৯৩৭

দৃষ্টিপাত ২১৭

রাজনীতির ধারা-প্রতিধারা ২১৭ আর্থনীতিক মন্দা ও ভারত ২২০

১৯২৮-১৯২৯ : সাইমন বয়কট ও শ্রমিক অভ্যুত্থান ২২৪

সাইমন কমিশন ও নেহরু প্রতিবেদন ২২৪ যুব আন্দোলন ২২৮ এইচ এস আর এ ২২৯ শ্রমিক অভ্যুত্থান ও কমিউনিস্টরা ২৩০ কৃষক আন্দোলন ও বারডোলি ২৩৫ ব্যবসায়ীদের মনোভাব ২৩৯ ডোমিনিয়ন মর্যাদা থেকে পূর্ণ স্বরাজ ২৪১

১৯৩০-১৯৩১ : আইন অমান্য ২৪৩

লবণ সত্যাগ্রহের অভিমুখে ২৪৩ চট্টগ্রাম, পেশোয়ার, শোলাপুর ২৪৬ আইন অমান্যের নানা পর্যায় ২৪৮ অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা ২৫৪ গোল টেবিল বৈঠক ২৬৪ গান্ধী-আরউইন চুক্তি ২৬৬

মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৩১ : স্বাচ্ছন্দ্যহীন সন্ধি ২৬৭

দ্বিমুখিতা ২৬৭ তলা থেকে চাপ ২৭০ সরকারি মনোভাব ২৭৩

১৯৩২-১৯৩৪ : দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন ২৭৫

উৎপীড়ন ও প্রতিরোধ ২৭৫ বাণিজ্য পুনর্বিন্যাস ২৭৯ হরিজনদের মধ্যে প্রচার অভিযান ২৮১ কাউন্সিল রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন ২৮৪ বাম বিকল্প ২৮৪

১৯৩৫-১৯৩৭ : সংবিধান ও কংগ্রেস ২৮৯

১৯৩৫-এর আইন ২৮৯ শ্রমিক-কিসান আন্দোলন ২৯১ সাহিত্যে বামপন্থা ২৯৪ লখনউ ও ফৈজপুর ২৯৫ দক্ষিণপন্থী জোট ও ব্যবসাদারদের চাপ ২৯৬

৭ রাজনৈতিক আন্দোলন ও যুদ্ধ ১৯৩৭-১৯৪৫

১৯৩৭-১৯৩৯ : কংগ্রেস মন্ত্রিসভা [প্রদেশে প্রদেশে] ৩০০

নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা-গঠন ৩০০ কংগ্রেস ও আমলাতন্ত্র ৩০২ সাম্প্রদায়িক সমস্যা ৩০৩ গান্ধীপন্থী-সংস্কার ৩০৭ পুঁজিপতিবৃন্দ ও কংগ্রেস ৩০৮ কংগ্রেস ও শ্রমিকরা ৩১০ কংগ্রেস ও কিসান ৩১২ দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন ৩১৪ কংগ্রেসের ভেতরের বামপন্থীরা ৩১৮ ত্রিপুরীর সঙ্কট ৩২০

১৯৩৯-১৯৪২ : যুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীত—প্রথম পর্ব ৩২৩

আমলাতান্ত্রিক প্রত্যাঘাত ৩২৩ মুসলীম লীগ ও পাকিস্তান ৩২৫ কংগ্রেসের ভেতরের বিভিন্ন প্রবণতা ৩২৭ বিভিন্ন আর্থনীতিক পরিণাম ৩৩০ যুদ্ধের নতুন পর্ব ৩৩০ ক্রিপ্‌স মিশন ৩৩১

১৯৪২-১৯৪৫ : ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের শেষ পর্যায় ৩৩৪

বিদ্রোহের মূল ৩৩৪ সর্বভারতীয় ধাঁচ ৩৩৯ সামাজিক গঠন ৩৪১ আঞ্চলিক রকমফের ৩৪৩ বিদ্রোহের পরিণাম ৩৪৮ যুদ্ধ ও ভারতীয় অর্থনীতি : আকাল ও অতি-মুনাফা ৩৪৯ মুসলীম লীগের অগ্রগতি ৩৫২ আজাদ হিন্দ ৩৫৩ কমিউনিস্টরা ও জনযুদ্ধ ৩৫৪

স্বাধীনতা ও দেশভাগ ১৯৪৫-১৯৪৭

১৯৪৫-১৯৪৬ : 'আগ্নেয়গিরির কিনারা' ৩৫৭

আলাপ আলোচনার প্রস্তুতি ৩৫৭ সিমলা সম্মিলন ৩৫৯ আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর বিচার ৩৬১ নৌ-বিদ্রোহ ৩৬৫

১৯৪৬ (মার্চ-অগাস্ট) : ক্যাবিনেট মিশন ৩৬৭

নির্বাচন ৩৬৭ ক্যাবিনেট মিশন ৩৬৯

১৯৪৬-১৯৪৭ : সাম্প্রদায়িক মহামারণ ও কৃষক বিদ্রোহ ৩৭২

কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব, ৩৭১ মহাত্মার মাহেন্দ্রক্ষণ ৩৭৭ তেভাগা ৩৭৯ পুন্নপ্র-বয়লার ৩৮০ তেলেঙ্গানা ৩৮১

১৯৪৭ : স্বাধীনতা ও দেশভাগ ৩৮৪

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ৩৮৫ দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি ৩৮৮ পনেরোই অগাস্ট ৩৯০

অতিরিক্ত রচনাপঞ্জি ৩৯৩

বর্ণানুক্রমিক রচনাপঞ্জি ৪১৯

নির্দেশিকা ৪৩৩

১

সূচনা

পরিবর্তন ও পরম্পরা

১৮৮৫-তে জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও ১৯৪৭-এর অগাস্টে স্বাধীনতা লাভ—এর অন্তর্বর্তী অল্পাধিক ৬০ বছরেই সম্ভবত সবচেয়ে বড় উত্তরণ দেখা গেছে আমাদের দেশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে। এই উত্তরণ বহুদিক থেকেই শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ। আর এই কেন্দ্রীয় দ্বিমুখিতার ফলেই, মনে হয়, এখান থেকেই আমাদের সমীক্ষা শুরু করা সুবিধে।

১৮৮৫-তে ভারতে ব্রিটিশদের মনে এক চিরস্থায়িত্বের ধারণা ভালোভাবে গেড়ে বসেছিল। তার আট বছর আগে মন্বন্তরের মধ্যেই এক জমকালো দরবারে সাম্রাজ্যের ঘোষণা করা হয়। পিতৃসুলভ মহানুভবতার মতাদর্শের সঙ্গে মাঝে মধ্যে যোগ করা হয়েছে অছি পরিষদ ও স্বায়ত্তশাসনে প্রশিক্ষণের কথা। কিন্তু ব্রিটিশ রাজের নিরাপোস সাদা-চামড়া ও স্বৈরতান্ত্রিক বাস্তব চেহারা তা খুব বেশি ঢাকতে পারে নি। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ও উচ্চস্তরে প্রশাসন ছিল পুরোটাই ইওরোপীয়দের দখলে। ১৮৮০-র দশকে ভারতীয় বেসামরিক বিভাগের নব্বইটিরও বেশি পদে ষোলটি বাদে সর্বত্র কায়েম ছিলেন তাঁরাই। ১৮৬১-তে প্রাদেশিক ও সর্বোচ্চ কাউন্সিলে সামান্য কয়েকজন দেশীয় লোককে মনোনয়নের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলির ক্ষমতাও কমিয়ে দেওয়া হয়। এমনকি বিরাট বাগাড়ম্বরের সঙ্গে রিপন যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন চালু করেন, তাও ছিল মূলত প্রয়োজনীয় আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণের এক উপায়। 'বাঙালি বাবুকে তার নিজস্ব স্কুল আর নর্দমা নিয়ে আলোচনা করতে দিয়ে আমরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে অন্তর্ঘাত করব না'—অর্থ বিভাগের সদস্য এভেলিন বেরিং-এর এই মন্তব্য খুবই উপযোগী। যথার্থই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে—যেমন, সামরিক বাহিনী—এই কৌপীনটুকুও ছিল না। সেখানে ১৯৪৭ অবধি কোনো ভারতীয়কে ব্রিগেডিয়ারের থেকে উঁচু পদে উঠতে দেওয়া হয় নি।

এই বিরাট দেশ চালানোর নিত্যকার কাজে ভারতীয় সংযোগী অবশ্যই ছিল অপরিহার্য। নির্ভরশীল মিত্র সহজেই পাওয়া যেত বলে ব্রিটিশদের আত্মবিশ্বাস প্রচুর বেড়ে গিয়েছিল। ১৮৫৭-র পরবর্তী বছরগুলিতে রাজন্যবর্গ, জমিনদার, ও গ্রাম-শহরের নানা ধরনের বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে নতুনভাবে যোগ তৈরি ও দৃঢ় করা হয়। একদম শেষ অবধি ৬৬২ জন দেশীয় রাজাই ছিলেন সবচেয়ে অনুগত রক্ষী। ইংরিজি-শিক্ষিত এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যাদের গায়ের রঙ বাদামি কিন্তু চিন্তা ও রুচিতে সাদা—মেকলে-র এই ভবিষ্যদ্ দৃষ্টি ১৮৮০-র দশক থেকেই বিবর্ণ হতে থাকে। তবু 'মধ্যশ্রেণী'র উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে কলকাতা, বোম্বাই, পুণা ও মাদ্রাজে প্রাদেশিক সভা তৈরি হচ্ছিল। শেষে তা কংগ্রেসের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এগুলো কিন্তু

ব্রিটিশদের গাত্রদাহের বেশি কিছু ছিল না। আর-একটি বিদ্রোহ প্রতিরোধ করার 'নিরাপত্তাসূচক ব্যবস্থা' হিসেবে কংগ্রেসকে সরকারি পৃষ্ঠপোষণ দেওয়ার অনুরোধ করেন হিউম। ডাফরিন তাঁর সুউচ্চ অভিজাত অবজ্ঞা থেকে তা বাতিল করে দেন : 'মানুষটা [হিউম] চতুর আর ভদ্রলোকের মতো, তার মনে হয় ওর মাথায় পোকা ঢুকেছে' (রেঈ-কে ডাফরিন, ১৭ মে ১৮৮৫)।

১৮৮৮-তে বড়লাট ঘোষণা করেন, কংগ্রেস এক অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু অংশের প্রতিনিধি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সার জন স্ট্র্যাচি কেমব্রিজের স্নাতক-ছাত্রদের আশ্বাস দেন, 'ভারত বলে কিছু নেই, কখনও ছিল না, বা এমনকি ভারত বলে কোনো দেশ...ভারতীয় জাতি বা "ভারতীয় জনসাধারণ" যাদের সম্পর্কে আমরা এত কিছু শুনি—তার কিছুই নেই। পাঞ্জাব, বাঙলা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও মাদ্রাজের লোকেরা নিজেদের কখনও এক বিশাল ভারতীয় জাতির অংশ বলে ভাববে এমন ঘটা অসম্ভব' (*ইন্ডিয়া*, লন্ডন, ১৮৮৮)। এর মধ্যে স্পষ্টতই যে প্রচারধর্মী ও ইঙ্গিত চিন্তার উপাদান আছে তা বাদ দিতে হবে। কিন্তু ১৮৮০-র দশককে এই মূল্যায়ন ও ভবিষ্যদ্‌বাণী খুব অবাস্তব ছিল বলে মনে হয় না। সর্বভারতীয় যোগাযোগ অনেকটাই বাঁধা ছিল সমাজশীর্ষের ইংরিজি-শেখা এক ক্ষীণ বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর মধ্যে। রাশভারী বার্ষিক সম্মেলনে ভদ্রলোক-সুলভ প্রস্তাব হিসেবে কংগ্রেসের দাবিদাওয়া পেশ করা হতো। তখনও সেখানে উৎসাহভরে জাহির করা হতো মৌল রাজভক্তি। লক্ষ লক্ষ চাষীকে সেদিন অবধি তা কোনো নাড়া দেয় নি। স্বাধীন পুঁজিবাদী বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে (আমাদের জাতীয়তাবাদে নরমপন্থী বুদ্ধিজীবীদের যা সবচেয়ে বড় অবদান) নিয়ে মোটামুটি স্পষ্ট সূত্র দেওয়া হলেও, উঠতি ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী তাতে বিশেষ সাড়া দেয় নি। উনিশ শতকে সুনিশ্চিতভাবেই এ দেশ ছিল পৃথিবীর দরিদ্রতম দেশগুলির একটি। অনিবার্যভাবেই নিচুশ্রেণীর মানুষের অসন্তোষ ছিল ব্যাপক। ১৮৮৫-র আগে কমবেশি দশ বছরে দেখা দিয়েছিল জমিনদারদের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে চাষীদের শক্তিশালী দল, দক্ষিণ মহারাষ্ট্রে মহাজন-বিরোধী হাঙ্গামা, আর অন্ধের 'রাম্পা' অঞ্চলে জনগোষ্ঠীর শক্তিশালী অভ্যুত্থান। কিন্তু এইসব আন্দোলনের কোপটা ছিল সরাসরি শোষকের বিরুদ্ধে, দূরের ব্রিটিশ মহাপ্রভুদের বিরুদ্ধে নয়। যেমন, ১৮৭৩-এ পাবনার চাষীরা শুধু 'মহারানী ভিক্টোরিয়া'র রায়ত হতে চেয়েছিলেন। বিভেদ-ও শাসন নীতির যথেষ্ট বিষয়গত ভিত্তি ছিল এখানে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ পরতে পরতে মিশে ছিল শ্রেণীগত টানাপোড়েনের সঙ্গে—যেমন পূর্ববঙ্গে মুসলমান চাষী ও হিন্দু বাবুসমাজ, মালাবারে মোপলা মুসলমান আবাদকারী ও নাম্বুদ্রি বা নায়ার বর্ণহিন্দু ভূস্বামী, যুক্ত প্রদেশের কোথাও কোথাও মুসলমান তালুকদার ও হিন্দু প্রজা, অথবা পাঞ্জাবে হিন্দু মহাজন ব্যবসায়ী ও মুসলমান বা শিখ চাষী।

তবু জাতীয় আন্দোলন শেষে তার প্রথম শিরোমণি বুদ্ধিজীবী গণ্ডি ছাড়িয়ে অনেক দূর যায়। ১৯৩৬ নাগাদ কংগ্রেস সভাপতি সঙ্গতভাবেই এই দাবি করতে পারতেন, যে, 'কংগ্রেস এখন সাধারণ মানুষের বৃহত্তম সংগঠন হয়ে উঠেছে। তারা এসেছে অনেকাংশেই গ্রামের মানুষদের মধ্যে থেকে, সদস্যদের ভেতর আছে লক্ষ লক্ষ চাষী ও আবাদকারী আর সামান্য কিছু শিল্প-শ্রমিক ও ক্ষেতমজুর।' ভৌগোলিক ও সামাজিক—দু দিক থেকেই এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে চড়াই-উৎরাই-এর মধ্যে দিয়ে। এর ক'টি স্পষ্ট শীর্ষবিন্দু হলো : ১৯০৫-১৯০৮, ১৯১৯-১৯২২,

১৯২৮-১৯৩৪, ১৯৪২, আর ১৯৪৫-১৯৪৬। চরমপন্থী পর্বে আন্দোলনের অভিকেন্দ্র ছিল বাঙলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব। গান্ধী-পর্বে তা সরে যায় গুজরাট, বিহার, যুক্ত প্রদেশ ও অন্ধ্রের মতো নতুন এলাকায়, নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের থেকে মফস্বলের নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, চাষীদের এক বড় অংশেও প্রভাবশালী বুর্জোয়া গোষ্ঠীতে। এরই সঙ্গে তাল রেখে আন্দোলনের নতুন রূপেরও বিবর্তন ঘটে : স্বদেশী, বয়কট, ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহ ও গ্রামে গঠনমূলক কাজ। আর সেই সঙ্গে ছিল সেইসব পদ্ধতি, নেতারা যেগুলোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতেন কিন্তু কখনও কখনও সেগুলোরও গুরুত্ব ছিল যথেষ্ট—বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ, হরতাল, শহরের লোক, চাষী বা জনগোষ্ঠীর সশস্ত্র বিস্ফোরণ। ১৯৩০-এর দশকে দেশের অনেক অংশেই কিসান সভা ও ট্রেড ইউনিয়নগুলো দ্রুত এক যথার্থ শক্তি হয়ে উঠছিল। নানা দেশীয় রাজ্যেও দেখা দিচ্ছিল গণ-আন্দোলন। যাবতীয় পশ্চাদ্‌গতি, সীমাবদ্ধতা ও বিরোধ সত্ত্বেও, সব মিলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় : এক অনাবর্তনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা—সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনে জনগণের আবির্ভাব। পরিবর্তিত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও গণচাপ—এই দু-এর ফলে ১৯৪৭-এ ব্রিটিশকে ভারত ছাড়তে হয়। এর মাত্র পাঁচ বছর আগেই জনৈক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, সাম্রাজ্য গুটোনোর কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্যে তিনি তাঁর উচ্চ পদে বসেন নি। স্বাধীনতার পরেই আসে দেশীয় রাজ্যের দ্রুত বিলোপ, জমিনদারি অবলোপ, আর উপ-মহাদেশের বৃহত্তর অংশে সার্বজনিক ভোটের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। ভেতরে-ভেতরে সামাজিক পরিবর্তনও হয়েছিল যথেষ্ট। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো বেশ কিছু সংখ্যক ধনী চাষী গোষ্ঠীর উদ্ভব ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সুসংহতি। ধ্রুপদী পুঁজিবাদী বিকাশের মানদণ্ডে যদিও এই শ্রেণী ছিল দুর্বল ও দোলাচলগ্রস্ত, তবু তৃতীয় বিশ্বের বেশির ভাগ দেশের তুলনায় যথেষ্ট শক্তিশালী ও পরিণত।

কিন্তু এই ছক স্পষ্টতই আপাতবিরোধে ভরা, যতটা পরম্পরা ততটাই পরিবর্তন। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল কংগ্রেস, কিন্তু ক্রমেই সে নিজেও এক 'রাজ' হয়ে উঠছিল। অবশেষে কোনো বড়ো ধরনের পরিবর্তন ছাড়াই তারা সামগ্রিক আমলাতান্ত্রিক ও সামরিক কাঠামোটি—'দৈবজাত' সিভিল সার্ভিস ও সবকিছুই—অধিগ্রহণ করে। সাদার বদলে শুধু এল বাদামি চামড়া। স্বাধীনতার দিনটি ছিল বিরোধে ভরপুর। একদিকে গণ-উচ্ছ্বাসের অবিস্মরণীয় দৃশ্য, সাম্রাজ্যের সব রঙবাহারের মধ্যে মাউন্টব্যাটেন-এর কাছে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ৩০-এর দশকের এক বহ্নিমান র‍্যাডিক্যাল—আর অন্যদিকে 'জাতির জনক' বললেন তাঁর বাণী ফুরিয়ে গেছে ; জীবনের শেষ ক'টি মাস তাঁকে কাটাতে হলো সাম্প্রদায়িক হানাহানির বিরুদ্ধে একক ও আশাহীন সংগ্রামে। দাঙ্গা ও দেশভাগ ছিল ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ব্যর্থতা। সম্ভবত আরও বেশি মৌলিক ব্যর্থতা হলো ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম চলাকালীন যেসব আশা-উদ্দীপনা জেগেছিল তার অনেকগুলিই থেকে গেল অপূর্ণ। আপনা থেকেই চাষী রামরাজ্যে আসছে—এই গান্ধীবাদী স্বপ্নও ফলল না, বামপন্থী আদর্শের সামাজিক বিপ্লবও হলো না। এমনকি এক সম্পূর্ণ বুর্জোয়া রূপান্তর ও সফল পুঁজিবাদী বিকাশের সমস্যাও ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তর দিয়ে পুরোপুরি সমাধান হয় নি। স্বাধীন ভারত ও পাকিস্তানের (ও বাংলাদেশের) ইতিহাসে তা বারবার দেখা গেছে।

অবশ্যই আমাদের মুখ্য ভাববস্তু হবে এই প্রচণ্ড দ্বিমুখী ও বিরোধী ছকের উৎস সন্ধান। আধুনিক ভারতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের জটিল ও সঙ্ঘাতময় ইতিহাসই জোগাবে তার কেন্দ্রবিন্দু। যা-ই হোক, প্রস্তাবনা হিসাবে আমাদের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক রচনার বর্তমান ধারার দিকে একটু তাকানো দরকার।

পুরনো ও নতুন পরিমার্গ

ব্রিটিশ শাসনের শেষ ষাট বছরের ইতিহাস-রচনা আজ আগের যে-কোনো সময়ের চেয়ে আরও মেতে ওঠার মতো কাজ—আবার অনেক বেশি কঠিন। তার কারণ, বিশেষ করে জাতীয় আন্দোলন নিয়ে হালে খুঁটিনাটি কাজের রীতিমতো বন্যা বয়ে গেছে।[১] এক দশক আগে অবধি যা পাওয়া যেত তা হলো বড়লাটদের বিষয়ে অল্প কিছু পর্যালোচনা, সাংবিধানিক বিকাশ নিয়ে কাজ, ভারতীয় নেতাদের বেশ কিছু জীবনী ও তাঁদের রচনা, আর জাতীয়তাবাদের বিকাশের কিছু সাধারণ সর্বভারতীয় সমীক্ষা। এই সব লেখার বেশির ভাগেরই ভিত্তি ছিল প্রকাশিত হাতফেরতা সূত্র, কারণ সাম্প্রতিক কালপর্বের ক্ষেত্রে সরকারি মহাফেজখানায় ঢোকার সুযোগ ছিল খুবই কম। আর এখনও অবধি কোমর বেঁধে ব্যক্তিগত কাগজপত্রের সামান্যই খোঁজাখুঁজি হয়েছে। চিরল, সীতারামাইয়া, তারাচন্দ বা রমেশচন্দ্র মজুমদারের (শুধু কয়েকটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত হিসেবে) পরিমার্গের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকলেও, মনে হয়, মোটের ওপর তাঁরা একমত। মূল নকশাটি ছিল ব্রিটিশ শাসনে লালিত, ইংরিজি জানা এক 'মধ্যশ্রেণী', নবজাগরণের নানা কাজে তারা লেগে ছিল। অবশেষে তারা তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধেই ঘুরে দাঁড়াল—আর এইভাবেই তারা জন্ম দিল আধুনিক জাতীয়তাবাদের। নিজস্ব দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী বিদ্বানরা তার নানা অভিপ্রেরণা আরোপ করেছেন—যেমন, ব্যর্থ স্বার্থপর উচ্চাশা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি থেকে পাওয়া স্বাদেশিকতা ও গণতন্ত্রের আদর্শ, বা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক স্বাভাবিক বিদ্বেষ, ভারতীয় সমাজের ভেতরে প্রবহমান সব বিভেদ, এমনকি গান্ধীপন্থী কংগ্রেসেরও সীমাবদ্ধ ও খুবই অস্থিত আবেদন, মুসলমানদের ভেঙে বেরিয়ে যাওয়া ও দেশভাগ। অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের মনে হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সব বাধা ভেঙে জনগণের কাছে পৌঁছনোটা মনে-ছাপ-ফেলার মতো ও নিতান্তই স্বাভাবিক, কারণ বিদেশী শাসনের বিরোধিতায় সব ভারতীয়রই সর্বদাই আগ্রহ ছিল, অভাব ছিল শুধু এক অলোকসামান্য নেতার। এ কথাও বলা দরকার যে, ইতিহাস-রচনার একটি প্রবণতা হিসেবে স্বাধীনতা আন্দোলন বিষয়ে জাতীয়তাবাদী লেখাপত্র সাধারণভাবে পর্যাপ্ত নয় বললেও কম বলা হয়। ১৯৫০-এর দশক অবধি পেশাদার ভারতীয় বিদ্বানরা এ-রকম বিষয় থেকে দূরে থাকতেই চাইতেন (তার বদলে মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে তথাভিহিত জাতীয় রাজপুত বা মারাঠা আন্দোলনের নিরাপদ মাধ্যমে ব্যক্ত করতেন তাঁদের দেশপ্রেম)। সময়ে সময়ে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক বিকৃতি খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠত। যেমন, স্বাধীনতা আন্দোলন নিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারের সুবিদিত বই-এর বিভিন্ন খণ্ডে শিক্ষিত বাঙালী হিন্দু নিয়ে রীতিমতো ভজনার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজাতি পরিমার্গকে খোলাখুলি

১ আনুপূর্বিক রচনাপঞ্জির জন্যে বইটির শেষ ভাগ দেখুন।

মেনে নেওয়া হয়েছে। মধ্যযুগের ভারত বিষয়ে কিছু লেখায় সব সময়েই হিন্দু ও মুসলমানকে দুটি সমজাতীয় সম্প্রদায় বলে ধরে নেওয়া হয়—যারা স্বভাবতই পরস্পরের বিরোধী। এ হলো বর্তমানের সাম্প্রদায়িক সংস্কারকে অতীতের ভেতরে দেখার এক স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। আরও যথার্থ জাতীয়তাবাদী ইতিহাস রচনায়ও জনগণ বা জাতির বিমূর্ত ভজনা করা হয়। কিন্তু সেখানেও ইতিহাস প্রায়শই মূলত শিরোমণিতান্ত্রিক ও কখনও কখনও কয়েকজন মহানেতার নির্বিচার গৌরবগাথায় পরিণত হয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের সামাজিক-আর্থনীতিক উৎস ও বিস্তারের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদী বিদ্বানরা যে এইসব জিনিস এড়িয়ে যাবেন তা স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরাও তার চেয়ে ভালো কিছু করেন নি। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া, আধুনিক ভারতের ইতিহাস-ব্যাখ্যায়, তাঁরা এমনকি দাদাভাই নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্তের প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌দের অনুসন্ধানের ফলাফলকেও নিজেদের রচনার অঙ্গীভূত করতে চান নি। আমাদের আলোচ্য পর্ব নিয়ে গোড়ার দিকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ মার্কসবাদী রচনার—সবার ওপরে রজনী পাম দত্ত, কিন্তু তাছাড়া মানবেন্দ্রনাথ রায়, এ আর দেশাই ও কিছু সোভিয়েত বিদ্বানও আছেন—বিরুদ্ধে শিরোমণিতন্ত্র এবং ঔপনিবেশিক কাঠামোকে অবহেলা করার অভিযোগ আনা যায় না। কিন্তু সব মিলিয়ে এগুলি সম্পূর্ণ সন্তোষজনক বিকল্প দিতে পারে নি। সচরাচর এগুলি অতি-নির্বিশেষ এবং শ্রেণী-বিশ্লেষণের প্রয়োগে কখনও কখনও খানিকটা যান্ত্রিক।

আমাদের বিষয়টি এখন যে নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে (যদিও প্রায়শই বহিরঙ্গে, সারবস্তুতে নয়, কারণ বহু পুরনো ধারণা এখনও রয়ে গেছে) অংশত তার কারণ এই যে, মহাফেজখানার উপাদান, ব্যক্তিগত কাগজপত্র ও ক্ষেত্র-সমীক্ষার ফলে উদ্ধার-হওয়া স্থানীয় সূত্রের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। গোটা ঔপনিবেশিক পর্বের জন্যেই সরকারি মহাফেজখানা এখন বিদ্বানদের কাছে খোলা। ব্যক্তিগত কাগজপত্রের সমৃদ্ধ সংগ্রহ গড়ে উঠেছে নতুন দিল্লীর নেহরু স্মারক মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগারের মতো জায়গায়। ক্ষেত্র-সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের মূল্য সম্পর্কে আরও বেশি মাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছেন ঐতিহাসিকরাও। কিন্তু আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে নতুন প্রকল্পগুলির ভূমিকা। সেগুলি সর্বদাই বিতর্কিত ও কখনও কখনও স্পষ্টতই সংশয়জনক, কিন্তু তা সত্ত্বেও খুবই চেতিয়ে তোলার মতো। এ ক্ষেত্রে তথাকথিত কেমব্রিজ ঘরানা বিশেষভাবে বহুপ্রসু। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গে অনীল শীল, বাঙলা প্রসঙ্গে মার্কিন ঐতিহাসিক ব্রুমফিল্ড, এবং কিছু পরিমাণে, গান্ধীর উত্থান প্রসঙ্গে জুডিথ ব্রাউন জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যানে চালু করেছেন এক (নতুন) কেতা। তার নিরিখ হলো নানা প্রাদেশিক, সাধারণত বর্ণভিত্তিক, শিরোমণি—বাঙালি ভদ্রলোক, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, হিন্দী অঞ্চলের বা অন্ধ্রের হিন্দু বলয়ের 'উপ-শিরোমণি'—এদের অসম বিকাশ ও প্রতিযোগিতা। অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থপর বস্তুগত অভিপ্রায়, যেমন চাকরি না-পাওয়ার হতাশার ছদ্ম হেতু ছাড়া স্বাদেশিকতা আর কিছু নয়—এই পূর্ব-ধারণাও এমন এক ছবি গড়ে তুলেছিল যা ব্রিটিশ রাজ্যের অজস্র মুখপাত্র ও ভ্যালেন্টাইন চিরল-এর মতো নির্লজ্জ সাম্রাজ্যবাদীদের আঁকা ছবি থেকে সত্যিই খুব আলাদা কিছু নয়। যা-ই হোক, ১৯৭৩-এ কেমব্রিজ ঘরানা বেশ হৈচৈ করে ঘোষণা করল যে, শিরোমণি-মার্কা দৃষ্টিভঙ্গি 'ইতিহাস-রচনার চোরা দরজা' দিয়ে গলে গেছে ; আর প্রদেশ ও শিরোমণি থেকে অবশ্যই সরে

যেতে হবে অঞ্চলে ও উপদলে (গ্যাল্যাগার, জনসন, শীল সম্পাদিত, *লোকালিটি, প্রভিন্স অ্যান্ড নেশন*)। ব্রিটিশরা তখন নতুন বোঝা চাপাচ্ছিল আর সংবিধান সংস্কারের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে খুঁজছিল নতুন সহযোগী। প্রশাসনিক চাপ ও সুযোগের এই সমন্বয়ই সময়বিশেষে স্থানীয় মুরুব্বি-যাচক গোষ্ঠীগুলির প্রাদেশিক, এমনকি জাতীয় মঞ্চে মিলিত হওয়ার ব্যাখ্যা করতে পারবে বলে মনে করা হয়। দক্ষিণ-ভারতের ক্ষেত্রে ওয়াশব্রুক ও বেকার, এলাহাবাদের ক্ষেত্রে বেলি, বোম্বাই-এর নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের ক্ষেত্রে গর্ডন জনসন, আর যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে রবিনসন সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে এই তত্ত্ব প্রয়োগ করেছেন। আর নতুন নতুন তথ্যের নিরিখে এই পরিমার্গটি যথেষ্ট ফলদায়ী বলে প্রমাণ হয়েছে।

আদি ও পরিশোধিত রূপে কেমব্রিজ পরিমার্গের মধ্যে তবু কতক ধারাবাহিকতা থেকে গেছে। বেলি-কে বাদ দিলে, সম্ভবত এখনও অবধি তার প্রবণতা হচ্ছে ভাবাদর্শ ও স্বাদেশিক উদ্দীপনার ভূমিকাকে খাটো করে দেখানো। বীরপূজা ছিল বিস্তর জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। তাকে শোধরানোর পক্ষে অনাস্থাবাদ কখনও কখনও স্বাস্থ্যকর। একসার ধ্যানধারণার তাৎপর্য ও সম্ভাব্য স্বার্থসন্ধানী উদ্দেশ্য (যা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে এগুলি সূত্রবদ্ধ ও গ্রহণ করার দিকে নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে)—এ দু-এর মধ্যে যুক্তিসঙ্গত পার্থক্য করতে হবে। চাকরি না-পাওয়ার হতাশা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিক উপন্যাসগুলিকে লেখা হয়ে থাকতো বা না-ও হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু তাদের সামগ্রিক প্রভাব এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা থেকেই যায়। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির আর্থনীতিক ও বর্ণবিদ্বেষবাদী মাত্রাগুলোকে তাচ্ছিল্য করা। ওয়াশব্রুক-এর বিশ্লেষণে দক্ষিণ ভারতের 'গ্রামীণ-স্থানীয় কর্তারা' অবশ্যই ঔপনিবেশিক অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে নির্ভর করেই গজিয়ে উঠেছিল। বিশ শতকের গোড়ায় বড়লাটের ৭০০ চাকর ছিল আর তিনি মাইনে পেতেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর দুগুণ। এই ঘটনার সঙ্গে, 'ছোটোলাট ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ...নিজেদের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উচ্ছিষ্ট ভাগ করে নিতেন'—এই মন্তব্য অদ্ভুত রকম বিসদৃশ। এমনকি ১৯৩০-এর ডাণ্ডি অভিযানের আগে গান্ধী আরউইনকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, গড়পড়তা ভারতীয়র চেয়ে বড়লাটের মাইনে ৫০০০ গুণ বেশি, আর বাঙলার একজন শ্বেতাঙ্গ অধস্তন জেল গভর্ণর হিজলীতে রাজবন্দীদের হত্যার অল্প কিছু পরেই ছুটি কাটাতে বিশ্বপরিক্রমা করতে পারতেন (বেকার-এর কাগজপত্র, কেমব্রিজ দক্ষিণ এশিয়া চর্চা কেন্দ্র)। এলাহাবাদের ট্যান্ডন ব্যবসাদার গোষ্ঠীর সঙ্গে মালবীয়-র যোগ ও পূর্ববঙ্গে হিন্দু জমিনদার ও মুসলমান চাষীর সম্পর্ক বর্ণনা প্রসঙ্গে, মনে হয়, এই নতুন মুরুব্বি-যাচক আদলটিকে অনেকটাই বাড়িয়ে দেখা হচ্ছে। রাজনীতির সঙ্গে উপদলতন্ত্রের সমীকরণের ক্ষেত্রে কেমব্রিজ বিদ্বানরা নিজেদের গড়ে তুলেছেন নেমিয়ার-এর ছাঁচে (তাঁর কাজ ছিল মধ্য-আঠেরো শতকের ইংল্যান্ড নিয়ে)। গোষ্ঠীশাসনতান্ত্রিক রাজনীতি ও মৌলিক টানাপোড়েন-বর্জিত পর্বে এই ধরনের পরিমার্গ আলোকপাত করতে পারে। কিন্তু বিরাট সংখ্যার মানুষজন যুক্ত আছে এমন সব মুখ্য সঙ্ঘাতের বিশ্লেষণে ক্রমশই তা কম উপযোগী হয়ে পড়ে। নেমিয়ারবাদে বাস্তবিকই বৃহৎ আন্দোলনের পর্বগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার ঝোঁক আছে। এইভাবে এলাহাবাদের ওপর বেলি-র অন্যথা মূল্যবান গবেষণা ১৯২০-তে এসে হঠাৎই শেষ হয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, গবেষণাকে অঞ্চলের ক্ষেত্রে সরিয়ে আনলেও শিরোমণিতন্ত্র থেকে যেতে

পারে ঃ 'আন্দোলনের নেতাদের, অর্থাৎ যেসব মানুষ সে-আন্দোলন সৃষ্টি করেছে সযত্নে তাদের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যেহেতু এর বিভিন্ন কারণ নিশ্চয়ই তাদের উচ্চাশার মধ্যেই নিহিত ছিল' (ওয়াশব্রুক, *ইমারজেন্স অফ প্রভিন্সিয়াল পলিটিক্স*, পৃ. ২৭৯)। মুরুব্বি ও উপদলের চর্চা থেকে বেলি, ওয়াশব্রুক ও বেকার-এর মতো ঐতিহাসিকরা অবশ্য অতি সম্প্রতি সরে আসছেন সরাসরি আর্থনীতিক ইতিহাসের দিকে, যা যথেষ্ট মূল্যবান।

কেমব্রিজ ঘরানার খ্যাতি (কখনও কখনও যা বদনামের সামিল) যদি গত দশকের অন্যান্য বিস্তর ঐতিহাসিকদের—দেশী তথা বিদেশী—রচনাকে আচ্ছন্ন করে দেয়, তবে তা হবে খুবই দুর্ভাগ্যজনক। ডি এ লো-র সঙ্গে যুক্ত সাসেক্স ও ক্যানবেরা-ভিত্তিক বিদ্বানরা সম্ভবত প্রকল্পের ব্যাপারে স্বল্পপ্রসূ ও কম সুসংবদ্ধ। কিন্তু ধ্যানধারণার ক্ষেত্রে তাঁরা তুলনায় অনেক বেশি খোলামেলা। রাওলাট সত্যাগ্রহ নিয়ে রচনা-সংগ্রহ ও আরও সাম্প্রতিক *কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ* বইটি গণ-উত্থানের বিভিন্ন পর্ব চর্চার ক্ষেত্রে অভিনব রকমে সংস্কারমুক্ত। উল্টোদিকে প্রায়শই গৌরবের স্থান দেওয়া হয়েছে কৃষক আন্দোলনকে, যদিও প্রভাবশালী গ্রামগোষ্ঠী বা ধনী কৃষকদের ভূমিকা নিয়ে কখনও কখনও যে সাধারণীকরণ করা হয়েছে তা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। সাম্রাজ্যবাদী নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রটি এখন আর [গবেষণা-জগতে] খুব কেতার ব্যাপার নয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ব্রিটিশ শ্রমিক দলের মনোভাব নিয়ে পি এস গুপ্ত, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর রদবদল নিয়ে আর জে মুর, ও দ্বৈত-শাসনতন্ত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে পিটার রব-এর কাজ এখানে উল্লেখ করতেই হবে। মার্কিনীদের অবদানের মধ্যে আছে পাঞ্জাবে আর্যসমাজ ও জাতীয়তাবাদ, দক্ষিণ-ভারতে জাতের রাজনীতি, বিহারের কৃষক আন্দোলন বিষয়ক চর্চা, আর হালে প্রথম যুগের কংগ্রেস নিয়ে জে আর ম্যাকলেন-এর এক চমৎকার পর্যালোচনা। মুসলমানদের ভেতর সামাজিক ও রাজনৈতিক ঝোঁক নিয়ে অজস্র রচনার মধ্যে ইসলামী আধুনিকতা বিষয়ে আজিজ আহ্‌মেদ, দেওবন্দ বিষয়ে জিয়া-উল হাসান ফারুকী, পিটার হার্ডি-র উপযোগী সাধারণ বিশ্লেষণ আর রফিউদ্দীন আহ্‌মেদ, মুশিরুল হাসান ও গেল মিনো-র সাম্প্রতিক বইগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনগুলিকে কালিমালিপ্ত করেছেন কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা—তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতীয় মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা মাঝে মাঝে যে-অবস্থান নিয়েছেন, প্রথাগত জাতীয়তাবাদ থেকে তাকে আলাদা করা শক্ত। রজনী পাম দত্ত ও প্রথমদিকের কিছু সোভিয়েত রচনার বৈশিষ্ট্য ছিল জাতীয় নেতৃত্বের 'সঙ্কীর্ণতাবাদী' ও অযথা নেতিবাচক মূল্যায়ন। কখনও কখনও তার বদলে এসেছে টিলক, গান্ধী বা নেহরুর সাক্ষাৎ বীরপূজা। এ এক দুর্ভাগ্যজনক দোলাচল যাতে এক প্রান্ত লালন করে অন্য প্রান্তকে। কিন্তু নরমপন্থী আর্থনীতিক ভাবাদর্শ এবং আসাম ও বাঙলার রাজনৈতিক আন্দোলনের বিস্তারিত পর্যালোচনাও করেছেন মার্কসবাদীরা। একই সঙ্গে তাঁরা বিভিন্ন বামপন্থী আন্দোলন নিয়েও যথেষ্ট লিখেছেন। আর মার্কসবাদী তথা অ-মার্কসবাদী বিদ্বানরা আরও বেশি করে গ্রাম-স্তরের তথ্যের ভিত্তিতে সত্যিকারের মাটি-ঘেঁষা চর্চার দিকে সরে আসছেন। গুজরাটের পাটীদার, যুক্ত প্রদেশের কিসান, বিহারের চাষী ও বাঙলার বিভিন্ন জায়গায় গ্রামীণ গান্ধীপন্থী আন্দোলন নিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছেন ডেভিড হার্ডিমান, মজিদ সিদ্দিকি, কপিল কুমার, জ্ঞান পাণ্ডে, স্টিফেন হেনিংহ্যাম, ও হিতেশ সান্যালের মতো

ঐতিহাসিকরা। এই সব অনুসন্ধানের ফলে যা বেরিয়ে আসে তা হলো 'তলা থেকে ইতিহাসে'র ওপর এক নতুন গুরুত্ব। সিয়োমণি-পরিমার্গের সব ধরনের থেকেই এটি আলাদা।

এ-জাতীয় ক্ষেত্র-সমীক্ষার একটা বাড়তি সুবিধে আছে ঃ ঐতিহাসিক এর দরুণ সমাজতত্ত্ব ও সামাজিক নৃতত্ত্ব—এই দুই শাখার আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসে যান। আশা করা যায় তা এক পারস্পরিক আদান-প্রদান জাগিয়ে তুলবে—এতাবৎ আমাদের দেশে যা প্রায় ছিলই না। বহুদিন ধরে ভারতীয় নৃতত্ত্ব বলতে বোঝাত বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবন সমীক্ষা। ১৯৫০-এর দশক থেকে এল জাতপাতের কাঠামো, আন্দোলন ও সংগঠন নিয়ে চর্চার নতুন কেতা। এই ধরনের গবেষণা থেকে সঙ্কলিত মূল্যবান তথ্যসম্ভারকে আধুনিক ভারতীয় ঐতিহাসিক অবহেলা করতে পারেন না। যদিও আঁদ্রে বেতেল-এর সাবধানবাণী মনে রাখলেই তিনি ভালো করবেন ঃ জাত-সচলতা প্রায়শই ছোটো-ছোটো রাইস-গোষ্ঠীর উর্ধ্বঘাতের বেশি কিছু না-ও হতে পারে। 'জাত-সমিতি নিয়ে আমাদের বিস্তারিত গবেষণা কেন এত বেশি আর কৃষক সংগঠন নিয়ে কেন এত কম—তা ভেবে কোনো সমাজতাত্ত্বিক নিশ্চয়ই অবাক হতে পারেন'—রুডলফ্‌দের *মডার্নিটি অফ ট্রাডিশন* বইটির সমালোচনায় বেতেল এই কথাগুলো যোগ করেছিলেন (*ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ*', সেপ্টেম্বর ১৯৭০)।

দুর্ভাগ্যবশত সামাজিক ইতিহাস এখনও অবধি ভারতে খুবই অবহেলিত বিষয়। প্রায়শই এটিকে সমাজসংস্কার প্রয়াস নিয়ে সমীক্ষার সঙ্গে কার্যত এক করে ফেলা হয়। শ্রেণী-গঠন ও শ্রেণী-চেতনা নিয়ে কাজ সবে শুরু হয়েছে। দেশীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের বিকাশ স্পষ্টতই আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবুও সেটি যে বিজ্ঞানসম্মত ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠছে এমন ইঙ্গিত প্রায় নেই-ই। বিশাল মাত্রায় নিরক্ষরের দেশে লিখিত সাহিত্য শুধু এক সংখ্যালঘু অংশেরই ধ্যানধারণা ও মূল্যবোধের দিশারি হতে পারে। 'কৃষকের মনের ভেতরে ঢোকার জন্যে' হালের এক ফরাসি ঐতিহাসিক (ইউজিন ওয়েবার, *পেজান্ট অ্যান্ড ফ্রেঞ্চমেন*) 'গ্রামের মানুষের গান, নাচ, প্রবচন, কাহিনী ও ছবি'র চর্চার ওপরেও জোর দিয়েছেন। এই সব পদ্ধতি এখনও ভারতে প্রয়োগ হতে বাকি আছে।

শেষত, অর্থনীতিবিদ্‌দের কাছ থেকে আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিকদের বড় রকমের উপকরণ চাই। বেশি ঠাটওয়ালা ও অঙ্ক-মনস্ক সমসাময়িক অর্থনীতিজীবীরা আর্থনীতিক ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় খোলাখুলিই নাক কুঁচকোন। তার থেকেই এক্ষেত্রে এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ বুঝতে হলে আজও আমাদের উনিশ ও বিশ শতকের সন্ধিক্ষণের জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌দের দিকে তাকাতে হয় (১৯৩০-এর দশকের বুকানন ও ডি আর গাডগীল আর ১৯৪০-এর দশকের রজনী পাম দত্তের সংযোজন সমেত)। তাঁদের সময়ে এইসব কাজ নতুন পথ করে দিয়েছিল ; আজ কিন্তু তার অনেকটাই তামাদি আর মেঠো লাগে। আঠেরো ও উনিশ শতকের ব্যবসা, অর্থসংস্থান, রাজস্ব-নীতি ও কৃষিসম্পর্ক নিয়ে ঐতিহাসিকরা তাঁদের দিক থেকে যথেষ্ট কাজ করেছেন। কিন্তু ১৯০০-পরবর্তী পর্বের ওপর কাজ তুলনায় কম। এ পর্বের ক্রমবর্ধমান জটিলতা ও সংখ্যাতাত্ত্বিক তথ্যের জন্যে অর্থনীতি বিষয়ে কিছু পরিমাণ প্রকরণগত প্রশিক্ষণ আরও বেশি দরকারি হয়ে উঠেছে। অর্থনীতিবিদ্‌দের অবদান কতটা মূল্যবান হতে পারে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে থর্নার

দম্পতির রচনায়, জর্জ ব্লিন-এর কৃষি-উৎপাদনশীলতা সম্পর্কিত পর্যালোচনায়, ভারতে দেশীয় অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বাধানিষেধ বিষয়ে অমিয় বাগচীর বিশ্লেষণে। *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি* ও *ইণ্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ*-এর পাতায় প্রকাশিত অসংখ্য গবেষণাপত্রেও তার ইঙ্গিত মেলে।

গত দশক জুড়ে আধুনিক ভারত নিয়ে গবেষণার হঠাৎ বিস্তারের দরুণ চালু পাঠ্যপুস্তক ও সাধারণ পর্যালোচনাগুলি হয়ে গেছে ভীষণ সেকেলে। নতুন মালমশলার এই বাড়বাড়ন্তের কোনো একরকম সংশ্লেষ, তা যতই সাময়িক ও অসম্পূর্ণ হোক না কেন, জরুরি হয়ে পড়েছে। এই বইটির প্রধান উদ্দেশ্য তা-ই। যেসব প্রকাশিত বই ও গবেষণাপত্র পাওয়া যায় মূলত তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও, সময়ে সময়ে নিজের গবেষণা দিয়ে আমি তথ্য বা পদ্ধতির ফাঁক ভরাবার চেষ্টা করেছি। কোনো ঐতিহাসিকই পক্ষপাতমুক্ত হতে পারেন না, সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো অঘোষিত ও অচেতন পক্ষপাত। তাই এখানেই আমার প্রধান প্রধান পূর্বধারণা খোলাখুলি বলে নেওয়াই ভালো। প্রথমত, আমি মনে করি, যে-বছরগুলির পর্যালোচনার চেষ্টা আমি করছি, ঔপনিবেশিক শোষণ আর তার বিরুদ্ধে সংগ্রামই হবে তার কেন্দ্রীয় ভাববস্তু। একই সঙ্গে আমি মনে করি, ভারতীয় সমাজের অন্তর্গত নানা টানাপোড়েনকে অবহেলা করা (জাতীয়তাবাদী ইতিহাস-রচনার ধারায় প্রায়শই যা করা হয়েছে) ঠিক হবে না, তা ভুল পথে নিয়ে যাবে। তৃতীয়ত, আমাদের কাহিনীর একাংশে অবশ্যই থাকবে উপদলীয় কোন্দলের কথা, তবু পরিণামে অন্তর্নিহিত শ্রেণীগত টানাপোড়েনই অনেক বেশি নির্ধারক হয়ে উঠেছিল—যদিও শ্রেণী ও শ্রেণী-চেতনাই বিশ্লেষণের হাতিয়ার, তাকে আরও দক্ষ ও নমনীয়ভাবে ব্যবহার করতে হবে। সর্বদা তা করা হয় নি। অবশেষে ও সবচেয়ে বড় কথা হলো, প্রথাগত জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কেমব্রিজ ঘরানা, এমনকি কিছু কিছু মার্কসবাদী ইতিহাস-রচনাধারার সঙ্গে আমার মূল বিবাদ এই যে, পরিষ্কার পারস্পরিক বিপক্ষতা সত্ত্বেও এঁরা সবাই এক সাধারণ শিরোমণি-পরিমার্গের ভাগীদার হয়ে গেছেন। আমি কিন্তু বিশ্বাস করি, আমাদের দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার দুটি স্তর ছিল ঃ একটি তুলনায় শিরোমণিতান্ত্রিক, অন্যটি আরও লোকায়ত। প্রথমটির চর্চা অনেক বেশি সহজ বলেই কোনো ঐতিহাসিক দ্বিতীয়টিকে অবহেলা করতে পারেন না। এই দুটি স্তরের জটিল পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমেই পরিবর্তনের-ভেতর-দিয়ে পরম্পরার নকশাটি বেরিয়ে আসে। আমার বিবেচনায় এই পর্বে এটিই ছিল প্রভুত্বশালী।

১৮৯০-এ যখন নরমপন্থী কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতিকেই মনে হয়েছিল জাতীয়তাবাদের একমাত্র রূপ, তখন বোম্বাই-এর এক লাট গোপনে বড়লাটকে লিখেছিলেন ঃ 'অরণ্য নীতি, আবগারি (অন্তঃশুল্ক) নীতি, লবণ কর, সংশোধন বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি-রাজস্বের কড়াকড়ি—এসবই আমাদের ঘৃণার পাত্র করে তুলেছে। ...এদেশীয় শিক্ষিত লোকেরা কী চায় তা আমরা ভালোভাবেই জানি কিন্তু আমি স্বীকার করছি, অশিক্ষিতদের মনোভাব যে কী তা জানি না' (ল্যান্সডাউন-কে রেঈ, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯০)। মাটির তলায় আগুন সম্পর্কে নিশ্চিতভাবেই এ এক জীবন্ত সচেতনতা। চল্লিশ বছর পরে মূলত নুন, ভূমি-রাজস্ব, আবগারি ও অরণ্যের অধিকার নিয়েই মহাত্মা গান্ধী এক সর্বভারতীয় আন্দোলন গড়ে তুলবেন। অনুসন্ধানের অপেক্ষায় এখানেই অনেক গভীরতা ও পরম্পরা রয়েছে।

২

রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক কাঠামো ১৮৮৫-১৯০৫

সাম্রাজ্যের কাঠামো ও নীতি

বিশ শতকের বেশ কিছুকাল অবধি ভারতে ব্রিটিশ সরকার মূলত ছিল ক্রমপরম্পরায় সাজানো কর্মচারীদের এক স্বৈরতন্ত্র। তার মাথায় ছিলেন বড়লাট ও ভারত-সচিব। অন্যদিকে চূড়ান্ত সংসদীয় নিয়ন্ত্রণ ছিল এলোপাথাড়ি ও অনেকটাই তত্ত্ব-সর্বস্ব। কার্যত ১৮৫৮-র পরবর্তী ঘটনাধারায় বড়লাট ও ভারত-সচিব জুড়ির ব্যক্তিগত ভূমিকা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। সংযোগের ক্ষেত্রে বিপ্লবের ফলে—সমুদ্রের তলা দিয়ে টেলিগ্রাফের তার পাতা ও সুয়েজ খাল (১৮৬৫-৬৯) যার প্রতীক—তাঁদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির কাজ-কারবার ছিল ইংল্যান্ডের সজীব রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক বিষয়। সনদ আইন একাধিকবার নতুন করে পাশ করানোর সময়ে সংসদে তীব্র বিতর্ক উঠত। ১৮৫৮-র পর প্রতি বছর নিয়মমাফিক ভারতের আর্থিক বিবরণ ও 'নৈতিক ও জাগতিক প্রগতির প্রতিবেদন' দাখিল করার সময়ে সাধারণত হাউস অফ কমন্স (সংসদের নিম্নকক্ষ) দ্রুত ফাঁকা হয়ে যেত। মুরুব্বির ভূমিকায় থাকার দরুন কম্পানির পরিচালকমণ্ডলী প্রভাবশালীই থেকে গিয়েছিল। ভারত-সচিবকে নিয়ন্ত্রণের জন্যে লর্ড স্ট্যানলি-র আইন অনুসারে ভারত পরিষদ (কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া) গড়ে তোলা হয়। কিন্তু তা কখনোই খুব একটা গুরুত্ব পায় নি, কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাকে খারিজ দেওয়া যেত বা বড়লাটের উদ্দেশ্যে 'জরুরি বার্তা' বা 'গোপন নির্দেশ' বলে এড়িয়ে যাওয়া যেত। ভারতেও রেলপথ ও টেলিগ্রাফের দরুণ স্থানীয় সরকারগুলি এসে গিয়েছিল কলকাতার কাছাকাছি। আর কুপল্যান্ড মনে করিয়ে দিয়েছেন, ১৯১৯-এর আগে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় (কাঠামোর) ধারণার কোনো লক্ষণ'ই ছিল না ('সাংবিধানিক সমস্যা')। ১৮৬১-র ভারতীয় পরিষদ আইনে 'দফ্‌তর' বা বিভাগীয় প্রণালীর বদলে যৌথ কাজকর্ম চালু হয়। এর ফলে শাসন-পরিষদের ওপর পাকা হয় বড়লাটের কর্তৃত্ব। এই আইন অনুযায়ী সাম্রাজ্যিক ও স্থানীয় আইন পরিষদ প্রসারণ বা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেগুলোয় কিছু বেসরকারি ভারতীয় সদস্য থাকলেও, আদতে তা ছিল শোভা বাড়ানো। ১৮৯২ অবধি এগুলি ছিল সম্পূর্ণভাবে মনোনীত লোকদের নিয়ে তৈরি সংস্থা। ঐ বছরের সংস্কারের আগে অবধি অর্থসংস্থান নিয়ে আলোচনা বা প্রশ্ন তোলার বৈধ ক্ষমতাও তাদের ছিল না। এইভাবে রাজনৈতিক কাঠামো অপরিসীম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে দিয়েছিল বড়লাট ও ভারত-সচিবের হাতে। তাই তাঁদের ব্যক্তিগত মনোভাব ও রাজনৈতিক পক্ষভুক্তি নিয়ে কিছুটা বিবেচনা প্রাসঙ্গিক—যদিও সৌভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসকে নানা বড়লাটী পর্বে ভাগ করার অভ্যাসে ইতি পড়েছে।

বড়লাটী মনোভাব

১৮৮৫-তে রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়রা বিভিন্ন বড়লাটের মধ্যে তফাতের ব্যাপারে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন ; বিশেষ করে লিটন আর রিপন-এর তফাতকে প্রায় কালো আর সাদার ফারাক হিসেবে দেখা হতো। এই পার্থক্যকে তাঁরা সরাসরি যুক্ত করতেন ব্রিটিশ রাজনীতির টোরি ও লিবারেলদের সঙ্ঘাতের সঙ্গে। ১৯১৫-য় নরমপন্থী কংগ্রেস নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার *ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ইভল্যুশন* গ্রন্থে ইতিহাস লিখতে বসে লিটন পর্বের 'ঘনায়মান মেঘ'কে উপস্থিত করেছেন রিপন ও ডাফরিন পর্বের 'মেঘমুক্তি' ও 'ঊষার আলো'-র উল্টো বলে। এমনকি আরও অনেক সাম্প্রতিক ও পরিশীলিত এক বিদ্বান ১৮৬৯-৮০-র 'রক্ষণশীল অভিযানে'র সঙ্গে ১৮৮০-৮৮-র 'উদারনৈতিক পরীক্ষা'র প্রতিতুলনা করেছেন (এস গোপাল, *ব্রিটিশ পলিসি ইন ইণ্ডিয়া*)।

বাক্যচ্ছটা বাদ দিলেও যথার্থ তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য দেখা দিয়েছিল ১৮৮০-র দশকের প্রথম দিকে। কিছুদিনের জন্য রাজা ও জমিনদার ছাড়িয়ে ইংরিজি-শিক্ষিত 'মধ্যশ্রেণীর গোষ্ঠীগুলিকে ভারতীয় সংযোগীদের বৃত্তে আনার এক চেষ্টা করা হয়। 'এইসব বাবু, আমরা যাদের ইংরিজি শিখিয়েছি দেশীয় কাগজে আধা-রাজদ্রোহী নিবন্ধ লেখার জন্যে'—এই বলে লিটন তাদের বাতিল করেন। অন্যদিকে 'এইসব শিক্ষিত নেটিভকে আমাদের শাসনের শত্রু বানানোর চেয়ে বন্ধু করার ক্রমবর্ধমান... প্রয়োজন'-এর কথা বলতে ভালোবাসতেন রিপন (অনিল শীল, *ইমার্জেন্সি অফ ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম*, পৃ. ১৩৪, ১৪৯)। ১৮৮৩-র ইলবার্ট বিলের প্রতিক্রিয়ায় অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের অপ্রত্যাশিত রোষাগ্নির ফলে অচিরেই এই পরীক্ষা বন্ধ হয়—যদিও শিক্ষিত ভারতীয়দের দৃষ্টিতে রিপন অনেকটাই অন্যায্য প্রায়-শহিদের মাহাত্ম্য লাভ করেন।

ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮), ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৩) ও এলগিন (১৮৯৩-৯৮)-এর আমলে ভারতীয়দের সম্পর্কে টোরি ও লিবারেলদের মনোভাবের পার্থক্য ক্রমেই আবছা হয়ে আসে। বেজুত ও বৃথাই সব সেরা ফলের দিকে হাত বাড়ান ডাফরিন। শ্বেতাঙ্গদের বাণিজ্যিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে তিনি ব্রহ্মদেশের উত্তরভাগকে সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করেন, ভূস্বামীদের অনুকূলে বাঙলা ও অযোধ্যার রায়ত আইনগুলোয় রদবদল করেন, কিছুদিন হিউম-এর সঙ্গে দহরম-মহরম চালান ; কিন্তু ভারত ছেড়ে যাওয়ার ঠিক আগে, সেন্ট অ্যাণ্ড্রুজ-এর নৈশভোজের ভাষণে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন কংগ্রেসকে। পরিণামে কাউকেই তিনি খুশি করতে পারেন নি। ১৮৮৮-র ডিসেম্বরে দাদাভাই নওরোজীকে এক ব্যক্তিগত চিঠিতে দিনশা ওয়াছা এমনকি এ-ও লেখেন যে, লিটনকে তিনি সহ্য করতে পারেন, কিন্তু ডাফরিনকে নয় (আর পি পটবর্ধন সম্পা., *দাদাভাই নওরোজী করেসপন্ডেন্স*, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৭)। ল্যান্সডাউনকে নিয়োগ করেছিল টোরি স্যালিসবারী মন্ত্রিসভা। কিন্তু সাত-তাড়াতাড়ি তিনি প্রাদেশিক পরিষদগুলোয় কয়েকটি নির্বাচিত আসনের জন্যে ডাফরিন-এর অপ্রকাশ্য উপরোধ স্বীকার করে নেন। তাতেই স্পষ্ট বোঝা যায়, ভারতের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ দলীয় ভাগাভাগি কতটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছিল। দুজনেই প্রায় একই ভাষায় যুক্তি দেন যে, এটি করলে কংগ্রেসের 'পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নেওয়া হবে'। এলগিন-এর সময়েই ভারতীয় তুলোর ওপর প্রতিকারী উৎপাদন-শুল্ক চাপিয়ে ল্যাঙ্কাশায়ারের সুবিধে করে দেওয়া হয়। গ্ল্যাডস্টোন প্রশাসনের শেষ পর্যায়ে বড়লাট নিযুক্ত

হন এলগিন। আর এই 'চমৎকার বুড়ো মানুষ'টি স্বয়ং ১৮৯২-এ লর্ড ক্রশ বিল-এর ক্ষেত্রে একটি সংশোধনী—যাতে খোলাখুলিই নির্বাচন চালু করতে চাওয়া হয়েছিল—সমর্থন করতে নারাজ হন। এতে তাঁর ভারতীয় অনুরাগীরা খুবই আশাহত হয়েছিলেন। একই জিনিস ঘটে ১৮৯৩-এ। (ভারতে ও ইংল্যান্ডে) একযোগে আই সি এস পরীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে সংসদের নিম্নকক্ষ (হাউস অফ কমন্স) এক প্রস্তাব নেয়। কিম্বার্লি ও ল্যান্সডাউন সেটিকে কোনো গুরুত্ব না দিলে তিনি তাঁদেরই সায় দেন।

১৮৮০-র মাঝামাঝির পর গ্ল্যাডস্টোন-এর 'আইরিশ স্বশাসন'-এর ব্যাপার নিয়ে লিবারেল দল ভেঙে যায়। সে-সময়ে দলীয় ভাগাভাগি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ডামাডোলের পেছনে তারও কিছু ভূমিকা থাকতে পারে। যাই-হোক, লিবারেল ঐতিহ্য সব সময়েই ছিল খানিক দ্বিমুখী। তার ভেতরে ছিলেন অভিজাত নেতৃত্বের হুইগ অনুরাগী, বৃহত্তর গণতন্ত্রের র‍্যাডিকাল সমর্থক, উদারপন্থী সাম্রাজ্যবাদী (বিদেশনীতির প্রশ্নে যাদের রক্ষণশীলদের থেকে আলাদা করা যায় না), আর ছোটো-ইংল্যান্ডবাদীরা', যাঁরা সত্যিই সামরিক বিস্তারের বিরোধী ছিলেন (যদিও অবাধ বাণিজ্যের দরুন পর্যাপ্ত জাগতিক লাভের বিরোধী নয়)। ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির গোটা হেতুপরম্পরা থেকে কয়েকটি পরিণতি বেরিয়ে আসে, রাজনৈতিক ভাবাদর্শের চেয়ে যেগুলো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আরও দীর্ঘমেয়াদি এই সব প্রবণতার দিকেই আমাদের এখন তাকাতে হবে।

বিদেশনীতি

ব্রিটিশ ভারতের বিদেশনীতিতে কার্জন-এর সময়ের আগে আবার লিটন-এর জমকালো সাম্রাজ্যবাদে ফিরে যাওয়ার ব্যাপার ছিল না। ১৮৬০-এর দশকের নীতি ছিল 'ওস্তাদি নিষ্ক্রিয়তা'। এই পর্বের মনোভঙ্গি ছিল তার তুলনায় যথেষ্ট বেশি আক্রমণাত্মক। রাশিয়া এগোচ্ছিল আফগানিস্তান ও পারস্যের দিকে আর ইন্দোচীন কব্জা করছিল ফ্রান্স। এই দুই দেশের সঙ্গে সদা শাণিত সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিপ্রেক্ষিতে সে-মনোভঙ্গি বোঝা যায়। বিরোধীপক্ষে থেকে লিবারেলরা-লিটন-এর আফগান অভিযানের নিন্দে করেছিল ভীষণভাবে। তবু শেষ পর্যন্ত রিপন-এর নীতি খুব একটা নতুন কিছু ছিল না। আফগানিস্তানকে ভাগ করার পরিকল্পনা, ও কাবুলে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি (এজেন্ট) রাখার ব্যাপারে জিদও বিসর্জন দেওয়া হয়। কিন্তু আবদুর রহমানকে (লিটন শেষে তাঁকেই বেছে নেন) আমির হিসেবে থাকতে দেওয়া হলো। আর ভর্তুকির বিনিময়ে চাপানো হলো বিদেশনীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ। পিশিন ও সিবি ব্রিটিশরা নিজের দখলেই রাখল ; ১৮৮৭-তে ঐ দুটি জায়গা পরিণত হলো ব্রিটিশ বালুচিস্তানে।

ডাফরিন-এর সময়ে রুশরা পঞ্জডেহ্-র আফগান সীমান্ত চৌকি দখল করে (মার্চ ১৮৮৫)। এই নিয়ে দেখা দেয় তীব্র উত্তেজনা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিষয়টি ডেনমার্কের রাজার কাছে সালিশির জন্যে পেশ করা হলো। জুলাই ১৮৮৭-তে আফগান সীমান্ত নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে রফা হলো একটা চুক্তি করে। জঙ্গীবাদী সর্বাধিনায়ক লর্ড রবার্টস-এর সময়ে (১৮৮৭ থেকে ১৮৯২) উত্তর পশ্চিম সীমান্তে এক আগ্রাসী নীতি অনুসরণ করা হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ, অভিযান, সামরিক দিক থেকে সুবিধাজনক রেলপথ বসানো, ১৮৯৩-এ ভারত

আফগান সীমান্ত নির্ধারণে ডুরান্ড চুক্তি চাপিয়ে দেওয়া, চিত্রল অধিকার ও শেষ অবধি তা দখলে রাখা (লিবারেলদের বিবেক দংশন সত্ত্বেও)—এগুলোও তার মধ্যে পড়ে।

ডাফরিন প্রশাসনের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় ব্রিটিশ সীমানার শেষ ও বাস্তবিকই বড় ধরনের প্রসার—১৮৮৬-র জানুয়ারিতে উত্তর ব্রহ্মদেশের সংযুক্তি। ১৮৮৫-র নভেম্বরে ব্রিটিশ বাহিনী কেন সেখানে ঢুকে পড়ার সিদ্ধান্ত নিল—একাধিক রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক কারণের সমাহার তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ব্রিটিশরা সন্দেহ করত, প্রতিবেশী ইন্দোচীন থেকে ব্রহ্মদেশে ফরাসি প্রভাব এসে পড়ছে। বিশেষত, রাজা থিবো ১৮৮৫-র জানুয়ারিতে একটি বাণিজ্য চুক্তি ও জুলাই-এ এক ফরাসি কম্পানির সঙ্গে রেলপথ চুক্তি সই করার পরেই সে সন্দেহ জাগে। ১৮৮৫-র অগাস্টে এক ব্রিটিশ কাঠ ব্যবসায়ী সমিতিকে জাল জোচ্চুরির অভিযোগে থিবো প্রচুর জরিমানা করেছিলেন। বিশেষ করে তার পরে রেঙ্গুনে ব্রিটিশ বাণিজ্য-সংস্থা (চেম্বার অফ কমার্স)-ও এই সংযুক্তিতে আগ্রহী ছিল। র‍্যান্ডলফ্ চার্চিল ডাফরিনকে আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'ব্রিটেনেও বৃহৎ ব্যবসায়ী স্বার্থ', বিশেষত ম্যাঞ্চেস্টার, এই 'সংযুক্তিকে সোৎসাহে সমর্থন করবে'। মনে হয়, উত্তর ব্রহ্মদেশের নিজ আকর্ষণ ছাড়াও ইউনান ও দক্ষিণ-পশ্চিম চীনে ঢোকার সম্ভাব্য পথ হিসেবে তার আকর্ষণ ছিল। স্যালিসবারী মন্ত্রিসভা সাগ্রহে ডাফরিনকে সমর্থন জানায়। আনুষ্ঠানিক সংযুক্তির সময়ে ক্ষমতায় ছিল গ্ল্যাডস্টোন মন্ত্রিসভা। কিছু বিবেক-দংশন থাকলেও, 'প্রভূত অনিচ্ছা সত্ত্বেও' তাঁরা শেষে রাজি হন। এই পর্বে টোরি ও লিবারেলদের মধ্যেকার তফাতকে এই ফারাকটুকু দিয়ে প্রায় মিলিয়ে দেওয়া হয়। যেমন ভাবা গিয়েছিল, ক্ষয়িষ্ণু মাণ্ডালে দরবার প্রায় বিনা যুদ্ধেই বিধ্বস্ত হয়, কিন্তু লোকায়ত গেরিলা প্রতিরোধ ভাঙতে লেগেছিল পাঁচটি বছর ও ৪০,০০০ সেনা।

সেনাবাহিনী

এরকম প্রতিটি অভিযান মানেই হলো সামরিক খাতে আরও বেশি খরচ। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে মূলত ভারতীয় কোষাগারের খরচে বিদেশে ভারতীয় সেনা নিয়োগ। ১৮৮২-তে রিপন-এর প্রতিবাদ সত্ত্বেও, গ্ল্যাডস্টোন তাঁদের পাঠান মিশরে। ১৮৮৫-৮৬ ও ১৮৯৬-এ মাহদি আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাঁদের পাঠানো হয় সুদানে ও ১৯০০-য় বক্সারদের বিরুদ্ধে চীনে। পঞ্জদেহ্ আতঙ্কের ফলে বাহিনীতে ৩০,০০০ সেনা বাড়ানোর সুযোগ পাওয়া গেল। ১৮৮১-৮২-তে ভারত সরকারের অর্থসংস্থানে সামরিক খাতে ব্যয় ছিল মোট খরচের ৪১.৯%। দশ বছর পরে তা হয় ৪৫.৪% ও ১৯০৪-০৫-এ কার্জন-এর আমলে বেড়ে দাঁড়ায় ৫১.৯%। ঔপনিবেশিক শাসনের ভেতরের যথার্থ চেহারা বুঝতে সামরিক নীতি বাস্তবিকই প্রচুর সাহায্য করে। সবচেয়ে প্রভাব ফেলেছিল ১৮৫৭-র স্মৃতি। ১৮৮৮-র ডিসেম্বরে ডাফরিন মন্তব্য করেন, '৩০ বছর আগে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার সঙ্গে' ব্রিটিশরা 'যেসব শিক্ষা পেয়েছিল সর্বদাই সেগুলো স্মরণে রাখা উচিত'। ১৮৫৯-১৮৭৯-র দুটি কমিশনে তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয় : সেনাবাহিনীতে শ্বেতাঙ্গরা হবে এক-তৃতীয়াংশ (১৮৫৭-র আগে ছিল ১৪%), গোলন্দাজ বাহিনীতে থাকবে কঠোর ইওরোপীয় একচেটিয়া অধিকার (১৯০০ অবধি ভারতীয়দের যে-রাইফেল দেওয়া হতো, এমনকি তা-ও ছিল নিচু মানের।) আর সার জন স্ট্র্যাচি যাকে

বলেছিলেন 'সম্পূর্ণ জল-অচল নীতি... যাতে জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা স্থানীয় সহানুভূতি থেকে উদ্ভূত কোনো বিপজ্জনক অনুভবগত একাত্মবোধ গড়ে উঠতে না পারে' (*ইন্ডিয়া*, পৃ. ৬৩)। ১৮৬২-তে বিভেদ-ও-শাসন নীতিটি ঘোষণা করেন উডঃ 'আমি চাই বিভিন্ন রেজিমেন্টের মধ্যে পৃথক ও রেষারেষির মনোভাব, দরকার হলে যাতে শিখ নির্দ্বিধায় গুলি করতে পারে হিন্দু ও গুর্খা এ দু-এর যে কাউকে'। কথার স্পষ্টতা দেখে ঈর্ষা জাগে। ১৮৭৯-র সামরিক কমিশনে এরই পুনরাবৃত্তি করা হয় : 'যথেষ্ট সংখ্যক ইওরোপীয় বাহিনীর চমৎকার ভারসাম্যের পরেই আসবে দেশীয়দের বিরুদ্ধে দেশীয়দের ভারসাম্য' (হীরালাল সিং, *প্রবলেমস্ অ্যান্ড পলিসিস্ অফ ব্রিটিশ ইন ইন্ডিয়া*, ১৮৮৫-১৮৯৮, পৃ. ১৪০, ১৪২ থেকে উদ্ধৃত)। 'যোদ্ধা জাতি'র মতাদর্শ—যাতে মনে করা হয়, ভালো সৈন্য আসতে পারে নির্দিষ্ট কয়েকটি সম্প্রদায় থেকেই—বিশেষ করে গড়ে ওঠে ১৮৮০-র দশকের শেষভাগে লর্ড রবার্টস-এর অধীনে। এটি কাজে লাগানো হয় সেই নিয়োগনীতির সাফাই হিসেবে যার প্রধান্য লক্ষ্য ছিল শিখ ও গুর্খারা। এঁরা তুলনায়-প্রান্তিক ধর্মীয় ও নৃকুলগত গোষ্ঠী, তাই জাতীয়তাবাদের ছোঁয়া লাগার সম্ভাবনা কম। জাতিগত সমতা বা সেনাবাহিনীর কর্তৃত্বে ভারতীয়দের আনার কোনো প্রশ্নই ছিল না। এমনকি সামান্য মাইনে বাড়ার পরেও ১৮৯৫-এ একজন ভারতীয় পদাতিক পেতেন মাসে ৯ টাকা। সেখানে একজন শ্বেতাঙ্গ পদাতিক পেতেন প্রায় ২৪ টাকা ও কয়েকটি ভাতা। এরও অনেক পরে, ১৯২৬-এ ভারতীয় স্যান্ডহার্স্ট কমিটি ৫০% ভারতীয় উচ্চপদস্থ (অফিসার ক্যাডার)-দের কথা ভাবতে পারতেন—১৯৫২-র জন্যে!

আর্থিক ও প্রশাসনিক চাপ

বৈদেশিক অভিযান ও সামরিক বিস্তারের অনিবার্য অর্থ হলো আর্থিক টানাটানি। সোনার তুলনায় রূপোর টাকার দ্রুত অবমূল্যায়নের ফলে ১৮৭৩ থেকে ভারতীয় রাজকোষের ওপর চাপ খুব বেড়ে যায়। ভারতীয় ব্যয়ের এক বিশাল অংশ দিতে হতো স্টার্লিং-এ (ব্রিটিশ সিভিলিয়ান ও সামরিক অফিসারদের অবসর ভাতা, ভারত-সচিবের দপ্তরের খরচ, ভারত-ঋণের ওপর সুদ ও অন্যান্য বিষয়, যা তথাকথিত 'হোম' ব্যয়ের খাতে যেত)। তবু ১৮৭২-এ যে-টাকার মূল্য ছিল ২ শিলিং, ১৮৯৩-৯৪-এ তার মূল্য দাঁড়ায় ১ শিলিং ২ পেন্স-এর সামান্য বেশি। হালে (ব্রিটিশ) 'রাজের আর্থিক ভিত্তি'র আনুপুঙ্খিক অনুসন্ধান করেছেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য। অন্যদিকে এইসব আর্থিক সমস্যা, হাতবদলের সঙ্গে যুক্ত প্রশাসনিক চাপ ও জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ স্পষ্টভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কেমব্রিজ ঐতিহাসিকদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। 'স্থানীয় ব্যাপারে (ব্রিটিশ) রাজের গুরুতর হস্তক্ষেপের ফলে', অনিল শীলের ভাষায়, 'প্রশাসনিক গরাদকে আরও জোর দিয়ে চাপাতে' হয়েছিল (*লোকালিটি, প্রভিন্স অ্যান্ড নেশন*, পৃ. ১০)। আরও স্পষ্ট কথায় এর মানে হলো : কর-ব্যবস্থার পুরনো কায়দার বিস্তার ও নতুন নতুন কায়দা সন্ধানের প্রয়াস। এই প্রণালীর ভেতরেই নানান সমস্যা ছিল, কারণ সরকারকে মোকাবিলা করতে হচ্ছিল নানা টান ও পাল্টা-টানের সঙ্গে।

ভূমি-রাজস্বই ছিল আয়ের একক বৃহত্তম উৎস। সিপাহী বিদ্রোহের ঠিক পরেই যখন বিশ্বস্ত নির্ভরশীল জমিদার খোঁজা হচ্ছিল, তখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রসারের কথা ছিল খুবই চালু।

এখন স্বাভাবিকভাবেই তা ভুলে যাওয়া হয়। ১৮৯০-এর দশকের শেষ ভাগে বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও, আদায়ের পরিমাণ ১৮৮১-৮২-র ১৯.৬৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯০১-০২-এ দাঁড়িয়েছিল ২৩.৯৯ কোটি টাকায়। আমরা দেখব, এটি ছিল প্রধান ও স্থায়ী জাতীয়তাবাদী ক্ষোভ। তবু ভূমি-করের অত্যধিক বৃদ্ধিকে ক্রমেই রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক, আর্থনীতিকভাবে অবিবেচনার কাজ বলে মনে হচ্ছিল, কারণ ব্রিটিশরাও ভীষণভাবে চাইছিল তুলো, পাট, চিনি, গম ও অন্যান্য কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্য বাড়াতে। ঘটনা এই যে, রাষ্ট্রের সামগ্রিক আয়ের তুলনায় ভূমি-রাজস্বের অনুপাত ধীরে ধীরে কমে আসছিল (ওপরে উল্লিখিত বছর দুটিতে মোট রাজস্ব ছিল যথাক্রমে ৪৬.৮৬ ও ৬০.৭৯ কোটি টাকা)। অর্থসংস্থান করার ব্যাপারে আমদানি শুল্ক খুবই সাহায্য করতে পারত আর খুশি করতে পারত রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়দেরও। কিন্তু এ ক্ষেত্রে, সবাই জানেন, ল্যাঙ্কাশায়ার বারবার অন্যরকম নির্দেশ দেয়। ১৮৭০-এর মাঝামাঝি থেকে ম্যাঞ্চেস্টার চক্র—যার পেছনে ছিলেন স্যালিসবারী—তুলোর শুল্ক নিয়ে তীব্র আক্রমণ চালায়, কারণ তা নাকি বোম্বাই-এর নতুন শিল্পকে সংরক্ষণ করছে। আফগান যুদ্ধ সত্ত্বেও ১৮৭৮-৭৯-তে লিটন এসব শুল্ক কমিয়ে দেন, আর ১৮৮২-তে তা একেবারেই তুলে দেন রিপন। ১৮৯০-এর দশকের বিশাল ঘাটতির সময়ে আবার শুল্ক চাপানো অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ১৮৯৪ ও ১৮৯৬-এ তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় কাপড়ের ওপর কুখ্যাত প্রতিকারী উৎপাদন-শুল্ক চাপানো হয়। শ্বেতাঙ্গ ও প্রভাবশালী ভারতীয় দু দলেরই প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ১৮৬০-এ জেমস উইলসন-এর সময় থেকে অর্থবিভাগে ব্রিটিশ-ভারতীয় সদস্যরা আয়কর নিয়েও কিঞ্চিৎ ভাবনা-চিন্তা করছিলেন। ১৮৮৬-তে পাঞ্জডেহ্ ও ব্রহ্মদেশের যুদ্ধের পর ডাফরিন এটিকে একটি সুসংবদ্ধ ও স্থায়ী রূপ দেন। দু বছর বাদে প্রচণ্ড অবরোহী বিক্রয়কর বাড়ানো হয় অনেকটাই।

মাদ্রাজ (১৮৮৭) ও এলাহাবাদের (১৮৮৮) কংগ্রেস অধিবেশনে অস্বাভাবিক রকমের ব্যাপক সমর্থন দেখা যায়। এর কারণ হিসেবে ১৮৮০-র দশকের মাঝামাঝি অস্বাভাবিক করবৃদ্ধির ভূমিকার ওপর জোর দিয়েছেন বেলি ও ওয়াশব্রুক, যথাক্রমে এলাহাবাদ ও দক্ষিণ ভারত নিয়ে তাঁদের আলোচনায়। প্রাদেশিক স্তরে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সম্পর্কে আগ্রহ জাগানোর মতো কিছু তথ্যও দিয়েছেন ওয়াশব্রুক। ১৮৮০-তে মাদ্রাজে মোট রাজস্বের ৫৭% আসত ভূমি-রাজস্ব থেকে, কিন্তু ১৯২০-তে তার পরিমাণ ছিল মাত্র ২৮%। উল্টোদিকে, মদ শিল্পের ওপর আবগাড়ি শুল্ক ১৮৮২-৮৩-তে ছিল ৬০ লাখ, ১৯২০-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫.৪ কোটিতে। বন-রাজস্বও বাড়ানো হচ্ছিল। এর অর্থ হলো গো-চারণ ও জ্বালানির ওপর জনগোষ্ঠীর মানুষ ও গরিব চাষীদের বহুদিনের অধিকারে বাধা দেওয়া আর কখনও কখনও আরও সমৃদ্ধ গ্রামীণ স্বার্থকে খর্ব করা। ইতোমধ্যেই ১৮৮০-র দশকের মাদ্রাজে ও ১৮৯০-র দশকে আসামে প্রাদেশিক সমিতিগুলি অরণ্য আইন ও চারণে বাধা দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। আমরা দেখব, গোড়ার দিকের কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতেও বিষয়টি বারবার উঠেছে।

উনিশ শতকের প্রথমদিকের, গুন্টুরে সরকারি প্রশাসন বিষয়ে ফ্রাইকেনবার্গ-এর বই-এ (*গুন্টুর ডিসট্রিক্ট*, ১৭৮৮ টু ১৮৪৮, অক্সফোর্ড, ১৯৬৫) একটি ছবি স্পষ্ট হয়। যে অধস্তন ভারতীয় কর্মচারীরা তুলনায় শিথিলভাবে সংগঠিত কম্পানি প্রশাসনে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের

সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ও আর্থিক লাভ হতো। ১৮৫৮-র পরবর্তী ঘটনাধারায় ও তাঁর সঙ্গে যুক্ত আর্থিক চাপের ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে ধরনের স্বাধিকার ক্ষুণ্ণ হয়। মাদ্রাজের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়াটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছেন ওয়াশব্রুক। কৌতূহলের ব্যাপার হলো, পূর্ববঙ্গের সিলেট অঞ্চলের ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র পালের বিবরণেও তার সমর্থন মেলে। কেন্দ্রীভূত প্রশাসন যেই বিভিন্ন এলাকার গভীরে ঢুকতে লাগল, ক্রমেই তত খর্ব হয়ে পড়ল 'স্বভাবনেতা' জমিদারদের ক্ষমতা (*মেমোয়ার্স অফ মাই লাইফ অ্যান্ড টাইমস্*, পৃ. ১১-১৬)।

স্থানীয় আত্মশাসন ও কাউন্সিল সংস্কার

আর্থিক চাপ ও প্রশাসনিক আঁটুনি যে রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক নয় তা প্রমাণ করতে হলে সেই সঙ্গে দরকার ছিল আরও বেশি সংখ্যায় ভারতীয় সহযোগীর সন্ধান। অনিল শীল যেমন জোর দিয়েছেন, 'মনোনয়ন, প্রতিনিধিত্ব ও নির্বাচনের প্রণালী—এইসবই ছিল সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে কাজ করার জন্যে ভারতীয়দের দলভুক্ত করার উপায়' (*লোকালিটি, প্রভিন্স অ্যান্ড নেশন*, পৃ. ১০)। স্থানীয় আত্মশাসনের বিকাশে আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলি তার সঙ্গে মিলে ছিল সুচারুভাবে। প্রক্রিয়াটি যথার্থই শুরু হয় রক্ষণশীল মেয়ো-র আমলে, উদারনীতিক রিপন-এর আমলে নয়। স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর দায় নতুন স্থানীয় করের বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে আর্থিক অসুবিধের মোকাবিলা করাই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু মেয়ো-রও মনে হচ্ছিল, 'এই দেশের সরকারে আমাদের অবশ্যই ক্রমেই আরও বেশি দেশীয় উপাদান [= লোকজন] যুক্ত করতে হবে।' যে ১৮৮২-তে রিপনের বিখ্যাত প্রস্তাবে এর দ্বিতীয়, রাজনৈতিক দিকটি বিশেষভাবে দেখা দেয়। তাতে স্থানীয় সংস্থায় নির্বাচিত সংখ্যাগুরু অংশ ও সভাপতি করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বেশির ভাগ প্রাদেশিক আমলার বাধার সামনে পড়ে তা অবশ্য পালন করা হয় ঢিমে তালে ও অসম্পূর্ণভাবে। স্থানীয় ক্ষমতা হস্তান্তরণের গোটা ধারাতেই আর্থনীতিক দিকটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা অনেক পরের একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে নির্দেশ করা যেতে পারে। ১৯১৯-২০-তে বাঙলার ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠার অর্থ দাঁড়াল : সেই মুহূর্তে চৌকিদারি কর ৫০% বৃদ্ধি। তার ফলে মেদিনীপুরে এক বিরাট ও সফল জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদ জেগে ওঠে।

১৮৮০-র দশকের শেষ দিক থেকে কংগ্রেসের উত্থানের অর্থ ছিল : প্রধানত অল্প মাত্রায় একের পর এক আইন পরিষদ মোতাবেক সংস্কার মারফতই উচ্চতর স্তরগুলিতে সহযোগিতা চাইতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ১৮৯২-এ লর্ড ক্রশ-এর ভারতীয় কাউন্সিল আইনে বেসরকারি লোকের সংখ্যা বাড়ে (সাম্রাজ্য-পরিষদে ১৬ জন সদস্যের ১০ জনই হবেন তাঁরা)। যদিও সুস্পষ্টভাবে নির্বাচন মেনে নেওয়া হয় নি, তাও এর ফলে, মনোনয়নের ক্ষেত্রে, ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে স্থানীয় প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, বণিক-সংস্থা ও জমিদার-সভাগুলোর সঙ্গে পরামর্শ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কাউন্সিল-সদস্যরা ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে আলোচনার ও প্রশ্ন করার অধিকার লাভ করেন, যদিও সংশোধনী তোলার, ব্যয়-বরাদ্দের ওপর ভোট দেওয়ার ও অতিরিক্ত প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না।

তথাকথিত 'সাংবিধানিক সংস্কার'-এর ধারাটি আগাগোড়াই যুক্ত ছিল সরকারি নীতির অন্য দুটি প্রধান দিকের সঙ্গে : কিছুকাল অন্তর 'নরমপন্থীদের জড়ো করা'র চেষ্টা (সূত্রটি মিন্টো-র,

কিন্তু তার চেষ্টা চলছিল তাঁর অনেক আগে থেকেই) ও বিভেদ-ও-শাসন কৌশলের দক্ষ ব্যবহার। রিপন-এর প্রচুর আশা সত্ত্বেও প্রথম লক্ষ্য পূরণে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি বিশেষ সফল হয় নি, কারণ পৌরসভা ও জেলাবোর্ডগুলির জন্যে সত্যিকারের ক্ষমতা ও আর্থিক সংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল সামান্যই। জাতীয়তাবাদীরা এই সব সংস্থায় ঢোকেন, তাঁদের পৃষ্ঠপোষণের সম্ভাবনাকেও কিছুটা কাজে লাগান, কিন্তু নিজেদের কর্মশক্তিকে পয়ঃপ্রণালী উন্নয়নের গণ্ডিতেই বেঁধে রাখতে সাধারণত নারাজ হন। ১৮৯২-এর সংস্কারের ফলে প্রথম সারির নেতাদের অনেকেই প্রাদেশিক ও সাম্রাজ্য-কাউন্সিলে ঢোকার পথ পান (যেমন, বাঙলায় লালমোহন ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ, বোম্বাই-এ ফিরোজশাহ্ মেহ্‌টা, গোখলে, এমনকি কিছু দিনের জন্যে টিলকও। মেহ্‌টার পর সাম্রাজ্য-কাউন্সিলে যান গোখলে)। সম্ভবত কয়েক বছরের জন্যে তা কংগ্রেসি বিক্ষোভের তাল ঢিমে করে দেয়। ১৮৯৪ থেকে ১৯০০ অবধি কংগ্রেস অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতে কাউন্সিল সংস্কারের সাধারণ দাবি খুব বেশি প্রাধান্য পায় নি। কিন্তু এর ফল হয়েছিল খুবই স্বল্পস্থায়ী। সেই বছরই প্রথম দেখা দিল চরমপন্থী উন্মেষ। ১৯০৪ নাগাদ গোটা কংগ্রেসই আবার বড় রকমের আইন সংস্কারের দাবি তুলতে থাকে।

বিভেদ ও শাসন

ভারতীয় শিরোমণি গোষ্ঠীগুলোর ভেতরকার বিভেদে ইন্ধন জোগানোটা পরিণামে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়েছিল। এটি করা হয় প্রধানত ধর্মীয়, কিন্তু কখনও কখনও জাতপাত ও আঞ্চলিক সূত্রেও। প্রায়শই এসব বিভেদের শেকড় ছিল খুবই গভীরে। জাতীয়তাবাদীরা নিঃসন্দেহেই এ ব্যাপারে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ ও সচেতন দায়িত্বের দিকটিকে বাড়িয়ে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু আমরা দেখব, এমনকি ইচ্ছাকৃত সরকারি নীতি ছাড়াও, শিক্ষা, প্রশাসনিক কাজ, ও পরবর্তীকালে যৎকিঞ্চিৎ রাজনৈতিক সুযোগ নিয়ে সঙ্ঘাতের মূল নিহিত ছিল ঔপনিবেশিক অর্ধোন্নতির হেতুপরম্পরার মধ্যেই। আমাদের আলোচ্য পর্বের আগাগোড়াই রাজনৈতিক সংস্কার বিনা-ব্যত্যয়ে এই রেষারেষিকে বিস্তৃত ও তীক্ষ্ণধার করে তোলে। সরকারি মহলে মুসলমানদের এক সমজাতীয় 'পশ্চাৎপদ' গোষ্ঠী হিসেবে বলা ও ভাবার কেতা দ্রুত চালু হয়ে যায় হান্টার-এর *ইন্ডিয়ান মুসলমানস্* বইটি থেকে। ১৮৮৮-তে ডাফরিন তাঁদের বর্ণনা করেছেন এইভাবে : '৫ কোটি মানুষের এক জাতি', এদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতি এক, তাদের 'মনে পড়ে সেই দিনগুলির কথা যখন, দিল্লীর মসনদে বসে, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী অবধি তারা একচ্ছত্র শাসন চালাত' (ক্রশ-কে ডাফরিন, ১১ নভেম্বর ১৯৮৮)। এই সব ধারণাই ইতিহাসের দিক থেকে যতটাই ভুল, আমাদের বিদেশী শাসকদের কাছে রাজনৈতিকভাবে ততটাই প্রয়োজনীয় বলে প্রমাণ হয়েছিল। নির্বাচিত পৌরসভা চালু করা মাত্রই পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে উত্তেজনা তীব্র হয়ে ওঠে। যুক্ত প্রদেশ নিয়ে ফ্রান্সিস রবিনসন ও পাঞ্জাব নিয়ে এন জি ব্যারিয়ার-এর সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। ১৮৮৬ নাগাদই লায়ালের পাঞ্জাব সরকার হোশিয়ারপুর, লাহোর ও মুলতানের মতো শহরে আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী চালু করে। হয়তো আদি উদ্দেশ্য ছিল, ব্যারিয়ার যেমন বলেছেন, ইতোমধ্যেই বিদ্যমান সঙ্ঘাত লাঘব করা। কিন্তু অনস্বীকার্য ঘটনা হলো আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী অনিবার্যভাবে বিভেদের জায়গাগুলো

কঠিন করে তুলেছিল, দুই সম্প্রদায়ের নেতাদেরই ইন্ধন জুগিয়েছিল, এমনকি বাধ্য করেছিল শুধু নিজ ধর্মের অনুগামীদেরই পোষণ করতে। কাউন্সিল সংস্কারের ক্ষেত্রেও মার্চ ১৮৯৩-এ ল্যান্সডাউন জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'অঞ্চল ও সংখ্যাভিত্তিক নয়', বরং প্রতিনিধিত্ব হতে হবে '(অধিবাসীদের) ধরন ও শ্রেণীভিত্তিক'। আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিদাওয়া মেনে নেওয়া আর সুদূর ভবিষ্যতের ব্যাপার থাকল না। একটা নির্দিষ্ট সীমা ছাড়ালে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা অবশ্যই গুরুতর আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা তৈরি করত। ৭ মে ১৮৯৭ এলগিন-কে লেখা ভারত-সচিব হ্যামিল্টন-এর গোপন চিঠিতেই সম্ভবত এ-বিষয়ে অতিপ্রচলিত ব্রিটিশ চিন্তার মার্কা-মারা নমুনা মেলে : 'উত্তর-পশ্চিম (ভারতে) ও পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সঙ্ঘর্ষের খবর শুনে আমি দুঃখিত। কী যে চাওয়া উচিত তা প্রায় কেউই জানে না। ভাবনা ও কর্মের ঐক্য রাজনৈতিক দিক থেকে খুবই বিপজ্জনক, আর ভাবনার ভিন্নতা ও সঙ্ঘর্ষ প্রশাসনিক দিক থেকে অস্বাচ্ছন্দ্যকর। এ দু-এর মধ্যে শেষেরটির ঝুঁকি কম, যদিও সঙ্ঘর্ষের জায়গায় যারা আছে তাদের ঘাড়ে এতে উদ্বেগ ও দায়িত্ব চাপানো হয়।'

এই অবধি আমরা শুধু ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক শাসনযন্ত্রের যুক্তি-ই বিবেচনা করেছি। আর কেমব্রিজ ঘরানার উৎকর্ষও এখানেই। কিন্তু প্রশাসন ও রাজনীতিকে এক আলাদা জগৎ বা স্বয়ংলক্ষ্য হিসেবে দেখতে চাওয়াটা নিশ্চিতভাবেই এক আশ্চর্য ক্ষীণদৃষ্টির লক্ষণ। সেই ক্ষীণদৃষ্টি থেকেই ১৯৭৩-এ লেখা প্রবন্ধে অনিল শীল খুশি মনে বলেছেন, 'ভারতে বৈদেশিক শাসনই প্রজাদের তার বিরুদ্ধে সংগঠিত হতে বাধ্য করেছে—এই যুক্তি আমাদের বিবেচ্য নয়' (*লোকালিটি, প্রভিন্স অ্যান্ড নেশন*, পৃ. ৫-৬)। জাতীয় আন্দোলন ও সাধারণভাবে ভারতের ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে অন্য দুটি মাত্রা অত্যন্ত জরুরি, কিন্তু বেশির ভাগ কেমব্রিজ বিশ্লেষণেই সে দুটি বাদ দেওয়া হয়েছে। তা হলো : ব্রিটিশ রাজ্যের এক গভীর বর্ণবিদ্বেষী দিক ছিল, আর শেষ অবধি এটি টিঁকে ছিল শুধু ঔপনিবেশিক শাসনকে রক্ষা করার জন্যেই।

শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষবাদ

নিজেরা যে প্রভুর জাত—এ বিষয়ে ভারতের ব্রিটিশরা ছিল বেশ সচেতন। রেল বা স্টিমারের সংরক্ষিত কামরায় ভুল করে ঢুকে পড়লে, অথবা চাকরিতে বা পেশায় পক্ষপাত ও পদোন্নতিতে বাধার মুখে পড়ে 'দেশীয়' (নেটিভ) সমাজের পুরোধারা তা ঠেকে শিখতেন। ইলবার্ট বিল নিয়ে ঝড় ছিল একেবারেই চরম, কিন্তু কোনো অর্থেই তা শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষের বিচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি ছিল না। যেমন, ১৮৭৮-এ মাদ্রাজ হাই কোর্ট-এর বিচারক হিসেবে মুথুস্বামী আয়ারের নিয়োগের বিরোধিতা করছিল *ম্যাড্রাস মেল* (শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদারদের মুখপত্র)। তার কারণ : 'দেশীয় কর্মচারীদের একই পরিস্থিতিতে ইওরোপীয়দের সমান মাইনে পাওয়া উচিত নয়' (আর সুনতারলিঙ্গম, *পলিটিক্স অ্যান্ড ন্যাশনালিস্ট অ্যাওয়েকনিং ইন সাউথ ইন্ডিয়া*, ১৮৫২-৯১, পৃ. ১৫১-৫২)। এই হৈচৈ-এর প্রত্যক্ষ ফল হলো বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা *হিন্দু*-র প্রতিষ্ঠা। কম ভাগ্যবানদের ক্ষেত্রে বর্ণবিদ্বেষ প্রকাশ পেত লাথি, ঘুষি ও 'দুর্ঘটনা' ক্রমে গুলি করার মতো তুলনায়-স্থূল রূপে, যখন 'সাহেব' তাঁর পাঙ্খা কুলিকে সহবত শেখাতেন বা শিকারে বেরিয়ে কোনো দেশী লোককেই খতম করতেন। ১৮৮০ থেকে ১৯০০-র মধ্যে নিদেনপক্ষে ৮১টি গুলি

শবে মারার 'দুর্ঘটনা' নথিভুক্ত হয়েছে। শ্বেতাঙ্গপ্রধান আদালতে এই ধরনের ঘটনায় উদ্ভট রকমের লঘু দণ্ডই ছিল বাঁধা। জাতীয়তাবাদের উত্থানে এইসব ব্যাপারের যে কতখানি গুরুত্ব ছিল তা সমসাময়িক ভারতীয় পত্র-পত্রিকা বা ব্যক্তিগত কাগজপত্রের দিকে একবার তাকালেই ধরা পড়ে। ৩০ অক্টোবর ১৮৯১-এ ওয়াছা নওরোজীর কাছে অভিযোগ করেন যে, 'ইওরোপীয়দের দেশীয়-হত্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রধানত সৈন্যরাই পাশবিক অপরাধী।... সর্বদাই (তাদের) কোনো-না-কোনো অজুহাতে ছেড়ে দেওয়া হয়' (আর পি পটবর্ধন, পৃ. ২৬৫)। ১৮৮০-র দশকের শেষে ভারত সভার কাজে আসামে চা-বাগানের কুলিদের প্রতি ব্যবহারের ঘটনাই প্রাধান্য পায়। বর্ণপক্ষপাত ও পাশবিক আচরণ ছিল বাস্তবিকই এমন এক বিষয় যা কোনো কোনো সময়ে 'দেশীয়' সমাজের উচ্চতম ও নিম্নতম মানুষদের বঞ্চনা ও অন্যায়-বিচারের সাধারণ বোধের ক্ষেত্রে একত্র করতে পারত।

ভারতের ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মধ্যে যাঁরা আরও একটু সদয় বা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন তাঁরা অবশ্যই সময়বিশেষে বর্ণবিদ্বেষের অতিরিক্ত স্থূলতাকে সংযত করার চেষ্টা করতেন। আর এর জন্যে শুধু রিপন নন, কার্জনও তাঁর স্বজাতীয় শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে কিছুটা অপ্রিয় হয়ে ওঠেন। দুটি কুখ্যাত ব্যাপারে কার্জন ব্রিটিশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা নেন। এটি হলো এক ব্রহ্মদেশীয় মহিলাকে একযোগে ধর্ষণ, আর দ্বিতীয়টি হলো কুটনিগিরি করতে রাজি না-হওয়ায় এক ভারতীয় রাঁধুনিকে খুন। ঘটনাচক্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে বাহিনীটি জড়িত ছিল ১৯০৩-এর দিল্লী দরবারে তাদের বীরের সংবর্ধনা দিয়েছিল ইওরোপীয়রা। কিন্তু এ ব্যাপারে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে যে, বাড়াবাড়ি ছাড়াও, ঔপনিবেশিক ভারতের রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক গড়নে কিছু পরিমাণ শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষবাদের এক কার্যকর ও প্রয়োজনীয় ভূমিকা ছিল। সব সত্ত্বেও, সামরিক ও প্রশাসনিক স্তরে যথার্থ উচ্চ ও প্রধান পদগুলি থেকে ভারতীয়দের যথাসম্ভব বাইরে রাখাটা ব্রিটিশদের দৃষ্টিকোণ থেকে অযৌক্তিক ছিল না। এইজন্যেই ইংল্যান্ডের সঙ্গে একযোগে ভারতেও আই সি এস পরীক্ষা নিতে হবে—এই আপাত তুচ্ছ দাবিরও তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছিল পঞ্চাশ বছর ধরে। জুলাই ১৮৯৫-এ এলগিন একটি চিঠিতে রোজবেরিকে লেখেন, 'আমরা প্রভুর জাত শুধু এই ভাব কায়েম রেখেই আমরা শাসন করতে পারি—চাকরিতে যদিও ভারতীয়দের উৎসাহ দেওয়া উচিত, কিন্তু আমাদের যদি আদপেই থাকতে হয়, তবে একটি সীমা অবধি নিয়ন্ত্রণ-ভার অবশ্যই আমাদের হাতে রাখতে হবে।'

আরও বেশি মারাত্মক ছিল বর্ণবিদ্বেষের আর্থনীতিক মাত্রা। অমিয় বাগচী সম্প্রতি এ ব্যাপারে জোর দিয়েছেন। সম্ভাব্য ভারতীয় প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদারদের ঐক্য রক্ষায় চামড়ার রঙের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 'অন্যদের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার গুণাবলীর কথা যতই বলুক না কেন, ইওরোপীয় বণিক ও ব্যবসাদাররা নিজেদের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত আপোস ও পারস্পরিক বোঝাপড়ায় গভীরভাবে বিশ্বাস করতে।' শ্বেতাঙ্গদের নানা বণিকসভা, ব্যবসায়ী সমিতি, পাট, চা ও খনির সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট নানা সংগঠনের কাজের ধারা থেকে তা প্রকাশ পায় (অমিয় বাগচী, *প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ১৭০)। কয়েকটি ক্ষেত্রে সঙ্ঘাতও ঘটেছে। বাণিজ্যের প্রতি কিছু আমলার এক অভিজাতসুলভ অবজ্ঞা ছিল। তা হলেও ভারতে শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদার ও শ্বেতাঙ্গ (সরকারি) উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তিগত ও

'ক্লাব-জীবন'-ঘটিত যোগসূত্র ছিল। ১৯০৩-এ বরাকরের ব্রিটিশ খনি-মালিকদের কাছে বক্তৃতায় সরকার ও ব্যবসার ভেতরকার সম্পর্কের সার কথাটি সংক্ষেপে সুচারুভাবে হাজির করেন কার্জন : 'আমার কাজ প্রশাসন নিয়ে আর আপনাদের শোষণ নিয়ে : দুই-ই কিন্তু একই প্রশ্ন ও একই কর্তব্যের দুটি দিক' (জে আর ম্যাকলেন, *ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম অ্যান্ড দি আর্লি কংগ্রেস*, পৃ. ৩৭-এ উদ্ধৃত)। অনেক পরে, এমনকি ১৯৪৪-এও একটি ভারতীয় উৎপাদক-গোষ্ঠী অভিযোগ করেন, 'দেশের শাসকদের সঙ্গে বর্ণগত সংযোগের রহস্যময় বন্ধন থেকে আসা নীরব সহানুভূতি স্বদেশীয় প্রতিযোগীদের বিরুদ্ধে তাদের [ইওরোপীয় ব্যবসায়ীদের] এমন এক সুযোগ দেয় যা অদৃশ্য হলেও কম কার্যকর নয়' (বাগচী, পৃ. ১৬৬)।

বাগচী যাকে বলেছেন ইওরোপীয় ব্যবসাদারদের 'জোটবদ্ধ একচেটিয়া' তা-ই ছিল বিশেষ করে ভারতের পূর্বাঞ্চলে শিল্প ও বাণিজ্য জীবনের এক বিশিষ্ট লক্ষণ। আর বর্ণবিদ্বেষই তাকে সংহত করতে সাহায্য করেছিল। এই আর্থনীতিক নাগপাশের পরিবর্তমান রূপ ও পরিণতি কী হয়েছিল এবার আমরা তারই পর্যালোচনা করব।

ঔপনিবেশিক অর্থনীতি

প্রথম প্রকাশের প্রায় পঞ্চাশ বছর পরেও, রজনী পাম দত্তের *ইন্ডিয়া টুডে* বইটিতে এখনও কয়েকটি দিক থেকে ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সেরা সামগ্রিক বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। এখানে মার্কস-এর কিছু অন্তরদৃষ্টি ও বিচ্ছিন্ন মন্তব্য থেকে একটি তত্ত্ব গড়ে তোলা হয়েছে : আমাদের দেশে ব্রিটিশ শোষণের পরপর তিনটি পর্বের তত্ত্ব। প্রথমটি হলো ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩-র 'বণিক' পর্যায়। সরাসরি লুঠ ও ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা ছিল এই পর্বের লক্ষণ। ইংল্যান্ড ও ইওরোপে রপ্তানির জন্যে ভারতে (প্রাথমিকভাবে বাঙলার) তৈরি মাল কিনে—প্রায়শই যথেচ্ছ কম দামে—ও তা থেকে উদ্বৃত্ত রাজস্ব 'বিনিয়োগ' করে এটি চলেছিল। ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লব নাটকীয়ভাবে ব্যবসার পুরো ধাঁচটাই পাল্টে দেয়। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ অবধি ছিল অবাধ ব্যবসার, শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী শোষণের ধ্রুপদী যুগ। ভারতের চিরায়ত হস্তশিল্পকে শেকড়সুদ্ধু উপড়ে অচিরেই তাকে ম্যাঞ্চেস্টার-এর কাপড়ের বাজারে ও কাঁচামালের উৎসে পরিণত করা হয়। এ এমন এক পর্ব যখন 'তুলোর জন্মভূমিকেই ভাসিয়ে দেওয়া হলো তুলোয়' (মার্কস)। উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে কিছু পুঁজি রপ্তানি, আর পরস্পরযুক্ত ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক, আমদানি-রপ্তানি সংস্থা, ম্যানেজিং এজেন্সি হাউসের বিশাল ব্যবস্থার মাধ্যমে লগ্নি পুঁজির সাম্রাজ্যবাদ ভারতে গেড়ে বসতে শুরু করে।

রজনী পাম দত্ত নিজেই মাঝে মধ্যে ইঙ্গিত দিয়েছেন, এই সমগ্র পর্বভাগ কিছুটা যথেচ্ছ ও অতিমাত্রায় ছাঁচে ঢালা। পর্যায়গুলো পরস্পরের সঙ্গে মিশে আছে—এমন ধারণা নিয়ে কাজ করা অনেক বাস্তবসম্মত, তাতে সাহায্যও হয়। শোষণের পুরনো রূপগুলো কখনোই পুরোপুরি মরে যায় না, এবং তা আরও নতুন নতুন ছকের সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদী অভিযোগের প্রধান স্থায়ী বিষয় হয়ে উঠেছিল—'সম্পদ নির্গম'। সে-দিকে একবার তাকালেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়।

সম্পদ নির্গম

দেশে যথেষ্ট সমালোচনার মুখে পড়েও, ১৭৫৭ থেকে ইওরোপীয় ব্যবসাদাররা ভারতে সোনা নিয়ে আসতে বাধ্য হয়। এর কারণ পশ্চিমে ভারতীয় সুতি ও রেশম কাপড়ের বাজার বাড়ছিল। ভারতে কিন্তু পশ্চিমী উৎপাদনের (যেমন ব্রিটিশ পশমের) চাহিদা ছিল সাধারণভাবে তুচ্ছ। নাটকীয়ভাবে সমস্যার সমাধান হয় পলাশীতে। তখন বাঙলা থেকে লুঠ, শুল্কহীন অন্তর্দেশীয় ব্যবসার মুনাফা ও দেওয়ানি রাজস্বের 'উদ্বৃত্ত' পাওয়া গেল। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি যাকে ঘুরিয়ে বলে চলত ভারতে তার 'বিনিয়োগ'—তার পক্ষে এ সবই ছিল যথেষ্ট। এটি ছিল সম্পদ নির্গমের এক নির্লজ্জ রকমে সুস্পষ্ট প্রক্রিয়া, বাঙলায় যুদ্ধ জয়ের মুনাফাকে কাজে লাগানো হচ্ছিল বাঙলা থেকে রপ্তানির মাল কেনার জন্যে। ম্যাঞ্চেস্টার-এর প্রতিযোগিতার সামনে সুতি ও রেশম-জাত জিনিসের পরম্পরাগত রপ্তানি কমে যায়। ফলে কম্পানি, তার কর্মচারী ও ব্যক্তি-ব্যবসাদার—সবার সামনেই টাকা পাঠানোর সমস্যা দেখা দেয়। নীলের আবাদ ও চা কেনার জন্যে চীনে আফিং রপ্তানি করে গোড়ায় সে-সমস্যার মোকাবিলা করা হয়েছিল। ১৮৫০-এর দশকের পর ভারত থেকে নতুন ধরনের রপ্তানির—পশ্চিম-ভারতের তুলো, পাঞ্জাবের গম, বাঙলার পাট, আসামের চা, দক্ষিণ-ভারতের তেলবীজ, ছাল ও চামড়া—দ্রুত বিস্তার ঘটিয়ে আরও সফলভাবে সে-কাজ করা হয়। ব্রিটেনে একমুখী তহবিল হস্তান্তরের প্রয়োজন থেকেই যায়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবিকই তা বাড়ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির লন্ডন প্রতিষ্ঠান ও অংশীদারদের লভ্যাংশ মেটানোর দায়ের বদলে ১৮৫৮-র পর থেকে শুরু হয় ভারত-সচিবের ভারত দফ্‌তরের খরচ। অন্যদিকে কম্পানির সামরিক অভিযান ও সিপাহী বিদ্রোহ দমনের কৃপায় ইতোমধ্যেই ইংল্যান্ডে ভারত-ঋণ ছিল যথেষ্ট। এর সঙ্গে যে-বছরের হিসেবে কম্পানির অংশীদারদের ক্ষতিপূরণের টাকা যোগ হতো, তা বেড়ে যেত অনেকখানি। ভারতে ব্রিটিশ কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর কর্তাব্যক্তিদের অবসর-ভাতা, ইংল্যান্ডে সামরিক ও অন্যান্য মালপত্র কেনা, সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণের খরচ, সরবরাহ ও সামরিক অভিযান বাবদে ভারতের বাইরে কিন্তু ভারতীয় অর্থভাণ্ডারের ঘাড়ে চাপানো খরচ, রেলপথের ওপর পূর্বস্বীকৃত সুদ ইত্যাদিও ছিল স্বরাষ্ট্র (হোম)-ব্যয়ের অন্তর্গত। যেমন, ১৯০১-০২-এ স্বরাষ্ট্র ব্যয় ছিল ১ কোটি ৭৩ লক্ষ পাউন্ড, এর মধ্যে প্রধান ছিল রেলপথ বাবদ সুদের ৬৪ লক্ষ পাউন্ড ; ভারত-ঋণের ওপর সুদ, ৩০ লক্ষ পাউন্ড ; সামরিক খরচ, ৪৩ লক্ষ পাউন্ড ; মালপত্র কেনা, ১৯ লক্ষ পাউন্ড ; আর অবসর-ভাতা, ১৩ লক্ষ পাউন্ড। এ সরকারি হিসেবের সঙ্গে যোগ করতে হবে ভারতে বসে ব্রিটিশ কর্মচারীরা যে-টাকা দেশে পাঠিয়েছে তার পরিমাণ ও ব্যক্তিগত ব্রিটিশ বিনিয়োগের মুনাফার অর্থ পাঠানো। স্বরাষ্ট্র ব্যয় ও ব্যক্তিগত অর্থ পাঠানোর সত্যিকারের বোঝা খুব বেশি বেড়ে যায় ১৮৭০-এর দশক থেকে, যখন পাউন্ড স্টার্লিং-এর স্বর্ণমানের নিরিখে রূপোর টাকার মূল্য হ্রাস করা হয়।

সার জন স্ট্র্যাচি তাঁর ১৮৮৮-র বক্তৃতামালায় নির্গমের কৌশল স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে ব্যাখ্যা করেন। 'ভারতে সরকারি কোষপত্র থেকে বিল কাটেন ভারতসচিব, আর তা প্রধানত সেই সব কোষপত্র থেকে যা ভারতে সরকারি রাজস্ব হিসেবে জমা পড়ে। এর থেকেই বণিকরা ভারতে ও ভারত-সচিব ইংল্যান্ডে তাঁর প্রয়োজনীয় অর্থ পান' (*ইন্ডিয়া*, পৃ. ১১৫)। অন্য কথায়, ভারতীয়

রপ্তানির হবু ব্রিটিশ ক্রেতারা স্টার্লিং (যা স্বরাষ্ট্র ব্যয় বাবদে ব্যবহার করা হতো) দিয়ে ভারত-সচিবের কাছ থেকে কাউন্সিল বিল কিনতেন। ভারত সরকারের রাজস্ব থেকে কাউন্সিল বিলের বিনিময়ে টাকা নেওয়া হতো, আর সেই টাকা দিয়ে কেনা হতো রপ্তানির জন্যে ভারতীয় মালপত্র। উল্টোদিকে ভারতে ব্রিটিশ কর্মচারী ও ব্যবসাদাররা ব্রিটিশ মালিকানার বিভিন্ন বিনিময় ব্যাঙ্ক থেকে তাঁদের লাভের টাকা (রুপি) দিয়ে স্টার্লিং কিনতেন। সেইসব বিল ও তার সঙ্গে ভারতীয় রপ্তানি থেকে পাওয়া টাকা—যা আবার স্টার্লিং বিল বিক্রির টাকায় কেনা হতো—পাউন্ডে মিটিয়ে দিত এইসব ব্যাঙ্কের লন্ডন শাখা। ব্যাপারটা বুঝতে নিচের ছকটি সাহায্য করতে পারে।

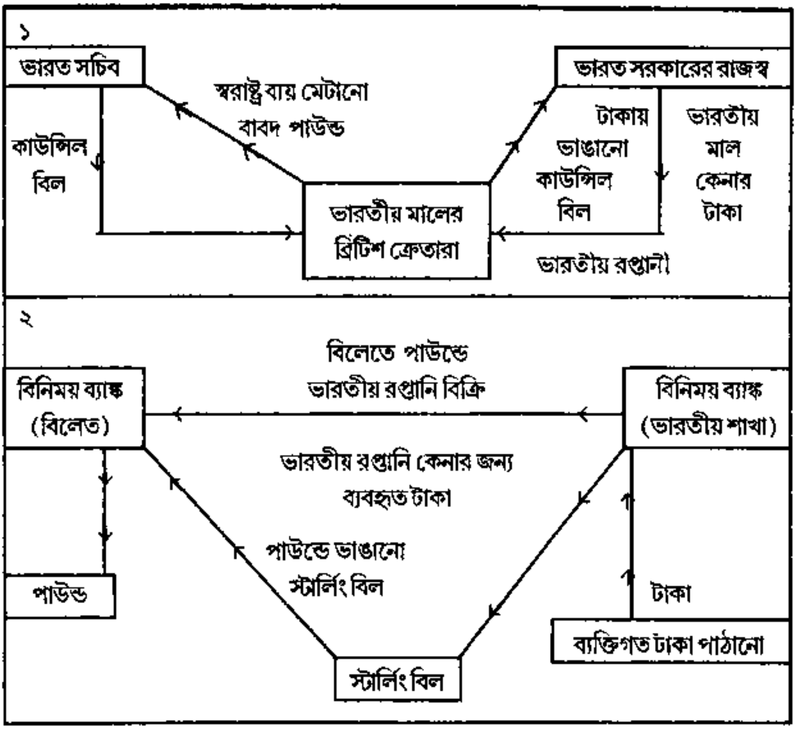

স্বরাষ্ট্র ব্যয় ও ব্যক্তি সূত্রে পাঠানো টাকা—দুই-ই চালান করা হতো ভারতীয় রপ্তানির মাধ্যমে। তাই সম্পদ নির্গম, যে দিকে নওরোজী ও তাঁর পরবর্তী জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ্‌রা বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তা ভারতের ক্রমবর্ধমান রপ্তানি উদ্বৃত্তের ভেতর দিয়েই চোখে পড়ে। অবাধ বাণিজ্যের মাধ্যমে শোষণের পদ্ধতি ও ব্রিটিশ-ভারতীয় লগ্নি পুঁজিবাদের গড়ন—এই দু-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল আদতে যা ছিল ব্যবসায়গত নির্গম।

উনিশ শতকের শেষ নাগাদ পশ্চিম ইওরোপ ও আমেরিকার উন্নয়নশীল পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রশুল্কের দেওয়াল তোলা হয়। তারই সঙ্গে যুক্তরাজ্যের লেনদেন অবশেষের জটিল

করণকৌশল ভারতের রপ্তানি উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে। আর এই সময়ে ব্রিটেন পড়েছিল বড় রকমের ঘাটতির সমস্যায়, কারণ তখনও তার প্রচুর কৃষিজাত পণ্য আমদানি করার দরকার হতো। কিন্তু ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণবাদী দুনিয়ায় তার উৎপাদকদের পক্ষে বাজার পাওয়া ছিল কঠিন। ভারত ছিল দু-দিক থেকে প্রয়োজনীয়। স্ট্র্যাচি যাকে 'প্রায় যে-কোনো দেশের তুলনায় বাণিজ্যের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা' বলেছেন (ঐ, পৃ. ১০১), ব্যবহারিক দিক থেকে তার অর্থ হলো ল্যাঙ্কাশায়ার-এর সুতি বস্ত্রের জন্যে এক বাঁধা বাজার মজুত রাখা। ভারতে জোর করে তা-ই করা হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কৃষিজাত পণ্য ও কাঁচামালের বিশাল বহির্গমনের জন্যে ব্রিটেন ছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের স্থায়ী রপ্তানি-উদ্বৃত্ত ব্রিটিশ ঘাটতিকে অন্যত্র পুষিয়ে দেয়। সামরিক ও রণনীতিগত সুবিধে ছাড়াও এগুলোও ছিল ভারত সাম্রাজ্য থেকে সামগ্রিকভাবে ব্রিটেনের পাকা লাভ।

একদম শুরু থেকেই নির্গম তত্ত্বের তীব্র সমালোচনা হয়েছে। এর কিছু জাতীয়তাবাদী সূত্রকে আজ নিশ্চিতভাবেই স্থূল ও অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। বলা হয়েছে, নির্গমকে জাতীয়তাবাদীরা অনেকটাই অতিরঞ্জিত করেছেন, কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য ও রপ্তানি উদ্বৃত্ত ভারতের জাতীয় আয়ের সামান্য একটা অংশই হতে পারত। নওরোজী যখন বলেন (১৮৯৫-এ ওয়েল্‌বি কমিশনের সামনে) যে, উদ্বৃত্তের একটা মোটা পরিমাণই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যথাযথভাবে তা বিনিয়োগ করলে ভারতের আয় যথেষ্ট বাড়তে পারত---তখন তাঁর যুক্তির সারবত্তা আছে। সাম্রাজ্যবাদীদের বাঁধা সাফাইটি স্ট্র্যাচি এইভাবে হাজির করেছিলেন ঃ 'ইংরেজরা যা পরিষেবা করে বা যে ইংরেজ পুঁজি ব্যয় হয়, তার বিনিময়ে যা প্রাপ্য তা ছাড়া ইংল্যান্ড ভারত থেকে আর কিছুই পায় না' (*ঐ*, পৃ. ১১৫)। এই যুক্তির প্রথম অংশে স্পষ্টতই ব্রিটিশদের আনা সু-রাজের তথাভিহিত লাভ, আইন-শৃঙ্খলা ইত্যাদির কথা বলা হচ্ছে। ব্যাপারটি সামান্যই আলোচনার দাবি রাখে। নির্গমের অধিকতর 'আর্থনীতিক' দিকটির সাফাই গাওয়া হয়েছে এই ভিত্তিতে যে, ইংল্যান্ড থেকে জিনিসপত্র কেনা ও লন্ডনের টাকার বাজার থেকে ঋণ জোগাড় করা হচ্ছিল উনিশ শতকের সম্ভাব্য ভারতীয় দরের চেয়ে কম দরে। তাহলেও বলা যেতে পারে —আর জাতীয়তাবাদীরা তা-ই বলতেন—যে, (যদি ঋণ কেনাকাটা ভারতের মধ্যেই করা হতো) সেই সম্ভাব্য চড়া লেনদেন দেশের ভেতরেই থেকে যেত। স্ট্র্যাচি যাকে 'ইংরেজ পুঁজি ব্যয়' বলেছেন, সেটাই আসল কথা। রেলপথ, আবাদ,খনি বা কলে খাটানো ব্রিটিশ পুঁজি থেকে পাওয়া লাভের ওপর প্রদেয় ছাড় সমর্থন করা হয়েছে এই যুক্তিতে যে, এসব জিনিস ভারতকে 'উন্নত' বা 'আধুনিক করেছে'। মূল প্রশ্ন হলো ঃ উন্নয়নের বিশিষ্ট ধাঁচটি কী? একদা এই ধারণা বেশ প্রচলিত ছিল যে, ব্রিটিশ শাসন বুর্জোয়া পথ ধরে আরও ধীরগতিতে কিন্তু সত্যিকারের আধুনিকীকরণ নিয়ে আসছিল। পশ্চিমে আগেই যা অর্জন করা হয়েছিল এটি মোটামুটি তারই মতো। কিন্তু সাম্প্রতিককালে এই ধারণাটিকে ক্রমেই আরও বেশি আক্রমণ করা হয়েছে।

শিল্পায়ন-রোধ

চিরায়ত ভারতীয় কুটিরশিল্প উৎপাদনের অধোগতিকে এক দুঃখজনক কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ঘটনা হিসেবেই গ্রহণ করতে চেয়েছেন ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও প্রচারকরা। আধুনিকীকরণের মূল্য

হিসেবে পশ্চিমের মতো ভারতেও যন্ত্রের সামনে হস্ত শিল্পকে নতি স্বীকার করতেই হতো। ইংল্যান্ডে কিন্তু হস্তশিল্পের অধোগতির ফলে যে-দুর্দশার সৃষ্টি হয়েছিল, কারখানা শিল্পের বৃহত্তর কর্ম ও আয় সংস্থানের ফলে তা বেশ তাড়াতাড়িই পুষিয়ে যায়। ভারতীয় উপনিবেশের ক্ষেত্রে, দু'হাজার মাইল দূরের এক দেশ যে-প্রগতি অর্জন করছিল তার বোঝা বইতে বাধ্য হয়েছিলেন এখানকার হস্তশিল্পীরা। ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকের আগে ভারতীয় কলকারখানা বাড়ে নি, এমনকি তারপরেও এর গতি ছিল নিতান্তই মন্থর। সাম্প্রতিককালে এক মার্কিন বিদ্বান মরিস ডি মরিস শেষমেশ এই যুক্তিও হাজির করেছেন যে শিল্পায়ন-রোধ ব্যাপারটিই এক অতিকথা। হস্তশিল্পের অবনতির নির্দিষ্ট পরিসংখ্যানগত প্রমাণ পাওয়া, আদমশুমারির আগে, ও এমনকি তার পরেও, যে কঠিন—সে কথা অনস্বীকার্য। ড্যানিয়েল থর্নার দেখিয়েছেন, ১৮৮১-১৯৩১-এর আদমশুমারি সারণির ভিত্তিতে আছে এলোমেলো পর্যায়ভাগ। জাতীয়তাবাদীরা প্রায়ই এর থেকে উদ্ধৃতি দেন। কিন্তু শিল্পের ওপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার আনুপাতিক হ্রাসের কোনো সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে পাওয়া যায় না। বহির্বাণিজ্যের পরিসংখ্যানের ওপর জাতীয়তাবাদীরা প্রচুর পরিমাণে নির্ভর করেছিলেন। এতে পরম্পরাগত ভারতীয় বস্ত্র-রপ্তানির বিপর্যয় ও ল্যাঙ্কাশায়ার-এর কাপড় আমদানির দ্রুত বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু অভ্যন্তরীণ মোট উৎপাদনে অবনতির কোনো নির্দিষ্ট প্রমাণ দেয় না। জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী লেখাপত্রেও হস্তশিল্পের বিপর্যয়কেই একমাত্র, নির্বিকল্প ও বিরাট ওলোটপালটের প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয় নি। হস্তশিল্পজাত জিনিসের বৈশিষ্ট্য, অঞ্চল ও বিভিন্ন কালপর্বের ভেতরেও তফাত করতে হবে। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের উঁচুমানের রেশম বা সুতি কাপড়ের মতো শহুরে বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনই নিশ্চিতভাবে প্রথম ঘা খায়। দেশীয় রাজসভার চাহিদা ও বাইরের বাজার চলে গিয়েছিল প্রায় একই সময়ে। আর এ দু-এর ওপরেই নির্ভর করেছিল এগুলি উৎপাদন। পূর্ব-ভারতে ব্রিটিশ অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সবার আগে ও সবচেয়ে গভীরভাবে। দেশের অভ্যন্তরে ও বিশেষ করে পূর্ব-ভারত ছাড়া অন্যান্য অঞ্চলে গ্রাম্য কারুকর্ম সম্ভবত অনেক বেশিদিন টিঁকেছিল। একমাত্র রেলপথ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই তা গুরুতরভাবে ব্যাহত হয়। যজমানী ব্যবস্থা অনেকটাই বহাল ছিল (গ্রাম্য হস্তশিল্পীরা পরম্পরাগতভাবে নির্দিষ্ট পরিমাণের উৎপন্ন বস্তু চাষীপরিবারগুলিকে জোগান দিতেন আর তার বদলে পেতেন শস্যের ভাগ)। তার ফলেই তা ১৯৩০-এর দশক থেকে ভাইসার ও বাইডেলমান-এর মতো সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের *গণদেবতা*-র মতো উপন্যাসে ১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশকের পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত জেলার বিবরণ আছে। তাতে যজমানী ব্যবস্থার পড়তি দশাকে তুলনায় নতুন এক ঘটনা হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে।

মরিস-এর যাবতীয় যুক্তি শিল্পায়ন-রোধের গোটা তত্ত্বকেই বর্জন করতে চায়। তবু বহুনিন্দিত জাতীয়তাবাদীরা সাধারণত যেসব যুক্তি দেখান মরিস-এর যুক্তি আসলে তার চেয়ে বেশি আন্দাজি আর সন্দেহজনক। মরিস যুক্তি দেখিয়েছেন যে, ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে প্রচুর আমদানি বাড়লেও দেশীয় কাপড়ের উৎপাদন একই থাকতে পারে, এমনকি বেড়েও থাকতে পারে, কারণ ভারতীয় চাহিদার এক প্রভূত উর্ধ্বগতি এই দুধরনের জোগানের পক্ষেই ছিল যথেষ্ট। কিন্তু এই উর্ধ্বগতির প্রমাণ স্বরূপ আদৌ কোনো তথ্য দেওয়া হয় নি। যুক্তি দেখানো হয়েছে, আমদানি-

কথা সুতোর কম দামের ফলে দেশী তাঁতিরা লাভবান হয়েছিলেন। এতে কিন্তু দুটি জিনিসকে উপেক্ষা করা হয়েছে, প্রথমত, ভারতীয় তাঁতিদের সর্বনাশ, আর দ্বিতীয়ত, বোনা কাপড়ের দাম পড়ে যাওয়ার ফলে সমস্যা। খরচ কমানোর মতো কারিগরি কৌশলের উদ্ভাবন হয়েছিল ইংল্যান্ডে, ভারতে নয়। সুতো তৈরি আর কাপড় বোনা—এই দু-এর খরচ কমানোয় লাভবান হয়েছিলেন, ল্যাঙ্কাশায়ার-এর উৎপাদকরা। আরও অল্প দামের আমদানি-করা সুতো থেকে ভারতীয় তাঁতিরা লাভবান হয়েছিলেন, কিন্তু বোনার খরচ কমে নি। তবু আমদানি -করা কাপড়ের আরও শস্তা দামের সঙ্গে তাঁদের প্রতিযোগিতা করতে হয়েছে। ফলে, মরিস-এর বক্তব্যের লাগসই জবাবে তোরু মাতসুই দেখিয়েছেন, তাঁদের অবস্থার সামান্যই উন্নতি হয়ে থাকতে পারে (*ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশাল হিস্ট্রি রিভিউ*, ১৯৬৮)।

ধরেই নেওয়া হয়েছিল, শিল্পায়ন-রোধ একটা (নিঃসংশয়) ঘটনা। আদমশুমারি ও দুর্ভিক্ষের প্রতিবেদন আর আঞ্চলিক শিল্প-সমীক্ষার মতো বহু তর্কাতীত সরকারি সূত্রে এ-বিষয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অনেক তথ্য দেওয়া আছে? ১৮৯০-এ কলিনস্ ও ১৯০৮-এ কামিংস্ বাঙলার উৎপাদনের যে সমীক্ষা করেছিলেন সেগুলিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দ্বিতীয়জনের সমীক্ষায় একটি চিত্তাকর্ষক বিষয় আছে। দেশপ্রেমের কারণে হঠাৎ চাহিদা বৃদ্ধি করে ১৯০৫-এর স্বদেশী আন্দোলন বহু দেশীয় কারুশিল্পের রক্ষাকর্তা হিসেবে দেখা দিয়েছিল। সাম্প্রতিককালে, উনিশ শতকের প্রথমভাগে বিহারের বেশ কিছু জেলার বুকানন-হ্যামিল্টন সমীক্ষার সঙ্গে, ১৯০১-এর আদমশুমারীতে পাওয়া তথ্যের সযত্ন পরিসংখ্যানগত তুলনার চেষ্টা করেছেন অমিয় বাগচী। তার প্রধান আবিষ্কার হলো : শিল্পের ওপর নির্ভরশীল মানুষের সংখ্যা ১৮% থেকে কমে দাঁড়িয়েছিল ৮%, আর সুতো-কাটিয়ে ও তাঁতিদের সংখ্যা বিশালভাবে কমে যায়। যা-ই হোক, মনে হয় জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদরা তত কিছু ভুল করেন নি (*এসেস্ ইন অনার অফ এস সি সরকার*-এ "ইন্ডাস্ট্রিয়া লাইজেশন ইন গ্যাঞ্জেটিক বিহার, ১৮০৯-১৯০১")। আমাদের পর্বের বহু আন্দোলনকে বুঝতে হস্তশিল্পীদের দুর্দশাকে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে রাখতে হবে। দু ভাবে তা হয়েছে : প্রথমত, শিল্পায়ন-রোধ নরমপন্থী, চরমপন্থী ও গান্ধীবাদী যুগে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে স্বাদেশিকতার ভাব উদ্দীপ্ত করেছে। দ্বিতীয়ত, আরও প্রত্যক্ষভাবে, মাঝে-মধ্যেই তা শহরে ও গ্রামে নানা ধরনের বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।

কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ

রেলপথ নির্মাণ (১৮৫৯-এ রেলপথ ছিল মাত্র ৪৩২ মাইল, ঠিক দশ বছর পরে তার দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৫০০০ মাইলেরও বেশি, আর ঐ শতকের শেষে প্রায় ২৫,০০০ মাইল), ক্রমবর্ধমান রপ্তানি (১৮৬০-এর 'তুলোর রমরমা'র সময়ে তা বিশেষ করে নজরে আসে। তখন আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কারণে ল্যাঙ্কাশায়ার-কে কার্পাসের জন্যে কয়েক বছর ডেকান-এর মুখাপেক্ষী হতে হয়। আবার তা ঘটে ১৮৮০-র দশকে ও '৯০-এর দশকের প্রথমে), আর কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ—এই সব পরস্পর সম্পর্কিত প্রক্রিয়াকে কখনও কখনও 'আধুনিকীকরণের' চিহ্ন বলে সুখ্যাত করা হয়েছে। সনাতনী অর্থনীতি কৃষি-উদ্বৃত্তের বিকাশ ও গ্রামীণ সমৃদ্ধিকে বাণিজ্যিক রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত করতে চায়। কৃষকদের মধ্যে পর্যায়ভেদকে কেউ কেউ পুঁজিবাদী চাষ-

আবাদের প্রবণতা বলে ভাবেন। অথচ-এর নিশ্চিত অর্থ দাঁড়ায় ঃ দরিদ্রতর অংশের দুর্দশা, কিন্তু উৎপাদন-ক্ষমতারও বৃদ্ধি। তবু অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও ঔপনিবেশিকতার নিজস্ব এক বাঁকা যুক্তি ছিল যা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাণিজ্যিক রূপায়ণ ছিল কৃত্রিম ও জোর করে চাপানো এক প্রক্রিয়া, যাতে পর্যায়ভেদই দেখা দিয়েছিল, যথার্থ উৎপাদন-ক্ষমতা বাড়ে নি।

বাণিজ্যিক রূপায়ণের সঠিক ধাঁচটি স্বভাবতই বিভিন্ন শস্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হতো। যেমন, চা। এমন অঞ্চলে তার সূচনা হলো যেখানে জনসংখ্যার চাপ সামান্যই। এর জন্যে প্রয়োজন ছিল শ্বেতাঙ্গদের সরাসরি পরিচালনাধীন বাগিচা, আর তার শ্রমিক জোগাড় করা হতো বহুদূর থেকে প্রায় দাসত্বের সামিল খত প্রথার ভিত্তিতে। মধ্যবঙ্গে প্রধানত চাষীরাই নীল চাষ করতেন, কিন্তু জনসাধারণের ঘোর অপ্রিয় সাহেব কুঠিয়ালরা যথেষ্ট হেনস্থা মারফত তা করাত। তারা রায়তদের জোর করে দাদন দিত, কারণ লাভ ছিল কম ও অনিশ্চিত, আর নীল চাষ স্বাভাবিক কৃষিচক্র ওলোটপালট করে দেয়। পূর্ববঙ্গে পাট চাষের জন্যে সরাসরি কোনো হেনস্থার দরকার হতো না, কারণ তা ছিল ধানের চেয়ে বেশি লাভজনক। কিন্তু এ ধরনের ভিন্নতা থাকলেও কিছু সাধারণ লক্ষণ নজরে পড়ে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ নাগাদ বৈদেশিক বাণিজ্য, জাহাজ ব্যবসা ও বীমা ছিল কার্যত ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণে। তাই রপ্তানির তেজি অবস্থার দরুন মুনাফার বেশির ভাগই আত্মসাৎ করত বিদেশী সংস্থাগুলি। 'বিদেশী ফুটো' দিয়েই তা চলে যেত দেশের বাইরে। দ্বিতীয়ত, কিন্তু তাহলেও, মোটা ভাগ পেত ভারতীয় ব্যবসাদার ও মহাজনরা। তারাই ছিল ফড়ে, চাষীকে দরকারমতো দাদন-দিত আর এইভাবেই বাগে আনত উৎপাদন। এই ধরনের দাদনের দরকার আবার প্রায়ই যুক্ত ছিল খাজনার বোঝার সঙ্গে। আর এইভাবে ভূস্বামী আর মহাজনদের শোষণের ফলে ইতোমধ্যেই যে-গড়ন কায়েম হয়েছিল তাকেই দানা বাঁধতে সাহায্য করেছে পুঁজিবাদী অনুপ্রবেশ। চিনি কলগুলোতে স্থানীয় চাষীদের থেকে আখ সংগ্রহের ঠিকাদার হিসেবে স্থানীয় জমিদার ও মহাজনদের নিয়োগ করা হতো। গোরখপুর জেলার আখ চাষ নিয়ে এক সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে এই বিষয়টির ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো জায়গায় ধনী চাষীদের আরও উঁচু একটি স্তরও দেখা দিচ্ছিল ; যেমন, ডেকান-এর তুলো উৎপাদন এলাকায়, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতে গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরীর ব-দ্বীপে। আর পাঞ্জাবে উনিশ শতকের শেষদিকে বড় মাপের সেচ-ব্যবস্থার ফলে এখানকার জমিতে চাষের সুযোগ হয়। কিন্তু মূল ঘটনা হচ্ছে ঃ উৎপাদনগত কারিগরি ও সংগঠনের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতির সঙ্গে গোটা ব্যবস্থাটির ছিল এক অন্তর্গত বিরোধ-প্রবণতা। ভারতীয় চাষীকে বাধ্য করা হয়েছিল বহু দূরের এক অজানা এক বিদেশী বাজারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে থাকতে। একসার দালালের কঠিন পারস্পরিক যোগসূত্রেই শুধু এই বাজারের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। ফলে দামের হঠাৎ-হঠাৎ ওটা-পড়ার বোঝা বারে বারে বইতে হতো তাঁকেই। ১৮৬০-এর দশকে তুলোর রমরমা বাজার যেমন নাটকীয়ভাবে দেখা দিয়েছিল, তেমনি ভাবেই তা ভেঙে পড়ল। (বোম্বাই-এ ১৮৫৯-এ এক পাউন্ড তুলোর দাম ছিল ২ আনা ৭ পয়সা, ১৮৬৪-তে ১১ আনা ৫ পয়সা, আর ১৮৬৬-তে মাত্র ৬ আনা ২ পয়সা)। এরই সঙ্গে ১৮৬০-এর দশকে ডেকান-এর তুলো-এলাকার সমৃদ্ধি পরিণত হলো প্রচুর ঋণদায়, দুর্ভিক্ষ ও ১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি কৃষকদের দাঙ্গা-

হাঙ্গামায়। ১৮৭০-এর দশক থেকে ১৮৯০-এর দশক অবধি পৃথিবীব্যাপী কৃষি-মূল্যের হ্রাস (উত্তর আমেরিকা আর্জেন্টিনা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে অনেক বাড়তি জোগানের ফলে) ভারতের গম ও তুলোর দামের হেরফের ঘটায়। আমরা দেখব, বিশ শতকের টাকা ও স্টার্লিং-এর অনুপাত কৃত্রিমভাবে উঁচু রাখার কুফলস্বরূপ এসেছিল ১৯৩০-এর দশকের মন্দার প্রধান দুর্যোগ।

বড় বড় রপ্তানি সংস্থা, কুশলী ভারতীয় ব্যবসাদার ও মহাজনরা দামের ওঠা-পড়ায় দুদিক থেকেই মুনাফা করতে পারত। কিন্তু উৎপাদনমুখী বিনিয়োগ বা নতুন কিছু করা ছিল খুবই ঝুঁকির ব্যাপার। তাই কিছু টাকা জমাতে পারলে চাষীরা ব্যবসা, সুদি কারবার, বা কোরফা প্রজা বা ভাগচাষীকে জমি ভাড়া দেওয়ার দিকে ঝুঁকতেন। এতে লাভের আশা ছিল যথেষ্ট। যথার্থ পুঁজিবাদী চাষ-আবাদের দিকে না-গিয়ে এইভাবেই উৎপাদন-ঝুঁকির গোটা বোঝাটা পরগাছার মতো চাপানো হতো অন্যের ঘাড়ে। বিশাল সংখ্যাগুরু দরিদ্রতর চাষীদের ক্ষেত্রে কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণ ছিল প্রায়শই বাধ্য হওয়ার ব্যাপার, কারণ নগদে রাজস্ব ও খাজনার ক্রমবর্ধমান ভার-মেটাতে দরকার হতো কাঁচা টাকার। কোয়েম্বাটুরের চাষীরা একবার এক ব্রিটিশ কালেক্টরকে বলেন, তাঁরা তুলোর চাষ করেন শুধু এই কারণেই যে তা খাওয়া যায় না ; শস্য ফলালে তাঁরা হয়তো তা খেয়ে ফেলতেন। অন্যদিকে এখন তাঁরা আধপেটা খেযে থাকলেও তাঁদের অন্তত রাজস্বের পাওনা মেটানোর মতো টাকা আছে। রাজস্ব ও খাজনার চাপে বাণিজ্যিক ফসল ও গমের মতো উঁচুমূল্যের খাদ্যশস্যের চাষ শুরু করার মানে দাঁড়াত জোয়ার, বজরা ও ডালের মতো গরিবের খাদ্যশস্যের চাষ থেকে সরে আসা। এর ফলে দুর্ভিক্ষের বছরগুলোয় প্রায়শই বিপর্যয় ঘটত। মহাজনদের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা ছিল এর আর-এক অনিবার্য পরিণাম, কারণ বাণিজ্যিক ফসলের জন্যে দরকার হতো অধিক লগ্নি যার মানে আরও বেশি দাদন। তাই কৃষির বাণিজ্যিক রূপায়ণে চাষীদের ভেতর পর্যায়ভেদ সৃষ্টিতে যতটা সাহায্য করেছিল, সত্যিকারের উৎপাদন বৃদ্ধিতে ততটা করে নি (হয়তো কয়েকটি বিচ্ছিন্ন এলাকায় ছাড়া)। ওলন্দাজ-শাসিত জাভা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যে ক্লিফোর্ড গীর্টৎস যাকে বলেছেন 'কৃষিঘটিত অন্তরাবর্তন', ঔপনিবেশিক ভারত সম্পর্কেও তা বলার লোভ হয় ঃ এত বেশি সংখ্যক চাষী যে ভুগলেন সেটাই আসল কথা নয় (পুঁজিবাদী আধুনিকীকরণেও তা হতে পারত), আসল কথা সেটা হলো অকারণে।

ভূমি-সম্পর্ক

বাণিজ্যিক রূপায়ণের বিশেষ ফলাফল অবশ্যই বাঁধা আছে ভূমি-সম্পর্কের গড়নের সঙ্গে। ব্রিটিশ রাজস্ব ও প্রজাবিলি-নীতিই প্রতিষ্ঠিত ও সংহত করেছিল সে গড়নকে। জমিনদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থার বিবর্তন এই বই-এর আওতায় আসে না ; এখানে শুধু কয়েকটি দীর্ঘমেয়াদি প্রবণতার দিকে নজর দিলেই চলবে।

ব্রিটিশ কৃষিনীতি গড়ে উঠেছিল মূলত দুটি ব্যাপার মিলে (পরিবর্তমান ও কখনও কখনও সঙ্ঘাতমূলক অনুপাতে) ঃ (এক) আরও বেশি রাজস্বের লালসা (যার থেকে বারেবারেই অতিমাত্রায় রাজস্ব নির্ধারণের ঝোঁক তৈরি হয়েছে), আর (দুই) রপ্তানির জন্যে বিশেষ কয়েকটি ধরনের কৃষি-উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার বাসনা। রাজনৈতিক মিত্রলাভ বা রক্ষা, প্রশাসনিক

সুবিধা, ও পরিবর্তমান ভাবাদর্শগত ধারণাও সময়বিশেষে একটা ভূমিকা নিয়েছে। উদ্দেশ্য ঘুরে যাওয়ার এক পৌনঃপুনিক ধাঁচও পরিষ্কার চোখে পড়ে। যেমন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্রষ্টারা বিশ্বাস করতেন সম্পত্তির যাদুস্পর্শ... কোনো এক উৎপাদন নীতি চালু করে দেবে।' বাস্তবে তা কখনোই দেখা যায় নি। বাঙলার জমিনদাররা কখনোই আঠেরো শতকের ব্রিটিশ ধাঁচের উন্নতিশীল ভূস্বামী হয়ে ওঠে নি। যথেচ্ছ খাজনা আদায়ের ব্যাপারে তাঁদের প্রায় কোনো বাধাই ছিল না, অন্যদিকে রাজস্ব ছিল বরাবরের মতো বাঁধা (আর তাই গোড়ায় অতিমাত্রায় নির্ধারণের সমস্যা থাকলেও তার বোঝা ক্রমেই আসছিল কমে)। স্বাভাবিকভাবেই পুঁজিবাদী চাষবাসে লগ্নির ঝুঁকির চেয়ে সামন্ততান্ত্রিক ও সুদখোরি শোষণই তাদের বেশি পছন্দ ছিল। খাজনা বাড়ানো যেত সহজেই, কারণ ১৭৭০-এর মন্বন্তরের পরে জনসংখ্যা আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসে—আর ১৮১৫ নাগাদ লর্ড ময়রা বলছিলেন 'কৃষক শ্রেণীর বাহুল্য-র কথা। কার্যত যা গড়ে উঠল তা স্ব-পরিচালিত বিশাল ভূ-সম্পত্তি নয়, প্রায়শই ভাগ হওয়া খণ্ড খণ্ড জমিনদারি (উনিশ শতকের শেষ ভাগ অবধি বাঙলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেওয়া ১,১০,৪৫৬টি ভূ-সম্পত্তির ৮৮.৫%-ই ছিল আয়তনে ৫০০ একরেরও কম) আর তলায় ছিল বিশাল সংখ্যায় মধ্যবর্তী তালুকদার। এরাই গড়ে তুলেছিল বাঙালি 'ভদ্রলোক'দের প্রধান আর্থিক ভিত্তি। খুদে জমিনদার ও তালুকদাররা অবশ্য সর্বদাই খুব একটা বড়লোক হতেন না। শতাব্দীর প্রান্তে এসে, জিনিসের দাম বাড়া, সরকারি চাকরি বা পেশায় সুযোগ কমা, আর খাজনা বাড়ানোর ব্যাপারে কিছু কড়াকড়ির ফলে তাঁরা বেশ কাবু হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু জমি থেকে তাঁদের আয় সেই পরজীবী ধরনেরই থেকে গিয়েছিল। র‍্যাডিকালিজম ও সামাজিক ব্যাপারে অন্তরের বাধার এক অদ্ভুত খিচুড়ি তৈরিতে ব্যাপারটি সাহায্য করেছে। আমরা দেখব বাঙলায় জাতীয়তাবাদ বোঝার পক্ষে এটি ভিত্তিস্বরূপ।

চাষীদের ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এলাকায় ১৮৫০-এর দশকের পরে ব্রিটিশ নীতিতে, ইংরেজ 'ইওম্যান' চাষীদের আদলে, এক শ্রেণীর উদ্যোগী রায়ত সৃষ্টিতে সাহায্য করার চেষ্টা মাঝেমধ্যে করা হয়েছিল। আবারও ঔপনিবেশিক পরিস্থিতির দরুন তার ফল হলো উল্টো। ১৮৫৯ ও ১৮৮৫-তে 'দখলি রায়তদের সুবিধাভোগী সংখ্যালঘু অংশকে যথেচ্ছ উচ্ছেদ ও খাজনা বাড়ার হাত থেকে আইনগত নিরাপত্তা দেওয়া হলো। কিন্তু প্রায়শই তাঁরা প্রকৃত কৃষক হতেন না বা থাকতেন না। বোঝা ও ঝুঁকি নিচের স্তরের (অধীন-রায়ত বা ভাগচাষীদের) ঘাড়ে চালান করার সেই একই ছক অচিরেই বহাল হতো। প্রত্যক্ষ উৎপাদকরা এত বেশি নিপীড়িত হতেন যে তাঁদের পক্ষে কোনো উন্নতির দিকে যাওয়া ছিল অসম্ভব। তাঁদের ওপরের স্তরে গড়ে উঠেছিল খাজনাদাতাদের এক সোপান। কোনো উদ্যোগের ঝুঁকি নেওয়ার দরকার তাদের ছিল না, ফলে ছিল না প্রবর্তনার ক্ষমতা।

রায়তওয়ারি অঞ্চলের চূড়ান্ত নকশাটি এর চেয়ে বেশি আলাদা কিছু হয় নি। চাষীদের সঙ্গে সরাসরি বন্দোবস্তের তত্ত্ব সত্ত্বেও, মাদ্রাজের কৃষকরা ছিলেন, ধর্মা কুমারের ভাষায়, 'কার্যত ভূস্বামী যাঁরা তাঁদের জমি ভাড়া দিতেন', বিশেষ করে ১৮৫০-এর দশকের পরে, যখন অতিমাত্রায় রাজস্ব নির্ধারণের বোঝা (যার জন্যে আগে রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের দিয়ে চাষীদের নির্যাতন পর্যন্ত করানোর দরকার পড়ত বলে দেখা যায়) ক্রমে কিছুটা কমানো হলো

(*ল্যান্ড অ্যান্ড কাস্ট ইন সাউথ ইন্ডিয়া*, পৃ. ৮৫)। বিশেষ এক ধরনের কৃষক হিসেবে রায়তওয়ারি চাষীরা ছিলেন ক্রমবর্ধমান। তাঁদের কথা জানা ছিল না বলে আইনগত কোনো নিরাপত্তাও তাঁরা পেতেন না। ফলে তাঁদের দুঃখ শুধু বেড়েই ছিল। সাম্প্রতিক অনুপুঙ্খ-পর্যালোচনায় এখানকার তাৎপর্যপূর্ণ আঞ্চলিক প্রকারভেদ প্রকাশ পেয়েছে ঃ তাঞ্জোরে ক্ষমতাশালী রায়তওয়ারি ভূমি-অধিকারীরা কৃষি-শ্রমিক নিয়োগ করতেন ; তামিলনাড়ু ও রয়ালসিমার ভেতরদিকের শুখা অঞ্চলে কমসংখ্যক ও আরও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ধনী চাষীদের ছোটো একটি শিরোমণি অংশ সুদের কারবার ও ব্যবসার মাধ্যমে বহু চাষীর ওপর জবরদস্তি করত ; আর অন্ধ্রের ব-দ্বীপে তাৎপর্যপূর্ণ রকমে আলাদা বিস্তৃত 'মধ্য চাষী' গড়ে উঠেছিল। চাষীদের স্তরবিভাগের গুরুত্বপূর্ণ প্রকারভেদে মাটি ও জল সরবরাহ ব্যবস্থার ভূমিকা ছিল এই রকম। অন্য দৃষ্টান্ত হলো বাঙলা। শ'য় শ'য় বছর ধরে এখানে নদীর গতিপথ সরে যাচ্ছিল পূর্বদিকে ; পশ্চিমের সব জেলা ('মর-মর ব-দ্বীপ') ও পূর্ববঙ্গের বেশি সমৃদ্ধ 'চালু ব-দ্বীপে'র মধ্যে তফাত ছিল। প্রথমটির ক্ষেত্রে চাষীরা জোতদার ও বর্গাদারে ভাগ হয়ে যাচ্ছিলেন। দ্বিতীয়টিতে অনুকূল পরিবেশ ও পাট থেকে পাওয়া মুনাফার ফলে অনেক স্বাধীন ছোটো ও মধ্য চাষীদের টিকে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে এইসব পার্থক্যের ফল হয়েছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমি-অধিকারী কৃষক ও রায়তদের নিচের দিকে ছিলেন বিরাট সংখ্যায় কৃষি-শ্রমিক। তাঁদের বেশির ভাগই এসেছিলেন জনগোষ্ঠী বা নিম্নতম বর্ণ থেকে। ১৯০১-এ তাঁদের সংখ্যা (পরিবারবর্গ সমেত) ধরা হয়েছিল ৫ কোটি ২৪ লক্ষ, বা গোটা জনসংখ্যার প্রায় একের পাঁচ ভাগ। সাম্প্রতিক গবেষণায় ইঙ্গিত মিলেছে, ভূমিহীন শ্রমিক ঔপনিবেশিক পর্বের সৃষ্টি নয়—যদিও জাতীয়তাবাদীরা কখনও তা-ই বলতেন। তাঁরা কল্পনা করেছিলেন সমতাভিত্তিক এক গ্রাম-সমাজের আদর্শ প্রতিরূপ। শিল্পায়ন-রোধ ও তার ফলে জমির ওপর অতিরিক্ত চাপ পড়ায় সে-সমাজ ভেঙে গিয়েছিল। —অবশ্য ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে সংযুক্ত প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ সর্বহারার সংখ্যা সম্ভবত বেশ বেড়ে গিয়েছিল আর অবস্থা হয়েছিল আরও খারাপ। যেমন, দক্ষিণ-ভারতে উপনিবেশ-পূর্ব সময় থেকেই বেশ কিছু চাষীর এতটাই বেশি জমি ছিল যে শুধু পরিবারের লোক দিয়ে তা চাষ করানো যেত না। তাছাড়া উঁচু শ্রেণীর মধ্যে নিজের হাতে চাষ করা ছিল নিষিদ্ধ। অন্যদিকে, অচ্ছুত বর্ণের দাসসুলভ ভূমি-শ্রমিক থাকার পর্যাপ্ত প্রমাণ পাওয়া গেছে। যেমন, মালাবারের চেরুমান বা তামিল পারাইয়ান (ধর্মা কুমার, *ল্যান্ড অ্যান্ড কাস্ট*, অধ্যায় ৩ ও ১১)। জাত এখানে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাড়তি জমি থাকলেও কিছু গোষ্ঠীকে ভূমি-অধিকার দেওয়া হয় নি, আর আধা-দাস বা নানা ধরনের 'চুক্তিবদ্ধ' শ্রমিকের ওপর উচ্চবর্ণের চাষীদের নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়েছে ঃ বিশেষ করে ফসল কাটার সময়ে, যখন প্রতি বছর শ্রমিকের ঘাটতি দেখা দিত তখন জোর খাটানো যেত সামাজিক চাপ ও সুদের কারবার—এই দুই মিলিয়ে। সুরাটের অনবিল ব্রাহ্মণদের যে 'দুবলা' ঋণ-দাস (হালি) ছিল তাঁদের নিয়ে সমীক্ষায় ইয়ান ব্রেমান দেখিয়েছেন, চিরায়ত পদ্ধতিতে শোষণ ছিল 'জটিল, তার লাঘব হতো মুরুব্বিসম্পর্কের ফলে'। 'দুবলা'রা তাঁদের প্রভুদের দেখতেন 'ধনিআমো', অর্থাৎ ধনদাতা ও রক্ষাকর্তা হিসেবে। ঔপনিবেশিক (ও তার পরের) আধুনিকীকরণে এই মুরুব্বি-ভূমিকা লঘু হওয়ার দিকেই গেছে। ফলে শোষণ হয়েছে আরও নগ্ন,

তাঁদের সম্পর্ক রূপান্তরিত হয়েছে 'ঋণের শর্ত-ভিত্তিক শ্রম-চুক্তি'তে (ইয়ান ব্রেমান, *প্যাট্রোনেজ অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন*, পৃ. ২১, ১৮৯)।

'১৭৯০-এর দশক থেকে ১৯৪০-এর দশকের মধ্যে যত বৃহৎ, সুপ্রতিষ্ঠিত, ও যত নিশ্চিন্ত ধনী ভূমি-অধিকারী গোষ্ঠী বৃদ্ধি পেয়েছিল ও সমৃদ্ধ হয়েছিল, ভারতের ইতিহাসে আর কোনো পর্বে তা দেখা যায় নি' (*ল্যান্ড অ্যান্ড লেবার ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ১০৯)—ড্যানিয়েল থর্নার এই বিষয়টি নজরে এনেছেন। জমিনদার ও ধনী চাষীরা প্রায়শই বাণিজ্যিক রূপায়ণ-প্রক্রিয়ার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে জড়িয়ে পড়তেন। কিন্তু সরাসরি কৃষি-উৎপাদনে বিনিয়োগ করার মতো কাঠামোগত চাহিদা অনেকাংশেই ছিল না। জমি ভাড়া দেওয়া, সুদি কারবার ও ব্যবসা ছিল সরাসরি পুঁজিবাদী চাষ-আবাদের চেয়ে অনেক বেশি সুরক্ষিত ও লাভজনক। এমনকি যেখানে বড় চাষীরা কৃষি-শ্রমিক লাগাতেন সেখানেও—অগুনতি গ্রামীণ সর্বহারা, যাঁরা (উঁচু) জাতের চাপে ও ঋণের দায়ে একান্তই নির্ভরশীল, তাঁদের কথা ধরলে—প্রযুক্তিগত প্রবর্তনা থেকে লাভের আশা ছিল সামান্যই। আধুনিকতা নয়, বরং এক আধা-সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সংহতিই ছিল আমাদের কৃষি-ব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক অভিঘাতের স্বকীয় চিহ্ন।

কৃষিজ উৎপাদন

কয়েকটি পরীক্ষামূলক কৃষিক্ষেত্র ও ১৮৭০-এর দশক থেকে সামান্য কিছু 'তকাভি' ঋণ ছাড়া কৃষি-উন্নয়নে প্রত্যক্ষ সরকারি প্রচেষ্টা বলতে দীর্ঘদিন ধরেই প্রায় কিছুই ছিল না। একমাত্র প্রধান ব্যতিক্রম ছিল পাঞ্জাব, পশ্চিম-যুক্ত প্রদেশ ও মাদ্রাজের কোনো কোনো জায়গায় খাল কেটে বড় মাপের জলসেচ ব্যবস্থা। কৌতূহলের বিষয় হলো, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে দেওয়া পূর্ব-ভারতে সেচ বাবদে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় নি। তার কারণ নিঃসন্দেহে এই যে, সেখানে চাষের উন্নতি থেকে সরকার খুব বেশি লাভের আশা করতে পারত না। জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা সেচকে সীমিত হলেও যথার্থ উপকার বলে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু যুক্ত প্রদেশ নিয়ে এলিজাবেথ হোয়াইটকোম্ব-এর সাম্প্রতিক গবেষণায় ব্রিটিশ শাসনের এমনকি এই দিকটির বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ দেখা দিয়েছে। মনে হয়, ব্রিটিশদের কাটানো খাল স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে খাপ খেত না, যেমন খেত চিরায়ত কাঁচা কুয়ো। খাল কখনও কখনও জলাজমি ও অতিরিক্ত নোনা জলের কারণ হতো। সেই সঙ্গে, খাল বাবদ কর বেশ চড়া ছিল বলে উপকারের পুরোটাই যেত কম সংখ্যক অবস্থাপন্ন চাষীদের দিকে। সেচের মাধ্যমে চিনি [আখ], তুলো ও গমের মতো ফসলের উৎপাদনে উৎসাহ দেওয়ার ফলে যব ও ডালের মতো গরিবের খাদ্য উৎপাদন যেত কমে। একই সঙ্গে, পাঞ্জাবের মতো জায়গায় সত্যিকারের কিছু লাভও হয়েছিল। ব্রিটিশদের কাটানো খালের সাহায্যে এখানে অহল্যাভূমিকে আনা হয়েছিল চাষের আওয়াত।

আবার ড্যানিয়েল থর্নার থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায়, ভারতের কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে গোটা ঔপনিবেশিক কাঠামোই ছিল এক 'সহজাত অন্তরায়'। ১৮৭০-এর দশকে, আবার ১৮৯০-এর দশকের শেষ দিকে একের পর এক বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষেই তার সবচেয়ে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলবে। পরেরটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল প্লেগ মহামারি। আর কুড়ি বছর পরে ইনফ্লুয়েঞ্জাতেও লাখ লাখ মানুষের প্রাণ গেল। ১৯২১ অবধি জনসংখ্যা বেড়েছিল খুবই ধীরে বা একবারেই বাড়ে নি

(১৮৯১-এ ২৮ কোটি ২০ লক্ষ, ১৯০১-এ ২৮ কোটি ৫০ লক্ষ, ১৯১১-এ ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ আর ১৯২১-এ ৩০ কোটি ৬০ লক্ষ)। ভারতের দারিদ্র্যের কারণ আর যা-ই হোক জনসংখ্যা নয়—যদিও কিছু স্তাবক ইতোমধ্যেই সে-যুক্তি হাজির করেছিল।

আরও দীর্ঘমেয়াদী স্তরে, ১৮৯৩ থেকে ১৯৪৬ অবধি কৃষি পরিসংখ্যান বিষয়ে জর্জ ব্লিন-এর গবেষণায় জড়তার, এমনকি অবনতির সত্যিই হতবাক করার মতো ছবি দেখা দিয়েছে। ১৮৯৩-৯৬-কে ভিত্তি করলে ১৯৩৬-৪৬-এর ফসল উৎপাদনের দশকওয়ারি গড় ছিল : খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে, ৯৩, বাণিজ্যিক ফসল ১৮৫, আর মোট কৃষি-উৎপাদন ১১০। ১৯২১-এর পরে জনসংখ্যাগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মাথাপিছু উৎপাদন বাস্তবিকই কমতে শুরু করে। ১৯৩৬-৪৬-এ সমস্ত শস্যের ক্ষেত্রে তা দাঁড়ায় ৮০, খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে ৬৮। অমিয় বাগচীর অনুপূরক হিসাবে দেখা যায়, ১৯০০-০৫ থেকে ১৯৩৫-৪০-এর পর্বে একরপিছু উৎপাদনশীলতার ধাঁচ ছিল একই রকম। একরপিছু বাণিজ্যিক ফসলের দাম খুবই সামান্য বেড়েছিল ; ৩৬.৭ টাকা থেকে ৩৭.৯ টাকা। অন্যদিকে, খাদ্যশস্যের দাম ২৫.৪ টাকা থেকে নেমে আসে ২২.৭ টাকায় আর সব শস্য মিলিয়ে ২৭.৬ টাকা থেকে ২৬.৩ টাকায় (অমিয় বাগচী), *প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ৯৫)। ব্লিন-এর 'বৃহত্তর' বাঙলা এলাকায় অতিমাত্রায় অবনতি আর পাঞ্জাব ও মাদ্রাজে কিছু অগ্রগতি—এই বিপরীত চেহারাও সমান তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ব-ভারতের আঞ্চলিক পশ্চাৎপদতা এখনও এক প্রধান সমস্যাই রয়ে গেছে। ব্রিটিশ শাসনের শেষ ক'টি দশকের মধ্যেই এটি এক সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিদেশী পুঁজি

ব্রিটিশ শাসন ছিল 'আধুনিকীকরণে'র বাহন—শেষ অবধি এই দাবি দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি ঘটনার ওপর ; যেমন, ব্রিটিশ পুঁজি দিয়ে রেলপথ তৈরি আর বাগিচা, খনি ও কল-কারখানার উন্নতি, এবং শ্বেতাঙ্গদের হাতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও শিল্প-পরিচালনায় পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও নতুন পদ্ধতির প্রচলন। ব্রিটিশরা ভারতে এক মনোজ্ঞ রেলপথের জাল গড়ছিল। ১৯০০-তে তা ছিল পৃথিবীর পঞ্চম বৃহত্তম রেলপথ। ১৮৫৩-য় যখন প্রথম রেল লাইন পাতা হচ্ছিল, মার্কস তখন ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন, রেলপথ হলো আধুনিক শিল্পের পূর্বসূরি। কিন্তু তার সামগ্রিক প্রভাবের হিসেব-নিকেশ করতে হলে, ১৮৮১-তে মার্কস একটি চিঠিতে যে-মন্তব্য করেছিলেন, ১৮৫৩-র ঐ বহু উদ্ধৃত কথাগুলির চেয়ে সেটি আরও বেশি মনে রাখা চাই : রেলপথ 'ছিল হিন্দুদের কাছে অদরকারি'। ভারতে ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের একক বৃহত্তম সংস্থা ছিল রেলপথ। কিন্তু পূর্বস্বীকৃত সুদ-প্রথার মধ্যে দিয়ে বোঝার অনেকটাই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় করদাতাদের ঘাড়ে। এর ফলে, লাভ না-হলেও সরকার একটা ন্যূনতম লভ্যাংশ (ডিভিডেণ্ড) দিত। ১৯০০ নাগাদ এ বাবদে দিতে হয়েছিল ৫ কোটি পাউন্ডেরও বেশি। 'সরকারি ঝুঁকিতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ'—আগাগোড়াই অদ্ভুত এই ব্যবস্থার সঙ্গে অনিবার্যভাবে জড়িয়ে ছিল অপচয়সর্বস্ব পথঘাট তৈরি ও কাজকর্ম—জাতীয়তাবাদীদের এক বাঁধাধরা ও বেশ ন্যায্য অভিযোগ। রেলপথের জাল পাতা হয়েছিল ব্রিটিশ বাণিজ্য ও রণনীতির প্রয়োজনেই। ভারতীয় ব্যবসাদাররা প্রায়শই পক্ষপাতমূলক মাল-পরিবহণ খরচ নিয়ে অভিযোগ করতেন।

সবচেয়ে বড় কথা, রেলপথে বিনিয়োগের দস্তুরমাফিক 'গুণবৃদ্ধি' ফল ঔপনিবেশিক ভারতে প্রায় দেখাই যায় নি। তার যন্ত্রপাতির বেশির ভাগই আমদানি করা হতো ইংল্যান্ড থেকে। ফলে সহযোগী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিকাশও থেকে গিয়েছিল খুবই অপর্যাপ্ত দশায়। যেমন, স্বাধীনতার আগে অবধি গোটা পর্বে এ-দেশে তৈরি হয়েছিল মাত্র ৭০০-র মতো লোকোমোটিভ। অনেক পরে, এমনকি ১৯২১-এও রেল বিভাগের উচ্চ পদে মাত্র ১০% ছিলেন ভারতীয়। নতুন দক্ষতার বিস্তার তাই ছিল সীমাবদ্ধ, আর রেলপথে বিনিয়োগের থেকে যা আয় হতো তার একটা মোটা অংশ ফুটো দিয়ে চলে যেত বিদেশে।

বাগিচা ও খনি, চটকল, ব্যাঙ্ক, বীমা, জাহাজ-ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানি সংস্থা—নিঃসন্দেহে এ সবই তাৎপর্যপূর্ণ প্রবর্তনা। এগুলোর পেছনে ছিল পরস্পর সংযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠান প্রথা, যারা সাধারণত একই সঙ্গে আর্থিক, বাণিজ্যিক ও শিল্পগত কাজকর্ম চালাত। ভারতের প্রগতিতে এদের অবদান কতখানি সে অন্য কথা, কারণ খুব বেশি হলেও এর ঝোঁকটা ছিল বিদেশী নিয়ন্ত্রণে—আর্থিক ব্যবস্থার বাকি অংশের বিকাশকে যা সত্যিই ব্যাহত করত—পুঁজিবাদী বেষ্টনী গড়ে তোলার দিকে। ভারত প্রসঙ্গে 'পুঁজি রপ্তানি' খানিক নতুন অর্থ পায় যখন আমরা মনে করি : ১৮৭০-এর দশকে বিদেশে সুদ পাঠানোর পরিমাণ ছিল সর্বদাই পুঁজি আমদানি থেকে বেশি। সবচেয়ে বড় কথা, অঞ্চলভেদ বিষয়ে সাম্প্রতিক কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে, আমাদের গোটা পর্ব জুড়ে অর্থব্যবস্থার নির্ধারক ক্ষেত্রগুলিতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের ফলে এ-দেশীয় পুঁজিবাদী বিকাশ কীভাবে ব্যাহত হয়েছিল।

ভারতীয় পুঁজিবাদী বিকাশ

বোম্বাই ও গুজরাটে ভারতীয় পুঁজিবাদী বিকাশ আর বাঙলায় কার্যত তার গর-হাজিরা—এই স্পষ্ট বিপরীত চেহারার ব্যাখ্যা খোঁজা হয়েছে এইভাবে : ব্যবসা ও শিল্পের দিকে বাঙালি ভদ্রলোকের তথাকথিত নিরাশক্তি, আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিতে দেশীয় পুঁজি বিনিয়োগ। কিন্তু ১৮৪০-এর দশক অবধি যথেষ্ট সংখ্যায় উঁচুজাতের বাঙালি জড়িয়ে ছিলেন ব্যবসার সঙ্গে, আর সারা উনিশ শতক জুড়েই সংবাদপত্র-পত্রিকায় স্বাধীন ব্যবসার উপকার ও গুণাবলীরকথা বারেবারেই পাঠকদের বোঝানো হয়েছে। পারসিদের ব্যবসায়িক সাফল্যের কৃতিত্বকে চাপানো হয় তাঁদের মধ্যেকার এক ধরনের 'প্রটেস্টান্ট নৈতিকতা'র ওপর। একই রকম বা আরও সফল গুজরাটি বানিয়া বা মারোয়াড়িদের মধ্যে কিন্তু আধুনিকতা-ঘেঁষা সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সামান্যই চোখে পড়ে। অন্যদিকে আর্থনীতিক উদ্যোগে বাঙালি ব্রাহ্মদের সহায় হয় নি আধুনিকতা। ভূমি-সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, জমিনদারি ও রায়তওয়ারি ব্যবস্থার চূড়ান্ত প্রভাব তেমন আলাদা কিছু নয়। অন্যদিকে, ঐ যে পরম্পরাগত তত্ত্ব—চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তৎক্ষণাৎ শহরের পুঁজিকে টেনে এনেছিল জমিতে—জমির বাজার নিয়ে হালের গবেষণায় তাতে সন্দেহের অবকাশ দেখা দিয়েছে। মোট কথা, অমিয় বাগচী যেমন বলেছেন, অর্থব্যবস্থার ওপর বিভিন্ন মাত্রায় বিজাতীয় সাম্রাজ্যবাদী প্রাধান্যের নিরিখে এর ব্যাখ্যা আরও সহজ হয়।

বোম্বাই-এর শিল্পের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মোটা দাগের বিপক্ষপাত দেখানো হত। এইভাবে

প্রশুল্ক ও অন্তঃশুল্ক নীতির মাধ্যমেই ব্রিটিশরা যে দেশীয় পুঁজিবাদকে আটকে দিয়েছিল এমন নয়। কাঠামোগত নানা বাধানিষেধ জারি করেও তা করা হয়েছে। শ্বেতাঙ্গ ব্যবসাদার ও শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে বহু রকমের সামাজিক যোগসূত্রের কথা আগেই বলা হয়েছে। অবাধ বাণিজ্য নীতির আড়ালে সরকারি নীতি প্রায়শই ছিল ইওরোপীয় উদ্যোগের অনুকূলে সক্রিয় [পূর্বস্বীকৃত (সুদ) পদ্ধতির মাধ্যমে রেলপথ আর আসামের চা-কুঠিয়ালদের নামমাত্র দামে বিরাট বিরাট জায়গা বিলোনোই তার দুটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত], আর ভারতীয়দের ক্ষেত্রে করা হতো বিভেদমূলক আচরণ। বন্দরগুলির সঙ্গে যোগাযোগে উৎসাহ জাগিয়েছিল রেলপথের জাল ও মালের ভাড়া, দেশের ভেতরদিকের নানা কেন্দ্রের মধ্যে নয়। সংগঠিত টাকার বাজার অনেক অংশেই ছিল শ্বেতাঙ্গদের নিয়ন্ত্রণে। ১৯১৪-র আগে প্রধান ভারতীয় ব্যাঙ্ক বলতে ছিল দুটি : পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক আর ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া। সম্ভবত সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, উনিশ শতকে অর্থনীতির প্রসার হয়েছিল রপ্তানির প্রয়োজনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে, আর তাদের ভারতীয় বিনিময় ব্যাঙ্ক, আমদানি-রপ্তানি প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ-ব্যবসার মাধ্যমে দেশের বহির্বাণিজ্যের বড় অংশটা নিয়ন্ত্রণ করত ব্রিটিশরাই।

শ্বেতাঙ্গদের 'সমবেত একচেটিয়া' সবার আগে এসেছিল পূর্ব-ভারতে আর সেখানেই তা সবচেয়ে দৃশ্যমান থেকে গিয়েছিল। উল্টো দিকে, পশ্চিম-ভারতের ভারতীয় বণিকরা (বিশেষত পারসিরা, কিন্তু তারাই একমাত্র নয়) চীন ও অন্যান্য জায়গার সঙ্গে সমুদ্রপারের বাণিজ্যের 'পা-রাখার জায়গাটুকু' কখনোই হারায় নি। তার একটা বড় কারণ : ব্রিটিশ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সেখানে এসেছিল অনেক দেরিতে (ভারতীয় সহযোগীদের ওপর আরও বেশি নির্ভরতার দরকার হয়ে পড়েছিল) আর তা বেশিদূর ছড়ায় নি। ১৮১৮-য় মারাঠাদের ভেঙে পড়ার আগে অবধি পশ্চিম- ভারতে 'দেশীয়' রাজনৈতিক শক্তি ছিল জোরদার। তার পরেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে-কটি দেশীয় রাজ্য টিকে গেল, বাওলার মানচিত্রের সঙ্গে তাদের তফাত পরিষ্কার। রেলপথ তৈরি হওয়ার আগে বোম্বাই-এর পশ্চাদ্‌ভূমিতে ঢোকা ছিল কঠিন, সেখানে নীল, চা বা কয়লা—ব্রিটিশ স্বার্থের গোড়ার দিকে লক্ষ্যবস্তু- ছিল না।

চিরকালের ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় অবশ্য টিঁকে ছিল, এমনকি তার বাড়বাড়ন্তও হয়েছিল। তা কিন্তু প্রধানত বাণিজ্যিক কৃষিকর্মের বিকাশের ফল খাওয়া মহাজন হিসেবে, বা দেশের মধ্যে ব্রিটিশ রপ্তানি-আমদানি প্রতিষ্ঠানগুলোর দালালি করা নির্ভরশীল ব্যবসাদার হিসেবে। আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের লক্ষণই ছিল উত্তর, পূর্ব ও মধ্য-ভারতের অনেকটা জুড়ে মারোয়াড়ি প্রসারণের, আর ব্রিটিশের নির্ভরশীল সহযোগী হিসেবে বর্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য অংশে দক্ষিণ ভারতীয় চেট্টিয়ার ব্যবসাদার ও মহাজনদের চলাচল প্রক্রিয়ার গতিবৃদ্ধি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি মারোয়াড়ি পারিবারিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মূলত নির্ভরশীল ভূমিকা সম্পর্কে টিমবার্গ-এর সাম্প্রতিক রচনায় অনেক তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। তারাচাঁদ ঘনশ্যামদাসের 'বিরাট প্রতিষ্ঠান'টি নিয়ে তিনি খুঁটিয়ে পরখ করেছেন। এটি কাজ করত শওয়ালেস-এর বানিয়া হিসেবে। র‍্যালি ব্রাদার্স আর গোয়েঙ্কা, গ্রাহাম আর ঝুনঝুনওয়ালা, অ্যাণ্ড্রু ইউল আর জাটিয়াদের মধ্যেও একই ধরনের নির্ভরশীল সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল।

শুধু পশ্চিম-ভারতেই, গোড়ায় বোম্বাই-এ আর কিছুকাল পরে আহ্‌মেদাবাদে' মুৎসুদ্দি

ব্যবসার মাধ্যমে পুঁজি সঞ্চয় হচ্ছিল (বোম্বাই-এ মূলত চীনের সঙ্গে ব্যবসায়)। সেই পুঁজি খাটিয়ে লাভ করার জায়গা পাওয়া গেল সত্যিকারের এদেশীয় সুতিশিল্পে। ১৮৬০-এর দশকে তুলোর রমরমার সময়ে চেয়ে ডেকান-এ রেলপথ বসানো হয়েছিল। অনায়াসে সেখান থেকে পাওয়া যেত কাঁচা তুলো। আর ম্যাঞ্চেস্টার-এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করবে যে-সুতিশিল্প, তাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্রিটিশদের বিশেষ আগ্রহ ছিল না।

১৮৭০-এর দশকের মাঝামাঝি বোম্বাই-এর উত্থানে ল্যাঙ্কাশায়ার-এ ইতোমধ্যেই ভীষণ আতঙ্ক দেখা দিয়েছিল। বিলেতের চাপেই মাঝে মধ্যে নেওয়া হচ্ছিল অন্যায় প্রশুল্ক ও অন্তঃশুল্ক নীতি। এই ব্যাপারটি ভারতীয় বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের ভেতর দেশপ্রেমিক চেতনা বাড়ানোয় এক প্রধান উদ্দীপকের কাজ করত। বোম্বাই আর ল্যাঙ্কাশায়ার-এর সম্পর্ক অবশ্য কখনোই সরল বা পুরোপুরি সঙ্ঘাতের ছিল না। অর্থ, বাণিজ্য ও শিল্পের গাঁটছড়া বাঁধাই ছিল ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথার বৈশিষ্ট্য। তার মানে : সুতিকাপড় সংস্থার সঙ্গে আমদানি-করা বোনা সুতো ও থানের কাপড়ের যোগ। ইওরোপীয় কারিগরি কুশলতার ওপর অনেকখানি আর আমদানি করা যন্ত্রপাতির ওপর পুরোপুরিই নির্ভর করে ছিল বোম্বাই-এর কল-কারখানা। সবচেয়ে বড় কথা, বোম্বাই ও ম্যাঞ্চেস্টার-এর মধ্যে সরাসরি সঙ্ঘাত খুব নিত্যকার ব্যাপার ছিল না। তা ঘটে বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলোয়, কতক প্রকরণগত কারণে। ১৮৯০-এর দশক অবধি থানের চেয়ে পাকানো ও বোনা সুতো নিয়েই কাজ করত বোম্বাই। এই পাকানো সুতোর অনেকখানিই রপ্তানি হতো দূর প্রাচ্যে বা জোগান দেওয়া হতো ভারতের তাঁতে। ভারতীয় কলে বোনা সুতোর বড় অংশটাই ছিল ২৪-এর চেয়ে কম পাকের। অন্যদিকে, ১৮৯৩-৯৪-এ বোম্বাই-এ যে বোনা সুতো আমদানি করা হয় তার মাত্র ১৮% এই আওতায় পড়ে। ভারতের দেশীয় বাজারে থান কাপড়ের প্রতিযোগিতা মূলত 'মোটা, মাঝারি' ধরনের ভেতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। উঁচু মানের কাপড়ের ক্ষেত্রে ১৯০৫-এর পরেও ভারতীয় কলের মাল কোনো প্রতিযোগিতায় আসত না। গত শতকের শেষ দিকে, চীনের যুদ্ধ ও বোম্বাই-এর প্লেগ মহামারির ফলে প্রথম দূর প্রাচ্যে রেশম ও সুতো রপ্তানি মার খায়। তার পরেই তা ক্রমেই পড়তে থাকে জাপানি প্রতিযোগিতার মুখে। এরই পরিণামে, ঝোঁক চলে যায় সুতো বোনা থেকে কাপড় তৈরির দিকে। এটি সবচেয়ে স্পষ্ট চোখে পড়ে আহ্‌মেদাবাদে। দেশের বাজারে বোম্বাই-এর চেয়ে এই জায়গাটিই বেশি পরিমাণ জোগান দিয়েছে আর তুলনায় বেশি-পাকের সুতোও ব্যবহার হতো সেখানে। ফলে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর সঙ্গে তাকে মোকাবিলা করতে হতো আরও প্রত্যক্ষভাবে। গান্ধীর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে, একবার যখন মনে হলো এই আন্দোলনে কিছু ফল হবে, তখনই আহমেদাবাদ আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়ল জাতীয় আন্দোলনে। এর বেশ স্পষ্ট আর্থনীতিক ভিত ছিল।

উনিশ শতকের শেষ ভাগে ভারতের পরিস্থিতিতে শিল্প-সংশ্লিষ্ট বুর্জোয়াশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল দ্বিতীয় নতুন উপাদান : শ্রমিকশ্রেণী। সেটি গড়ে উঠছিল বেশ ধীরে ধীরে। ১৯১১-য় জনসংখ্যা যখন ৩০ কোটি ৩০ লক্ষ, তখন সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ছিল মাত্র ২১ লক্ষ (বিভিন্ন বাগিচায় ৮ লক্ষ ধরে)। কিন্তু বোম্বাই ও কলকাতার মতো বড় বড় শহরে জড়ো হওয়ায় সর্বহারারা (১৯২০-র দশক থেকে) মাঝে মধ্যে তাঁদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি আঘাত হানার ক্ষমতা পেয়েছিলেন। অন্যান্য অনেক দেশেও এমন ঘটেছে। বহু 'পুঁজিবাদ-

পূর্ব' অবশেষের দরুন যেমন ব্রিটিশ মালিকানা-সংস্থায় তেমনি ভারতীয় সংস্থাতেও গোড়ার দিকের পুঁজিবাদী শিল্পায়নের ভয়াবহতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। আসামের চা-বাগিচার জন্যে কুলি আর ফিজি, মরিশাস, নাটাল ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ-এর দেশান্তরী ভারতীয় শ্রমিকদের নিয়োগ করা হতো এক খৎবদ্ধ প্রথার ভিত্তিতে। মজুরি-শ্রমের চেয়ে দাসপ্রথার সঙ্গেই তার মিল বেশি। অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও পুঁজিবাদ পূর্ব রূপগুলোকে লালন করেছিল সাম্রাজ্যবাদই। খনি, রেলপথ বা কল-কারখানায় নিয়োগ ছিল প্রকরণগতভাবে অবাধ। কিন্তু তা চলেছিল মধ্যের দালাল ও আড়কাঠি মারফত। শ্রমিকদের বোঝা বাড়াত তাদের নানান উপরি-র দাবি। পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ, বিহার ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ছিল পূর্ব-ভারতের চা বাগিচা, খনি ও কারখানার শ্রমিক সরবরাহের বাঁধা জায়গা। আর এইভাবে কলকাতার শিল্পাঞ্চলেও শ্রমিকশ্রেণী হয়ে উঠেছিল প্রধানত অবাঙালি। অন্যদিকে, আহ্‌মেদাবাদে ও বোম্বাই-এ শ্রমিকের জোগান আসত ধারকাছের এলাকা থেকে। প্রথমটিতে তা ছিল গুজরাটের গ্রাম, দ্বিতীয়টিতে মহারাষ্ট্রের পশ্চাদ্‌ভূমি (বিশেষত কোঙ্কনের রত্নগিরি জেলা)। এই তফাতের দরুন পরবর্তীকালে কিছু ট্রেড ইউনিয়ন ও রাজনীতি-গত ফলাফলও দেখা দেবে।

'আধুনিক' ক্ষেত্রে এ ধরনের উন্নতির চিহ্ন সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতিতে প্রধান ঘটনা ছিল ঃ জনসাধারণের চূড়ান্ত দারিদ্র্য। গোড়ার দিকের মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয়ের হিসেব অনেকটাই আন্দাজি। জাতীয়তাবাদী ও ব্রিটিশ শাসন-সমর্থকদের চলমান রাজনৈতিক বিতর্কের তা একটা অংশও বটে দু দলের হিসেবের মধ্যে তাই বেশ ফারাক দেখা যায়। ভারতপ্রেমী ডিগ্‌বি-র হিসেবে ১৮৯৯-এ তা ছিল চলতি দামে ১৮ টাকা, আর অ্যাটকিনসন-এর হিসেবে ১৮৯৫-এ ৩৯.৫ টাকা। তা হলেও, এমনকি অ্যাটকিনসন-এর হিসেবেও তা দাঁড়ায় মাত্র ২ পাউন্ড ১৩ শিলিং ০ পেন্স। আধুনিক ভারতীয় জীবনের সমস্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারায় জনসাধারণের দারিদ্র্য এক স্থায়ী চালচিত্রই থেকে যাবে।

৩

সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন ১৮৮৫-১৯০৫

'তলা থেকে ইতিহাস'-এর দিকে

এ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রাধান্যের কাঠামো বিষয়ে আমাদের সমীক্ষায় অজস্র সঙ্ঘাতের মূল কারণগুলোর ইঙ্গিত মিলেছে। সঙ্ঘাত ছিল সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের অধিকাংশের, আর ভারতীয় সমাজেরই ভেতরকার নানা গোষ্ঠী ও শ্রেণীর মধ্যে। এখন দেখতে হবে কী কী ভাবে এইসব বিরোধ দেশের মানুষের জীবন, চিন্তা ও কাজে ফুটে উঠত। আগেই বলা হয়েছে, যথার্থ সামাজিক ইতিহাস বিস্তর পেছিয়ে আছে। ফলে দেখতে বসলেই একটা বড় সমস্যা তৈরি হয়। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের কথা প্রচুর লেখা হয়েছে। এই গোষ্ঠী নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সংখ্যায় তবুও নগণ্য। বিশেষ বিশেষ জনগোষ্ঠী, গ্রাম ও বর্ণ নিয়ে নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক লেখাপত্র যথেষ্টই আছে। কিন্তু, এখনও অবধি এমনকি আঞ্চলিক স্তরে প্রধান সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মোটামুটি সাধারণ চর্চা হয়েছে খুবই সামান্য। জমিনদার বা চাষী, খেতমজুর বা কারিগর, শিল্প-শ্রমিক বা বুর্জোয়া উপাদান— এঁদের বাঁচার হাল ও চেতনায় রদবদল—দু-এরই বিশ্লেষণ করে এমন কোনো প্রকৃত ইতিহাস নেই। রাজনৈতিক আন্দোলনের, বিশেষত জাতীয়তাবাদের ইতিহাসকে এই গুরুতর ফাঁকটি যেন এক শূন্যতার মধ্যে ফেলে দেয়। 'তলা থেকে ইতিহাস', যাতে বিরসা মুণ্ডার জনগোষ্ঠীর বিদ্রোহের জায়গা হতে পারে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের আগে, তা এখন খুবই ছাড়া-ছাড়া ও খসড়া আকারে থাকতে বাধ্য। তাহলেও মাঝে মাঝে সে-দিকে চেষ্টা করাটা হয়তো বেমানান হবে না।

গত তিরিশ বছর ধরে তথাকথিত 'অসামরিক হাঙ্গামা' নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে : পলাশীর যুদ্ধের অন্তত একশ বছর পরেও 'ব্রিটিশ শান্তি' (প্যাক্স ব্রিটানিকা) ছিল অনেকটাই অতিকথা। দেশের অধিকাংশে সঙ্ঘটিত বিদ্রোহে বারে বারে তা ভেঙে পড়ে। সে-বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন চিরায়ত উপাদান (ক্ষমতাচ্যুত স্থানীয় শাসক, জমিনদার বা ধর্মীয় নেতা), কিন্তু সামাজিক বিন্যাসের দিক দিয়ে প্রধানত নিচু শ্রেণীর মানুষ। নৃতত্ত্ববিদ্ ক্যাটলিন গাফ সম্প্রতি গোটা ব্রিটিশ পর্বে ৭৭টি রক্তাক্ত কৃষক-অভ্যুত্থানের একটি তালিকা খাড়া করেছেন। সেগুলোকে তিনি ভাগ করেছেন পাঁচ ধরনে : 'পুনরুদ্ধারমূলক', ধর্মীয়, সামাজিক ডাকাতি, সন্ত্রাসবাদী প্রতিরোধ, ও সশস্ত্র বিদ্রোহ। ১৮৫৭-কে পুরনো ধরনের ব্রিটিশ-বিরোধী প্রতিরোধের চূড়ান্ত পর্যায় বলে ধরা যেতে পারে। এর নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষমতাচ্যুত রাজ-রাজড়া, লক্ষ্য ছিল 'পুনরুদ্ধার'। শতকের শেষে এসব বিস্ফোরণ তুলনায় কমে এসেছিল—সাধারণভাবে এমন ধারণা হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী সময়ে দেশীয় রাজা ও জমিনদারদের সঙ্গে ব্রিটিশ যোগসূত্র দৃঢ় হয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও আরও কার্যকর সামরিক প্রশাসনিক কাঠামোর উন্নতি ঘটে, আর

সম্ভবত ১৮৭০-এর ও ১৮৯০-এর দশকে একের পর এক দুর্ভিক্ষের ফলে শক্তিতে ভাঁটা পড়ে—এই সবের নিরিখে তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তবু সাধারণ মানুষের বিচ্ছিন্ন বিস্ফোরণ ঘটে নি এমন নয়। কখনও কখনও তার সঙ্গে যুক্ত থাকত আদলের মধ্যে আগ্রহ জাগানোর মতো কিছু রকমফের।

জনগোষ্ঠীয় আন্দোলন

প্রথম বা পরবর্তী পর্বে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক বিদ্রোহ ছিল জনগোষ্ঠীর মানুষদের। সাম্প্রতিক এক বিদ্বানের ভাষায়, তাঁরা 'ভারতে কৃষক সমেত যে-কোনো সম্প্রদায়ের চেয়ে অনেক বেশিবার ও অনেক বেশি উগ্রভাবে বিদ্রোহী হয়েছেন' (কে সুরেশ সিং)। 'জনগোষ্ঠী'—এই শব্দটি দিয়ে 'জাত' থেকে আলাদা করে সামাজিকভাবে সংগঠিত জনগণকে বোঝানো হয়, ভারতীয় জীবনের মূলধারা থেকে তাঁরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন—এমন অর্থে নয়। কার্যত, কিছু বিচ্ছিন্ন ও সত্যিই আদিম খাদ্য-সংগ্রাহক ছাড়া কৃষককুলের সবচেয়ে নিচের স্তর হিসেবে জনগোষ্ঠীগুলি সর্বদাই ভারতীয় সমাজের অংশ ছিল ও আছে। ঝুম চাষ, খেত-মজুরি, আর ক্রমবর্ধমানভাবে, দূরের বাগিচা, খনি ও কল-কারখানায় কুলি হিসেবে চালান হয়ে তাঁরা বেঁচে থাকতেন। সমভূমি থেকে বহিরাগতদের জনগোষ্ঠীয় এলাকায় অনুপ্রবেশের যে-প্রবণতা ইতোমধ্যেই দেখা দিয়েছিল, ব্রিটিশ শাসন ও তার সহগামী বাণিজ্যিক রূপায়ণে তা আরও জোরদার হয়। এরা হলো মহাজন, ব্যবসাদার, জমি-দখলদার ও ঠিকাদার, যে-'দিকু'দের সাঁওতালরা অত ঘৃণা করতেন। নিরঙ্কুশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিষয়ে ব্রিটিশ আইনগত ধারণা নষ্ট করে দেয় যৌথ মালিকানার পরম্পরাকে (যেমন ছোটোনাগপুরের খুণ্টকাট্টি স্বত্ব) আর তীব্র করে তোলে জনগোষ্ঠীয় সমাজের ভেতরকার টানাপোড়েন। বহু জনগোষ্ঠী-এলাকায় (বিশেষত বিহার ও পার্বত্য আসামে) সক্রিয় ছিল নানা খ্রীস্টান মিশন। তারা এনেছিল শিক্ষা আর সামাজিক উত্তরণের কিছু আশ্বাস। প্রায়শই তা কিন্তু নানা রকম কৌতূহলজনক প্রতিক্রিয়াও জাগিয়ে তুলত। তার মধ্যে যেমন ছিল বৈরিতা, তেমনি ছিল কিছু খ্রীস্টান মতবাদকে বিদেশ-বিরোধী উপায়ে কাজে লাগানোর চেষ্টা। ১৮৭০-৮০-র দশক থেকে এক নতুন কিন্তু ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের উপকরণ দেখা দিল : রাজস্বের উদ্দেশ্যে বনাঞ্চলে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ি। ঝুম চাষের জন্যে লাঙল বইবার পশুর দরকার হয় না, তাই সমাজের দরিদ্রতম মানুষদের বেঁচে থাকার পক্ষে তা প্রায়শই অপরিহার্য। কিন্তু ১৮৬৭ থেকে 'সংরক্ষিত' বনে ঝুম চাষ নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত করা হলো। কাঠ কুড়নো ও গোচারণের সুযোগ-সুবিধে আটকে দিয়ে চেষ্টা চলল অরণ্য-সম্পদের ওপর একচেটিয়া অধিকার কায়েমের।

আগের মতোই জনগোষ্ঠীরা নানাভাবে এর জবাব দিল। তার মধ্যে ছিল মাঝে মাঝেই উগ্র বিস্ফোরণ। আর সেই সঙ্গে ছিল নিজেদের মধ্যেকার ধর্মীয় ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন। 'নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারে'র এই সব আন্দোলনের মালমশলা ধার করা হতো খ্রীস্টান বা হিন্দুধর্ম থেকে। তাতে আশ্বাস থাকত হঠাৎই এক স্বর্ণযুগের দৈবদ্বার খুলে যাওয়ার। ক্রমেই আরও বেশি করে এগুলি ১৮৬০-১৯২০ পর্বের বিশিষ্ট লক্ষণ হয়ে ওঠে। এসব সাধারণত দেখা দিত পরম্পরাগত গোষ্ঠীনেতাদের পরিচালনায় কোনো অভ্যুত্থানে হেরে যাওয়ার পরে। সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) পেছু পেছু তাই দেখা দিল ১৮৭০-এর দশকের খেরওয়ার বা

সাফা হর আন্দোলন। প্রথমে তা একেশ্বরবাদ ও অভ্যন্তরীণ সমাজ-সংস্কার প্রচার করত, কিন্তু দমনের ঠিক আগে তা রাজস্ব বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে এক অভিযানে পরিণত হওয়ার দিকে মোড় নিতে শুরু করে। ভাবী সুখরাজ্যের ধারণা (আসন্ন এক স্বর্ণযুগে বিশ্বাস) আরও উগ্র চেহারা নিতে পারে। ১৮৬৮-তে 'ধর্ম-রাজ' প্রতিষ্ঠার আশায় গুজরাটের নৈকদা অরণ্যগোষ্ঠীর মানুষরা পুলিশ-চৌকি আক্রমণ শুরু করেন। ১৮৮২-তে কাছাড়ের কাছা নাগারা সম্ভুদান নামে এক দৈব-জাদুকরের নেতৃত্বে শ্বেতাঙ্গদের ওপর চড়াও হন। এই জাদুকর দাবি করতেন, তাঁর জাদুর এমনই গুণ যে তাঁর অনুগামীদের বুলেট কিছুই করতে পারবে না। পুরনো জেলা গেজেটিয়ার ও নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষায় সত্যিই এ ধরনের বিষয়ের অজস্র উল্লেখ আছে। আর কখনও কখনও তা আশ্চর্য নাড়া দেয়। যেমন, ভিজাগপত্তনম্ এজেন্সিতে ১৯০০-য় কোর্‌রা মল্লয়া নামে এক কোন্ডা ডোরা নিজেকে 'অনুপ্রাণিত বলে ভান করেন ... নিজের আশপাসে ৪-৫০০০ মানুষ জড়ো করেন ... তিনি বলেন, তিনি পঞ্চপান্ডবের এক ভাই-এর অবতার, তাঁর শিশুপুত্র শ্রীকৃষ্ণ; ইংরেজদের তাড়িয়ে তিনি এ দেশ শাসন করবেন, তা করার জন্য তিনি তাঁর অনুগামীদের অস্ত্র হিসেবে দেবেন বাঁশ, যা কিনা জাদুবলে পরিণত হবে বন্দুকে, আর কর্তৃপক্ষের অস্ত্রশস্ত্র পরিণত হবে জলে।' ফল তো জানাই ছিল। পুলিশ ১১ জন 'দাঙ্গাকারী'কে গুলি করে মারে, ও সোপর্দ করে ৬০ জনকে। তার মধ্যে দুজনের ফাঁসি হয়। (থার্সটন ও রঙ্গচারী, *কাস্ট অ্যান্ড ট্রাইবস্ অফ সাউথ ইন্ডিয়া*, খণ্ড ৩, মাদ্রাজ, ১৯০৯, পৃ. ৩৫৩)।

১৮৭৯-৮০-তে পাশের গোদাবরী এজেন্সির পার্বত্য অঞ্চলে অনেক বেশি জোরদার এক বিদ্রোহ হয়। এর কেন্দ্র ছিল চোড়াভরম-এর 'রাম্পা' অঞ্চল। এখানকার কোয়া ও কোন্ডা দোরা পার্বত্য সর্দাররা ('মুট্টাদর') ১৮৪০, ১৮৪৫, ১৮৫৮, ১৮৬১ ও ১৮৬২-তে স্থানীয় শাসকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। শাসক ছিল এক মনসবদার পরিবার, ১৮১৩-য় তারা ব্রিটিশদের সঙ্গে এক বোঝাপড়ায় পৌঁছেছিল। মার্চ ১৮৭৯-র বড় বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল কাঠ ও চারণভূমির ওপর মনসবদারের কর বাড়ানোর চেষ্টা। এরই সঙ্গে বাড়তি ক্ষোভের ইন্ধন জোগায় পুলিশি জুলুম, নতুন অন্তঃশুল্ক আইন (যাতে ঘরে তৈরি তাড়ির ব্যাপারে কড়াকড়ি হয়), সমভূমির ব্যবসাদার ও মহাজনদের শোষণ, আর জঙ্গলে ঝুম চাষের জমির ('নাড়ু') ওপর নিয়ন্ত্রণ। চূড়ান্ত পর্যায়ে এই বিদ্রোহ ৫০০০ বর্গমাইল অবধি বিস্তৃত এলাকায় ছাপ ফেলে। মাদ্রাজ পদাতিক বাহিনীর ৬টি রেজিমেন্ট নামিয়ে তবে নভেম্বর ১৮৮০ নাগাদ এটি দমন করা গিয়েছিল। ১৮৮৬-তে এই এলাকায় আরও একটি অভ্যুত্থান হয়। বিদ্রোহীরা নিজেদের বলতেন 'রাম দলু' (রামের সেনাবাহিনী)। তাঁদের এক নেতা, রাজানা অনন্তয়্যা, মহারাজার কাছে আগ্রহ জাগানোর মতো 'আদি-জাতীয়তাবাদী' আবেদন পাঠান : 'আমাদের দেশে ইংরেজ থাকা কি ভালো? ... আমাদের ... উচিত ইংরজের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। রুশরাও ইংরেজদের নাস্তানাবুদ করছে। লোকজন আর অস্ত্রপাতি দিয়ে আমায় সাহায্য করলে আমি রামের ভূমিকা নেব' (ডেভিড আর্নল্ড, 'ড্যাকইটি অ্যান্ড রুরাল ক্রাইম ইন ম্যাড্রাস ১৮৬০-১৯৪', *জার্নাল অফ পেজান্ট স্টাডিজ*, জানুয়ারি ১৯৭৯)। পরবর্তীকালে রামরাজ্য বিষয়ে গান্ধীর ধারণা থেকে 'রামায়ণ' কাহিনীর এই ব্যবহার কিছু আলাদা বটে!

এই পর্বের সবচেয়ে সুপরিচিত জনগোষ্ঠী-বিদ্রোহ অবশ্য রাঁচির দক্ষিণাঞ্চলে ১৮৯৯-১৯০০-

য় বিরসা মুন্ডার 'উলগুলান' (বিরাট তোলপাড়)। নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক কে. সুরেশ সিং সম্প্রতি এ বিষয়ে চমৎকার পর্যালোচনা করেছেন। উনিশ শতক ধরে মুন্ডারা দেখেছিলেন, তাঁদের চিরায়ত 'খুণ্টকাট্টি' ভূমি-ব্যবস্থা ('খুণ্ট' বা জনগোষ্ঠী-বংশের যৌথ মালিকানা) উত্তরের সমভূমি থেকে ব্যবসাদার ও মহাজন হিসেবে আসা জাগিরদার ও ঠিকাদারদের হাতে পড়ে বিপন্ন হচ্ছে। ঠিকাদারদের খৎবদ্ধ মজুর জোগাড়ের এক সুখের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল এই অঞ্চল। পরের পর লুটেরান, অ্যাংলিকান ও ক্যাথলিক মিশন কিছু সাহায্যের আশ্বাস দেয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মূল ভূমিসমস্যা নিয়ে তারা কিছুই করে নি। ১৮৯০-এর দশকের গোড়ায় জনগোষ্ঠীর সর্দাররা কলকাতার এক ইঙ্গ-ভারতীয় উকিলের মারফত এই বহিরাগত ভূমি-অধিকারী ও 'বেত বেগারি' (জবরদস্তি খাটনি) প্রথা চাপানোর বিরুদ্ধে আদালতে লড়ার চেষ্টা করে। সেই উকিল কিন্তু তাদের ঠকিয়েছিল বলে মনে হয়। জনৈক মিশনারি জানিয়েছেন, সর্দারদের অভিযোগ ছিল এই : 'বিচার চেয়ে আমরা সরকারের কাছে আর্জি করেছিলুম, কিছুই পাই নি। মিশনে গেলুম, তারাও 'দিকু'দের হাত থেকে আমাদের বাঁচালে না। এখন আমাদের নিজেদের কোনো লোকের দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছু করার নেই।'

মুন্ডাদের ত্রাতা দেখা দিলেন বিরসা (আনু. ১৮৭৪-১৯০০) রূপে। তাঁর বাবা ছিলেন ভাগচাষী; মিশনারিদের স্কুলে তিনি কিছু লেখাপড়াও শিখেছিলেন। পরে তিনি পড়েন বৈষ্ণব প্রভাবে। ১৮৯৩-৯৪-এ বন বিভাগ গ্রামের পতিত জমি অধিগ্রহণ করতে গেলে তা আটকানোর আন্দোলনে তিনি যোগ দেন। বলা হয়, ১৮৯৫-এ তরুণ বিরসা দর্শন পান পরমেশ্বরের। তারপর তিনি দাবি করলেন : আমি প্রেরিত পুরুষ, রোগ সারাবার অলৌকিক ক্ষমতা আমার আছে। বিরসার 'নতুন কথা' ও আসন্ন প্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণী শুনতে চালকেড-এ জড়ো হতে লাগলেন হাজার হাজার মানুষ। এদিকে মূলত ধর্মীয় এই আন্দোলনে সর্দাররা জোগান দিতে শুরু করলেন কৃষিগত ও রাজনৈতিক ভাব। ১৮৯৫-এ ষড়যন্ত্রের ভয়ে ব্রিটিশরা বিরসাকে জেলে পোরে। কিন্তু তিনি ফিরে এলেন আরও অনেক আগুনরাঙা হয়ে। ১৮৯৮-৯৯ নাগাদ রাতের জঙ্গলে পরপর বেশ কয়েকটি জমায়েত হয়। সেখানে বিরসা নাকি 'ঠিকাদার, জাগিরদার, রাজা, হাকিম ও খ্রীস্টানদের খতম' করার ডাক দেন। তিনি আশ্বাস দেন যে 'জল হয়ে যাবে বন্দুক আর গুলি'। ভাবগম্ভীর রীতিতে দাহ করা হয় ব্রিটিশ রাজের কুশপুতুল। ঘৃণার সংরাগ-ভরা মন্ত্রে উৎসাহভরে সাড়া দিলেন মুন্ডারা :

> কাটং বাবা কাটং
> সাহেব কাটং কাটং, রারি কাটং কাটং ...
> (মারো, বাবা, মারো
> সাহেবদের মারো, অন্য জাতদের মারো ...)।

বিরসাপন্থীরা ইতোমধ্যেই প্রচুর খ্রীস্টান মুন্ডাকে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের নতুন একেশ্বর-বিশ্বাসের দিকে যার প্রেরিত পুরুষ হলেন বিরসা। ১৮৯৯-এ খ্রীস্টমাসের আগের দিন তাঁরা তীর ছুঁড়লেন, পুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন রাঁচি ও সিংভূমের ছ-টি থানার এলাকা জুড়ে সমস্ত গির্জা। জানুয়ারি ১৯০০ নাগাদ পুলিশই হয়ে দাঁড়াল আঘাতের প্রধান লক্ষ্য। ফলে রাঁচিতে দেখা দিল সত্যিকারের আতঙ্ক। ৯ জানুয়ারি সইল রকাব পাহাড়ে বিদ্রোহীরা অবশ্য পরাস্ত

হন। এর তিন সপ্তাহ পরে ধরা পড়েন বিরসা, জেলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বিচার হয় প্রায় ৩৫০ মুন্ডার, ৩ জনের ফাঁসি ও ৪৪ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। ১৯০২-১০-এর জরিপ ও বন্দোবস্তির কাজকর্ম আর ১৯০৮-এর ছোটোনাগপুর প্রজাস্বত্ব আইন অনেক দেরিতে হলেও 'খুন্টকাট্টি' অধিকারকে কিছুটা স্বীকৃত দেয়, নিষিদ্ধ হয় 'বেত বেগারি'। বিহারের কৃষককুলের বিরাট অংশের এক প্রজন্ম আগেই ছোটোনাগপুরের জনগোষ্ঠীর মানুষরা জমির ওপর তাঁদের অধিকারের কিছুটা আইনগত নিরাপত্তা আদায় করতে পেরেছিলেন ঃ উগ্র আন্দোলন সর্বদা বিফলে যায় না। ছোটো একটি ধর্মসম্প্রদায়ের উপগাতা হিসেবে, ও আরও ব্যাপকভাবে, অ-সাধারণ নাড়া দেওয়ার মতো কিছু লোকগীতির ভেতর দিয়ে বিরসার স্মৃতি এখনও জীবন্ত। সুরেশ সিং তাঁর ক্ষেত্রকর্মে সেসব গান লিখে রেখেছেন। সম্ভবত এটা খুব অপ্রত্যাশিত নয় যে, বিভিন্ন ও কখনও কখনও পুরোপুরি বিরুদ্ধ কারণে সম্মান পান বিরসা—পুরোদস্তুর জাতীয়তাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী ঝাড়খন্ডের প্রেরিত পুরুষ, বা চরম বামপন্থীদের বীরনায়ক হিসেবে। বিরসার ভেতর সচেতন কোনো জাতীয়তাবাদীকে খোঁজা অবশ্যই নিষ্ফল। সমস্ত অনাহূতের বিরুদ্ধে তাঁর জনগোষ্ঠীর এলাকাকে বাঁচানোর চেয়ে ব্যাপক কোনো দৃষ্টি তাঁর থাকার কথা নয়—তার মানে কিন্তু এই দাঁড়ায় না যে, তাঁর আন্দোলনের আদিবর্গীয় হলেও বুনিয়াদি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সারবস্তুকে অস্বীকার করাই অবধারিত।

ফড়কে

মহারাষ্ট্রে বাসুদেও বলবন্ত ফড়কে-র উত্থানে (১৮৭৯) যা ঘটেছিল, সেই সময়ের নিরিখে তা অনন্য ঃ সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের জাতীয়তাবাদ ও অনভিজাত মানুষের জঙ্গীপনার এক স্পল্পস্থায়ী সংযোগ। ফড়কে ছিলেন চিৎপাবন ব্রাহ্মণ, কমিসারিয়ট বিভাগের কেরানি। কিছু ইংরিজি শিক্ষাও তাঁর ছিল। মনে হয় সম্পদ নির্গম বিষয়ে রানাডে-র বক্তৃতা, ১৮৭৬-৭৭-এর ডেকান দুর্ভিক্ষের অভিজ্ঞতা, ও পুণার ব্রাহ্মণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেড়ে-চলা হিন্দু-পুনরুত্থানবাদী মনোভঙ্গির প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। পুলিশের চোখ এড়িয়ে মন্দিরে লুকিয়ে থাকার সময়ে তিনি আত্মজীবনীর কিছু কিছু টুকরো লেখেন। সেখানে তিনি স্মরণ করেছেন, কেমন করে এক গোপন দল জড়ো করে, ডাকাতি মারফত টাকা জোগাড় ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করে, সশস্ত্র বিদ্রোহ উস্কে দিয়ে আবার এক হিন্দু রাজ প্রতিষ্ঠার কথা তাঁর মাথায় এসেছিল। 'মানুষের মনে প্রচুর বিরাগ আছে, কয়েকজন যদি লাগিয়ে দিতে পারে তবে ভুখা লোকে যোগ দেবে।' এর অনেকখানির মধ্যেই পরবর্তী বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের স্পষ্ট ছায়া পড়েছে। অবশ্য লক্ষ্য করার হলো, ফড়কে-র চল্লিশজনের দলে মাত্র কয়েকজন ছিলেন ব্রাহ্মণ যুবক, অনেক বেশি ছিলেন নিচু জাতের রামোশী ও ধাঙ্গড়। এর পরিণাম দাঁড়িয়েছিল এক ধরনের সামাজিক ডাকাতি, যেখানে ডাকাতদের আশ্রয় দিতেন চাষীরা। ফড়কে-র গ্রেপ্তার ও যাবজ্জীবন দণ্ড হওয়ার পর দৌলত রামোশীর পরিচালনায় এক রামোশী ডাকাত-দল ১৮৮৩ অবধি কাজ চালিয়েছিল। অন্যদিকে, কোলি জনগোষ্ঠীর এক উপদলের কথা শোনা যায়, নির্মূল হওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁরা সাত মাসে ২৮টি ডাকাতি করেছিলেন। দেশের আরও অন্যত্র তাঁদের ভাইদের মতোই, কোলিদেরও এই অঞ্চলে তাঁদের পূর্বপুরুষদের ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছিল।

মোপলা

মালাবারের মোপলাদের উত্তাল ইতিহাস থেকে ভারতীয় পরিস্থিতির অন্য এক জটিলতা ধরা পড়ে—ভূস্বামী ও বিদেশী-বিরোধী অসন্তোষ প্রকাশের বাহ্যরূপ হিসেবে ধর্মীয় 'উন্মাদনা' কাজ করে কীভাবে। ১৪৯৮-এ পর্তুগিজরা যখন মশলার ব্যবসা দখল আর খুন-লুঠ করে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্যে এখানে আসে, তখন থেকেই মালাবারের মুসলমানদের এক অংশের মধ্যে ভীষণ শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী মেজাজ গড়ে ওঠে। তার প্রতিফলন ঘটেছে ১৫৮০-র দশকে লেখা জায়ন-আল-দিন-এর 'তুহ্ফত আল-মুজাহিদিন' ও 'কোতুপালি মালা'র মতো আজও জনপ্রিয় গীতিকায়, ধর্মযুদ্ধের শহিদদের যাতে সম্মান জানানো হয়েছে। ব্রটিশ শাসনে ভূস্বামী-স্বত্বের ওপরেই জোর দেওয়া হতো। ফলে হিন্দু উঁচুজাতের নাম্বুদ্রি ও নায়ার 'জেন্মি'দের (টিপু সুলতান যাদের অনেককে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন) অবস্থা ফেরে ও বাড়বাড়ন্ত হয়। এরই সঙ্গে প্রচুর মুসলমান ইজারাদার ('কনমদার') ও কৃষক ('বেরুম্পট্টমদার')—ওখানে যাঁদের মোপলা বলা হতো—তাঁদের অবস্থা পড়ে যায়। এর পরিণামে সেই মুহূর্তেই শক্তিশালী হলো নিজ সম্প্রদায়ের সংহতি। ১৮৩১-এ যেখানে মালাবারে মসজিদ ছিল ৬৩৭টি, ১৮৫১-য় তা বেড়ে দাঁড়াল ১০৫৮। তিরুরঙ্গাডি-র কাছে মামব্রুম-এর তাঙ্গলরা (সৈয়দ আলাবি ও তাঁর পরে তাঁর ছেলে সৈয়দ ফদল, ১৮৫২-য় ব্রিটিশরা যাঁকে নির্বাসিত করে) ক্রমেই মোপলা সমাজের ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আরও বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠলেন। অস্পৃশ্য চেরুমরদের অনেকে ইসলাম ধর্ম নিলেন। এতে ছিল খানিক সমতা ও সমাজিক মান-উন্নতির আশ্বাস। বাস্তবিকই দক্ষিণ মালাবারে এর্নেনাড় ও ভাল্লুভেনাড় তালুকে এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩৬ থেকে ১৮৫৪-র মধ্যে ২২টি ঘটনা নথিভুক্ত আছে। ১৮৮২-৮৫-তে আরও কয়েকটি অভ্যুত্থান ঘটে, আবারও ১৮৯৬-এ। এটি 'জেন্মি'দের সম্পত্তি আক্রমণ ও মন্দির অপবিত্র করার রূপ নেয়। এ ছিল অল্প কিছু মোপলার কয়েকটি দলের কাজ, তারপর পুলিশের গুলির মুখে কার্যত তাঁরা সমবেত আত্মহত্যা করেন। তাঁরা মৃত্যুবরণ করেছিলেন এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে শহিদ হয়ে তাঁরা সোজা বেহেস্ত যাবেন। সক্রিয় বিদ্রোহীর সংখ্যা ছিল কম ঃ ১৮৩৬ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে নথিভুক্ত ২৮টি অভ্যুত্থানে সব মিলিয়ে ৩৪৯। দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিচ্ছিন্ন বসতের কারণে দক্ষিণ মালাবারে সমবেত গণ-প্রতিরোধ ছিল কঠিন। মোপলা বিদ্রোহগুলি তাই 'গ্রামীণ সন্ত্রাসবাদের এক বিচিত্র রূপ ... সম্ভবত জেন্মি-দের বর্ধিত ক্ষমতা রোখবার ও যে সব মোপলা নিজেরা যোগ দেন নি তাঁদের ঐহিক উপকারের পক্ষে এটি ছিল সবচেয়ে কার্যকর উপায়।' ১৯১১ অবধি মোপলাদের আক্রমণের শিকার হয়েছিলেন ৮২ জন, তার মধ্যে ৬২ জনই উচ্চবর্ণের হিন্দু (২২ জন নাম্বুদ্রি ও ৩৪ জন নায়ার)। আর যে ৭০ জনের শ্রেণীগত পশ্চাৎপট বার করা গেছে তাঁদের ৫৮ জনই জেন্মি ও বা মহাজন (কনরাড উড, 'পেজান্ট রিভোল্ট ঃ অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন অফ মোপলা ভাইওলেন্স ইন দি নাইনটিন্থ অ্যান্ড টুয়েনটিথ্ সেঞ্চুরিজ', ডিউই ও হপকিন্স সম্পা., *দি ইম্পিরিয়াল ইম্প্যাক্ট ঃ স্টাডিজ ইন দি ইকনমিক হিস্ট্রি অফ আফ্রিকা আন্ড ইন্ডিয়া*, লন্ডন, ১৯৭৮)। বেশিরভাগ মোপলা শহিদই ছিলেন গরিব চাষী বা ভূমিহীন মজুর। কিন্তু তাঁরা সাধারণত অবস্থাপন্ন কনমদার ও ছোটো ব্যবসাদারদের সহানুভূতি পেতেন। মোপলাদের জন্যে অস্ত্রবোঝাই জাহাজ আসছে—এ ছিল বহুব্যাপক বিশ্বাস।

ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে প্রশান্ত মহাসাগরের মেলানেশিয়া দ্বীপের 'জাহাজি মাল-ভজনা'র সঙ্গে এই অতিকথার চমকদার মিল আছে, পিটার ওর্সলি-র মতো নৃতত্ত্ববিদ্‌রা এ নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। মোপলা অসন্তোষের বীজ ছিল স্পষ্টতই কৃষিগত। ১৮৬২ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে দক্ষিণ মালাবারের বিভিন্ন তালুকে খাজনা নিয়ে মামলা ২৪৪% ও উচ্ছেদের আদেশ (ডিক্রি) ৪৪১% বেড়ে যায়। হিন্দু চাষীরাও দুর্দশা ভোগ করতেন কিন্তু তাদের প্রতিরোধের রূপ ছিল আলাদা। বলা হয়েছে, ১৮৬০ ও ১৮৭০-এর দশকে মালাবারের গ্রামে গ্রামে অনেক হিন্দু ডাকাত দল সক্রিয় ছিল। ইসলাম দিতে পারত ভাবী সুখরাজ্যের ভাবাদর্শ। তেমন কিছুর অভাবে হিন্দু চাষীর অসন্তোষ সামাজিক ডাকাতির স্তর ছাড়িয়ে উঠতে পারে নি।

ডেকানের দাঙ্গা-হাঙ্গামা

কোনো এক ধরনের আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্য স্থির করে যেসব বিস্ফোরণ হয়েছে, এতক্ষণ আমরা সেগুলি নিয়েই আলোচনা করছিলাম। এদের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত থাকত প্রবল ধর্মীয় বা ভাবী সুখরাজ্যের সুর (সামাজিক পরিবর্তনের কোনো ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক ভাবাদর্শের অভাবে তা-ই স্বাভাবিক) আর তার মূল নিহিত ছিল ভারতীয় সমাজের সবচেয়ে গহন স্তরে—জনগোষ্ঠী ও গরিব কৃষককুলের মধ্যে। কিন্তু অন্য এক ধরনের গ্রামীণ প্রতিবাদের পরম্পরাও ছিল। বিশেষ কোনো অভিযোগের ফুলকি থেকে তার আগুন জ্বলে ওঠে, লক্ষ্যও থাকে নির্দিষ্ট ও সীমিত, আর তার নেতৃত্ব ও সমর্থনের অনেকখানিই আসে কৃষককুলের তুলনায় অবস্থাপন্ন অংশ থেকে। যেমন, ১৮৬০ -এর দশকে তুলোর রমরমার সময়ে মহারাষ্ট্র ডেকান-এ ধনী চাষীর উন্নতি হয়, আবার তার পরের দশকেই দাম পড়ে যাওয়ার দরুণ হঠাৎই তা থমকে যায়। সেই সঙ্গে ১৮৬৭ থেকে ভূমি-রাজস্বও ভীষণ চড়ে গিয়েছিল। এরই ফলে ঋণের দায় হয়ে উঠল বহুব্যাপ্ত, আর মানুষের রাগের অনিবার্য লক্ষ্য হয়ে উঠল বাইরে থেকে আসা মারোয়াড়ি মহাজন। মে-সেপ্টেম্বর ১৮৭৫-এ পুণা ও আহ্‌মেদনগর জেলায় ৬টি তালুকের ৩৩টি জায়গায় দেখা দিল সাবকর-বিরোধী ডেকান হাঙ্গামা। তার রূপ ছিল ঃ পরম্পরাগত মোড়ল (পাটীল)-দের নেতৃত্বে ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীদের জোর করে সব ঋণপত্র কেড়ে নেওয়া। যেসব অঞ্চলে মহাজনরা বাইরে থেকে আসে নি, স্থানীয় ছোটো জমি-মালিক বা ধনী কৃষকরাই যেখানে মহাজনি বা ব্যবসায় নেমেছে (যেমন, রত্নগিরির খোত-রা), সেখানে হাঙ্গামা ছিল বিরল—এর একটা তাৎপর্য আছে। গোলমালের চার বছর পরে ১৮৭৯-এর ডেকান কৃষক ত্রাণ আইনে বিচার পদ্ধতি ও প্রতিকারের ব্যবস্থা মজবুত হওয়ায় অবস্থাপন্ন চাষীদের খানিক সীমিত সুরক্ষা জোটে।

পাবনা

মহাজন-বিরোধী দাঙ্গা বাঙলায় (জনগোষ্ঠীর এলাকা বাদে) হয়েছিল কমই, কারণ এখানেও মহাজনরা প্রায়শই ছিল স্থানীয় ধনী চাষী বা জোতদার। উৎপাদনের জন্যে যে-কোনো ক্ষেত্রেই ঋণ ছিল বেশ অপরিহার্য। অন্যদিকে, জমিনদারদের কোনো উৎপাদনশীল ভূমিকা ছিল না। ১৮৭০-এর দশকে ও ১৮৮০-র দশকের গোড়ায় 'চড়া মাত্রার জমিদারি'র দাবির ফলে পূর্ববঙ্গের বহু জায়গায় বেশ কিছু রায়তের মধ্যে ব্যাপক প্রতিরোধ দেখা দেয়। ঝড়ের কেন্দ্র ছিল তুলনায়-

সমৃদ্ধ জেলা, পাবনা। এখানে বিস্তর দু-ফসলি জমি ছিল, আর ছিল পাটের রমরমা ব্যবসা। এখানকার ৫০%-এরও বেশি আবাদকারী ১৮৫৯-এর দশ আইন অনুযায়ী বর্গাদারি অধিকার (যাতে উচ্ছেদ না-হওয়ার নিরাপত্তা ও খাজনা বাড়ানোয় কিছু নিয়ন্ত্রণ পাওয়া যেত) অর্জন করতে পেরেছিলেন। তবু ১৭৯৩ থেকে ১৮৭২-এর মধ্যে জামিনদারি খাজনা বেড়েছিল সাতগুণ। ১৮৬০-এর দশকে ও ১৮৭০-এর দশকের গোড়ায় ভূস্বামীরা নানারকম আবওয়াব-এর মাধ্যমে খাজনা বাড়ানোর যৌথ প্রচেষ্টা চালায়। যথেচ্ছ ছোটো মান-এককে জমি মাপা হতো, ফলে আবাদি এলাকার পরিমাণ আপনিই বেড়ে যেত। সেই সঙ্গে ছিল শারীরিক নিগ্রহ। এ সবেরই অর্থ দাঁড়ায় ঃ দখলি রায়তদের নতুন পাওয়া নিরাপত্তার ওপর আক্রমণ। ১৮৭৩-এ পাবনার ইউসুফশাহী পরগনার চাষীরা এক কৃষক সমিতি গড়ে তোলেন। মামলার খরচ চালানোর জন্যে এঁরা টাকা তুলতেন, মোষের শিঙে ফুঁকে, ঢাক বাজিয়ে বা রাতে চেঁচিয়ে গ্রামে-গ্রামান্তরে লোক ডেকে জনসভা করাতেন, আর মাঝে মাঝে বন্ধ করতেন খাজনা দেওয়াও। পরের দশকে পূর্ববঙ্গের একাধিক প্রতিবেশী জেলা (ঢাকা, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, বগুড়া, ও রাজশাহী) থেকে একই ধরনের আন্দোলনের খবর পাওয়া যায়। কলকাতার জমিনদার মহলে কৃষক উগ্রতা ও বিদ্রোহ সম্বন্ধে নানা আতঙ্কের কথা সত্ত্বেও ঘটনা এই যে, রায়তদের প্রতিরোধ ছিল প্রধানতই আইনানুগ আর, পাবনার কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বাদে, শান্তিপূর্ণ। আন্দোলনের লক্ষ্যও ছিল মোটামুটি সীমাবদ্ধ। খাজনা-বন্ধ ছিল কিছু নির্দিষ্ট দাবির আদায়ের উপায়—যেমন, মাপের মান বদলানো, বে-আইনি আবওয়াব রদ ও খানিক খাজনা কমানো, তার বেশি কিছু নয়। পাবনা বিক্ষোভ সচেতনভাবে ব্রিটিশ-বিরোধীও ছিল না; বাস্তবিকই রায়তদের সবচেয়ে প্রান্তিক দাবি ছিল ঃ তাঁরা 'মহারানীর রায়ত ও শুধু তাঁরই রায়ত হতে' চান। ঠিক সামনের অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দূরের মালিকের কাছে এরকম আবেদন অবশ্য কৃষক-আন্দোলনে বিরল নয়। জুলাই ১৮৭৩-এ ছোটোলাট ক্যাম্বেল-এর মতো কর্তাব্যক্তিদের আপাত কৃষক-পক্ষীয় প্রয়াসে চাষীরা উৎসাহ পান। তাঁর এক ঘোষণায় কৃষক জোটগুলিকে বৈধ বলে মেনে নেওয়া হয়, যদিও তাতে হিংসার নিন্দা করা হয়েছিল।

পাবনা সমিতি ও অন্যান্য জেলার একই ধরনের আন্দোলন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে খুবই বিচিত্র প্রতিক্রিয়া জাগায়। জমিদার-প্রধান ব্রিটিশ-ভারতীয় সভা (ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) ছিল ঘোর শত্রুভাবাপন্ন। তার মুখপাত্র *হিন্দু প্যাট্রিয়ট*-এ পাবনা আন্দোলনকে হিন্দু ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে মুসলমান চাষীদের সাম্প্রদায়িক বিক্ষোভ হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়। আসলে, ঘটনাচক্রে পাবনার চাষীদের বড় অংশই যদিও সত্যিই ছিলেন মুসলমান, আর তাঁদের জমিনদাররা হিন্দু, তাহলেও সাম্প্রদায়িক উপাদান তখনও পর্যন্ত প্রায় ছিলই না (এর ঠিক উল্টো দিকে, বিশ শতকে প্রায়শই এর বিপরীত ব্যাপারই ঘটবে)। কৃষক সমিতির তিন প্রধান নেতা ছিলেন খুদে জমি-মালিক ঈশানচন্দ্র রায়, গ্রামের মোড়ল শম্ভু পাল (দুজনেই বর্ণহিন্দু) আর মুসলমান জোতদার খুদি মোল্লা। প্রসঙ্গত, যেসব জমিনদার মুখ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হন তাঁদের মধ্যে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য' কঠোর ব্যবস্থা নিতে ইনি জুলাই ১৮৭৩ -এ সরকারের কাছে আর্জি জানান। বড় জমিনদারির সঙ্গে যাঁদের যোগ তুলনায় কম এমন বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী আরও সহানুভূতিসূচক

মনোভাব দেখিয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত-র 'পেজান্ট্রি অফ বেঙ্গল' (১৮৭৪)-এ ও কিছুকাল পরে ১৮৮৫-র প্রজা আইনের আগে প্রজাদের অধিকারের সমর্থনে ভারতসভা-র প্রচার অভিযানে (যাতে এমনকি অনেক রায়ত-সভাও করা হয়েছিল) তার প্রমাণ মেলে। প্রজা আইনে দখলি স্বত্ব সংরক্ষিত ও কিছুটা বর্ধিত হয়। পাবনা আন্দোলন, পরে ভারতসভা-র প্রচার-আন্দোলন বা সরকারি আইন—কোথাওই দখলি-দাবিহীন কৃষক, ভাগচাষী বা কৃষি-শ্রমিকদের নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনার ব্যাপার নেই—এও অন্তত সমান তাৎপর্যপূর্ণ। ইতোমধ্যেই দখলি রায়তরা প্রয়াশই তাঁদের জমি কোরফা রায়তদের দর-ইজারা দিয়েছিলেন। কোরফা রায়তরা ছিলেন পুরোপুরি অরক্ষিত আর দখলি স্বত্বের সঙ্গে প্রকৃত চাষকে যুক্ত করার দিকে কখনোই জোর দেওয়া হয় নি। কৃষক বিক্ষোভ ও বাঙলার প্রজা আইনের এই সমগ্র পর্বের শেষ পরিণাম হয়েছিল জোতদার গোষ্ঠীর বাড়াবাড়ন্ত অবস্থাকেই লালন করা। পরে দেখা গেল, জমিনদারদের মতোই তারা শোষণকারী ও পরজীবী, আর এরাই ক্রমে জমিনদারদের জায়গায় আসবে।

রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলন

অস্থায়ী বন্দোবস্তের রায়তওয়ারি অঞ্চলে ব্রিটিশরা ভূমি-রাজস্ব বাড়ানোর চেষ্টা করলে মাঝে মাঝে আর-এক ধরনের গ্রামীণ প্রতিবাদ জেগে উঠত। এর লক্ষণ ছিল ঃ মতের ব্যাপক ঐক্য, স্থানীয় নামী লোকদের নেতৃত্ব আর বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের তরফে অনেক বেশি স্বার্থহীন সমর্থন। যেমন, আসামের কামরূপ ও ডরং জেলা। ১৮৯৩-৯৪-এর নতুন রাজস্ব বন্দোবস্তে এখানে খাজনার পরিমাণ বাড়ে ৫০% থেকে ৭০%। এর মোকাবিলায় গ্রামের শিরোমণিদের (ব্রাহ্মণ, গোহাঞি ও দলুই) নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের গণসভা, 'রাইজ মেল' সংগঠন রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে। গণসম্মত সিদ্ধান্ত লঙ্ঘন করে যারা সরকারের কাছে নতি স্বীকার করত, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হতো সামাজিক বর্জন (বয়কট) ও জাতিচ্যুতির অস্ত্র। এইভাবে, শাসকদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হয়েছিল পরম্পরাগত বর্ণ-উপকরণ। মধ্যশ্রেণীর জাতীয়তাবাদ যে-পদ্ধতি ১৯০৫-এর পর থেকেই শুধু ব্যবহার করতে শুরু করে, এখানে তা এক দশকেরও বেশি আগে করা হয়েছিল। কয়েকটি বাজারও লুঠ হয়, আর জানুয়ারি ১৮৯৪-এ রঙ্গিয়া ও পাথারুঘাটে পুলিশ দুবার গুলি চালায়। রাজস্ব কমানোর দাবি সমর্থন করে জোরহাট সার্বজনিক সভা। বাঙলার নরমপন্থী কংগ্রেস নেতা রাসবিহারী ঘোষও সাম্রাজ্যিক আইন পরিষদে বিষয়টি তোলেন। অবশেষে কিছু ছাড় পাওয়া যায়। সামাজিক মানদণ্ডের অন্য প্রান্তে, লোকস্মৃতিতে কিন্তু কয়েকজন অনভিজাত সংগ্রামীর নাম সুরক্ষিত হয়েছে, যেমন, সরুখেত্রীর কাঁসারি, পুষ্পরাম কানহার।

১৮৯৬-৯৭-এ মহারাষ্ট্র ডেকানে দুর্ভিক্ষ দশার দরুণ ফসলের গোলা লুঠ হয় ও দুর্ভিক্ষ বিধি মোতাবেক রাজস্ব মকুবের দাবি ওঠে। সরকার তা নাকচ করে দেয়। টিলক তখন পুণা সার্বজনিক সভা দখল করেছেন। তার পক্ষ থেকে অক্টোবর ১৮৯৬ ও এপ্রিল ১৮৯৭-এর মধ্যে গ্রামে গ্রামে প্রতিনিধি পাঠানো হয়। উদ্দেশ্য ছিল ঃ দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতিতে রায়তদের আইনগত অধিকার সম্বন্ধে লোককে অবহিত করা। সরকার গুরুতর শঙ্কিত হয়ে ওঠে ও বলে, জাতীয়তাবাদীরা আইরিশ বিক্ষোভ-প্রচারকদের কায়দা নিয়েছে। আসলে, টিলকের আন্দোলন

অনেকটাই সভা আর ইস্তাহার বিলি করার গণ্ডিতেই আটকে ছিল, যদিও থানা, কোলাবা ও রত্নগিরির মতো জেলায় এক ধরনের স্বল্পস্থায়ী রাজস্ব-বন্ধ জোটও চালু করা হয়। জনগণের চাপে ও তার সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর কিছু উদ্যোগে আবার এখানে তারই পূর্বসূচনা দেখা যায়, গান্ধীর নেতৃত্বে যা হয়ে উঠেছিল বাঁধাগত জাতীয়তাবাদী কৌশল। ফডকে-র আন্দোলনের মতোই, জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভ-প্রচারকরা সরে দাঁড়ানোর পরেও জন-প্রতিরোধ অব্যাহত ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্য বিভাগে (মহারাষ্ট্রের মধ্যভাগ, পুণার চারধারে) রাজস্ব না-দেওয়ার দরুন অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোকের ঘটনার বার্ষিক গড় ১৮৯২-৯৭-এ ২৬ থেকে বেড়ে ১৮৯৭-৯৮-এ ১৯৪ ও ১৮৯৮-৯৯-এ ২২৬৯ হয়ে দাঁড়ায়। ১৮৯৯-১৯০০-র দুর্ভিক্ষের পর সুরাট, নাসিক, খেড়া, আহ্‌মেদাবাদ, ও আশপাশের জেলা থেকে ধনী চাষী ও মহাজনদের নেতৃত্বে রাজস্ব-বন্ধ জোটের কথা শোনা যায়, যদিও পূর্ব-পুণা সার্বজনিক সভা ততদিনে মোটামুটি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল।

এতক্ষণ আমরা যে-ধরনের সঙ্ঘাত অনুধাবন করেছি, সব সঙ্ঘাতই যদি সেই ধরনের হতো—অর্থাৎ, দিকু, মহাজন, জমিনদার ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের শোষণের বিরুদ্ধে মোটের ওপর সরাসরি প্রতিরোধ আন্দোলন—তবে আধুনিক ভারতের ইতিহাস হতো তুলনায় অনেক সরল। কিন্তু ভারতীয়দের বিশাল সংখ্যাগুরু অংশ জাতপাত বা ধর্মের নিরিখে ভাগাভাগিতে অভ্যস্ত ছিল। প্রায়শই তা শ্রেণীগত পার্থক্যকে ছাপিয়ে যেত বা আবছা করে দিত। উপনিবেশবাদকে প্রায়ই আধুনিকীকরণের শক্তি হিসেবে দাবি করা হয়; বাস্তবে কিন্তু নানা উপায়ে তা পরম্পরাগত আনুগত্যকেই জোরদার করেছিল।

জাতপাতের চেতনা

জাতপাত নিয়ে হালের সমাজতাত্ত্বিক গবেষণায় একটি বিষয়ের ওপর বেশি করে জোর দেওয়া হচ্ছে। সেটি হলো ঃ এই অর্থবহ এককগুলি এখানে ঠিক বিমূর্ত অর্থে 'বর্ণ' নয় (সংস্কৃত রচনা যেমন তত্ত্বগত সর্বভারতীয় সোপানের বর্ণনা আছে), এ হলো নানা স্থানীয় 'জাতি'র সমাহার; পেশাগত অভিন্নতা, সাধারণ আচার-অনুষ্ঠান, আর গোষ্ঠীর বাইরে বিয়ে বা খাওয়া-দাওয়া বাধানিষেধের নানা মাত্রা দিয়ে তা একত্র। জাতপাতের চূড়ান্ত অনড় ও অপরিবর্তনীয় সোপানের পুরনো ধারণাও বর্জন করা হয়েছে। পরম্পরাক্রমে উঁচু গোষ্ঠীর আচার-ব্যবহার ও বাধানিষেধ ধার করে অন্যান্য জাত নিজেদের আরও উন্নত মর্যাদার কথা জাহির করছে—সাম্প্রতিক ও তত-সাম্প্রতিক নয় এমন অতীতে তার অজস্র দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করা হয়েছে। একেই এম এন শ্রীনিবাস 'সংস্কৃতায়ন'-প্রবণতা আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশপূর্ব ভারতে পাকাপাকি কোনো রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা ছিল না, উদ্বৃত্ত জমি থাকার ফলে দেশান্তরে যাওয়া যেত অনায়াসে। তার ফলে জাতপাতের সচলতাও ছিল সহজ। যেমন, মধ্যযুগের বাঙলায় সদ্গোপরা আদতে ছিলেন গোয়ালা 'গোপ' সম্প্রদায়। সেখান থেকে তাঁরা চাষী ও ব্যবসাদারে উন্নীত হন। দেশান্তরী হয়ে তাঁরা চলে আসেন বাঙলা-বিহার সীমানার অহল্যাভূমিতে, কখনও কখনও স্থানীয় প্রতিপত্তিও অর্জন করেন। ঔপনিবেশিক পর্বে এসব পথ বন্ধ বা খর্ব হয়ে যায়, কিন্তু খুলে যায় অন্যান্য রাস্তা। নতুন রাজত্ব বার করে নেওয়া ছিল অসম্ভব, অহল্যাভূমিও ক্রমেই আসছিল

কমে। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে ব্যাপকতর সংযোগ সম্ভব হয়েছিল। ছোটো কিন্তু বাড়ন্ত সংখ্যালঘু অংশের কাছেও ইংরিজি শিক্ষা হয়ে উঠছিল আরও বেশি করে সামাজিক উন্নতির নতুন ধাপ। ঔপনিবেশিক শোষণের সঙ্গে জড়িত ছিল (আমরা যেমন দেখেছি) পর্যায়-বিভাগের এক পদ্ধতি। ভারতের কিছু কিছু গোষ্ঠী এতে অন্যদের বঞ্চিত করে নিজেরা লাভবান হয়েছিল। ১৯০১-এর আদমশুমারির সময় থেকে 'দেশীয় জনমত কর্তৃক স্বীকৃত সামাজিক পূর্বদৃষ্টান্ত'-র ভিত্তিতে প্রতি দশক অন্তর বর্গকরণের চেষ্টা করে ব্রিটিশরাও তা'তে সরাসরি সাহায্য করেছিল। এর অব্যবহিত ফল হিসেবে দাবি ও পাল্টা-দাবির বান ডাকে। কে বড়—সেই নিয়ে জাতের নেতারা গোঁতাগুঁতি করতে লাগল, জাত-ভিত্তিক সমিতি গড়ল—আর উদ্ভাবন করল পৌরাণিক জাতীয় 'ইতিহাস'। এই নতুন পরিস্থিতিতে অন্তত দুভাবে জাতের সংহতিতে ইন্ধন জোগানো হয়। জাতের সফল নেতৃস্থানীয় লোকেরা দেখেন, সামাজিক স্বীকৃতি, চাকরি ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণ আদায়ের লড়াইতে (যা স্বভাবতই বেশ সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থসর্বস্ব) জাতভাইদের সমর্থন জোগাড় করা দরকার। ১৮৮০-র দশক ইস্তক আস্তে আস্তে নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতির সূচনা থেকে এই পদ্ধতিতে আরও বেশি উৎসাহ জুটে যায়। জাতের দরিদ্রতর লোকদের ক্ষেত্রে, মনে হয়, প্রায়শই জীবনে আরও সফল সহ-সদস্যদের সঙ্গে পৃষ্ঠপোষণের এই যোগসূত্রই ছিল কঠোর ও ক্রমেই আরও বেশি বেগানা জগতে টিঁকে থাকার একমাত্র উপায়।

এক ধরনের জাত-সংহতির ভ্রান্ত-চেতনা, জাত নিয়ে রেষারেষি ও সংস্কৃতায়নের আন্দোলন—এগুলির মধ্যে দিয়ে সামাজিক-আর্থনীতিক টানাপোড়েনের অভিব্যক্তিই ছিল প্রায়শ এর নিট ফল। যেমন জৌনপুরের (পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ) এক গ্রাম নিয়ে বার্নার্ড কোন-এর পর্যালোচনায় দেখা গেছে, চামাররা কীভাবে সান্ত্বনা পেয়েছিলেন শিব-নারায়ণ সম্প্রদায়ের ধর্মমতে। ব্রাহ্মণ্য রূপকে (যেমন, গোমাংস খাওয়ায় বাধানিষেধ) নকল করে তাঁরা তাঁদের সামাজিক অবস্থানকে ওপরে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এঁরা ছিলেন প্রধানত ছোটো চাষী বা ভূমিহীন মজুর, এঁদের থাকতে হতো রাজপুত ঠাকুর জমি-মালিকদের তাঁবে। দেশের অন্য প্রান্তে, কেরলের অচ্ছুৎ এজাভারা বিশ শতকের গোড়া থেকেই ব্রাহ্মণ প্রভুত্বকে আক্রমণ করার অনুপ্রেরনা পান নানু আসন (শ্রীনারায়ণ গুরু, আনু ১৮৫৪-১৯২৮)-এর কাছে। তাঁরা সব মন্দিরে ঢোকবার দাবি জানান আর নিজেদের কিছু রীতিনীতির সংস্কৃতায়নে'র চেষ্টা করেন। ঘটনাক্রমে পরবর্তীকালে এজাভারা হয়ে ওঠেন কেরলের কমিউনিস্টদের সবচেয়ে দৃঢ় সমর্থক। ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ এতদূর অবধি বলেছেন যে, সময়ে সময়ে জাতি-ভিত্তিক সমিতি ছিল 'সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষক জনগণের সংগ্রামে রুখে দাঁড়ানোর প্রথম রূপ', যদিও সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও যোগ করেছেন যে 'শ্রেণী হিসেবে সংগঠিত করতে হলে চাষীদের ওপর জাত-ভিত্তিক সংগঠনের কব্জা ভাঙতে হবে' (*ন্যাশনাল কোশ্চেন ইন কেরালা*, বোম্বাই, ১৯৫২, পৃ. ১-২)।

দক্ষিণ তামিলনাড়ুর নাদার-দের উত্থান নিয়ে হার্ডগ্রেভ-এর বিস্তারিত পর্যালোচনায় দেখা যায়, আদিতে যাঁদের 'শানান' বলা হতো, সেই অচ্ছুৎ মানুষরা তাড়ি তৈরি ও খেতমজুরের কাজ করতেন। তাঁদের মধ্যে বাণিজ্যজীবী একটি উঁচু স্তর গড়ে উঠল। ১৯০১-এর আদমশুমারিতে তাঁরা ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দাবি করলেন ও নিজেদের নাদার বলতে শুরু করলেন

(শব্দটি আগে জমি ও তালগাছের মালিক শানানদের বোঝাতে ব্যবহার হতো)। ১৮৯৯-এ তাঁরা মন্দিরে ঢোকার অধিকার জাহির করলেন, সেই নিয়ে তিরুনাভেলিতে গুরুতর দাঙ্গা হয়। একইভাবে ১৮৭১ থেকে উত্তর-তামিলনাড়ুর পল্লী-রা নিজেদের ক্ষত্রিয় উৎস দাবি করেন এবং বন্নিয়া কুল ক্ষত্রিয় বলতে শুরু করেন ও বিধবার পুনর্বিবাহ-নিষেধের মতো ব্রাহ্মণ্য আচারপালন করতে আরম্ভ করেন। মহারাষ্ট্রের মাহার-রা, পরে যাঁরা ছিলেন আম্বেডকরের আন্দোলনের মেরুদণ্ড স্বরূপ, উনিশ শতকের শেষ নাগাদ গোপাল বাবা ভালংকর নামে এক প্রাক্তন সামরিক কর্মচারীর নেতৃত্বে জোট বাঁধতে শুরু করেন। ১৮৯৪-এ ভালংকর এক আবেদনপত্রের মুসাবিদা করলেন। সেখানে তাঁদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করা হয় ও অধস্তন গ্রাম-কর্মচারীদের (চৌকিদার, স্থানীয় সালিশ, হরকরা, ঝাড়ুদার ইত্যাদি) জন্যে সেনাবাহিনী ও সরকারি চাকরিতে আরও বেশি কাজ চাওয়া হয়। এঁদের কিছু কিছু পরম্পরাগত পেশা ব্রিটিশ শাসনে বিপর্যস্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে কিছুকাল সামরিক চাকরি করে তাঁরা নতুন নতুন সুযোগও পান। সেনাবাহিনীতে নিয়োগের ব্যাপারে উত্তর-ভারতের 'সামরিক জাতিগুলি'র ওপর নতুন গুরুত্ব দেওয়াতেই মাহারদের জোট বাঁধার ব্যাপারে আগুনে ঘি পড়ে।

মোটের ওপর, আলোচ্য পর্বে বেশি ফলদায়ী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা ছিল মধ্যবর্তী স্তরের, যারা দ্বিজাতির নিচে ও অচ্ছুৎদের ওপরে। এদের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যায় জমি-মালিক ও ধনী চাষীও ছিলেন, শহরে শিক্ষিত গোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষমতাও তাঁদের ছিল। উনিশ শতকের শেষভাগ নাগাদ মহারাষ্ট্রে ও মাদ্রাজে চাকরি ও সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনে ব্রাহ্মণদের সুস্পষ্ট প্রাধান্যের দরুণ ব্রাহ্মণ-বিরোধী নানা আন্দোলনের সূত্রপাত হচ্ছিল। মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্মণ-বিরোধী দুন্দুভিতে প্রথম আওয়াজ তোলেন জ্যোতিবা ফুলে তাঁর বই *গুলামগিরি* (১৮৭২) ও তাঁর সংগঠন স ত্য শো ধ ক স মা জে র মধ্যে দিয়ে। 'ভণ্ড ব্রাহ্মণ ও তাদের সুবিধাবাদী শাস্ত্রের কবল থেকে নিচু জাতদের' রক্ষা করা দরকার —এ কথাই সেখানে বলা হয়। নিচু মালি জাতের এক শহরে-শিক্ষিত মানুষ শুরু করেন এই আন্দোলন, পরে তা কৃষকপ্রধান জাতি-সমবায়ের মধ্যে কিছুটা শেকড় গাড়ে। গেল ওমভেট-এর মূল্যবান্ সাম্প্রতিক পর্যালোচনায় (*কালচারাল রিভোল্ট ইন এ কলোনিয়াল সোসাইটি : দি নন্-ব্রাহ্মণ মুভমেন্ট ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া,* ১৮৭৩-১৯৩০) সত্যশোধক আন্দোলনের ভেতরকার এক দ্বিধার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে 'এক শিরোমণি ভিত্তিক রক্ষণশীল ধারা ও আরও আঁকাড়া এক গণ-ভিত্তিক র‍্যাডিকালিজম'—দুই-ই ছিল। প্রথমটির বিকাশ ঘটে নরমপন্থী 'সংস্কৃতায়নে'র পথ ধরে, মারাঠাদের ক্ষত্রিয় উৎসের কথা মাঝে মধ্যে দাবি করা হয়। ১৮৯০-এর দশক থেকে তা কোল্হাপুরের মহারাজার পৃষ্ঠপোষণ পেতে থাকে। এটি ছিল খোলাখুলিই রাজভক্ত ও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভেদমূলক। টিলকের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা তাতাচ্ছিল কোল্হাপুরকে আর ১৯১৯-এর পর ভাস্কররাও যাদবের অ-ব্রাহ্মণ দল ছিল প্রচণ্ড কংগ্রেস-বিরোধী। কিন্তু দ্বিতীয় একটি ধারাও ছিল। সেটি কাজ করত শহরে নয়, গ্রামে (উনিশ শতকের অন্যান্য সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের বেশির ভাগ থেকেই যা আলাদা), আর ইংরিজির বদলে ব্যবহার হতো মারাঠি। এই ধারাটি খোদ জাত-ব্যবস্থাকেই আক্রমণ করেছিল, শুধুই তার মধ্যে উঁচু মর্যাদা দাবি করে নি। 'শেঠজী ভাটজী' (মহাজন ও ব্রাহ্মণ)-র বিরুদ্ধে এঁরা 'বহুজন সমাজে'র মুখপাত্র হওয়ার

এখতিয়ার চাইতেন। ১৯১৯-২১-এ সাতারায় কৃষক-উত্থানকে তা অনুপ্রাণিত করে ও পরে গ্রামীণ মহারাষ্ট্রে গান্ধীপন্থী কংগ্রেসকে পুনর্জীবিত করার সহায় হয়। অল্প কিছু পরে দেখা যায় প্রায় একই ধরনের ছক। শিক্ষা ও চাকরিতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ছিল অবিসংবাদিত (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির জনসংখ্যার ৩.২% ছিল ব্রাহ্মণ কিন্তু ১৮৭০ থেকে ১৯১৮-র মধ্যে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭০% স্নাতক ছিলেন তাঁরাই)। সে-আধিপত্য শিক্ষিত তামিল ভেল্লালা, তেলেগু রেড্ডি ও কাম্মা, ও মালয়ালি নায়ারদের চ্যালেঞ্জ-এর মুখে পড়ে। ডিসেম্বর ১৯১৬-র অ-ব্রাহ্মণ ইশ্‌তেহার-এ এই চ্যালেঞ্জ-এর উপ-শিরোমণি চরিত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সেখানে প্রায়ই বলা হয়েছে, অ-ব্রাহ্মণরাই 'করদাতাদের বড় অংশ, তার গরিষ্ঠ ভাগই জমিনদার, জমি-মালিক, ও কৃষিজীবী...'। পরিণামে যা এক ধরনের 'দ্রাবিড়ীয়' বা তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদ হয়ে দাঁড়াল, তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল ব্রিটিশরাই। ইর্শচিক-এর পর্যালোচনায় তার প্রচুর প্রমাণ মেলে। ১৯২০-র ও '৩০-এর দশকের জাস্টিস (ন্যায়বিচার) দলের ক্ষেত্রে এটি বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু তার অনেক আগে, ১৮৮৬-তে মাদ্রাজের এক লাটের সমাবর্তন-ভাষণটি পড়তে ইন্টারেস্টিং লাগে : 'তোমরা বিশুদ্ধ দ্রাবিড় জাতি (রেস)। তোমাদের মধ্যে সংস্কৃত-পূর্ব উপাদানটি আরও বেশি আত্ম-পরিব্যক্ত হচ্ছে—এটাই আমি দেখতে চাই। ... আমাদের, ইংরেজদের চেয়ে তোমাদের সঙ্গে সংস্কৃত-র যোগ আরও কম। বদমাশ ইওরোপীয়রা কখনও কখনও ভারতীয় অধিবাসীদের "নিগার" (কেলে) বলে—এমন শোনা যায়। কিন্তু গর্বিত সংস্কৃত-ভাষী বা লেখকদের মতো তারা দাক্ষিণাত্যের লোকদের বাঁদরের পাল বলে না।' অন্য নানা ধরনের ভেতরকার টানা-পোড়েনের মতো (জাত, ধর্ম, অঞ্চল বা শ্রেণী যা-ই হোক) এ ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদীরা সুকৌশলে বাস্তব ক্ষোভকে কাজে লাগিয়েছিল খণ্ড-চেতনার লালনে। সেই সঙ্গে, মহারাষ্ট্রের মতো তামিলনাডুতে সামাজিক দিক দিয়ে র‍্যাডিকাল কিছু সম্ভাবনাও একেবারে গরহাজির ছিল না। ১৯২০-র দশকের সংগ্রামী, প্রায়শই নিরীশ্বরবাদী, আ ত্ম-ম র্যা দা আন্দোলনের উন্মেষ থেকেই তা দেখা যায়। সব রকম জাত-ভিত্তিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে 'সংস্কৃতায়নে'র মার্কা মারাটা সত্যিই ঠিক নয়। সময়বিশেষে কিছু কিছু আন্দোলন জাতের ভিতকেই চ্যালেঞ্জ করেছিল।

উত্তর ও পূর্ব-ভারতে ব্রাহ্মণ-আধিপত্য এতটা স্পষ্ট ছিল না। এখানে অন্যক'টি উঁচু-জাতগোষ্ঠী ঘাত-নিরোধকের কাজ করত (যেমন যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে রাজপুত ও কায়স্থ, আর বাঙলায় কায়স্থ ও বৈদ্য)। জাত-অনুযায়ী জোট এখানে কিছুটা পরে দেখা দেয়, যদিও আজ এটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। আন্তঃপ্রাদেশিক বৃত্তিগত যোগাযোগের দরুন কায়স্থরা ইতোমধ্যেই একটি সর্বভারতীয় সমিতি ও সংবাদপত্র (এলাহাবাদ-কেন্দ্রিক *কায়স্থ সমাচার*) বার করছিল ১৯০০ নাগাদ। বাঙলায় নিচু জাতের সমিতিগুলি গুরুত্ব পেতে থাকে বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে। কিছু স্থানীয় জমিনদার, কয়েকজন কলকাতাবাসী আইনজীবী ও ব্যবসাদারের নেতৃত্বে মেদিনীপুরের অবস্থাপন্ন কৈবর্তরা নিজেদের মাহিষ্য বলতে শুরু করেন। ১৮৯৭-এ তাঁরা একটি জাতি নির্ধারণী সভা ও ১৯০১-এর আদমশুমারির সময়ে কেন্দ্রীয় মাহিষ্য সমিতির পত্তন করেন। পরে, মেদিনীপুরের মাহিষ্যরা জাতপাতের আন্দোলনে লক্ষণীয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। ব্রিটিশদের ভেদ-ও-শাসন নীতি অনেক বেশি সফল হয়েছিল ফরিদপুরের নমশূদ্রদের ক্ষেত্রে। ১৯০১-এর

পর শিক্ষিত লোকদের একটি ছোট্টো শিরোমণি গোষ্ঠীর ও কিছুটা মিশনারিদের উৎসাহে এঁরা সেখানে সমিতি গড়তে শুরু করেন। মেদিনীপুরের মাহিষ্যরা ছিলেন স্থানীয়ভাবে প্রতিপত্তিশালী জাত। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ছোটো জমি-মালিক, ও বিরাট সংখ্যক সম্পন্ন ও গরিব চাষী। আর নমশূদ্ররা ছিলেন অচ্ছুৎ গরিব চাষী। দূরের ব্রিটিশ প্রভুর চেয়ে উঁচু জাতের বাবুদেরই এঁরা আরও কাছের শত্রু বলে মনে করতেন—দু-এর বৈপরীত্যের কিছুটা ব্যাখ্যা হয়তো এখান থেকেই পাওয়া যায়।

সাম্প্রদায়িক চেতনা

উপনিবেশবাদের হাতে লালিত আর প্রায়শই প্রত্যক্ষভাবে পালিত দ্বিতীয় এক বড় ধরনের খণ্ড-চেতনা হলো ধর্মীয় বিভাগ—হিন্দু ও মুসলিম 'সাম্প্রদায়িকতা'। বিশ শতকে গড়ে-ওঠা দুটি উল্টো বাঁধাছকের দরুন অত্যন্ত জটিল এই বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ চিন্তা যথেষ্ট বাধা পেয়েছে। একটি হলো সাম্প্রদায়িকতাবাদী পূর্ব-ধারণা যে, হিন্দু ও মুসলমানরা সমসত্ত্ব ও অনিবার্যভাবেই বৈরী দুটি সত্তা, মধ্যযুগ থেকেই দুটি 'জাতি'। আর অন্যটি হলো পরিপূর্ণ সৌহার্দ্যের এক স্বর্ণযুগ নিয়ে জাতীয়তাবাদী পাল্টা-অতিকথা, যা একমাত্র ব্রিটিশ ভেদ-ও-শাসনের দরুনই গেছে ভেঙে। দুটি বাঁধাছকেই ধরে নেওয়া হয় যে, সারা দেশেই এক বা একাধিক ধরনের সংহতি ও অভিন্ন রূপ ছিল—উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে যোগাযোগের উন্নতি ও আর্থনীতিক সংযোগ গড়ে ওঠার আগে যা প্রায় একান্তই অসম্ভব। আসলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা—দুই-ই সারগতভাবে আধুনিক ব্যাপার। আগের শতকগুলোয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মাঝে মাঝে স্থানীয় সঙ্ঘর্ষের নজির নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, যেমন পাওয়া যাবে শিয়া-সুন্নি সঙ্ঘাত জাত-পাত ঘটিত বিবাদের অজস্র নজির। কিন্তু ১৮৮০-র দশক অবধি, মনে হয়, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ রকমে বিরল। ১৯৪৪-এ কুপল্যান্ড একটা বড় নজির পান ঃ বেনারসে ১৮০৯-এর দাঙ্গা (হিন্দুরা নাকি সেখানে ৫০টি মসজিদ ধ্বংস করেছিল)। তার পরের বড় দাঙ্গার নজির অনেক পরে, ১৮৭১-৭২-এ। ১৮৮৫ থেকে পরপর দাঙ্গা চলতেই থাকে (আর কুপল্যান্ড, *কন্সটিটিউশনাল প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ২৯)। কুপল্যান্ড ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী পক্ষের বিদ্বান, তাঁর তরফে নিশ্চয়ই বিষয়টিকে ছোটো করে দেখানোর কোনো কারণ নেই (তিনি এমনকি এও বলেছেন যে, হিন্দু-মুসলিম সমস্যাই 'ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত থাকার কারণ')।

সাম্প্রদায়িকতার অনেকটাই যে চাকরি ও রাজনৈতিক দাক্ষিণ্যের জন্যে শিরোমণি-সঙ্ঘাত থেকেই গজায়—বহুদিন থেকেই তা স্বতঃস্পষ্ট সত্য, আর বিদ্বান্‌রা সাধারণত শুধু এই স্তরেই দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করেছেন। যুক্ত প্রদেশের মুসলমানদের বিষয়ে ফ্রান্সিস রবিনসন-এর বিস্তারিত কাজটির অভিকেন্দ্র ছিল 'রাজনীতি করায় ব্যাপৃত বিভিন্ন শিরোমণি গোষ্ঠী' (*সেপারেটিজম্ অ্যামাং ইন্ডিয়ান মুসলিম*, পৃ. ৬)। সেই সুবাদে গণ-দাঙ্গাগুলোকে অনায়াসে আলোচ্য বিষয়ের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শিরোমণিদের সাম্প্রদায়িকতার নানা উৎস নিয়ে পরের অংশে আলোচনা করা হবে—ঐতিহাসিকভাবে তার সমকালীন, বুদ্ধিবৃত্তিজীবী বা 'মধ্যশ্রেণী'র জাতীয়তাবাদের সঙ্গে। কিন্তু, গোড়া থেকেই সাম্প্রদায়িকতা একটা গণ-মাত্রা অর্জন করেছিল—

এই বেদনাদায়ক তথ্যটি স্বীকার করতেই হবে—যদিও এই মাত্রাটির সঙ্গে শিরোমণি গোষ্ঠীগুলির কাজকর্মের যে কোনো যোগ ছিল না তা নয়। পাবনার দাঙ্গা বা মেপালা বিস্ফোরণের সম্ভাব্য সাম্প্রদায়িক মাত্রাগুলি আমাদের আলোচ্য পর্বে তৈরি হয়ে ওঠে নি—সম্ভবত তার কারণ বাঙলা বা মালাবারে তখনও কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী বুদ্ধিবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব ছিল না। যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবে হিন্দু ও মুসলমান শিরোমণি গোষ্ঠী ছিল অনেক বেশি সমভারী আর এই অঞ্চলেই ১৮৮০-র দশক থেকে দাঙ্গা ক্রমেই বেশি করে অবিরল ঘটনা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। হয়তো শেষ বিচারে সামাজিক আর্থনীতিক টানাপোড়েন কিছুটা দায়ী ছিল। যেমন, অবধে, আলীগড়-বুলন্দশহর অঞ্চলে বহুলাংশে হিন্দু চাষীরা মুখোমুখি হতেন মুসলমান তালুকদার ও জমিমালিকদের। যুক্ত প্রদেশের শহরগুলোয় কেন্দ্রীভূত মুসলমানরা ছিলেন প্রধানত কারিগর, দোকানদার ও খুদে ব্যবসায়ী; অন্যদিকে, বেশির ভাগ বড় বণিক ও ব্যাঙ্ক-মালিক ছিলেন হিন্দু। আবার পাঞ্জাবে মুসলমান চাষীদের কাছে হিন্দু ব্যবসাদার ও মহাজনরা সহজেই অপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

কিন্তু দাঙ্গা সাধারণত বাধত আর্থনীতিক ক্ষোভের চেয়ে অনেক দূরের কোনো বিষয় নিয়ে। যে-আন্দোলন বিষয়ে অনুসন্ধান সবে সুরু হয়েছে সেই গোহত্যা নিয়ে ব্যাপক দাঙ্গা উত্তর-ভারতের অনেক অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৮৩ থেকে ১৮৯১-এর মধ্যে পাঞ্জাবে এই ধরনের ১৫টি বড় দাঙ্গার উল্লেখ করেছেন জোরান্ড ব্যারিয়ার। ১৮৮৮ থেকে ১৮৯৩-এর মধ্যে পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে এজাতীয় হাঙ্গামা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। তাতে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বালিয়া, বেনারস, আজমগড়, গোরখপুর, আরা, সারন, গয়া ও পাটনা জেলা। ১৮৯৩ থেকে ১৮৯৫-এর মধ্যে বোম্বাই শহর ও মহারাষ্ট্রের অনেকক'টি শহরগুলিতে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হয়। ১৮৯৩-এ জনৈক গুজরাটি কলমালিক বোম্বাই-এ একটি গোরক্ষা সমিতি গড়েন। অন্যদিকে অবস্থা আরও গুরুতর করে তুলেছিল আর-একটি বাড়তি উপকরণ ঃ টিলকের গণপতি উৎসব। সার্বজনিক ভিত্তিতে তিনি এটি নতুন করে সংগঠিত করেন। এই উপলক্ষ্যে লেখা গানে হিন্দুদের মহরম বর্জন করতে বলা হয়—আগে যদিও তাঁরা অবাধে তাতে যোগ দিয়েছেন (১৮৯৪-এ সংস্কারবাদী পত্রিকা *সুধারক*-এও বলা হয়েছিল, গণপতির তুলনায় মহরম অনেক বড় জাতীয় উৎসব)। কয়েকটি গান ছিল খোলাখুলিই লোক-খ্যাপানো ঃ 'আল্লা তোমায় কোন্ বর দিয়েছেন/যে তোমরা আজ মুসলমান হয়েছ? পরধর্মের সঙ্গে সখ্য কোরো না। গরু আমাদের মা, তাঁকে ভুলে যেও না' (আর ক্যাশম্যান, *দি মিথ্ অফ দি লোকমান্য*, পৃ. ৭৮)। কলকাতার উপকণ্ঠে শিল্পাঞ্চলে প্রথম নথিভুক্ত দাঙ্গাটি ঘটে মে ১৮৯১-এ, তারপর ১৮৯৬ এর বকর-ইদ উপলক্ষ্যে টিটাগড় ও গার্ডেনরিচ এলাকায় হাঙ্গামা আর ১৮৯৭-এ উত্তর কলকাতার টালায় বিরাট দাঙ্গা বাধে।

শ্রমিক

সম্প্রতি দীপেশ চক্রবর্তী ১৮৯০-এর দশকের মধ্যভাগে কলকাতার চটকলের দাঙ্গাকে এমন একটি বিষয়ে ঢোকার জায়গা হিসেবে কাজে লাগিয়েছেন যা নিয়ে আমাদের দেশে এ যাবৎ কোনো অনুসন্ধানই হয় নি। সেটি হলো ঃ শ্রমিক-চেতনার আদি স্ফুরণ। ১৮৯০-এর দশক

নাগাদ বোম্বাই-এর সুতোকল ও কলকাতার চটকলগুলো ঘিরে যথেষ্ট সংখ্যায় সর্বহারা জড়ো হন। পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় শিল্পপুঁজিবাদের একই পর্যায়ে যেমন দেখা গেছে, তার চেয়ে খারাপ যদি না-ও হয়, তবে সমান ভয়াবহ অবস্থায় তাঁরা বাস ও কাজ করতেন। এমনকি ১৮৮১ ও ১৮৯১-এর কারখানা আইনে শিশু ও নারীদের নিয়োগ বাবদে যেটুকু নিষেধ কাগজে-কলমে আরোপ করা হয় (প্রধানত বোম্বাই-এর ভারতীয় সুতিশিল্পের ব্যাপারে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর ঈর্ষাজনিত উপরোধে) তা-ও কদাচিৎ মেনে চলা হতো। আর, দিনে ১৫, ১৬, এমন কি ১৮ ঘণ্টা খাটনিও খুব সাধারণ ঘটনাই থেকে যায়। বোম্বাই-এ প্রধানত মারাঠি শ্রমিকদল শ্রেণী-গণ্ডি ছাড়িয়ে খানিক সামাজিক যোগাযোগের সুযোগ পেতেন। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যে প্রায় গোড়া থেকেই মধ্যশ্রেণীর জনহিতৈষী প্রয়াস শুরু হয়ে যায়। ১৮৮০-তে এন এম লোখণ্ডে (ফুলে-র সহযোগী) সাপ্তাহিক *দীনবন্ধু* বার করেন। কাজের সময় কমানোর দাবিতে ১৮৮৪-তে তিনি সংগঠিত করেন শ্রমিকদের সভা, এমনকি ১৮৯০-এ বোম্বাই মিলকর্মী সমিতি-র পত্তনও করেন। এটি অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। লোখণ্ডে একটি দফ্তর খোলেন। যেসব শ্রমিক সেখানে আসতেন, তাঁদের তিনি নিখরচায় পরামর্শ দিতেন। ব্রাহ্ম সমাজ-সংস্কারক শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার উপকণ্ঠে বরানগরে বাঙালি চটকল শ্রমিকদের মধ্যে শুরু করেন একই ধরনের কাজ—নৈশ বিদ্যালয়, মজলিস, সুরাপান নিবারণী সভা, *ভারত শ্রমজীবী* নামে এক পত্রিকা। এ সবই ছিল শ্রমিকদের ভেতরে মিতব্যয়িতা, মদ্যপান-নিরোধ ও আত্মসহায়তা বিষয়ে মধ্যশ্রেণীর ভিক্টোরিআন নীতিবোধ সম্প্রচারের চেষ্টা। ইওরোপীয় মিল-ম্যানেজাররা ঘোষণা করেছিলেন যে, 'তাঁদের শ্রমিকদের মধ্যে যাঁরা শশীবাবুর স্কুলে গেছেন তাঁরা নিজেদের কাজে সবচেয়ে যত্নবান্ ও পরিশ্রমী বলে দেখা গেছে।' বরানগর চটকলের ম্যানেজার, বোর্নিও জুট কম্পানির ডব্লিউ আলেকজান্ডার বাস্তবিকই ছিলেন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ১৮৯০-এর দশকে চটকলে বাঙালিদের জায়গাটা ক্রমেই পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ ও বিহার থেকে আসা পশ্চিমী প্রবাসী শ্রমিকরা নেওয়ার পর কলকাতায় মধ্যশ্রেণীর এই জনহিতৈষিতাও শেষ হয়ে যায়। বিহার ও বাঙলার খনি আর আসামের চা-বাগানের কুলিরাও ছিলেন প্রবাসী। স্বস্থান থেকে ছিন্নমূল হয়ে শ'য় শ'য় মাইল দূরে খৎবন্দী ব্যবস্থার সমস্ত বিভীষিকার মধ্যে, নতুন পরিবেশে তাঁরা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাতেন। দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর মতো বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের নেতারা চা-বাগানের দাসশ্রমিক অবস্থার বিরুদ্ধে ১৮৮০-র দশকে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করেন। তখনও অবধি কেউ কিন্তু খোদ কুলিদেরই সংগঠিত করার চেষ্টা করেন নি।

অধিদর্শক (ওভারসিয়র)-দের ওপর চড়াও হয়ে, বিচ্ছিন্ন দাঙ্গা ও স্বতঃস্ফূর্ত স্বল্পস্থায়ী ধর্মঘটের মারফত শ্রমিকরা অবশ্য মাঝে মধ্যে নিজেদের কায়দায় লড়াই করতেন। ১৮৮২ ও ১৮৯০-এর মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে পঁচিশটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘট আর ১৮৯২-৯৩ ও ১৯০১-এ বোম্বাই-এ বেশ ক'টি বড় ধর্মঘটের কথা নথিভুক্ত আছে। ১৮৯০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে কলকাতার চট শ্রমিকদের মধ্যে এক নতুন জঙ্গীভাব ফুটে ওঠে। এর ফলে ভারতীয় চটকল সমিতি (মালিকদের সংগঠন) এপ্রিল ১৮৯৫-এ বাঙলা সরকারের কাছে কারখানার কর্মীদের 'দাঙ্গাকারী জোট' দমন করার জন্যে 'বাড়তি পুলিশি তদারকি'র দাবি জানায়। কিন্তু

দীপেশ চক্রবর্তী একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। তা হলো : শ্রমিকদের এই উঠতি প্রতিবাদ প্রায়শই স্পষ্ট শ্রেণীগত স্বীকৃতির চেয়ে বরং এক ধরনের 'সম্প্রদায়-চেতনা'র রূপ নিতে পারত। মুসলমান শ্রমিকরা ইদ ও মহরমের, আর হিন্দু শ্রমিকরা রথযাত্রার ছুটি দাবি করতেন। সময় বিশেষে গো-হত্যা বা বিতর্কিত জমির ওপর ধর্মালয় তৈরি নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই বেধে যেত। ১৮৯৬-৯৭-এ কলকাতায় ও তার আশেপাশে এই নিয়ে একাধিক দাঙ্গা হয়। ১৮৯০-এর দশকে পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের শ্রমিক জোগানের এলাকা থেকে প্রচুর চটকল মজদুর আসতে থাকেন। ঐসব অঞ্চলই ছিল গো-রক্ষা দাঙ্গার প্রধান ঘাঁটি। স্পষ্টতই সেখানে গড়ে ওঠা মনোভাব নিয়েই তাঁরা এখানে আসেন। কারিগরদের র‍্যাডিকালিজম-এর সম্পন্ন ঐতিহ্য ইংরেজ শ্রমিকশ্রেণীর গড়নে বিরাট সাহায্য করেছিল। সতেরো শতকের ইংল্যান্ডে বুর্জোয়া বিপ্লবের আরও গণতান্ত্রিক দিকগুলোকে তা বাঁচিয়ে রাখে ও ছড়িয়ে দেয়। ই পি টমসন অতি চমৎকারভাবে তা দেখিয়েছেন। একইভাবে, সর্বস্বান্ত ভারতীয় কৃষক বা বিধ্বস্ত কারিগররা যখন বাধ্য হয়ে কারখানায় ঢোকেন, তাঁদেরও প্রবণতা থাকে অঞ্চল, জাত, রক্তের সম্পর্ক বা ধর্মের খণ্ডিত বাঁধনেই আশ্রয় নেওয়ার। আসলে নতুন নাগরিক পরিবেশ প্রায়শই এইসব পুরনো আনুগত্যকে জোরদার করছে। নতুন প্রবাসী শ্রমিক দেখেন তিনি এক তীব্র প্রতিযোগিতামূলক উদ্বৃত্ত শ্রমের হাটে এসে পড়েছেন। এখানে অদক্ষ শ্রমিকরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়ছেন কাজের জন্যে—আর কাজ সাধারণত পাওয়া যেত একমাত্র 'সর্দার'-এর মাধ্যমে। নিজের সম্প্রদায় বা স্বজনদেরই তিনি পোষণ করবেন—এমনটাই সম্ভব। এই সর্দার'রাই সময়বিশেষে তাঁদের সমাজের ওপরওয়ালাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী মতাদর্শের বাহক হিসেবে কাজ করতে পারতেন। দীপেশ চক্রবর্তীর গবেষণা-নিবন্ধে দেখা যায়, ১৮৯৬ নাগাদ স্থানীয় ইমাম-এর মাধ্যমে রিষড়ার কিছু মুসলমান চটকল মজদুরের সঙ্গে কলকাতার এক বিশিষ্ট পশ্চিমা মুসলমান সওদাগরের যোগাযোগ গড়ে উঠছে। ইনি হলেন হাজী নুর মহম্মদ জাকারিয়া। সর্ব-ইসলামি আন্দোলনে ইনি ইতোমধ্যেই সক্রিয় ছিলেন। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, কলকাতার শিল্পাঞ্চলে প্রথম যে তুলনায়-পোক্ত শ্রমিক-সংগঠনটির কথা শোনা যায় তা হলো কাঁকিনাড়ার মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন (মুসলমান সমিতি)। এর পত্তন হয় ১৮৯৫-এ। মসজিদের উন্নতির জন্যে এই সমিতি টাকা তুলত, সদস্যদের দান-খয়রাত করত আর চিকিৎসার ব্যাপারে সাহায্য দিত।

১৮৯০-এর দশকের মাঝামাঝি হঠাৎ দেখা দেয় পশ্চিমা শ্রমিকদের জোয়ার, খাবারের প্রায়-দুর্ভিক্ষকালীন দাম, বৈদ্যুতিক আলোর চল—যার ফলে সঙ্গে সঙ্গেই কর্মদিবস বেড়ে যায়। এই সবের কারণে কলকাতার চটকলগুলোয় আর্থনীতিক চাপ তীব্র হয়ে ওঠে। তারই পরিণতিতে মালিকদের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা ফেটে পড়েন, কিন্তু সেই সঙ্গে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাও বাধে। দীপেশ চক্রবর্তী যদিও বলেছেন, দাঙ্গাই হয়েছিল বেশি, কিন্তু রণজিৎ দাশগুপ্তের আনুপুঙ্খিক পর্যালোচনায় এ ব্যাপারে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। বিশ শতকে ভারতের ইতিহাসে (চেতনার) এই তরলতা এক তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ হয়েই থেকে যাবে। সাম্প্রদায়িক, শ্রেণীগত ও জাতীয় চেতনা একে অন্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছে ও মিশে গেছে। কৃষি-বিক্ষোভ প্রায়শই পরিণত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। গোরক্ষা-উৎসাহী বা সর্ব-ইসলামি প্রচারকরাই দেখা দিতেন

শ্রমিক বা কৃষক-নেতা হয়ে। ব্যাপারটি বোধহয় ততটা অদ্ভুত বা অনন্য নয়। শিল্পায়ন-পূর্ব জনতার সম্পর্কে জর্জ রুদ-এর মন্তব্যটি স্মরণ করা যায় : এক ধরনের জঙ্গীপনা সহজেই অন্য ধরনে পরিণত হতে পারে। অথবা স্মরণ করা যায় ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লবে শ্রেণী-সংগ্রাম বিষয়ে জন ফস্টার-এর পর্যালোচনা, 'খণ্ড-চেতনা'ই যেখানে উস্কে তোলে শ্রেণী-চেতনাকে বা তার উল্টোটাও ঘটে।

ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও উঁচুশ্রেণীর দল

নতুন ভারতীয় সর্বহারা শ্রেণী আদৌ কোনো 'আধুনিক' ভাবাদর্শের সুনিশ্চিত বাহক ছিলেন না—উদীয়মান ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণী সম্পর্কেও এই মন্তব্য আরও বেশি প্রযোজ্য বলে মনে হয়। প্রধান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে বোম্বাই-এর পারসিরাই শুধু গোড়া থেকেই 'পাশ্চাত্যভাবিত' বলে খ্যাত হন, যদিও এক্ষেত্রেও বড় ব্যবসায়ী শেঠিয়ারা তার সূচনা করেন নি, করেছিলেন সাধারণত এলফিনস্টোন কলেজের স্নাতকরা। উল্টো দিকে, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে গুজরাটি বানিয়া ও মারোয়াড়িদের গোঁড়ামি রয়ে গিয়েছিল প্রবাদস্বরূপ। বাঙালি সহ-নাগরিকদের অন্তত দু পুরুষ পরে, একমাত্র বিশ শতকেই কলকাতার মারোয়াড়িদের মধ্যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন গড়ে ওঠে। মারোয়াড়িদের সাফল্য-কথার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে টিমবার্গ-এর মতো ঐতিহাসিকরা বাস্তবিকই যৌথ পরিবার ও দৃঢ় জাত-বন্ধনের মতো পরম্পরাগত প্রতিষ্ঠানগুলোকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পারিবারিক সংস্থাই মার্কামারা ব্যবসা-একক হয়ে থেকে যায়। অন্য দিকে প্রবাসী মারোয়াড়ি যেখানেই যেতেন, তাঁর জাতভাইদের ভরণ-করা 'বাসা'য় তাঁকে নিশ্চিত স্বাগত জানানো হতো। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, উনিশ শতকের বিস্তর সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে খুবই দোলাচলগ্রস্ত আর্যসমাজ আন্দোলনই শুধু ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর কিছুটা সমর্থন লাভ করতে পেরেছিল। 'জাতীয় বুর্জোয়া' বিকাশ ও ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক-আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি বিষয়মুখী বিরোধ থাকলেও, পেছন ফিরে দেখলে এখন এ কথা স্পষ্ট যে, ১৯২০-র দশক পর্যন্ত ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ছিল ঢালাও রাজভক্ত। ইতোমধ্যেই আমরা দেখেছি, প্রায়শই তার পাকাপোক্ত আর্থনীতিক কারণও ছিল।

রাজন্যবর্গ ও জমিনদারকুল

'দেশীয়' রাজা ও জমিনদারদের জগৎ থেকে সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বের আশা ছিল স্পষ্টতই আরও কম। এই সব 'সামন্ত' উপাদানের সঙ্গে মৈত্রীই ছিল ১৮৫৭-র পরে মোটামুটি বিনা-ব্যত্যয়ে ব্রিটিশ কৌশল। ইতোমধ্যে, এমনকি সিপাহী বিদ্রোহের সময়েই, ক্যানিং তাঁদের অনেককেই 'ঝড়ের মুখে ঢেউ ঠেকানোর বাঁধ' বলেছিলেন। নতুন কৌশলের মানে দাঁড়াল : তামাদির মতবাদ ভুলে যাওয়া, ১৮৮১-তে পঞ্চাশ বছর পরে মাইশোর ফিরিয়ে দেওয়া হলো তার হিন্দু রাজপরিবারকে, লিটন-এর আমলে দরবারের জাঁকজমক আর ডাফরিন-এর আমলে সাম্রাজ্যিক সেনাবাহিনী, রাজার ছেলেদের জন্যে আজমীরে মেয়ো কলেজে ও অবধের তালুকদারদের

জন্যে লখনউ-এর কলভিন কলেজে পাবলিক স্কুল ধরনের লেখাপড়ার ব্যবস্থা। কাগজেকলমে 'ব্রিটিশ সর্বময় কর্তৃত্ব' সর্বদাই বহাল রাখা হতো দৃঢ়ভাবে, আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো ব্রিটিশ রেসিডেন্টদের মাধ্যমে তা বলবৎও করা হতো। তবু এই সামগ্রিক ছত্রচ্ছায়ায় ভারতের একের-তিন ভাগে কাগজে-কলমে 'দেশীয়' শাসনের আওতায় সামন্ততান্ত্রিক ধরনধারন ও স্বৈরতন্ত্রের বিকাশে ইন্ধন জোগানো হয়েছে। যথার্থ আধুনিকীকরণে উপনিবেশবাদের ভূমিকা যে কত কম—এই ঘটনাই তা আরও একবার মনে করিয়ে দেয়। কয়েকটি রাজ্যে ব্রিটিশ ভারতের সমমানের—যদি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরও উন্নত না-ও হয়ে থাকে—শাসন-কাঠামো গড়ে তোলা হয়। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে মাইশোর ও বরোদা ছিল বেশ সক্রিয় (স্বাধীনতার সময় অবধি বরোদায় বিবাহ-আইন ছিল ব্রিটিশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে)। ত্রিবাঙ্কুরে সাক্ষরতার হার ছিল সচরাচরের চেয়ে বেশি। নানা সময়ে নওরোজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, অরবিন্দ ঘোষকে নিয়োগ করে বরোদা এমনকি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গেও কিছুটা যোগাযোগ গড়ে তোলে। রাজকীয় ও জমিনদারি পৃষ্ঠপোষণের ফলে পরম্পরাগত ভারতীয় সংস্কৃতির কিছু মূল্যবান দিকও হয়তো রক্ষা পেয়েছে—যেমন, ধ্রুপদী সঙ্গীতের সমৃদ্ধ উত্তরাধিকার। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেশীয় রাজ্যগুলো ছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে পেছিয়ে থাকা এলাকা। ব্রিটিশ ভারতে যেসব আইনি রূপ ও নাগরিক অধিকারকে বিস্তর ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রসারিত করা হয়েছিল, ঐসব খুদে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রকে তার কোনো পরোয়াই করতে হতো না। ১৯৩০-এর দশক থেকে দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলনের প্রসারের ফলেই কৃত্রিমভাবে বিচ্ছিন্ন এই দ্বীপগুলো উপমহাদেশের মূল স্রোতের সঙ্গে মেলে। আমরাই ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছি—ব্রিটিশদের এই দাবি সম্পর্কে তাই বেশ খানিক সংশয়ের অবকাশ আছে। নরমপন্থী কংগ্রেসের পরবর্তী দাবিদাওয়ার অনেকগুলোই কলকাতার ব্রিটিশ-ভারতীয় সভা-র মতো ভূস্বামী-প্রধান সংস্থাও ১৮৫০-এর দশকেই ভেবেছিল। কিন্তু ১৮৭০-এর দশকে বিভিন্ন 'মধ্যশ্রেণী'-ভিত্তিক সমিতির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এইসব সংস্থা অচিরেই অতি-রাজভক্ত ও অনেকটাই নিষ্ক্রিয় ঘোঁটের পর্যায়ে নেবে যায়।

১৮৮৬-র কলকাতা অধিবেশনে প্রতিনিধিদের শ্রেণীবিন্যাস বিশ্লেষণ করে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিবেদনে' লক্ষ্য করা হয় যে, 'জনসাধারণের তথাকথিত স্বাভাবিক নেতা পুরনো অভিজাতরা একেবারেই অনুপস্থিত'। এও স্বীকার করা হয় যে, 'রায়ত ও কৃষক শ্রেণীগুলির প্রতিনিধি অপর্যাপ্ত', অন্যদিকে 'খুদে মহাজন ও দোকানদারদের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়'। ঐ 'প্রতিবেদনে' অবশ্য দাবি করা হয় যে, 'বড় ব্যবসায়ী শ্রেণী, ব্যাঙ্ক মালিক ও বণিকদে'র বেশ ভালো সংখ্যক প্রতিনিধিরাই রয়েছে, আর 'প্রতিনিধিদের প্রায় ১৩০ জন ... কোনো-না কোনো ধরনের জমি-মালিক'। তাহলেও, কংগ্রেসের অন্তত গোড়ার দিকের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য এই যে, তার একাত্মতা ছিল ঐতিহাসিকরা নানাভাবে যাকে অভিহিত করেছেন সেই 'শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী', 'ইংরিজি শিক্ষিত শিরোমণি', বা 'বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠী'র সঙ্গেই। যেমন, এলাহাবাদ কংগ্রেসে (১৮৮৮) ১২০০-র মতো প্রতিনিধির মধ্যে ৪৫৫ জনই নিজেদের আইনজীবী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন, সেখানে শিক্ষক ছিলেন ৫৯ জন, সাংবাদিক ৭৩ জন। এবার এই বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর সামাজিক ভিত, ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের দিকেই আমাদের তাকাতে হবে।

'মধ্যশ্রেণী'-চেতনা ও রাজনীতি

বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর সামাজিক ভিত

ম্যাট্রিক-পাশ লোকের সংখ্যা থেকে মোটামুটি আভাস মিলবে—এমন ধরে নিলে ১৮৮০-র দশক নাগাদ ইংরিজি-শিক্ষিত ভারতীয়র সংখ্যা বাড়ছিল ৫০,০০০-এর দিকে (তখনও অবধি স্নাতক ছিলেন মাত্র ৫০০০)। ইংরিজি-পড়ুয়ার সংখ্যা ১৮৮৭-তে ছিল ২৯৮,০০০, ১৯০৭-এ বেশ তাড়াতাড়িই তা ৫০৫,০০০-এ পৌঁছয়। আর ইংরিজি খবরের কাগজের প্রচারসংখ্যা ১৮৮৫-তে ছিল ৯০,০০০, ১৯০৫-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৭৬,০০০ (জে আর ম্যাক্‌লেন, *ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্ অ্যান্ড দি আর্লি কংগ্রেস*, পৃ. ৪)। 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যালঘু' (এমনকি ১৯১১-তেও সাক্ষরতার হার ছিল ইংরিজির ক্ষেত্রে ১%, দেশীয় ভাষার ক্ষেত্রে ৬%)—ব্রিটিশরা কখনোই সেটা বলতে ছাড়ত না—এই উদীয়মান সামাজিক গোষ্ঠীটি তাদের আয়তনের তুলনায় অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছিল। ইংরিজি শেখার দৌলতে সুবিধাবান্‌রা সারা দেশ জুড়ে যোগাযোগ গড়ার এক অনন্য ক্ষমতা পেয়ে যান। ইংরিজি-শিক্ষিত সরকারি কর্মচারী, আইনজীবী, শিক্ষক, সাংবাদিক বা ডাক্তাররা প্রায়শই তাঁদের বসত-এলাকার বাইরে কাজ করতেন। যেমন, ইতোমধ্যেই, ১৮৭০-এর দশকে উত্তর-ভারতের অনেক শহরে আস্তানা গেড়েছিলেন শিক্ষিত বাঙালিরা। তার দৌলতেই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েকটি সফল রাজনৈতিক সফর করতে পেরেছিলেন। আর বাঙলার বাইরে ভারতসভা-র অনেক ক'টি শাখা খোলা সম্ভব হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, পশ্চিমী শিক্ষার সঙ্গে বিশ্বের নানা চিন্তার স্রোত ও ভাবাদর্শ সম্বন্ধে একটা বোধ এসেছিল। সেটি ছাড়া জাতীয়তাবাদের সচেতন তত্ত্বাদি খাড়া করাই কঠিন হতো। সেই সঙ্গে, বিদেশী ভাষায় শিক্ষাজনিত বিচ্ছেদ ও বিভেদ-জনক পরিণামও ছিল পরিষ্কার, আজও তা রয়ে গেছে। ১৮৮৩-৮৪-তে বাঙলার কলেজ-পড়ুয়াদের মাত্র ৯%-এর পারিবারিক আয় ছিল বছরে ২০০ টাকার কম—ইতোমধ্যেই ১৮২০-র দশকে কলকাতা হিন্দু কলেজ-এর ছাত্রদের যখন মাসিক মাইনে ছিল ৫ টাকা, তখন এমনটিই প্রত্যাশিত। অঞ্চলে অঞ্চলে প্রচণ্ড বিষমতার দরুন আর-এক সমস্যা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে গড়ে ওঠে প্রাদেশিক চোরাটান, কারণ ক্রমেই ভালো চাকরি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা হয়ে উঠছিল ইংরিজি শিক্ষা। সরকারি চাকরি কমিশন-এর ১৮৮৬-৮৭-র প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাদ্রাজে ১৮,৩৯০ জন, বাঙলায় ১৬,৬৩৯ জন ও বোম্বাই-এ ৭১৯৬ জন 'শিক্ষিত দেশীয় লোক' আছেন—কিন্তু যুক্ত প্রদেশে তার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২০০, পাঞ্জাবে ১৯৪৪, মধ্যপ্রদেশে ৬০৮ ও আসামে ২৭৪।

অনিল শীল ও জন ব্রুমফিল্ড-এর গোড়ার দিকের গবেষণার ফলে কিছুকাল ইংরিজি-শিক্ষিতদেরই—মূলত তাঁদের উঁচুজাতের মর্যাদার নিরিখে—'সিরোমণি গোষ্ঠীকুল' (এলিট গ্রুপ(স্)) হিসেবে দেখাটা কেতাদুরস্ত হয়ে উঠেছিল। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে, পরম্পরাগত জাতগুলিই আরও সহজে নতুন শিক্ষার দিকে ঝুঁকেছিল। ১৮৮৩-৮৪-তে বাঙলার হিন্দু কলেজের ছাত্রদের শতকরা ৮৪.৭ ভাগই এসেছিলেন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বা বৈদ্য—এই তিন 'ভদ্রলোক' জাত থেকে। মাদ্রাজ, বোম্বাই বা পুণায় ব্রাহ্মণ ছাত্ররাই ছিলেন প্রধান, যুক্ত প্রদেশে

কায়স্থরাই ছিলেন লক্ষণীয়। এই গোটা পরিমার্গের মূল্য সম্পর্কেই এখন কিছু গুরুতর প্রশ্ন উঠেছে। ১৯৭৩-এ আত্ম-সমালোচনার এক মুহূর্তে অনিল শীল স্বীকার করেন যে, 'ব্রিটিশ রাজের বাঁধাগতগুলো'ই 'ঐতিহাসিকদের বেদবাক্য (ডগ্‌মা)' হয়ে দাঁড়িয়েছিল—সরকারি পর্যায়গুলোকেই মেনে নেওয়া হয়েছিল খানিকটা নির্বিচারে। সব বাঙালি ব্রাহ্মণকেই কোনোভাবে 'ভদ্রলোক' বলে ধরে নেওয়া হয় নি (যেমন, রাঁধুনি বামুন, বা কখনও কখনও এমনকি পুরোহিত, যিনি পারিবারিক পূজা-অর্চনা করতেন)। অন্যদিকে ১৮৬৪-তে বোম্বাই শহরের তথাকথিত 'মুখ্য শিরোমণি' চিৎপাবন ও সারস্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যে, ১০,০০০ ভিখিরি ও ১৮৮০ জন বাড়ির চাকরও ছিল। এই প্রসঙ্গে 'শিরোমণি' শব্দটির ব্যবহারই সংশয়জনক, কারণ ঔপনিবেশিক ভারতে একমাত্র খাঁটি ও সত্যিই অদ্বিতীয় শিরোমণি ছিল শ্বেতাঙ্গরা। সুযোগ-সুবিধার (শিক্ষাগত বা জাতঘটিত, যা-ই হোক) সচেতন সংরক্ষণ বা নিয়ন্ত্রণ—সত্যিকারের শিরোমণির কাছেই যা প্রত্যাশিত ও ভারতে ইংরেজদের মধ্যেই যা দেখা যায়—ইংরিজি শিক্ষিতদের ভাবাদর্শ বড় একটা তেমন ছিল না। বরং যেসব সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রায়শই লক্ষ্য ছিল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে উঁচু জাতের সুযোগ-সুবিধার বিরুদ্ধতা করা—ইংরিজি-শিক্ষিতদের কেউ কেউ তাতে যথেষ্ট আত্মত্যাগ করেছেন; আরও অনেকে তাঁদের দেশের শহরে বা গ্রামে বেসরকারি স্কুল-কলেজ খুলে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। হান্টার কমিশন (১৮৮২)-এর সুপারিশ অনুসারে যখন উচ্চশিক্ষা-খাতে সরকারি অনুদান কমিয়ে দেওয়া হয়, তখন বাস্তবিকই প্রধানত এই পথেই ভারতে শিক্ষাবিস্তার ঘটে। ১৮৮১-৮২ থেকে ১৯০১-০২-এর মধ্যে (সরকারি) সাহায্য-বঞ্চিত বেসরকারি কলেজের সংখ্যা ১১ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৫৩। এও মনে রাখা দরকার যে, ১৯১১-য় সাম্রাজ্য কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক (ও পারিবারিক আয় মাসে ১০ টাকার কম হলে, অবৈতনিক) করার বিলটি প্রথম আনেন গোপাল কৃষ্ণ গোখলে ঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি সদস্যরা সেটি বাতিল করে দেন। বোম্বাই-এর লাট একটি অপ্রকাশ্য চিঠিতে বড়লাটকে তার আসল কারণটি বলেন—'যদি সব চাষাই পড়তে পারে তবে' জাতীয়তাবাদীদের 'অসন্তোষ খুঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা প্রচণ্ড বেড়ে যাবে' (বি আর নন্দ, *গোখলে*, পৃ. ৩৯২)।

বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীকে অনুধাবন করার আরও ফলপ্রসু একটি উপায় হলো তার ধ্যানধারণা ও তার সামাজিক-আর্থনীতিক ভিত্তিকে একযোগে বিশ্লেষণ করা। পাশ্চাত্যের সমসাময়িক ঘটনাধারা সম্পর্কে তাঁরা আরও বেশি করে সচেতন হয়ে উঠছিলেন। তার থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন মোটের ওপর বুর্জোয়া আদর্শাবলি। সেগুলির সঙ্গে তাঁদের প্রধানত অ-বুর্জোয়া সামাজিক ভিত্তির এক তাৎপর্যপূর্ণ বৈপরীত্য তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে। এই বৈপরীত্য সম্ভবত বাঙলাতেই ছিল সবচেয়ে প্রকট। এখানকার বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠী আয়াস করে এক 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র স্ব-ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন, যার অবস্থান জমিনদারদের নিচে কিন্তু খেটে-খাওয়া মানুষদের ওপরে। এঁরা নিজেদের আদল খুঁজতেন ইওরোপীয় 'মধ্যশ্রেণী'র ভেতরে। পশ্চিমী শিক্ষা থেকে এঁরা জেনেছিলেন যে, নবজাগরণ (রেনেসাঁস), ধর্মসংস্কার (রিফর্মেশন), দীপায়ন (এনলাইটেনমেন্ট), ও গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা সংস্কার আন্দোলনের ভেতর দিয়ে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে বিশাল রূপান্তর ঘটিয়েছিল এই শ্রেণীই। শিল্প বা বাণিজ্যের মধ্যে এঁদের নিজস্ব

সামাজিক শেকড় ছিল না (ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সি সংস্থা ও তাদের অধীনস্থ মারোয়াড়িরা সেগুলো আরও বেশি করে নিয়ন্ত্রণ করছিল)। বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর শেকড় ছিল সরকারি চাকরি বা আইন ব্যবসা, শিক্ষা, সাংবাদিকতা বা চিকিৎসাবৃত্তিতে—এরই সঙ্গে মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাঙলায় যা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল) জমির সঙ্গে প্রায়শই কিছু যোগ থাকত। ৯ ডিসেম্বর ১৮৬৯-এ *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় এই দ্বৈততার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখা যায় : 'যে-কোনো সমাজেই মধ্যবিত্ত লোকদের সর্বদা সবচেয়ে প্রয়োজনীয় গোষ্ঠী বলে ধরা হয়। আমাদের দেশের কল্যাণ অনেকাংশেই এই শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল। এ দেশে যদি কখনও কোনো সামাজিক বা অন্য কোনো বিপ্লব হয় তবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীই তা করবে। আমাদের দেশে যত জনহিতকর সংস্থা ও ক্রিয়াকলাপ আজ আমরা দেখতে পাই তা শুরু করেছিল এই শ্রেণী। ... মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ ভূ-সম্পত্তি ও চাকরি মারফত জীবিকা নির্বাহ করে।...মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ প্রায়শই 'গাঁতিদার'।' (এক ধরনের মধ্যস্বত্বভোগী, যশোর-নদীয়া অঞ্চলে যাদের খুবই দেখা যেত। তখন *অমৃতবাজার পত্রিকা* বেরত সেখান থেকেই)।

এ কথাও বলা দরকার যে, ব্যবসা সম্পর্কে বাঙালি বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর দূরে থাকার মনোভাব বাস্তবে বাণিজ্যের প্রতি 'ভদ্রলোক'-সুলভ কোনো বিরূপতা থেকে আসে নি, কারণ উনিশ শতক জুড়ে 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী'র পত্র-পত্রিকায় তাদের পাঠকদের শিল্প বা ব্যবসার দিকে যাওয়ার ব্যাপারে তাগিদ দেওয়ায় কখনও ক্ষান্তি ছিল না। আধা-সামন্ততান্ত্রিক ভূমি-ব্যবস্থার সঙ্গে যোগ থাকাটা বুর্জোয়া সাধ-বাঞ্ছাকে প্রতিহত করে নি, কিন্তু পরে আমাদের বারেবারে দেখতে হবে, কৃষি বিষয়ে র‍্যাডিকাল চিন্তা বা কর্মের ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বিরাট সংখ্যায় মুসলমান কৃষক ছিলেন সেই বাঙলার পক্ষে এই সীমাবদ্ধতার চূড়ান্ত পরিণতি হয়েছিল খুবই গুরুতর।

অন্যান্য প্রদেশেও মোটামুটি একই রকমের ধাঁচ দেখা যায়, যদিও কৌতূহল জাগানোর মতো কিছু আঞ্চলিক প্রকারভেদও ছিল। যেমন, মাদ্রাজে গোড়া থেকেই এক 'বাণিজ্যিক শিরোমণি গোষ্ঠী'র প্রাধান্যর কথা বলেছেন সুব্বারলিঙ্গম। লক্ষ্মণরাসু চেট্টি (শেঠী)-র মতো ব্যবসাদাররা ১৮৫০-এর দশক থেকে মা দ্রা জ দে শী য় স ভা (নেটিভ অ্যাসোসিয়েশন-য়) প্রাধান্য পেতেন। কিন্তু 'প্রশাসনিক' ও 'বৃত্তিজীবী শিরোমণি'দের তাঁরা জায়গা ছেড়ে দিচ্ছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত, সুব্বারলিঙ্গম তার কারণ বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। পশ্চিমী শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠীগুলি আবার প্রায়শই যুক্ত ছিল ছোটো জাতের সঙ্গে। অবশ্য ১৮৮০-র দশকে মা দ্রা জ ম হা জ ন স ভা ও তার পরিচালিত কংগ্রেসের কার্যকলাপে মাদ্রাজ শহরের চেট্টি বা অন্ধ্র ব-দ্বীপের 'কোমতি' বণিকদের মতো সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর ও কিছু বড় জমিদারদের থেকে আসা আর্থিক পৃষ্ঠপোষকদের নেপথ্য ভূমিকার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন ওয়াশব্রুক।

শিল্প বা বাণিজ্যের দিক দিয়ে মহারাষ্ট্রের পুণা শহরের যথার্থ কোনো গুরুত্ব ছিল না। এক স্বদেশী আশা-আকাঙ্ক্ষার সূত্রে ছাড়া, এখানকার বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের যোগ ছিল সামান্যই। টিলকের পত্রিকা *মরাঠা*-র ৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ সংখ্যায় একটি কৌতূহলজনক ও গুরুত্বপূর্ণ আপাতবিরোধের দিক লক্ষ্য করা হয়েছে। একটি বার্ষিক শিল্প সম্মিলন আরম্ভ করার ব্যাপারে পুণায় যে-উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার ওপর মন্তব্য প্রসঙ্গে সেখানে লেখা

হয় ঃ 'আমরা নির্দ্বিধায় স্বীকার করি, পুণা কোনো উৎপাদন-বা বাণিজ্য-কেন্দ্র নয়। এটি সমৃদ্ধ ... রাজনৈতিক ঐতিহ্যে। ... বোম্বাই পুণার চেয়ে ধনী, কিন্তু আমাদের বোম্বাই বণিকদের মনোযোগ ও সময় তাঁদের ব্যবসায়-প্রয়াসেই পুরোপুরি চলে যায়। ফলে, বাণিজ্যিক পুনরুত্থানের ছক তৈরির কাজ অন্যদেরই করতে হবে।' আবার, প্রায়শই বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের সঙ্গে জমির একটা যোগ থাকত খুচরো খাজনা আদায়ের 'খোতী' অধিকারের আকারে, বিশেষ করে রত্নগিরির মতো জেলায়, মহারাষ্ট্রীয় বুদ্ধিজীবীরা যেখান থেকে এসেছিলেন অনুপাত-অতিরিক্ত বেশি সংখ্যায় (টিলক ও গোখলে দুজনেই এসেছিলেন রত্নগিরির 'খোতী' অধিকার-সম্পন্ন পরিবার থেকে)। বাঙলার মতো এখানে সামাজিক ভিত্তি দিয়ে যান্ত্রিকভাবে ভাবাদর্শ নির্ধারিত হয়ে যেত না, কিন্তু কিছুটা গণ্ডি বেঁধে দিত অবশ্যই। ১৯০১-এ মহাজনদের হাতে চাষীর জমি হস্তান্তর রোখার চেষ্টা করেছিল বোম্বাই সরকার। টিলক তথা গোখলে তার তীব্র বিরোধিতা করেন। এমনকি চরমপন্থার জনক একবার এই প্রকট মন্তব্যও করেছিলেন ঃ 'সাবকর' (মহাজন)-দের সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার অধিকার যেমন সরকারের নেই, তেমনি 'খোতদের ন্যায্য আয় থেকে বঞ্চিত করে সেই টাকা চাষীদের ভেতর বাঁটোয়ারা করে দেওয়ার অধিকারও নেই। এটা অধিকারের প্রশ্ন মানবিকতার নয়' (ভগবত ও প্রধান, *লোকমান্য টিলক*, পৃ. ১৩৪-এ উদ্ধৃত)।

বুর্জোয়া যোগাযোগ বোম্বাই শহরে স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা বেশি লক্ষণীয়। 'শেটিয়া' বণিক-নবাব ও 'তরুণ বোম্বাই' বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অনিশ্চিত আর কখনও কখনও বেশ শত্রুতার। তাহলেও ১৮৮০-র ও ৯১-এর দশকে বোম্বাই-এর নতুন বুদ্ধিবৃত্তিজীবী নেতৃত্ব (তাদের নেতা ছিলেন আইনজীবীদের ত্রিমূর্তি, ফিরোজশা মেহটা, কে টি তেলঙ্গ ও বদরুদ্দিন তায়বজী) ও সুতোকল-মালিকদের মধ্যে আরও সুস্থির কিছু যোগসূত্র গড়ে ওঠে—ল্যাঙ্কাশায়ার-এর সুতোর ওপর আমদানি শল্ক রদ ও প্রতিকারী উৎপাদন শুল্ক আরোপ ইত্যাদি বিষয়ে বিক্ষোভ-আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। দীনশা ওয়াছা-র কর্মজীবনই এই যোগাযোগের প্রতীকস্বরূপ। তিনি ছিলেন বোম্বাই-এ নওরোজীর প্রধান যোগসূত্র, বোম্বাই প্রেসিডেন্সি সমিতির সম্পাদক (১৮৮৫-১৯১৫), কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৮৯৬-১৯১৩), ৩৮ বছর ধরে বোম্বাই সুতোকল-মালিক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, ও একাধিক সুতোকলের ম্যানেজিং এজেন্ট। তবু নওরোজীকে লেখা ওয়াছা-র চিঠি বোম্বাই-এর ব্যবসাদারদের বায়কুণ্ঠা সম্পর্কে অভিযোগে ভরা—যেমন, ১৮৮৯-এ জে এন টাটা-র কাছ থেকে সামান্য ৫০০ টাকা আদায় করতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়। এর এক পুরুষ বাদে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ও গান্ধীর উত্থান হওয়ার পরে তবে ভারতীয় পুঁজিপতিরা জাতীয়তাবাদীদের জন্যে উপুড়হস্ত হয়েছিলেন।

উত্তর-ভারত নিয়ে বেলি-র অণুসন্ধান থেকে আবার বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী ও খুদে জমি-মালিকানার মধ্যেকার যোগাযোগটা ফুটে ওঠে। তিনি অবশ্য আরও জোর দেন মদনমোহন মলবীয়-র মতো রাজনীতিবিদ্‌দের সঙ্গে খত্রী ও আগরওয়াল পরিবারগুলির সম্পর্কসূত্রের ওপর। এইসব পরিবার ব্যাঙ্ক ও ব্যবসা চালাত (লক্ষ্য করা উচিত, তারা নিজেরাও প্রায়শই ছিল ভূস্বামী—বেলি যে এলাহাবাদের ২৪টি প্রধান ব্যবসায়ী পরিবারের তালিকা করেছেন তাদের ১২টিরই জমিনদারি ছিল)। ঐ সম্পর্কসূত্র গড়ে উঠেছিল প্রাথমিকভাবে আর্যসমাজী

ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদী সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে।

উনিশ শতকের শেষ পাদের বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপের ছক সম্পর্কে সাধারণত দুটি নির্বিশেষ মন্তব্য করা হয়। বলা হয় যে, ১৮৭০-এর দশক অবধি যে সব সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন অত লক্ষণীয় ছিল, পুনরুত্থানবাদের ভরা কোটালে তা ভেসে যায়, আর পুনরুত্থানবাদও আরও চরম ধরনের জাতীয়তাবাদের উদ্ভবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। অন্য অনেক সাধারণীকরণের মতো এই দুটি কথারই কিছু রদবদল করা দরকার।

হিন্দু সংস্কার ও পুনরুত্থান

সংস্কার আন্দোলনগুলোর জোয়ার যে চলে গেছে বাঙলায় তা বেশ স্পষ্ট হয় ১৮৭০-এর দশকের পরেই। ব্রাহ্মরা নিজেদের মধ্যে বিবাদে দীর্ণ হয়ে পড়েন, তাঁদের প্রভাব কমতে থাকে; আর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সরে যান এক বেদনাময় বিচ্ছিন্নতায়। পশ্চিম-ভারতের চিত্রটি কিন্তু কোনোভাবেই এতটা দ্ব্যর্থহীন ছিল না। ১৯০১-এ মৃত্যুর আগে অবধি এম জি রানাডে বুদ্ধিজীবী জগতে তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি বজায় রেখেছিলেন। তাঁর বন্ধু কে টি তেলঙ্গ (প্রার্থনা সমাজ-পন্থী ও সংস্কারক তথা গোড়ার দিকের কংগ্রেসের অন্যতম স্তম্ভ)-এর সঙ্গে সমাজ সংস্কার চালানোর এক সাবধানী নীতি অনুসরণ করেছিলেন তিনি—'সবচেয়ে কম বাধার পথ ধরে'। ১৮৯০-এর দশকের শেষ দিকে আর জি ভাণ্ডারকর ও এন সি চন্দ্রবরকরের মতো মানুষরা এই সাবধানী ভাবকে আক্রমণ করছিলেন। দক্ষিণেও একটি সংস্কারক গোষ্ঠী দেখা দেয়। এখানে তেলেগুভাষী অঞ্চলের বিরাসলিঙ্গম ১৮৭৮-এ রাজামুন্দ্রি সমাজ সংস্কার সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। বিধবা বিবাহে উদ্যোগ সঞ্চারই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৯০-এ কে এন নটরাজন প্রকাশ করেন প্রভাবশালী *ইণ্ডিয়ান সোশাল রিফর্মার* পত্রিকা। তার সঙ্গে যুক্ত 'তরুণ মাদ্রাজ দল'ও ১৮৯২-এ এক হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির পত্তন করেন। এই প্রথম সর্বভারতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মতো একটা ব্যাপারও শুরু হলো, যখন ১৮৮৭ থেকে রানাডে একটি বার্ষিক জা তী য় সা মা জি ক স ম্মি ল ন সংগঠিত করলেন। ১৮৯৫-এ পুণায় টিলক সেটিকে বার করে দেওয়ার আগে অবধি কংগ্রেস মণ্ডপেই তার অধিবেশন বসত। ১৮৮৪-তে বাল্যবিবাহ ও বাধ্যতামূলক বৈধব্য বিষয়ে বেহরামজী মালবারি-র 'মন্তব্য' ('নোট্স্')-র ফলে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেশ জুড়ে বিতর্ক শুরু হয়। তাঁর লাগাতার প্রচারের (এ কথা ঠিক যে, তার লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের মতোই—যদি না তার চেয়ে বেশি হয়—ইংল্যান্ডের জনমত ও ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের স্বপক্ষে আনা) চাপে পড়ে সরকার ১৮৫৬-র বিধবা পুনর্বিবাহ আইনের পর একটি বড় সমাজ সংস্কারসূচক আইন ১৮৯১-এর সহবাস সম্মতি আইন পাশ করে।

সহবাস সম্মতির বয়েস নিয়ে স্বল্পস্থায়ী হলেও প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। ১৮৬০-এর তুলনায় শিক্ষিতদের মতামত তখন কতটা বদলে গিয়েছিল এতেই তা দেখা যায়। ১৮৬০-এ, দশের কম বয়েসি কোনো মেয়ের সঙ্গে সহবাসকে ধর্ষণ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, কেউই সে-নিয়ে বিশেষ প্রতিবাদ করে নি। এই বয়েসকে দশ থেকে বারো-য় নিয়ে আসাটা তুলনায় গৌণ সংস্কার। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মালবারি-র আরও অনেক ব্যাপক প্রস্তাবগুলোর মধ্যে সরকার শেষে এইটুকুই মেনে নেয়। তাতেই খুঁচিয়ে তোলা হয় বিরাট বিরোধিতা, বিশেষ করে বাঙলায়

ও মহারাষ্ট্রে। খোলাখুলি রক্ষণশীল ও অন্ধতার মনোভাব এখানে মিশে গিয়েছিল জাতীয়তাবাদী যুক্তির সঙ্গে। লক্ষণীয় ভাবে তা তুলে ধরেন টিলকই ঃ ধর্মীয় ও সামাজিক প্রথায় হাত দেওয়ার অধিকার বিদেশী শাসকদের নেই। অবশ্যই বলা দরকার, এই যুক্তিটি খানিক সাজানো, কারণ একই পর্বে গোঁড়া হিন্দু গোষ্ঠীগুলো গোহত্যা-বিরোধী আইনের জন্যে দরবার করতে বড় একটা ইতস্তত করে নি। তেমন আইনে অবশ্যই ভারতীয় সমাজের একটা বড় অংশের—মুসলমানদের—সামাজিক প্রথায়ও হাত দেওয়া হতো। বাঙলায় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় *বঙ্গবাসী* পত্রিকা (তার প্রচার সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০,০০০ যেখানে সংস্কারপন্থী ব্রাহ্ম পত্রিকা *সঞ্জীবনী*-র প্রচার সংখ্যা ছিল ৪০০০; *বঙ্গবাসী*-র বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলাও রুজু করা হয়)। এ-আন্দোলনে 'স্বদেশী'র কিছু কিছু মনোভঙ্গি ও পদ্ধতির পূর্বসূচনা দেখা যায়। যেমন, কলকাতা ময়দানে বিশাল সমাবেশ, কালীঘাটে বিরাট পুজো, এমনকি বয়কট-এর ডাক ও দেশীয় উদ্যোগ সংগঠিত করার কয়েকটি প্রচেষ্টা।

১৮৭০-এর দশক থেকে বাঙলায় নানা ধরনের প্রভাবে মননগত মনোভঙ্গিও পাল্টাচ্ছিল। ম্যাক্স ম্যুলার-এর মতো বিদ্বান্‌রা প্রাচীন আর্য গৌরব পুনরুদ্ধার করেছিলেন, আর পশ্চিমে রোমাঞ্চকর প্রাচ্য নিয়ে এক রোমান্টিক ভজনারীতি গড়ে ওঠে। এরই অদ্ভুত ও বেশ খানিকটা সন্দেহজনক ফল হলো অলকট ও ব্লাভাট্‌স্কি-র থিওজফি আন্দোলন। এইসব কারণে হিন্দু পরম্পরার সপক্ষে কথা বলাও আরও সম্মানজনক হয়ে উঠছিল। যে-বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের পরম্পরাগত বিশ্বাস হারিয়েও সামাজিক সাযুজ্য চাইতেন তাঁদের জন্যে একটি মধ্যপন্থা তৈরি করতে কোঁত-এর দৃষ্টবাদকে কাজে লাগান একটি ছোটো কিন্তু প্রভাবশালী গোষ্ঠী। ১৮৮০-র ও '৯০-এর দশকে এর পরিচালক ছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ। পুনরুত্থানবাদকে যে পরিশীলিত ও মননশীল রূপ দেওয়া হয় তার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ১৮৮০-র দশকের বঙ্কিমচন্দ্র। আদর্শ মানুষ, সংস্কৃতি নায়ক ও জাতি-নির্মাতা হিসেবে কৃষ্ণের তিনি নতুন ব্যাখ্যান দেন। আরও অন্ধতার স্তরে পুনরুত্থানবাদের প্রতিনিধি ছিলেন শশধর তর্কচূড়ামণি ও কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন। তাঁরা দাবি করতেন, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সমস্ত আবিষ্কারেরই শাস্ত্রীয় পূর্বদৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু পুনরুত্থানবাদ তখনই সবচেয়ে ফলপ্রসূ হলো যখন তা আবেদন রাখতে চাইল আবেগের কাছে, বুদ্ধির কাছে নয়। *অমৃতবাজার পত্রিকা*-র নব-বৈষ্ণবধর্ম অনুপ্রেরণা খুঁজল চৈতন্য-র কাছে, মহাকাব্যের কৃষ্ণের কাছে নয়, যে-কৃষ্ণকে আদর্শ রূপ দিতে চেয়েছিলেন বঙ্কিম। সবার ওপরে, দক্ষিণেশ্বরের সন্তসুলভ পুরোহিত রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্মোহনী প্রভাব ফেলেছিলেন কলকাতার পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীদের মনে—তাঁর 'যত মত তত পথ' ও গ্রাম্য সরলতার মাধ্যমে। হিন্দু পুনরুত্থান ঘটেছিল এই সব দিয়েই। শিকাগো ধর্ম সম্মিলনে স্মরণীয় উপস্থিতির পর তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ ১৮৯০-এর দশকে হঠাৎই যশস্বী হয়ে ওঠেন। কোনো স্থূল অর্থে তিনি আদৌ অন্ধতাপন্থী বা পুনরুত্থানবাদী ছিলেন না। তাহলেও তাঁর কাজের এক প্রধান পরিণাম হলো সমাজ-সংস্কারকে শক্তিহীন করে দেওয়া। সমাজ-সংস্কার ব্যাপারটা শিরোমণিতান্ত্রিক ও বিদেশী ছাঁচে অনুপ্রাণিত—নিঃসন্দেহে এমন বলে হেয় করার যথেষ্ট ন্যায্যতাও ছিল। তার বদলে তিনি আনলেন সমাজসেবার আদর্শ। ১৮৯৭-এ তিনি যে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন তা দক্ষ জনহিতকর প্রতিষ্ঠান বলে প্রমাণ হয়েছে, সামাজিক র‍্যাডিকালিজম-এর কোনো দাবিই তার

নেই। তবুও বিবেকানন্দ নিজে আর্য ঐতিহ্যের গৌরবের আবেগমথিত ভাব-উদ্রেকের সঙ্গে মিলিয়ে ছিলেন হিন্দুত্বকে (বিশেষ করে পশ্চিমী শ্রোতাদের সামনে) আর তীব্র আক্রমণ করেছিলেন বর্তমান অধোগতিকে : 'রান্নাঘর হচ্ছে তোমাদের ঈশ্বর, শাস্ত্র—ভাতের হাঁড়ি।' সহবাস সম্মতি আইন নিয়ে হৈ-হট্টগোলের ব্যাপারে তাঁর অপ্রকাশ্য মন্তব্য ছিল, 'ধর্ম মানে যেন বারো কি তেরো বছর বয়েসে মেয়েকে মা করা'। গো-ভজনা সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য—'যেমন মা, তেমনি ছা'—মনে করার যোগ্য। তিনি এক ইহজগৎ-জাতীয় ধর্ম প্রচার করেছিলেন, গুরুত্ব দিয়েছিলেন আত্মসহায়তা ও পৌরুষ গড়ে তোলার দিকে : 'আমি চাই এমন লোক যাহাদের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্মিত।' একই রকম লক্ষণীয় হলো 'দরিদ্র-নারায়ণ', শূদ্র ও অচ্ছুৎদের দুর্দশা নিতে তাঁর উদ্বেগ। মাঝে মাঝে তিনি আবছা ভবিষ্যদবাণী করেছেন : 'সর্বদেশে শূদ্ররা একাধিপত্য লাভ করিবে ... সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ প্রভৃতি এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা'। তেমনি লক্ষণীয় তাঁর বিখ্যাত আবেদন : 'হে ভারত, ভুলিও না—নীচ জাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই।' এইসব আলঙ্কারিক উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কিন্তু মিশে ছিল প্রায় পুরোপুরি অস্বচ্ছতা—নির্দিষ্ট সামাজিক-আর্থনীতিক কর্মসূচি, গণ-সংযোগের পদ্ধতি, বা এমনকি রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধেও ; তবু এই পাঁচমিশেলি ভাবের মধ্যেই নিহিত ছিল তাঁর আবেদনের শক্তি, আর পৌরুষের অর্চনা, অস্পষ্ট জনমুখিতা ও হিন্দু গৌরবের ভাব-উদ্রেকের সঙ্গে দেশপ্রেমের এই মিশ্রণ আসন্ন স্বদেশী পর্বে তরুণদের পক্ষে বাস্তবিকই তীব্র মাদক বলে প্রমাণ হয়।

মহারাষ্ট্রে পুনরুত্থানবাদের কেন্দ্র ছিল পুণা। বাঙলার চেয়ে তা আরও বেশি সঙ্কীর্ণ ব্রাহ্মণ্য চারিত্র পরিগ্রহ করে। গোড়ায় তার যোগ ছিল পরম্পরাগত 'শাস্ত্রী' পণ্ডিতদের পড়ন্ত অবস্থার সঙ্গে। তাঁরা দেখলেন ব্রিটিশ আমলে তাঁদের দক্ষিণা ক্রমেই কমে আসছে। বিষ্ণু কৃষ্ণ চিপলুণকর-এর *নিবন্ধমালা* (১৮৭৪-৮১)-র প্রভাবে হিন্দু ব্রাহ্মণ ও মারাঠা গৌরবের ভাব-উদ্রেক আরও বেশি সমর্থন পেতে থাকে ইংরিজি-শিক্ষিতদের কাছ থেকে। সহবাস সম্মতি আইনের বিরোধিতা, গণপতি উৎসবের সূচনা, ও ১৮৯৫-এ রানাডে-কে কংগ্রেস মণ্ডপে জাতীয় সামাজিক সম্মিলন করতে না-দেওয়া—এই সবের মাধ্যমেই ১৮৯০-এর দশকে পুণার পুনরুত্থানবাদীদের সঙ্গে টিলকের মৈত্রী গড়ে ওঠে। ব্যাপারটিকে বোধ হয় সবচেয়ে ভালোভাবে দেখা যায় এই হিসেবে যে, ইতোমধ্যেই যার বাস্তব অস্তিত্ব ছিল তাকে রাজনৈতিকভাবে কাজে লাগানো হলো—কারণ ব্যক্তিগতভাবে টিলক আদৌ অন্ধতাগ্রস্ত ছিলেন না। অনেক পরে, এমনকি ১৮৯০-এ একটি প্রচারপত্রে তিনি রানাডে-র সঙ্গে নিজের নামও দেন, যাতে স্ত্রীশিক্ষা ও বিয়ের বয়েস বাড়ানোর পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়।

দক্ষিণ-ভারতে সংস্কার বা পুনরুত্থানের দেশজ আন্দোলন ছিল তুলনায় দুর্বল। ১৮৮২-তে অ্যাডিয়ার-এ যে থিওজফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়, ইংরিজি-শিক্ষিতদের মধ্যে তা যথেষ্ট প্রভাব ফেলে, বিশেষ করে ১৮৯৩-এ অ্যানি বেসাণ্ট সেখানে আসার পর। ১৮৯০-এর দশকে শ্রীমতী বেসাণ্ট বারেবারে সমাজ-সংস্কারকদের আক্রমণ করেন ও পরম্পরাগত হিন্দুধর্মের গুণকীর্তন লাগান, যদিও পরবর্তীকালে এ বিষয়ে ও অন্যান্য বহু বিষয়েই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

অবশ্য ১৮৮০-র ও '৯০-এর দশকে একমাত্র যে-'সংস্কার' আন্দোলনটির দর্শনীয় অগ্রগতি ঘটেছিল তা হলো আর্যসমাজ। কাঠিয়াবাড়ের এক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩)-এর প্রতিষ্ঠাতা। কিন্তু এর প্রধান ভিত্তি অর্জিত হয় উত্তর-ভারতে (পাঞ্জাব ও পশ্চিম-যুক্ত প্রদেশের কিছু জায়গায়)। সম্ভবত দয়ানন্দ-র বাণীর দ্বিমুখিতার জন্যেই তা সফল হয়েছিল, কারণ একদিকে এতে বহু প্রচলিত হিন্দু আচারের (মূর্তিপূজা ও বহুদেববাদ, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহে ও বিদেশযাত্রায় নিষেধ, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য ও সূক্ষ্ম জন্মের ভিত্তিতে বর্ণভেদ) কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে, আবার তারই সঙ্গে মিলেছিল অন্য সব ধর্মবিশ্বাসের—খ্রীস্টান, ইসলাম, শিখ—চেয়ে বেদের অভ্রান্ততা-ভিত্তিক পরিশোধিত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে চূড়ান্ত আক্রমণমুখী এক বিঘোষণা। উত্তর-ভারতের শিক্ষিত, সংস্কারমনস্ক যুবকদের আনুগত্য লাভের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর্যসমাজ অচিরেই ব্রাহ্মদের ম্লান করে দেয়। তাঁরা হাজির করেছিলেন এমন এক মতবাদ যা একই সঙ্গে আরও নিরাপদ, কম বিচ্ছেদজনক, ও ক্রমেই অপ্রিয় হয়ে-ওঠা প্রবাসী বাঙালি সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত নয়। ইংরিজি শিক্ষায় এগিয়ে থাকার দৌলতে এই সম্প্রদায়ই গোড়ায় প্রশাসনিক ও বৃত্তিগত কাজকর্মে পাওনার বেশি অংশ দখল করে ছিল। ব্যবসায়ী জাতগুলির মধ্যেও আর্যসমাজীরা শেকড় চালিয়ে দেয় গভীরে। পাঞ্জাবের প্রথম দিকের নেতারা—গুরু দত্ত, লালা হংসরাজ, লালা লাজপত রায় ও লালা মুন্‌শী রাম (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ)—সবাই এসেছিলেন খত্রী, অরোরা বা অগ্রবাল পরিবার থেকে। পাঞ্জাবে আর্যসমাজীদের প্রধান চারটি ভিতকে (পেশোয়ার-রাওলপিণ্ডি, মুলতান, রোহটক-হিসার, ও জলন্ধর দোআব) স্থানীয় ব্যবসায়ী স্বার্থের সঙ্গে আংশিকভাবে যুক্ত করেছেন কেনেথ জোন্‌স্। ১৯০০ থেকে তাঁরা গণ-শুদ্ধিকরণ ও নিচু জাতের—রহটিয়া, ওদ, মেঘ ও জাটদের—ধর্মান্তর করাতে শুরু করেন। ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলোর মতোই তাঁদের ক্ষেত্রে আর্যসমাজ এইভাবে হয়ে উঠল 'সংস্কৃতায়নে'র একটি প্রণালীস্বরূপ। ফলে সদস্য-সংখ্যাও বেড়ে যায় দর্শনীয়ভাবে ঃ ১৮৯১-এ ৪০,০০০, ১৯০১-এ ৯২,০০০ ও ১৯২১-এ এসে ৫০০,০০০ (এর ঠিক উল্টো দিকে আদমশুমারির হিসাবে ব্রাহ্মদের সংখ্যা কখনোই কয়েক হাজারের বেশি ছিল না)।

আমিষ বনাম নিরামিষ আহার আর ইংরিজি-ভাবিত বনাম সংস্কৃত-ভিত্তিক শিক্ষা—১৮৯৩-এ এই দুই প্রশ্নে আর্যসমাজ ভেঙে যায়। হংসরাজ ও লাজপত রায় পরিচালিত নরমপন্থী 'কলেজ' উপদলটি তখন থেকে সার বেঁধে 'দয়ানন্দ ইঙ্গ-বৈদিক' (ডি এ ভি) কলেজ গড়ে তোলার দিকে মন দেন। তাঁরা সময়বিশেষে কংগ্রেস রাজনীতিতে ও আরও বেশি একনাগাড়ে স্বদেশী উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। লেখ রাম ও মুন্‌শী রাম ছিলেন আরও খোলাখুলি পুনরুত্থানবাদী ও লড়াকু 'গুরুকুল' উপদলটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০২-এ তাঁরা হরিদ্বার গুরুকুলের পত্তন করেন (ডি এ ভি-র মতো এটি সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভূত ছিল না, এর ভিত্তি ছিল ব্রহ্মচর্য ও বৈদিক শিক্ষণ)। তাঁরা জোর দেন বেতনভুক্ প্রচারক ও শুদ্ধির মাধ্যমে ধর্মান্তর করানোর দিকে। দুটি গোষ্ঠীর মধ্যেই অবশ্য 'আর্যধর্ম থেকে হিন্দু চেতনায়' (কেনেথ জোন্‌স্) সরে আসার সাধারণ ঝোঁক দেখা যায়—আর প্রায়শই বেশ প্রকাশ্য সাম্প্রদায়িক ও মুসলমান-বিরোধী চেতনা। আহ্‌মেদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিক্ত বাগ্‌বিতণ্ডার পরিণামে ১৮৯৭-এ নিহত হন লেখ রাম। আর ফেব্রুয়ারি ১৯০৯-এ লাজপতের

সহযোগী লালা লালচন্দের একটি প্রবন্ধ, 'রাজনীতিতে আত্মবিসর্জন' বেরয় *পাঞ্জাবী* পত্রিকায়। উত্তরকালের হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের ভাবাদর্শের বহু পূর্বসূচনাই সেখানে ছিল। হিন্দুদের নিজস্ব সমস্যা ও দাবি-দাওয়াকে অবহেলা করার জন্যে কংগ্রেসকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন লালচন্দ। 'প্রতিটি হিন্দুর মনে এই চেতনা জাগতে হবে যে, তিনি একজন হিন্দু, শুধুই-ভারতীয় নন'—আর তাই 'কংগ্রেস কমিটির জায়গায় হিন্দু সভা, কংগ্রেস প্রকাশনের জায়গায় হিন্দু প্রকাশন, খবর সংগ্রহ ও আত্মসহায়ের মাধ্যমে প্রতিকারের উপায় সন্ধানের জন্যে নিয়মমাফিক দফ্‌তর এবং আনুষঙ্গিক উপকরণ সমেত এক হিন্দু প্রতিরক্ষা তহবিল গঠন' করা দরকার। তাই গোড়ায় অনেক শত্রুতা সত্ত্বেও (যার মধ্যে এমনকি দয়ানন্দের জীবননাশের একাধিক চক্রান্তও পড়ে) আর্যসমাজ কার্যত গোঁড়া হিন্দুয়ানির চালচলনের বেশ কাছাকাছি চলে আসে। উনিশ শতকের শেষ দিকে নানা হরিসভা, সনাতন ধর্মসভা, কুম্ভমেলাগুলোর বহু সম্মিলন ও ১৯০০-য় দিল্লীতে এক বিরাট সম্মিলন যার থেকে ভা র ত ধ র্ম ম হা ম ণ্ড লে র সূচনা—এ সবের মধ্যে দিয়ে গোঁড়ারা নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। এইসব সাংগঠনিক প্রয়াস এখনও ঐতিহাসিকদের মনে যথেষ্ট আগ্রহ জাগাতে পারে নি।

এইভাবে এক আক্রমণাত্মক হিন্দু সত্তার বিঘোষণায় 'পুনরুত্থানবাদে'র সুস্পষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু এও যোগ করা দরকার : 'সংস্কার' আন্দোলনের সঙ্গে এর তফাত ছিল মাত্রায়, ধরনে নয়। ব্রাহ্ম বা প্রার্থনা সমাজের মতো 'আধুনিকতাধর্মী' প্রবণতা বা তরুণ বঙ্গ (ইয়ং বেঙ্গল) বা বিদ্যাসাগরের আরও ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলনগুলির উপাদান ছিল পুরোপুরি হিন্দু। অল্প কিছু ব্যতিক্রম বাদে, সেগুলোও 'মুসলিম স্বৈরাচার' বা 'মধ্যকালীন' অন্ধকার যুগের ধারণা নিয়েই চলত (বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে এই ধারণা যতটা পাওয়া যায় প্রায় ততটাই পাওয়া যায় রামমোহন ও ডিরোজিওপন্থীদের মধ্যেও)। ব্রিটিশ শাসন ও তার সহগামী তথাভিহিত 'রেনসাঁস' বা 'জাগরণ' ছিল তার থেকে মুক্তি। মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের কাছে এই তত্ত্বের কোনো আবেদন থাকবে—কখনোই এমন আশা করা যায় না। আবার, প্রাচীন মান ও মধ্যশ্রেণীর সম্ভ্রমের জায়মান নিয়মনীতির নাম করে হিন্দু ধর্ম ও সমাজকে 'মধ্যকালীন' স্থূলতা ও কুসংস্কার-মুক্ত করার চেষ্টা হয়েছিল বটে, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান সাধুপুরুষ বা ধর্মস্থানে দু ধর্মের মানুষের অর্চনার মতো প্রচলিত সমন্বয়ধর্মী প্রথাকে কখনও কখনও আক্রমণও করা হতো। প্রায় একই সময়ে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ আন্দোলন গড়ে উঠছিল (যেমন, আদি ইসলামের বিশুদ্ধতা ও কঠোরতায় ফিরে যাওয়ার জায়গা থেকে সুফি বহুগ্রাহিতাকে আক্রমণ)। এর ফলে দুই সম্প্রদায়ই একে অন্যের থেকে দূরে সরে যেতে থাকে—শিরোমণি স্তরে (উত্তর-ভারতে ঊর্ধ্বভিত্তিক সংস্কৃতির মিলনসূত্র প্রচণ্ড একটা চাপের মুখে পড়ে) আর চাষীসাধারণের স্তরেও। যেমন, প্রায় শতাব্দী প্রান্তের জেলা গেজেটিয়ার ও বাঙলায় লেখা চরিতসাহিত্যে দুর্গাপূজা বা মহরমের মতো উৎসবে দুই ধর্মের মানুষদের যোগ দেওয়া ও নানা সমন্বয়ধর্মী লোকপ্রচলিত অর্চনারীতিকে প্রায়শই স্মরণ করা হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিলীয়মান ঘটনা বলে।

ভারতীয় ইসলামের বিবিধ প্রবণতা

উনিশ শতকের শেষ ভাগে ভারতীয় ইসলামের মধ্যে প্রথম এক সুস্পষ্ট সংস্কারবাদী-বনাম-

পুনরুত্থানবাদী সঙ্ঘাতের নকশা প্রকট হলো বলে মনে হয়। প্রথমটির ঝোঁক ছিল রাজভক্তি, দ্বিতীয়টি ব্রিটিশ-বিরোধী। সার সৈয়দ আহ্‌মেদ খানের আলীগড় আন্দোলন ও দেওবন্দ-এর দার-উল-উলুম (সিপাহী বিদ্রোহের দুই অভিজ্ঞ যোদ্ধা, মহম্মদ কাসিম নানাবতবী ও রশিদ আহ্‌মেদ গঙ্গোহি এই শিক্ষালয়ের প্রতিষ্ঠাতা) ছিল দুই মেরুর প্রতিনিধি। বি জ্ঞা ন স মা জ (সায়েন্টিফিক সোসাইটি, ১৮৬৪), আধুনিকতাপন্থী উর্দু পত্রিকা *তহজিব আল-আখলাক* (১৮৭০) ও আলীগড় অ্যাংলো-মহামেডান ওরিয়েন্টাল কলেজ (১৮৭৫)—এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পশ্চিম-যুক্ত প্রদেশের উঁচুশ্রেণীর মুসলমানদের ইংরিজি শিক্ষার গুণ ও উপকারিতায় মতান্তরিত করার চেষ্টা করেন সৈয়দ আহ্‌মেদ। তাঁর ইসলাম-ব্যাখ্যানে মুক্ত সন্ধানের (ইজতিহাদ) বৈধতা আর কোরানের প্রত্যাদেশ ও আধুনিক বিজ্ঞান-আবিষ্কৃত প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে তথাভিহিত মিলের ওপর জোর দেওয়া হয়। তাহলেও আলীগড়ে ধর্মতত্ত্বের পাঠন চালাতেন গোঁড়া মোল্লারা, আর আলীগড় আন্দোলনের আধুনিকতাপন্থী উপাদানগুলি কালে কালে যথেষ্ট ক্ষীণ হয়ে আসে, বিশেষ করে মহসিন আল-মূল্‌ক্‌-এর অধীনে। কিন্তু যা আরও গুরুত্বপূর্ণ তা হলো ঃ সৈয়দ আহ্‌মেদ সর্বদা জোর দিতেন মুসলমান হিসেবেই উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিমী শিক্ষা আমদানির প্রয়োজনীয়তার দিকে, আর এইভাবেই তাঁদের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ ঐক্যের মনোভাগ জাগিয়ে তোলার দিকে। তাঁর কর্মসূচি খাপে খাপে মিলে গেল নতুন ব্রিটিশ নীতির লক্ষ্যের সঙ্গে। ১৮৭১-এ মেয়ো-র ফরমাশে লেখা হান্টার-এর *ইন্ডিয়ান মুসলমানস্‌* বইটিতে তাকে সূত্রাকারে উপস্থিত করা হয়েছে এইভাবে ঃ ব্রিটিশরা 'মুসলমানদের এক উদীয়মান প্রজন্মের বিকাশে' সাহায্য করবে ... 'পাশ্চাত্ত্যের ভব্য ও নম্র জ্ঞানে যারা অনুরঞ্জিত। সেই সঙ্গে নিজ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সম্ভ্রম আদায় করার জন্য তারা তাদের ধর্মবিধির সঙ্গেও পর্যাপ্ত পরিচয় রাখবে ...'। ফলে আলীগড় বেশ অসঙ্গত পরিমাণ ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষণ লাভ করে, যার মধ্যে বড়লাট, লর্ড নর্থব্রুক-এর ব্যক্তিগত দান ছিল ১০,০০০ টাকা। ফ্রান্সিস রবিনসন যেমন দেখিয়েছেন, সবকিছুর ওপরে, ব্রিটিশ সমর্থনেই 'যে-মানুষটির ধর্মীয় মতামত ছিল এতই মুক্ত যে তাঁর সহ-ধর্মীদের অধিকাংশই তাঁকে ধর্মদ্রোহী বলে চিহ্নিত করত, তাঁকেই তুলে ধরা হলো তাঁর সম্প্রদায়ের প্রবক্তা হিসেবে।' (*সেপারেটিজম্‌ অ্যামাং ইন্ডিয়ান মুসলিমস্‌*, পৃ. ১৩১)।

সৈয়দ আহ্‌মেদের সামাজিক ভিত্তি জুগিয়েছিল যুক্ত প্রদেশের মুসলমান জমিমালিক ও পরম্পরাগত চাকরিজীবী পরিবারবর্গ। আলীগড়-বুলন্দশহর অঞ্চলে জমি-মালিক ছিলেন অজস্র, আর অবধের ২৭২টি তালুকদার পরিবারের ৭৬টি ছিলেন তাঁরাই। আর চাকরিজীবীরা ছিলেন এক সুবিধাভোগী কিন্তু ক্রমক্ষীয়মাণ গোষ্ঠী। ১৮৫৭-য় প্রদেশের ৬৩.৯% অধস্তন বিচারবিভাগীয় ও প্রশাসনিক পদ এঁরাই দখল করেছিলেন, ১৮৮৬-৮৭-তে ৪৫.১% ও ১৯১৩-য় ৩৪.৭% (১৮৮৬-৮৭-তে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ও অবধে মুসলমানরা ছিলেন মোট জনসংখ্যার ১৩.৪ ভাগ মাত্র)। বাঙলার কিছুটা বিশেষ অবস্থার (এখানে নগরবাসী উচ্চ বা মধ্য-শ্রেণীর মুসলমান ছিলেন তুলনায় কম সংখ্যক) ভিত্তিতে হান্টার এক সাধারণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন ঃ 'পশ্চাৎপদতা'ই বিচ্ছিন্নতাবাদের হেতু। বহু ব্রিটিশ বড়কর্তা ও মুসলমান নেতা তা-ই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা ছিল উল্টো। বিচ্ছিন্নতাবাদের আসল কারণ এই যে, হিন্দু ব্যবসাদার,

মহাজন ও বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী জমি কিনে নিচ্ছিল, পুরসভা দখল করছিল ও পরম্পরাগত (মুসলমান) শিরোমণি গোষ্ঠীর জায়গায় চাকরি পাচ্ছিল; ফলে ঐ শিরোমণি গোষ্ঠীটি আরও বেশি করে আশঙ্কিত হয়ে ওঠে। একই ধরনের ঘটনার উল্টো পিঠ দেখা যায় পাঞ্জাবে। সেখানে ব্যবসা ও বিভিন্ন বৃত্তিতে আগে ছিল খত্রী, অরোরা ও বাদিয়াদেরই প্রাধান্য। তার বিরুদ্ধে মুসলিম চ্যালেনঞ্জ-কেই আর্যসমাজী পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন কেনেথ জোন্স।

গোড়ায় ব্রিটিশরা আলীগড় আন্দোলনকে সমর্থন করে। এটি কংগ্রেসি ধরনের জাতীয়তাবাদের (তখনও অবধি সেটি খুব একটা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠেনি) বিরুদ্ধে পাল্লা দেওয়ার দরকার থেকে ততটা করা হয় নি, যতটা করা হয়েছিল ভারতীয় ইসলামের অন্য কতক প্রবণতার ব্যাপারে সরকারি ভয়ের দরুন। সেগুলি হলো তথাকথিত 'ধর্মোন্মাদনা' ও বিদেশী-বিরোধী মানসিকতা। কয়েকজন ধর্মীয় নেতা ছিলেন তার প্রচারক। পিটার হার্ডি যাকে বলেছেন 'শিল্পায়ন-পূর্ব নিম্ন মধ্যশ্রেণী, ছোটো জমি-মালিক, গ্রাম-মফস্বলের মোল্লা, শিক্ষক, গ্রন্থবিক্রেতা, খুদে দোকানি, অধস্তন কর্মচারী ও দক্ষ কারিগর ... নিজ ভাষায় সাক্ষর মানুষ ... ধর্মীয় ভাবাবেগে যারা দ্রুত আক্রান্ত হয়' (*মুসলিমস্ অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*, পৃ ৫৮), তাঁদের মধ্যে প্রায়শই এই প্রচার সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া ফেলত বলে মনে হয়। উনিশ শতকের শেষ দিক নাগাদ হিন্দুদের মধ্যেও মোটের ওপর এই ধরনের সব গোষ্ঠীই পুনরুত্থানবাদ ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল। এ ক্ষেত্রে, ১৮৫৭-র স্মৃতি—মুসলমানদের বিশিষ্ট ভূমিকাকে যেমন কিছুটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছিল—আর ১৮৬০-এর দশকের 'ওয়াহবি' সীমান্ত যুদ্ধ ও ষড়যন্ত্রের আতঙ্ক মিশে গিয়েছিল। পরের দশক নাগাদ ওয়াহবি (আরও সঠিকভাবে, 'তারিকাহ্-এ-মুহম্মেদিয়াহ্') আন্দোলনের রাজনৈতিক, ব্রিটিশ-বিরোধী দিকগুলি দমন করা হয়; টিঁকে থাকে শুধু ইসলামীকরণের অবিরাম প্রচার-অভিযান। বিশেষ করে তা সক্রিয় ছিল গ্রাম বাঙলায়। তার লক্ষ্য ছিল নানা সমন্বয়বাদী ভজনরীতি, 'শির্ক' ও 'বিদ্অহ' (বহুদেববাদ ও পাপজনক প্রবর্তনা)। এ ধরনের যাবতীয় অতিনৈতিক আন্দোলন ছিল তাই অদ্ভুত শাঁখের করাতের মতো—সময়ে সময়ে বীরের মতো ব্রিটিশ-বিরোধী, আবার অভ্যন্তরীণ সঙ্ঘাতগুলোয়ও তা ইন্ধন জোগাতে পারত। এ বাবদে শিখদের কুকা সম্প্রদায় এর প্রায় সমজাতীয়। ১৮৭২-এ তাঁরা ব্রিটিশদের কামানের মুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে মাঝে মধ্যে তাঁদের স্বাধীনতা-সংগ্রামী বলে তারিফ করা হয়। তাহলেও, তাঁদের ক্রিয়াকলাপ ছিল প্রধানত গোহত্যার ব্যাপারে ইসলামের ওপর তীব্র আক্রমণ চালানো। তারই পরিণামে ১৮৭১-এ অমৃতসর ও লুধিয়ানায় কয়েকজন মুসলমান কসাই খুন হন।

১৮৬৭-তে দেওবন্দে যে ধর্মীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা করা হয় তাতে আরও চাপা ধরনের ব্রিটিশ-বিরোধী মেজাজ বজায় ছিল। এঁরা ছিলেন কট্টর গোঁড়া (ওয়াহবিদের মতো নয়), ধর্মতাত্ত্বিক অভিনবতা ও (ব্রিটিশদের কাছে) রাজনৈতিক আনুগত্য—দু কারণেই সৈয়দ আহ্মেদের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন। দেওবন্দ আকৃষ্ট করেছিল তুলনায় গরিব ছাত্রদের, পশ্চিমী শিক্ষার খরচ চালাতে যারা অপারগ। এখান থেকে বেরনো মাদ্রাসা-শিক্ষকদের মাধ্যমে দেওবন্দের প্রভাব থেকে গিয়েছিল। বিশ শতকে মোটামুটি বিনা-ব্যত্যয়েই এই প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদকে সমর্থন জুগিয়ে গেছে। সর্ব-ইসলামি ভাবাবেগের যে প্রমাণ মাঝে মাঝে পাওয়া

যেত, আমাদের আলোচ্য পর্বে তা-ই অবশ্য ব্রিটিশদের আশঙ্কিত করেছিল আরও বেশি। বিশেষ করে ১৮৭৬-৭৮-এর বল্‌কান যুদ্ধ ও ১৮৯৬-৯৭-এর গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধের সময়ে অটোমান সুলতান-খলিফার দূরস্থ মূর্তি জাগিয়ে তুলত সেই ভাবাবেগ। আধুনিক সর্ব-ইসলামদের জনক জামাল আল-দিন আল-আফগানি স্বয়ং ১৮৭৯ থেকে ১৮৮২-র মধ্যবর্তী সময়ে ভারতেই ছিলেন। তিনি লেখালেখি করতেন আর বক্তৃতা দিতেন হায়দরাবাদ ও কলকাতায়। যদিও *রেফুটেশন অফ দি মেটেরিয়ালিস্টস্* (১৮৮২)-এ তিনি সৈয়দ আহ্‌মেদকে প্রচণ্ড আক্রমণ করেন, তাহলেও আধুনিক গবেষণায় এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, তাঁর আসল বিবাদ ছিল ব্রিটিশদের প্রতি সৈয়দ আহমেদের বশংবদতা নিয়ে। আল আফগানির নিজের ধর্মতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা ছিল অন্তত সমান বিপন্থী। কলকাতার ছাত্রদের কাছে বক্তৃতায় (তার একটি হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটের অ্যালবার্ট হল্-এ, এখন যা কফি হাউস) তিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্যে আবেগভরা আবেদন জানান। এর তাৎক্ষণিক অভিঘাত বোধহয় সামান্যই পড়েছিল। কিন্তু দেখা দিচ্ছিল এক নতুন প্রবণতা, সেটিও আবার প্রগাঢ় রকমের দ্বিমুখী। ১৮৯০-এর দশকের শেষে এমনকি কলকাতার মুসলমান চটকল-শ্রমিকদেরও যে সুলতানকে দূরবর্তী কিন্তু শক্তিমান রক্ষক হিসেবে দেখতে শেখানো হচ্ছিল তারও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। কলকাতায় ১৮৯৭-এর দাঙ্গায় সর্ব-ইসলামবাদ মদত জুগিয়েছিল; কুড়ি বছর পর খিলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে কিছুকালের জন্যে তা-ই পরিণত হবে শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী এক শক্তিতে।

ওপরের সমীক্ষা থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, উনিশ শতকের শেষে ভারতীয় সমাজের অনেক সঙ্ঘাতই ছিল হিন্দুত্ব বা ইসলামের নিজেদের ভেতরকার নানা প্রবণতার বিসংবাদ, দুটি বড় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মোকাবিলা নয়। কিন্তু ১৮৮০-র ও '৯০-এর দশকেই খোদ সাম্প্রদায়িকতা'ও সর্বভারতীয় মাত্রা-গোছের কিছু একটা অর্জন করছিল। উর্দু-দেবনাগরী বিতর্ক ও গোরক্ষা ছিল দুটি প্রধান বিষয়। ১৮৬৮-তে দেবনাগরী হরফ ব্যবহারের দাবি প্রথম তোলেন বেনারসের কিছু হিন্দু; ছোটোলাট ম্যাক্‌ডোনেল ১৯০০-য় তা মঞ্জুর করেন। স্পষ্টতই এটি ছিল যুক্ত প্রদেশের প্রাচীন ও নবীন শিরোমণিদের মধ্যেকার টানাপোড়েনের সঙ্গে জড়িত। এও কৌতূহলের যে, আলাদা এক সত্তা হিসেবে মুসলমানদের কথা সৈয়দ আহ্‌মেদ প্রথম বলতে শুরু করেন ১৮৬৯-এ, ঐ হরফ-বিতর্কেরই প্রসঙ্গে—বাস্তবে তাঁর বি জ্ঞা ন স মা জ-এ মুসলমানের চেয়ে হিন্দু সদস্যই ছিল বেশি। শেষ বিচারে অবশ্য গোরক্ষার বিষয়টিই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। সম্প্রতি প্রকাশিত এক পর্যালোচনায় ম্যাক্‌লেন দেখিয়েছেন, শিরোমণিদের সাম্প্রদায়িকতা ও সাধারণ মানুষের সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এটিই যোগসূত্রের কাজ করেছিল। হিন্দু গোরক্ষকরা এ বিষয়ে আইন তৈরির আশা করে ও বিক্ষোভ দেখায়। তথাভিহিত 'স্বাস্থ্যে'র কারণে কসাইখানা ও কাবাবের দোকানে কড়াকড়ির জন্যে উপ-বিধি পাশ করে যুক্ত প্রদেশের বহু পৌরসভা। নির্বাচন চালু হওয়ার ফলে হিন্দুরা সংখ্যাগুরু হবে আর অনেকেই যাকে ধর্মের সার অংশ মনে করে তার ওপর বাধানিষেধ বসবে—মুসলমান রাজনীতিকরা এমন আশঙ্কা করতেন। ১৮৮১-তে দয়ানন্দ এ বিষয়ে *গৌকরুণানিধি* নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৮০-র দশকের শেষ থেকে উত্তর-ভারতের বহু জায়গায় গো র ক্ষি ণী স ভা গজিয়ে উঠতে শুরু করে। কিছু উকিল ও জমিদারের পৃষ্ঠপোষণ ও কিছু পরিব্রাজক সাধুর কার্যকলাপ

তাতে উৎসাহ জুগিয়েছিল। গরু শুধু বহুপ্রাচীন ধর্মীয় প্রতীকই নয়, জমির পরে গরুই হলো চাষীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর্থনীতিক সম্পদ। অন্যদিকে শিক্ষিত হিন্দুরা আকৃষ্ট হতেন এই যুক্তিতে যে, গোরক্ষায় সমস্ত ভারতীয়েরই স্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি বাড়বে। ১৮৯২-৯৩ 'র পরে গোরক্ষিণী সভাগুলো বেশি করে জঙ্গী হয়ে উঠছিল। তার আগের বছর যে সহবাস সম্মতি আইন পাশ হয়, এটি ছিল সম্ভবত খানিকটা তারই বিরুদ্ধে গোঁড়াদের ক্ষোভের প্রতিফলন। খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, গরু বিক্রি বা জবাই-এর ব্যাপারে জোর করে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, এমনকি বিচারসভাও বসছে, যেখানে কসাইকে জরিমানা বা সামাজিক বয়কট করে শাস্তি দেওয়া হয়। ইসলামি পুনরুত্থানবাদী প্রবণতা একই সঙ্গে বকর-ইদ কোরবানির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছিল। এইভাবেই জুন-জুলাই ১৮৯৩-এর বড় মাপের দাঙ্গাগুলোর জমি তৈরি হলো। দাঙ্গা শুরু হয়েছিল আজমগড়ের মৌ-তে। গাজীপুর আর বালিয়া জেলা থেকে আসা লোকজন বড় সংখ্যক মুসলমান অধিবাসীদের আক্রমণ করে। সবচেয়ে সংগঠিত দাঙ্গা হয় বালিয়ায়—এক রাজপুত জমিনদার সেখানে ছিল খুবই তৎপর। সবচেয়ে ব্যাপক দাঙ্গা (মোট ২২টি) ঘটে সারন, গয়া ও পাটনায়, যেখানে অনেক বড় বড় গো-হাট বসত। আর সবচেয়ে রক্তাক্ত দাঙ্গা হয় বোম্বাই শহরে, মারা যান ৮০ জন। হিন্দুদের শোভাযাত্রা মসজিদের সামনে বাজনা বাজাতে পারবে কিনা—হাঙ্গামা বাধে এই নিয়ে। দাঙ্গার কবলে পড়ে আর দুটি জায়গা, জুনাগড় ও বহু দূরের রেঙ্গুন। এ ছিল একেবারেই গবনজির, প্রায় দেশজোড়া মাপের দাঙ্গা—আধুনিক জাতীয় আন্দোলন যখন সবে নিজের পায়ে হাঁটতে শিখছে তার পক্ষে বাস্তবিকই এ ছিল এক কুলক্ষণ।

পুনরুত্থানবাদ ও জাতীয়তাবাদের আরও চরমপন্থী সব রকমফেরের মধ্যে যে সংযোগের কথা প্রায়শই ধরে নেওয়া হয় তা একটু সংশয়ের বলে বোধ হয়, যেহেতু প্রথমটি থেকে একাধিক দাঙ্গা বেধেছিল, আর ভারত-সচিব কিমবার্লি তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ এটি 'ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় লোকগোষ্ঠী গঠনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসি আন্দোলনের শেকড়' কেটে দিচ্ছে (ল্যান্সডাউন-কে কিমবার্লি, ২৫ অগাস্ট ১৮৯৩)। এমনকি অন্যদিক থেকেও, মনে রাখা চাই যে, ১৯০৫-এর আগের পর্বে জাতীয়তাবাদের যা বৃহত্তম একক অবদান—সম্পদ নির্গম তত্ত্বের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের আর্থনীতিক দিকগুলোর সুবিন্যস্ত সমালোচনার সূত্র রচনা—সে-কাজ করেছিলেন দাদাভাই নওরোজী, রানাডে, জি ভি জোশী ও রমেশচন্দ্র দত্ত-র মতো মানুষরাই। এঁরা সবাই মোটের ওপর আধুনিকতাপন্থী সংস্কারকদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সমাজ-সংস্কারে উৎসাহীরাও সর্বদাই রাজনীতিতে অবধারিতভাবে জোলো নরমপন্থী ছিলেন না। ১৮৭৬-এ, ব্রাহ্ম নেতা শিবনাথ শাস্ত্রী একদল তরুণকে (যার মধ্যে বিপিনচন্দ্র পালও ছিলেন) এক লক্ষণীয় শপথ নিতে অনুপ্রাণিত করেন : সরকারি চাকরি করব না। তাঁরা এও ঘোষণা করেন যে স্বায়ত্তশাসনই আমরা একমাত্র বিধাতৃ-নির্দিষ্ট শাসন বলিয়া স্বীকার করি'। সামাজিক ও রাজনৈতিক—দু ব্যাপারেই র‍্যাডিকাল বলে জি জি আগরকরের নাম ছিল (টিলকের সঙ্গে তিনি ডে কা ন শি ক্ষা স মা জ, *কেসরী* ও *মরাঠা* সাময়িকপত্র দুটির প্রতিষ্ঠাতা, পরে দুজনের ঝগড়া হয়)। ১৮৯৫-এ তাঁর অকালমৃত্যুর পর সংস্কারপন্থী পত্রিকা *সুধারক*-এর সম্পাদক হন পটবর্ধন। শিক্ষকের চাকরি থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়, আর ১৮৯৭-এ পুণায় মহামারি

নিয়ে হাঙ্গামার সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনার ভয় দেখানো হয়। অন্যদিকে, সনাতনপন্থা বা পুনরুত্থানবাদের সব প্রবক্তাই রাজনৈতিক অগ্নিশর্মা ছিলেন না। ১৮৯২-এ বেনারসে ১০,০০০ সনাতনপন্থীর এক সমাবেশ সমাপ্ত হয়েছিল সনাতন ধর্ম ও রাণী ভিক্টোরিয়া-র নামে জয়ধ্বনি দিয়ে। সমাজ-সংস্কারের পক্ষে মতান্তরিত হওয়ার পরে তবেই রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে ওঠেন অ্যানি বেসান্ট। আর আর্যসমাজীদের বেশি গোঁড়া গুরুকুল অংশটি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকত (লাজপত রায়ের 'কলেজ' উপদলের মতো নয়)। অনেক পরে, এমনকি ১৯১৩-তেও ছোটোলাট মেস্টন-কে জমকালো অভ্যর্থনা জানিয়ে গুরুকুল অংশ তার রাজভক্তি প্রদর্শন করছিল।

মোটামুটি ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদের নানা রূপের প্রতি বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের গোটা ভাবজগৎ ও কর্মজগতে মোটের ওপর ক্রমিক, অসম্পূর্ণ, প্রায়শই খাপছাড়া, তবু চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ এক দিক-পরিবর্তন ঘটছিল। আর এই পরিবর্তন সমান নাড়া দিয়েছিল বহু (যদিও কোনোভাবেই সবাইকে নয়) সংস্কারক ও পুনরুত্থানবাদীকেই। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধির নিরিখে এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা পুরোপুরি সন্তোষজনক নয়। এ কথা ঠিক যে, ভারতীয় সংবাদপত্রে (ও বহু সরকারি প্রতিবেদনে) স্নাতকদের ক্রমহ্রাসমান ভবিষ্যৎ নিয়ে বারেবারে অভিযোগ করা হচ্ছিল (এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে : স্নাতকরা স্বয়ং ছিলেন উপনিবেশবাদের ফসল। শিল্পের অতি ধীর বৃদ্ধি ও মেকলে-র আমল থেকে শুরু করে ইংরিজি শিক্ষায় মানবিকবিদ্যার দিকে যে-ঝোঁক ছিল তার ফলে স্বাধীন বৃত্তি ও সরকারি চাকরিতে অতিমাত্রায় ভিড় জমা ছিল অনিবার্য)। তবুও এ কথা মনে রাখতে হবে যে, খোদ চাকরির প্রতিযোগিতাই খুব সহজে আঞ্চলিক বা সাম্প্রদায়িক ধারা বেয়ে খণ্ড-চেতনার দিকে নিয়ে যেতে পারত। এমন ঘটনার একাধিক দৃষ্টান্ত আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি : যুক্ত প্রদেশে হিন্দু-মুসলমান শিরোমণি সংঘর্ষ বা উত্তর-ভারতের বড় একটা অংশে বাঙালির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা হ্রাস। গোড়ার দিকের কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ ও যোগদাতাদের বেশির ভাগই বেকার যুবক ছিলেন না, বরং ছিলেন সফল ও বেশ সমৃদ্ধিশালী বৃত্তিজীবী। বর্ণ বৈষম্য ছিল অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান—ইলবার্ট বিল নিয়ে হট্টগোল তার প্রধান অভিপ্রকাশগুলির একটি মাত্র। আর ব্রিটিশ সরকারি নীতি ও দেশের নগ্ন দারিদ্র্যের মধ্যে যে-যোগ আছে (১৮৭০ ও ১৮৯০-এর দশকে একের পর এক দুর্ভিক্ষে তা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল) সে-ব্যাপারেও একটা বোধ দেখা দিচ্ছিল আরও বেশি করে। তবুও অণু-স্তরে এর ব্যাখ্যা খুঁজলে দেখানো যায় যে, কর্মজীবনের সূচনায় কংগ্রেসের আইনজীবী নেতাদের যথেষ্ট বাধা পেরোতে হয়েছিল, যা আসত শ্বেতাঙ্গদের তরফ থেকে। যেমন, ১৮৭৩-এ বোম্বাই-এ অসঙ্গত ব্রিটিশ প্রতিযোগিতার অভিযোগ তুলে ফিরোজশাহ্ মেহটা মফস্বলের ওকালতিতেই কাজ কেন্দ্রীভূত করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৮১-তে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সন্নিযুক্ত ব্যবহারিক (স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল) নিয়োগ করা হলো না। মাদ্রাজ ও কলকাতার ভারতীয় উকিলরা শ্বেতাঙ্গদের কনিষ্ঠ কৌসুলি হিসেবে কাজ করতে নারাজ হলেন, তবেই তাঁরা বড় আদালতের আদিম (অরিজিনাল) বিভাগের মামলায় ব্যারিস্টার ছাড়াই দাঁড়ানোর অধিকার পেলেন। সিভিল সার্ভিস-এর ভেতরে পক্ষপাতের দরুন সময়বিশেষে অবধারিতভাবেই আরও মুখচাপা ধরনের স্বাদেশিকতা লালিত হতো—যেমন, ব্রজেন্দ্রনাথ দে-

র মতো মানুষদের মধ্যে। রাণীগঞ্জের শ্বেতাঙ্গ খনি-মালিকদের হাতে নিগৃহীত ভারতীয়দের পক্ষে তিনি হস্তক্ষেপ করেন। তার পরে তাঁর বড়কর্তা জন বিম্‌স্‌-এর ইচ্ছের বিরুদ্ধে ইলবার্ট বিল সমর্থন করে আরও পাপ করেছিলেন। তাই বারেবারে তাঁর (পাওনা) পদোন্নতি থেকে তিনি বঞ্চিত হন। জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলে আর একজন বাঙালি জেলা মুন্সেফ একটি অপ্রকাশিত দিনলিপি রেখে গেছেন। তার পুরোটাই তীব্র ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবে ভরা। বর্ণগত পক্ষপাত আর গণ-দারিদ্র্য—দুই-ই তাতে আঁচ দিয়েছিল।

সাহিত্যে স্বাদেশিকতা

বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর স্বাদেশিকতার প্রাথমিক ও স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের মধ্যে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার আধুনিক সাহিত্যের (বিশেষ করে গদ্যের, উনিশ শতকের আগে যার খুব একটা উন্নতি হয় নি) সর্বত্রই উদয় হয় সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রে (যেমন, বাঙলা গদ্যের বিকাশে রামমোহন ও বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে)। পরে তার দায় তুলে নেয় নতুন দেশপ্রেমিক মনোভাব। ১৮৬০-এর ও '৭০-এর দশকে বাঙলায় বহু দেশাত্মবোধক কবিতা ও গানে দেশের দুর্দশা নিয়ে বিলাপ করা হয়েছে, কখনও কখনও হস্তশিল্পের অবনতিরও উল্লেখ করা আছে সরাসরি। এর অনেকগুলিই লেখা হয়েছিল হি ন্দু মে লা উপলক্ষ্যে। ঠাকুর পরিবারের পৃষ্ঠপোষণে ১৮৬৭ থেকে নবগোপাল মিত্র কয়েক বছর এটির ব্যবস্থা করেন। সদাস্থাপিত নাট্যশালা ছিল আরও অনেক প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী—দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ*-এ (১৮৬০) নীলকরদের স্বরূপ খুলে ধরা থেকে ১৮৭০-এর দশকের কিছু নাটক অবধি। সরাসরি এর দরুনই আসে ১৮৭৬-এ লিটন-এর নাট্যাভিনয় আইন। একক মহত্তম প্রভাব ছিল বঙ্কিমের। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস চূড়ান্ত রূপ পায় 'বন্দে মাতরম্' গান সমেত *আনন্দমঠ*-এ (১৮৮২)। প্রবন্ধ তথা উপন্যাসের মাধ্যমে বঙ্কিম দেশের ইতিহাস সম্পর্কে এক নতুন আগ্রহ জাগানোর চেষ্টা করেন। সারা পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদের যে সুর, তাঁরও সুর ছিল তা-ই। এও অবশ্য কৌতূহলের যে, ১৮৮০-র ও '৯০-এর দশকে—বাঙলায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদ যখন তুঙ্গে—রাজনৈতিক আগ্রহে খানিক ভাঁটা পড়েছিল মনে হয়। নাট্যশালায় তখন প্রাধান্য ছিল গিরিশচন্দ্র ঘোষের ভাবালু পারিবারিক পালা বা পৌরাণিক নাটকের। সরাসরি রাজনৈতিক বিষয়বস্তু ছিল সামান্যই। ১৯০৩-এ বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, ইলবার্ট বিল-এর সময় থেকে 'রাজনীতি অবহেলিত হয়েছে বিমূর্ত ধর্মের স্বার্থে। আর পরিণামে পুরনো সব জাতীয় সঙ্গীতের স্থান নিয়েছে ধর্মীয় সঙ্গীত' (*নিউ ইণ্ডিয়া*, ১৯ মার্চ ১৯০৩)।

জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিক সাহিত্যের বিকাশের মধ্যে সংযোগের মোটামুটি একই ধরনের ছক দেখা যায় দেশের অন্যান্য অংশেও। বিভিন্ন কালপর্বে তা ঘটেছে। আবার বিশেষ বিশেষ এলাকার স্বাদেশিক ক্রিয়াকলাপের উদ্ভবের সঙ্গেই মোটামুটি তার সাযুজ্য দেখা যায়। মহাদেব গোবিন্দ রানাডে তাঁর 'মারাঠি সাহিত্যের উত্থান বিষয়ক রচনা'য় (১৮৯৮) মারাঠি প্রকাশনের দ্রুত বৃদ্ধির এক তালিকা করেন (১৮১৮-২৭-এর মধ্যে মাত্র ৩টি, ১৮৪৭-৫৭-য় ১০২, ১৮৬৫-৭৪-এ ১৫৩০, ১৮৮৫-৯৬-এ ৩৮২৪)। ১৮৪০-এর দশক থেকে মধ্যযুগের মারাঠি ভক্তি

কবিদের নব সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগের বিষয়টিতে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেন। এর পরেই আসে পুরনো মারাঠি কালপঞ্জি (*বখর*) প্রকাশ। রানাডে-র নিজের ঐতিহাসিক রচনা ও নিবন্ধাবলিই এক অর্থে শিবাজী-ভজনার সূত্রপাত করে। ১৮৯৫ থেকে সেটি গ্রহণ করেন টিলক। সতেরো শতকের পুনরুত্থানকে রানাডে অবশ্য ভক্তি-সন্তদের (যাঁরা জাতিভেদ অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন) অনুপ্রেরণায় এক ধরনের প্রতিবাদী (প্রটেস্টান্ট) আন্দোলন হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর মনে হয়েছিল, পরবর্তী পেশওয়াদের গোঁড়ামিই মারাঠাদের অবনতির জন্যে অংশত দায়ী। ১৮৯০-এর দশক নাগাদ শিবাজী সম্পর্কে পুরোপুরি আলাদা একটি মত হাজির করেন টিলক, কেলকর ও রাজওয়াড়ে। হিন্দু জঙ্গীপনার বাহক হিসেবে শিবাজীর গুরু রামদাসের ভূমিকার ওপর তাতে জোর দেওয়া হয়। স্পষ্টই বোঝা যায়, দু পক্ষই সমকালীন পার্থক্যকে প্রতিভাসিত করছিলেন অতীতে। তৃতীয় একটি মতও ছিল। যেমন, ১৮৬৯-এ লেখা এক গাথায় জ্যোতিবা ফুলে শূদ্র রাজা হিসেবে শিবাজীকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছিলেন। আরও প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ভাববস্তুও ফুটিয়ে তোলা হয়—আবার সেই নানা বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে। 'লোকহিতবাদী' গোপাল হরি দেশমুখ তাঁর *শতপত্র* গ্রন্থমালায় (১৮৪৮-৫০, এতে সমাজ-সংস্কারের ডাক দেওয়া হতো) দেশীয় উদ্যোগের পক্ষে প্রচার করেন, কিন্তু মোটের ওপর স্বাগত জানান ব্রিটিশ শাসনকে। এর এক পুরুষ পরে বিষ্ণু কৃষ্ণ চিপলুণকর-এর পত্রিকা *নিবন্ধমালা*-য় (১৮৭৪-৮১) ছিল কঠোর পুনরুত্থানবাদী ও ব্রিটিশ-বিরোধী সুর।

বাঙলা ও মারাঠির দৃষ্টান্তগুলি থেকে অবশ্য একটা কথা স্পষ্ট : ভারতের নানা মানবগোষ্ঠীর ভাষায় রচিত স্বদেশী সাহিত্যের বিকাশে কিছুটা দ্বিমুখিতা ছিল। মোটামুটি একই সময়ে তা গিয়েছিল জাতীয়, আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক চেতনাকে লালন করার দিকে। বাঙলার ইতিহাসই ছিল বঙ্কিমের মূল বিবেচ্য। তিনি বারবার বলেছেন, বাঙলা তার স্বাধীনতা হারায় পলাশীতে নয়, বক্তিয়ার খিলজী আসার সঙ্গে সঙ্গে। আঞ্চলিক জীবনে মুঘল কেন্দ্রীকরণের ক্ষতিকর প্রভাবের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন, আর তাঁর পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে (বিশেষ করে *আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী* ও *সীতারাম*-এ) মুসলমানদের নিন্দা করেছেন যথেচ্ছ। মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রাজপুত শৌর্য ও সাহস নিয়ে রোমান্টিক অতিকথা রচনা করেছিলেন টড। বাঙলা কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও এমনকি বাচ্চাদের বইতেও এই বিষয়টি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। চেষ্টা হয়েছিল শিবাজী-ভজনা আমদানি করার, যদিও প্রধানত ১৭৪০-এর দশকের চূড়ান্ত ধ্বংসাত্মক বর্গী হানার ভেতর দিয়েই বাঙলার সঙ্গে মারাঠা শক্তির ঐতিহাসিক যোগাযোগ ঘটে। বিপান চন্দ্র যাকে যথার্থই 'আনুকল্পিক (ভাইকারিয়াস) জাতীয়তাবাদ' বলেছেন, তা গড়ে ওঠে এই ভাবেই। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু লিখলে তা বিপজ্জনক হতে পারত (যেমন, বঙ্কিম ছিলেন সরকারি কর্মচারী)—এই যুক্তিতে মাঝে মাঝে সেটিকে ন্যায্য প্রমাণ করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশের জাগায় মুসলমানকে বসিয়ে, ঝি-কে মেরে বৌকে শেখানোর ফলও চরম ক্ষতিকর না-হয়ে যেত না। 'স্বদেশী' হিন্দু যুবকরা, বিশেষ করে ১৯০৫ থেকে, বঙ্কিমকে দেবতা করে তুলেছিলেন। তাঁর বহু রচনায় 'যবন'দের বিরুদ্ধে কটুকাটব্য ছিল। তাই এমনকি মুসলমান-এর মতো জাতীয়তাবাদের প্রতি মোটামুটি সহানুভূতিশীল মুসলিম পত্রপত্রিকাতেও তাঁকে বারবার আক্রমণ করা হয়। মুসলমান

বুদ্ধিজীবীরাও অচিরেই তাঁদের নিজস্ব ধরনের 'আনুকল্পিক জাতীয়তাবাদ' গড়ে তুলতে থাকেন। যেসব কালপর্ব বা ব্যক্তিকে (যেমন, আওরঙ্গজেব) হিন্দুরা হেয় করতেন, বিশেষ করে সেগুলিকেই তাঁরা মহিমান্বিত করেন, আর বিশ্ব জুড়ে ইসলামের হৃত গৌরবের জন্যে জাগিয়ে তোলেন স্মৃতিকাতরতা। আলতাফ হুসেন হালি ও শিবলি নোমানি-র মতো প্রান্তীয়-উনিশ শতকের উর্দু কবিরা তান ধরেছিলেন এই সুরেই। বাঙলায় এই প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে মুসলমান কবি কায়কোবাদ-এ।

তামিলনাড়ু, আর আজকাল যাকে 'হিন্দী' বলয় বলা হয়—এই দুটি প্রধান অঞ্চলে অবস্থা ছিল আরও বেশি ঘোরালো। তামিল ইতিহাস ও ধ্রুপদী তামিল সাহিত্যের আবাহনে উৎসাহ জোগান রবার্ট কল্ডওয়েল ও জে এইচ নেলসন-এর মতো ব্রিটিশ বিদ্বানরা। বিশ শতকের গোড়ায় তা এক শক্তিশালী ব্রাহ্মণ্য বিরোধী ভাব অর্জন করছিল। সহজেই এটি উত্তর-ভারতীয় আর্য-বিরোধীও হয়ে উঠতে পারত। আমরা দেখেছি, ১৮৮৬-তে লাট গ্রাণ্ট ডাফ-এর মতো ব্রিটিশ বড়কর্তারা তার বিকাশে উৎসাহ দিয়েছিলেন। আবার, সাহিত্যিক হিন্দি ছিল অনেকটাই কৃত্রিমভাবে তৈরি, হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। *ভারতেন্দু* হরিশ্চন্দ্রের (১৮৫০-৮৫) নাটক, কবিতা ও সাংবাদিকতার সুবাদে তাঁকে আধুনিক হিন্দীর 'জনক' বলা হয়। স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের আবেদনের সঙ্গে তিনি আদালতে উর্দুর জায়গায় হিন্দীর প্রচলন ও গোহত্যা নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি মূলত রাজভক্তই থেকে যান। আঠেরো ও উনিশ শতকের অনেকটা জুড়ে উত্তর-ভারতের বড় একটা অংশে হিন্দু ও মুসলমান দু-এর মধ্যেই সুভদ্র সংস্কৃতির ভাষা ছিল উর্দু। অনেক পরে, এমনকি ১৮৮১-৯০ দশকেও যুক্ত প্রদেশে ৪৩৮০টি উর্দু বই প্রকাশিত হয়েছিল, তুলনায় হিন্দী বই-এর সংখ্যা ছিল ২৭৯৩। বিভিন্ন উর্দু সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা ছিল ১৬,২৫৬, হিন্দীর ৮০০২। প্রকাশক পেতে অসুবিধে হওয়ার আগে অবধি, ১৯১৫ পর্যন্ত এমনকি প্রেমচন্দ-ও প্রধানত উর্দুতেই লিখতেন। দেবনাগরী হরফে হিন্দী লেখার পক্ষে আর্যসমাজী ও গোঁড়া হিন্দুদের প্রচারের একটা জন-আবেদন ছিল, কারণ ফারসি-ঘেঁষা উর্দু ছিল শিরোমণিদের ভাষা। কিন্তু যে অতিমাত্রায় সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দী বেশি করে প্রচার করা হচ্ছিল ও পরবর্তীকালে কিছু উৎসাহী ব্যক্তি যাকে 'জাতীয়' ভাষার মর্যাদা দিতে চেয়েছিল, আসলে তা ছিল ঐ অঞ্চলে প্রচলিত নানা জন-ভাষার (পাঞ্জাবী, হরিয়ানবী, পাহাড়ী, রাজস্থানী, অবধী, ভোজপুরী, মৈথিলী, মাগধী, ইত্যাদি) চেয়ে অনেক দূরের জিনিস। হরফ ও ভাষার পার্থক্য ক্রমেই যেভাবে ধর্মীয় পার্থক্য হয়ে পড়ছিল তা ছিল আরও অনেক বেশি অশুভ লক্ষণ। সাম্প্রদায়িকতাকে তা গণ-চেতনার আরও গভীরে প্রেথিত করছিল। এইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতে এমন সব সমস্যা দেখা দিচ্ছিল যা এখনও অবধি স্বাধীন ভারতকে উত্ত্যক্ত করার জন্যে রয়ে গেছে।

জাতীয়তাবাদী আর্থনীতিক তত্ত্ব

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় প্রধান অভিপ্রকাশ ছিল তাৎপর্যের দিক দিয়ে অনেক কম দ্বিমুখী। তা হলো বিদেশী শাসনের আর্থনীতিক সমালোচনা, সুবিধের জন্যে যাকে স ম্প দ নি র্গ ম বলা যায়। ধারণার দিক দিয়ে, এর সাহায্যেই ১৮৭০-উত্তর ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের

সত্যিই আলাদা করা যায় তাঁদের পূর্বসূরিদের থেকে। মনে করতে মজা লাগে যে, ১৮৩১-এ ব্রিটিশ সংসদের নিম্নকক্ষের প্রবর সমিতি (সিলেক্ট কমিটি)-র সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রামমোহনও তার উল্লেখ করেছিলেন, পরের এক প্রজন্ম যাকে বলবে নি র্গ ম। তিনি এমনকি এর একটা আনুমানিক হিসেবও করার চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু সমাধান হিসেবে তিনি শুধু প্রস্তাব দেন ইওরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের, কারণ ভারতে থেকে শ্বেতাঙ্গদের করা মুনাফা তাহলে দেশের বাইরে যাবে না! যা-ই হোক, ১৮৭০-এর দশক থেকে জাতীয়তাবাদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ একটা পরম্পরা গড়ে উঠতে থাকে, যার শুরু নওরোজী দিয়ে। বিস্তর বই, সংবাদপত্রের নিবন্ধ, ভাষণ ও স্মারকলিপির মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি ঘটে। এ বিষয়ে বিপান চন্দ্রের প্রামাণিক গ্রন্থটির ভিত্তি এইগুলোই। জাতীয়তাবাদী সমালোচনায় ভারতের অতলান্ত ও ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যকে সরাসরি যুক্ত করা হতো কয়েকটি ইচ্ছাকৃত ব্রিটিশ নীতির সঙ্গে—আরও নির্দিষ্টভাবে, কৃত্রিম রপ্তানি-উদ্বৃত্ত মারফত সম্পদ নির্গম, হস্তশিল্পের ধ্বংস ও তার পরে আধুনিক ভারতীয় শিল্পে বাধানিষেধ, আর অতিরিক্ত ভূমি-রাজস্বের ভারের সঙ্গে। রমেশচন্দ্র দত্তের *ইকনমিক হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া* (১৯০১-০৩)-এ ঘুরে ঘুরে এই তিনটি বিষয় আসে। প্রতিকারের যে-প্রস্তাব বারবার দেওয়া হয় তা হলো : এইসব নীতির রদবদল ও শিল্প বিকাশের জন্যে সর্বাত্মক ভারতীয় প্রয়াস। প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীরা বাস্তবিক বেশ পরিষ্কার করেই পুঁজিবাদী ধারায় স্বাধীন বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতটি সূত্রবদ্ধ করেন। অনেক আগে, এমনকি ১৮৭৩-এ ভোলানাথ চন্দ্র (শিল্পায়ন-বোধের জনৈক আদি বাঙালি সমালোচক, সমাধান হিসেবে তিনি ইংরেজদের তৈরি জিনিস 'ভোগ না-করা'র পরামর্শ দেন) দেশবাসীর কাছে শিল্প-উদ্যোগকে তাঁদের 'সকল চিন্তা প্রবাহের সাগর' করতে আহ্বান জানান। এর কুড়ি বছর পরে রানাডে আশা প্রকাশ করেন যে, 'অচিরেই শিল্পায়ন সারা জাতির ইষ্টমন্ত্র (ক্রিড) হয়ে উঠবে, আর এই প্রাচীন ভূমিতে আধুনিক ভাবের স্থায়ী বিজয় হবে সুনিশ্চিত'। টিলকের *মারাঠা*-তেও একই ভাবনার প্রতিধ্বনি করা হয় : 'আমাদের হতে হবে পুঁজিপতি ও শিল্প-উদ্যোগী ... ব্যবসায়ী, যন্ত্রকার ও দোকানদারের জাতি।' (১৩ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১)

আগের অধ্যায়ে যে আরও সাম্প্রতিক ও পরিশীলিত গবেষণার সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে তার নিরিখে বিচার করলে জাতীয়তাবাদী সমালোচনা সত্যিই খানিকটা সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রিটেনের সামগ্রিক সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতিতে ভারতের অবশ্যগণ্য ভূমিকা সম্পর্কে ধারণা ছিল সামান্যই, আর তার দুঃখ-দুর্দশার বাবদে প্রায়শই দায়ী করা হতো একক কয়েকটি 'অ-ব্রিটিশ' নীতিকে। নওরোজীর মতো মানুষরা অনেকদিন ধরেই ভাবতেন, ভদ্রভাবে বুঝিয়ে ও চাপ দিয়ে সেগুলো পাল্টানো যাবে। সমস্ত সমালোচনা সরকারি নীতির ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীভূত করার ফলে ব্যক্তিগত ব্রিটিশ পুঁজির ভূমিকাও উপেক্ষিত হয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা, ভারতীয় সমাজের ভেতরকার টানাপোড়েনকে নিশ্চিতই লঘু করে দেখা হয়। যেমন, নওরোজী ও রমেশচন্দ্র দত্ত যদিও ঠিকই বলেছিলেন যে, উৎপন্ন জিনিস বিক্রি করতে চাষীদের বাধ্য করা হতো আর বিদেশী রপ্তানি সংস্থার মাধ্যমে তা চালান করা হতো নির্গমের জন্যে প্রয়োজনীয় রপ্তানী-উদ্বৃত্ত বজায় রাখতে, তাহলেও এর কারণ শুধু রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই নিহিত ছিল না, ভারতীয় জমিনদার ও মহাজনদের শোষণও তার জন্যে দায়ী। বহু ভারতীয়ই ছিল অধস্তন সুবিধাভোগী ও

ঔপনিবেশিক শোষণের মুৎসুদ্দি। জাতীয়তাবাদীরা সাধারণত এই দিকটিকে উপেক্ষা করতেন। ভারতীয় মালিকানার কারখানায় কর্মরত ভারতীয়দের দুর্দশা নিয়ে জাতীয়তাবাদীরা সচরাচর মাথা ঘামাতে রাজি হতেন না। এর ঠিক উল্টো পিঠে, বিদেশীরা যাঁদের নিয়োগ করেছে (যেমন, আসামের কুলি) তাঁদের জন্যে প্রকাশ পেত মানবপ্রেমী ভাবাবেগ। কারখানা আইনে নারী ও শিশু নিয়োগের ব্যাপারে যৎসামান্য বাধানিষেধ চাপায়, ঠিকমতো তার প্রয়োগও হতো না। প্রধানত বোম্বাই-এর প্রতিযোগিতার দরুন দুশ্চিন্তিত ল্যাঙ্কাশায়ার-এর উপরোধেই সরকার এই আইনটি পাশ করে। বেশির ভাগ জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রই এর বিরোধিতা করেছিল। সব কিছু ছাপিয়ে, ভাবনা ছিল ভারতীয় সুতিকাপড় শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে। যেমন, ২ সেপ্টেম্বর ১৮৭৫-এ *অমৃতবাজার পত্রিকা*-য় লেখা হয়, 'এই উদীয়মান শিল্পের বিনাশের চেয়ে আমাদের যন্ত্রচালকদের বৃহত্তর মৃত্যুহার অনেক বেশি বাঞ্ছনীয়।' একমাত্র সেই ভাবনার সূত্রেই এই নির্বিকার পাশবিকতার ব্যাখ্যা (যদিও মার্জনা নয়) মিলতে পারে।

এই ধরনের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, নরমপন্থীদের আর্থনীতিক চিন্তা এখনও খুবই মনোগ্রাহী রয়ে গেছে। জাতীয়তাবাদের পরবর্তী সব পর্ব জুড়ে—চরমপন্থী, বিপ্লবী-সন্ত্রাসবাদী, গান্ধীপন্থী বা এমনকি সমাজবাদী, যা-ই হোক—এটিই ছিল বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় সমালোচনার সারকথা। সম্পদ নির্গম তত্ত্ব ঔপনিবেশিক শোষণের অন্তর্নিহিত বাস্তবতার মোটামুটি সঠিক একটা ছবি হাজির করেছিল। এ যাবৎ আমরা যত ধরনের ভাবাদর্শ ও আন্দোলনের কথা বিচার করেছি সেগুলি দেশের দুঃখের সমাধান খুঁজেছিল সমাজ-সংস্কার, পুনরুত্থানবাদ, সাম্প্রদায়িক জোট বা আঞ্চলিক আনুগত্যের মধ্যে দিয়ে। তার তুলনায় সম্পদ নির্গম তত্ত্বে অপচেতনার ভাব অনেক কম। আরও অব্যবহিত অর্থে, সম্পদ নির্গমের যুক্তিধারা কাজ করেছিল গোড়ার দিকের নরমপন্থী-পরিচালিত কংগ্রেসের দাবিদাওয়া ও কার্যকলাপের তাত্ত্বিক ভিত হিসেবে।

জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা

কংগ্রেস নেতৃত্বের কেন্দ্রে ছিলেন বোম্বাই ও কলকাতার লোকজন। ১৮৬০-এর দশকের শেষে বা ১৮৭০-এর দশকের প্রথমে আই সি এস বা আইন পড়ার সময়ে এঁরা প্রথম জড়ো হয়েছিলেন লন্ডনে। ফিরোজশাহ্ মেহটা, বদরুদ্দীন তায়বজী, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত—সবাই পড়েন দাদাভাই নওরোজীর প্রভাবে। ব্যবসায়ী-তথ্য-প্রচারক হিসেবে তিনি তখন ইংল্যান্ডেই থাকতেন। এই গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা সিভিল সার্ভিস-এ যোগ দেন নি (বা সুরেন্দ্রনাথের মতো তার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন) তাঁরা আরও কয়েকজনের সঙ্গে মিলে কয়েকটি স্থানীয় সমিতি খোলার উদ্যোগ নেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক সাধারণ-ব্রাহ্ম গোষ্ঠী (কলকাতায় যাঁদের নেতা ছিলেন দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী), পুণার রানাডে ও জি ভি জোশী, বোম্বাই-এ কে টি তেলঙ্গ, আর সামান্য কিছু পরে মাদ্রাজে জি সুব্রহ্মণ্য আয়্যার, বীররাঘবাচারী ও আনন্দ চারলু। উপাদানের দিক দিয়ে এই সব সমিতি ছিল 'মধ্যশ্রেণী'র বৃত্তিজীবীদের সংগঠন, জমিদার-চালিত নয়। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল পুণা সার্বজনিক সভা (১৮৭০), [কলকাতার] ভারতসভা

(ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ১৮৭৬; ১৮৭৭-৭৮-এ সিভিল সার্ভিস ও মুদ্রণ আইন নিয়ে এটিই প্রথম সর্বভারতীয় আন্দোলন সংগঠিত করে), মাদ্রাজ মহাজন সভা (১৮৮৪), ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৫)। ১৮৮০-র দশকের গোড়া থেকেই সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই সব গোষ্ঠীকে একত্র করার জন্যে বিস্তর প্রস্তাব ও প্রচেষ্টা হয়েছিল। এমনকি ১৮৮৩ ও ১৮৮৫-তে ভারতসভা কলকাতায় দুটি 'জাতীয় সম্মিলনে'র ব্যবস্থা করে। কিন্তু অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম-এর উদ্যোগে যার সূচনা হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত সেটিই শুধু সফল হলো স্থায়ীভাবে। ডিসেম্বর ১৮৮৫-তে অনেকটাই স্ব-নিযুক্ত ৭২ জন প্রতিনিধি বোম্বাই-এ মিলিত হলেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে।

১৮৯৮-এ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হিউম সরাসরি ডাফরিন-এর উপদেশেই কাজ করতেন। এ নিয়ে কিছু অনাবশ্যক বিতণ্ডা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি বলা হয়েছিল সম্ভ্রম লাভের উপায় হিসেবে। হিউম বারেবারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, গণহিংসা এল বলে। তা ঠেকাতে হলে শিক্ষিত ভারতীয়দের কিছু ছাড় দিতে হবে। বড়কর্তাদের কাছে তিনি এই নিয়ে তদ্বির করতেন। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষ্যের সঙ্গে হিউম-এর এই তদ্বিরকেও একযোগে অনুধাবন করা হতে থাকে। তার ফলে দেখা দিল এক তত্ত্ব, কংগ্রেসের পরবর্তী র‍্যাডিকাল সমালোচকদের (রজনী পাম দত্তের মতো) কাছে তার আবেদন ছিল যথেষ্ট। বলা হতো, জনৈক ব্রিটিশ বড়লাট জনৈক প্রাক্তন ব্রিটিশ সিভিলিয়ান মারফত গণ-অসন্তোষের বিরুদ্ধে 'নিরাপত্তা ভাল্‌ভ্‌' হিসেবে কাজ করার জন্য সুপরিকল্পিতভাবে কংগ্রেসের সৃষ্টি করেন। ডাফরিন-এর ব্যক্তিগত কাগজপত্র খোলার পর এই 'ষড়যন্ত্র তত্ত্ব' বিশ্বাসের অযোগ্য হয়ে গেছে। তাতে দেখা যায়, শাসক মহলের কেউই আসন্ন বিপর্যয় সম্পর্কে হিউম-এর এই কাসান্দ্রা-সুলভ ভবিষ্যদ্বাণীকে গুরুত্ব সহকারে নেয় নি। মে ১৮৮৫-তে সিমলায় ডাফরিন-এর সঙ্গে হিউম দেখা করেছিলেন ঠিকই। কিন্তু সেই মুহূর্তে বড়লাটের প্রধান প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এই যে, বোম্বাই-এর লাটকে তিনি 'প্রতিনিধিদের এই প্রস্তাবিত রাজনৈতিক সমাগম' থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেন (রেঈ-কে ডাফরিন, ১৭ মে ১৮৮৫)। যা-ই হোক, সমস্ত গল্পটাই হিউম-এর ব্যক্তিগত ভূমিকাকে অতিরঞ্জিত করে। বেশ কিছুদিন ধরেই জাতীয় সংগঠন-গোছের একটা ব্যাপার নিয়ে কথা চলছিল। ইতোমধ্যেই তৈরি এই আবহাওয়ার সুযোগটুকু নিয়েছিলেন হিউম। কোনো আঞ্চলিক আনুগত্য না থাকায় ভারতীয়দের কাছে তিনি আরও গ্রহণযোগ্য ছিলেন— এই বিষয়টি হয়তো তাঁকে সাহায্য করেছিল। বড়কর্তা মহলে হিউম-এর সম্ভাব্য প্রভাবের ব্যাপারেও ভারতীয়দের বোধহয় মাত্রাছাড়ানো ধারণা ছিল—সে-মনোভাব কাটাতে তিনি কিছুই করেন নি।

নরমপন্থী কংগ্রেস : লক্ষ্য ও পদ্ধতি

কংগ্রেসের ইতিহাসের প্রথম কুড়ি বছরকে—তার নরমপন্থী পর্ব—একটি অভঙ্গ পর্ব হিসেবে আলোচনা করাই প্রথাসিদ্ধ। নিশ্চিতভাবে গোটা পর্ব জুড়ে লক্ষ্য আর কর্মপদ্ধতি যে মোটামুটি একই রকম ছিল তা বেশ স্পষ্ট। প্রতি বছরশেষে তিন দিনের কংগ্রেস মিলিত হতো। তা হয়ে উঠেছিল এক বিরাট সামাজিক উপলক্ষ্য তথা রাজনৈতিক সমাবেশ। সভাপতির লম্বা

অভিভাষণ ও বিস্তর বক্তৃতা (প্রায় সর্বদাই ইংরিজিতে) শোনা হতো ও হাততালি পড়ত। আর রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আর্থনীতিক—এই তিনটি বড় ধরনের বিষয়ে প্রায় একই ছাঁদের প্রস্তাব নেওয়ার পর সবাই ফিরে যেতেন। প্রধান রাজনৈতিক দাবি ছিল : সর্বোচ্চ ও স্থানীয় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলগুলির সংস্কার, যাতে তাদের ক্ষমতা বাড়ে (যেমন, অর্থসংস্থান নিয়ে আলোচনা ও কৈফিয়ত চাওয়ার অধিকার) আর স্থানীয় সংস্থা, বণিকসভা ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদির নির্বাচিত কিছু সদস্যকে তাদের অন্তর্ভূত করে সেগুলোকে প্রতিনিধিমূলক করে তোলা। তাহলে আত্ম-শাসন বা গণতন্ত্রের চেয়ে অব্যবহিত পরিপ্রেক্ষিত ছিল অনেক ছোটো। বহু পরে, এমনকি ১৯০৫-এও গোখলে তাঁর সভাপতির অভিভাষণে ঘোষণা করেন যে, শিক্ষিতরাই 'জনগণের স্বাভাবিক নেতা'। ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, রাজনৈতিক অধিকার 'সমগ্র জনসমষ্টির জন্যে' চাওয়া হয় নি, চাওয়া হয়েছে 'বরং সেই অংশের জন্যে শিক্ষার সুবাদে যাঁরা সে ধরনের সঙ্ঘের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার উপযুক্ত হয়েছেন'। অবশ্য এই প্রত্যাশাও ছিল যে, ব্রিটিশ ছাঁচে একের পর এক পূর্বদৃষ্টান্ত ধরে স্বাধীনতার প্রসার হয়ে চলবে, যতদিন-না ভারত প্রবেশ করে সেই প্রতিশ্রুত কিন্তু দূরে দেশে, ১৯০৬-এ যথেষ্ট দ্ব্যর্থকতা সহ নওরোজী যাকে বলেছিলেন 'যুক্ত রাজ্য (ইউনাইটেড কিংডম) বা উপনিবেশগুলির মতো আত্ম-শাসন বা স্বরাজ'। প্রশাসনিক সংস্কারের মধ্যে প্রথম দাবি ছিল ইংল্যান্ডে ও ভারতে একযোগে আই সি এস পরীক্ষার মাধ্যমে ঐ পরিষেবার ভারতীয়করণ। কখনও কখনও বলা হয়েছে, এ দাবি শুধুই এক মুষ্টিমেয় শিরোমণি গোষ্ঠীকে—যারা আই সি এস-এ ঢোকার আশা করতে পারত—তাদের সন্তুষ্ট করার জন্যেই তোলা হতো না, বরং এটি যুক্ত ছিল আরও বিস্তীর্ণ বিষয়ের সঙ্গে। ভারতীয়করণের সপক্ষে বলা হয়েছিল বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে আঘাত হিসেবে। শ্বেতাঙ্গ বড়কর্তাদের মোটা মাইনে বা অবসর-ভাতা চলে যাচ্ছিল ইংল্যাণ্ডে। ভারতীয়করণ হলে তা বন্ধ হয়ে সম্পদ নির্গমও কমত আর প্রশাসনও ভারতের প্রয়োজনের দিকে বেশি মন দিত। অন্যান্য প্রশাসনিক দাবির মধ্যে ছিল বিচার বিভাগকে পৃথক করা, জুরি-র সাহায্যে বিচারের বিস্তার ঘটানো, অস্ত্র আইন প্রত্যাহার, সেনাবাহিনীতে ভারতীয়দের জন্যে আরও উঁচু পদ, ও ভারতীয় স্বেচ্ছাবাহিনী গঠন। দাবিগুলিতে স্পষ্টতই বর্ণ সাম্য-র উপরোধকে মেলানো হয়েছিল নাগরিক অধিকার সংক্রান্ত ভাবনার সঙ্গে। যেসব আর্থনীতিক বিষয় তোলা হতো সেগুলিও ছিল ভারতের সাধারণ দারিদ্র্য-ও-সম্পদ নির্গমবিষয়টির সঙ্গে যুক্ত। ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের তদন্ত দাবি করে বারবার প্রস্তাব পাশ করা হয়। হোম বাবদ ব্যয় ও সামরিক খরচ কমানো, ভারতীয় শিল্পকে আনুকূল্য করার জন্যে কারিগরি শিক্ষায় আরও টাকা বরাদ্দ, আর অসম প্রশুল্ক ও অন্তঃশুল্ক রদের দাবিও তোলা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিস্তারের দাবিও ছিল সম্পদ নির্গমের যুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত, কারণ অতিনির্ধারণের দরুনই চাষীরা আপৎকালীন বিক্রি করতে বাধ্য হন, আর তার থেকেই রপ্তানি-উদ্বৃত্তের সৃষ্টি। গোড়ার দিকের কংগ্রেস যে শুধুই ইংরিজি-শিক্ষিত বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী, জমিনদার বা শিল্পপতিদের স্বার্থ নিয়েই ভাবত না—তার ইঙ্গিত মেলে লবণ কর, বিদেশে ভারতীয় কুলিদের প্রতি আচরণ ও অরণ্য প্রশাসনের কারণে দুর্দশা বিষয়ে অজস্র প্রস্তাবে। ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫-এর মধ্যে প্রতি বছরেই অরণ্য আইনের নিন্দাসূচক প্রস্তাব নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে, ১৮৮০-র দশকের শেষ দিকে আসামের চা-বাগানের খৎবন্দী কুলিদের

দুর্বিষহ অবস্থার কথা ফাঁস করে এক প্রচার-অভিযান শুরু করে ভারতসভা। এমনকি সেখানকার শ্রমিকদের দাসসুলভ অবস্থার খবর আনার জন্যে ভারতসভার সহ-সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী যথেষ্ট ব্যক্তিগত ঝুঁকি নিয়ে আসামের চা-বাগানে যান। এটা স্থানীয় ব্যাপার—এই যুক্তিতে কংগ্রেস অবশ্য বিষয়টি হাতে নিতে রাজি হয় নি।

নরমপন্থী কংগ্রেস আরও বেশি করে সমালোচনার লক্ষ্য হয়ে উঠছিল। এর কারণ তাদের লক্ষ্য ততটা নয়, যতটা তাদের কাজের ধরন ও কায়দা। নওরোজীর কথা—'অ-ব্রিটিশ শাসন'—ছিল তার মূল সুর। আবেদনপত্র, ভাষণ ও নিবন্ধের সাহায্যে গোড়ার দিকের সংগ্রেস এক নিশ্ছিদ্র যুক্তিসঙ্গত আরজি তৈরি করায় মন দিয়েছিল। ততটা ব্রিটিশ ভারতের 'রোদে-শুকিয়ে যাওয়া' আমলাদের নয়, যতটা কবডেন ব্রাইট, মিল ও গ্ল্যাডস্টোন-এর দেশের তথাগৃহীত উদারমনা জনমতকে বুঝিয়ে রাজি করানোই ছিল তার লক্ষ্য। তার ওপর, চরমপন্থীরা যাকে বলতেন 'ভিক্ষাবৃত্তি', তার রাজনীতিও প্রয়োগের চেষ্টা হতো থেমে থেমে। বেশির ভাগ নরমপন্থীর ক্ষেত্রেই রাজনীতি ছিল অনেকটাই আংশিক সময়ের কাজ—কংগ্রেস কোনো রাজনৈতিক দল ছিল না, ছিল বছরে তিন দিনের এক মেলা। তার দু-একজন সচিব ছিল, আর কিছু স্থানীয় সমিতি। কাগজে-কলমে তার সংখ্যা ছিল বিস্তর, আসলে কিন্তু সেগুলো ছোটো ছোটো ঘোঁট (সাধারণত আইনজীবীদের) ছাড়া আর কিছুই নয়। নিজেদের মধ্যে থেকে সে-বছরের কংগ্রেস প্রতিনিধি 'নির্বাচন' বা কোনো তাৎক্ষণিক অভিযোগ নিয়ে প্রস্তাব পাশ করার জন্যে মাঝে মধ্যে সেগুলোর বৈঠক হতো, না-হলে ভোগ করত লম্বা নিশ্চিন্ত শীতঘুম।

এ সবই জানা কথা। কিন্তু আরও আগ্রহ-জাগানো প্রশ্ন হলো ঃ কেন এমন হয়েছিল? হয়তো এর উত্তর পাওয়া যাবে গোড়ার দিকের কংগ্রেস নেতাদের ও যোগদাতাদের সামাজিক বিন্যাসের ধরনের মধ্যে; ব্যক্তিগত জীবনে নরমপন্থী নেতারা ছিলেন ইংরেজ ভাবিত ও নিজেদের পেশায় প্রভূত সফল ব্যক্তি। প্রথমটি জন্ম দিয়েছিল ইংরেজদের সম্পর্কে নানা দোলাচলগ্রস্ত মনোভাবের। কোনো কোনো নীতির সমালোচনা তাঁরা করতেন, কিন্তু সাধারণভাবে ব্রিটিশ শাসনের 'দৈবজাত' প্রকৃতিতে বিশ্বাস দিয়ে পাল্লা প্রমান হতো। দ্বিতীয়টির (= পেশায় সফলতা) মানে দাঁড়াত ঃ রাজনৈতিক কাজকর্মের জন্যে সময়ের একান্ত অভাব। ১৮ নভেম্বর ১৮৮৭-তে ওয়াছা যেমন নওরোজীর কাছে নালিশ করেছেন ঃ 'আজকাল ফিরোজ শাহ্ ওঁর পেশাগত কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত। ... ইতোমধ্যেই ওঁরা যথেষ্ট বড়লোক। ... শ্রীযুত তেলঙ্গও ব্যস্তই থাকেন। আমি ভাবি সবাই যদি সোনার খোঁজে ব্যস্ত থাকে তবে দেশে প্রগতি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে কী করে?' সাফল্য আবার আত্মতুষ্টির জন্ম দিত, (তাঁদের) বিশ্বাস হতো যে ধীরে ধীরে উন্নতি হবে, কারণ, যা-ই হোক ১৮৯২-র কাউন্সিল আইনের মতো কিছু ছাড় তো পাওয়া গেছে। সবচেয়ে বড় কথা, উঁচুতলার কংগ্রেস নেতাদের অনেকেই অত্যন্ত শিরোমণি-মার্কা জীবনযাত্রার ধরন গড়ে তুলেছিলেন (মেহটা যাতায়াত করতেন বিশেষ রেলওয়ে সেলুন-এ; গান্ধী স্মরণ করেছেন যে, ১৯০১-এর কলকাতা কংগ্রেসের সময়ে জে ঘোষাল তাঁকে জামার বোতাম লাগিয়ে দিতে বলেছিলেন; এমনকি তুলনায় কম ইংরেজ-ভাবিত রানাডেও ১৮৮৬-তে সিমলায় গিয়েছিলেন ২৫ জন চাকর নিয়ে)। এর থেকে অনেক সময়েই 'নিম্ন স্তরে'র সম্পর্কে অবজ্ঞা ও ভয় মেশানো মনোভাব তৈরি হয়, আর আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে ব্রিটিশদের ওপর নির্ভরতার

ভাব আসে। ১৮৯০-এর দশকের পুনরুত্থানবাদী উন্মত্ততা ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তা নিশ্চয়ই আরও জোরদার হয়েছিল। ১৮৫৭-র বিদ্রোহীদের তোপ দেগে উড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশরা—লেশমাত্র সহানুভূতি ছাড়াই ওয়াছা সে-কথা স্মরণ করেছেন তাঁর *শেল ফ্রম দি স্যান্ডস্ অফ্ বম্বে*-এ। ১৮৭৪-এ একটি পারসি-মুসলমান সঙ্ঘাতে আক্রান্ত হন মেহটা। আক্রমণকারীদের তিনি বর্ণনা করেছেন 'মুসলমান লোকদের এই হাঘরের দঙ্গল ও তলানি' বলে। ১৮৮৭-তে একবার সুরাপান নিবারণী প্রচারের সময়ে সুরেন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, নিচু তলার মানুষরা একেবারেই বিজাতীয়। ১৮৯৬-এ নাগপুরে খাদ্য দাঙ্গাকারীরা এক কংগ্রেসি নেতার বাড়িকেই প্রধান লক্ষ্যবস্তু করেছিল—নিঃসন্দেহে তার কারণ এই যে, লোকটি ছিল জমি-মালিক আর মহাজনও। সাম্প্রতিক গবেষণায়, আমরা দেখেছি, গোড়ার দিকের কংগ্রেসের পেশাদার বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের সঙ্গে সম্পত্তিশালী গোষ্ঠীগুলোর যোগাযোগের কথা বেরচ্ছে—বোম্বাই-এর কিছু শিল্পপতি, এলাহাবাদের ট্যান্ডনদের মতো বাণিজ্য চূড়ামণি প্রায় সর্বত্রই জমি-মালিক ও ইজারাদারদের যোগাযোগ। এসব গোষ্ঠীর পক্ষে র‍্যাডিকাল কর্মসূচি বা বল্গাহীন গণ-বিক্ষোভকে সমর্থন করার সম্ভাবনা ছিল না।

নরমপন্থী রাজনীতির নানা পর্ব

এতক্ষণ আমরা রূপগত মিলের কথাই বলছিলুম। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় নানা সময়ে নানা অঞ্চলের মধ্যে আগ্রহ জাগানোর মতো কিছু প্রকারভেদও বেরচ্ছে। কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলোর ছক ছিল মোটের ওপর একই রকম। ১৮৯২ থেকে ১৯০৪-এর মধ্যে কাউন্সিল সংস্কারের বিষয়টি খুব একটা প্রাধান্য পায়নি—এক্ষেত্রে তো কিছু ছাড় পাওয়া গিয়েছিল, নতুন স্থানীয় ও সাম্রাজ্য-ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস নেতারা নির্বাচিত হচ্ছিলেন। একের পর এক দুর্ভিক্ষ ও তুলোর ওপর অন্তঃশুল্কের প্রশ্নটির দরুন আরও বেশি করে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত হতে থাকে আর্থনীতিক বিষয়ে। ১৯০১-এ সাম্রাজ্য-ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে অর্থসংস্থানের ব্যাপারে ভাষণ দিতে উঠে গোখলেই সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী আর্থনীতিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন। বিপান চন্দ্র যেমন দেখিয়েছেন, সম্পদ নির্গম মতবাদ র‍্যাডিকাল করে তোলার শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল, কারণ এই বিঘ্নময় স্তরে অবস্থা ভালো না-হয়ে বরং খারাপই হচ্ছিল; বৃদ্ধ নওরোজী বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আরও চরম হয়ে উঠছিলেন। তিনি এমনকি এইচ এম হাইন্ডম্যান-এর মতো ব্রিটিশ সমাজবাদীদের সঙ্গেও খানিক যোগাযোগ গড়ে তোলেন। 'কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীগুলি'র বাইরে জমির হাতবদলে বাধা দেওয়ার জন্যে পাঞ্জাব ভূমি হাস্তান্তর আইন (১৯০১)-এর মতো ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটিশরা চাষীদের কাছে টানতে চাইছিল, আর (তথাভিহিত কংগ্রেস শিরোমণিতন্ত্রের উল্টো দিকে) এক পিতৃসুলভ 'সরকার'-এর ভাবমূর্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করছিল। এর দরুনও ভূমি-সম্পর্কের সমস্যাসঙ্কুল বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস নতুন করে খানিক ভাবতে বাধ্য হয়। পাঞ্জাবের কংগ্রেসে প্রাধান্য ছিল হিন্দু শহরবাসী ব্যবসায়ীদের। তারা এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করলেও লাহোর অধিবেশনে (১৯০০) এ বিষয়ে কোনো প্রস্তাব না-এনে, দেখার মতো একটা ছাড় দেওয়া হয়। আবার, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে প্রথমে যাঁরা প্রস্তাব তুলেছিলেন তাঁরাই এই ব্যবস্থাকে মোটামুটি জমিদারদের সঙ্গেই একটা বন্দোবস্তের সামিল

বলে ধরে নিয়েছিলেন। ১৮৯০-এর দশকের শেষে রমেশচন্দ্র দত্ত আরও ব্যাপক একটি সূত্র খাড়া করেন। ১৮৯৯ অধিবেশনে তিনিই ছিলেন সভাপতি। সেখানে স্পষ্ট করে রায়তওয়ারি অঞ্চলেও চিরস্থায়ী রাজস্ব-নির্ধারণ ও জমিনদারি খাজনার উর্ধ্বসীমা বেঁধে দেওয়ার প্রস্তাব পাশ হয়। প্রসঙ্গত, কৃষকদের সপক্ষে ব্রিটিশদের 'ন্যায়পরায়ণ বাক্যচ্ছটা' যে অনেকটাই অতিকথা—ম্যাক্‌লেন-এর আনুপুঙ্খিক পর্যালোচনাতেও তা ধরা পড়েছে। যেমন, ১৮৮৫-র বাঙলা প্রজা আইনে জমিনদারদের সপক্ষীয় কিছু রদবদলের বিরোধিতা করেন সুরেন্দ্রনাথ (১৮৯৮)। এর ঠিক পরেই কাউন্সিলের একটি আসন পুরসভার হাত থেকে জমিনদারদের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়।

কংগ্রেসের ক্রিয়াকলাপ ও সংগঠনের দিকে নজর ফেরানো যাক। নরমপন্থী যুগের মোটামুটি তিনটি পর্ব আলাদা করা যায়। ১৮৯২ অবধি সাধারণ সম্পাদক ও একমাত্র সারাক্ষণের কর্মী হিসেবে কংগ্রেসে অনেকটাই প্রাধান্য ছিল হিউম-এর। তিনি ছিলেন খেয়ালি, পিতৃতান্ত্রিক ও মাতব্বর ধরনের। তাঁর উপস্থিতি অবশ্য খানিকটা গতি সঞ্চার করত, পরবর্তী বছরগুলোয় যা আর একেবারেই দেখা যায় না। প্রথম পাঁচটি অধিবেশনে কংগ্রেসে যোগদাতাদের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছিল, ১৮৮৫-তে ৭২ থেকে ১৮৮৯-এ প্রায় ২০০০। ওয়াশব্রুক ও বেলি-র আনুপুঙ্খিক পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ১৮৮৭ (মাদ্রাজ) ও ১৮৮৮ (এলাহাবাদ) অধিবেশন ছিল ১৮৯০-এর দশকের কংগ্রেসের তুলনায় ব্যাপক-ভিত্তিক (সচরাচর যা হতো না) আর জাগিয়েছিল বহুব্যাপ্ত আগ্রহ। যেমন, মাদ্রাজ অধিবেশনের তহবিল জোগাড় হয়েছিল গণ-সংগ্রহ করে। ৮০০০ লোক ১ আনা থেকে দেড় টাকা অবধি চাঁদা দিয়েছিলেন। তাতে উঠেছিল ৫৫০০ টাকা, আর ২ টাকা থেকে ৩০ টাকা অবধি অনুদানে ৮০০০ টাকা। যুক্ত প্রদেশের পুরনো শিরোমণিরা (গোড়ায় যার মধ্যে মুসলমানদের সঙ্গে বেনারসের মহারাজার মতো হিন্দু অভিজাতরাও ছিলেন) সৈয়দ আহ্‌মদের নেতৃত্বে, নির্বাচিত কাউন্সিল ও পরীক্ষার মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগ—এই দু' বিষয়ে কংগ্রেসের দাবির বিরোধিতা করেন। এর মোকাবিলা করতে, মুসলমানদের সমর্থন পাওয়ার দৃঢ় প্রচেষ্টায় ১৮৮৭-৮৮-তে হিউম কাজে লাগান বদরুদ্দীন তায়বজীর ব্যক্তিগত যোগাযোগকে। ১৮৮৭ অধিবেশনে তিনি এক সূত্র বার করেন যাতে কোনো সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ লোক বিরোধিতা করলে সে-প্রস্তাব বাতিল হবে। আরও লক্ষণীয় হলো, আবার হিউম-এরই উদ্যোগে, ১৮৮৭-তে চাষীর সমর্থন জোগাড় করার অনন্য প্রয়াস—অন্যূন বারোটি আঞ্চলিক ভাষায় তর্জমা করে দুটি জনবোধ্য পুস্তিকার মাধ্যমে। গ্রামের যথেচ্ছ প্রশাসনের স্বরূপ খুলে ধরে হিউম নিজেই একটি কাল্পনিক সংলাপ লেখেন। বীররাঘবাচারী-র *তামিল প্রশ্নোত্তরমালা*-য় তৎকালীন ব্যবস্থাপক পরিষদগুলোকে ভাঁওতা বলে আক্রমণ করা হয়। এটি নাকি ৩০,০০০ কপি বিক্রি হয়েছিল ১৯০৫-এর দিনগুলির আগে অবধি আর ঠিক ঐ ধরনের কোনো চেষ্টা হয় নি।

অবশ্য এইজাতীয় সব চেষ্টাই ছিল স্বল্পস্থায়ী, আর বিশেষ সফলও হয় নি। আলীগড়ের মুসলিম শিরোমণিকুল তখনও মনে করতেন, নির্বাচিত কাউন্সিল ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মনিয়োগের দরুন তাঁদের অনেক কিছু হারানোর আছে। কারণ, প্রথমটিতে হিন্দুরাই নিশ্চিত প্রাধান্য পাবেন, আর ইংরিজি শিক্ষায় এগিয়ে থাকার সুবাদে দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেও সুবিধে হবে

তাঁদেরই। ১৮৯৩-এর সব দাঙ্গা মুসলিম বিচ্ছিন্নতাতেই শক্তি জোগায়। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯২-এর মধ্যে কংগ্রেসে মুসলমান প্রতিনিধির গড় হার ছিল মোট প্রতিনিধির ১৩.৫, ১৮৯৩ থেকে ১৯০৫-এর মধ্যে তা নেমে দাঁড়ায় ৭.১। লখনউ অধিবেশনে (১৮৯৯) প্রচুর স্থানীয় মুসলমান যোগ দেওয়ায় পরের সংখ্যাটি কৃত্রিমভাবে ফেঁপে উঠেছে—১৮৯৩-১৯০৫ পর্বের সবকটি অধিবেশনে যোগ দিয়েছেন এমন মোট ৭৬১ জন মুসলমানের মধ্যে ৩১৩। কংগ্রেস নেতারা অবশ্য খুব একটা ভাবিত ছিলেন না, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো মুসলমান সংগঠন তখনও দেখা দেয় নি। থিওডর বেক-এর মহামেডান অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন (১৮৯৩) স্বল্পজীবী বলে প্রমাণ হয়। মুসলমানদের টানার জন্যে ১৮৮৭-৮৮-র পর বিশেষ কোনো চেষ্টা হয়েছিল বলে মনে হয় না। যখনই দেখা গেছে হিউম-এর কৃষক-নীতি সরকারি সন্দেহ ও বৈরিতা উদ্রেক করছে, তখনই তা অতি দ্রুত পরিত্যক্ত হয়েছিল। যুক্ত প্রদেশের ছোটোলাট অকল্যাণ্ড কলভিন এলাহাবাদ অধিবেশনের ব্যাপারে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন, আর নভেম্বর ১৮৮৮-তে ডাফরিন এক বিখ্যাত ভাষণে কংগ্রেসকে 'অণুপরিমাণ সংখ্যালঘু' বলে বাতিল করে দেন। নিঃসন্দেহে এর কারণ হলো, কংগ্রেস যে আর অতটা অণুপরিমাণ থাকবে না তার কিছুকিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। খুবই ভয় পেয়ে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব আড়ালে হিউমকে ধমকান আর গণসংযোগের চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া হয়।

১৮৯২-তে আশাহত হিউম ইংল্যান্ডে চলে যান আর বিদায়-নির্ঘোষ হিসেবে দিয়ে যান একটি প্রচারপত্র যাতে আসন্ন কৃষক বিপ্লবের ভবিষ্যদ্বাণী করা ছিল (যদি-না কংগ্রেস আরও উদ্যমী ও ব্রিটিশরা আরও সংবেদী হয়)। সরকারি কর্তারা এই প্রচারপত্রকে 'ইন্ধন-জোগানো' বলে নিন্দে করেন, অন্যান্য কংগ্রেস নেতাও সেটিকে নস্যাৎ করে দেন। ১৮৯০-এর দশকে কংগ্রেস হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সিদ্ধান্ত নিত একটা ছোটো চক্র, সচরাচর যার মধ্যে ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দ চারলু, ও ফিরোজশাহ্ মেহটা, আড়াল থেকে পরামর্শ দিতেন রানাডে। কিন্তু ১৮৯৯ থেকে, কংগ্রেসের ব্যাপারে মেহটার আর সক্রিয় আগ্রহ নেওয়ার সিদ্ধান্ত ও নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করার আগে অবধি কোনো কার্যকর নেতৃত্ব দেখা দেয় নি। সর্বসম্মত বিকল্পের অভাবে, অনুপস্থিতি সত্ত্বেও হিউমকেই সাধারণ সম্পাদক নির্বাচন করা হতো। ভারতে ব্যর্থতার দরুন এই সব বছরে গুরুত্ব প্রায় পুরোপুরি সরে যায় ইংল্যান্ডে প্রচার-অভিযানের ওপর। ওয়েডারবার্ন, হিউম ও নওরোজীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের ব্রিটিশ কমিটি তার পত্রিকা *ইণ্ডিয়া* মারফত সে-কাজ করত। সামান্য কংগ্রেস তহবিলের বেশির ভাগটাই পাঠানো হতো এই লন্ডন কমিটিকে (বছরে ৩২,০০০ টাকা)। যদিও ১৮৯৫ থেকে দিনশা ওয়াছাকে যুগ্ম সম্পাদক করা হয়, তাঁর জন্যে বরাদ্দ টাকা ছিল অল্পই। তাহলেও ১৮৯২-এর আইনে ও ১৮৯৩-এ সংসদের নিম্নকক্ষে একযোগে (আই সি এস) পরীক্ষা নেওয়ার সমর্থনে হঠাৎ যে-প্রস্তাব নেওয়া হয়, তাতে যে-আশা জেগেছিল ইংল্যান্ডে তা অচিরেই মিলিয়ে যায়—বিশেষ করে টোরিরা যখন ক্ষমতায় ফিরে এল আর ১৮৯৫-এর নির্বাচনে নওরোজী হেরে গেলেন। ইতোমধ্যে ভারতেও কংগ্রেস সম্পর্কে উৎসাহে ভাঁটা পড়ছিল। কংগ্রেস অধিবেশনে স্থানীয় প্রতিনিধিদের অনুপাত বেড়ে যাওয়ায় যেমন তার ইঙ্গিত মেলে। ১৮৮৫-৯৩-এর মধ্যে তা ছিল ৪৩.৫% থেকে ৫৯.৫%, কিন্তু ১৮৯৪-১৯০৩-এ তা বেড়ে যায় ৬৪.৭% থেকে ৮৮.৬%-

এর মতো উঁচু হারে। ১৮৯০-এর দশকের শেষে ভারতসভা, পুণা সার্বজনিক সভা বা মাদ্রাজ মহাজন সভা-র মতো স্থানীয় বা আঞ্চলিক সংস্থার কাজকর্মও কমে আসতে দেখা যায়। নরমপন্থীদের ভেতরে নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্যে দরকার পড়েছিল একজন কার্জন-এর প্ররোচনামূলক কর্মনীতির (পরের অধ্যায়ে তা অনুধাবন করা হবে)—আর সেই সঙ্গে দরকার ছিল গোখলের মতো এক নতুন নেতার উত্থানের। তাঁর সম্পদ ছিল এক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব (ফিরোজশাহ্ মেহতার মতো রূঢ় নয়), যৌবন (টিলকের চেয়ে তিনি ছিলেন দশ বছরের ছোটো), আর সর্বক্ষণের জন্য সাধারণের কাজে সন্দেহাতীত আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা।

চরমপন্থার বিভিন্ন উৎস

তাহলেও, 'কংগ্রেস নড়বড় করে ভেঙে পড়ছে' (ভারত-সচিব হ্যামিল্টন-কে কার্জন, ১৮ নভেম্বর ১৯০০) কার্জন-এর এই মূল্যায়ন অচিরেই হাস্যকরভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট বলে প্রমাণ হয়। তার প্রধান কারণ ঃ নরমপন্থী কংগ্রেস ক্রমেই আরও বেশি করে 'জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের একটি সামান্য অংশমাত্রের প্রতিফলন করছিল' (ম্যাক্লেন)। দুর্ভিক্ষ ও মহামারির অভিঘাত, প্রতিকারী উৎপাদনশুল্ক আর কার্জন-এর একরাশ আক্রমণাত্মক ব্যবস্থার ফলে ব্রিটিশরা আরও বেশি অপ্রিয় হয়ে উঠছিল। দেশীয় সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা ১৮৮৫-এ ছিল ২৯৯,০০০, ১৯০৫-এ তা বেড়ে হয় ৮১৭,০০০। এর ফলে রাজনৈতিক কার্যকলাপের সম্ভাব্য ভিত্তি বিস্তৃত হচ্ছিল দ্রুত। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, নানা কারণে কংগ্রেস সমালোচক কয়েকটি পত্রিকা ছিল সবচেয়ে জনপ্রিয়; যেমন, কলকাতার *বঙ্গবাসী* বা পুণার *কেসরী* ও *কাল*। তৈরি হচ্ছিল চরমপন্থার উত্থানের জমি।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে 'কেমব্রিজ ঘরানা'র ঐতিহাসিকরা চরমপন্থী ভিন্নমতের উদ্ভবকে মূলত কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণের জন্যে 'ভেতরে'র ও 'বাইরে'র মধ্যে একসার উপদলীয় কোন্দল হিসেবে হাজির করার চেষ্টা করেছেন। নিশ্চয়ই, ১৮৯০-এর দশকে বিভিন্ন কংগ্রেসি চক্রের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কোনো অভাব ছিল না। বাঙলায় সেই ১৮৭৫-৭৬-এ সুরেন্দ্রনাথের ভারতসভা স্বল্পজীবী ইন্ডিয়ান লীগ-কে খর্ব করে দেওয়ার সময় থেকেই মোতিলাল ঘোষের *অমৃতবাজার পত্রিকা* গোষ্ঠীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ও তাঁর *বেঙ্গলী*-র একটানা ঝগড়া চলছিল। গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিশেষ করে তীব্র হয়ে উঠেছিল পাঞ্জাবে। সেই সঙ্গে ছিল লাহোর ব্রাহ্ম সমাজের ভেতরে তিনটি গোষ্ঠী, আর্যসমাজীদের মধ্যে একটা বড় ভাঙন, আর লালা হরকিষণ লাল ও লাজপত রায়ের মধ্যে সঙ্ঘাত। মাদ্রাজের রাজনীতিকে ওয়াশব্রুক এক ত্রিমুখী সঙ্ঘাতের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন, অর্থাৎ 'মাইলাপুর চক্র' (১৮৮০-র দশকে ভি ভাষ্যম আয়েঙ্গার ও এস সুব্রহ্মণ্যম আয়্যার এবং তারপরে ভি কৃষ্ণস্বামী আয়্যার—ওয়াশব্রুক-এর কথায় এঁরা হচ্ছেন 'ভেতরে'র গোষ্ঠী), এই চক্রের কম সফল 'এগমোর' প্রতিদ্বন্দ্বীরা (সি শঙ্করণ নায়ার, কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার) এঁরাও ছিলেন মাদ্রাজ শহর-কেন্দ্রিক, এবং মফস্বলের 'বাইরে'র গোষ্ঠী, যেমন উপকূলবর্তী অন্ধ্রের টি প্রকাশম ও কৃষ্ণ রাও বা টুটিকোরিন-এ চিদাম্বরম পিল্লাই। 'এগমোর'-এর কিছু রাজনীতিকের সঙ্গে সমঝওতা করে ১৯০৫-এর পরে তিনি মাদ্রাজ চরমপন্থা গড়ে তুলেছিলেন। পুণার ক্ষেত্রেও যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, ১৮৮০-র দশকের শেষদিকে আগরকর ও গোখলে বনাম টিলক-এর যে ঝগড়া হয়েছিল তা ডেকান এডুকেশন

সোসাইটি-র নিয়ন্ত্রণ নিয়ে, তার সঙ্গে গোড়ায় রাজনৈতিক বা এমনকি সমাজ সংস্কার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে মতপার্থক্যের বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না।

উপদল বিশ্লেষণের অবশ্যই খানিক উপযোগিতা আছে, বিশেষভাবে গোড়ার দিকের প্রবণতার পরিপ্রেক্ষিতে, যাতে বিভিন্ন সঙ্ঘাতকে জাতীয়তাবাদের মধ্যেই কমবেশি নিরাকার নানান আদর্শ সংক্রান্ত বিতর্কের নিরিখে উপস্থিত করা হতো। তাহলেও কেমব্রিজ বিদ্বান্‌রা বিষয়টিতে অত্যধিক গুরত্ব দেন। ভিন্নমতের লোকদের যদি পেশ করার মতো কোনো বিকল্প পরিকৌশল ও আদর্শ থাকত তাহলে তাঁরা কংগ্রেস দখল করার জন্যে এত আগ্রহী হবেন কেন তা বোঝা শক্ত, কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কংগ্রেস তখনও পর্যন্ত ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষণের সুবিধে সমেত প্রকৃত কোনো রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠে নি। সে-সময়ে এর তহবিল ছিল খুবই অপর্যাপ্ত, এটি বার্ষিক মঞ্চের বেশি কিছু ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, ১৮৯০-এর দশকে নরমপন্থী রাজনীতির বিরুদ্ধে মোটামুটি সুবিন্যস্ত একটা সমালোচনা গড়ে উঠছিল বিশেষ করে পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদের তিনটি প্রধান ঘাঁটিতে, অর্থাৎ বাঙলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্রে। কিন্তু কেমব্রিজ ঘরানার এই ধরনের পাণ্ডিত্য এ-ব্যাপারটিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনাবিন্দু ছিল নরমপন্থী কংগ্রেসের দ্বিমুখী সমালোচনা— প্রথমটি হলো, ব্রিটিশ জনমতের কাছে আবেদনের 'ভিক্ষুকসুলভ' কৌশলের সমালোচনা, যে-কৌশলকে একই সঙ্গে নিষ্ফল ও অসম্মানজনক বলে মনে হতো; অন্যটি হলো, নরমপন্থী কংগ্রেস সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন ইংরিজি-শিক্ষিত শিরোমণিদের আন্দোলনের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, আবেদন-নিবেদনের বদলে নতুন স্লোগান হয় আত্মনির্ভরতা ও গঠনমূলক কাজ— অর্থাৎ স্বদেশী উদ্যোগের সূচনা; পরে যেটি জা তী য় শি ক্ষা নামে অভিহিত হয় তার সংগঠন; আর গ্রামে সুনির্দিষ্ট কাজের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেওয়া। আত্মসহায়, দেশীয় ভাষার ব্যবহার, গ্রামের মেলার মতো বিভিন্ন পরম্পরাগত জনপ্রিয় প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে কাজে লাগানো আর হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মানসিকতাকে ক্রমেই বেশি করে আবাহন করা—শিক্ষিত ও জনসাধারণের মধ্যে ব্যবধানকে দূর করার উদ্দেশ্যে এইসবই সেরা উপায় বলে গণ্য হলো। নরমপন্থী 'আন্দোলনে'র বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া অবশেষে সব মিলিয়ে তিনটি প্রধান রূপ নেয়। সেগুলো পরিষ্কার হয়ে ওঠে একমাত্র ১৯০৫-এর পরে। কিন্তু ১৮৯০-এর দশক থেকেই তার উন্মেষ দেখা যায়। এগুলি হলো : গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মবিকাশের দিকে এগোনোর খানিকটা অ-রাজনৈতিক ধারা, বিদেশী শাসনকে সোজাসুজি আক্রমণ করার চেয়ে তাকে উপেক্ষা করা; যথার্থ রাজনৈতিক চরমপন্থা, কিছু নতুন কৌশলের মাধ্যমে—যেগুলি নি ষ্ক্রি য় প্র তি রো ধ নামে পরিচিত হয়—স্বরাজের সপক্ষে গণ-জমায়েতের চেষ্টা ; আর বি প্ল বী স ন্ত্রা স বা দ, যেটি ব্যক্তিহনন ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের কাটছাঁট রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করে।

নরমপন্থী রাজনীতির প্রথম প্রকৃত সুবিন্যস্ত সমালোচনা করা হয় ১৮৯৩-৯৪-এ অরবিন্দ ঘোষের লেখা *নিউ ল্যাম্পস্ ফর ওল্ড* নামে এক প্রবন্ধগুচ্ছে। ইংল্যান্ড থেকে এক প্রচণ্ড ইংরিজি-ঘেঁষা শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে দেশে ফিরে অরবিন্দ তখন বরোদায় থাকতেন। ঐ শিক্ষাদীক্ষার

বিরুদ্ধে তিনি তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাতে শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে সাংবিধানিক অগ্রগতির যে ইংরিজি ধরনটিকে নরমপন্থীরা তারিফ করতেন, অরবিন্দ সেটিকে 'বিরাট ও ভয়ঙ্কর সাধারণতন্ত্রের' ফরাসি অভিজ্ঞতার চয়ে অনেক নিকৃষ্ট বলে খারিজ করে দিলেন। কংগ্রেস ভিক্ষাবৃত্তিকে তিনি আক্রমণ করেন ('ব্রিটিশ শাসনের আশীর্বাদ নিয়ে একটু বহবাচন') এবং এক লক্ষণীয় শ্রেণী-সচেতনতার (এটি নিঃসন্দেহে তাঁর সাম্প্রতিক ইওরোপীয় অভিজ্ঞতা থেকে সংগ্রহ করা) সুরে তিনি আরজি রাখেন যে, সমস্ত সমস্যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো : কংগ্রেস যে 'বার্জেস, বা মধ্য শ্রেণী'র প্রতিনিধিত্ব করে তার সঙ্গে 'সর্বহারা'র (প্রলেতারিয়েত) যোগসূত্র গড়ে তোলা। সর্বহারাই (হলো) ... পরিস্থিতির আসল চাবিকাঠি ... মধ্য শ্রেণীর পক্ষে সঠিক ও ফলপ্রসূ নীতি, অর্থাৎ একমাত্র নীতি শেষ পর্যন্ত যার সাফল্যের সম্ভাবনা আছে, তা হলো সর্বহারাকে দক্ষভাবে পরিচালনা করার ওপর (নিজের) উদ্দেশ্যের ভিত গাড়া।' কিন্তু অরবিন্দের কাছে 'সর্বহারা' অবশ্যই শহর ও গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। আর ১৮৯৪-এ বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে তিনি ইতোমধ্যেই পুনরুত্থানবাদী হিন্দুত্বের মাধ্যমে এর যে-'চাবিকাঠি' খুঁজছিলেন, পরিণামে তা চরমপন্থীদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়। উনিশ শতকের শেষে অরবিন্দ গোপন সমিতি গড়ার চেষ্টা করছিলেন, আর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষকে বাঙলায় পাঠাচ্ছিলেন দূত হিসেবে। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী অভ্যুত্থান যখন কিছুকালের জন্যে একটি ব্যাপকতর আন্দোলনের সম্ভাবনা খুলে দিল, তখন অরবিন্দই কিন্তু গণ-নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের একটি বিশদ কর্মসূচি খাড়া করেন। অন্যান্য চরমপন্থী ব্যক্তিত্বদের মধ্যেও আমরা প্রায়শই এই ধরনের দোদুল্যমানতা দেখতে পাব।

বাঙলায় কংগ্রেস সম্বন্ধে মোহভঙ্গ ব্যক্ত করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। ১৮৯৭-এর অমরাবতী অধিবেশনকে তিনি 'তিন দিনের তামাশা' আখ্যা দেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত ছিলেন বরিশালের স্কুলশিক্ষক। তাঁর নিজের জেলায় তিনি ধৈর্য ধরে আজীবন সমাজসেবার মাধ্যমে এক অনন্য ধরনের গণ-সমর্থন গড়ে তোলেন। ১৯০৫-এর দিনগুলিতে তাঁর এলাকাকে তিনি পরিণত করেন স্বদেশী আন্দোলনের সবচেয়ে বড় ঘাঁটিতে। কংগ্রেস নিয়ে মোহভঙ্গ স্মরণীয়ভাবে ব্যক্ত করেন রবীন্দ্রনাথও। তিনি ইতোমধ্যেই বাঙলার শীর্ষস্থানীয় সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন (পরের পঞ্চাশ বছরেও সে-আসন টলে নি)। স্বাদেশিকতায় তাঁর অবদান শুধুই অতুলনীয় কবিতা ও ছোটোগল্পের মাধ্যমে বাঙলার গ্রামাঞ্চলের সৌন্দর্যকে আবাহন ও তার মানুষদের জীবনকথার বর্ণনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। সেই সঙ্গে তিনি সরাসরি আক্রমণ করেছিলেন কংগ্রেসের ভিক্ষাবৃত্তিকে। স্বদেশী উদ্যোগ ও জাতীয় শিক্ষার মাধ্যমে আত্মশক্তি বিকাশের জন্যে তিনি বারে বারে ডাক দেন; মেলা, যাত্রার সাহায্যে গণসংযোগ, আর শিক্ষা ও রাজনৈতিক কাজ— দুক্ষেত্রেই মাতৃভাষা ব্যবহারের জন্যে খুবই বিচক্ষণ পরামর্শ দেন। আইরিশ ও অন্যান্য ইওরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে, বিবেকানন্দের শিষ্যা নিবেদিতা (মার্গারেট নোব্‌ল্) বিশ শতকের গোড়ায় তাঁর গুরুর বাণীকে আরও বেশি প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক রূপ দিচ্ছিলেন। বাঙালি 'ভদ্রলোক'রাও স্বদেশী শিল্প-উদ্যোগের দিকে ঝুঁকছিলেন। যেমন প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর বেঙ্গল কেমিকাল শুরু করেন ১৮৯৩-এ। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর ডন সোসাইটি ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতন আশ্রমের মাধ্যমে দেশীয় নিয়ন্ত্রণাধীন শিক্ষার নতুন নতুন

রূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ও মতিলাল ঘোষের তুচ্ছ উপদলীয় দ্বন্দ্বের চেয়ে এইসব বিষয় অবশ্যই বাঙলার চরমপন্থায় অনেক বেশি অবদান রেখেছিল।

১৮৯০-এর দশক থেকে পাঞ্জাবে স্বদেশী উদ্যোগে সক্রিয় ছিলেন হরকিষণ লাল (যিনি পাঞ্জাব জাতীয় ব্যাঙ্ক শুরু করেন) ও কলেজ উপদলের আর্যসমাজীরা—দুপক্ষই। ১৮৯৩ থেকে পাঞ্জাবের কংগ্রেস প্রতিনিধিরা একটি আনুষ্ঠানিক গঠনতন্ত্রের জন্যে চাপ দিতে শুরু করেন। অবশ্যই তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সংগঠনের ওপর বোম্বাই-বাঙলা বেসরকারি জোটের যে আধিপত্য ছিল তার শক্তিকে খর্ব করা। ১৮৯৯-এর অধিবেশনে এঁরা একটি স্থায়ী ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি স্থাপন করতে সমর্থ হন, কিন্তু তার একমাত্র পরিণাম হয় যে, দু-বছর বাদে ফিরোজশাহ্-র চক্র সেটিকে সফলভাবে ভণ্ডুল করে দেন। কংগ্রেস প্রকৃতপক্ষে ইংরিজি-শিক্ষিত শিরোমণিদের উদ্দেশ্যহীন বার্ষিক উৎসবের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। ১৯০১-এ *কায়স্থ সমাচার*-এ প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধে লাজপত রায় তার বদলে কারিগরি শিক্ষা ও শিল্পভিত্তিক আত্মসহায়তার প্রস্তাব দেন। তিনি এও বলেন যে, কংগ্রেসের উচিত খোলাখুলি ও সাহসভরে একমাত্র হিন্দুদের ওপরেই নিজের ভিত গাড়া, কারণ মুসলমানদের সঙ্গে ঐক্য মায়া মাত্র। আরও একবার আমরা বিভিন্ন চরমপন্থী ভাববস্তুর রূপরেখা রচনার প্রক্রিয়া ও তার সীমাবদ্ধতা দেখতে পাই।

কিন্তু চরমপন্থার পথ যিনি সত্যিই দীপ্ত করে তুলেছিলেন তিনি মহারাষ্ট্রের বাল গঙ্গাধর টিলক। অনেক দিক থেকেই টিলক ছিলেন পথিকৃৎ। যেমন, ধর্মীয় গোঁড়ামিকে গণসংযোগের পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার (সহবাস সম্মতি বিষয়ে তিনি জোট বাঁধেন সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে, আর তারপরে ১৮৯৪ থেকে সংগঠিত করেন গণপতি উৎসব), জাতীয়তাবাদের কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসেবে একই সঙ্গে স্বাদেশিক-তথা-ঐতিহাসিক ভজনা গড়ে তোলা (শিবাজী উৎসব, এটি তিনি সংগঠিত করেন ১৮৯৬ থেকে) এবং এর সঙ্গে ১৮৯৬-৯৭-এ এক ধরনের রাজস্ব-বন্ধ অভিযানের পরীক্ষা। সুতোর ওপর ১৮৯৬-এর প্রতিকারী অন্তঃশুল্ক পশ্চিম ভারতে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে। তার ওপর ভিত্তি করে টিলক এক ধরনের বয়কট আন্দোলনের চেষ্টা করেন—১৯০৫-এর পর থেকে যে-আন্দোলন কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী কৌশলে পরিণত হবে এটি ছিল তার প্রথম পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা। অত্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে টিলক ঘোষণা করেন, 'যদি আমরা বছরে একবার ব্যাঙের মতো গ্যাঙর গ্যাঙর করি তাহলে আমাদের পরিশ্রম নিষ্ফল হবে।' মনে হয়, তিনি গণ-নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা আইন-অমান্যের কৌশলের পথ হাতড়াচ্ছিলেন। ১৯০২-এ একটি বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন : 'নিপীড়িত ও অবহেলিত হলেও ইচ্ছে করলে প্রশাসনকে অকেজো করে দেওয়ার ক্ষমতা তোমাদের আছে; নিজেদের সেই ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তোমরাই রেলপথ ও টেলিগ্রাফ পরিচালনা কর, তোমরাই যারা বসত গড় ও রাজস্ব আদায় কর ...।'

কিন্তু ১৯০৫-এ গণ-আন্দোলনের সম্ভাবনা দেখা দেওয়ার আগে নরমপন্থী পদ্ধতির বিরুদ্ধে অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ছিল ব্যক্তিহননের ডাক দেওয়া (আমরা পরে দেখব, যখনই গণ-যোগদানের সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে তখনই এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে)। সংবিধানসম্মত বিক্ষোভ ও সন্ত্রাসবাদ ছিল শিরোমণি-সক্রিয়তার সাধারণভিত্তিতে একত্র হওয়া দুটি পরস্পরবিরোধী মেরু। প্রকৃত গণ-সক্রিয়তার দিকে মোড় নেওয়ার চেয়ে এক মেরু থেকে

অন্যটিতে যাওয়া ছিল আসলে অনেক সহজ ও সামাজিকভাবে কম বিপজ্জনক। অতএব, ১৮৯৭-এ পুণার মারি-পরিস্থিতিকে ব্রিটিশরা নির্বোধের মত সামাল দেওয়ার ফলে যে তিক্ত মনোভাব তৈরি হয়, তার পরিণামে কোনো কার্যকর গণ-সক্রিয়তা গড়ে উঠল না, তার বদলে প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ—চাপেকর ভাইদের হাতে র‍্যাণ্ড ও এইয়েরস্ট নিধন। দামোদর চাপেকরের আত্মজীবনীতে দেশভক্তির উত্তাপ (ছোটোবেলায় ট্রেনে করে ঘাট পর্বতমালার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময়ে তিনি গেরিলা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখেছিলেন), ব্রাহ্মণ্য পুনরুত্থানবাদ আর সমাজ-সংস্কারকদের প্রতি ঘৃণার (তার অন্তত আংশিক কারণ হলো তাঁরা ছিলেন সফল ব্যক্তি, আর তিনি নিজে এসেছিলেন বাঁচার লড়াই-এ রত নিম্নমধ্য শ্রেণী থেকে) এক জটিল পরস্পর-মিশ্রণের ছবি পাওয়া যায়। *কেসরী*-তে একটি প্রবন্ধে টিলক শিবাজী-র হাতে বিজাপুর সেনাপতি আফজল খাঁ-র হত্যাকে সমর্থন জানান এবং প্রধানত তারই ভিত্তিতে ব্রিটিশরা তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ আনে। তাঁকে দু বছরের জন্যে কয়েদ করা হয়। কংগ্রেসের সবাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। কারণ, টিলককে অনেকে অপছন্দ করলেও, তাঁরা সবাই বুঝতে পারেন যে, এক্ষেত্রে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীন সংবাদপত্রের প্রশ্নটি বিপন্ন হয়েছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক গতিশীলতা দ্রুত কমে যেতে থাকে—ভারতের বেশ খানিকটা অংশের সঙ্গে মিলে এই গতিশীলতা আবার জেগে ওঠে ১৯১৫-এ, কার্জন-এর বাঙলা ভাগের নির্বুদ্ধিতার পর।

৪

রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন ১৯০৫-১৯১৭

কার্জন যখন বড়লাট

প্রভূত কাজকর্ম আর দক্ষতা সম্পর্কে রীতিমতো ভক্তিভাবের জন্যে লর্ড কার্জন-এর প্রশাসন বিখ্যাত—তথা কুখ্যাতও—হয়ে আছে। ১৯০৪-এ এক বাজেট বক্তৃতায় বড়লাট ঘোষণা করেছিলেন, 'প্রশাসনের দক্ষতা হলো, আমার চোখে, শাসিতের সন্তোষের সমার্থক'। এর নিট ফল ঃ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে বাস্তবিকই সূচনা হলো এক নতুন পর্বের।

বিপিনচন্দ্র পালের *নিউ ইণ্ডিয়া*-য় কার্জন-এর নীতির এই সমকালীন বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছিল ঃ 'লর্ড রিপন-এর আদর্শ ছিল ভা র তী য় জ ন সা ধা র ণে র জন্যে স্বায়ত্তশাসন ধীরে ধীরে নিশ্চিত করা। লর্ড কার্জন তা নিশ্চিত করলেন ভা র ত স র কা রে র জন্যে' (২০ অগাস্ট ১৯০৩)। এর দুবছর পর, ঐ পত্রিকায় বলা হলো, কার্জন-এর চেষ্টা ছিল 'জনসাধারণের শুভেচ্ছা অর্জন করা, এবং শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীগুলির সঙ্গে তাদের শক্তিশালী মেলবন্ধনকে আটকানো' (১৫ জুলাই ১৯০৫)। রিপন সম্পর্কে চলতি কল্পকথা তৈরীর অংশটুকু বাদ দিলে এখানে পাওয়া যায় পিতৃসুলভ স্বৈরতন্ত্রের মোটামুটি নিখুঁত এক বর্ণনা, খানিকটা টোরি-ঐতিহ্যের অনুসারী, কিন্তু রেওয়াজ-মাফিকের চেয়ে বেশি আক্রমণমূলক; তার সঙ্গে ছিল—ভারত-সচিবকে, এমনকি মন্ত্রিসভাকেও বড়লাটের তালে তালে নাচানোর চেষ্টা—যা ঠিক ছাঁচে-ঢালা নয়।

বৈদেশিক নীতি

কার্জন ঘোষণা করেছিলেন, ভারতে থেকেই তিনি নীতি-নির্দেশ করবেন। তার সবচেয়ে স্থূল রূপ দেখা গেল বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাঁর চূড়ান্ত রুশভীতিতে, ব্রিটিশ সরকারকে যা প্রায়শই অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলত। ইতোমধ্যেই তারা সেই অনিশ্চিত ব্যবস্থাগুলি নিচ্ছিল, ১৯০৭-এ যা হয়ে উঠল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে এক ত্রিপাক্ষিক আঁতাত। পারস্য উপসাগর ও সেইস্তান-এর ওপর একটি সুনির্দিষ্ট ব্রিটিশ স্বার্থের এলাকা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা বড়লাট বারবার ব্যক্ত করেছিলেন। অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর পারস্য উপসাগরের ব্যাপারে অন্যান্য শক্তিকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে (মে ১৯০৩), লন্ডন শুধু এক মনরো নীতিসুলভ ব্রিটিশ ঘোষণায় সম্মত হলো এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বয়ং কার্জন-এর নেতৃত্বে এক ঝাণ্ডা-ওড়ানো মিশন পাঠানোর অনুমতি দিল। যা-ই হোক, বিশ শতকের তেল-রাজনীতির দরুন কুয়েত ও বাহারাইনে ব্রিটিশ প্রভাব বিস্তার যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। যখন

নতুন আফগান আমীর হবিবুল্লাহ্ পুরনো অস্ত্র ভরতুকির জন্যে জেদ ধরলেন, বড়লাটের ইচ্ছানুযায়ী ডুরান্ড সীমান্ত চুক্তির কোনোরকম নতুন বন্দোবস্ত না-করেই কান্দাহার আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছিলেন কার্জন। 'ভগবানের দোহাই, কার্জন যেন ওখানে আমাদের কোনো ঝঞ্ঝাটে ফেলতে না পারে', চূড়ান্ত আতঙ্কিত হয়ে কাতর অনুরোধ করেছিলেন জোসেফ চেম্বারলেন, 'মনে রেখো এতে ডিজি-র [ডিজরেলি-র] সরকার ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।' ১৯০৪-এ কাবুলে লুই ডেন-এর প্রতিনিধিদল শেষ পর্যন্ত পুরনো চুক্তিগুলো অনুমোদন করিয়ে ফিরে এল। তিব্বতে কার্জন আরও বেশি সফল হন। সেখানে যথাসম্ভব রুশ জুজুর ভয় দেখানোর জন্যে জার-এর সঙ্গে তিব্বতী অভিযাত্রী দোর্জিয়েফ-এর সাক্ষাৎকে তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। মন্ত্রিসভার ক্রমাগত সতর্কবাণী উপেক্ষা করে ইয়ংহাজব্যান্ড সোজা লাসা অবধি কুচকাওয়াজ করে চলে গেলেন (১৯০৩-০৪), এবং যদিও রুশদের উপস্থিতির একমাত্র প্রমাণ পাওয়া গেল শুধু এক জোড়া রাইফেল, তবু তাঁরা দাবি করলেন প্রচুর ক্ষতিপূরণ আর ৭৫ বছরের জন্যে চুম্বি উপত্যকার অধিকারভুক্তি, একটা বাণিজ্য চুক্তি এবং তাতে অন্যান্য বিদেশী প্রভাব-বহির্ভূত কয়েকটি ধারাও বন্দুক দেখিয়ে আদায় করে নেওয়া হয়। মন্ত্রিসভা অবশ্য ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও অধিকারভুক্তির সময়সীমা কমিয়ে দিয়েছিল।

প্রশাসনিক সংস্কার

প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রশাসনিক লালফিতের বাঁধন কেটে দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা চালানো হয়। তবু, (কার্জন-এর) প্রচুর স্তুতিমূলক, প্রায়-সমকালীন জীবনীতে লোভাট ফ্রেজার স্বীকার করেছেন, কার্জন-এর সময়ে দফতরের কাগজপত্রের খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। সরকারি নথিতে বা ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে অধস্তন কর্মীদের সম্পর্কে বড়লাটের অকরুণ মন্তব্য পড়ে আজকের ঐতিহাসিকরা মজা পান ('বিভাগীয় কর্মবিভাগ' সম্পর্কে যেমন তাঁর সুখ্যাত উক্তি : 'পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনের মতো ফাইল ঘুরছে তো ঘুরছেই, অচপল, গম্ভীর, নিশ্চিত ও নির্বেগ'); সমসময়ে নিশ্চিয়ই এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল প্রায়শই অনাবশ্যক বিরক্তি। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ভারতে কার্জনকে ঘিরে কোনো অনুরক্ত কর্মচারীকুল গড়ে ওঠে নি (যেমন ঘটেছিল আফ্রিকায় মিল্‌নারকে ঘিরে)। কিচনার-এর সঙ্গে নেহাতই তুচ্ছ বিবাদের কারণে ১৯০৫-এর অগাস্টে তিনি পদত্যাগ করলেন। বিবাদের কারণ ছিল বড়লাটের শাসন-বিভাগে সামরিক সরবরাহ সংক্রান্ত সদস্যের পদমর্যাদা ও নির্বাচন। কার্জন-এর অভ্যাসই ছিল অযথা ঝগড়া বাধানো। যেমন, তিনি জেদ ধরেছিলেন যে, বিদেশযাত্রার আগে ভারতীয় রাজ-রাজড়াদেরও [তার জন্যে] অনুমতি নিতে হবে। রমেশচন্দ্র দত্তকে [দেওয়ান] নিয়োগ করে বরোদার গায়কোয়াড় আগেই বড়লাটকে চটিয়ে রেখেছিলেন। এরপর কোনো অনুমতি না চেয়েই তিনি বিদেশ যাত্রা করলেন, আর শেষ পর্যন্ত পিছু হঠতে হলো কলকাতাকেই।

কার্জন প্রশাসনের ভাগ্য ভালো, তার সূচনা হয়েছিল দুর্ভিক্ষ-চক্রের শেষের দিকে। শেষ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল ১৮৯৯-১৯০০-য় (যদিও মহামারির প্রাদুর্ভাব আদৌ কমে নি, ১৯০৪-এ বার্ষিক মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল দশ লক্ষেরও বেশি), এবং উদ্বৃত্ত অর্থসংস্থানই চলছিল। যথেচ্ছ মুদ্রা তৈরি বন্ধ করার পর ১৮৯০-এর দশকের শেষ দিকে এবং স্বর্ণবিনিময়-মান গৃহীত হওয়ার

পরে রুপোর টাকার অপচয় বন্ধ হয়ে যায়। টাকার দাম পড়তে থাকার সময়ে হোম বাবদ ব্যয় যে ক্রমবর্ধমান বোঝা হয়ে উঠেছিল, এ-সময়ে আর তা ছিল না। কর বাবদ খানিকটা ছাড় দেওয়াও সম্ভব হয়েছিল। ১৮৯৯-১৯০০-য় দুর্ভিক্ষের পর ভূমি-রাজস্ব মকুব করা হয় (যদিও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে কংগ্রেসের দাবিকে কার্জন বারবার প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং যুক্তি দিয়েছিলেন যে, অতিরিক্ত কর নয়, আবহাওয়াই দুর্ভিক্ষের কারণ), লবণ কর কমানো হয়, আর ১৯০৩-০৪-এ বার্ষিক আয়কর-ছাড়ের সীমা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয় ১০০০ টাকা। এ ছাড়া রেলওয়ে বোর্ড গঠন করে ৬১০০ মাইল নতুন রেলপথ খুলে (যে-কোনো বড়লাটের আমলে এটি সবচেয়ে বড় বিস্তার) সরকার রেলপথ তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। আর ১৯০১-০৩-এ সেচ কমিশনের মাধ্যমে সেচ-ব্যবস্থার দিকে আরও বেশি নজর দেওয়া হয়। কার্জন যে আর্থনীতিক বিষয়েও আগ্রহী ছিলেন তা দেখা যায় ১৯০৫-এ বাণিজ্য ও শিল্প-বিভাগ এবং কৃষি গবেষণার জন্যে পুসা ইনস্টিটিউট স্থাপনে। যথারীতি এইসব সুযোগ-সুবিধের অধিকাংশই চলে গিয়েছিল শ্বেতাঙ্গদের হাতে, বা খুব বেশি হলে ভারতীয়দের কয়েকটি বাছাই-করা গোষ্ঠীর হাতে। যেমন, নতুন রেলপথ মানেই ইংল্যান্ড অথবা ভারতের ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আরও বেশি প্রকৌশল চুক্তি; ইংরেজরাই ছিল ভারতে আয়করদাতাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ; অন্যদিকে, খোলা ব্যবসানীতি থেকে সরে এসে উদার সাহায্য পাওয়া ইওরোপীয় বিটচিনির ওপর আমদানি শুল্ক বসানোর (১৮৯৯) দরুন মরিশাসের কুঠিয়াল এবং কানপুরের বেগ সাদারল্যান্ড অ্যান্ড কম্পানির মতো চিনিকলের শ্বেতাঙ্গ মালিকদের উপকার হয়েছিল। কার্জনীয় 'পিতৃতন্ত্র' আরও ভালোভাবে ধরা পড়ে পাঞ্জাব ভূমি স্বত্বান্তর আইন (১৯০১)-এ (ঐ আইনে কৃষকদের সম্পত্তি শহরবাসী মহাজনদের কাছে হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ হলো) এবং ১৯০৪-এ আইন করে কৃষিজীবীদের মধ্যে সমবায় ঋণ সমিতি স্থাপনে উৎসাহ দেওয়ায়। প্রথমটি জাতীয়তাবাদীদের কাছে কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কারণ পাঞ্জাবের কংগ্রেসিদের সঙ্গে প্রায়শই যোগ ছিল শহরবাসী হিন্দু ব্যবসায়ীদের, যেখানে কৃষকদের একটা বড় অংশই ছিল মুসলমান বা শিখ। দুই ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত ধনী চাষীদের উপকারে লাগে। তারা নিজেদের পরিণত করে মহাজনে এবং প্রায়শ সমবায় সমিতিগুলিতেও নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করে।

ভারতের প্রাচীন স্মৃতিচিহ্নগুলি সম্পর্কে অবশ্য প্রকৃত আগ্রহ দেখিয়েছিলেন কার্জন। সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে তিনি একটি মূল্যবান আইনও পাশ করেন। কলকাতার খানিকটা উদ্ভট ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের যে সাড়ম্বর পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন সেটি আরও কম প্রশংসার যোগ্য, আর ১৯০২-এ সপ্তম এডওয়ার্ড-এর দরবারের জন্যে কুড়ি লক্ষ-রও বেশি টাকা নেহাতই বাজে খরচ। রেঙ্গুনের একটি গণ-ধর্ষণের ঘটনার সঙ্গে জড়িত শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের তিনি শাস্তি দিয়েছিলেন (১৮৯৯); নবম ল্যান্সার বাহিনীকে সমুচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন শিয়ালকোটে একজন ভারতীয় রাঁধুনিকে পিটিয়ে মারার জন্যে (১৯০২); আসামের এক চা-বাগিচায় ম্যানেজার একজন কুলিকে খুন করেছিল, নিম্ন-আদালতে তার মাত্র ছ-মাস কারাদণ্ড হয়, কার্জন কলকাতা হাই কোর্টকে দিয়ে সেই রায় সংশোধনের ব্যর্থ চেষ্টা করেন (বেন মামলা, ১৯০৪)। এইসব কাজকর্মের সুবাদে তাঁর শাসনকালের গোড়ার দিকে তিনি ভারতীয়দের মধ্যে কিছুটা জনপ্রিয়

হয়েছিলেন। এই সমস্ত ঘটনা কিছুকাল ইঙ্গ-ভারতীয়দেরও খেপিয়ে তুলেছিল। কিন্তু আর-একটি ইলবার্ট বিল বিক্ষোভের ঝুঁকি নেওয়ার মতো কোনো মতলবই কার্জন-এর ছিল না। এবং একমাত্র প্রকৃত প্রতিকারের—একাধিক জাতি (রেস) জড়িত এমন মামলায় সব-শ্বেতাঙ্গ জুরি নিয়োগ বন্ধ করার—চেষ্টাই তিনি আর কখনও করেন নি। মূলগত ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্য যে-কারও মতোই জাতিগর্বী। এমনকি সবচেয়ে সদাশয় মেজাজেও 'ভারতীয়দের সম্পর্কে তিনি যে সুরে কথা বলতেন তা সাধারণত পোষা প্রাণীদের জন্যেই লোকে তুলে রাখে' (এস গোপাল, *ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ২২৭)। ২৩ এপ্রিল ১৯০০-এ ভারত-সচিব হ্যামিল্টনকে লেখা একটি চিঠিতে কার্জন তাঁর দুর্ভাবনা প্রকাশ করেন, কারণ অনেক উঁচু পদ—'যেগুলো একান্তই ও নির্দিষ্টভাবে ইওরোপীয়দের জন্য সংরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল ... সেগুলো নেটিভদের [অর্থাৎ ভারতীয়দের] উন্নততর বুদ্ধির জন্যে হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।' এমনকি প্রকাশ্য ঘোষণাতেও তিনি বেশ উদ্ভটভাবে ও বিনা প্রয়োজনে অপমানজনক কথা বলতে পারতেন ঃ 'আমি আশা করি আমি কোনো মিথ্যা বা উদ্ধত দাবি করছি না যখন আমি বলি যে, সত্যের উচ্চতম আদর্শ অনেকাংশেই একটি পাশ্চাত্য ধারণা'। (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন ভাষণ, ১৯০৫)

কার্জন-এর প্রশাসনকে শেষ পর্যন্ত যা অত তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছিল তা হলো শিক্ষিত ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা (যার প্রতিনিধি ছিল কংগ্রেস) সম্পর্কে তাঁর অটল বৈরীভাব। সেই সঙ্গে ছিল আর-একটি সঙ্কল্প—এই বৈরীভাবের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়—ভারতে ব্রিটিশ রাজের কর্তৃত্বকে শক্তিশালী, নির্দিষ্টমুখী ও বলবৎ করতে হবে। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী বৈরীভাব আত্মপ্রকাশ করার আগেই, শুরু থেকেই তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন, কংগ্রেসকে তিনি 'নোংরা জিনিস' হিসেবে গণ্য করবেন, '... কখনোই তার তোয়াক্কা করবেন না' যেন 'এটি যতখানি নির্দোষ, এটি নিষ্প্রয়োজন এবং সরকারের যতখানি বৈরী বা রাজদ্রোহী, এটি স্বাভাবিক বিপদ' (অ্যাম্পটহিল-কে কার্জন, ১৫ জুন ১৯০৩)। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, পুলিশি ব্যবস্থার সংস্কার এবং সরকারি গোপনীয়তা আইন (১৯০৪)-এর মধ্যে দিয়ে নিরাপত্তাকে জোরদার করা ছিল তাঁর পরিকল্পনার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অ্যান্ড্রু ফ্রেজার-এর সভাপতিত্বে গঠিত পুলিশ কমিশন (১৯০২-০৩)-এর সুপারিশ অনুযায়ী পুলিশ বাহিনীর সংখ্যা, প্রশিক্ষণ ও বেতনে লক্ষণীয় উন্নতি ঘটে। এর জন্য বছরে ১৫০ লক্ষ টাকা বাড়তি খরচ হয়। রাজনৈতিক অপরাধের মোকাবিলা করার জন্যে অদ্ভুত নামধারী 'ঠগী ও ডাকাতি বিভাগে'র বদলে অপরাধ- ঘটিত সংবাদ সংগ্রহের একটি আলাদা বিভাগও খোলা হয়।

কার্জন ও জাতীয়তাবাদীরা

কার্জন ও জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের মধ্যে প্রকৃত সঙ্ঘাত শুরু হয় পরপর তিনটি ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ঃ ১৮৯৯-এ কলকাতা পৌরসভায় পরিবর্তন, ১৯০৪-এর বিশ্ববিদ্যালয় আইন এবং ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ। প্রথমটির ফলে নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যের সংখ্যা কমে গেল; এটি সরাসরি যুক্ত ছিল কলকাতার ইওরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে, যারা ইতোমধ্যেই লাইসেন্স বা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা মঞ্জুরিতে দেরি হওয়া নিয়ে প্রায়ই অভিযোগ করত। এটাও কৌতূহলের যে, বাঙলার তদানীন্তন ছোটোলাট আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি—এইসব পরিবর্তনের

জন্যে, কার্জন বাদে, যিনি মুখ্যত দায়ী—তিনি ছিলেন বার্ণ কম্পানির এক অংশীদারের ভাই। এই অংশীদার আবার আইন পরিষদে বাঙলার বণিকসভার প্রতিনিধি ছিলেন। সেপ্টেম্বর ১৯০১-এ সিমলায় এক গোপন ও একান্তই শ্বেতাঙ্গদের সম্মিলনে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের সূত্র স্থির করা হয়। তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয় এক বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন। এর একমাত্র ভারতীয় সদস্য, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তার সব সুপারিশ সম্পর্কে প্রবল মতভেদ পোষণ করেন। 'সর্বতোভাবে শিক্ষার মান উন্নত করা'র প্রচেষ্টা বলে এর সপক্ষে ঢাকঢোল পিটিয়েছিলেন কার্জন। ঐ আইনে নির্বাচিত সিনেট-সদস্যের সংখ্যা কমে গেল, কলেজের অনুমোদন আর স্কুলের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে শেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দয়িত্ব দেওয়া হলো সরকারি আমলাদের হাতে, এবং ন্যূনতম মাইনে বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। এই আইনের অগণতান্ত্রিক ও সঙ্কোচনমূলক প্রকৃতির দরুন শিক্ষিত ভারতীয়রা যে এর বিরোধিতা করেন তা আদৌ অস্বাভাবিক নয়। দাবি করা হয়, শিক্ষার উন্নতিই ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু শিক্ষাখাতে মোট খরচ ১৯০৩-০৪-এ ছিল ২০৪.৬ লক্ষ টাকা এবং ১৯০৫-০৬-এ ২৪৪.৯ লক্ষ টাকা। এ-ও লক্ষণীয় যে, ঐ সময়ে পুলিশ খাতে ব্যয়বৃদ্ধির তুলনায় এটি সামান্যই বেশি, আর মোট ব্যয়সংস্থানের শতকরা মাত্র ২.৫ ভাগের মতো। এই তথ্যের সঙ্গে ঐ দাবি মেলে না। শুধু পরীক্ষা নেওয়ার সংস্থা বলে নয়, জোর দেওয়া হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষণে। তাতে কিছু সুফলও ফলেছিল, বিশেষত কলকাতায়, যেখানে এটি প্রয়োগ করেছিলেন মননদৃষ্টিসম্পন্ন এক উপাচার্য, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ঠিক এই প্রসঙ্গে আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল অনুমোদন ও সহায়তা-অনুদানের ওপর নতুন সরকারি নিয়ন্ত্রণ। ১৯০৫-পরবর্তী সময়ে ছাত্রদের জঙ্গীভাব দমন করার কাজে এগুলো হাত খুলে ব্যবহার করা হয়েছিল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় আইনও সত্যিই পুলিশ কমিশনের পাশে স্থান পাওয়ার যোগ্য। দুটোই উঠতি জাতীয়তাবাদী জোয়ারের মুখে ব্রিটিশ সুরক্ষাকে মজবুত করেছিল।

বঙ্গভঙ্গ

সাধারণের কাছে কার্জন-এর যে-ব্যবস্থাটি সবচেয়ে অপ্রিয় হয়েছিল সেটি হলো—বঙ্গভঙ্গ। ঐতিহাসিকদের মধ্যেও এটি সবচেয়ে বেশি বিতর্ক তুলেছে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে স্বপক্ষীয়রা জোর দিতে চেয়েছেন প্রশাসনিক সুবিধের ওপর, সমসাময়িক ও পরবর্তী জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ তুলেছিলেন ইচ্ছাকৃত 'ভেদ ও শাসন'-এর। ১৯০৩ অবধি সরকারি মহলে অবশ্য প্রশাসনিক বিবেচনাই ছিল সর্বপ্রধান। বাঙলা প্রেসিডেন্সির আয়তন বিভিন্ন সময়ে বহু লোককে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল (তাই অনেক আগেই, ১৮৬০-এর দশকেই এর আকার কমানোর বিক্ষিপ্ত কিছু প্রস্তাব এসেছিল। ১৮৭৪-এ আসাম ও সিলেটকে আলাদা করার কথা ওঠে, আর ১৮৯৬-৯৭-এ আসামের মুখ্য কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড-এর প্রস্তাব ছিল : চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহকে তাঁর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হোক) এবং আসামকে আরও সমর্থ প্রদেশে পরিণত করার ব্যাপারে আগ্রহও বাড়ছিল। ২৮ মার্চ ১৯০৩-এর এক নোট-এ ওয়ার্ড-এর এই প্রস্তাবটি আবার উত্থাপন করেন বাঙলার নতুন ছোটোলাট অ্যান্ড্রু ফ্রেজার, ভারতের আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস বিষয়ক একটি কার্যবৃত্ত (মিনিট)-এ (১ জুন ১৯০৩)। কার্জন

সেটি মেনে নেন। জনসাধারণের বোধার্থে এটির উপযুক্ত কাটছাঁট করা হয় আর সর্বপ্রথম ঘোষণা করা হয় ৩ ডিসেম্বর ১৯০৩-এ, স্বরাষ্ট্রসচিব রিজলি-র একটি চিঠিতে। হস্তান্তরের এই পরিকল্পনার সমর্থনে রিজলি দুটি যুক্তি হাজির করেন—বাঙলার ভার লাঘব ও আসামের উন্নতি। এটা অবশ্য উল্লেখ করা দরকার যে, 'প্রশাসনিক সুবিধে' কোনো বিমূর্ত বা নিস্পক্ষ ব্যাপার ছিল না। বরং প্রায়শই তা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল ব্রিটিশ বড়কর্তা ও ব্রিটিশ ব্যবসাদারদের সুবিধের সঙ্গে। রিজলি-র যুক্তি ছিল, আসামের প্রসার হওয়া দরকার, 'যাতে এখানকার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের আরও বিস্তৃত ও আরও আকর্ষণীয় কর্মক্ষেত্র দেওয়া যায়', এবং 'এর চা, তেল ও কয়লাশিল্পের বিকাশের উদ্দেশ্যে একটি সামুদ্রিক নির্গম-পথের ব্যবস্থা হয়'। (এর সঙ্গে যোগ করা যায়, এই সব শিল্পই ছিল শ্বেতাঙ্গপ্রধান)।

ডিসেম্বর ১৯০৩ এবং ১৯ জুলাই ১৯০৫-এ আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মধ্যবর্তী সময়ে, ফ্রেজার, রিজলি ও কার্জন হস্তান্তরের পরিকল্পনাকে রূপান্তরিত করলেন পুরোদস্তুর এক ব্যবচ্ছেদে। তার পরিণামে, আসাম ছাড়াও চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজশাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা ও মালদহ-ও নতুন প্রদেশ 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম'-এর অন্তর্ভুক্ত হলো। প্রকাশ্যে এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য অস্বীকার করা হয়েছিল। কিন্তু বিশেষত এই দ্বিতীয় পর্যায়ে, গোপন সরকারি কার্যবৃত্ত, মন্তব্য ও ব্যক্তিগত কাগজপত্রের কল্যাণে সে-কথা টেকানো কঠিন। সমসাময়িক ও পরবর্তী জাতীয়তাবাদীরা অভিযোগ করেছিলেন, হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে ইচ্ছে করেই উস্কানি দেওয়া হচ্ছে। এই অভিযোগের কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায় ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-এ ঢাকায় কার্জন-এর বহু উদ্ধৃত এক বক্তৃতায়। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কাছে তিনি এক ঐক্যের সম্ভাবনার কথা বলেন, যে-ঐক্য তারা প্রাচীনকালের মুসলমান সুবাদার ও রাজাদের পরে আর ভোগ করে নি। কিন্তু এই সময়ে সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল ঃ পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলার প্রভাবশালী হিন্দু রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। স্বরাষ্ট্র সচিব এইচ রিজলি ৭ ফেব্রুয়ারি ও ৬ ডিসেম্বর ১৯০৪-এর দুটি নোট-এ ব্যবচ্ছেদের সমালোচকদের যুক্তি বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে এই সমস্ত কথাই স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে গুছিয়ে বলেছেন ঃ 'ঐক্যবদ্ধ বাঙলা একটা শক্তি; বিভক্ত বাঙলা নানাদিকে চলবে। এটা নির্ভেজাল সত্য এবং [এই] পরিকল্পনার এটি অন্যতম গুণ। ... এই পরিকল্পনায়—যেমন মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে বেরার-এর সংযুক্তির ব্যাপারে—আমাদের অন্যতম লক্ষ্য হলো আমাদের শাসনের শক্ত বিরোধী গোষ্ঠীকে দ্বিধাবিভক্ত ও দুর্বল করে ফেলা, এ কথা খুলে না-বলে একটা সরকারি নথিতে (যা নিশ্চিতভাবেই প্রকাশিত হবে) এর উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়।' ১৯০২-এ মারাঠি-ভাষী বেরারকে নিজামের কাছ থেকে স্থায়ী ইজারায় নতুন করে দখল করা হয়েছিল। কিন্তু বোম্বাই-এর সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হয় নি, কারণ, কার্জন যেমন বলেছিলেন, 'শিবাজীর কথা এমনিতেই আমরা যথেষ্ট শুনি।' বাঙলার প্রশাসনকে ভারমুক্ত করাতে একটা শাসন-পরিষদ গঠন করা বা ভাষাগতভাবে পৃথক বিহার ও ওড়িশাকে আলাদা করে দেওয়া (শেষ পর্যন্ত ১৯১১-য় যার নিষ্পত্তি হয়)—এইসব বিকল্প পরিকল্পনা কার্জন বারবার বাতিল করে দেন রাজনৈতিক কারণে। ভারত-সচিব এই শেষের প্রস্তাবটি নিয়েই নাড়াচাড়া করছিলেন। একটি টেলিগ্রামে কার্জন তাঁকে বলেন, 'এতে বাইরের সব উপাদান থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে বাঙালি অংশটিকে সংহত করার প্রবণতা দেখা দেবে, এবং আমরা যে পরিণাম

এড়াতে চাই তারই সৃষ্টি করবে। আমাদের প্রস্তাবের রাজনৈতিক সুবিধার সবসেরা গ্যারান্টি এই যে, কংগ্রেস দল এটি অপছন্দ করছে।'

আজকের দিনের কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা শিরোমণি-স্বার্থগোষ্ঠীর নিরিখেই বঙ্গ-ভঙ্গ-বিরোধিতার ব্যাখ্যা দেওয়া পছন্দ করেন। তার পূর্ব-সূচনা দেখা যায় রিজলির মতো আমলাদের লেখায়। বিক্রমপুরের বাবুরা তাঁদের কেরানির চাকরি নিয়ে দুশ্চিন্তায় ছিলেন, উভয় বাঙলায়ই যে-জমিদারদের ভূ-সম্পত্তি ছিল তাঁরা দু-দল প্রতিনিধি ও উকিল নিয়োগের ব্যাপারটা অপছন্দ করেছিলেন। কলকাতার কাছেই ভাগ্যকুলের রায় পরিবারের ছিল কাঁচা পাট ও চালের ব্যবসা, চট্টগ্রামের সম্ভাব্য উত্থানে তাঁদের হিংসে হয়। কলকাতার উকিলরা ভয় পেয়ে যান, নতুন একটা প্রদেশ মানেই শেষ পর্যন্ত নতুন একটা উচ্চ আদালত যা তাঁদের পসারে ভাগ বসাবে। তার ওপর, পূর্ব বাঙলার রাজনৈতিক শিরোমণিদের মনে হলো : আইন পরিষদে বসার সুযোগ ফস্কে যাবে (এটি ছিল প্রথম পর্যায়ে, যখন বাঙলার কিছু অংশকে মুখ্য কমিশনারের প্রদেশ আসামের সঙ্গে যুক্ত করার কথা হচ্ছিল, তখন সেখানে কোনো নির্বাচিত আইসভাও ছিল না), আর কলকাতার রাজনীতিবিদ্‌রা দেখলেন যে তাঁদের প্রভাব গুরুতরভাবে কমে যাবে। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪-এ রিজলি-র নোট-এ যেসব উপাদানের তালিকা আছে, তার কোনোটাই তাঁর আবিষ্কার নয়। আসলে, তার সবই এ-বিষয়ে প্রথমদিকের বিভিন্ন পুস্তিকায়—'লর্ড কার্জনকে লেখা খোলা চিঠি' (ঢাকা, এপ্রিল ১৯০৪) 'বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যুক্তি' ও 'বিভাগ সম্পর্কে' (কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯০৫)—বারবার দেখা গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে আমলাতন্ত্রের প্রত্যাশা ছিল : সব প্রতিবাদই অল্প দিনের মধ্যে থেমে যাবে, এবং, আর যা-ই হোক, সভা-সমিতি ও আবেদন-নিবেদনের বাঁধা সড়ক কখনোই ছাড়বে না। বাঙলা ও অন্য কয়েকটি প্রদেশের ঘটনাবলি এই প্রত্যাশাকে অচিরেই সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। জুলাই ১৯০৫-এর পর চমকপ্রদ দ্রুততায় আন্দোলন তার প্রথাগত নোঙর ছিঁড়ে বেরিয়ে এল, গড়ে তুলল নানান ধরনের নতুন ও জঙ্গী কৌশল, টেনে আনল আগের চেয়ে আরও অনেক বেশি মানুষকে এবং ছড়িয়ে পড়ল স্বরাজের সংগ্রামে।

ব্রিটিশরা স্পষ্টতই যেটিকে ছোটো করে দেখছিল তা হলো, প্রথমত বাঙালির ঐক্যবোধ—যার কিছুটা শেকড় ছিল ইতিহাসে। দীর্ঘ কাল ধরে তারা আঞ্চলিক স্বাধীনতা ভোগ করছিল, এবং তাকে লালন করেছিল, অন্তত সাক্ষরদের মধ্যে, উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারা। শিক্ষিত বাঙালি 'ভদ্রলোকে'র পক্ষে কলকাতা হয়ে উঠেছিল সত্যিকারের মহানগর। ছাত্রদের তা টেনেছিল সব জেলা থেকে, গোটা প্রদেশ ও তার বাইরেও পাঠিয়েছিল শিক্ষক, উকিল, ডাক্তার ও কেরানি। সাহিত্যচর্চার উপযোগী ভাষার বিবর্তন, ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা, আর এক আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথে এসে যা বিশ্বস্বীকৃতির দোরগোড়ায় পৌঁছেছিল—এসবের মাধ্যমেও আঞ্চলিক গরিমা ও আঞ্চলিক রচনায় আনুকূল্য করেছিল কলকাতা। এসবই লালন করেছিল এক নতুন আত্মবিশ্বাস—ক্রমবর্ধমান হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মনোভাব (বিবেকানন্দই যার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ) তাকে আরও বেশি উজ্জীবিত করেছিল। এর সঙ্গে তুলনায় কম যোগ্য উপাদান ছিল : আগে ইংরিজি শিক্ষার সুবিধের দৌলতে শিক্ষিত বাঙালিরা ভারতের অধিকাংশ জায়গার তুলনায় স্পষ্টতই এগিয়ে ছিলেন (যদিও ক্রমেই তা কমে আসছিল) বিভিন্ন পেশায়, সরকারি চাকরি এবং রাজনীতিতে। আন্তর্জাতিক

ঘটনাধারারও একটা ভূমিকা ছিল—বুয়র যুদ্ধে ব্রিটিশের পরাজয়, ১৯০৪-০৫-এ রাশিয়ার বিরুদ্ধে জাপানিদের অপ্রত্যাশিত বিজয় সমগ্র এশিয়ায় যা গর্বের পুলক জাগায় আর বাঙলার পত্র-পত্রিকা যাকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানায় (এমনকি জাপানি নেতাদের নামে বাচ্চাদের ডাকনাম রাখা হতো, যেমন, তোজো বা নোগি), অভিবাসন আইনের প্রতিবাদে চীনে মার্কিন মাল বয়কট, আর রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লব।

দৃঢ় আঞ্চলিক ঐক্য, ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্বাস ও গরিমার এই পরিবেশে এল কার্জন-এর প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ—যার পরিণতি হয়েছিল কার্যত সবার অলক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত (ফেব্রুয়ারি ১৯০৪ ও জুলাই ১৯০৫-এর মধ্যবর্তী সময়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এর সম্পর্কে প্রকাশ্যে বিশেষ কিছুই বলেন নি)। সবার ওপরে, এটিকে ধরা হয়েছিল জাতীয় অবমাননা হিসেবে। অনিবার্যভাবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নরমপন্থী আন্দোলনের তুচ্ছ ফললাভ নিয়ে রাজনৈতিক হতাশা; সম্ভবত খুব সীমিত গোষ্ঠীকেই তা সরাসরি প্রভাবিত করেছিল। সেই সঙ্গে আরও ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়েছিল জাতিগত ভেদনীতি ও শ্বেতাঙ্গদের ঔদ্ধত্য নিয়ে ক্ষোভ। জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোজনামচায় এ সবই বিশদভাবে প্রতিফলিত হয়েছে ঃ একজন শ্বেতাঙ্গ জেলা জজ যেখানে পান দু হাজার টাকা সেখানে একজন মুন্সেফ পান দুশ টাকা, দূরাগত হুইসিলের আওয়াজে তাঁর মনে পড়ে স্টিমার ও ট্রেনে জাতিগত ভেদের কথা। তিনি সান্ত্বনা পান 'জাতীয় পুনর্জাগরণের লক্ষণে', বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর কৃতিত্বে ও 'বিশ্বশক্তি হিসেবে জাপানের উত্থানে।'

জ্ঞানচন্দ্র তাঁর দিনপঞ্জি শুরু করেছিলেন (অক্টোবর ১৯০৪-এ) ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ দিয়ে। বাঙালি 'ভদ্রলোক'রা কদাচিৎ মন্বন্তর বা মহামারিতে আক্রান্ত হতেন। তাহলেও ১৮৯০-এর দশকে এ দু-এর সংহারলীলা তাঁদের বিবেককে নাড়া না-দিয়ে যায় নি। বিশেষ করে নরমপন্থীদের অন্তর্বিনাশী তত্ত্বের অন্য একটি দিক—ভারতীয় দুর্দশার ব্যাখ্যা হিসেবে 'সম্পদ নির্গম'—তার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রিটিশদের সঙ্গে 'দৈবজাত' সংযোগের ওপর আস্থা রাখা ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ল। আরও প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষোভেরও সম্ভবত একটা ভূমিকা ছিল। স্বাধীন পেশার ক্ষেত্রেও কাজের চেয়ে লোক হয়ে গিয়েছিল বেশি (১৯০৫-এর এক স্বদেশী পুস্তিকায় অভিযোগ করা হয়, পূর্ব বাঙলার মাদারিপুর—এই একটিমাত্র মহকুমায় উকিল ছিলেন ৮০ জন)। ফলে ভদ্রলোকেরা নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিলেন ছোটো জমিদারি বা মধ্যস্বত্বের ওপর। উত্তরাধিকার সূত্রে তার যে উপভাগ, তাও ক্রমশই আরও কম লাভজনক হয়ে উঠেছিল। এবং হঠাৎই দামও বাড়ছিল তাড়াতাড়ি। কে এল দত্ত যে সর্বভারতীয় অভারিত (আন্‌ওয়েটেড) সূচক খাড়া করেছেন (১৮৯০-৯৪ = ১০০) তাতে ১৯০৪-এ মূল্যমান ছিল ১০৬, ১৯০৫-এ ১১৬, ১৯০৬-এ ১২৯, ও ১৯০৮-এ ১৪৩। বস্তুত ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে মূল্যরেখাটি ছিল সবচেয়ে খাড়াই—এটিই ছিল সবচেয়ে বেশি রাজনৈতিক অশান্তির সময়।

বাখরগঞ্জ, মাদারিপুর, বিক্রমপুর, কিশোরগঞ্জ—পূর্ব বাঙলার এইসব গ্রামাঞ্চল ছিল স্বদেশী-র শক্ত ঘাঁটি। এখানেই কেন্দ্রীভূত ছিলেন হিন্দু ভদ্রলোকেরা, মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা ছিল বিশাল, এবং ইংরিজি শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল যথেষ্ট (তারই পরিণতিতে বিভিন্ন পেশায় কাজের চেয়ে লোক হয়ে গিয়েছিল বেশি এবং জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের প্রসার ঘটেছিল)।

দাম বাড়ার জন্যেও হয়তো ঐসব এলাকায় ও গোষ্ঠীর মধ্যে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদ। মুদ্রাস্ফীতির তাড়নায় শিল্প-শ্রমিকদের কিছু কিছু অংশ ধর্মঘট করেছিলেন। ১৯০৫-এর দিনগুলোর এটি এক গুরুত্বপূর্ণ—যদিও প্রায়শই বিস্তৃত—দিক তুলে ধরে। আর্থনীতিক অসন্তোষ কিন্তু ঘুরে যেতে পারত ঠিক সামনের নিপীড়নকারীর—মুনফাখোর (সাধারণত হিন্দু), মহাজন বা পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যবসাদারের—দিকেও, এবং এইভাবেই ইন্ধন জোগাতে পারত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার। বাঙলার স্বদেশী বুদ্ধিবৃত্তিজীবীরা হিন্দু পুনরুত্থানবাদী মানসিকতার সঙ্গে ক্রমেই জড়িয়ে পড়ে এই সব সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুললেন। পরে আমরা দেখব, একটা র‍্যাডিকাল কৃষি-কর্মসূচি গড়ে তুলতেও তাঁরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। মূল্যবৃদ্ধি ও চাকরি পাওয়ার সমস্যার দরুন তাঁরা আরও বেশি করে খাজনার আয়ের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়েছিলেন—যত অল্পই হোক সে-আয়। বিক্রমপুরে জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিতান্তই অল্প পৈতৃক জোতজমি ছিল। তবু তিনি তাঁর রোজনামচায় ১৮৮৫-র রায়তি আইনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, কারণ তাতে প্রজা-মালিক সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। ভূমি-সম্পর্ক বিষয়ে বাঙলায় লেখা (১৯৪০) খুবই কৌতূহলজনক একটি পুস্তিকায় মধ্যস্বত্বভোগীদের 'প্রাচীন আর্য' উৎপত্তি সম্পর্কে এটি মজার তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছিল ঃ যথারীতি তাদের স্বরচিত সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছিল 'মধ্যশ্রেণী'। লেখক অভিযোগ করেছেন, একদিকে বড় জমিদার (বলা হয়েছে, তারা মুসলমানদের ও ব্রিটিশদের তৈরি দখলদার), অন্যদিকে রায়তি আইনে উৎসাহ পাওয়া 'উদ্ধত রায়তকুল'—মধ্যস্বত্বভোগীদের এরা নিংড়ে ফেলেছে (অমৃতলাল পাল, *বঙ্গের ভূমি-রাজস্ব ও প্রাচীন আর্য্য গ্রাম্য সমিতি*, কলকাতা, ১৯০৪)। *ওপেন লেটার টু কার্জন* (১৯০৪) নামের অন্য একটি পুস্তিকায়, এডমণ্ড বার্ক-কে উদ্ধৃত করে, যাঁরা 'ভৃত্য-সুলভ নির্ভরতার ঊর্ধ্বে' আছেন সেই মানুষদের অভিমতকে জনমতের সঙ্গে এক করে দেখা হয়েছে। সেখানে স্থির বিশ্বাসে ঘোষণা করা হয়েছে, 'শিক্ষিত শ্রেণীরা'ই জনসাধারণের 'স্বাভাবিক নেতা'। কৃষককুলের সঙ্গে 'ভদ্রলোকে'র দূরত্বের তাহলে একটা মোটামুটি পরিষ্কার শ্রেণীগত উৎস ছিল, ব্যাপারটা শুধুই কায়িক শ্রমবিমুখতা নয়।

বাঙলায় বা অন্যান্য প্রদেশে চরমপন্থী বুদ্ধিবৃত্তিজীবীরা যেমন কৃষককুলের সেই মুহূর্তের আর্থনীতিক অভাব-অভিযোগের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী স্লোগান মেলাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন (সচরাচর ধর্মীয় আবেদনের মাধ্যমে ছাঁটকাট পথেই তাঁরা জনসংযোগের চেষ্টা করছিলেন, নিদেনপক্ষে মুসলমানদের ক্ষেত্রে যা প্রায়শই সর্বনাশা বলে প্রমাণ হয়েছিল), তেমনি নিচের থেকে চাপ আলগা হয়ে যাওয়ারও কিছু সাক্ষ্য আছে। দেশের একটা বড় অংশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারির ফলে নিশ্চয়ই যথেষ্ট শক্তিক্ষয় হয়েছিল। যাঁরা বেঁচে গেলেন তাঁদের ক্ষেত্রে, লোক কমার দরুন জমির ওপর চাপ, সুতরাং কৃষিজীবনের চোরাটানও হয়তো খানিকটা কমে গিয়েছিল। ১৮৭০-এর ও ১৮৮০-র দশকে গ্রামের দিকে অশান্তির পর ব্রিটিশরা কিছু প্রতিকারমূলক আইন তৈরি করে। বাঙলায় দখলি স্বত্ব জোরদার করা হয়, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে বাইরের মহাজনদের হাতে জমি চলে যাওয়ার ব্যাপারে কড়াকড়ি চালু হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা কৃষককুলের ওপরের স্তরের লোকদের কিছু কাল শান্ত রাখে। মহাজন ও ভূস্বামীদের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে তারাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয় অংশ। কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানির বাড়বাড়ন্তের সঙ্গে

দাম বাড়ার যোগ ছিল নিবিড় ঃ মনে হয় দাম আদতে বাড়ত তার জন্যেই। মুদ্রাস্ফীতির পেছনে আর-একটি কারণ হলো মুদ্রার প্রসার। তারও সঙ্গে আবার যোগ ছিল রপ্তানিজাত উদ্বৃত্তের, যার ফলে দেশে এসেছিল প্রচুর সোনা ও রুপো। এই বাড়বাড়ন্তের ফলে প্রধান উপকার হয়েছিল ব্রিটিশ রপ্তানি এজেন্সি ও ভারতীয় ফড়ে-ব্যাপারিদের। তাহলেও কৃষককুলের কিছু অংশেরও (যেমন, তুলনায়-ধনী পূর্ববঙ্গের পাটচাষীদের) বোধহয় প্রান্তিক লাভ হয়েছিল। ১৯৩৮-৩৯-এর দামের ভিত্তিতে, শিব সুব্রহ্মণ্যনের হিসেব অনুযায়ী, বিশ শতকের প্রথম দশকে মাথাপিছু জাতীয় আয় কিছুটা বেড়েছিল বলে মনে হয় ঃ ১৯০০-০১-এ ছিল ৪৯.৪ টাকা, ১৯১৬-১৭-য় দাঁড়িয়েছিল ৬০.৪ টাকা ('ন্যাশনাল ইনকাম অফ ইন্ডিয়া ১৯০০-০১ টু ১৯৪৬-৪৭', দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় মিমিওগ্রাফ, ১৯৬৫)। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চরমপন্থী পর্যায়ে জাতীয় ও সামাজিক অসন্তোষের বিভিন্ন প্রবাহকে আলাদা রাখতে সাহায্য করেছিল এই সবই।

বাঙলায় স্বদেশী আন্দোলন ঃ ১৯০৫-১৯০৮

জুলাই ১৯০৫ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা হয়েছিল প্রথাগত 'নরমপন্থী' পদ্ধতিরই ঐকান্তিক প্রয়োগ করে ঃ পত্র-পত্রিকায় প্রচার, বিস্তর সভা-সমিতি ও দরখাস্ত (বিশেষত ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায়), এবং মার্চ ১৯০৪ ও জানুয়ারি ১৯০৫-এ কলকাতার টাউন হল-এ বহু জেলা প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বড় দুটি সম্মিলনে। এই ধরনের ক্রিয়াকৌশলের সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ ব্যর্থতার থেকে শুরু হলো নতুন নতুন রূপের সন্ধান ঃ ব্রিটিশ দ্রব্য বয়কট (১৩ জুলাই ১৯০৫-এ কৃষ্ণকুমার মিত্র-র পত্রিকা সাপ্তাহিক *সঞ্জীবনী*-তে প্রথম এটি প্রস্তাব করা হয়; ৭ আগাস্ট টাউন হল-এর সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো প্রতিষ্ঠিত নেতারা যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর সেটি গ্রহণ করেন। এবং রাখীবন্ধন ও অরন্ধনের জন্যে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী-র কল্পনাসমৃদ্ধ আবেদন। বঙ্গভঙ্গ দিবসে (১৬ অক্টোবর) ভ্রাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে বিনিময় করা হলো নানা রঙের রাখি আর বিষাদের চিহ্ন হিসেবে উনুনে আগুন দেওয়া হলো না। ব্রিটিশরাও কার্লাইল সার্কুলার (২২ অক্টোবর-এ প্রকাশিত) ইত্যাদি মারফত ধর্নারত ছাত্রদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—জাতীয়তাবাদী-প্রভাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে অনুদান, বৃত্তি ও অনুমোদন প্রত্যাহারের ভয় দেখানো হলো। এর থেকেই দেখা দিল সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের আন্দোলন ও জাতীয় বিদ্যালয় সংগঠন। ৯ নভেম্বর এতে প্রভূত উৎসাহ জোগায় সুবোধচন্দ্র মল্লিকের দেখবার মতো দান ঃ ১ লক্ষ টাকা। আরও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার (বরিশালে গুর্খা পাহারা বসানো, সেখানেই এপ্রিল ১৯০৬-এ প্রাদেশিক সম্মিলনী ভাঙার জন্যে লাঠি চার্জ, ধর্নারতদের বিরুদ্ধে অজস্র 'স্বদেশী' মামলা) ফলে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠে। বাঙলায় এই আন্দোলনে অচিরেই মাথাচাড়া দিল অভ্যন্তরীণ মতভেদ। কারও কারও কাছে বয়কট হয়ে উঠল পুরো একসার নতুন পদ্ধতি স্থির করার সূচনা। ধরে নেওয়া হলো, বঙ্গভঙ্গ প্রত্যাহার মানে 'সমস্ত রাজনৈতিক লক্ষ্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম ও সঙ্কীর্ণতম উদ্দেশ্যে'র (এপ্রিল ১৯০৭-এ অরবিন্দ ঘোষ) বেশি কিছু নয়—যা 'স্বরাজ' বা পূর্ণ স্বাধীনতার সংগ্রামে একটি ধাপ মাত্র।

অন্যদের কাছে (যেমন সুরেন্দ্রনাথ) বয়কট ছিল ম্যাঞ্চেস্টারের টাকার থলির বাঁধনদড়িতে টান মেরে বঙ্গভঙ্গ রদ করার শেষ মরিয়া প্রয়াস। প্রতিষ্ঠিত নরমপন্থী নেতারা ১৬ নভেম্বর ১৯০৫-এর মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বয়কটের ডাক প্রত্যাহার করাতে পারলেন। আর মর্লি-র নিয়োগের সুবাদে (ভারত-সচিব হিসেবে তাঁর উদারতার সুনাম ছিল) অচিরেই তাঁরা সেই 'ভিক্ষাবৃত্তি'র আরও নিরাপদ কিনারায় ফিরে আসার সুযোগ নিচ্ছিলেন।

এই ধরনের সব অভ্যন্তরীণ মতভেদের স্পষ্টতই একটা উপদলীয় দিকও ছিল। যেসব ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এতকাল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল (যেমন, মতিলাল ঘোষ ও তাঁর *অমৃতবাজার পত্রিকা* বা বিপিনচন্দ্র পাল বা অরবিন্দ ঘোষ), তাঁরা এবার জোর করে ঢোকার চেষ্টা করছিলেন এতকালের বন্ধ এলাকায়, আর ভাঙতে চাইছিলেন 'উকিলদের চক্র'। বিপিনচন্দ্র অভিযোগ করেছিলেন, জেলা শহরগুলোয় এঁরা তখনও পর্যন্ত রাজনীতিকে নিজেদের কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন। তাহলেও গোটা কাহিনীটিকে যদি 'ভেতরে'র ও বাইরে'র লোকের সঙ্ঘাত হিসেবে হাজির করা হয় তবে তা অতিসরলীকরণ হয়ে যাবে, আর রিক্ত করে ফেলা হবে বাঙলায় স্বদেশী যুগের সত্যিকারের আগ্রহের দিক ও তাৎপর্যকে।

নানা প্রবণতা

১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে বাঙলার রাজনৈতিক জীবনে, সুপ্রতিষ্ঠিত নরমপন্থী ঐতিহ্য ছাড়াও তিনটি প্রধান ধারাকে তত্ত্বগত স্তরে আলাদা করা যায়। প্রথমটি ছিল, যাকে বলা যেতে পারে, 'গঠনমূলক স্বদেশী'—নিষ্ফল ও আত্ম-অবমাননাকর 'ভিক্ষাবৃত্তি'র রাজনীতি বর্জন করে, স্বদেশী শিল্প, জাতীয় শিক্ষা আর গ্রামোন্নয়ন ও সংগঠনের মাধ্যমে আত্মসহায়তা। এটি প্রকাশ পেয়েছিল প্রফুল্লচন্দ্র রায় বা নীলরতন সরকারের ব্যবসায়িক উদ্যোগে, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্রিকা *ডন* ও ডন সোসাইটিতে (জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে যা অঙ্কুরের ভূমিকা নেয়) আর, সবার ওপরে, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে। 'স্বদেশী সমাজ' ভাষণে (১৯০৪), চিরায়ত হিন্দু 'সমাজ' বা জনসম্প্রদায়ের পুনরভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে গ্রামে গঠনমূলক কাজকর্মের একটা নকশা তিনি ইতোমধ্যেই ছকে ফেলেছিলেন। বরিশাল (বাখরগঞ্জ)-এ অশ্বিনীকুমার দত্ত-র স্বদেশবান্ধব সমিতি তার প্রথম বার্ষিক প্রতিবেদনে (সেপ্টেম্বর ১৯০৬) দাবি করেছিল যে, ৮৯টি সালিশি কমিটি মারফত ৫২৩টি গ্রাম্য বিবাদের সুরাহা করা হয়েছে। এপ্রিল ১৯০৭-এ প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বলা হয়, বাঙলায় প্রায় এক হাজার গ্রাম সমিতি কাজ করছে। 'স্বদেশী' জাতীয় বিদ্যালয় ও গঠনমূলক গ্রামীণ কাজ বিষয়ে উত্তরকালে গান্ধীপন্থী কর্মসূচির অনেকখানিরই সুস্পষ্ট পূর্বাভাস এ সবের মধ্যে পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ যাকে 'আত্মশক্তি' বলেছিলেন, তার ঐ ধীর ও অনাড়ম্বর বিকাশের প্রেক্ষিত বাঙলার উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদের মনে তেমন কোনো সাড়া জাগায় নি। তাঁরা অনেক বেশি আকৃষ্ট হচ্ছিলেন অধিকতর রাজনৈতিক চরমপন্থার প্রত্যয়ের দিকে। বিপিনচন্দ্র পালের *নিউ ইন্ডিয়া*, অরবিন্দ ঘোষের *বন্দে মাতরম্*, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের *সন্ধ্যা* ও *যুগান্তর* (বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সঙ্গে যুক্ত একটি গোষ্ঠী এটি বার করে)-এর মতো পত্র-পত্রিকা স্বরাজের জন্যে সংগ্রামের ডাক দিচ্ছিল। পরবর্তী ঘটনাবলি থেকে দেখা গেল, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অনেক

চরমপন্থী নেতাই আরও কমে রফা করতে রাজি ছিলেন—যেমন, জানুয়ারি ১৯০৭-এ টিলক 'নেই মামার চেয়ে কানা মামা' পাওয়ার সাধ জানিয়েছিলেন, যদিও 'যথাসময়ে পুরো মামা পাওয়া'-র অভিপ্রায়ও তাঁর ছিল। আর মৌলিক মতভেদ ছিল পদ্ধতি নিয়ে, তার ধ্রুপদী বয়ান পাওয়া যায় এপ্রিল ১৯০৭-এ *বন্দে মাতরম্*-এ প্রকাশিত অরবিন্দের প্রবন্ধগুচ্ছে (পরে 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতি' নামে পুনর্মুদ্রিত)। 'শান্তিপূর্ণ আশ্রম, স্বদেশীয়ানা ও আত্মসহায়তা'র আদর্শকে তিনি বিদ্রূপ করলেন অপর্যাপ্ত বলে, আর হাজির করলেন ব্রিটিশ পণ্য, সরকারি শিক্ষা, বিচার-ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাজকর্মের 'সংগঠিত ও নিরবচ্ছিন্ন বয়কট'-এর কর্মসূচি (তার সহায় হবে স্বদেশী শিল্প, জাতীয় বিদ্যালয় ও সালিশি আদালতের ইতিবাচক বিকাশ)। আর তিনি প্রতীক্ষা করছিলেন, ব্রিটিশের দমন-পীড়ন যদি সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন অন্যায় কানুনের বিরুদ্ধে অসামরিক আইন অমান্য আন্দোলন, রাজভক্তদের 'সামাজিক বয়কট' ও সশস্ত্র সংগ্রামের পথ নেওয়া হবে। ২১ নভেম্বর ১৯০৬-এর *সন্ধ্যা* পত্রিকাও ঐ একই পরিপ্রেক্ষিতের পরিকল্পনা করেছিল : '...চৌকিদার, পাহারাওয়ালা, ডেপুটি, মুন্সেফ, কেরানি—সেপাই-এর কথা না-বললেও চলে—প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কাজ ছেড়ে দেয়, তাহলে এক নিমেষেই এদেশে ফিরিঙ্গিদের শাসন শেষ হতে পারে'।* আবারও, অহিংসার গোঁড়ামি বাদ দিয়ে, গান্ধীবাদের পুরো ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মসূচিই এখানে পাওয়া যাচ্ছে, আর লক্ষণীয় এই যে, কর-বা খাজনা-বন্ধের ডাক দেওয়া হয় নি। এপ্রিল ১৯০৭-এ লেখা প্রবন্ধগুচ্ছে অরবিন্দ সেটি পরিষ্কার নাকচ করে দিয়েছিলেন, কারণ তা বাঙলার জমিনদার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যাবে, যাদের মূলত দেশপ্রেমিক হিসেবে ধরা হয়েছিল।

কার্যত, একেবারেই কথার ও কলমের লড়াই-এ আর কংগ্রেস সংগঠন নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে প্রচুর শক্তি ক্ষয় করেছিলেন বাঙলার চরমপন্থীরা। যদিও পরে আমরা দেখব যে (অন্যদের সঙ্গে) মনোগ্রাহী একসার জেলা সংগঠন বা সমিতি গড়ে তোলায় ও শ্রমিক-বিক্ষোভের ক্ষেত্রে খানিক নতুন রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁদের অবদান ছিল। অবশ্য ইতোমধ্যে ১৯০৭ নাগাদ গণ-আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উঠে আসছিল তার নিজের কর্মীবাহিনীর মধ্যে থেকে; তাঁরা ডাক দিচ্ছিলেন শিরোমণিকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের : 'প্রতিটি জেলায় ক'জন ইংরেজ কর্মচারী আছে? দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে তোমরা একদিনেই ইংরেজ শাসন শেষ করে দিতে পার। ... আমরা যদি অলস হয়ে বসে থাকি, আর অঙ্কুশের ঘা-য় সমগ্র জনসাধারণ মরিয়া না-হয়ে ওঠা পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে দ্বিধা করি, তবে অনন্তকাল অবধি আমরা অলসই থাকব। হে দেশপ্রেমিকগণ! রক্ত ছাড়া দেশ কি জাগবে?' (*যুগান্তর*, ৩ মার্চ, ২৬ আগস্ট ১৯০৭)।** আধুনিকতাপন্থী ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদী প্রবণতার মধ্যে রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী বা লক্ষ্য নিয়ে বিতর্ক ছাপিয়ে দেখা গিয়েছিল সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে আর-এক বিবাদ। সাধারণভাবে স্বদেশী মেজাজের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগ ছিল রাজনীতি ও ধর্মীয় পুনরুত্থানবাদের মিলন প্রয়াসের। এটিকে বারবার ব্যবহার করা হয়েছিল সক্রিয় কর্মীদের নৈতিক শক্তিবৃদ্ধি এবং জনসংযোগের প্রধান উপকরণ হিসেবে। সুরেন্দ্রনাথ তাই দাবি করেছিলেন, তিনিই প্রথম মন্দিরে

* মূলের ইংরিজি অনুবাদের অনুবাদ—সম্পা.।

** মূলের ইংরিজি অনুবাদের অনুবাদ—সম্পা.।

দাঁড়িয়ে স্বদেশী শপথ নেওয়ার উপায়টি ব্যবহার করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যেও প্রায়শই প্রবল পুনরুত্থানবাদী অন্তর্বস্তু ছিল, প্রচলিত জাতিভেদ বিধির মাধ্যমে বয়কট বলবৎ করার চেষ্টা হয়। যে ১৯০৬-এ চরমপন্থী নেতারা জেদ ধরেছিলেন যে, প্রতিমা পূজো সমেত শিবাজী উৎসব করতে হবে। *বন্দে মাতরম্*, *সন্ধ্যা* বা *যুগান্তর*-এর পাতায় র‍্যাডিকাল রাজনীতির সঙ্গে আক্রমণমুখী হিন্দুত্ব প্রায়শই অঙ্গাঙ্গী মিশে যেত। তাহলেও প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে বিক্ষুব্ধ লোক ছিলেন। *সঞ্জীবনী* বা *প্রবাসী*-র মতো ব্রাহ্ম-সম্পাদিত পত্রিকাও ধর্মান্ধতাকে ভালো চোখে দেখে নি এবং স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করা হয় যে, 'যে জাতি নিজ পূর্ব গৌরবের অভিমানে স্ফীত হইয়া বর্তমানের উন্নতি সাধনে বিমুখ তাহারাও অশ্রদ্ধেয় এবং তাহাদের অতীতানুরাগ ব্যাধিবিশেষ' (*প্রবাসী*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩/১৯০৬ খ্রী-এ শিবনাথ শাস্ত্রী)। কৃষ্ণকুমার মিত্র-র সার্কুলার-বিরোধী সমিতি তার 'অগণিত মুসলমান কর্মী ও সমর্থকে'র কথা বিবেচনা করে শিবাজী উৎসব বয়কট করে, এবং হেমচন্দ্র কানুনগোর মতো কিছু বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীও পরে প্রচলিত ধার্মিকতাকে তীব্র ধিক্কার দিয়েছিলেন। সম্ভবত এর মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলজনক ঘটনা হলো রবীন্দ্রনাথের বিবর্তন—কয়েক বছর পুনরুত্থানবাদের যথেষ্ট প্রভাবে থাকার পরেও ১৯০৭-এর মাঝামাঝি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিঘাতে তিনি তার সঙ্গে পরিষ্কার সম্পর্কচ্ছেদ করলেন। তাঁর দুটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাসে—*গোরা* (১৯০৭-০৯) ও *ঘরে বাইরে* (১৯১৪)—সে-যুগের টানাপোড়েন ও দ্বিমুখিতা সুস্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে।

গান্ধীপন্থী গঠনমূলক কার্যকলাপ ও গণ-সত্যাগ্রহের পূর্বসূচনা প্রমাণিত হলো চূড়ান্ত ক্ষণস্থায়ী বলে, আর ১৯০৮-এর শেষদিকে বাঙলার রাজনীতি আবার আটকে গেল নরমপন্থী 'ভিক্ষাবৃত্তি' এবং ব্যক্তি 'সন্ত্রাসবাদ'—এই দুই বিপরীত—কিন্তু অসম্পর্কিত নয়—মেরুতে। এই পর্বের কেন্দ্রীয় ঐতিহাসিক সমস্যা হচ্ছে : কেন এমন হয়ে গেল—যেহেতু ব্রিটিশ নিপীড়নের বাহ্য নিমিত্তের নিরিখেই এর ব্যাখ্যা আদৌ যথেষ্ট নয়। জাতীয়তাবাদী মহলে 'পুলিশি নিষ্ঠুরতা' ও স্বদেশী 'শহিদ'দের সম্পর্কে অনেক কথা বলা হলেও, ১৯০৯ পর্যন্ত প্রকাশ্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছিল বাঙলায় মাত্র ১০টি এবং নতুন প্রদেশে ১০৫টি; অভিযুক্তদের শাস্তি হয়েছিল দু-সপ্তাহ থেকে এক বছরের কারাবাস। এই পর্বে গুলিচালানোর দুটিমাত্র ঘটনা পাওয়া যায়। তার লক্ষ্য ছিল : জামালপুরে ধর্মঘটী রেল শ্রমিক (অগাস্ট ১৯০৬) আর শেরপুরের মুসলমান দাঙ্গাবাজরা (সেপ্টেম্বর ১৯০৭) স্বদেশী বিক্ষোভকারীরা নয়। ১৯০৫-০৮-এর আন্দোলনের যেসব প্রধান উপাদান—বয়কট ও স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা, শ্রমিক ইউনিয়ন, সমিতি ও গণ-সংযোগের পদ্ধতি—সেগুলির শক্তি ও অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা আরও ভালো করে দেখা দরকার।

বয়কট ও স্বদেশী

বাঙলায় বয়কট ও স্বদেশী-র ইতিহাস বুদ্ধিবৃত্তিজীবী আন্দোলনের পরিসীমার সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরে—মোটের ওপর তার বুর্জোয়া সাধবাঞ্ছা ছিল কিন্তু তখনও পর্যন্ত সত্যিকারের বুর্জোয়া সমর্থন ছিল না। বয়কট কিছু প্রাথমিক সাফল্য অর্জনও করেছিল—কলকাতার শুল্ক দফ্‌তরের কালেক্টর সেপ্টেম্বর ১৯০৬-এ লক্ষ্য করেন যে, অগাস্ট ১৯০৫-এর তুলনায় অগাস্ট ১৯০৬-

এ সুতির থানে ২২%, তুলোজাত ও পাকানো সুতোয় ৪৪%, নুনে ১১%, সিগারেট ৫৫% ও বুট-জুতোয় ৬৮% আমদানি কমেছে। ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় বিক্রি পড়ে যাওয়ার জন্যে অনেকটাই দায়ী ছিল ব্যবসার শর্ত নিয়ে কলকাতার মারোয়াড়ি দোকানদারদের সঙ্গে ব্রিটিশ নির্মাতাদের কোন্দল। এর ফলে, 'সৌভাগ্য দিবসে' (লাকি ডে) চুক্তির পরিমাণ দর্শনীয় রকমে নেমে যায় : অক্টোবর ১৯০৫-এ যা ছিল ৩২,০০০ গাঁট, পরের বছরে তা দাঁড়ায় মাত্র ২৫০০। যা-ই হোক, এই গোলমাল মিটে গেলে মারোয়াড়িরা তাদের পুরনো মুৎসুদ্দি ব্যবসায়ে ফিরে যায়, অন্যদিকে প্রায়শই সামাজিক বয়কটের মুখ্য লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় জেলা স্তরে সাহা গোষ্ঠীর ব্যবসায়ীরা, কারণ তারা স্বাদেশিকতার স্বার্থে মুনাফাকে খাটো করতে রাজি হয় নি। বাঙলার বহু আবেদন সত্ত্বেও বোম্বাই-এর কল-মালিকরা তাদের দিক থেকে দাম বাড়াবার সুযোগটুকুর সদ্ব্যবহার করল। ম্যানচেস্টার থেকে আমদানি-করা মিহি ধরনের সুতো ও কাপড় বোম্বাই তখনও তৈরি করতে পারত না। এবং সেই কারণেই বয়কট নিয়ে তাদের খুব বেশি উৎসাহ ছিল না। এও লক্ষণীয় যে, আমদানি সবচেয়ে পড়ে গিয়েছিল জুতো ও সিগারেটের মতো ভোগ্যপণ্যের ক্ষেত্রে। শুল্ক বিভাগের কালেক্টর উল্লেখ করেছেন, এর চাহিদা ছিল মূলত 'ভারতীয় মধ্যশ্রেণী ভদ্রলোক, যেমন কেরানি, উকিল ইত্যাদির...' মধ্যে। (গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, 'হোম পাবলিক বি', অক্টোবর ১৯০৬, নোট ১৩)।

স্বদেশী মেজাজ লক্ষণীয়ভাবে পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিল তাঁত, রেশম-বয়ন ও অন্যান্য কতকগুলি পরম্পরাগত কারু-শিল্পে—১৯০৮-এর দুটি সরকারি শিল্প-সমীক্ষায় এই বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বৃহৎ শিল্পের কুফলগুলি এড়ানোর জন্যে ভারতীয় বা প্রাচ্য উপায় হিসেবে হস্তশিল্পকে মহিমান্বিত করার একটি প্রায় গান্ধীপন্থী, মননগত প্রবণতাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। যেমন, ১৯০০-য় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিল্প বিপ্লবের ভয়াবহতা প্রমাণ করার জন্যে এঙ্গেলস থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যেখানে না-হলে নয়, শুধু সেখানেই তিনি বড় কারখানা চেয়েছিলেন। তাঁর পছন্দ ছিল, যেখানে সম্ভব, ছোটো মাপের 'এক-একটি পরিবার-সংগঠন', খোলাখুলি জাতিভিত্তিতে সেগুলো চলবে। যা-ই হোক, বেশ কয়েকটি আধুনিক শিল্প গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নরমপন্থী অর্থনীতি থেকে এই তাত্ত্বিক বিচ্যুতি (যা প্রায়শই পুনরুত্থানবাদের সঙ্গে যুক্ত) কোনো বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। ছাত্রদের কারিগরি শিক্ষণের উদ্দেশ্যে বিদেশে (বিশেষত জাপানে) পাঠানোর তহবিল সংগ্রহের জন্যে মার্চ ১৯০৪-এ যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ একটি সমিতি স্থাপন করেন। প্রচুর ঢাকঢোল পিটিয়ে অগাস্ট ১৯০৬-এ বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্ চালু হয়েছিল। তার যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল শ্রীরামপুরের একটি বহাল কারখানা থেকে। মোটামুটি সফল কয়েকটি উদ্যোগ হলো : চীনামাটির পাত্র (১৯০৬-এর ক্যালকাটা পটারি ওয়র্কস), ক্রোমিয়াম দিয়ে চামড়া ট্যান করা, সাবান, দেশলাই ও সিগারেট। এর পৃষ্ঠপোষক ও উদ্যোক্তাদের মধ্যে কিছু বড় জমিদার (যেমন কাশিমবাজারের মণীন্দ্র নন্দী) থাকলেও, বেশির ভাগই এসেছিলেন মূলত বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের থেকে। তাই মূলধনের অভাব হয়ে উঠেছিল কঠিন প্রতিবন্ধক। প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ব্যাবসাদার সম্প্রদায় মনে করত, 'শিল্প-উদ্যোগে টাকা বিনিয়োগের চেয়ে আমদানি-করা মালের দালালি করে টাকা করা অনেক সহজ কাজ' (একটি সরকারি প্রতিবেদনে উদ্ধৃত—কলকাতার নেতৃস্থানীয় এক ব্যবসাদারের উক্তি)। কালীশঙ্কর

শুকুল নামে একজন স্বদেশী প্রচারপুস্তিকা-লেখক বলেওছিলেন, একটা বা দুটো কারখানা চালু করার থেকেও প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত করা উচিত প্রথমেই বণ্টন ব্যবস্থার দিকে, আর ধীরে ধীরে ব্যবসার মাধ্যমে এক নতুন ধরনের ব্যবসাদার শ্রেণী গড়ে তোলা দরকার, যেহেতু পুরনো শ্রেণীটি মূলত স্বাদেশিকতা-বিমুখ। কিন্তু তাঁর এই মতামত গ্রহণ করার মতো বিশেষ কেউ ছিল না। বাঙলার অর্থনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রে স্বদেশী তাই কখনোই কব্জা ভাঙার মতো গুরুতর কারণ হয়ে ওঠে নি।

জাতীয় শিক্ষা

অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো স্বদেশী বাঙলায় জাতীয় শিক্ষা প্রয়াসেও যথেষ্ট বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। এর বিস্তার ছিল আরও বেশি, কারিগরি শিক্ষণের দাবি থেকে শুরু করে মাতৃভাষায় শিক্ষার সমর্থনে প্রচার (খুব জোর দিয়ে যার আবেদন রেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ), রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন ও সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের খানিক পাঁচ মেশালি ডন সোসাইটির পরিকল্পনা পর্যন্ত, যাতে কিছু বাছাই-করা তরুণের 'উচ্চতর সংস্কৃতি'র জন্যে পরম্পরাগত ও আধুনিক-কে একটি কার্যক্রমে যুক্ত করা গেল। অবশ্য ছাত্রসম্প্রদায়ের বড় অংশকে জাতীয় শিক্ষা আকর্ষণ করতে পারে নি, কারণ তাতে চাকরির সম্ভাবনা ছিল নগণ্য। এর বছর দুই পরে যা টিকে ছিল তা হলো : বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ (মার্চ ১৯০৬-এ গঠিত ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন-এর অন্তর্গত, গোড়ায় তার পরিকল্পনা করা হয়েছিল একটি সমান্তরাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে, কিন্তু আর কোনো কলেজকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় নি), একটি বেঙ্গল টেক্‌নিকাল ইন্‌স্টিটিউট (যেটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এদের থেকে বেরিয়ে আসা একটি গোষ্ঠী, নরমপন্থীদের সঙ্গে যাদের আরও ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল) আর— ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার দিক থেকে সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ—পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের প্রায় বারোটি এবং পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে তার চেয়েও যথেষ্ট পরিমাণে বেশি জাতীয় বিদ্যালয়। এর পরের যে-ঘটনাধারায় সরকারি কর্তৃপক্ষ অল্প কিছুকালের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল তা হলো : 'গ্রামে গ্রামে এইসব বিদ্যালয়ের প্রসার ও প্রাথমিক শিক্ষাকে দখল করা'র প্রয়াস ('হোম পলিটিক্যাল খ', মার্চ ১৯৯০, পৃ. ১০-১১) এই চেষ্টা হয়েছিল ময়মনসিংহ, ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের বিদ্যালয়গুলিকে নিয়ে, কখনও কখনও যেখানে বিশাল সংখ্যক মুসলমান ও নিচুজাতের নমঃশূদ্র ছাত্ররা পড়ত। অবশ্য এই ধরনের জেলা বা গ্রামের বিদ্যালয় সম্পর্কে কলকাতা-ভিত্তিক জাতীয় পরিষদ (ন্যাশনাল কাউন্সিল) ছিল অনেকটাই উদাসীন (১৯০৮-এ মোট অর্থসংস্থানের ১২৫,০০০ টাকার মধ্যে তাদের জন্যে খরচ করা হচ্ছিল মাত্র ১২,০০০ টাকা)। গণমুখী আন্দোলনের সাধারণ অবনতি থেকে তারাও বাদ পড়ে নি। শেষ পর্যন্ত টিকে রইল পূর্ববঙ্গের কয়েকটি মাত্র বিদ্যালয়। কার্যত এগুলোই হয়ে উঠেছিল বিপ্লবী সংগ্রহের কেন্দ্র। এর মধ্যে ঢাকার কাছে সোনারঙ জাতীয় বিদ্যালয় ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত।

শ্রমিক বিক্ষোভ

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ বেঙ্গল আন্ডার অ্যান্ড্রু ফ্রেজার, ১৯০৩-০৮ শীর্ষক সরকারি সমীক্ষায় 'শিল্প বিক্ষোভ'কে 'এই শতাব্দীর বিশিষ্ট লক্ষণ' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে, আর 'পেশাদার

বিক্ষোভকারী'দের ভূমিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বেশ অভিনব ব্যাপার বলে। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও সেই সঙ্গে প্রায়শই জাতিগত অপমান যা শ্বেতাঙ্গ-নিয়ন্ত্রিত শিল্প-উদ্যোগে ধর্মঘটের ইন্ধন জোগাচ্ছিল (যেহেতু বেশিরভাগ কারখানা ছিল বাঙলায়), সেগুলো তখন জাতীয়তাবাদী মহল থেকে সংবাদপত্রে যথেষ্ট সহানুভূতি, কখনও বা আর্থিক সহায়তা এবং এমনকি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করার সাহায্যও পাচ্ছিল। অগ্রণী শ্রমিকনেতা হিসেবে চারজনের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় ঃ তিন ব্যারিস্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুসুম রায়চৌধুরী, এথানাসিয়াস অপূর্বকুমার ঘোষ, আর উত্তর কলকাতার একটি ছোটো ছাপাখানার মালিক প্রেমতোষ বসু। কাজের একটি নতুন নিয়মকে মানহানিকর মনে করে হাওড়ার বার্ন কম্পানির ২৪৭ জন বাঙালি কেরানি তার প্রতিবাদে কাজ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। সেপ্টেম্বর ১৯০৫-এ সমগ্র স্বদেশী জনতা তাকে অভিনন্দন জানায়। পরের মাসে কলকাতায় হলো ট্রাম ধর্মঘট। অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অপূর্ব কুমার ঘোষের চেষ্টায় তার নিষ্পত্তি হয়। আর ১৬ অক্টোবরের প্রতিবেদনে বন্‌ধের মতো স্বাদ পাওয়া যায় ঃ প্রায় সব দফ্‌তরেই তালা ঝুলছে, রাস্তায় গাড়োয়ান নেই, আর কয়েকটি চটকল ও রেলের কর্মশালায় ধর্মঘট। তার অল্প কিছুদিন বাদেই দেখা দিল প্রথম প্রকৃত শ্রমিক সঙ্ঘ—সরকারি ছাপাখানায় এক কঠিন ধর্মঘটের মধ্যেই ২১ অক্টোবর গঠিত হলো মুদ্রাকরদের ইউনিয়ন। জুলাই ১৯০৬-এ পূর্ব-ভারতীয় রেলপথের কেরানি ধর্মঘটের থেকেই গড়ে উঠল রেলপথকর্মী ইউনিয়ন, আর আসানসোল, রানীগঞ্জ ও জামালপুরে সভা-সমিতি করে কুলিদের দলে টানার চেষ্টা চলল সেখানে। ভাষণ দিলেন অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অপূর্বকুমার ঘোষ ও প্রেমতোষ বসু ছাড়াও বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও লিয়াকত হোসেনের মতো স্বদেশী রাজনৈতিক নেতারা। ২৭ অগাস্ট জামালপুর কর্মশালায় সর্বহারার এক বিরাট হস্তক্ষেপ ঘটে, যার ফলে (পুলিশের) গুলি চলে। ধর্মঘট অবশ্য ব্যর্থ হয়, আর সেই সঙ্গে ভেঙে যায় ইউনিয়নও। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যে চটকলেও প্রায়শই ধর্মঘট হয়েছিল। ৩৭টির মধ্যে ১৮টি চটকলে বিভিন্ন সময়ে তা ঘটে। অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে দেখা যায়, অগাস্ট ১৯০৬-এ তিনি বজবজে ভারতীয় মিলশ্রমিক ইউনিয়ন সংগঠিত করেছেন। ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের যে-সমস্যাটি ক্রমাগত দেখা দেবে, তাঁর কাগজপত্র থেকে তা-ও ধরা পড়ে। শ্রমিকদের সঙ্গে যোগাযোগ অনিবার্যভাবেই হতো প্রায়শই 'বাবু' (কেরানি) ও সর্দারদের মাধ্যমে। তাহলেও বজবজ চটকলের ২৮ জন শ্রমিকের সই-করা একটি স্মারকলিপিতে দেখা যায় ঐ 'বাবু' ও সর্দাররা ছিল শুদে শোষক তারা ঘুষ আর পুজোর চাঁদা আদায় করত।

শ্রমিক আন্দোলন যখন তুঙ্গে ওঠে তখন তা এতই শক্তিশালী হয়ে দেখা দিয়েছিল যে, ইঙ্গ-ভারতীয় পত্রিকা *পায়োনিয়ার* ২৭ অগাস্ট ১৯০৬ গর্জে ওঠে এই বলে যে ঃ রাজনীতিবিদ্‌ 'মনের খুশিতে বঙ্গবিভাগের ব্যাপারে বা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে পারেন, কিন্তু যখন তিনি অজ্ঞ শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের বীজ বপন করেন ... সমগ্র প্রদেশের মঙ্গলকে বিঘ্নিত করেন ... তখন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সরকারের নিজেকে জানান দেওয়ার সময় হয়েছে।' রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটের 'রুশীয় পদ্ধতি'র বিরাট সম্ভাবনা সম্পর্কে কিছু কিছু চরমপন্থী পত্র-পত্রিকা মাঝে মাঝে জল্পনা-কল্পনা করছিল ঃ 'নিপীড়নের সময়ে কার্যকর প্রতিবাদের যে পদ্ধতি আজকের রাশিয়ার শ্রমিকরা দুনিয়াকে শেখাচ্ছে ভারতের শ্রমিকরা কি তাদের থেকে

কিছু শিখবে না?'* (*নবশক্তি*, ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৭, বিপিনচন্দ্র পাল কারারুদ্ধ হওয়ার পর)। অবশ্য অনেক কিছুর মতো এ সবই আগ্রহ জাগানো পূর্বাভাসই থেকে গিয়েছিল, কোনো যথার্থ রাজনৈতিক ধর্মঘট হয় নি (১৯০৮-এ টিলকের বিচারের সময়ে যেমন হয়েছিল বোম্বাই-এ), বাগিচা-ও খনি-শ্রমিকরা গা করেন নি। স্বদেশীদের যোগাযোগ বেড়েছিল মূলত কেরানিদের, বা খুব বেশি হলে, বাঙালি চটকল-শ্রমিকদের সঙ্গে (ফোর্ট গ্লস্টার বা বজবজের মতো চটকলের গুরুত্ব এইখানেই, পশ্চিমা শ্রমিকরা এখানে অন্যান্য জায়গার চেয়ে কম চোখে পড়ত)—এবং ১৯০৮-এর গ্রীষ্মের পর, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদী আগ্রহ হঠাৎ পুরোপুরিই থিতিয়ে পড়ে। ১৯১৯-২১-এর আগে তা আর নতুন করে দেখা দেয় নি।

সমিতি

সমিতি বা 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক' আন্দোলনের আকস্মিক উত্থান ছিল স্বদেশী যুগের অন্যতম প্রধান কীর্তি। ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর সেটি দেখে, এই ধরনের সংগঠনের সঙ্গে উঠতি সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলোকে প্রায়শই এক করে ফেলা হয়েছে। আসলে, ১৯০৮-এর গ্রীষ্ম পর্যন্ত অধিকাংশ সমিতিই ছিল বেশ খোলামেলা সংস্থা, সেগুলি যুক্ত ছিল নানা ধরনের কাজে : সদস্যদের শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষণ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি বা ধর্মীয় উৎসবের সময়ে সমাজ-সেবা, বিভিন্নরূপে স্বদেশীর বাণী প্রচার, কারুশিল্প, বিদ্যালয়, সালিশি-আদালত ও গ্রাম সমিতি সংগঠন এবং নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কৌশল প্রয়োগ। ১৯০৭-এ পুলিশের খবর অনুযায়ী, কলকাতার ১৯টি সমিতি ছিল। এছাড়া তার মূল শক্তি ছিল পূর্ববঙ্গে। এর মধ্যে ছিল বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে একটা কেন্দ্রীয় গোষ্ঠী (এখানে পাঁচটি মুখ্য সমিতির জন্ম হয়েছিল—স্বদেশবান্ধব ব্রতী, ঢাকা অনুশীলন, সুহৃদ, সাধনা—জানুয়ারি ১৯০৯-এ এগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়), রংপুর, ত্রিপুরা, সিলেট ও হুগলি নদীর পূর্বদিকে পুরনো প্রদেশের ভাগটিতে ছিল শক্তিশালী সংগঠন, এবং শিবসাগর, গোয়ালপাড়া ও গারো পার্বত্য অঞ্চল ছাড়া সব জেলাতেই কয়েকটি সমিতি ছিল। জুন ১৯০৭-এ পুলিশের প্রতিবেদনে হিসেব দেওয়া হয়েছে যে, স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা পূর্ববঙ্গে ৮৪৮৫ : তালিকার সবার ওপরে রয়েছে বাখরগঞ্জ ও ঢাকা—দু-এরই সদস্যসংখ্যা ২৬০০-র বেশি। অন্যান্য ব্যাপারের মতো, সমিতি-আন্দোলনের মধ্যে বহু বৈচিত্র্যও ছিল। যেমন, কলকাতাভিত্তিক সার্কুলার-বিরোধী সমিতি দাঁড়িয়ে ছিল তার ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যে (এটিই একমাত্র সমিতি যার সঙ্গে ছিলেন লিয়াকত হুসেন, আবুল হোসেন, দেদার বক্স ও আবদুল গফুরের মতো বিশিষ্ট মুসলমান সহযোগী), বরিশাল স্বদেশবান্ধব সত্যিকারের গণভিত্তি অর্জন করেছিল—১৯০৯-এ ১৭৫টি গ্রামীণ শাখার খবর পাওয়া যায়, আর ক্রমাগত জনসেবামূলক কাজের মাধ্যমে (যেমন ১৯০৬-এ প্রায়-দুর্ভিক্ষের সময়ে) এই সমিতির নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর জেলায় হিন্দু ও মুসলমান চাষীদের মধ্যে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। এর ঠিক উল্টোদিকে পুলিনবিহারী দাস-প্রতিষ্ঠিত ঢাকা অনুশীলন গোড়া থেকেই তার কাজকর্ম কেন্দ্রীভূত করেছিল শরীরচর্চা আর হিন্দুত্বের আচারে আবিল শপথের মাধ্যমে কর্মীদলের গুপ্ত প্রশিক্ষণে। তুলনায় ঢিলেঢালা কিন্তু গণমুখী

* মূলের ইংরিজি অনুবাদের অনুবাদ—সম্পা.।

কাঠামোর স্বদেশবান্ধবের ক্ষেত্রে এসব ব্যাপার প্রায় দেখাই যেত না। তাহলেও ১৯০৮ পর্যন্ত সমিতিগুলির একটা বড়ো অংশের মুখ্য কাজ ছিল গণ-সংযোগ, কখনও কখনও তা আবার নানান ধরনের খুবই কল্পনা-ঋদ্ধ মাধ্যম গ্রহণ করেছিল; শুধুই প্রচুর পত্র-পত্রিকা, পুস্তিকা বা ভাষণ (ক্রমেই আরও বেশি করে বাঙলা ভাষায়) নয়, তার সঙ্গে ছিল দেশাত্মবোধক গানের বন্যা, নাটক, ও যাত্রার (বিশেষ করে বাখরগঞ্জের মুকুন্দ দাসের যাত্রা) মতো লোক-মাধ্যমের ব্যবহার, বিভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা এবং ঐতিহ্যবাদী ধর্মীয় বাগ্‌রীতির পরিচর্চা। ক্রমশই আরও বেশি করে জনসাধারণের কাছে পৌঁছনোর প্রধান সেতু হিসেবে হিন্দুধর্মকে ব্যবহার করাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার আবেদন ছিল একই সঙ্গে কল্পনা ও ভয়ের কাছে (যেমন, রাজভক্তদের সামাজিক বয়কটে জাত-পাতের ব্যবহার)।

তবু, ১৯০৮-০৯-এ নিপীড়নের একেবারেই প্রথম ধাক্কাতেই প্রকাশ্য সমিতিগুলো হয় লুপ্ত হলো (যেমন স্বদেশ-এর ক্ষেত্রে), নয়তো পরিণত হলো সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতিতে। ঢাকার প্রতিরূপ বরিশাল প্রতিরূপকে হটিয়ে দিল। এমনকি অশ্বিনীকুমার দত্তের সংগঠনও কৃষক-সদস্যের সংখ্যা বাড়াতে পারে নি (সভায় প্রায় কিছু না-বুঝেই তাদের হাজিরা,সদাশয় বাবু-র সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধা থেকে যা আলাদা)—গ্রামীণ সমিতির মধ্যে ছিলেন বিনা ব্যতিক্রমে 'গ্রামের ভদ্রলোকরা'। এ-ও তাৎপর্যপূর্ণ যে, যেমন স্বরূপকাঠিতে (বাখরগঞ্জ জেলায়) 'স্বেচ্ছাসেবকদের অর্ধেকের কাছাকাছি ... ছিলেন ভূমিস্বত্বের অধিকারী' ('হোম পলিটিকাল ডিরোজিট', অক্টোবর ১৯০৭, নোট ১৯)। অশুভরকমের বেশি সংখ্যায় স্বদেশী মামলার বিষয় ছিল জমিদারি কর্মচারী ও মুসলমান হাটুরেদের মধ্যে বিবাদ। ভূস্বামীদের হাট বন্ধ করে দেওয়াই হয়ে উঠল বয়কটের এক মুখ্য পদ্ধতি। জমিনদার বা স্বত্বভোগীরা রায়ত বা ভাগচাষীদের ওপর চাপ দিচ্ছে—সামাজিক বয়কটের রূপ প্রায়শই এ-ই হয়ে দাঁড়াল; এক প্রজাপীড়ক জমিদার কীভাবে নায়কে পরিণত হলো—পরে রবীন্দ্রনাথের *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে হরিশ কুণ্ডুর মধ্যে তার জীবন্ত দৃষ্টান্ত রয়েছে। এটা যে শুধু মনগড়া নয় তার নিদর্শন পাওয়া যায় নভেম্বর ১৯০৭-এ টাঙ্গাইলের (ময়মনসিংহ জেলা) একটি মামলায়। সেখানে একজন মুসলমান ভাগচাষী তাঁর হিন্দু জমিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন যে, ভয় দেখিয়ে তাঁর (ভাগচাষী) ইজারা ছাড়ানোর জন্যে জমিদারটি সেই ভাগচাষীর ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড় পুড়িয়ে দিয়েছেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

তখনকার পরিস্থিতি তাই ব্রিটিশের বিভেদ ও শাসন পদ্ধতির সঙ্গে প্রায় মাপে মিলে গিয়েছিল। অক্টোবর ১৯০৭-এ উত্তর কলকাতার স্বদেশী আন্দোলনের দরদীরা দেখলেন, পুলিশ তাঁদের পেটাচ্ছে আর তাতে মদত দিচ্ছে শহরের গরিবদের মধ্যে থেকে আনা কিছু লোক। তাই সব উৎপাতের বেসরকারি তদন্ত প্রতিবেদনে বারবার তাদের বর্ণনা করা হয় 'গুণ্ডা ও নিম্নশ্রেণীর লোক, যেমন ধাঙড়, মেথর, ঝাড়ুদার ইত্যাদি' বলে। কিন্তু সত্যিকারের গুরুতর পরিবর্তন হলো মুসলমান বিচ্ছিন্নতাবাদের দ্রুত বৃদ্ধি। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের সোচ্চার আবেদন, ভ্রাতৃত্বের স্মরণীয় দৃশ্য (যেমন ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৫-এ কলকাতায় ১০,০০০ হিন্দু-মুসলমান ছাত্রের মিলিত শোভাযাত্রা), খুবই সক্রিয় ও নিষ্ঠাবান স্বদেশী মুসলমান প্রচারকগোষ্ঠীর উপস্থিতি (যেমন গজনবী,

রসুল, দীন মহম্মদ, দেদার বক্স, মনিরুজ্জামান, ইসমাইল হুসেন সিরাজী, আবুল হুসেন, আবদুল গফুর, ও লিয়াকত হুসেনের মতো লোক—মে ১৯০৭-এ প্রস্তাবিত রাজদ্রোহ বিষয়ক শাস্তির প্রথম তালিকাতেই যাঁদের কয়েকজনের নাম ছিল)—এসব সত্ত্বেও, নতুন প্রদেশ মানেই আরও বেশি চাকরি—এই ব্রিটিশ প্রচার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সফল হয়েছিল। সলিমুল্লা গোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ (অক্টোবর ১৯০৬-এ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত)-এর শিরোমণি-মার্কা রাজনীতির কথা পরে বিবেচনা করা হবে; এক্ষেত্রে আরও অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হলো পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দাহ : মে ১৯০৬-এ ময়মনসিংহ জেলার ঈশ্বরগঞ্জে, কুমিল্লায় (মার্চ ১৯০৭), এপ্রিল-মে ১৯০৭-এ জামালপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও বক্সীগঞ্জে (এসবই আবার ময়মনসিংহে)। কুমিল্লা শহরের দাঙ্গায় লক্ষণীয় ছিল 'বাজারের নিচু শ্রেণীর সাধারণ মুসলমানরা' ('হোম পাবলিক এ', মে ১৯০৭, নোট ১৬৩)। অন্যদিকে ময়মনসিংহ-র গোলযোগের একটা কৃষিঘটিত চরিত্র ছিল প্রকট। (দাঙ্গাকারীদের) লক্ষ্য ছিল হিন্দু জমিদার ও মহাজনরা—এদের মধ্যে কেউ কেউ তখন হিন্দু দেবদেবীর পুজো বহাল রাখার জন্যে ঈশ্বরবৃত্তি চাপাতে শুরু করেছিলেন। নানান জায়গায় ঋণপত্র ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছিল, কখনও কখনও দাঙ্গা 'গরিবরা বড়লোকদের লুঠতরাজ করছে'—এমন রূপ নিয়েছিল। কোথাও কোথাও এমনকি হিন্দু চাষীরাও এতে যোগ দিয়েছিলেন ('হোম পলিটিক্যাল এ', জুলাই ১৯০৭, নোট ১৬)। মৌলবিরা নাকি গুজব ছড়াচ্ছিলেন, ব্রিটিশরা ঢাকার নবাব সলিমুল্লা-র হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়েছে, আর *নবাব সাহাবের সুবিচার* নামে এক সাম্প্রদায়িক পুস্তিকায় তাঁকে চিত্রিত করা হয়েছিল বেশ অনুপযোগী ভূমিকায়, একজন ত্রাতা হিসেবে। এইসব ধর্মীয় নেতারা প্রায়শই যোগাযোগ রাখত পাট-কারবারে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধিশালী উঠতি ধনী-কৃষকদলের সঙ্গে এবং *লাল ইস্তাহার* (১৯০৭) বা তার পরের *কৃষকবন্ধু* (১৯১০)-র মতো মুসলিম প্রচারমূলক লেখাপত্রে এক ধরনের 'কুলাক' বা পুঁজিবাদী আবাদকারীর বিকাশের কথাও ভাবা হয়েছে, আর তার পাশাপাশি জমিদার-মহাজন শোষকদের সঙ্গে এক করা হয়েছে হিন্দুদের।

১৯০৭-০৮-এ অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন একগুচ্ছ নিবন্ধে তথা পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর (ফেব্রুয়ারি ১৯০৮) সভাপতির অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ দেখান, দাঙ্গার জন্যে শুধু ব্রিটিশদের দোষ দেওয়াটা যথেষ্ট নয়। 'শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না', আর মূল সমস্যা এই যে, 'আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান' ['ব্যাধি ও প্রতিকার']। যতদিন না এই ব্যবধান ঘুচছে, ততদিন বাক্‌সর্বস্ব চরমপন্থা বা সন্ত্রাসবাদী কার্যধারার চোরাপথে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিকল্প ছিল গ্রামে ধৈর্য ধরে বিনা আড়ম্বরে গঠনমূল কাজ। তিনি আশা করেছিলেন, জমিদাররা তাতে পিতৃসুলভ কায়দায় নেতৃত্ব দেবে (যেমন তিনি চেষ্টা করেছিলেন তাঁর নিজের মহালে)। ব্রিটিশদের পীড়নে যারা ক্রমেই প্রক্ষুব্ধ হচ্ছিল সেই লড়াকু যুবকদের কাছে এর বিশেষ কোনো আবেদন ছিল না। ব্যাপক মানুষকে সমবেত করার মতো কোনো সামাজিক বা আর্থনীতিক কর্মসূচিও তাঁর সত্যিই ছিল না। সুতরাং, তাঁর কণ্ঠস্বর হয়ে দাঁড়িয়েছিল ক্রমেই অরণ্যে রোদনের মতো। এরই অন্তর্নিহিত স্বীকৃতি রয়েছে *ঘরে বাইরে* উপন্যাসে। তাঁর উদারচেতা কিন্তু একেবারেই অকেজো ও বিচ্ছিন্ন নায়ক নিখিলেশের সঙ্গে তাঁর আগের উপন্যাস *গোরা*-র আশাবাদী পরিণতির গরমিলটি লক্ষণীয়।

জাতীয়তাবাদীদের বৃহত্তম অংশের কাছে মুসলমান দাঙ্গাকারীরা ভাড়া-করা দালালের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। *বন্দে মাতরম্* যেমন বলেছিল, এরা রুশ প্রতিবিপ্লবী কা লো শ ত ক (ব্ল্যাক হানড্রেড)-এর সমপর্যায়ী। ১৯০৭-এর দাঙ্গার দরুন স্বেচ্ছাসেবক-সংগঠন সত্যিই খুব চাঙ্গা হয়েছিল। চরমপন্থীদের প্রচারেও আক্রমণাত্মক হিন্দু রঙ ধরল, আর একই সঙ্গে তা মোড় নিল সন্ত্রাসবাদের দিকে। এই ছিল প্রায় অবধারিত পরিণাম; বৃহত্তম জনসাধারণ অনড় বা বৈরী হলে বিপ্লবের মানে দাঁড়ায় শুধুই শিরোমণি গোষ্ঠীর কার্যকলাপ।

দিক্-পরিবর্তন : সন্ত্রাসবাদের অভিমুখে

১৯০২ নাগাদ প্রথম বিপ্লবী গোষ্ঠীগুলির পত্তন হয়েছিল মেদিনীপুরে (জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুর উদ্যোগে) ও কলকাতায় (অনুশীলন সমিতি, প্রমথনাথ মিত্র এবং বরোদা থেকে অরবিন্দ-র পাঠানো দূত, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠিত), কিন্তু গোড়ার দিকে তাদের কাজকর্ম সদস্যদের শারীরিক ও নৈতিক প্রশিক্ষণের গণ্ডিতেই আটকে ছিল। ১৯০৭ বা ১৯০৮-এর আগে অবধি সেইসব গোষ্ঠীর বিশেষ কোনো তাৎপর্য ছিল না। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে অনুশীলনের এক ভেতরকার চক্র (অরবিন্দ-র নেপথ্য পরামর্শে) এপ্রিল ১৯০৬-এ সাপ্তাহিক *যুগান্তর* প্রকাশ করে। ঐ বছরের গ্রীষ্মে তারা দু-একটি নিষ্ফল 'ইষ্টকর্ম' ('অ্যাকশন') করে (যেমন, জনসাধারণের কাছে খুবই অপ্রিয়, পূর্ববঙ্গের ছোটোলাট ফুল্যারকে হত্যার পরিকল্পনা, যেটি ব্যর্থ হয়)। হেমচন্দ্র কানুনগো, প্রথম বিপ্লবী প্রজন্মের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যক্তি, তারপর সামরিক (ও কিছুটা রাজনৈতিক) শিক্ষার জন্যে বিদেশ যাত্রা করলেন; শেষ পর্যন্ত তিনি সে-শিক্ষা পেলেন প্যারীবাসী এক রুশ দেশত্যাগীর কাছ থেকে। জানুয়ারি ১৯০৮-এ কানুনগো ফিরে এলেন; কলকাতার উপকণ্ঠে মানিকতলার একটি বাগান-বাড়িতে মিলিতভাবে একটি ধর্মীয় শিক্ষায়তন ও বোমার কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হলো। নেতৃত্বের (বিশেষ করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ-এর) চূড়ান্ত অসাবধানতায় গ্রেপ্তার হলো অরবিন্দ সমেত গোটা দলটিই। এটি ঘটল ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্লচাকীর হাতে কেনেডি হত্যার (৩০শে এপ্রিল ১৯০৮) কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই। হত্যার লক্ষ্য ছিল বিশেষভাবে অত্যাচারী কিংসফোর্ড নামের এক শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি। তার গায়ে একটা আঁচড়ও লাগল না। ইতোমধ্যে আরও দক্ষ ধাঁচের সন্ত্রাসবাদ গড়ে উঠেছিল পূর্ববঙ্গে—তার অগ্রণী ভূমিকায় ছিল পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে আরও অনেক দৃঢ় সংগঠিত ঢাকা অনুশীলন। এদের প্রথম প্রধান উদ্যোগ ছিল বড়া ডাকাতি (২ জুন ১৯০৮)।

দেশাত্মবোধক গানের সম্পদ ও অন্যান্য যথেষ্ট পরিমাণ সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব (যার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাস ও লৌকিক পরম্পরায় নতুন আগ্রহ, জগদীশচন্দ্র বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বৈজ্ঞানিক কাজকর্ম এবং অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত চিত্রকলার কলকাতা ঘরানা) ছাড়াও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল স্বদেশী বাঙলার সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরাধিকার। র‍্যাডিকাল শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায়ের মনে তা মোহিনী মায়া বিস্তার করেছিল অন্তত একপুরুষ বা তারও বেশি সময় ধরে। অত্যাচারী রাজকর্মচারী বা বেইমানদের খতম করা, তহবিল জোগাড়ের জন্যে স্বদেশী ডাকাতি, আর, খুব বেশি হলে,

ব্রিটেনের বিদেশী শত্রুদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশায় সামরিক চক্রান্ত—'বিপ্লবী' আন্দোলন এইসব রূপ নিয়েছিল। কখনও কখনও কারও কারও সে-ইচ্ছে থাকলেও, এটি কখনোই নাগরিক গণ-অভ্যুত্থান বা গ্রামাঞ্চলে গেরিলা ভিত্তির পর্যায়ে ওঠে নি। 'সন্ত্রাসবাদ' শব্দটি তাই বেঠিক নয়।

জাতীয় সংগ্রামে শিরোমণি-'বিপ্লব' ভালোমতোই অবদান রেখেছিল। ব্রিটিশরা প্রায়ই খুব শঙ্কিত হয়ে পড়ত। পূর্ণ স্বাধীনতার (যে-লক্ষ্যটি সমগ্র কংগ্রেস ১৯৩০-এর আগে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করে নি) স্বার্থে স্থাপিত হয়েছিল মৃত্যুঞ্জয়ী বীরত্বের বিরল দৃষ্টান্ত। আশ্রয় ও অস্ত্রের খোঁজে বিশ্বব্যাপী সম্পর্ক গড়ার সন্ধান চলেছিল। আমরা দেখব, এর থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত পরিণতিও ঘটে। তার সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় ঃ হেমচন্দ্র কানুনগো। পুরী থেকে তিনি ফিরে এলেন মার্কসবাদের প্রতি কিছুটা আগ্রহী একজন নাস্তিক হিসেবে। শিক্ষিত ভারতীয়দের বহু ব্যাপক অংশের মধ্যে, কখনও কখনও অন্যদের মধ্যেও সন্ত্রাসবাদী বীরত্ব জাগিয়ে তুলেছিল বিরাট তারিফের ভাব। যেমন, ক্ষুদিরামকে নিয়ে এক পথের ভিখিরির বিলাপ তাঁর ফাঁসির কয়েক দশক পরেও বাঙলায় শোনা যেত। তবু ব্রিটিশ প্রশাসন কখনোই ভেঙে পড়ার মতো বড়ো বিপদে পড়ে নি, আর যে-তারিফ অনুভব করা যেত সেটা অন্যের আত্মাহুতিতে আনুকল্পিক তৃপ্তির বেশি আর কিছু ছিল না। প্রথমদিকের প্রায় সব গুপ্ত সমিতির তীব্র ধার্মিকতা (যেটি কালক্রমে অংশত লোপ পেয়েছিল) মুসলমানদের দূরে সরিয়ে রাখতে বা বৈরী হতে সাহায্য করেছিল। ধর্মের ওপর জোর দেওয়ার আরও কতক নেতিবাচক দিকও ছিল, হেমচন্দ্র যা পরে দেখিয়েছেন। বহু-উদ্ধৃত *গীতা*-র 'নিষ্কাম কর্মে'র তত্ত্ব কিছুটা কিম্ভূত বীরত্ব জাগিয়ে তুলেছিল। যোগ্য কর্মসূচির বদলে শহিদ হওয়ার জন্যেই শহিদ হওয়ার ভজনা ঃ 'মা আমাদের কাছে কোনো প্রকল্প, কোনো পরিকল্পনা, পদ্ধতি জোগাবেন ...' (এপ্রিল ১৯০৮-এ অরবিন্দ)। ধর্ম আবার সসম্মানে পিছু হঠার রাজমার্গ হতে পারত ঃ যেমন অরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরি চলে গেলেন, বা যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বাকি জীবনটা কাটালেন রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজী হিসেবে।

সবচেয়ে বড় কথা, জনসাধারণকে সক্রিয় রাজনৈতিক সংগ্রামে টেনে আনার প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দিয়েছিল এই শিরোমণি কার্যকলাপ। আরও র‍্যাডিকাল কর্মসূচির মাধ্যমে এই সংগ্রামই জাতীয় প্রশ্নগুলির সঙ্গে সামাজিক-আর্থনীতিক প্রশ্নগুলিকে যুক্ত করার সচেতন প্রয়াসকে তার মধ্যে নিয়ে আসতে পারত। বাংলার বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের সামাজিক সীমাবদ্ধতা তো প্রকট ঃ ১৯১৮-র এক সরকারি তালিকায় দেখা যাচ্ছে ১৮৬ জন নিহত বা দণ্ডিত বিপ্লবীর মধ্যে ১৬৫ জনই এসেছিলেন তিনটি উঁচু জাত, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য থেকে।

অন্যান্য প্রদেশে চরমপন্থা ঃ ১৯০৫-১৯০৮

এতক্ষণ আমরা শুধু বাঙলা নিয়েই ছিলাম ; এবার আমাদের নজর ছড়ানোর সময় হয়েছে। দেখতে হবে ঐ একই প্রবণতাগুলি অন্যান্য প্রদেশেও কতখানি দেখা দিচ্ছিল, আর সর্বভারতীয় স্তরে চরমপন্থীরা কীভাবে নরমপন্থীদের মোকাবিলা করেছিলেন।

কার্জন-এর কার্যকলাপ, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ গোটা ভারতেই শিক্ষিত লোকদের ব্যাপকভাবে ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু তার নির্দিষ্ট প্রত্যাচরণের প্রসার ও প্রকৃতি স্বভাবতই নির্ধারিত হয়েছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক বা স্থানীয় উপাদান দিয়ে। যেমন, বিভিন্ন চাকরি ও পেশায় তাঁদের প্রভাবশালী অবস্থানের দরুন বিহার, ওড়িশা ও আসামে শিক্ষিত বাঙালিরা আরও বেশি করে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছিলেন। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 'প্রতি-শিরোমণি' আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। শেষ পর্যন্ত, বিহার ও ওড়িশার জন্যে আলাদা প্রদেশের দাবি ওঠে। এই সব ধারায় প্রাথমিকভাবে বাঙলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট র‍্যাডিকাল মতবাদ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার ঝোঁক ছিল এবং এই সব প্রদেশে সেই মতবাদ পৌঁছয় প্রবাসী শিক্ষিত বাঙালিদের মাধ্যমে, যদিও সহানুভূতি প্রায়শই প্রকাশ পেত 'অ-রাজনৈতিক' স্বদেশী উদ্যোগের সপক্ষে (যেমন মধুসূদন দাসের উ ৎ ক ল ঐ ক্য স ম্মি ল ন)।

যুক্ত প্রদেশেও চরমপন্থা খুব বেশি দাগ কাটতে পারে নি। ১৮৮০-র দশকের শেষে প্রথম স্ফুরণের পরে সেখানে কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্যকলাপ শেষ হয়ে যায়। এলাহাবাদ সম্পর্কে আলোচনায় বেলি দেখিয়েছেন, মদনমোহন মালবীয় বা মোতিলাল নেহরুর মতো নেতারা তখনও মনে করতেন, প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা নীতির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে যথেষ্ট লাভ হবে। ম্যাকডোনেল-এর আমলে যুক্ত প্রদেশ সরকার হিন্দুদের দিকে সামান্য ঝুঁকতে শুরু করেছিল। নাগরী প্রস্তাব (১৯০০) হিন্দীকে আদালতে উর্দুর সমান মর্যাদা দিল, নাগরী প্রচারিণী সভাকে সরকারি অনুদান এবং বেনারসে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তাবে একটা মোটামুটি অনুকূল সরকারি মনোভাব—এই সবই মালবীয়কে খুশি রেখেছিল। অ-রাজনৈতিক স্বদেশী, বিশেষত যুক্ত প্রদেশ চিনি সংরক্ষণের দাবি বিষয়ে ব্রিটিশরা বেশ সহানুভূতিশীল ছিল বলে মনে হয়েছিল। ১৯০৭-এ নৈনিতালে সরকার-পুষ্ট শিল্প-সম্মিলনে মালবীয় ও চিন্তামণিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। জানুয়ারি ১৯০৭-এ টিলকের যুক্ত প্রদেশ-ভ্রমণ ছাত্রদের মধ্যে সত্যিই সাড়া ফেলেছিল, কিন্তু বেশির ভাগ প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাই দূরে সরে ছিলেন। মালবীয় ইতোমধ্যেই তাঁর নিজমার্কা রাজনীতির সঙ্গে হিন্দী ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদের আবেগময় শক্তি জুতে নিয়েছিলেন, অন্যথায় যাকে কাজে লাগাতেন র‍্যাডিকালরা। ১৯১৭ পর্যন্ত কৃষকদের কাছে পৌঁছানোর জন্যে কোনো বুদ্ধিবৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর তরফে কোনো সিরিয়স উদ্যোগ দেখা যায় নি। একমাত্র বেনারসে বড় রকমের মারাঠি ও বিশেষত বাঙালি সম্প্রদায়ের মধ্যে চরমপন্থা হয়ে ওঠে এক প্রচণ্ড শক্তি। অচিরেই এখানে একটি বিপ্লবী গোষ্ঠী দেখা দেয়। মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী (ডিসেম্বর ১৯০৭-এ ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর *সন্ধ্যা* পত্রিকার সম্পাদক) মারফত তাঁরা কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। এই বিপ্লবী গোষ্ঠীই শচীন্দ্রনাথ সান্যালের মতো এক অসাধারণ নেতার জন্ম দেয়। যুক্ত প্রদেশে সুন্দরলালের মতো যে-ছাত্ররা চরমপন্থার দলে যোগ দেন, তাঁরাও দ্রুত আকৃষ্ট হলেন সন্ত্রাসবাদের দিকে। তখনও গণরাজনীতির ভবিষ্যৎ ছিল স্পষ্টতই ক্ষীণ। তাই বাঙলা ও পাঞ্জাব গোষ্ঠীর মিলনকেন্দ্র হিসেবে ঐ প্রদেশ (বিশেষত বেনারস) তার ভৌগোলিক অবস্থানের সুবাদে বিপ্লবী পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করে।

আর-একটি অঞ্চলেও চরমপন্থা ব্যর্থ হয় : বোম্বাই প্রেসিডেন্সির গুজরাটি-ভাষী জেলাগুলিতে। ১৯০৭-এ ফিরোজশাহ্ মেহটা কৌশলে কংগ্রেস অধিবেশন নাগপুরের বদলে

নিরাপদ নরমপন্থী ঘাঁটি সুরাটে সরিয়ে নিয়ে যান। এই পরিস্থিতির কতক জটিলতা অবশ্য দেখা যায় কুনওয়ারজী ও কল্যাণজী মেহটা ভাইদের কৌতূহলজনক ঘটনা থেকে। এই দুই ধনী গুজরাটি কৃষক সুরাট অধিবেশনে যোগ দেন, লাল-বাল-পাল ত্রয়ীর উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ফিরে আসেন ও সাংগঠনিক কাজকর্ম শুরু করেন পাটীদার যুবক মণ্ডল মারফত। ১৯২০-র দশকে এটি চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছয় ঃ তাঁরাই হয়ে ওঠেন বারডোলিতে গান্ধীপন্থার বিরাট সাফল্য-কথার 'প্রকৃত স্রষ্টা'।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত পরম্পরাগত ব্যবসাদার গোষ্ঠী (যাদের বেশির ভাগই ছিল ক্ষত্রী, অগ্রবাল ও অরোরা জাতের)। মূলত ১৮৯০-এর দশকের দিনগুলোর সূত্রেই গঠনমূলক স্বদেশীর কাজ শুরু হয় ব্যাঙ্ক, বীমা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে। ১৮৯৫-এ প্রতিকারী উৎপাদন শুল্ক চাপানোর ফলে বিদেশী কাপড় বর্জন সংগঠিত করার কিছু চেষ্টাও হয়েছিল। এই ধরনের স্বনির্ভরতার প্রয়াসে 'কলেজ' উপদলের সঙ্গে যুক্ত আর্যসমাজীরা ছিলেন উল্লেখযোগ্য। সেই সঙ্গে ছিলেন লালা হরকিষণ লালের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী, যাঁরা *ট্রিবিউন* কাগজটি চালাতেন। আর্যদের মধ্যে (এমনকি কিছু পরিমাণে পাঞ্জাবী ব্রাহ্মদের মধ্যেও) গঠনমূলক স্বদেশী প্রায়শই অচ্ছেদ্যভাবে মিশে গিয়েছিল জঙ্গী হিন্দু-চেতনার সঙ্গে। লাজপত রায়ের খুবই স্বপ্রকাশ আত্মজীবনী থেকে স্পষ্ট হয় যে, ১৮৮০-এর দশকের হিন্দু-উর্দু বিতর্কই তাঁকে 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত' করে তুলেছিল। প্রভূত ইসলাম-ভাবিত পিতা কৈশোরে তাঁর মনে যে-প্রভাব ফেলেছিলেন, মুসলমান অত্যাচারের কাহিনীতে ভরা সরকারি বিদ্যালয়ে-পাঠ্যবই-এর প্রভাবে তা মুছে গেল। লাজপত হিন্দীর সপক্ষে বক্তৃতা দিতে শুরু করলেন, এমনকি দেবনাগরী বর্ণমালা লেখার আগেই (তাঁর কাছে, তাঁর সময়কার অনেক উত্তর-ভারতীয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীর মতোই, উর্দুই ছিল সাহিত্যিক প্রকাশের সত্যিই অনেক বেশি স্বাভাবিক রূপ)। উল্টোদিকে, আমরা আগেই দেখেছি যে, পাঞ্জাবের এই গোষ্ঠীর সঙ্গে কংগ্রেসের যোগাযোগ ছিল তুলনায় খুবই বিক্ষিপ্ত। প্রায়শই তাঁদের মনে হতো ঃ কংগ্রেস একই সঙ্গে অতিমাত্রায় ভিক্ষাবৃত্তিজীবী ও অতিমাত্রায় পশ্চিমীভাবাপন্ন বা ধর্মনিরপেক্ষ।

১৯০৪ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যে কিছুদিনের জন্যে পাঞ্জাব চরমপন্থার দিকে ঘুরেছিল। এটি নির্ধারিত হয়েছিল খানিকটা উপদলীয় বিবেচনা থেকে—যদিও যথারীতি সেটাই তার একমাত্র দিক নয়। পাঞ্জাব জাতীয় ব্যাঙ্ক ও ভারত বীমা-র পরিচালনা নিয়ে লাজপত ও হংসরাজ-এর আর্য গোষ্ঠীর সঙ্গে লালা হরকিষণ লালের কটু বিবাদ হয়। *ট্রিবিউন*-এর বিরুদ্ধে একটা র‍্যাডিকাল চ্যালেঞ্জ হিসেবে অক্টোবর ১৯০৪-এ তারা (আর্য গোষ্ঠী) বার করে *পাঞ্জাবী* পত্রিকা (যার ধ্রুববাক্য ছিল ঃ 'যে-কোনো মূল্যেই স্বনির্ভরতা')। অবশ্য, ১৯০৬-এর শেষ দিক পর্যন্ত পাঞ্জাবি ধাঁচের চরমপন্থা ছিল বাঙলার তুলনায় অনেক মৃদু। বয়কটের চেয়ে তাদের প্রয়োগের ক্ষেত্র কেন্দ্রীভূত ছিল গঠনমূলক কাজকর্মে। প্রায়শই নরমপন্থী কংগ্রেসি, এমনকি মুহম্মদ শফি ও ফজল-ই-হুসেনের নেতৃত্বাধীন একটি মুসলমান গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁরা যৌথ মঞ্চ খুঁজতেন।

১৯০৭-এ কয়েক মাসের জন্যে পাঞ্জাব পরিস্থিতিকে যা একেবারে আলাদা করে তুলেছিল

তা হলো ব্রিটিশদের একের পর-এক প্ররোচনা। বর্ণবৈষম্যবাদীর ঘোর কদাচার সম্পর্কে লেখার কারণে *পাঞ্জাবী*-কে অভিযুক্ত করা হয়। পাঞ্জাবের বুদ্ধিবৃত্তিজীবীরা তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। *সিভিল অ্যান্ড মিলিটারি গেজেট*-এর পাতায় ভারতীয়দের সম্পর্কে যে তীব্র অপমানজনক মন্তব্য বেরোচ্ছিল সরকারি কর্তাব্যক্তিদের তা নজরেই পড়ে নি। *পাঞ্জাবী*-র সম্পাদকের বিচারের পরিণামে ফেব্রুয়ারি ১৯০৭-এ, ও আবার মে-তে বিক্ষোভ-মিছিল ও এখানে-ওখানে শ্বেতাঙ্গদের ওপর আক্রমণ চলে। ভূমি-স্বত্বান্তর আইনের কড়াকড়ির প্রস্তাব শহরবাসী হিন্দু ব্যবসাদার ও বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীদের অসন্তুষ্ট করে তোলে। কিন্তু ব্রিটিশদের যা সত্যিই আতঙ্কিত করে তোলে তা হলো কোনো কোনো এলাকার কৃষকদের—শিখ ও মুসলমান তথা হিন্দু—মধ্যে অসন্তোষ ও সংগ্রামমুখিতার লক্ষণ। ব্রিটিশদের কাছে এটি বিশেষ করে অশুভ ইঙ্গিত মনে হয়েছিল, যেহেতু ব্রিটিশ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতে জনশক্তির একের-তিন ভাগ জোগান দিত পাঞ্জাব। ব্রিটিশ সেচ-ব্যবস্থার ফলে লয়ালপুরের চারধারে চেনাব খাল বসতি অঞ্চল হয়ে উঠেছিল উর্বর। বহিরাগত কৃষক, প্রাক্তন সৈনিক, ও কখনও কখনও শহরে লগ্নীকারীদের (কোনো কোনো ক্ষেত্রে যাদের ভূ-সম্পত্তি ২৫০০ একরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল) বড় বড় ভূখণ্ড মঞ্জুর করা হয়েছিল। কড়া আমলাতান্ত্রিক ও একনায়কসুলভ কায়দায় গোটা এলাকা নিয়ন্ত্রণ করত বসতি-র শ্বেতাঙ্গ উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা (তাদের হুকুম অমান্য করলে তারা চাপিয়ে দিত বিশাল জরিমানা)। অক্টোবর ১৯০৬-এ চেনাব বস্তি আইন এনে ঐ ব্যবস্থা আরও কঠিন করার চেষ্টা হয়। সিরাজ-উদ্দিন আহমদ তাঁর পত্রিকা *জমিনদার* (পাঞ্জাব প্রসঙ্গে শব্দটির অর্থ কৃষক-মালিক, ভূস্বামী নয়) মারফত একটি প্রতিবাদ-আন্দোলন সংগঠিত করতে শুরু করেন ১৯০৩ থেকে। ১৯০৭-এর শুরুতে চেনাব বস্তির অধিবাসীরা (যাঁদের মধ্যে ছিলেন মুসলমান, শিখ ও হিন্দু, ঐ সময়ে যাঁদের বৈশিষ্ট্যই ছিল চোখে-পড়ার মতো সাম্প্রদায়িক মৈত্রী) সাগ্রহে চাইছিলেন এক ব্যাপকতর রাজনৈতিক নেতৃত্ব। ইতোমধ্যে ব্রিটিশরা নিজেদের ঝামেলা নিজেরাই বাড়াল। নভেম্বর ১৯০৬-এ তারা বারি-দোআব অঞ্চলে (প্রধানত শিখ কৃষক-অধ্যুষিত অমৃতসর, গুরুদাসপুর ও লাহোর জেলা) খালের জল-কর ভীষণ বাড়িয়ে দিল: ২৫%, কখনও বা এমনকি ৫০%। আর রাওয়ালপিণ্ডি জেলাতেও ভূমি-রাজস্বের হার চড়িয়ে দেওয়া হলো। প্লেগের ধ্বংসলীলা ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, শ্রমিকরাও হয়ে উঠেছিলেন অশান্ত। রাজস্ব-বিভাগের কেরানিরা একাধিক ধর্মঘট করেন, আর ১৯০৭-এর গোড়ায় উত্তর-পশ্চিম রাজ্য রেলপথ (এর লাইন চেনাব বসতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছিল)-এর ধর্মঘটের প্রতি লোকের সহানুভূতি জেগে ওঠে। পাঞ্জাবের ছোটোলাট ডেনজিল ইবেটসন-এর মনে এটি বিশেষ শঙ্কার সঞ্চার করে।

কৃষক খেপানোর অভিযোগে মে ১৯০৭-এ লাজপতকে দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়, যদিও তাঁর আত্মজীবনীর বিবরণ থেকে মনে হয়, তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকা ছিল তুলনায় সীমিত। চেনাব বসতকারীদের সভায় বক্তৃতা দিতে তিনি দুবার লয়ালপুর গিয়েছিলেন। প্রথমে ফেব্রুয়ারি ১৯০৭-এ, আবার একটা বড় গবাদি পশু মেলা চলাকালীন—মার্চে। কিন্তু তাঁর যথেষ্ট দোনামনা ছিল ('আমি [আন্দোলনটি] পেছিয়ে চলছিলাম', তিনি আমাদের জানাচ্ছেন)। স্পষ্টতই সেখানে তিনি বসতকারীদের সংযত রাখারই চেষ্টা করেছিলেন। সত্যিই আরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল অজিত সিং-এর (প্রসঙ্গত, ইনি ভগৎ সিং-এর কাকা) কার্যকলাপ। লাহোরে তিনি গড়ে

তোলেন চরমপন্থী আঞ্জুমান-ই-মহিব্বন-ই-ওয়াতন ও তার পত্রিকা *ভারতমাতা*। 'মুসলমান ও হিন্দু নাম'-এর এই মিলন ইবেটসনকে শঙ্কিত করে তোলে। বাঙলার বহু 'সমিতি'র মতো অজিত সিং-এর গোষ্ঠী পরে সন্ত্রাসবাদের দিকে যায়। কিন্তু ১৯০৭-এ চেনাব বসতি ও বারি-দোআবের কৃষকদের মধ্যে, রাজস্ব ও জল-কর না-দেওয়ার প্রচারে এই গোষ্ঠী ছিল খুবই সক্রিয়। ৩০ এপ্রিল ১৯০৭-এ এক কার্যবৃত্ত-য় ইবেটসন কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করেন। 'সরকারি রাজস্ব, জল-কর ও অন্যান্য কর দেওয়া বন্ধ করার জোটে'র দিকে যে উদ্যোগ, তাকে তিনি বর্ণনা করেন 'ধারণাতীত বিপজ্জনক প্রস্তাব' বলে। ফিরোজপুরে রাজদ্রোহমূলক সভায় সেপাইদের যোগ দেওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছিল ; অজিত সিং-এর একটি সভার উদ্যোক্তা ছিলেন রাওয়ালপিন্ডির পাঁচজন অগ্রণী আইনজীবী। সরকারের তরফ থেকে তার জন্যে তাঁদের আদালত থেকে বার করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তার বিরুদ্ধে ঐ শহরে বিপুল প্রতিবাদ ওঠে (এর মধ্যে ছিল অস্ত্রাগার ও রেলপথ ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার মুসলমান ও শিখ শ্রমিকদের ধর্মঘট আর সাহেব বাংলোয় হামলা)।

কিন্তু, মে ১৯০৭-এ সরকার আঘাত হানল। রাজনৈতিক সভা নিষিদ্ধ হলো, দ্বীপান্তরে পাঠানো হলো লাজপত রায় ও অজিত সিংকে। এরপরই পাঞ্জাবে চরমপন্থা দ্রুত নিভে গেল। এইসব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার পাশাপাশি বুদ্ধিমানের মতো অন্য পাল্লায় রাখা হলো কিছু ছাড় : চেনাব বসতি আইনে অসম্মতি জানালেন বড়লাট, জল-কর কমানো হলো, আর সেপ্টেম্বর ১৯০৭-এ দ্বীপান্তরিত ব্যক্তিরা মুক্তি পেলেন। আর্যসমাজী নেতারা তড়িঘড়ি ঘোষণা করলেন তাঁদের রাজভক্তির কথা। র‍্যাডিকাল আন্দোলন যেমনি ভেঙে গেল, তাঁরাও একেবারে উল্টো মোড় নিলেন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে। ১৯০৮-০৯-এর মধ্যে বেশির ভাগ জেলায়ই অচল কংগ্রেস সংগঠনের জায়গা অনেকটাই দখল করল নানান হিন্দু 'সভা'। এর ঠিক উল্টো দিকে, অজিত সিং ও তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী (যেমন যুক্ত প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার সুফি অম্বাপ্রসাদ ও র‍্যাডিকাল উর্দু কবি লালচন্দ 'ফলক') পুরোপুরি বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন ভাই পরমানন্দ ও দিল্লীর মেধাবী ছাত্র হরদয়ালের মতো কয়েকজন আর্যসমাজী।

মাদ্রাজ

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে চরমপন্থী ভাবধারা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল দুটি বিরাট বিচ্ছিন্ন এলাকায় : অন্ধ্র ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও প্রত্যন্ত দক্ষিণের তিরুনেলভেলি জেলায়। ওয়াশব্রুক এই বিষয়টিকে পুরোপুরিই উপদলীয় সংঘাতের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। প্রভাবশালী 'মায়লাপুর' চক্রের— এই সময়ে তার নেতৃত্বে ছিলেন ভি কৃষ্ণস্বামী আয়ার—প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছিল কিছু 'এগমোর' রাজনীতিবিদ্ ও মফস্বলের 'বাইরের' গোষ্ঠী (রাজামুন্দ্রীর টি প্রকাশম্, মাসুলিপত্তম-এর এম কৃষ্ণ রাও, তিরুনেলভেলি জেলার টুটিকোরিনের ভি ও চিদাম্বরম পিল্লাই)-র এক জোট। এই জোটের নেতা ছিলেন জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার, যিনি ১৮৮০-র দশকে সুপরিচিত ছিলেন, কিন্তু এরপর তাঁকে ঠেলে পেছনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সময়ে মাদ্রাজের প্রভাবশালী সংবাদপত্র *হিন্দু* ছিল 'এগমোর'-এর হাতে আর প্রকাশম ও কৃষ্ণ রাও ১৯০৪-এ মাসুলিপত্তম থেকে বার

করেন র‍্যাডিকাল *কিস্টিনাপত্রিকা*। নিঃসন্দেহে উপদলীয় কোন্দল ছিল, কিন্তু ১৯০৮-এ অন্ধ্রের কয়েকটি শহরে ও মার্চ ১৯০৮-এ টুটিকোরিন ও তিরুনেলভেলিতে 'ছাত্র ও শ্রমিক জনতা'র কাজ বলে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে, দুটি পঙ্‌ক্তির বিবরণে তাকে উড়িয়ে দেওয়াটা ঠিক পর্যাপ্ত বলে গণ্য হতে পারে না।

১৯০৬ থেকে বাঙলার প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে রজামুন্দ্রী, কোকনদ ও মাসুলিপত্তমের মতো অন্ধ্রের ব-দ্বীপ শহরগুলিতে সভা করা হচ্ছিল। এম কৃষ্ণ রাও-এর আমন্ত্রণে এপ্রিল ১৯০৭-এ, যাকে বলা হয়েছে 'বন্দেমাতরম্' আন্দোলন, বিপিনচন্দ্র পালের সফর তাতে বিরাট উদ্দীপনা জোগায়। রাজামুন্দ্রীর ছাত্ররা *বন্দেমাতরম্'* ব্যাজ পরেছিল ও বিপিনচন্দ্র পালের সভায় হাজির ছিল—এর জন্যে পীড়নমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ছাত্ররা এর দরুন ধর্মঘট করে, আর তারপরেই শুরু হয় অন্ধ্রের জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। একটি ছেলে 'বন্দে মাতরম্' বলে চেঁচিয়েছিল, তাই এক সাহেব তার কান মলে দেয়। তার পরিণামে ৩১ মে ১৯০৭-এ একদল লোক কোকনদ ইওরোপীয় ক্লাব আক্রমণ করে। তেলেগু ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রতি নতুন আগ্রহ জাগানোয় প্রচুর সাহায্য করেছিল স্বদেশী আবহাওয়া। (প্রভাবপ্রসু একটি বই *অন্ধ্রুলা চরিত্রামু* বা *অন্ধ্রের ইতিহাস* প্রকাশিত হয় ১৯১০-এ)। চরমপন্থার বিলয়ের পর, প্রকাশম, কোণ্ডা বেঙ্কটাপ্পায়া ও পট্টাভি সীতারামাইয়া—প্রত্যেকেই ভবিষ্যতের গান্ধীপন্থী মহানায়ক—তেলেগুভাষী মানুষের জন্যে এক আলাদা ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবি নিয়ে অ ন্ধ্র ম হা স ভা সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন।

টুটিকোরিন বন্দরকে কেন্দ্র করে তিরুনেলভেলি জেলায় যা ঘটে চলেছিল, সরকারি দৃষ্টিকোণ থেকে সেই মুহূর্তে তা ছিল আরও অনেক বেশি শঙ্কার কারণ। ডিসেম্বর ১৯০৬-এর এক সরকারি প্রতিবেদন তিরুনেলভেলিকে আলাদা করে নেওয়া হয়েছিল মাদ্রাজের একমাত্র জেলা হিসেবে, যেখান থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের খবর পাওয়া যাচ্ছে। ১৯০৬ ও ১৯০৭-এ জি সুব্রহ্মণ্য আয়ার বেশ কয়েকবার ঐ জেলা সফরে যান। টুটিকোরিনের উকিল ভি ও চিদাম্বরম পিল্লাই হয়ে ওঠেন একজন মুখ্য চরমপন্থী নেতা। অক্টোবর ১৯০৬-এ টুটিকোরিন থেকে কলম্বো পর্যন্ত স্টিমার চালানোর জন্যে একটা স্বদেশী বাষ্পীয় পোত কম্পানি চালু হয়। এই স্বদেশী উদ্যোগের (৬ লক্ষ টাকা মূলধনের সংস্থান ছিল, এবং এর থেকে দেখা যায়—স্থানীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীরা এতে যথেষ্ট পরিমাণেই যোগ দিয়েছিলেন) প্রতি ব্রিটিশ ভারত বাষ্পীয় পোত কম্পানির প্রবল শত্রুতার ফলে টুটিকোরিনের সমুদ্রতীরে চিদাম্বরম পিল্লাই-এর সঙ্গে প্রায় প্রাত্যহিক সভায় বক্তৃতা দিতে শুরু করেন সুব্রহ্মণ্য শিব। তিনি ছিলেন মাদুরার অনভিজাত বিক্ষোভ-প্রচারক। জানুয়ারি ১৯০৮-এ তাঁর আগমন থেকেই র‍্যাডিকালিজমের দিকে একটি তীক্ষ্ণ ঝোঁক স্পষ্ট হয়ে উঠল। তিনি প্রচার করতেন 'স্বরাজে'র বাণী, ব্যাপক বয়কট, আর (যদি পুলিশ প্রতিবেদনকে বিশ্বাস করা যায়) মাঝে মাঝে আরও উগ্র উপায়ের কথাও বলতেন। ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে শ্রমিকদের মধ্যে সরাসরি আবেদনের জন্যে এই বক্তারা একটা নতুন ধুয়া তুললেন : 'কুলিরা যদি বাড়তি মজুরির জন্যে রুখে দাঁড়ায়, তাহলে আর ভারতে ইওরোপীয় কল-কারখানা থাকবে না' (২৬ ফেব্রুয়ারি শিব-র উক্তি)—এবং এমনকি এরকম বক্তব্যও রাখেন (ঐ একই বক্তা, ২৩ ফেব্রুয়ারি) যে 'রুশ বিপ্লবের ফলে

জনগণের উপকার হয়েছে এবং বিপ্লবে সর্বদাই জগতের মঙ্গল হয়'। বলা হয়েছে যে,এইসব বক্তৃতার প্রত্যক্ষ পরিণামস্বরূপ বিদেশী-মালিকানাধীন কোরাল কটন মিলস-এ শ্রমিকরা ধর্মঘট করলেন এবং মার্চের প্রথম সপ্তাহেই ৫০% জুরি বাড়াতে পারলেন। মার্চের মাঝামাঝি ব্রিটিশরা সভা-সমিতি বন্ধ করার এবং শিব ও পিল্লাইকে সোপর্দ করার চেষ্টাও করল। এর ফলে টুটিকোরিনে দোকান-পাট বন্ধ থাকে, পৌরসভা ও তার বাইরের ঝাড়ুদার ও গাড়োয়ানদের প্রতিবাদী ধর্মঘট হয়। তিরুনেলভেলিতে পৌরসভার দপ্তর, আদালত ও থানায় হামলা হয়; ১১-১৩ মার্চ ১৯০৮-এ ঐ দুটি শহরেই গুলি চলে। ১৩ মার্চ কলকাতার 'বন্দে মাতরম্' টুটিকোরিনের ঘটনাকে স্বাগত জানাল এই বলে যে, 'জনসাধারণ ও শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বাঁধন' শক্ত হলো 'যা স্বরাজের দিকে (এগোনোর) প্রথম বড় পদক্ষেপ... ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতিটি জয় জাতির পক্ষেই একটি জয়।' অবশ্য বাঙলায় তখন এই 'প্রথম বড় পদক্ষেপ' ছিল চরমপন্থীদের নাগালের বাইরে। শিব ও পিল্লাই-এর অপসারণের পর তিরুনেলভেলির র‍্যাডিকালরা হয় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেন, নয়তো এক ছোটো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী গঠন করলেন। জুন ১৯১১-য় জেলাশাসক অ্যাশ-এর হত্যার জন্যে তাঁরাই দায়ী। ঘটনাক্রমে তামিল বিপ্লবীদের এই ছোটো গোষ্ঠীর মধ্যে সুব্রহ্মণ্য ভারতী-র মতো একজন বড় কবিও ছিলেন। তিরুনেলভেলির এই ব্রাহ্মণ ছিলেন জাতপাতের সমালোচক। উদীয়মান তামিল জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বিরাট। ১৯১০ থেকে রাজনৈতিক নির্বাসিত হিসেবে তিনি ছিলেন পণ্ডিচেরিতে। তাঁর সহনির্বাসিত ভি ভি এস আয়ার হয়ে উঠেছিলেন হিন্দু পুনরুত্থানবাদী সাভারকরের শিষ্য। তাঁর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথ অনুসরণ করেন ভারতী। ১৯২১-এ অকালমৃত্যুর আগে তিনি ১৯১৭-র রুশ বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করেন।

মহারাষ্ট্র

সবচেয়ে বিশিষ্ট চরমপন্থী নেতা হিসেবে টিলকই সাধারণভাবে স্বীকৃত। তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট পরিমাণ জীবনীমূলক রচনা থাকলেও ১৯০৫ থেকে ১৯০৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে মহারাষ্ট্রের আন্দোলন বিষয়ে প্রকৃত আনুপুঙ্খিক বিবরণ এখনও অবধি পাওয়া গেছে বলে মনে হয় না (অন্তত ইংরিজিতে নেই)। স্বদেশী মেজাজের ফলে স্বভাবতই র‍্যাডিকাল সাংবাদিকতার দ্রুত বিকাশ ঘটে। ১৯০৭-এ *কেসরী*-র প্রচারসংখ্যা দাঁড়ায় ২০,০০০। টিলক ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা (যেমন খাপার্ডে ও মুঞ্জে) মহারাষ্ট্র ও অন্যান্য প্রদেশে স্বরাজের অঙ্গীকার ও বিস্তৃত বয়কট বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা উদ্যম-সহকারে প্রচার করতেন। বিপিনচন্দ্র পালের মাদ্রাজ বক্তৃতা এবং *বন্দে মাতরম্*-এ অরবিন্দ-র বিভিন্ন প্রবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে টিলকের 'নতুন দলের মতবাদ' (*টেনেটস্ অফ দ নিউ পার্টি*, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯০৭)-এর মতো বক্তৃতাবলিও চরমপন্থার ধ্রুপদী সৃষ্টি হয়ে আছে। ইতোমধ্যেই ১৮৯০-এর দশকে টিলক বিভিন্ন ধর্মীয়-রাজনৈতিক উৎসব (গণপতি, শিবাজী, রামদাস) পুনরুজ্জীবনের সূচনা করেছিলেন, সংগঠিত হয়েছিল বিদেশী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব (যেমন, ৮ অক্টোবর ১৯০৫-এ পুণায়)। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতাদের দিক থেকে এতকাল যে-শহর ছিল নরমপন্থীদের কেল্লা, সেই বোম্বাই শহরে নতুন বাণী নিয়ে যাওয়ার জন্যে গঠিত হয় এক স্বদেশী বস্ত্র প্রচারিণী সভা।

আমরা আগেই দেখেছি, বোম্বাই-এর শিল্পপতিরা (সবচেয়ে বড় অংশই পারসি বা গুজরাটি—১৯০৮-এ একজনই মাত্র মহারাষ্ট্রীয় মিল-মালিক ছিলেন) খুব বেশি হলে ছিলেন 'স্বদেশী'র অনতিশীতল সমর্থক। টিলকের জীবন-বিষয়ক পরবর্তীকালের এক পুলিশি সূত্র থেকে জানা যায়, দিনশা ওয়াচ্ছার মাধ্যমে চরমপন্থী নেতারা মিল-মালিকদের বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা যেন আরও কম দামে ধুতি বিক্রি করেন। তার চাঁচাছোলা জবাব এল 'যে বাজারদর ছাড়া আর কোনো দামে এগুলো জোগান দেওয়া যাবে না।' দেশী কাপড়ের ব্যাপারে স্বদেশী উৎসাহ প্রথমত ১৯০৫-০৬-এ বোম্বাই ও আহ্‌মেদাবাদকে অতি-মুনাফা করতে সাহায্য করেছিল (ঐ সময়ের একটা হিসেব থেকে দেখা যায়, বোম্বাই-এর মিল-মালিকরা ৩.২৫ কোটি টাকা লাভ করেছিল; সে-তুলনায় মজুরি বাবদ খরচ ছিল ১.৬৮ কোটি টাকা)। দ্বিতীয়ত, এটি সাহায্য করেছিল ১৯০৬-০৭-এ বাজারের একটা বড় পড়তি দশা ঠেকাতে। চীনের সুতোর বাজারকে তখন প্রচণ্ড খর্ব করতে শুরু করেছে জাপানি প্রতিযোগিতা। অগাস্ট ১৯০৭-এ টাটার লৌহ ও ইস্পাত প্রকল্পের প্রবর্তনা ছিল এক বড় ধরনের আবির্ভাব (২.৫ কোটি টাকার প্রস্তাবিত শেয়ার মূলধনের গ্রাহক জুটে গিয়েছিল তিন সপ্তাহেই, মূলত বোম্বাই থেকে)। রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিকাশের ফলে যে আত্মবিশ্বাস ও স্বাদেশিকতার নতুন মেজাজের সৃষ্টি হয়েছিল তার সঙ্গে এই ঘটনার কিছু যোগ থাকতে পারে।

১৯০৭-এর শেষে ও ১৯০৮-এর গোড়ায় মহারাষ্ট্রে ও বোম্বাই শহরে টিলকপন্থী কার্যকলাপের সঙ্গে দুটি মুখ্য নতুন উদ্যোগ জড়িয়ে আছে—মদের দোকানের সামনে গণ-ধর্না, আর বোম্বাই-এর প্রধানতই মারাঠা শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যোগ গড়ে তোলার প্রয়াস। এর প্রথমটি এক মুখ্য গান্ধীপন্থী কৌশলের পূর্ব-সূচনা। এর দুটি সুবিধে ছিল। এতে সরকারি আবগারি-রাজস্ব কমে যেত, আবার, নিচু জাতের লোকদের ব্রাহ্মণ্য নিয়মনীতির অনুকরণে যে 'সংস্কৃতায়নে'র ঝোঁক—তার কাছেও এর একটা আকর্ষণ ছিল। দ্বিতীয়টি (শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে যোগ গড়ে তোলা) কলকাতার তুলনায় বোম্বাই-এ ছিল আরও সহজ। কলকাতায় কারখানা-শ্রমিকদের একটা বড়ো অংশই ছিল অবাঙালি; অন্যদিকে, বোম্বাই-এ ১৯১১-য় ৪৯.১৬% শ্রমিকই এসেছিলেন টিলকের নিজের জেলা রত্নগিরি থেকে। ১৮৮০-র দশকে বোম্বাই-এর শ্রমিকদের মধ্যে কিছু জনসেবামূলক কাজ ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছিল। অবশ্য এই উদ্যোগ প্রধানতই ব্রাহ্মণ জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের কাছ থেকে আসে নি, এসেছিল এন এম লোখাণ্ডে-র মতো মানুষদের কাছ থেকে, ফুলে-র ব্রাহ্মণ-বিরোধী সত্যশোধক সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে যাঁদের যোগ ছিল। জঙ্গীপনার একটি ঐতিহ্য দেখা দিচ্ছিল—সেটি বোধহয় আরও গুরুত্বপূর্ণ, কারণ বোম্বাই-এর শ্রমিকরা যদিও বা কখনও কখনও ভাতৃঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়তেন (যেমন ১৮৯৩-এ), তাহলেও ১৮৯২-৯৩ ও ১৯০১-এ মজুরি কামানোর বিরুদ্ধে তাঁরা স্বতঃস্ফূর্ত কিন্তু শক্তিশালী ধর্মঘট করেছিলেন। আবার বৈদ্যুতিক আলো বসিয়ে মিল-মালিকরা যে উদ্ভট ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা কর্মদিবস চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল, তার বিরুদ্ধেও সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫-এ শ্রমিক ধর্মঘট হয়।

ভারতীয়-মালিকানাধীন উদ্যোগগুলিতে—বিদেশী উদ্যোগের সঙ্গে যার ফারাক অনেক—শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাতে জাতীয়তাবাদীরা সাধারণত রাজি হতেন না। ১৮৮১-তে

প্রথম কারখানা আইনের (বোম্বাই-এ মজুরি বাবদ কম খরচ দেখে সেই ঈর্ষায় ল্যাঙ্কাশায়ারের মালিকরা জোর করে এটা পাশ করিয়েছিল) সমান তীব্র বিরোধিতা করে রানাডের *কোয়ার্টালি জার্নাল* এবং টিলকের *মারাঠা*-ও। কখনও কখনও কল্পনা করা হয়েছে যে, ১৯০৭-০৮-এ টিলকের কাজকর্মের ধারায় একটা বড় রকমের ছেদ পড়ে। তা কিন্তু ঠিক নয়। ডিসেম্বর ১৯০৭ ও জুন ১৯০৮-এ বোম্বাই-এর কারখানা অঞ্চল চিঞ্চপুগলি-তে যেসব শ্রমিকসভায় তিনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে কোথাও কোনো শ্রেণী-যুদ্ধের সুর নেই। সমস্ত জোরটাই সেখানে দেওয়া হয়েছিল বিদেশী দ্রব্য ও মদ বর্জনের ওপর। স্বদেশীর প্রচার করা হয়েছিল যেহেতু তার মাধ্যমে 'কারখানার কাজ বাড়বে আর কর্মচারীদেরও উপকার হবে'। শ্রমিকদের দুরবস্থাকে যুক্ত করা হয় শিল্পায়ন-রোধের সঙ্গে, যার দরুন লোকে গ্রাম ছাড়তে বাধ্য হয়। টিলক নাকি 'মিল-শ্রমিকদের, বিশেষ করে আড়কাঠি (জবার) ও তার মুখিয়াদের নিয়ে মিল-শ্রমিক কমিটি গঠন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।' বাস্তবিকই আড়কাঠিদের প্রভাব ছিল প্রচুর, শ্রমিক ভাড়া করার ক্ষেত্রে তারাই ছিল মূল দালাল। যেসব লোককে তারা কাজে লাগাত তাঁরাও ছিলেন সেই একই জাত ও অঞ্চলের লোক। ঐ মারাঠি আড়কাঠিরা নিজেরাও ছিল খুদে শোষক। তাহলেও প্রধানত পারসি বা শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার ও সিনিয়র ফোরম্যানদের ব্যাপারে তাদেরও নিজস্ব কিছু ক্ষোভ ছিল। পুলিশ প্রতিবেদনেও দেখা যায়, 'প্রতিটি কারখানাতেই থাকে তার ব্রাহ্মণ কেরানিকুল, আড়কাঠিদের মধ্যে যাদের কম-বেশি প্রভাব আছে', আর ঐ সব কেরানিগোষ্ঠী ছিল অনেকটাই চরমপন্থার আওতায়। ঘটনা এই যে, বোম্বাই-এর শ্রমিক সংগঠনে আড়কাঠিরা পরবর্তীকালেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল—যতদিন না ১৯২৮-এ কমিউনিস্ট-পরিচালিত গিরণী কামগার [ইউনিয়ন] একটা বড় ধরনের ছেদ ঘটানোর চেষ্টা করে।

চরমপন্থী নেতৃত্বের কিছু সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল, তাহলেও জুলাই ১৯০৮-এ টিলকের বিচার (বাঙলার সন্ত্রাসবাদ নিয়ে *কেসরী*-তে প্রকাশিত কয়েকটি রচনার জন্যে) ও ছ-বছর দ্বীপান্তর দণ্ডের পরে বোম্বাই-এ সর্বহারার ক্রোধের যে বিশাল বিস্ফোরণ ঘটে আমাদের ইতিহাসে তা এক প্রধান দিক্‌চিহ্ন হয়ে আছে। জাতীয়তাবাদী বক্তৃতা, ইস্তাহার ও কেরানি-আড়কাঠিদের কারসাজি ছাড়াও শ্রমিকরা তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চয়ই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, সরকারি আমলা ও পুলিশই তাঁদের স্বভাবশত্রু। সত্যিই অসহনীয় জীবনযাত্রা ও কাজের অবস্থার দরুন যখন বিশুদ্ধ আর্থনীতিক ধর্মঘটের আগুন জ্বলে উঠত, বারেবারে সেগুলো পর্যুদস্ত হতো পুলিশি হস্তক্ষেপে। যেমন, অক্টোবর ১৯০৫-এ ফিনিক্স কারখানার ধর্মঘট ভাঙার জন্যে একটা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন খোদ পুলিশ কমিশনার। ১৩ জুলাই টিলকের বিচার শুরু হলে বিক্ষিপ্ত ধর্মঘট, পাথর ছোঁড়া এবং পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাধে, অচিরেই সেনাবাহিনীও তলব করা হয়। ২২ জুলাই যেদিন টিলকের সাজা হলো, মুলজী জেঠা বাজারের কাপড়ের দোকানের কর্মচারীরা ছ-দিনের হরতালের ডাক দিলেন (টিলকের কারাদণ্ডের বছরপিছু এক দিন)। বোম্বাই-এর শ্রমিকশ্রেণী ২৮ জুলাই পর্যন্ত এক বিশাল কর্মবিরতি করে সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। এই আন্দোলনের তুঙ্গে ৮৫টি সুতোকলের ৭৬টিতে আর পারেলের রেলপথ কর্মশালাতেও (ইতোমধ্যেই সেখানে যে ১৯০৭ ও জানুয়ারি ১৯০৮-এ দুটি বড় আর্থনীতিক ধর্মঘট হয়েছিল) ধর্মঘট হয়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী

বারবার গুলি চালায়। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৬ জন নিহত ও ৪৩ জন আহত হন।

টিলকের কারাদণ্ডের পরেই ২৯ জুলাই মফস্বলে একটা বড় দাঙ্গা বাধে, পন্টরপুরের (শোলাপুর জেলায়) এক তীর্থস্থানে। সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই দাঙ্গার ভাগী ও সংগঠক—দুই-ই ছিলেন নিচু জাতের লোক। মহারাষ্ট্রের চরমপন্থা চিৎপাবন (ব্রাহ্মণদের) ষড়্‌যন্ত্রের বেশি কিছু নয়—এই বহুকথিত তত্ত্বের সঙ্গে, বোম্বাই-এর ধর্মঘটের মতোই, এই ঘটনাও খাপ খায় না। কিন্তু অন্যান্য প্রদেশের মতোই এখানেও জন-সংযোগ ও যোগদানের ব্যাপারটি খুবই স্বল্পস্থায়ী বলে প্রমাণিত হয়েছিল। টিলককে সরিয়ে দেওয়ার পর মহারাষ্ট্রের চরমপন্থার যেটুকু অবশিষ্ট রইল অনেকাংশেই তা পথ নিল ব্যক্তিসন্ত্রাসের। তার মধ্যে নাসিক-কেন্দ্রিক অ ভি ন ব ভা র ত-গোষ্ঠী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৯-এ সাভারকর ভাইদের প্রতিষ্ঠিত মি ত্র মে লা থেকে ১৯০৭-এ এই সংগঠনের উদ্ভব হয়েছিল। লন্ডন থেকে ভি ডি সাভারকর গোপনে যেসব পিস্তল পাঠিয়েছিলেন, ডিসেম্বর ১৯০৯-এ নাসিকের জেলাশাসক নিধনে সেগুলো কাজে লাগে। গোয়ালিয়রেও নবভারত নামে একই ধরনের একটি গোষ্ঠী ছিল। ভারতীয় বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদীরা ঐ সময়ে যে-মোহ লালন করতেন, সিন্ধিয়ার স্বৈরতন্ত্রের অধীনে কাজের অভিজ্ঞতার দরুন নবভারত গোষ্ঠীর সে বাবদে সম্পূর্ণ মোহমুক্তি ঘটেছিল। নবভারত সমাজ ঘোষণা করেছিল, তার লক্ষ্য সাধারণতন্ত্র, 'কারণ সব দেশীয় রাজাই পুতুল মাত্র'। মহারাষ্ট্রের সন্ত্রাসবাদ অবশ্য বাঙলার মতো শক্তিশালী হওয়ার ধারে-কাছেও আসতে পারে নি। ১৯০৯-১০-এ নাসিক ও গোয়ালিয়র ষড়্‌যন্ত্র মামলার পর এ নিয়ে আর বিশেষ কিছু শোনা যায় না।

কংগ্রেসে ভাঙন

১৯০৫ থেকে ১৯০৭-এ জাতীয় আন্দোলনের ভেতরকার বিভিন্ন ধারার সংগ্রাম অবশ্য কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনগুলিতেও চলত। ডিসেম্বর ১৯০৭-এ সুরাটের ভাঙনে তা তুঙ্গে ওঠে। চরমপন্থার 'সবচেয়ে লক্ষণীয় রূপ' বলে একে বর্ণনা করা হয়েছে, আর চরমপন্থার সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয়েছে : এটি 'বিক্ষুব্ধদের এক সর্বভারতীয় জোট যারা ... বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সব পরাজয়কে সর্বোচ্চস্তরে উল্টে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল' (অনিল শীল, পৃ. ৩৪৭)। এগুলো কিন্তু বিশেষ প্রত্যয়গ্রাহ্য নয়। মনে রাখতে হবে, কংগ্রেস তখনও পর্যন্ত 'দখল' করার যোগ্য কোনো প্রকৃত রাজনৈতিক সংগঠন ছিল না। এটি ছিল নেহাতই এক বার্ষিক সমাবেশ, যার আলাপ-আলোচনাকে সম্ভবত কিছুটা অতিরিক্ত তাৎপর্য দেওয়া হয়েছে। ১৯০৭-০৮ পর্যন্ত চরমপন্থীরা অবশ্যই বাঙলা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজের কিছু অংশ ও মহারাষ্ট্রে তাঁদের আঞ্চলিক ঘাঁটিতে 'পরাজিত' হন নি। এই পর্বে বারকয়েক কংগ্রেসকে আরও পোক্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। 'স্থায়ী ও ধারাবাহিক রাজনৈতিক কাজের জন্যে ... জেলা সমিতি' গঠনের সুপারিশ করে কলকাতা অধিবেশনে (১৯০৬) নেওয়া একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে যে-চেষ্টা করা হয় সেটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭-এ ও ১৯০৮-এর গোড়ায় বেশ কয়েকটি প্রদেশে, প্রধানত চরমপন্থীদের উদ্যোগে (যদিও তাঁরাই একমাত্র উদ্যোক্তা ছিলেন না) প্রচুর জেলা সম্মিলন সংগঠিত করা হয়। কয়েকজন নরমপন্থী নেতাও এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে

নেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। এক ধরনের অ-জঙ্গী স্বদেশী চালু করার জন্যে, ডিসেম্বর ১৯০৫ থেকে কংগ্রেস অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-সম্মিলনও অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে। জুন ১৯০৫-এ গোখলে পত্তন করেন তাঁর ভারত সেবক সমাজ (সার্ভান্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি)। একান্তই নরমপন্থী লক্ষ্যের সঙ্গে তিনি মিলিয়েছিলেন আত্মত্যাগ, নৈতিক শুদ্ধতা, আর অনধিক মাসিক ৬৫ টাকা বেতনে সর্বক্ষণের জাতীয় কাজের সঙ্কল্প। ১৯০৯ অবধি এই সংস্থা অবশ্য ২০ জনের বেশি সদস্যকে দলে আনতে পারে নি। বাকি সব ক্ষেত্রে কংগ্রেস আগে যা ছিল তা-ই রয়ে গেল। তাকে চরমপন্থী প্রস্তাব নিতে রাজি করানোর অর্থ দাঁড়াত ভালো প্রচার ও বাড়তি সম্মান, কিন্তু তার বেশি খুব কিছু নয়।

ডিসেম্বর ১৯০৫-এ বেনারসে (কংগ্রেস অধিবেশনে) চরমপন্থীদের চ্যালেঞ্জ তখনও পর্যন্ত খানিকটা দুর্বলই ছিল। গোখলের সভাপতির অভিভাষণে ও একটি আলাদা প্রস্তাবে বঙ্গভঙ্গ তথা বাঙলায় পীড়নমূলক ব্যবস্থার নিন্দা করা হয়। কিন্তু বয়কটের উল্লেখ করা হয়েছিল মাত্র একবার। তার ভাষা লক্ষণীয়রকমে দায়সারা গোছের ঃ 'সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সম্ভবত এই একমাত্র সাংবিধানিক ও কার্যকর পন্থাই তাঁদের (বাঙালিদের) জন্যে পড়ে ছিল' (প্রস্তাব ১৩, উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ ও মালবীয়)। যুবরাজের আসন্ন সফরকে 'অতি নম্র ও সশ্রদ্ধভাবে' স্বাগত জানিয়ে একটি প্রস্তাব ছিল। বিষয়নির্বাচনী কমিটিতে টিলক, লাজপত ও মতিলাল ঘোষ এর বিরোধিতা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটা আপসরফা হলো। তাঁরা এবং তাঁদের অনুগামীরা প্রকাশ্য অধিবেশনে যোগ দিলেন না। সেখানে এই প্রস্তাব 'সর্বসম্মতিক্রমে' গৃহীত হয়।

ডিসেম্বর ১৯০৬ নাগাদ চরমপন্থা যথেষ্ট পরিমাণে এগিয়ে গিয়েছিল, আর কিছুটা আন্তঃপ্রাদেশিক যোগাযোগও গড়ে তুলেছিল (যেমন, জুন ১৯০৬-এ টিলকের কলকাতা সফরের মতো ঘটনার ভেতর দিয়ে)। আসন্ন কলকাতা অধিবেশনে টিলক বা লাজপতকে সভাপতি নির্বাচনের প্রয়াস বানচাল করতে প্রভাবশালী বোম্বাই চক্রের (ফিরোজশাহ্ মেহ্টা, ওয়াছা ও গোখলে) সামনে একটাই পথ ছিল ঃ সর্বজনশ্রদ্ধেয়, পিতৃকল্প দাদাভাই নওরোজীকে আমন্ত্রণ জানানো। কলকাতা অধিবেশনে বয়কট, স্বদেশী, জাতীয় শিক্ষা ও স্বরাজের প্রস্তাব থেকে দেখা যায়, একদিক দিয়ে কংগ্রেসের ওপর চরমপন্থীদের প্রভাব তুঙ্গে উঠেছিল, যদিও দ্বিমুখিতার একটা উপাদান প্রায়শই থাকত। কংগ্রেসের লক্ষ্যকে নওরোজী আবার নির্দেশ করলেন ইচ্ছাকৃত অস্পষ্ট ভাষায় ঃ 'আত্মশাসন বা স্বরাজ যেমন (আছে) যুক্তরাজ্যে বা উপনিবেশসমূহে'। উপনিবেশ বা ডমিনিয়নগুলোর সঙ্গে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য থেকে গিয়েছিল, অন্তত ১৯২৬-এর ওয়েস্টমিনিস্টার-এর সংবিধি পর্যন্ত। অন্যান্য প্রদেশকে বয়কটের আওতায় আনা আর অবৈতনিক পদ ও বিদেশী দ্রব্য বয়কট অবধি প্রস্তাবটিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেন বিপিনচন্দ্র পাল। মালবীয় ও গোখলে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সেটি বানচাল করেন, আর ১৯০৭ জুড়ে চারটি মুখ্য প্রস্তাবেরই নানারকম ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

পরবর্তী অধিবেশনের জায়গা নাগপুর থেকে সরিয়ে সুরাটে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করলেন মেহ্টা। প্রথা অনুযায়ী স্থানীয় সংবর্ধনা কমিটিই সভাপতি নির্বাচিত করতেন। এইভাবে অতি নরমপন্থী রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচন করাটাও তিনি নিশ্চিত করেন। একটা মোকাবিলার জন্যে তৈরি হয়ে আসেন দুপক্ষই। কলকাতা অধিবেশনের প্রস্তাব চারটি বাতিল

হয়ে যাবে—এই গুজব ছড়িয়ে পড়ার ফলে প্রথম দিনেই হৈ-হট্টগোল বেধে যায়। ২৭ ডিসেম্বর অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্যে টিলক ব্যর্থ চেষ্টা করেন (সংবর্ধনা কমিটির সভাপতি মালবীয় সেটি বাতিল করে দেন)। তারই পরে মারাঠি চপ্পল ছুঁড়ে মারার সেই বিখ্যাত ঘটনা। অধিবেশন ভেঙে যায় পুরো ডামাডোলের মধ্যে। আসল সঙ্ঘাতের জন্যে ঠিক কারা দায়ী, সে নিয়ে বিবাদ আছে (বহু চরমপন্থী যে লাঠি নিয়ে এসেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই)। কিন্তু একটু ছড়িয়ে দেখলে মনে হয়, প্রধান প্ররোচনা এসেছিল নরমপন্থীদের দিক থেকেই। অবশ্যই শুধু লাজপত (চরমপন্থীদের মধ্যে এই সময়ে যাঁকে সবচেয়ে মৃদুচেতা বলে গণ্য করা হতো) নন, টিলক ও বাঙলায় তাঁর বেশির ভাগ বন্ধু সুরাট অধিবেশনের পরের মাসগুলোয় কংগ্রেসের পুনর্মিলনের জন্যে চেষ্টা করেছিলেন বার-বার। কিন্তু বোম্বাই-এর নরমপন্থী গোষ্ঠী ছিল অটল। এলাহাবাদ কনভেনশনে (এপ্রিল ১৯০৮) এই ভাঙন চূড়ান্ত হয়। সেখানে একটা সংবিধান খাড়া করে কংগ্রেসের পদ্ধতিকে 'কঠোরভাবে নিয়মতান্ত্রিক' বলে স্থির করে দেওয়া হয়, আর 'প্রশাসনের বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে নিয়মিত সংস্কার' সাধনের ভেতরে তাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—'তিন বছরের বেশি স্থায়ী স্বীকৃত সংস্থা'র মধ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনকে বেঁধে রাখা হয়। আগামী অধিবেশনগুলি থেকে চরমপন্থীদের বাদ রাখার জন্যেই এইভাবে ইচ্ছে করেই সবরকমের চেষ্টা করা হয়েছিল।

নরমপন্থী নেতৃত্বের এই আকস্মিক অনমনীয়তার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেতু ছিল এই যে, তাঁরা কিছু সংস্কার আশা করেছিলেন, কারণ ইংল্যান্ডে তখন লিবারেলরা ক্ষমতায় আসীন আর বিখ্যাত লিবারেল রাজনৈতিক চিন্তাবিদ্ জন মর্লি হয়েছিলেন ভারত-সচিব। সুতরাং ব্রিটিশ নীতির এই বিবর্তনের দিকে এবার আমাদের চোখ ফেরাতে হবে।

নিপীড়ন, রফা, এবং ভেদ ও শাসন : ১৯০৯-১৯১৪

মর্লি ও মিন্টো

কোনো একটি বিশেষ ব্যবস্থার সূচনা কে করেছিলেন—বড়লাট না ভারত-সচিব সে নিয়ে ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকারি নীতির আলোচনা প্রায়শই বিতর্কে পরিণত হয়েছে। মর্লি ও মিন্টোর চিঠিপত্রের কিছু কিছু অংশ আগেই ছাপিয়ে বার করেছিলেন প্রাক্তন ভারত-সচিব ও বড়লাটের স্ত্রী। তাই মর্লি-মিন্টো-র ক্ষেত্রে এই বিতর্কটি লক্ষণীয় রকমে সুস্পষ্ট, কারণ এ ব্যাপারে প্রচুর লেখাপত্র পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্নটি সত্যিই নেহাতই মামুলি, কারণ আমরা দেখব, লিবারেল পণ্ডিত মর্লি ও বড়লাটের (যাঁকে নিয়োগ করেছিলেন বিদায়ী টোরি প্রশাসন, আর রাজনীতির চেয়ে ঘোড়াই যিনি বেশি পছন্দ করতেন) মধ্যে মৌলিক বিষয়ে বড় একটা মতভেদ ছিল না। সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে, অন্যান্য আমলাদের সঙ্গে, দুজনেরই একটি অবদান ছিল। তা হলো রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সমলানোর জন্যে কয়েকটি নীতি নির্ধারণ, যেসব নীতি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বাকি বছরগুলিতে অল্প-বিস্তর পাকাপোক্তই রয়ে গেল। তিনটি প্রধান উপাদানকে এখানে আলাদা করা যায়—নিরঙ্কুশ নিপীড়ন, 'নরমপন্থীদের সমবেত করা'র জন্যে

ছাড়, আর (দ্বিতীয়টির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত) ভেদ ও শাসন, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কৌশলই যার সেরা নমুনা।

১৯০৬-এর পর প্রথমে যথেষ্ট দোনামনা ও অনিশ্চয়তা নিয়ে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো, কারণ তাঁদের লক্ষ্য ছিল শিক্ষিত ভারতবাসীরা। তাঁদের (জনগোষ্ঠী বা কৃষক বিদ্রোহী, ধর্মঘটী শ্রমিক বা চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে নয়) তুষ্ট রাখার জন্যে নাগরিক স্বাধীনতা ও আইনের শাসন ছিল মোটের ওপর একই সঙ্গে বাস্তব এবং গুরুত্বপূর্ণ ভাবাদর্শগত উপকরণ। নতুন প্রদেশ পূর্ববাঙলা ও আসামের ছোটোলাট বাম্পফিল্ড ফুলার-কে দিয়ে তাঁরা প্রথম এর-চেষ্টা চালিয়েছিলেন। ইনি বরিশালে গোর্খাবাহিনী নামিয়েছিলেন, নিষিদ্ধ করেছিলেন বন্দে মাতরম্ স্লোগান, আর রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার কারণে স্কুলগুলির অনুমোদন বাতিল করার চেষ্টা করেছিলেন। এতে মিন্টো, এবং আরও বেশি পরিমাণে মর্লি, কিছুটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়েন। অনুমোদন কেটে দেওয়ার প্রশ্নে মত-সঙ্ঘাতের দরুন অগাস্ট ১৯০৬ -এ ফুলার পদত্যাগ করলে, তাঁরা তৎক্ষণাৎ সেটি গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের ঘটনাবলি ও সর্বোপরি বাঙলায় বোমার আবির্ভাবের পর, ১৯০৭-০৮-এ আরও পরিকল্পিত নিপীড়ন শুরু হয়। যেসব প্রধান অস্ত্র শানানো হলো তার মধ্যে ছিল ঃ নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় 'রাজদ্রোহমূলক' সভা নিষিদ্ধ করা (মে ও নভেম্বর ১৯০৭), সংবাদপত্র আইন যাতে ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা যাবে (জুন ১৯০৮, ফেব্রুয়ারি, ১৯১০), ডিসেম্বর ১৯০৮-এ ফৌজদারি বিধি সংশোধন আইন যাতে বাঙলার প্রধান প্রধান সমিতি নিষিদ্ধ করা যাবে, এবং দ্বীপান্তর (মে ১৯০৭-এ লাজপত ও অজিত সিং, ডিসেম্বর ১৯০৮-এ বাঙলার ন'জন নেতা)। মর্লি প্রায়শই যথাযোগ্য উদারনৈতিক নাকিকান্না কাঁদলেন, এই মনোভাবও ব্যক্ত করলেন যে, তিনি 'এক কসাক শাসনের সহযোগী' হয়ে পড়ছেন (মিন্টোকে লেখা চিঠি, ৭মে ১৯০৮), কিন্তু দ্বীপান্তরের মেয়াদ খানিক কমানো ছাড়া আর কিছু করলেন না বা করতে পারলেন না। ১৯১০-এর পরে হার্ডিঞ্জ-এর হোম সদস্য রেজিনাল্ড ক্র্যাডক-এর অধীনে এই কঠোর নীতি অব্যাহত রইল। এরই চূড়ান্ত পরিণতি হলো ১৯১৫ -র যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইন।

গোখলের সঙ্গে এক দফা বেশ ফলদায়ী আলোচনার পর, মর্লি গোড়ায় মিন্টোকে খুঁচিয়েছিলেন ঃ সাধারণের অপ্রিয় বঙ্গভঙ্গের পাল্লা ঠিক রাখতে অন্যদিকে কিছু সংস্কারের ব্যবস্থা করুন (ভারত-সচিব তাঁর ভারতীয় অনুরাগীদের অনেকটাই হতাশ করে মার্চ ১৯০৬-এ ঘোষণা করেছিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ একটা 'চুকে যাওয়া ঘটনা')। 'আমলাতন্ত্রের লোহার খাঁচা চিরদিন চলতে পারে না', আইন পরিষদে এবং সম্ভবত, এমনকি শাসন পরিষদেও আরও কিছু ভারতীয়কে আসতে দিতে হবে, অর্থসংস্থান-বিতর্ক ও সংশোধনী প্রস্তাবের ব্যাপারে আরও সময় দিতে হবে, যদিও 'অবশ্যই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে', আর ভারতে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি প্রবর্তন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—'আমার বা আপনার আমলে নিশ্চিতভাবেই নয়' (মিন্টোকে লেখা চিঠি, ১ জুন, ও ১৫ জুন ১৯০৬)। অবশ্য মিন্টো ও ভারতে অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দৃঢ়সঙ্কল্প ছিলেন যে, সংস্কার প্রস্তাবগুলো দেখে যেমন মনে হয় ঃ সবই কলকাতা থেকেই আসছে, আর সংসদীয় তদন্ত কমিশন বিষয়ে মর্লির প্রস্তাবটি তিনি কঠোর হাতে নাকচ করে দেন। সংস্কার প্রকল্প খসড়ার জন্যে তাঁরা আপন খুশিমতো

সময় নিচ্ছিলেন, আর সংস্কার বিষয়ে ভারত সরকারের ডেস্‌প্যাচটির চূড়ান্ত রূপ পাঠানো হলো অনেক দেরিতে, ১ অক্টোবর ১৯০৮-এ। কোন্ ধরনের 'নরমপন্থী'দের সমবেত করা যাবে—সে ব্যাপারেও মর্লি ও মিন্টোর মতভেদ ছিল। মর্লি যেখানে গোখলে-মার্কা কংগ্রেস নরমপন্থীদের সঙ্গে একটা রফায় আসাই পছন্দ করতেন, বড়লাট সেখানে ঐ শব্দটি দিয়ে সাধারণত কংগ্রেসের বাইরের রাজভক্তদেরই বোঝাতেন বলে মনে হয়। তিনি প্রথমেই একটি রাজন্যপরিষদ্ (কাউন্সিল অফ প্রিন্সেস) গোছের একটা কিছুর প্রস্তাব দেন (যাতে ১৯২০-র ও ৩০-এর দশকে ব্রিটিশদের মনোমতো একটি চালের পূর্ব-সূচনা দেখা যায়), তারপর মাপ সমান রাখার পক্ষে দরকারি বাটখারা হিসেবে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের সাগ্রহে গ্রহণ করেন। আসলে রাজন্যশাসিত রাজ্য বিষয়ে ব্রিটিশ নীতির ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ দিক্‌বদলের সূচনা করলেন মিন্টো ও তাঁর রাজনৈতিক সচিব হার্কর্ট বাটলার। বড়লাট ১৯০৯-এ উদয়পুরে তাঁর ভাষণে 'দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করার' নীতির ওপর জোর দিয়েছিলেন। '...প্রশাসনিক দক্ষতার মূল্যকে বড় করে দেখা সহজ।' 'সাম্রাজ্যের প্রতি' রাজন্যবর্গের 'ভক্তি ও আনুগত্যে'র আরও একটি প্রমাণ হিসেবে মিন্টো রাজদ্রোহের বিরুদ্ধে যৌথ কর্মোদ্যোগের সুস্পষ্ট উল্লেখ করেন। জাতীয়তাবাদী বিপদের মোকাবিলা করতে গিয়ে সামন্ত-প্রধানদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধার সিপাহী বিদ্রোহ-পরবর্তী নীতিকেই এইভাবে প্রসারিত করা হচ্ছিল, আর বর্জন করা হচ্ছিল দক্ষতার স্বার্থে কার্জনীয় হস্তক্ষেপ।

১৯০৯-এর ভারতীয় কাউন্সিল আইনে, আইন পরিষদের সদস্যদের বাজেট আলোচনা, প্রশ্ন রাখা ও প্রস্তাব তোলার কিছুটা বেশি ক্ষমতা অবশ্য দেওয়া হলো। এই প্রথম নির্বাচনের নীতি চালু করা হলো আনুষ্ঠানিকভাবে। আসন্ন বাঁটোয়ারা ও নির্বাচনে দাঁড়ানোর যোগ্যতার খুঁটিনাটি নিয়ম ভারতেই কানুন মোতাবেক ঠিক হবে বলে ছেড়ে দেওয়া হলো; 'স্থানীয় শাসনব্যবস্থার নির্দিষ্ট সুপারিশে'র ভিত্তিতে সেগুলোর মীমাংসা হবে। এইসব সংস্কার এমনিতেই খুব বেশি বদান্য ছিল না, এর ফলে সেখানেও আমলাতান্ত্রিক ছাঁটকাটের যথেষ্ট জায়গা রেখে দেওয়া হলো। আবার তার ওপর 'বৃত্তিজীবী শ্রেণী, ভূস্বামী, মুসলমান, ইওরোপীয় বণিক ও ভারতীয় বণিকদের প্রতিনিধিত্বে'র বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হবে। সাম্রাজ্য-আইন-পরিষদে সরকারি সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখা হলো (৬০ জনের মধ্যে মাত্র ২৭ জন হবেন নির্বাচিত সদস্য)। প্রাদেশিক পরিষদে 'বে-সরকারি গরিষ্ঠতা' ছিল মায়া মাত্র, কারণ তার মধ্যে কিছু মনোনীত সদস্য থাকতেন। বাঙলাই একমাত্র প্রদেশ যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাচিত সদস্যের গরিষ্ঠতা দেওয়া হয়েছিল। তার মধ্যেও চারজনকে পাঠাবে ব্রিটিশ-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিকভাবে বিপজ্জনক প্রার্থীদের বাতিল করার ঢালাও ক্ষমতা ভারত সরকারকে দেওয়া হলো। সবচেয়ে বড়ো কথা, সাম্রাজ্য পরিষদে ২৭টি নির্বাচিত আসনের মধ্যে ৮টিই ছিল মুসলমানদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর জন্যে সংরক্ষিত (১৯১০-এর নির্বাচনে তাঁরা ৩টি সাধারণ আসনও দখল করতে পেরেছিলেন)। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলি তৈরিও করা হয়েছিল ভেদসৃষ্টির স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে : যেমন, হিন্দু ভোটদাতাদের তুলনায় মুসলমান ভোটদাতাদের আয়গত যোগ্যতা ছিল যথেষ্ট কম। এর সঙ্গে এটাও অবশ্যই যোগ করা দরকার যে, যদিও সরকারি কর্তা ও মুসলমান নেতারা সর্বদাই সমগ্র সম্প্রদায়ের নিরিখেই কথা বলতেন, তাহলেও

কার্যত গোটা সরকারি নীতি জুড়েই পক্ষপাত দেখানো হচ্ছিল। ১৯১৬-য় যখন যুক্ত প্রদেশের আঞ্চলিক সংস্থাগুলিতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা প্রসারিত হলো, তখন 'মুসলমান ভোটে' বৃত্তিজীবী, ব্যবসায়ী বা 'উলেমা'র মতো তুলনায় কম বিশ্বাসযোগ্য গোষ্ঠীর চেয়ে সরকারি কর্মচারী, অবসরভাতা ভোগী ও ভূস্বামীদের সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল অনেক বেশী।

সিমলা প্রতিনিধি দল ও মুসলিম লীগ

প্রধানত যুক্ত প্রদেশ ও আলীগড়-ভিত্তিক মুসলমান শিরোমণিগোষ্ঠীর প্রচেষ্টা তেমনি দেখার মতো সফল হয়েছিল। ১ অক্টোবর ১৯০৬-এ তাঁরা মিন্টো-র কাছে সিমলায় একটি প্রতিনিধিদল সংগঠিত করে পাঠিয়েছিলেন —পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং 'সাম্রাজ্য রক্ষা'য় মুসলমানরা যে 'অবদান' রাখছেন তার 'মূল্যে'র প্রেক্ষিতে জনসংখ্যার শক্তির তুলনায় বেশি প্রতিনিধিত্বের আরজি জানাতে। ঐ গোষ্ঠী অচিরেই দখল করে নিল মুসলিম লীগ, ডিসেম্বর ১৯০৬-এ ঢাকায় যে-লীগের পত্তন করেছিলেন সলিমুল্লা। মুসলিম লীগের অনুগামীরা ক্ষুব্ধভাবে এই জাতীয়তাবাদী (তথা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী) অভিযোগ খণ্ডাতে চেয়েছেন যে, গোটা আন্দোলনটিই ছিল ব্রিটিশের সাজানো কারসাজি, আর এটি 'জোহুকুম পুতুল খেলা'র (১৯২৩-এ কোকনদ কংগ্রেসে সিমলা প্রতিনিধিদল সম্পর্কে মহম্মদ আলীর বহু উদ্ধৃত কথা) চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। ১৮৮০-র দশক থেকে সৈয়দ আহ্‌মেদ গোষ্ঠী মনোনয়নমূলক বিশেষ মুসলমান প্রতিনিধিত্বের দরবার করছিল। নির্বাচন যখন অনিবার্য হয়ে উঠল তখন পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিও উঠতে বাধ্য। রাজনীতি-সচেতন মুসলমানদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ মতভেদের কিছু লক্ষণও ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সৈয়দ আহ্‌মেদের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী মহসিন-উল-মুল্‌ক ৪ অগাস্ট ১৯০৬-এ প্রিন্সিপাল আর্চবোল্ডকে জানিয়েছিলেন যে, আরও কার্যকর একটা রাজনৈতিক পথ চাই, কারণ 'শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের কংগ্রেসের প্রতি দরদ আছে মনে হয়'—সম্ভবত তিনি হসরত মোহানি বা মহম্মদ আলী বা লাহোরের *জমিনদার* পত্রিকার সম্পাদক জাফর আলী খানের মতো আলীগড়ের 'তরুণ ভদ্রলোক'দের উল্লেখ করেছিলেন। আসলে যে ১৯০৬-এ হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক সহযোগিতার সপক্ষে আলীগড় ছাত্র সংসদ একটি প্রস্তাব নিয়েছিল। আর্চবোল্ড-এর প্রথম খসড়ায় একটি বাক্যে 'রাজনৈতিক বিক্ষোভ থেকে দূরে থাকা'-র অঙ্গীকার ছিল। মহসিন-উল-মুল্‌ক সেটি বাদ দেওয়ার জন্যে জেদ ধরেন, কারণ যে-র‍্যাডিকালদের তিনি রুখতে চাইছিলেন তাঁরা ইতোমধ্যেই বলছিলেন 'যে সার সৈয়দের নীতি ও আমার [মহসিন-উল-মুল্‌ক] বিরুদ্ধে নীতি মুসলমানদের কোনো মঙ্গল করে নি'।

তাহলেও সাম্প্রদায়িক বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দেওয়ার ব্রিটিশের দায়িত্ব এক অনস্বীকার্য তথ্য। নতুন প্রদেশের 'জনসাধারণের দুই অংশের একটিকে অপরের বিরুদ্ধ খেলাচ্ছিলেন' ফুলার— ১৫ অগাস্ট ১৯০৬-এ মর্লির কাছে মিন্টো একথা স্বীকার করেন। এবং নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আনুকূল্য করার এই নীতি অব্যাহত রেখেছিলেন তাঁর উত্তরবর্তী। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে ১৪ লক্ষ টাকা ধার মঞ্জুর করার জন্যে তিনিও মিন্টো-কে চাপ দিয়েছিলেন, যেহেতু এটি 'বিরাট গুরুত্বপূর্ণ এক রাজনৈতিক ব্যাপার'। মহসিন-উল-মুল্‌ক ও অন্যান্য নেতারা যে প্রিন্সিপাল আর্চবোল্ড-এর মাধ্যমে বড়লাটের একান্ত সচিব ডানলপ স্মিথ ও লখনউ-এর কমিশনার

হার্কর্ট বাটলার-এর মতো রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন তারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে (বড়লাটের ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে ঐতিহাসিকরা সম্প্রতি সিমলা স্মারকলিপির প্রথম খসড়াটি আবিষ্কার করেছেন)। মুসলিম লীগ সংগঠিত করার সময়ে ২৯ অক্টোবর ১৯০৬-এ আগা খান ডানলপ স্মিথকে আশ্বাস দেন যে, তিনি মহসিন-উল-মুল্‌ককে নির্দেশ দিয়েছেন, 'সরকারের পূর্ণ অনুমোদন আছে কিনা অপ্রকাশ্যে সেটা না জেনে কোনো ব্যাপারে যেন না এগোনো হয়...'। অবশ্য প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল স্বার্থের বিষয়গত মিল। আমলা মহল আর হিন্দু ও মুসলমান দু-এরই উচ্চশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে এই মিল পরবর্তী দশকগুলোতে বারেবারেই দেখা যাবে। এরই ফাঁকে একথাও বলা যায় যে, ডিসেম্বর ১৯০৬-এ ভারত ধর্মমহামন্ডলের এক সভায় দ্বারভাঙ্গার মহারাজা ঘোষণা করেছিলেন, 'হিন্দুদের ক্ষেত্রে আনুগত্য বা রাজভক্তি ধর্মেরই এক অঙ্গ'। মুসলিম লীগের মতো সদ্যোজাত ও সত্যিই দুর্বল একটা সংগঠন (ডিসেম্বর ১৯০৭-এ তার সদস্য ছিলেন মাত্র ৪০০, বার্ষিক চাঁদা ২৫ টাকার কম নয়, এবং সদস্য হওয়ার ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়) প্রথমদিকের কংগ্রেসের মতো একই রকমের 'ভিক্ষাবৃত্তি'র কৌশল চালিয়েও, স্থাপিত হওয়ার তিন বছরের মধ্যেই কী করে এত সফল হলো—এছাড়া আর কোনোভাবেই তার ব্যাখ্যা করা যায় না। পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর বদলে একটা মিশ্র নির্বাচক সংস্থা তৈরি করার যে-চেষ্টা মর্লি করেছিলেন, ১৯০৯-এর প্রথমদিকে আমীর আলীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল সেটি দ্রুত বানচাল করে দেয়। টোরিদের সঙ্গে লীগ যে-যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল সেটি লিবেরাল প্রশাসনের পক্ষে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, যে-প্রশাসন তখনও অভ্যন্তরীণ সংস্কার নিয়ে এক কটু যুদ্ধে লিপ্ত। 'এখন তাদের (মুসলমানদের) যে-পরিমাণ আমল দেওয়া হবে তাদের এতটুকুও হক তাতে আছে বলে আমার মনে হয় না'—১১ নভেম্বর ১৯০৯-এ মর্লির কাছে মিন্টো একথা অপ্রকাশ্যে কবুল করেন—এ বিষয়ে কিছু করার ব্যাপারে কিন্তু দুজনের কেউই কোনো দায় বোধ করেন নি। মুসলিম লীগের আসল দুর্বলতা অচিরেই প্রকট হয়ে উঠল, যখন তাদের সোচ্চার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসাম (যা নিঃসন্দেহে সাহায্য করেছিল মুসলমান শিরোমণিদের) ডিসেম্বর ১৯১১-য় হঠাৎ গুটিয়ে ফেলা হলো।

ভারতে যাবতীয় ব্রিটিশ 'সাংবিধানিক' পরীক্ষার মধ্যে সবচেয়ে স্বল্পস্থায়ী বলে প্রমাণিত হলো ১৯০৯-এর ভারতীয় কাউন্সিল আইন। ন-বছরের মধ্যে, ১৯১৮-য় মণ্টাগু-চেমসফোর্ড প্রতিবেদনে, তা সম্পূর্ণ সংশোধিত হলো। এরও ব্যর্থতা দেখা দিল অচিরেই ঃ এই আইন নরমপন্থীদেরও সমবেত করতে পারল না, আবার রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হিন্দু ও মুসলমানদেরও আলাদা করে রাখতে পারল না। নরমপন্থীরা তাঁদের মাদ্রাজ কংগ্রেসে। (১৯০৮) প্রস্তাবিত সংস্কারগুলিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন 'বিশাল ও উদার' বলে। যা-ই হোক, ১৯০৯ নাগাদ, মালবীয়-র মতো লোকেরা ব্যাপারটা ভালো করে দেখার পর, মুসলমানদের অত্যধিক ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে তাঁরা চূড়ান্ত সমালোচক হয়ে উঠলেন। এলাহাবাদ নিয়ে অনু-সন্ধানে বেলি অনুপুঙ্খভাবে দেখিয়েছেন, ১৯১৫-১৬ নাগাদ র‍্যাডিকালদের দমন করার জন্যে নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন এবং স্থানীয় সংস্থাগুলিতে পৃথক নির্বাচকমন্ডলীর আরও প্রসারের মতো ঘটনার ফলে যে-অস্বস্তি, তা পুরোনো নরমপন্থী নেতৃত্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশকে খানিকটা আরও

জঙ্গী ধরনের চিন্তা করার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। অবশ্য সেই মুহূর্তে, যুদ্ধের অব্যবহিত কয়েক বছর আগে, কংগ্রেসি রাজনীতি রয়ে গিয়েছিল 'খুবই নিস্তেজ' (জওরলাল নেহরু যেমন তাঁর *অটোবায়গ্রাফি*-তে স্মরণ করেছেন)। কংগ্রেস অধিবেশনে হাজিরা প্রচণ্ড কমে গিয়েছিল, আর যেহেতু নরমপন্থীদের খোঁচানোর জন্যে চরমপন্থীরা আর ছিলেন না, তাই তাঁরা শুধু সোচ্চার বক্তৃতাই দিতে পারেন বলে মনে হতো। কিছুটা কার্যকরভাবে সে-কাজই করেছিলেন গোখলে। সংস্কার-উত্তর সাম্রাজ্য-পরিষদের সভায় তিনি দাবি করেন সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, আক্রমণ করেন নিপীড়নমূলক নীতিকে, আর দক্ষিণ আফ্রিকায় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ও ভারতীয়দের দুর্দশার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন জনসাধারণের।

দিল্লীর দরবারে পঞ্চম জর্জ যখন বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব রদের কথা ঘোষণা করলেন তখন, ডিসেম্বর ১৯১১-য় মুসলমান রাজনৈতিক শিরোমণিকুল এক রূঢ় আঘাত পেল। রাজা নিজেই বলেছিলেন এটি একটি যোগ্য 'বর' ঃ ১৯০৫-০৬-এ যুবরাজ হিসেবে ভারত ভ্রমণের সময়ে বাঙলার বিক্ষোভের কিছুটা তিনি স্বচক্ষেই দেখেছিলেন। গোড়ায় খানিক দ্বিধার পর, বড়লাট হার্ডিঞ্জ ও ভারত-সচিব ক্রিউ-এর কাছে ভাবনাটা বেশ আকর্ষণীয় লাগল, যেহেতু অন্যান্য সম্ভাব্য 'বরে'র চেয়ে এতে বাড়তি খরচ অনেক কম। এই প্রস্তাব দৃঢ় সমর্থন করলেন হোম সদস্য জেনকিন্স। বাঙলায় ক্রমাগত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের দরুন তিনি গভীর উদ্বেগে ছিলেন ; তাঁর মনে হয়েছিল 'যতক্ষণ না ব্যবচ্ছেদের ক্ষত থেকে মুক্তি পাচ্ছি, ততক্ষণ আমরা কোনো শান্তি পাব না...'। ২৫ অগাস্ট ১৯১১-র ভারত সরকারের একটি প্রতিবেদনে পরিষদের লাট (গভর্নর-ইন-কাউন্সিল)-এর অধীনে বাঙলা আবার জোড়া লাগে, সেই সঙ্গে রাজধানী তুলে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতা থেকে দিল্লীতে। তার দুটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ এক, মুসলমান ভাবাবেগকে প্রশমিত করা, আর, যা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো খানিকটা দূরদর্শী এই যুক্তি যে, বড়লাটের কর্তৃত্বকে প্রাদেশিক চাপ থেকে আলাদা করে রাখতে হবে, যেহেতু প্রদেশগুলিতে 'আরও বেশিমাত্রায় স্ব-শাসন' অনিবার্য।

দিল্লী-ভিত্তিক মোগল গৌরব ফিরিয়ে আনার এই প্রয়াসে মুসলিম জনমত শান্ত হলো না। ইতালীয় ও বল্কান যুদ্ধে (১৯১১-১২) তুর্কিতে সাহায্য করতে গররাজি হলো ব্রিটেন ; অগাস্ট ১৯১২-য় আলীগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় খোলার প্রস্তাব বাতিল করে দিলেন হার্ডিঞ্জ ; অগাস্ট ১৯১৩-য় কানপুরের দাঙ্গায় মসজিদের লাগোয়া একটি মঞ্চ ভেঙে ফেলা হলো—এসবের ফলে সে-জনমত তার থেকে আরও দূরে সরে গেল। ১৯১২-য় তথাকথিত 'জওয়ান দল' (ইয়ং পার্টি) দখল করল মুসলিম লীগ। তারা লীগকে চালাতে শুরু করল আরও বেশি জঙ্গীপনা, জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া ও ক্রমবর্ধমান সব ইসলামি মতবাদের দিকে। এর নেতাদের মধ্যে ছিলেন ওয়াজির হাসান, টি এ কে শেরওয়ানি এবং আরও র‍্যাডিকাল দুই আলী ভাই (মুহম্মদ ও শওকত) এবং যুক্ত প্রদেশের হসরত মোহানি ; পাঞ্জাবের প্রবীণ চরমপন্থী জাফর আলী খান এবং বাঙলার ফজলুল হক (এক উদীয়মান তরুণ আইনজীবী, ৫০ বছর ধরে যিনি পরিশীলিত রাজনৈতিক চক্রান্তের সঙ্গে খাঁটি গ্রামীণ গণ-আবেদনকে মেলাবেন)। বাঙলার সলিমুল্লা, নবাব আলী চৌধুরী ও শামসুল হুদা বা যুক্ত প্রদেশের মহসিন-উল-মুল্‌ক-এর মতো 'বুড়োর দল'-এর পুরনো লোকেরা ছিলেন খেতাবওয়ালা জমিনদার।

জওয়ান দলের বিশেষ কেউ তা ছিলেন না (যদিও যুক্ত প্রদেশে একটা সময় পর্যন্ত মাহ্‌মুদাবাদের রাজার সমর্থন এঁরা পেয়েছিলেন)। ফ্রান্সিস রবিনসন দেখিয়েছেন যে, যুক্ত প্রদেশের জওয়ান দল ছিল মুখ্যত 'সেই শ্রেণীর লোক যারা কখনও কখনও খুবই সামান্য পরিমাণ খাজনা পেতেন জমি থেকে, কিন্তু সাধারণত তাঁদের কাজ খুঁজে নিতে হতো কোনো চাকরিতে বা পেশায়' (পৃ. ১৭৭)। এ-ও লক্ষ্য করা যায় যে, এঁদের সামাজিক বিন্যাস ছিল র‍্যাডিকাল হিন্দু জাতীয়তাবাদীদেরই মতো। সর্ব-ইসলামি ও ব্রিটিশ-বিরোধী সুরের জন্যে মুহম্মদ আলীর *কমরেড* (কলকাতা), আবুল কালাম আজাদের *আল-হিলাল* (কলকাতা) বা জাফর আলী খানের *জমিনদার* (লাহোর)-এর মতো পত্রিকা অচিরেই পুলিশের নজরে এল। আবদুল বারি-র লখনউ-ভিত্তিক ফিরিঙ্গি মহলের উলেমা-র দল আলী ভাইদের সমর্থন নিয়ে ১৯১৩-য় আঞ্জুমান-ই-খুদ্দাম-ই কাবা সংগঠিত করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের বিভিন্ন পবিত্র স্থান বাঁচানোর জন্যে তহ্‌বিল সংগ্রহ। বল্কান যুদ্ধে তুর্কিকে সাহায্য করার জন্যে ১৯১২-১৩য় এক চিকিৎসকদল নিয়ে গেলেন আনসারি ও জাফর আলী খান। মুসলিম লীগের নতুন সচিব হিসেবে ওয়াজির হাসান মার্চ ১৯১৩-য় একটি প্রস্তাব পাশ করালেন ঃ লীগের লক্ষ্য হলো সাংবিধানিক উপায়ে ঔপনিবেশিক স্বশাসন। এইভাবেই সেটি কংগ্রেসের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা হলো। খিলাফত আন্দোলন ও সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক সহযোগিতার প্রস্তুতি চলছিল এইভাবেই।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ

এর মধ্যে বাঙলায় বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদে ভাঁটা পড়ার কোনো লক্ষণই দেখা যায় নি। ডিসেম্বর ১৯১১-য় বঙ্গভঙ্গ রদের রাজকীয় 'বর'ও তাকে বিচলিত করতে পারল না। সারা প্রদেশে, এমন কি তার বাইরেও বহু শাখাবিশিষ্ট, দৃঢ়সংগঠিত ঢাকা অনুশীলন তাদের কাজ কেন্দ্রীভূত করল টাকা জোগাড়ের জন্যে স্বদেশী ডাকাতি আর উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও বিশ্বাসঘাতকদের খতম করায়। অনেক আলগা গোষ্ঠীর সমবায়ের প্রতিনিধিত্ব করত যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-পরিচালিত যুগান্তর 'দল'। তাঁরা সামগ্রিকভাবে চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাঁদের সামর্থ্যকে সংরক্ষা করতে আর আন্তর্জাতিক যোগাযোগ গড়ে তুলতে, যাতে উপযুক্ত সময়ে সত্যিকারের একটা সামরিক অভ্যুত্থান সংগঠিত করা যায়। রাসবিহারী বসু ও শচীন্দ্রনাথ সান্যাল মিলে বহুবিস্তৃত গুপ্ত সংগঠনের কেন্দ্র ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পাঞ্জাব, দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশে। ২৩ ডিসেম্বর ১৯১২-য় নতুন রাজধানীতে হার্ডিঞ্জ-এর আনুষ্ঠানিক প্রবেশের সময়ে তাঁর ওপর তাঁরা দর্শনীয় বোমা-আক্রমণ চালালেন।

যা-ই হোক, আশ্রয়ের প্রয়োজন, ছাপাখানা আইনের থেকে নিরাপদে বিপ্লবী লেখাপত্র বার করার সম্ভাবনা এবং অস্ত্রের সন্ধানে ভারতীয় বিপ্লবীদের আরও বেশি করে দেশের বাইরে যেতে হচ্ছিল। ১৯০৫-এ শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা লন্ডনে পত্তন করেছিলেন ভারতীয় ছাত্রদের একটি কেন্দ্র (ইন্ডিয়া হাউস), একটি পত্রিকা (*ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট*), একটি ভারতীয় হোম রুল সমিতি, আর অল্প কিছু পরে ভারত থেকে র‍্যাডিকাল যুবকদের আনার জন্যে একটি বৃত্তি প্রকল্প। কৃষ্ণবর্মার নিজস্ব জঙ্গীভাব খানিকটা তাত্ত্বিকই থেকে গিয়েছিল আর অনেকটাই আটকে ছিল নিষ্ক্রিয়

প্রতিরোধ-তত্ত্বের গণ্ডিতে (*ইণ্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট*ই তার এক আদি প্রবক্তা)। কিন্তু ১৯০৭ থেকে নাসিক-এর বিনায়ক দামোদর সাভারকর-এর নেতৃত্বে এক বিপ্লবীগোষ্ঠী তাঁর ইন্ডিয়া হাউস দখল করে। এই চক্রের মদনলাল ধিংড়া জুলাই ১৯০৯-এ ইন্ডিয়া অফিসের আমলা কার্জন-ওয়াইলিকে হত্যা করেন এবং ফাঁসির মঞ্চে ওঠেন দেশপ্রেমী উদ্দীপনার এই স্মরণীয় ঘোষণা করে : 'ধনীও নয়, যোগ্যও নয়, আমার মতো গরিব ছেলে মাতৃমুক্তির বেদীতে শুধু রক্তই উৎসর্গ করতে পারে। আমি যেন আবার এই একই মা-এর গর্ভে জন্ম নিই, আবার মরতে পারি ঐ একই পুণ্য কারণে, যতদিন না আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হয় আর মানুষের মঙ্গল ও ঈশ্বরের মহিমায় তিনি মুক্ত হয়ে দাঁড়ান।' ভারতীয় বিপ্লবীদের পক্ষে লন্ডন এখন হয়ে উঠল বড় বেশি উত্তপ্ত, বিশেষ করে ১৯১০-এ সাভারকরকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো আর নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় শাস্তি হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। নতুন কেন্দ্র গড়ে উঠতে থাকে ইওরোপ মহাদেশে—প্যারী ও জেনিভায়। এক পারসি বিপ্লবী, মাদাম কামা, জ্যাঁ লঁগ্যে-র মতো ফরাসি সমাজবাদীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলেন, সেখান থেকে প্রকাশ করেন *বন্দে মাতরম্* পত্রিকা। ইঙ্গ-জার্মান সম্পর্ক যতই খারাপ হতে থাকল ততই গুরুত্বপূর্ণ জায়গা হয়ে উঠল বার্লিন। ১৯০৯ থেকে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেটিকেই তাঁর ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেন।

ব্রিটেন ও ইওরোপের ভারতীয়রা খানিকটা বিচ্ছিন্ন প্রবাসী গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছু হতে পারতেন না। ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূল অঞ্চলে অবশ্য বিপ্লবী আন্দোলন এই প্রথম খানিক গণ-ভিত্তির মতো একটা ব্যাপার অর্জন করল। ১৯১৪ নাগাদ ১৫,০০০ ভারতীয়ের—তার মধ্যে অধিকাংশই শিখ—একটি বসতি এখানে গড়ে ওঠে। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেশ সম্পন্ন ব্যবসায়ী ও শ্রমিক, তবুও নানারকমের জাতিবৈষম্যের হেনস্থা তাঁদের সইতে হচ্ছিল ভীষণভাবে। ব্রিটিশ-ভারতীয় সরকার যে বাবদে কিছুই করে নি। ১৯১৩-য় সান ফ্রান্সিস্কোয় শুরু হলো বিখ্যাত 'গদর' আন্দোলন। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সোহন সিং ভাক্না আর তার প্রথম দিককার নেতাদের মধ্যে ছিলেন দিল্লীর সেন্ট স্টিফেন্স কলেজের উজ্জ্বল—যদিও কিছুটা অস্থিতচিত্ত—বুদ্ধিজীবী হরদয়াল। এর নামকরণ হয়েছিল সাপ্তাহিক *গদর* পত্রিকা থেকে। এটি প্রকাশিত হয় ১ নভেম্বর ১৯১৩-য় উর্দু ও গুরমুখীতে এবং পরবর্তীকালে আরও কয়েকটি ভারতীয় ভাষায়। *গদর*-এর প্রথম সংখ্যা শুরু হয়েছিল এক নাটকীয় পরিচ্ছেদ দিয়ে : 'কী আমাদের নাম? 'গদর' (বিপ্লব)। কী আমাদের কাজ? অভ্যুত্থান ঘটানো।...কোথায় অভ্যুত্থান ফেটে পড়বে? ভারতে। কখন পড়বে? কয়েক বছরের মধ্যেই...'। এই পর্বে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রবাসী ভারতীয় বাসিন্দাদের দুটি প্রধান অবদানের একটির প্রতিনিধি ছিল গদর আন্দোলন। অন্যটির কথা—দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহের অভিজ্ঞতা—গান্ধীর আবির্ভাবের সূত্রেই আলোচনা করা হবে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কয়েক বছর ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সত্যিকারের ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিলেন। এছাড়াও, তীব্র হিন্দু ধর্মভাব, তুলনায় সঙ্কীর্ণ মানসিকতা আর গোড়ার দিককার জঙ্গী জাতীয়তাবাদের কিছুটা সীমাবদ্ধ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অবসান ঘটাতে সাহায্য করেছিল দেশে দেশে তাঁদের পরিক্রমা। অরবিন্দ ঘোষের আক্রমণাত্মক হিন্দু *ভবানীমন্দির*-পুস্তিকায় (১৯০৫) বলা হয়েছিল, 'জগৎকে আ র্যী কৃ ত করার প্রয়োজনে'র

কথা, চাওয়া হয়েছিল 'এক অদ্বিতীয় ও সজীব ধর্মীয় ভাব-সূত্রে'র মাধ্যমে সমস্ত শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করতে, আর এমনকি 'জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে সহানুভূতি জাগানো এবং সব বিরোধের নিষ্পত্তি'র বাসনাও স্পষ্টই ব্যক্ত করা হয়েছিল। লন্ডন গোষ্ঠী-প্রকাশিত পুস্তিকা ও *মার্টিয়ার্স* (১৯০৭)-য় অবশ্য ১৮৫৭ র হিন্দু-মুসলমানের মিলিত অভ্যুত্থানের স্মৃতি জাগিয়ে তুলল ঃ কীভাবে ফিরিঙ্গি শাসনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে হিন্দু ও মুসলমানদের সাধারণ সম্মতিতে কত স্বদেশী মসনদ কায়েম করা হয়েছিল...'। দেখা দিচ্ছিল আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের এক মানসচিত্র ঃ 'আয়ারল্যান্ডের ভাড়াটে কৃষক তাঁর নির্জন কুঁড়েঘরে, মিশরের কৃষক তাঁর ক্ষেতে, অন্ধকার খনির মধ্যে জুলু শ্রমিক...শুনতে পেয়েছেন খিংড়ার পিস্তলের আওয়াজ'। (*বন্দে মাতরম্*, লণ্ডন ১৯০৯)। বিশেষ করে আইরিশ র‍্যাডিক্যালদের সঙ্গে যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ—যেমন, জি এফ ফ্রিম্যান-এর নিউ ইয়র্ক-ভিত্তিক *গেলিক অ্যামেরিকান* পত্রিকার সঙ্গে সঙ্গে *ইন্ডিয়ান সোশিওলজিস্ট, বন্দে মাতরম্*, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *তলোয়ার* (বার্লিন), তারকনাথ দাসের *ফ্রি হিন্দুস্তান* (ভ্যাঙ্কুভার) ও *গদর*-এর মতো পত্রিকাও ভারতীয় শুল্ক বিভাগ (কাস্টমস) ক্রমাগত বাজেয়াপ্ত করছিল। আর আন্তর্জাতিক সমাজবাদী আন্দোলনের সঙ্গেও যোগাযোগ গড়ে উঠছিল। কৃষ্ণবর্মার ইন্ডিয়া হাউসের সভায় ব্রিটিশ মার্কসবাদী সোশাল ডেমোক্র্যাটিক ফেডারেশন-এর হাইন্ডম্যান বক্তৃতা দিয়েছিলেন, অগাস্ট ১৯০৭-এ দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের স্টুটগার্ট অধিবেশনে মাদাম কামা তুলে ধরেছিলেন স্বাধীন ভারতের পতাকা, আর হরদয়াল কাজ করছিলেন দু নি য়া র শি ল্প-শ্র মি ক নামে এক নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিকালিস্ট সংগঠনের সানফ্রান্সিস্কো শাখার সম্পাদক হিসেবে। মার্চ ১৯১২-য় *মডার্ন রিভিউ* (কলকাতা) পত্রিকায় তিনি কার্ল মার্কস বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন ঃ সম্ভবত ভারতে এ নিয়ে এটিই আদি রচনা। রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের পর এই ধারা থেকেই উঠে আসবেন প্রথম ভারতীয় কমিউনিস্টরা—যুগান্তর নেতা নরেন ভট্টাচার্য (এম এন রায়), বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অবনী মুখোপাধ্যায় এবং কয়েকজন প্রবীণ গদরপন্থী-র মতো লোক—এটা কোনো অঘটন নয়।

যুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮) ভারতের রাজনৈতিক জীবন ও সামাজিক-আর্থনীতিক অবস্থার মধ্যে সত্যিই একটা চূড়ান্ত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। আরও গভীর সব পরিণতিকে পরের আলোচনার জন্যে মুলতুবি রেখে (যুদ্ধের ঠিক পরের বছরগুলিতে সর্বভারতীয় গণ-জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান প্রসঙ্গে সেগুলোর বিরাট অবদান ছিল), প্রথমেই আমাদের আলোচনা কেন্দ্রীভূত করতে পারি ইতোমধ্যেই-সক্রিয় ভারতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে যুদ্ধ বিষয়ে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার দিকে।

বিপ্লবী কাজকর্ম

যে বিপ্লবীরা অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছিলেন তাঁদের মনে হয়েছিল, এই যুদ্ধ এক দৈব-দত্ত সুযোগ। ভারত থেকে [ব্রিটিশ] সেনাদলের অপসারণ (একটা সময়ে শ্বেতাঙ্গ

সৈন্যের সংখ্যা নেমে দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৫,০০০) এবং ব্রিটেনের শত্রুপক্ষ জার্মান ও তুর্কিদের কাছ থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্যের সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছিল। এই ছিল এক সময়, যখন একটা সফল রাষ্ট্রঘাত (ক্যু দে তা) অসম্ভব বলে মনে হয় নি। তুর্কির (সব মুসলমানের ধর্মীয়-রাজনৈতিক নেতৃত্বের দাবিদার খলিফা-র জায়গা) সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ গড়ে তুলল হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও সর্ব-ইসলামবাদী জঙ্গী মুসলমানদের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা, আর দেখা দিলেন গদর-এর বরকাতুল্লা এবং দেওবন্দ মোল্লা মাহমুদ হাসান ও ওবেইদুল্লা সিন্ধির মতো গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান বিপ্লবী নেতা।

অগাস্ট ১৯১৪-য় বাঙলার বিপ্লবীরা একটা বড় সাফল্য অর্জন করলেন। একজন সহমর্মী কর্মচারীর মাধ্যমে কলকাতার রডা সংস্থার কাছ থেকে তাঁরা ৫০টি মাউজার পিস্তল ও ৪৬,০০০ রাউন্ড গুলি-র মতো বিশাল আমদানি দখল করে নিলেন। এই সময়েই রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যার রেখাচিত্র উঠেছিল সর্বোচ্চ মাত্রায়—১৯১৪-১৫-য় ১২ ও ৭ আর ১৯১৫-১৬-য় ২৩ ও ৯-এর কম নয়। বাঙলার অধিকাংশ গোষ্ঠীই যতীন মুখোপাধ্যায়ের (চলিত নাম 'বাঘা যতীন') অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা, কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দখল (সেখানে তখন ছিল ষোড়শ রাজপুত বাহিনী, তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল) জার্মানি থেকে অস্ত্রের আমদানি (তার ব্যবস্থা করার জন্যে নরেন ভট্টাচার্যকে জাভায় পাঠানো হয়) করার পরিকল্পনাও হয়েছিল। যা-ই হোক, দুর্বল সমন্বয়ের কারণে এই সাড়ম্বর পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়, এবং বাঘা যতীন বীরের মৃত্যু বরণ করেন ওড়িশার উপকূলে বালেশ্বরের কাছে। সেখানকার গ্রামবাসীদের সহায়তায় পুলিশ তাঁকে খুঁজে বার করে (সেপ্টেম্বর ১৯১৫)। এই ঘটনা বাঙলার বিপ্লবীদের মৌলিক সমাজ-বিচ্ছিন্নতাকেই করুণভাবে মনে করিয়ে দেয়।

বাঙলার পরিকল্পনা ছিল দূর-বিস্তৃত এক ষড়যন্ত্রের অংশ। এটি সংগঠিত করেছিলেন রাসবিহারী বসু ও শচীন সান্যাল—পাঞ্জাবে ফিরে-আসা গদরপন্থীদের সহযোগিতায়। যুদ্ধ বাধার পর, দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়তে হাজারে হাজারে গদরপন্থী ফিরে আসতে শুরু করেছিলেন। তীব্র আবেগ আবারও জ্বলে উঠেছিল কোমাগাটা মারু-র ঘটনায় (২৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৪)—কানাডীয় অভিবাসন কর্তৃপক্ষ এক জাহাজ ভর্তি শিখ ও পাঞ্জাবি মুসলমান অভিবাসন-প্রার্থীদের ভ্যাঙ্কুভার থেকে ফেরত পাঠাল। কলকাতার কাছে বজবজে তাঁরা ফিরে এলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে, নিহত হন ২২ জন। যে সব পাঞ্জাবি ১৯১৪-র পর ফিরে এসেছিলেন, ব্রিটিশরা অচিরেই তাঁদের অনেককে গ্রেপ্তার করে (১৯১৬ পর্যন্ত, মোট প্রায় ৮০০০ জনের মধ্যে ২৫০০ জন অন্তরীণ এবং ৪০০ জন কারাবন্দী হন)। ফিরোজপুর, লাহোর ও রাওয়ালপিণ্ডির সেনাদলের প্রকাশ্য বিদ্রোহের ভিত্তিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫-য় সমন্বিত অভ্যুত্থানের যে-পরিকল্পনা হয়েছিল, শেষ মুহূর্তের বিশ্বাসঘাতকতার দরুন তা ব্যর্থ হয়ে যায়। রাসবিহারী বসুকে পালাতে হয় জাপানে, বেনারস ও দানাপুরের সৈন্যদলের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করার জন্যে শচীন সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। যদিও সর্বভারতীয় বিদ্রোহের এই পরিকল্পনা বিশ্রীভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়, তাহলেও এর সংগঠকরা—আর বিশেষত গদরপন্থীরা—তখনও পর্যন্ত ছিলেন সৈন্যদলের ও কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবী ভাবধারা নিয়ে যাওয়ার অগ্রবাহিনী। কিছু বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহের মধ্য সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৫-য় সিঙ্গাপুরে জমাদার চিস্তি

খান, জমাদার আবদুল গনি ও সুবেদার দাউদ খানের নেতৃত্বে ৫ম লাইট ইনফ্যানট্রি ও ৩৬-তম শিখ বাহিনীর পাঞ্জাবি মুসলমানদের বিদ্রোহ। এটিকে দমন করে ৩৭ জনের মৃত্যুদণ্ড ও ৪১ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দেওয়া হয়। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯১৫-য় পাঞ্জাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ডাকাতির মধ্যেও কিছুটা নতুন সামাজিক অন্তর্বস্তু ছিল। ৫টি প্রধান ঘটনার মধ্যে কম করেও ৩টির লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ মহাজন ; টাকা নিয়ে ভেগে পড়ার আগেই আক্রমণকারীরা সমস্ত ঋণপত্র পুড়িয়ে দেয়। ভদ্রলোক বাঙালি সন্ত্রাসবাদীদের তুলনায় অনুচ্চ এই গদর চাষী এবং সিপাহী বীরদের অনেক কম স্মরণ করা হয়েছে। তাহলেও, এখনও অন্তত নিজের প্রদেশে ঘরে ঘরে তাঁদের নাম করা হয়—তবু, নিশ্চয়ই তাঁদের আরও গৌরবময় পরিণতি প্রাপ্য। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কর্তার সিং সরভ-এর মতো মানুষ, পাঞ্জাব সেনাদলের মধ্যে বিদ্রোহের সংগঠক, ১৯ বছর বয়সী এই যুবকটি মৃত্যুর আগে বলেছিলেন : 'যদি আমার একটার বেশি জীবন থাকত, তাহলে আমি তার প্রতিটিকেই উৎসর্গ করতুম আমার দেশের জন্যে।' আম্বালায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একদল বিদ্রোহী সেপাই-এর মধ্যে একমাত্র মুসলমান, আবদুল্লার বিদায়ী কথাগুলি সমান স্মরণীয়। তাঁর কাফের সহযোদ্ধাদের সঙ্গে বেইমানির প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে তিনি বলেছিলেন : 'একমাত্র এই মানুষগুলির সঙ্গে থাকলে তবেই আমার জন্যে বেহেস্তের (স্বর্গের) দরজা খুলে যাবে।'

যুদ্ধের বছরগুলিতে বাইরে থেকে বিপ্লবীদের সাহায্য পাঠানোর চেষ্টার কেন্দ্র ছিল বার্লিন। এখানে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হরদয়াল ও আরও কয়েকজনের নেতৃত্বে, তথাকথিত 'ৎসিমারমান পরিকল্পনা' অনুযায়ী জার্মান বৈদেশিক দফতরের সহযোগিতায় ভারতীয় স্বাধীনতা সমিতি (ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেণ্ডেন্স কমিটি) স্থাপিত হয়েছিল ১৯১৫-য়। একটা ভারত-জার্মান-তুর্কি প্রতিনিধিদল ভারত-ইরান সীমান্তের কাছে জনগোষ্ঠীদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী ভাব জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। ডিসেম্বর ১৯১৫-য় কাবুলে 'স্বাধীন ভারতের অন্তর্বর্তী সরকার' গঠন করেন মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকাতুল্লা ও ওবেইদুল্লা সিন্ধি। তাঁরা সমর্থন পেয়েছিলেন বাদশাজাদা আমানুল্লাহ্-র কাছ থেকে, কিন্তু আমির হবিবুল্লাহ-র কাছ থেকে নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছিল তৃতীয় কেন্দ্র। সেখানে রামচন্দ্রের মতো অবশিষ্ট কিছু গদর নেতা এবং চন্দ্র চক্রবর্তীর নেতৃত্বে বার্লিন কমিটির নিউ ইয়র্ক-স্থিত প্রতিনিধিরা যথেষ্ট পরিমাণ জার্মান টাকা পেয়েছিলেন,কিন্তু তাঁরা ঝগড়া-বিবাদ করতেন নিজেদের মধ্যেই। যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঢুকে পড়ার পর 'হিন্দু ষড়যন্ত্র মামলা'য় (১৯১৮) এই ধরনের কার্যকলাপের অবসান ঘটল। দূর প্রাচ্যের জার্মান দূতাবাসগুলির মাধ্যমে টাকা পাঠানো হচ্ছিল ; ১৯১৫-র পর রাসবিহারি বসু ও অবনী মুখোপাধ্যায় জাপান থেকে কয়েকবার অস্ত্র পাঠানোর চেষ্টা করেন। অবশ্য, বিপ্লবের জন্যে গোপনে অস্ত্র পাঠানোর এই সব প্রয়াসই হতোদ্যম করার মতো বিনা ব্যত্যয়ে ব্যর্থ হলো। ঘটনা যা-ই হোক, সেগুলি পৌঁছেছিল বড়ই দেরিতে, কারণ ১৯১৫-র গোড়ার দিকে ভারতে সম্ভাব্য সশস্ত্র বিদ্রোহের অশনিসঙ্কেত দেখা দিয়েই চলে গিয়েছিল।

ব্রিটিশরা যুদ্ধকালীন আশঙ্কার মোকাবিলা করল নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার এক শক্তিশালী সমবায়ে—১৮৫৭-র পর তীব্রতম—আর সবচেয়ে বড় কথা, মার্চ ১৯১৫-য় তারা ভারত রক্ষা আইন পাশ করিয়েছিল মুখ্যত গদর আন্দোলনকে ধ্বংস করতে। বাঙলায় ও পাঞ্জাবে বিশাল

সংখ্যক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বিনা-বিচারে আটক রাখা হয়েছিল বছরের পর বছর, আর বিশেষ আদালত অনেককেই অত্যন্ত কঠিন সাজা দিয়েছিল। গদর বিচারের তালিকার একটা হিসেবে দেখা যায়, ৪৬ জনের মৃত্যুদণ্ড এবং ৬৪ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। এছাড়াও ছিল সেনাবাহিনীর বিচারের জন্য বহু সংখ্যক সামরিক আদালত। বাঙলার সন্ত্রাসবাদী ও পাঞ্জাবের গদরপন্থীরা বাদেও, র্যাডিকাল সর্ব-ইসলামবাদীরাও ব্রিটিশদের মধ্যে যথেষ্ট শঙ্কার সঞ্চার করেছিলেন। দুই আলী ভাই, আজাদ ও হসরত মোহানিকে যুদ্ধের বছরগুলোতে অন্তরীণ রাখা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনকি তার পরেও।

লখনউ-ঐক্য

যে ভারতীয় রাজনীতিকরা বিপ্লবী ছিলেন না, তাঁরা যুদ্ধ-প্রয়াসকে সমর্থন জানিয়েছিলেন—১৯১৮-য় টিলক ও গান্ধী এমনকি গ্রামে-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে ব্রিটিশদের জন্যে টাকা ও লোক জোগাড়ের চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু এই আশা নিয়ে যে, এজাতীয় রাজভক্তির ফলে শাসকরা আরও বড় রাজনৈতিক সংস্কার মঞ্জুর করবে। ১৯১৮-য় টিলকের বক্তব্য ছিল ঃ 'যুদ্ধের ঋণপত্র কেনো, কিন্তু সেগুলোকে দেখো স্ব-রাজের স্বত্বের দলিল হিসেবে'। যুদ্ধের বছরগুলিতে নরমপন্থী, চরমপন্থী, এবং 'জওয়ান দল'-নিয়ন্ত্রিত মুসলিম লীগের একধরনের যৌথমঞ্চের একটা বাস্তব ভিত্তি এইভাবে দেখা দেয়। যুদ্ধ-সমর্থনের বিনিময়ে বিব্রত ব্রিটিশ সরকারের ওপর গঠনতান্ত্রিক, তাহলেও যথেষ্ট পরিমাণে তীব্র চাপ সৃষ্টির কর্মসূচি ছিল তার কেন্দ্র। ১৯১৪-য় মান্দালয়ের নির্বাসন থেকে ফিরে, চির-ব্যবহারিক টিলক তাঁর পুরনো কংগ্রেসি শত্রুদের সঙ্গে মিটমাট করার ব্যাপারে আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল। ফিরোজশাহ্ মেহটা ১৯১৫-য়, তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এ-ব্যাপারে অনড় ছিলেন। কিন্তু কলকাতার ভূপেন্দ্রনাথ বসুর মতো অন্যান্য নরমপন্থী 'বর্তমান বদ্ধ অবস্থা থেকে কংগ্রেসকে বার করার জন্যে যে-কোনো উপায় মেনে নেওয়া'র ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন (গোখলেকে লেখা চিঠি, ২৬ নভেম্বর ১৯১৪)। ১৯১৪ থেকে থিওসফিস্ট নেতা অ্যানি বেসান্ট হঠাৎ-ই বিশিষ্ট রাজনীতিক হিসেবে উঠে এলেন। এই প্রধান নতুন উপাদানটি পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার সহায় হয়েছিল। পরে ঘটনাবলি থেকে দেখা যায়, বেসান্ট আদৌ ব্যত্যয়হীন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ছিলেন না ; কিন্তু তিনি অনুভব করেছিলেন যে, ভারত-ব্রিটিশ বন্ধুত্বের জন্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে স্বশাসিত সরকার দরকার, আর ব্রিটিশ র্যাডিকাল ও আইরিশ হোমরুল আন্দোলনের ধাঁচে কার্যকর ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও সংগঠনই সেই লক্ষ্য অর্জন করার একমাত্র উপায়।

ডিসেম্বর ১৯১৫-য় টিলক গোষ্ঠী আবার কংগ্রেসে ঢোকার অনুমতি পেল, আর বোম্বাইতে একই সঙ্গে সভা করে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে, ন্যূনতম সাংবিধানিক দাবির সর্বসম্মত খসড়া তৈরি করার জন্যে কয়েকটি কমিটি গঠন করল। ভারতে প্রতিনিধিত্ব-মূলক সরকার ও ডোমিনিয়ন অধিকার চেয়ে অক্টোবর ১৯১৬-য় বড়লাটের কাছে যৌথ আবেদন জানালেন সাম্রাজ্য-কাউন্সিলের ১৯ জন বেসরকারি সদস্য। কাউন্সিলে নির্বাচিত গরিষ্ঠতা নিয়ে ডিসেম্বর ১৯১৬-য় লখনউ-এ আবারও একটি সর্বস্বীকৃত দাবি উঠল ; বিখ্যাত লখনউ চুক্তির মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক বিভেদ মেটানোর চেষ্টা হলো।

এই চুক্তিতে কংগ্রেস পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী মেনে নিল আর আসন বন্টনের ব্যাপারেও একটা রফা হলো। মুসলমান নেতারা বোম্বাই বা যুক্ত প্রদেশের মতো রাজ্যে (যেখানে শতকরা ৩০ ভাগ তাঁদের জন্যে বরাদ্দ ছিল) বেশি প্রতিনিধিত্বের বিনিময়ে মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে কম প্রতিনিধিত্ব মেনে নিলেন (যেমন বাঙলায় মাত্র শতকরা ৪০ ভাগ আসন)। মুসলমানদের দিক থেকে এই চুক্তিতে স্পষ্টতই ওয়াজির হাসান ও মাহ্‌মুদাবাদ পরিচালিত যুক্ত প্রদেশ-ভিত্তিক 'জওয়ান দলে'র স্বার্থই প্রতিফলিত হয়। এবং ফজলুল হক গোষ্ঠী এটিকে সমর্থন করা সত্ত্বেও বাঙলায় দেখা দেয় কিছু অসন্তোষ।

হোম রুল বিক্ষোভ

অবশ্য কংগ্রেস তখনও একটা বিশুদ্ধ বিতর্কসভাই রয়ে গেল, কোনো লাগাতার আন্দোলনের সঙ্গে যার কোনো যোগ নেই। প্রকৃত পার্টিতে রূপান্তরের দিকে যাওয়ার প্রথম ধাপ হিসেবে, একটা সুসংহত কার্যনির্বাহী সমিতি গঠন হোক—লখনউতে টিলকের এই প্রস্তাব সভাপতি খারিজ করে দিলেন। সুতরাং বিক্ষোভমূলক কাজকর্ম টিলক ও অ্যানি বেসাণ্ট-এর দুটি হোম রুল লীগের মাধ্যমে সংগঠিত করতে হয়েছিল। সেপ্টেম্বর ১৯১৫-য় বেসাণ্ট এই ধরনের লীগের পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং ঐ লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছিলেন তাঁর মাদ্রাজের সংবাদপত্র 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'কমনউইল', তারপরে ১৯১৬-র গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত বোম্বাই-এর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মাধ্যমে। টিলক, অংশত তাঁর পুরনো মহারাষ্ট্র-ভিত বজায় রাখার জন্যে, এপ্রিল ১৯১৬-য় তাঁর হোম রুল লীগ পত্তন করে, বেসাণ্টকে আগেই আটকে দিলেন। তখনও এটি গণ্ডিবদ্ধ ছিল মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে, কিন্তু দাবি করা হয় যে, এপ্রিল ১৯১৭-য় এর সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪,০০০ এবং ১৯১৮-র গোড়ার দিকে ৩২,০০০। বেসাণ্ট -এর লীগ স্থাপিত হয়েছিল সেপ্টেম্বর ১৯১৬-য়। তার অনেকটাই সর্বভারতীয় চরিত্র ছিল, কিন্তু প্রথমে পুরনো থিওসফিকাল (সোসাইটি-ঘটিত) যোগাযোগের ওপরই খুব বেশি ভরসা করতে হয়েছিল। টিলক ও কেলকর পুণা থেকে একটি মোটামুটি কেন্দ্রীভূত সংগঠন চালাবার চেষ্টা করেছিলেন, আর বেসাণ্ট-এর লীগের সদর দফ্‌তর অড্যার মাদ্রাজ) সেখানে শুধু তাদের ন্যূনাধিক ২০০ স্থানীয় শাখা (তার মধ্যে ১৩২টি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির)-র ওপর নেহাতই আলগা তদারকি বজায় রেখেছিল। ১৯১৭-র মাঝামাঝি তার তুঙ্গ অবস্থাতেই বেসাণ্ট-এর হোম রুল লীগের সদস্য ছিল ২৭,০০০।

হোম রুল লীগের কাজকর্মের মধ্যে ছিল শহরে কিছু আলোচনাচক্র ও পাঠকক্ষ সংগঠিত করা, গণ-হারে প্রচার পুস্তিকা বিক্রি ও বিভিন্ন জায়গায় বক্তৃতা সফর—পুরনো নরমপন্থী রাজনীতির বাহ্যরূপের সঙ্গে যার কোনো ভেদ ছিল না। কিন্তু গভীরতা ও বিস্তারের দিক থেকে এটি ছিল লক্ষণীয়ভাবে নতুন। টিলকের লীগ তার প্রথম বছরেই ৬টি মারাঠি ও ২টি ইংরিজি পুস্তিকার ৪৭,০০০ কপি বিক্রি করে ফেলে, আর বেসাণ্ট-এর সংগঠন সেপ্টেম্বর ১৯১৬-র মধ্যেই ২৬টি ইংরিজি রচনার ৩০০,০০০ কপি বার করেছিল। বেসাণ্ট ও তাঁর দুই প্রধান থিওসফিস্ট সহকর্মী, আরুণ্ডালে ও ওয়াডিকা-কে জুন ১৯১৭-য় অন্তরীণ করার পর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথাও উঠেছিল। প্রচারের বড় অংশই ছিল হোম রুল সম্পর্কে খানিকটা

নির্মূর্ত ও মননগত ধারণাকে কেন্দ্র করে, কিন্তু টিলকের সামান্য যে-কয়েকটি বক্তৃতা রক্ষা পেয়েছে সেগুলোয় কিছু কৌতূহলজনক প্রয়াস দেখা যায়। সাধারণ মানুষের আরও নির্দিষ্ট ও মূর্ত নানা ক্ষোভের সঙ্গে এই আদর্শকে যুক্ত করার প্রয়াস বারেবারেই পরবর্তীকালের গান্ধীপন্থী ভাবধারার দিকেই ইঙ্গিত করে। 'বন দফ্‌তরের সূত্রে আমাদের ওপর জুলুম করা হচ্ছে, আবগারি দফ্‌তরের সূত্রে মদ (-এর ব্যবহার) আরও ছড়িয়ে পড়েছে' (বেলগাঁও-এ টিলকের বক্তৃতা, ১ মে ১৯১৬)—রাজস্বের চাপ ও লবণ-করেরও উল্লেখ করা হয়েছিল। টিলকের আন্দোলন একটা বিশুদ্ধ চিৎপাবন ব্রাহ্মণ-ঘটিত ব্যাপারই ছিল না : হোম রুল লীগের সদস্য-তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে, পুণাতে যথেষ্টসংখ্যক অব্রাহ্মণ ব্যবসাদার যোগ দিয়েছিলেন, এবং খান্দেশের মতো জেলায় ব্রাহ্মণদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি ছিলেন গুজার ও মারাঠারা। বি পি ওয়াডিয়ার মতো হোম রুল লীগ-পন্থীরাও মাদ্রাজ শহরের শ্রমীকশ্রেণীর মধ্যে কিছু ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম—যদিও বেশ নরমপন্থী ধরনের—শুরু করেছিলেন।

অবশ্য হোম রুল আন্দোলনের, বিশেষত বেসান্ট-এর লীগের প্রকৃত গুরুত্ব হলো : নতুন এলাকা, গোষ্ঠী ও খানিকটা নতুন প্রজন্মের মতো একটা ব্যাপারের প্রসার—এই আন্দোলন সম্পর্কে এ. যাবৎ একমাত্র সারবান্ বিবরণে এইচ এফ আওয়েন এই দিকটির ওপর জোর দিয়েছেন। মহারাষ্ট্র বাদে, অন্য দুটি পুরনো চরমপন্থী ঘাঁটি ছিল তুলনায় শান্ত। যুদ্ধের বছরগুলিতে ব্রিটিশ নিপীড়নের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙলা ও পাঞ্জাব, যে-কোনো ধরনের জঙ্গী বিক্ষোভ করা হয়ে পড়েছিল কঠিন—যদিও এই সময়ে বাঙলায় ভবানীপুর প্রাদেশিক সম্মিলনে (এপ্রিল ১৯১৭) সক্রিয় রাজনীতিতে আবির্ভূত হলেন একজন মুখ্য নতুন নেতা : চিত্তরঞ্জন দাস। বেসান্ট-এর লীগ তার প্রধান সমর্থক হিসেবে পেয়েছিল মাদ্রাজ শহর ও মফস্বল শহরগুলির তামিল ব্রাহ্মণ, যুক্ত প্রদেশের নাগরিক বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী (কায়স্থ, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ, কিছু মুসলমান), সিন্ধুপ্রদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু তামিল, তরুণতর গুজরাটি শিল্পপতি, বোম্বাই শহর ও গুজরাটের ব্যবসাদার ও উকিলদের। থিওসফি ও তার সঙ্গে কিছুটা সমাজ সংস্কারের সমন্বয়, প্রাচীন হিন্দু প্রজ্ঞা ও মহিমার তত্ত্ব এবং কিছু অতীন্দ্রিয় দাবি যে ঋষিরা অনেক আগেই আধুনিক পাশ্চাত্যের সব কীর্তিরই পূর্বসূচনা করে ছিলেন—[এর ফলে] প্রধানত এই ধরনের গোষ্ঠী থেকেই সদস্য জোগাড় হয়েছিল। তার কারণ সম্ভবত এই যে, ব্রাহ্ম ধর্ম বা আর্যসমাজের মতো অন্যান্য সংস্কারমূলক বা পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন তাদের কাছে খুব বেশি পৌঁছয় নি। রাজনৈতিক শূন্যতার মতো একটা পরিস্থিতিও দেখা দিয়েছিল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহর ছাড়া, এগুলি ছিল সেই এলাকা যেখানে কোনোরকম পোক্ত ভিতগাড়া রাজনৈতিক পরম্পরাই ছিল না—না চরমপন্থী, না নরমপন্থী। বেসান্ট নিজেই মাদ্রাজের কিছু ঘনিষ্ঠ সহযোগী (ওয়াডিয়া, আরুন্ডালে, আর সি পি রামস্বামী আয়্যার—ইনি পরে হয়ে উঠবেন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের একজন কট্টর কর্তৃত্বকামী ও রক্ষণশীল দেওয়ান) নিয়ে অচিরেই র‍্যাডিকাল রাজনীতির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই ছেদ করেন। কিন্তু হোম রুল আন্দোলনের মাধ্যমে যে-তরুণরা সক্রিয় হয়ে ওঠেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন, ১৯২০-র দশক থেকে ভারতীয় রাজনীতির বেশ কিছু ভাবী নেতা : মাদ্রাজে সত্যমূর্তি, কলকাতায় জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাহাবাদ ও লক্ষ্নউ-এ জওহরলাল নেহরু ও খালিকুজ্জামান, আর বোম্বাই ও গুজরাটে ধনী রঞ্জক-আমদানীকারী যমনাদাস দ্বারকাদাস, শিল্পপতি ওমর সোভানি, ধনীর সন্তান

মতো দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরা চিতোরের মধ্যযুগীয় রাণাদের ক্ষাত্রধর্ম ও বীরবত্তার গুণগান করে উপন্যাস, নাটক, গল্প ও কবিতা রচনা করছিলেন। এ এক বিচিত্র সমাপতন। ঐ রাণাদের আধুনিক বংশধররা ছিল ব্রিটিশদের প্রতি শোচনীয় দাসমনোভাবাপন্ন আর সেই সঙ্গে তারা স্থূলতম আকারে কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ করত। মেবারের একটা বড় জাগীর বিজোলিয়ার অধিকারী ছিলেন জনৈক পারমার রাজপুত। সেখানে কিসানদের ওপর ৮৬টি বিভিন্ন ধরনের উপ-কর ছিল। ১৯০৫-এ ও আবার ১৯১৩-য় কিসানরা চাষ করতে সমবেতভাবে নারাজ হল, ও আশপাশ এলাকায় চলে যাওয়ার চেষ্টা করেন। ১৯১৩-য় এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এক সাধু—সীতারাম দাস। ১৯১৫-য় ভূপ সিং ওরফে বিনয় সিং পথিক নামে শচীন সান্যাল গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত একজন প্রাক্তন বিপ্লবী সরকারি হুকুমে নির্বাসিত হয়ে এই অঞ্চলে আসায় একটি নতুন দিকের সূত্রপাত হলো। নির্বাসিত অবস্থায় পথিক হয়ে উঠলেন কৃষক নেতা, মানিকলাল বর্মা বলে একজন রাজ্য কর্মচারীকে বুঝিয়ে তাঁরা যৌথভাবে ১৯১৬-য় উদয়পুরের মহারাণার বিরুদ্ধে কর-বন্ধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। বিজোলিয়া আন্দোলনের অন্য একটি উপাদান হলো : যুদ্ধ-ঋণে সাহায্য দিতে কৃষকরা অস্বীকার করেন। পরে তার সঙ্গে গান্ধীপন্থীদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে, ১৯২০-র দশক পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পরবর্তীকালে পথিক ও বর্মা দুজনেই রাজস্থানের গুরুত্বপূর্ণ কংগ্রেস নেতা হয়ে ওঠেন।

দুটি এলাকায় গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদের জন্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে কৃষক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও খুবই সারবান্ অবদান ছিল : উত্তর-পশ্চিম বিহারের চম্পারন এবং গুজরাটের খেড়া। স্থানীয় প্রশ্নগুলিকে সর্বভারতীয় স্তরে তুলে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে গান্ধীর হস্তক্ষেপ ছিল অপরিহার্য। তাহলেও মহাত্মা-র আবির্ভাবের বহু আগেই এই দুটি ক্ষেত্রেই অসন্তোষ ও প্রতিবাদের পর্যাপ্ত সাক্ষ্য রয়েছে। এবং জাক পুশেপাদাস চম্পারন নিয়ে তাঁর গবেষণায় যাকে বলেছেন 'গ্রামীণ জনতার নিজেদের তরফ থেকে উর্ধ্বমুখী চাপ', তাও ছিল। ১৮৬০-এর দশক থেকেই চম্পারনে তিনকাঠিয়া প্রথার ব্যাপারে বিক্ষিপ্ত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। ইওরোপীয় নীলকররা রামনগর, বেট্টিয়া, ও মধুবনের বড় জমিদারদের কাছ থেকে ঠিকাদারি ইজারা নিয়েছিল আর চাষীদের জমির একটা অংশে অ-লাভজনক দামে নীল বুনতে বাধ্য করেছিল। কৃত্রিম রঙের সঙ্গে প্রতিযোগিতার মোকাবিলা করতে না-পেরে ১৯০০ নাগাদ নীল চাষ কমে যায়। তখন নীলকররা নীলচাষের দায় থেকে তাদের রেহাই দেওয়ার পরিবর্তে 'শহরবেশী' (খাজনা-বৃদ্ধি) বা 'তাবন' (থোক ক্ষতিপূরণ)-এর বোঝাটা চাষীদের ঘাড়েই চালান করার চেষ্টা করেছিল। ১৯০৫-০৮-এর মধ্যে মোতিহারী-বেট্টিয়া অঞ্চলে ব্যাপক বিস্তৃত প্রতিরোধ গড়ে ওঠে, ৪০০ বর্গমাইল এলাকায় তার প্রভাব পড়ে এবং কয়েকটি সঙ্ঘর্ষে (একজন নীলকুঠির ম্যানেজার, ব্লুমফিল্ডকে হত্যা) ৫৭টি ফৌজদারি মামলা, ও আদালতে ২৭৭ জনের শাস্তি পাওয়ার ঘটনা ঘটে। কৃষককুলের তুলনায়-সম্পন্ন একটা অংশ দরখাস্ত, মোকদ্দমা আর বিহার কংগ্রেসের কিছু নেতা ও সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে এই আন্দোলন চালিয়ে নিয়ে যায় পরের দশক পর্যন্ত। মোকাবিলা চলতেই থাকে, তারই অংশ হিসেবে জনৈক ধনী কৃষক-তথা-ছোট মহাজন, রাজকুমার শুক্ল ১৯১৬-য় লখনউ কংগ্রেসে গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। খেড়ায়ও গান্ধী ঢোকার অনেক আগেই খাজনা দিতে সমবেত অস্বীকৃতি ক্রমেই আরও বেশি করে প্রচলিত

হয়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের শেষে তামাক ও দুগ্ধজাত দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান বাজার থেকে লাভবান হয়েছিল ধনী কৃষকদের একটি উঠতি স্তর। তারা নিজেদের 'কণবী'-র বদলে 'পাটীদার' বলে ঘোষণা করতে শুরু করেছিল। ১৮৯৮ ও ১৯০৬-এর মধ্যে মহামারি ও আকালে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সরকারি রাজস্ব-বৃদ্ধির ফলে তাদের বোঝা আরও বেড়ে যায়। গুজরাটের গান্ধীপন্থী কাজকর্মের অন্য একটি প্রধান কেন্দ্র সুরাট জেলার বারডোলিতে গোড়ায় জাতের ভিত্তিতে ১৯০৮ থেকে খানিক সংগঠন গড়ে ওঠা শুরু হয়েছিল ঃ কুনবরজী মেহ্‌তা-প্রতিষ্ঠিত পাটীদার যুবক মণ্ডল।

সাম্প্রদায়িকতা

আগের অধ্যায়েই দেখা গেছে, নিচুশ্রেণীর অসন্তোষ প্রায়শই সাম্প্রদায়িক, জাতপাত বা আঞ্চলিক চেতনার 'খণ্ডিত' রূপ নিত যা অনেকটাই কম স্পষ্ট। যেমন, ময়মনসিংহে-র জামালপুর মহকুমার কামবিয়ারচরে ১৯১৪-য় প্রজা সম্মিলনে রায়তদের এক দাবিপত্র খাড়া করা হয় ঃ খাজনা কমানো, আবওয়াব বন্ধ করা, ঋণমকুব, জমিদারকে 'নজর' না-দিয়ে গাছ লাগানো ও পুকুর খোঁড়ার অধিকার, এবং হিন্দু জমিদারের আদালতে মুসলমান প্রজার সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার। এই সম্মিলন সংগঠিত করেন একজন সম্পন্ন মুসলমান রায়ত ঃ চৌধুরী খোদা মহম্মদ সরকার। ঐ সম্মিলনে তখনও ভাগচাষীদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে যে কিছুই বলা হয় নি এও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে উপস্থিত ছিলেন বাঙলার কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা, তাঁদের সকলেই মুসলমান—ফজলুল হক, আক্রাম খাঁ, আবুল কাসেম ও অন্যান্য। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল প্রজা আন্দোলন, ১৯২০-র ও ৩০-এর দশকে যেটি বাঙলার রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি প্রতিফলিত করেছিল কৃষিক্ষেত্রের অসন্তোষকে (বোধহয় আরও ঠিকভাবে বললে, ধনী চাষী বা জোতদারদের দাবিদাওয়াকে) আর সেই সঙ্গে পরিপুষ্ট করেছিল মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকেও। এমনটি ঘটেছিল হিন্দুপ্রধান বাঙলা কংগ্রেসের ভুল-ভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতার ফলে। মুসলমান, হিন্দু বা যেই হোক, শিরোমণিদের থেকে পৃথক,তুলনায়-'জনভিত্তিক' এই সাম্প্রদায়িকতার মূল সন্ধানের কাজ এখনও পর্যন্ত খুব অল্পই হয়েছে। যেমন, অক্টোবর ১৯১৭-য় বিহারের বিরাট সব দাঙ্গা, যেখানে ৫০,০০০ অবধি হিন্দু জনতা শাহাবাদে ১২৪টি গ্রাম, গয়ায় ২৮টি ও পাটনার ২টি গ্রামে মুসলমানদের আক্রমণ করে, তার সম্ভাব্য সামাজিক মাত্রা সম্বন্ধে আরও জানার ইচ্ছে হয়। অব্যবহিত ও আপাত বিষয় ছিল গোরক্ষা, কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল ঃ ব্রিটিশ শাসন ভেঙ্গে পড়ছে। দাঙ্গাকারী জনতা আওয়াজ তুলেছিল 'আংরেজ কা রাজ উঠ্ গয়া' ও 'জার্মান কী জয়'। ১৮৫৭-৫৮-য় যেখানে কুনবর সিং-এর ঘাঁটি ছিল, ঘটনাচক্রে শাহাবাদের এই এলাকাটি তার কাছেই। এ-ও বলা হয়েছে যে, উঁচু জাতের ভূস্বামীরা স্থানীয় নেতৃত্ব ফিরে পাওয়ার জন্যে সাম্প্রদায়িকতাকে কাজে লাগাচ্ছিল। সে-নেতৃত্বের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল আসন্ন শ্রেণীগত টানাপোড়েন। সনাতন ধর্মসভা ও আর্যসমাজী বিক্ষোভকারীদের গোরক্ষা প্রচার এই ধরনের দাঙ্গা উস্কানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল—এবং গোড়ার দিকের কৃষক সমাবেশের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির অন্য একটি কৌতূহলজনক সূচক এই যে, যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদ অঞ্চলের সনাতন ধর্মসভার

একজন সুপরিচিত সক্রিয় কর্মী মালবীয়-র আশ্রিত ব্যক্তি ইন্দর নারায়ণ দ্বিবেদী ধর্মীয় বক্তৃতা ও হিন্দী ভাষা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৭-য় হোম রুল রাজনীতি ও কিসান সভার একাধিক শাখার পত্তন করেন। সেপ্টেম্বর ১৯১৮-য় কলকাতার দাঙ্গা সম্পর্কে খানিকটা খুঁটিয়ে চর্চা করেছেন জে এইচ ব্রুমফিল্ড। বড়বাজারের মারোয়াড়ি ব্যবসাদারদের আক্রমণ করেছিলেন তাঁদের প্রতিবেশী আরও গরিব মুসলমানরা। আংশিকভাবে কিছু অবাঙালি মুসলমান বিক্ষোভকারী (হাবিব শাহ্, ফজলুর রহমান, কালামি) ও পশ্চিমের উলেমাদের সর্ব-ইসলামী প্রচারেই তাঁরা খেপে উঠেছিলেন। হিন্দু পুনরুত্থানবাদ ও সর্ব-ইসলামবাদ—এই দুই-ই নিচু শ্রেণীর অসন্তোষের প্রকাশ, সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা, ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনীতির মধ্যে দোলাচল করতে পারত।

জাতপাতের আন্দোলন

বিশ শতকের গোড়ার দশকগুলিতে জাতি সম্মিলন, সমিতি ও আন্দোলনের সংখ্যাবৃদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের সংস্থা গড়ে তুলেছিল মাঝারি বা আরও বিরল নিচু জাতের শিক্ষিত মানুষের বেশ ছোটোছোটো কয়েকটি গোষ্ঠী। পেশা বা চাকরির প্রতিযোগিতায় তাঁরা এসেছিলেন পরে। এগিয়ে থাকা প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ বা অন্যান্য উঁচু জাতের লোকদের (তাঁরাই সাধারণত ছিলেন ইংরিজি শিক্ষার প্রথম সুবিধাভোগী) বিরুদ্ধে আক্রমণের ব্যাপারে জাতপাতের মধ্যেই তাঁরা লোক-জোটানোর একটা উপযোগী ক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। কেমব্রিজ ঐতিহাসিকরা যে এই উপদলীয় দিকটিতে জোর দেন সেটি অপ্রত্যাশিত নয়, আর সমাজতাত্ত্বিকদের ধারা হলো, জাতপাতের আন্দোলনের সঙ্গে সামগ্রিকভাবে কোনো কোনো বিশেষ জাতের 'সংস্কৃতায়নে'র মাধ্যমে ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতার সম্পর্ক স্থাপন, আর কখনও কখনও 'পরম্পরা' ও 'আধুনিকতা'র মধ্যে মূল্যবান যোগসূত্র হিসেবে তাঁরা এইসব জাতি সমিতির তারিফ করেছেন। মহারাষ্ট্রে অ-ব্রাহ্মণ আন্দোলনের ওপর সাম্প্রতিক কালের খুবই কৌতূহলজনক একটি গবেষণায় গেল ওমভেট তৃতীয় ধরনের একটি পরিমার্গ করে নিয়েছেন ঃ সামাজিক-আর্থিক ও শ্রেণীগত টানাপোড়েনের বিকৃত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অভিপ্রকাশ হিসেবে জাতিসঙ্ঘাতকে ব্যাখার চেষ্টা করা হয়েছে। 'সংস্কৃতায়নে'র ধারণাটি তাঁর কাছে খুবই সঙ্কীর্ণ মনে হয়েছে, কারণ এটি মহারাষ্ট্রের সত্যশোধক সমাজ বা তামিলনাড়ুর আ ত্ম ম র্যা দা প্রচারের মতো কিছু র‍্যাডিকাল ও জনমুখী জাতপাত-বিরোধী আন্দোলনের অভ্যুদয়ের ব্যাখ্যা করতে পারে না।

বাঙলার মতো প্রদেশে জাতি-সমিতির যে কোনো চল ছিল না এমন নয় (১৯০৮-এর পর জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা পড়ায় তা আরও লক্ষণীয় হয়ে ওঠে), কিন্তু দক্ষিণ-ভারত ও মহারাষ্ট্রে এই সব সমিতি অনেক বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্ব অর্জন করেছিল। এই এলাকাগুলোয় স্পষ্টভাবে ব্রাহ্মণ্য-প্রধান্য ও উঁচু জাতের কড়াকড়ির চিহ্ন ছিল খুবই প্রকট (যেমন, কেরলে শুধু নিচু জাতের ছোঁয়ায়ই নয়, নজরে পড়লেও শুচিতা নষ্ট হয় বলে মনে করা হতো)। দক্ষিণ তামিলনাড়ুর অচ্ছুত নাদারদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষভাগ থকে রামনাড জেলার শহরগুলিতে একটা সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী দেখা দিয়েছিল। শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কাজের জন্যে তাঁরা সবাই মিলে চাঁদা তুলতেন, ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা দাবি করতেন, উঁচু শ্রেণীর আচার-

আচরণ নকল করতেন, আর ১৯১০-এ গড়ে তোলেন না দা র ম হা জ ন স ঙ্গ ম। 'সংস্কৃতায়নের নকশাটি এখানে বেশ উপযোগী বলে মনে হয়, যদি মনে রাখা হয় যে, এই ধরনের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা তিরুনেলভেলির নিচু জাতের পাসিদের (তাড়ির জন্যে যাঁরা তাল গাছে ওঠেন) ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলে নি। যখন রামনাডে তাঁদের সফল জাতভাইরা আরও মর্যাদাসূচক পদবি 'নাদার' পদবিটি দখল করে ফেলেছিলেন, তাঁদের তখনও পুরনো জাত-নাম 'শানার'ই বলা হতো। রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হলো, ১৯১৫-১৬ নাগাদ মাদ্রাজে মাঝারি জাতের (তামিল, ভেল্লাল, মুদালিয়র ও চেট্টিয়ার, কিন্তু সবার ওপরে, তেলুগু রেড্ডি, কাম্মা ও বালিজা নাইডু এবং মালয়ালী নায়াররা) তরফে সি এন মুদালিয়র, টি এম নায়ার, ও পি ত্যাগরাজ চেট্টি-র প্রবর্তিত 'ন্যায়বিচার' (জাস্টিস) আন্দোলন। এঁদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিত্তর সমৃদ্ধ ভূস্বামী ও বণিক। তাঁরা তাই শিক্ষা, চাকরি ও রাজনীতিতে ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিষয়ে ঈর্ষাবোধ করছিলেন। ১৯১২-য় মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.২% ব্রাহ্মণ ৫৫% ডেপুটি কালেক্টর-এর পদ ও ৭২.৬% জেলা মুন্সেফের পদ অধিকার করেছিলেন। কখনও কখনও ব্রাহ্মণরাও ছিলেন বড় ভূস্বামী, বিশেষ করে তাঞ্জাভুরে। কৃষিকর্ম ও নাগরিক বৃত্তিগুলি—উঁচু জাত হিসেবে তাঁদের নিষিদ্ধ থাকায় সাধারণত তাঁরা অনুপস্থিত ভূস্বামী হয়েই থাকতেন। অ্যানি বেসান্ট-এর ব্রাহ্মণ প্রধান হোম রুল লীগ বিক্ষোভ তাঁদের মনে ভয় জাগিয়ে তুলেছিল, আর উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী, সাংবাদিক ও মাদ্রাজের ব্যবসাদাররা অচিরেই তার সুযোগ নেয়। *মাদ্রাজ মেল*-এর সম্পাদক ও মাদ্রাজ শহরে ব্রিটিশ ব্যবসার স্বার্থের মুখপাত্র টি আর্ল ওয়েলবি, মণ্টাগু-র প্রতিশ্রুত দায়িত্বশীল সরকারের প্রস্তাবকে প্রবল আক্রমণ করেন ('ইংল্যান্ডের নিনাদ আর তাদের জানা সিংহনিনাদ নয়, তা হয়ে উঠল এই ভবঘুরে ইহুদি-র ফিসফিসানি'—*মাদ্রাজ মেল*, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯১৭) এবং উদীয়মান জাস্টিস দলকে আনুকূল্য করতে শুরু করেন। সেই দলও আরও বেশি পরিষেবার কাজ ও নতুন আইনসভায় বিশেষ প্রতিনিধিত্বের আশায় তাদের রাজভক্তি জাহির করল। ২০ ডিসেম্বর ১৯১৬-য় প্রকাশিত হয় 'অব্রাহ্মণ ইশ্‌তেহার'। 'একমাত্র ব্রিটিশ শাসকই ধর্মমত ও শ্রেণীর মধ্যে পাল্লা সমান রাখতে পারে...তাদের প্রভাব ও কর্তৃত্বের পক্ষে হানিকর' যে-কোনো প্রয়াসেরই তাতে বিরোধিতা করা হয়। মৈত্রী আরও সহজ হয়েছিল এই কারণে যে, জাস্টিস দলের নেতারা ছিলেন ভূস্বামীদের অর্থের ওপর প্রচন্ড ভাবে নির্ভরশীল এক শিরোমণি গোষ্ঠী। সেপ্টেম্বর ১৯১৭-য় জাতীয়তাবাদ-প্রবণ মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি সমিতি-র সংগঠন থেকে দেখা যায়, অব্রাহ্মণ ক্ষোভগুলি ছিল যথেষ্ট বাস্তব। আলাদা প্রতিনিধিত্বের দাবিও তাঁদের ছিল—আর ১৯২০-র দশকের শেষে ই ভি রামস্বামী নায়কর-এর নেতৃত্বে একটি র‍্যাডিকাল ও জনমুখী ব্রাহ্মণ-বিরোধী ও জাতপাত-বিরোধী আন্দোলনও গড়ে ওঠে।

রাজন্যশাসিত মাইশোর রাজ্যে ১৯১৮-য় প্রধানত শহরবাসী একটি ব্রাহ্মণগোষ্ঠী (মোট জনসংখ্যার ৩.৮% ভাগ) গেজেটেড পদ অধিকার করে ছিল। বোক্কালিগা ও লিঙ্গায়ত-রাই ছিলেন মুখ্য গ্রামীণ গোষ্ঠী। ১৯০৫-০৬-এ একটি লিঙ্গায়ত শিক্ষা তহবিল সমিতি ও বোক্কালিগা সঙ্ঘ দেখা দেয়। আর ১৯১৭-য় জনৈক মাদ্রাজী অব্রাহ্মণ রাজনীতিবিদ্‌ ও মাইশোরের মহারাজা কলেজের অধ্যাপক সি আর রেড্ডি ব্রাহ্মণ-বিরোধী অবস্থান থেকে এই রাজ্যের প্রথম

রাজনৈতিক সংগঠন—প্রজা মিত্র মণ্ডলী—পত্তন করেন। অবশ্য এই সব সংস্থাই নাগরিক বৃত্তিজীবীদের জোটই রয়ে গিয়েছিল, যারা শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে দরবারি রাজনীতিকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করত।

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের ছোটো শিরোমণি গোষ্ঠী (জনসংখ্যার ১%-এরও কম) বড় নিষ্কর 'জেন্‌মি' ভূসম্পত্তি থেকেই জীবন ধারণ করত। শিক্ষা ও চাকরির প্রতিযোগিতা থেকে তারা অনেকটাই দূরে সরে থাকত। অবশ্য অ-মালয়ালী ব্রাহ্মণরা (মারাঠি দেশস্থ বা তামিল বংশ-জাত) রাজ্য প্রশাসনে একটা সুবিধাভোগী অবস্থা ভোগ করতেন। ১৮৯১-এ স্থানীয় প্রতিপত্তিশালী জাত নায়ারদের শক্তির (৫০ লক্ষ) বিরুদ্ধে তাঁরা ছিলেন মাত্র ২৮,০০০। ত্রিবাঙ্কুরের জীবনধারায় একটা অস্বাভাবিক বিশেষত্ব ছিল বিশাল সংখ্যক সাক্ষর মানুষ। খ্রীস্টানদের এই পুরনো কেন্দ্রে এজাভা ও অন্যান্য নিচুজাতের মধ্যে প্রবল ধর্মপ্রচারমূলক কার্যকলাপ ও দেওয়ান মাধব রাও-এর আমলে (১৮৬০-৭২) উঁচুজাতের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের প্রচেষ্টার ফলে এটি ঘটেছিল। ১৯০১-এ ত্রিবাঙ্কুরের শহর অঞ্চলে সাক্ষরতার হার ছিল ৩৬%—কলকাতার চেয়েও বেশি। নায়ারদের মনে হতো, অ-মালয়ালী ব্রাহ্মণরা তাঁদের (সমাজের) বাইরে রেখে দিয়েছেন আর সেই সঙ্গে ছিলেন সিরীয় খ্রীস্টানরাও (একটি সম্প্রদায়, যাঁদের মধ্যে ছিলেন উত্তর ত্রিবাঙ্কুরের বহু ভূস্বামী ও সমৃদ্ধ ব্যবসায়ী, আর তাঁরাই ছিলেন আধুনিক সাংবাদিকতার অগ্রদূত)। তাঁদের ও এজাভাদের মধ্যে উর্দ্ধমুখী গতির সূচনাও ছিল নায়ারদের আশঙ্কার কারণ। নায়ারদের বহু অভ্যন্তরীণ সমস্যাও ছিল : নায়ারদের পরম্পরাগত অব্যবহার্য 'তারাবাদ' (মাতৃতান্ত্রিক যৌথ পরিবার) ক্রমাগতই আধুনিক আর্থনীতিক অবস্থায় অচল বলে বোঝা যাচ্ছিল ; বহু 'তারাবাদ' তুলনায় ছোটো ভূ-খণ্ড অধিকার করেছিল আর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে মার খাচ্ছিল (অন্যান্য প্রদেশের বাবু-ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিজীবী সম্প্রদায় যে-অবস্থার মুখে পড়েছিলেন, এখানেও তা-ই তৈরি হচ্ছিল)। পাশ্চাত্য শিক্ষার দরুন নায়ারদের বহু সামাজিক প্রথা অস্বস্তিকর ও পশ্চাদ্‌মুখী বলে মনে হচ্ছিল, বিশষ করে এই নিয়মটি যে, নাম্বুদ্রি অতিথির সামনে নায়ার নারীকে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে আসতে হবে ও তার সঙ্গে সাময়িক দেহ সম্বন্ধ ('সম্বন্ধনম্') স্থাপন করতে হবে।

এর মিলিত ফল হলো গোড়াতেই ও প্রায় একই সঙ্গে অনেক ক'টি প্রবণতার উত্থান : সমাজ সংস্কার, ব্রাহ্মণ-বিরোধী ভাবাবেগ, স্বাদেশিকতা, এমনি কিছুটা র‍্যাডিকালিজম। কেরলের প্রধান আধুনিক উপন্যাস, চন্দর মেননের *ইন্দুলেখা*-য় (১৮৮৯) তাই নাম্বুদ্রিদের সামাজিক প্রাধান্য এবং রোমান্টিক প্রেমের ওপর 'তারাবাদ' কড়াকড়িকে আক্রমণ করা হয়। আর সি ভি রামন পিল্লাই-এর ঐতিহাসিক উপন্যাস *মর্তণ্ড বর্মা*, (১৮৯১)-য় তার নায়ক আনন্দ পদ্মনাভন-এর মাধ্যমে নায়ারদের লুপ্ত সামরিক গৌরবকে স্মরণের চেষ্টা করা হয়। রামন পিল্লাই ছিলেন ১৮৯১-এর 'মালায়ালী স্মারকলিপি'র মুখ্য সংগঠক। এই স্মারকলিপিতে রাজ্যের চাকরিতে ব্রাহ্মণ-প্রধান্যকে আক্রমণ করা হয়—প্রাথমিকভাবে এটি ছিল নায়ারদের প্রয়াস, যদিও কিছু খ্রীস্টান ও এজাভা তাতে সই দিয়েছিলেন। যখন রামন পিল্লাই-এর গোষ্ঠীকে ১৮৯০-এর দশকের শেষে বেশ সহজেই সরকারি শিরোমণিদের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া গেল, সেই সময়ে কে রামকৃষ্ণ পিল্লাই ও মন্মথ পদ্মনাভ পিল্লাই-এর নেতৃত্বে ১৯০০-র পরে আরও তেজীয়ান

একটি নায়ার নেতৃত্ব উঠে আসে। মন্মথ পদ্মনাভ পিল্লাই ১৯১৪-য় নায়ার সেবা সমিতি-র পত্তন করেন, যা এখনও আছে। জাতপাতগত সাধবাঙ্খার সঙ্গে তাঁরা খানিকটা অভ্যন্তরীণ সমাজ-সংস্কারও যুক্ত করেছিলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত কে রামকৃষ্ণ পিল্লাই *স্বদেশাভিমানী*-র সম্পাদক ছিলেন। দরবারকে আক্রমণ ও রাজনৈতিক অধিকার দাবি করার দরুন তাঁকে ত্রিবান্দ্রুর থেকে বার করে দেওয়া হয়। টি এম নায়ার-এর জাস্টিস আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কিছু যোগাযোগ ছিল, কিন্তু ১৯১৬-য় অকালমৃত্যুর দু-বছর আগে তিনি মালয়ালম ভাষায় প্রথম কার্ল মার্কস-এর জীবনীও প্রকাশ করেছিলেন।

এই ধরনের বহুমুখী কাজকর্ম নায়ারদেরই একচেটিয়া ছিল না। ধর্মীয় নেতা শ্রী নারায়ণ গুরু (আনু. ১৮৫৫-১৯২৮) ও তাঁর অরুবিপুরম্ মন্দিরকে কেন্দ্র করে জাগরণ ঘটছিল এজাভাদের। এরা পরম্পরাগতভাবে নিচু জাতের পাসী ও নারকোল গাছের মালি। নারকোলজাত দ্রব্যের বাজার বাড়ার ফলে, তুলনায় সম্পন্ন একটা অংশ হিসেবে তাঁরা বেড়ে উঠছিলেন। শ্রী নারায়ণ গুরু, এজাভাদের মধ্যে প্রথম স্নাতক ড. পাল্লু এবং মহান মালয়ালি কবি এন কুমারন আসান ১৯০২-০৩-এ স্থাপন করেন শ্রীনারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম্। কুইলনে (জানুয়ারি ১৯০৫) তাদের সংগঠিত সফল শিল্পমেলার পরেই দেখা দিল একের পর এক নায়ার-এজাভা দাঙ্গা। ১৯২০-র দশকে টি কে মাধবনের নেতৃত্বে এই যোগম্ গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তোলেন। আর এজাভাদের পরের প্রজন্ম নির্দ্বিধায় চলে গেলেন কমিউনিস্টদের দিকে। সমাজ সংস্কার (গোড়ার দিকে যার কাজ চলত প্রায়শই জাতি সমিতির মাধ্যমে) থেকে পুরোদস্তুর র‍্যাডিকালিজম-এ দ্রুত উত্তরণ—বাস্তবে এ-ই হয়ে দাঁড়াল কেরল জীবনের এক পুনরাবৃত্ত লক্ষণ : ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদও ১৯২০-র দশকে নাম্বুদ্রি কল্যাণ সমিতি-র সক্রিয় কর্মী হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন।

কিন্তু জাতপাত আন্দোলনের সবচেয়ে আগ্রহজনক দিক ছিল মহারাষ্ট্রের সত্যশোধক সমাজের আন্দোলন। গেল ওমভেট-এর গবেষণা থেকে দেখা যায়, তার দুটি পৃথক ধারা ছিল। প্রথম ধারাটি ছিল অনেকটাই মাদ্রাজের জাস্টিস আন্দোলনের মতো। কোলহাপুরের রাজা শাহু-র (ব্রাহ্মণ সভাসদদের সঙ্গে যাঁর নিজেরই ঝগড়া ছিল) পৃষ্ঠপোষণের ওপর এটি অনেকটাই নির্ভর করত। তার লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত ছিল শিরোমণিদের জন্যে আরও চাকরি ও রাজনৈতিক আনুকূল্য পাওয়ার দিকে। কিন্তু আরও অনেক বেশি জনমুখী ও র‍্যাডিকাল একটি ধারাও ছিল। 'বহুজন সমাজ'-এর নামে 'শেঠজী' ও 'ভাটজী' (ব্রাহ্মণ পুরোহিত, কিন্তু বণিকও বটে, আর সাধারণভাবে ধনীও)-দের বিরুদ্ধে সেটি সোচ্চার হওয়ার দাবি করত। মুকুন্দরাম পাটীল ১৯১০ ইস্তক তাঁর নিজের গ্রাম তারাভিদে থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সত্যশোধক পত্রিকা *দীনমিত্র* বার করতেন। বস্তুত গোটা সত্যশোধক রচনাপত্র ছিল মারাঠি ভাষায়, ইংরিজিতে নয়—এর থেকেই তার জনমুখী চরিত্রটি ভালোভাবে ধরা পড়ে। মুকুন্দরামের মতো নেতাদের পরিচালনায় এই সমাজ মহারাষ্ট্রের ডোকান ও বিদর্ভ-নাগপুর অঞ্চলে এক অনন্য গ্রামীণ ভিত্তি লাভ করেছিল। এই সমাজের ১৯১৭-র বাৎসরিক সম্মিলনে ১৪টি জেলায় ছড়িয়ে থাকা ৪৯টি শাখার প্রতিবেদন পাওয়া যায়। তার মধ্যে কমপক্ষে ৩০টি স্থানীয় সংগঠন ছিল ২০০০-এর কম অধিবাসীর গ্রামে। এই স্তরের উল্লেখযোগ্য দিক ছিল জাতপাতের নিপীড়ন ও সামাজিক ক্রমবিন্যাস বর্জন, চলতি কাঠামোর

মধ্যে উঁচু পদমর্যাদার জন্যে সংস্কৃতায়ন করার দাবি নয়। নিঃসন্দেহে, এর সামাজিক ভিত্তি ছিল মুখ্যত ধনী কৃষকরা, কিন্তু এই পর্বে ব্যাপকভাব উঁচু জাতের মহাজন ও ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে সমগ্র কৃষককুলের কয়েকটি সাধারণ স্বার্থ ছিল। সত্যশোধকদের বার্তা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছিল পরম্পরাগত লোকনাট্য বা 'তামাশা'কে নতুন রূপ দেওয়ার মাধ্যমে (১৯৪০-এর দশকে কমিউনিস্টরা আবার এই পদ্ধতিই ব্যবহার করেছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের ভেতর দিয়ে)। সাতারা-য় (যেখানে এই ধরনের বহু তামাশা দল খুবই সক্রিয় ছিল) ১৯১৯-এ স্থানীয় সত্যশোধক নেতাদের পরিচালনায় এক কৃষক অভ্যুত্থান ঘটে।

আঞ্চলিক ভাবাবেগ ও ভাষা

আমাদের আলোচ্য পর্বে চূড়ান্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল ভষাগত দিক দিয়ে আঞ্চলিক ভাবাবেগের বিকাশ। শিক্ষিত যুবকদের তুলনায় সুবিধাবঞ্চিত গোষ্ঠীগুলির আরও অনেক গভীরে শেকড় চারিয়েছিল, যেহেতু তার যোগ ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় শক্তিশালী সাহিত্যসংস্কৃতি-গত নানা ধারার উদ্ভবের সঙ্গে। ১৯১১ নাগাদই মাদ্রাজের অন্ধ্র জেলাগুলিতে আলাদা প্রদেশের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। গুন্টুর-এর *দেশাভিমানী*-র মতো পত্রিকার মাধ্যমে চাকরির ক্ষেত্রে তেলেগুদের কম প্রতিনিধিত্বের অভিযোগ ওঠে। এই আন্দোলনে তা ইন্ধন জোগায়। আর একে অনুপ্রাণিত করেছিল *অন্ধ্রুলা চরিত্রামু*-র মতো রচনাও। বার্ষিক অন্ধ্র সম্মিলন (পরে এর নাম হয় অন্ধ্র মহাসভা)-এর অনুষ্ঠান হতে থাকে ১৯১৩ থেকে। তার প্রস্তাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহারের দাবিও তোলা হয়। প্রধান সমর্থন এসেছিল কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চল থেকে। এই অঞ্চলে সমৃদ্ধ নগরবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে ব্যাপক কৃষক-স্তরের বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। এর ফলে, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে এখানেই রাজনৈতিক বিক্ষোভের ব্যাপকতর ক্ষেত্র তৈরি হয়। অন্ধ্র-আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন কোন্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়্যা ও পট্টভি সীতারামাইয়্যা-র মতো জাতীয় নেতারা। ১৯১৮-য় কংগ্রেস তার নিজেদের সংগঠনের মধ্যে পৃথক 'অন্ধ্রমণ্ডল'-এর দাবিটি মেনে নিয়েছিল।

ভাষাভিত্তিক রাজ্যের সুস্পষ্ট দাবি তখনও পর্যন্ত উঠেছিল একমাত্র অন্ধ্রেই, তবে নানা ধরনের, কখনও বা পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক প্রবণতাকে লালন করছিল আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশই। আমরা যেমন দেখেছি, সমাজ-সংস্কার ও দেশপ্রেমের শক্তিশালী বাহন হয়ে উঠেছিল মালয়লম। ১৯০৮-এ এজাভা কবি কুমারন আসান লিখেছিলেন : 'মা গো, তোর দাসত্বই তোর নিয়তি! তোর সন্তান আজ জাতের নামে অন্ধ, শুধুই হানাহানি করে নিজেদের মধ্যে / আর মরে ; স্বাধীনতা তবে কিসের জন্যে?' ১৯২০-র দশকে কেরলে গান্ধীপন্থী ভাবধারা প্রচারের মুখ্য শক্তি হয়ে উঠবে ভাল্লাথোল-এর কবিতা। তামিলনাড়ুর ব্রাহ্মণ-বিরোধী আন্দোলনগুলির সঙ্গে মাদুরা, মাদ্রাজ ও অন্যান্য শহরে তামিল সঙ্গম প্রতিষ্ঠার যোগ ছিল। তার ফলে আগ্রহ জেগে উঠল প্রাচীন তামিল ধ্রুপদী সাহিত্যে, আর দক্ষিণের সংস্কৃত-পূর্ব ও অনার্য 'দ্রাবিড়' উত্তরাধিকারের ওপর গুরুত্ব দেওয়া শুরু হলো। রামের বিরুদ্ধে রাবণকে মহিমান্বিত করার জন্যে উল্টে দেওয়া হলো রামায়ণকে। এও কৌতূহলের যে, কখনও কখনও মহারাষ্ট্রেরও সত্যশোধকদের প্রচারের মধ্যে রামের হাতে অস্পৃশ্য শম্বুকের নিধন নিয়েও

বিলাপগীত থাকত, আর সুগ্রীব ও রামের হাতে নিহত বালি-রাজাকে নিয়ে মারাঠা কৃষকদের এক পুরনো অর্চনাকেও তা চালু করেছিল নতুন করে। শিবাজীকে 'শূদ্র রাজা' হিসেবে তুলে ধরে ১৮৬৯-এ ফুলে একটি গাথা রচনা করেছিলেন। তার পর থেকে অব্রাহ্মণরাও শিবাজীর এক ভাবমূর্তি গড়ে তুললেন—টিলক বা রানাডে-র প্রচারের থেকে যা বেশ আলাদা। এ-শিবাজী রামদাসের প্রেরণায় গো-ব্রাহ্মণের রক্ষার উদ্দেশ্যে গোঁড়া মুসলমান-বিরোধী বীর নন, বা ভক্তির মাধ্যমে উঁচু ও নিচু জাতের মধ্যে উদার ঐক্যবিধায়ক নন, বরং জাতপাতের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক যোদ্ধা, পরবর্তী কালে ব্রাহ্মণ্য পেশওয়াদের ক্ষমতা দখলের ফলে যাঁর কাজ ধ্বংস হয়ে যায়।

১৯০৫-এ আঞ্চলিক ভাবাবেগের শক্তির প্রথম স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিল বাঙলা। ১৯১৭-য় ভবানীপুর বক্তৃতায় চিত্তরঞ্জন দাস চেষ্টা করেছিলেন ঐ একই তারে ঘা দিতে : 'বাঙালি হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রীস্টান হতে পারেন, কিন্তু তিনি বাঙালিই থেকে যান।' শিক্ষিত বাঙালির সংস্কৃতি-জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রাধান্য থাকল পূর্বাধিক (বিশেষত ১৯১৩-য় নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর), যদিও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবর্তনা—সাহিত্যে কথ্যরূপের ব্যবহার—তিনি গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু প্রত্যক্ষ সূচনা করেন নি ; ১৯১৫-য় *সবুজপত্র* সাহিত্যগোষ্ঠীই তার পথিকৃৎ। ১৯০৮-এর পর অবশ্য রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি থেকে সরে যান : যে-জাতীয়তাবাদকে তিনি অতিসঙ্কীর্ণ ও পুনরুত্থানবাদী বলে মনে করতেন তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে তিনি এক বিশ্বজনীন মানবতাবাদ প্রচার করেন। তাঁর সমালোচকরা (যেমন, চিত্তরঞ্জন দাস) তাকে কিছুটা অবাস্তব মনে করতেন।

চাকরি ও বৃত্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকার সুবাদে শিক্ষিত বাঙালিরা তাঁদের প্রতিবেশীদের কাছে খুবই অপ্রিয় ছিলেন। বিহারের সচ্চিদানন্দ সিংহ-র নেতৃত্বে কায়স্থ বৃত্তিজীবীরা বিশ্ববিদ্যালয় ও বড় আদালত সমেত একটা নতুন প্রদেশের জন্যে আন্দোলন শুরু করেন। ১৯১১-য় নতুন প্রদেশ বিহার ও ওড়িশা গঠনের সঙ্গে ও পরেও তা চালু থাকে। উত্তর-ভারতের ব্যাপক অংশে উর্দু ছিল তখনও সাহিত্যের প্রধান ভাষা, মুহম্মদ ইকবাল-ই এই পর্বে সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অবশ্য হিন্দু পুনরুত্থানবাদের চাপে হিন্দীর মুখে পড়ে তার অবস্থা ক্রমেই ক্ষীণ হতে থাকে—জনবাদেরপক্ষে তা ছিল কিছুটা লাভের (সীমিত লাভ, কারণ লিখ্য হিন্দী ছিল প্রায়শই খুবই সংস্কৃত-প্রভাবিত ও কৃত্রিমভাবে গঠিত) কিন্তু সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পক্ষে বড় একটা আঘাত। এমনকি প্রেমচন্দও তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেন উর্দূ ভাষাতেই। ১৯১৫-য় তিনি হিন্দীতে লেখার দিকে সরে আসেন, কারণ দেখা গেল উর্দূ লেখা ছাপানো শক্ত। তাঁর গোড়ার দিকের রচনাতেই একটি স্বকীয় রাজনৈতিক সুর ছিল। *সোজ-এ-বতন* (মাতৃভূমির জ্বালা, ১৯০৮) নামক গল্প সঙ্কলনের ভূমিকায় তিনি বঙ্গভঙ্গের কথা উল্লেখ করেন এই বলে যে, এটি 'জনগণের হৃদয়ে জাগিয়ে তুলেছে বিদ্রোহের ভাব'। তাঁর উপন্যাস *জলবাই-এ-ঈসার* (১৯১২)-এর নায়ককে তিনি রূপ দেন বিবেকানন্দ-র আদলে।

এইভাবেই ভারতের সমাজ ও রাজনীতি ছিল জটিলতা ও স্ববিরোধে ভরা। ১৯১৯ থেকে গান্ধীর নেতৃত্বে সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদ এইসব নিচের তলার গভীরেও কমবেশি সফলভাবে নামতে শুরু করবে।

৫

গণজাতীয়তাবাদ—উন্মেষ ও সমস্যাবলি ১৯১৭-২৭

যুদ্ধ, সংস্কার ও সমাজ

মন্টফোর্ড সংস্কার

যুদ্ধ ও তার ঠিক পরের বছরগুলিতে ভারতীয় জীবনে দেখা গিয়েছিল সত্যিই কিছু নাটকীয় পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের তিনটি সর্বস্বীকৃত নির্ণায়ক দিক্‌চিহ্ন হলো : সাংবিধানিক সংস্কার (২০ অগাস্ট ১৯১৭-য় ভারত-সচিব মন্টাগু-র ঘোষণা ও তার পরে ১৯১৮-য় মন্টাগু-চেমসফোর্ড প্রতিবেদন ও ১৯১৯-এ ভারত সরকার আইন), গুণগতভাবে নতুন ধরনের সর্বভারতীয় গণ-জাতীয়তাবাদের নেতা হিসেবে গান্ধীর উত্থান, আর ভারতের ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ দিক্‌পরিবর্তন। এই সব নতুন লক্ষণ ও তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঠিক প্রকৃতি ও তাৎপর্য নিয়ে অবশ্য যথেষ্ট মতভেদ আছে।

মূল ব্রিটিশ সদিচ্ছার জ্বলজ্যান্ত প্রমাণ হিসেবে 'মন্টফোর্ড' সংস্কার নিয়ে উদারনৈতিক-সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতরা মাঝে মাঝে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন। ২০ অগাস্ট হাউস অফ কমন্স-এ মণ্টাগু ঘোষণা করেন যে, এবার থেকে ভারতে ব্রিটিশ নীতির সামগ্রিক লক্ষ্য হবে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভারতে ক্রমে ক্রমে একটি দায়িত্বশীল সরকারের বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে নানান স্বয়ংশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্রমবিকাশ'। খুব বেশি হলে একটি 'প্রতিনিধিমূলক' সরকারের দিকে (নির্বাচিত সাংসদ, এমনকি নির্বাচিত বিভিন্ন সংখ্যাগুরু অংশ, কিন্তু শাসনবিভাগের ওপর তাদের কোনো নিয়ন্ত্রণই থাকবে না)—ব্রিটিশ ভারতীয় এই পুরনো পন্থার থেকে ওপরের নীতিটিকে নিশ্চিতভাবেই পরিষ্কার আলাদা বলে মনে হয়। 'ক্রমে ক্রমে' 'দায়িত্বশীল সরকারে'র বাস্তব রূপদানের সমস্যাটি ১৯১৯-এ প্রাদেশিক স্বাধিকার ও 'দ্বৈত শাসন' ব্যবস্থার কিম্ভুত কৌশল দিয়ে সামলানো হয়। ঐ ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের কিছু কিছু দায়িত্ব (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় সংস্থা) আইন পরিষদের কাছে দায়ী মন্ত্রীদের হাতে পাঠানো হয়, আর অন্যান্য বিষয়কে রাখা হয় 'সংরক্ষিত' করে। মর্লি-মিন্টো সংস্কারের মতো, এই সংস্কারের কাজে লন্ডন না দিল্লী, ভারত-সচিব না বড়লাট—কার কতটা অবদান সে নিয়ে কিছু বিতর্ক দেখা দেয়। সংবাদপত্র মোটের উপর মন্টাগু-র পক্ষেই ছিল। এর পেছনে তাঁর নিজের *ইন্ডিয়ান ডায়রী* (১৯৩০)-র বেশ খানিকটা কৃতিত্ব আছে। এই ডায়েরীতে মন্টাগু নিজেকে হাজির করেছেন ধর্মযোদ্ধাসুলভ সংস্কারক হিসেবে। অবশ্য চেমসফোর্ড-এর হয়ে ওকালতি করতে সম্প্রতি আসরে নেমেছেন পি জি রব।

খুঁটিয়ে দেখলে সংস্কার প্রক্রিয়াকে এমন কিছু অভূতপূর্ব বা সুদূরপ্রসারী বলে মনে হয় না। আমরা আগেই দেখেছি, আর্থিক ক্ষমতার দায়িত্ববণ্টন ও স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত ও পরিচালিত রাজস্বের ওপর স্থানীয় ব্যয়ভার-ন্যাস মেয়ো ও রিপন-এর সময়েই চালু হয়েছিল, আর গোটা ব্যাপারটিকে বিচার করার জন্যে ১৯০৭-এ একটি বিকেন্দ্রীকরণ কমিশন নিয়োগ করা হয়। ২৫ অগাস্ট ১৯১১-এ হার্ডিঞ্জ-এর বার্তায় প্রচ্ছন্নভাবে যুক্তি দেওয়া হয় যে, রাজনৈতিক ছাড়ের পরবর্তী স্তর হওয়া উচিত এক ধরনের প্রাদেশিক স্বয়ত্তশাসন ও স্বশাসিত সরকার, কারণ তার ফলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব ব্রিটিশের হাতে নিরাপদে থাকবে। যে-কোনো ধরনের ভারতীয় স্বশাসিত সরকারের পুরো ধারণাটিকে ভারত-সচিব ক্রিউ যদিও তখন 'আটলান্টিস বা এয়ারহোন-এর মতো সুদূর' একটা কিছু বলে খারিজ করে দেন, তাহলেও যুদ্ধজনিত নানান চাপ ও দুর্বলতার ফলে ব্যাপারটিকে নিয়ে অচিরেই আবার যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করতে হয়। ভারতীয় জনমতের কাছে চেমস্‌ফোর্ড-এর প্রশাসন বেশ কয়েকটি ছাড় দেয়—এগুলিকে মন্টাগু পরে 'মসৃণকারক' বলে অভিহিত করেন। যুদ্ধে ব্যয়বরাদ্দের কারণে তুলোর ওপর আমদানি শুল্ক বাড়াতে হয়। ফলে মার্চ ১৯১৭-য় এই শুল্ক ৩$\frac{১}{২}$ % থেকে বাড়িয়ে ৭$\frac{১}{২}$ % করা হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় সুতিবস্ত্রের ওপর প্রতিকারী উৎপাদনশুল্ক বাড়ানো হয় নি। চুক্তিবদ্ধ শ্রমব্যবস্থায় কুলি রপ্তানির ব্যাপারে ভারতীয় জনমত সর্বদাই ছিল সমালোচনামুখর, আর সামরিক বাহিনীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে সুবিধে হয় তার জন্যে এখন সমরদপ্তরও এই অভিবাসনের ওপর নিষেধাজ্ঞা চাইছিল। ১৯১৭-য় চেম্‌স্‌ফোর্ড এই দাবি তৎক্ষণাৎ মেনে নেন। দ্বিধাগ্রস্ত ভারত-সচিব (অস্টিন চেম্বারলেন)-কে বড়লাটও এই মর্মে [সরকারের] উদ্দেশ্য বিষয়ক একটি সাধারণ বিবৃতি জারি করতে উপরোধ করেন। ১৮মে ১৯১৭-এ বড়লাটের তারবার্তায় হোম রুল আন্দোলন (এই কয়েক মাসে তা পৌঁছেছিল চূড়ান্ত পর্যায়ে, আর সে-কারণে বোম্বাই-এর লাট উইলিংডন-ও এই ধরনের কিছু ঘোষণার উৎসাহী সমর্থক হয়ে ওঠেন) ছাড়াও মার্চ ১৯১৭-য় রাশিয়া-য় জারপন্থী স্বৈরতন্ত্রের উৎখাতের ফলে তার সম্ভাব্য অভিঘাত সম্পর্কে কৌতূহল জাগানোর মতো উল্লেখ করা হয়। জুলাই ১৯১৭-য় মণ্টাগু চেম্বারলেনকে সরিয়ে দেন। তার ফলে যে প্রক্রিয়াটি আগেই অনেকটা এগিয়ে ছিল সেটিই শুধু ত্বরান্বিত হয়। বিভিন্ন লক্ষ্য জানিয়ে বিবৃতি দেওয়ার সপক্ষে ওকালতি করার জন্যে চেমস্‌ফোর্ড-এর দূরদৃষ্টি ও উদারনীতির প্রশংসা করেছেন রব। আরও নিস্পৃহ ঐতিহাসিকরা মনে করতে পারেন যে, ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই ধরনের একটি ঘোষণা পছন্দই হতো, কারণ এটি কোনোরকম সুনির্দিষ্ট আশু ব্যবস্থা নেওয়ার মধ্যে না গিয়ে একটা অস্পষ্ট ও সাধারণ প্রতিশ্রুতি ঝুলিয়ে রাখত।

২৪ নভেম্বর ১৯১৬-য় ভারত সরকারের শাসনপত্রে সুনির্দিষ্ট সংস্কারের ক্ষেত্রে শুধুই প্রদেশগুলিতে নির্বাচিত সংখ্যাগুরুর কথা ভাবা হয়েছিল, শাসনবিভাগীয় কোনোরকম দায়িত্বের কথা ভাবা হয় নি। কিন্তু ক্রমেই আরও বেশি করে বোঝা গিয়েছিল যে, মর্লি-মিন্টো বিকাশধারাকে এইভাবে প্রসারিত করলে বিভিন্ন কাউন্সিলে শক্তিশালী ও স্থায়ী বিরোধীপক্ষের সৃষ্টি হবে এবং ভারতীয় সহযোগীর সংখ্যা বাড়বে না। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল লন্ডন-এর পত্রিকা 'গোল টেবিল'-কে কেন্দ্র করে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠী (লায়োনেল কার্টিস, ফিলিপ-কের, উইলিয়াম ডিউক, ও অন্যেরা)। এই গোষ্ঠীটি মনে করত : নির্বাচিত বেসরকারি

ব্যক্তিদের খানিকটা শাসনবিভাগীয় দায়িত্ব না দিয়ে আরও বেশি ক্ষমতা দিলে পরিণামে বিপর্যয় ঘটবে। প্রদেশগুলির জন্যে তাঁরা দ্বৈতশাসনের ধারণা হাজির করেন।

১৯১৯-এর ভারত সরকার আইনে কেন্দ্রে দ্বি-কক্ষ-বিশিষ্ট ব্যবস্থা খাড়া করা হয় (নির্বাচিত সংখ্যাগুরুদের রাজ্য কাউন্সিল ও আইনসভা, কিন্তু মন্ত্রীদের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না ও সেই সঙ্গে বড়লাটের ভেটো ও খারিজ বিলকে ঠেলে পাস করানোর জন্যে 'সার্টিফিকেট' পদ্ধতি)। এই আইনে নির্বাচকদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়ে প্রদেশগুলিতে ৫৫ লক্ষ ও সাম্রাজ্য-পরিষদের ক্ষেত্রে ১৫ লক্ষ করা হয়। মৌলিক উদ্ভাবন—দ্বৈতশাসন—শুধু কম রাজনৈতিক গুরুত্বের ও অল্প তহবিলের বিভাগগুলিকে প্রাদেশিক আইনসভার কাছে দায়ী মন্ত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়, আর ভারতীয় রাজনীতিকদের সুকৌশলে টেনে আনা হয় পৃষ্ঠপোষণের প্রাণপণ প্রতিযোগিতায়। ঐ মন্ত্রীরা সম্ভবত এতে হতমানও হতেন, কারণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও বিভিন্ন স্থানীয় সংস্থায় প্রকৃত উন্নতির জন্যে ব্রিটিশরা এইসব শাখায় যা টাকা বরাদ্দ করতে রাজি হতো তার চেয়ে অনেক বেশি টাকার দরকার ছিল। আরও অপরিহার্য বিভাগগুলি, যেমন আইন-শৃঙ্খলা বা অর্থবিভাগ থাকে সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণে, আর প্রাদেশিক লাটদেরও ভেটো ও সার্টিফিকেট ক্ষমতা ছিল। রাজস্ব সম্পদকে ভাগ করে দেওয়া হয় কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে। যেমন, ভূমিরাজস্ব যায় প্রদেশগুলোর হাতে, আয়কর থাকে ভারত সরকারের কাছে। মন্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড প্রতিবেদনে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী নিয়ে কিছু তাত্ত্বিক সমালোচনা করা হলেও সম্প্রদায়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব ও সংরক্ষণকে কার্যত শুধু বজায় রাখাই হয় নি, যথেষ্ট বাড়ানোও হয়েছিল। মাদ্রাজে জাস্টিস দলের অব্রাহ্মণদের জন্যে সংরক্ষণের দাবিকে ব্রিটিশরা এত অনায়াসে মেনে নেয় যা সন্দেহজনক।

১৯১৯-এর সংস্কার সম্পর্কে এই কম বিমুগ্ধ দৃষ্টির বিকাশে যথেষ্ট অবদান রেখেছে সাম্প্রতিক কেমব্রিজ ইতিহাস-রচনা। সংস্কারগুলিকে যুক্ত করা হয়েছে আর্থিক দায়িত্ববন্টন ও বিস্তৃততর ভারতীয় সহযোগী চক্রের প্রয়োজনীয়তা—সাম্রাজ্য রক্ষার এই যুগ্ম চাহিদার সঙ্গে। কিন্তু সংস্কার ও গণ-রাজনীতির উন্মেষের মধ্যে সরাসরি কার্যকারণ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করার যে চেষ্টা মাঝেমাঝে তাঁরা করেন তা অবশ্য বেশি বিতর্কিত। যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে, ১৯১৯-এর আইন নির্বাচকমন্ডলীকে বিস্তৃত করেছিল আর রাজনীতিকরা তাই আরও বেশি গণতান্ত্রিক চালচলন রপ্ত করতে বাধ্য হন। অন্যক্ষেত্রেও যেমন হয়, তেমনি এখানেও কেমব্রিজ ভাষ্যটি ভুল নয়। কিন্তু তা প্রচন্ড অসম্পূর্ণ। এর মাধ্যমে কয়েক ধরনের রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ভালোই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর প্রবল গণজাগরণের মূল বিষয়টিকে নয়। মাদ্রাজের জাস্টিস দল বা মহারাষ্ট্রের অব্রাহ্মণ ও (কিছু পরে) 'অবনত শ্রেণী'র আন্দোলন নিঃসন্দেহে বিরাটভাবে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল বিশেষ সংরক্ষণের বাস্তবতা বা সম্ভাবনার ফলেই। এমনকি জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও মালবীয়-র ভাবশিষ্য ইন্দ্রনারায়ণ দ্বিবেদী এলাহাবাদ হোম রুল লীগের তহবিল নিয়ে ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-য় একটি যুক্ত প্রদেশ কিসান সভা-র পত্তন করেন। সেটি যে নির্বাচনী অভিসন্ধি নিয়েই করা হয় তা বেশ প্রকট। আর অনেক পরে, জুন ১৯২৮-এও কিসানদের মধ্যে জওহরলালের ঘোরাঘুরিকে তাঁর বাবা স্বাগত জানিয়েছিলেন, কারণ এতে ছেলের ভোট জেতার সম্ভাবনা বাড়বে। এসব সত্ত্বেও এই যুক্ত প্রদেশেই প্রত্যয় জাগানোর মতো

একটি পাল্টা দৃষ্টান্তও দেখা যায়। তা হলো ১৯২০-তে বাবা রামচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতাপগড় ও রায় বেরেলী-তে গোড়ায় বেশ স্বপরিচালিত মাটিঘেঁষা কিসান সভার উদ্ভব। গান্ধীর নেতৃত্বে ভারতীয় রাজনীতিকদের সবচেয়ে বড় অংশটি অবশ্য কয়েক বছর ধরে নির্বাচন বর্জন করেছিলেন; আর ১৯১৯-২২-এর বিশাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উত্থানকে খুব বেশি হলে প্রাপ্তবয়স্কদের এক থেকে তিন শতাংশের মধ্যে ভোটাধিকারের নগণ্য প্রসার বলে ব্যাখ্যা করা যায় না, নিঃসন্দেহে তা এর চেয়ে অনেক বড় ব্যাপার।

যুদ্ধের অভিঘাত

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আর্থনীতিক ও সামাজিক পরিণাম ছিল অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে অসংখ্য দ্বন্দ্ব চোখের সামনে আসে ও তীব্র হয়ে ওঠে। আগের একটি অধ্যায়ে ইতোমধ্যেই সে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে—সম্পদ নির্গম, হস্তশিল্পের অবনতি, রাজস্বের চাপ ও দেশীয় পুঁজিবাদী বৃদ্ধির পথে নানান বাধা। আরও নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, যেসব দিক দিয়ে যুদ্ধ ভারতীয় জনজীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল সেগুলো হলো: বিশালমাত্রায় সৈন্য সংগ্রহ, করের বোঝা ও যুদ্ধঋণ, আর তীব্র মূল্যবৃদ্ধি। জাতীয় আন্দোলনের দ্বিমুখী প্রসারের সঙ্গে এই যুদ্ধ হয়তো সরাসরিভাবে সম্পর্কিত ছিল। এই দুটি ধারার প্রথমটি হলো কৃষক-সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশের, অন্যটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর অভিমুখে। ধারাদুটি অচিরেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল গান্ধীর নেতৃত্বে আসার পরে। তাই দুটি ক্ষেত্রেই—ও সেই সঙ্গে শিল্পশ্রমিকদের ক্ষেত্রেও, যাঁরা ঠিক যুদ্ধের পরের বছরগুলিতেই জাতীয় পটভূমিতে দর্শনীয়ভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন—যে ব্যাপারটি বারবারই দেখা যায় তা হলো উত্তরোত্তর অভিযোগের সঙ্গে শক্তি বা আশার নতুন নতুন মেজাজের সংমিশ্রণ: সম্ভাব্য বৈপ্লবিক পরিস্থিতির চিরায়ত ঐতিহাসিক সূত্র। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ করতে হবে যে, এই যুদ্ধ ভারতীয় জনগণের নানান অংশকে বিভিন্ন ও মাঝে মাঝে এমনকি উল্টোভাবেও প্রভাবিত করেছিল, আর একই সঙ্গে তীব্র করে তুলেছিল ভারতীয় সমাজের মধ্যেকার টানাপোড়েনকেও।

যুদ্ধের বছরগুলিতে 'সম্পদ' নির্গমের'র অর্থ দাঁড়ায় ভারতীয় মানব ও বস্তু-সম্পদের বিশাল লুঠ। ভারতীয় সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়ে ১২ লক্ষে দাঁড় করানো হয়, আর হাজার হাজার ভারতীয়কে সামরিক অভিযানে মরতে পাঠানো হয় পুরোপুরি বিজাতীয় এক উদ্দেশ্যে। এই অভিযানগুলি প্রায়ই পরিচালিত হয়েছিল অযোগ্যভাবে (যেমন, পশ্চিম রণাঙ্গনের কয়েকটি আক্রমণে বা মেসোপটেমিয়া-য় যেখানে ১৯১৬-য় একটি পয়লাশ্রেণীর কেলেঙ্কারী হওয়ার ফলে অস্টিন চেম্বারলেন পদত্যাগ করতে বাধ্য হন)। তাত্ত্বিকভাবে স্বেচ্ছা-যোগদান প্রায়শই হয়ে দাঁড়ায় বাধ্য হওয়ারই সামিল। এই ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় ছিল ছোটোলাট মাইকেল ও'ডায়ার-এর পাঞ্জাবে। এখানে ১৯১৯-এর গণ্ডগোলের পর কংগ্রেসের তদন্তের ফলে লম্বরদার (গ্রামপ্রধান)-এর মাধ্যমে বলপ্রয়োগের অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পাঞ্জাব থেকে কম করেও ৩৫৫,০০০ জনকে নেওয়া হয় এবং অগাস্ট ১৯১৮-য় ও'ডায়ার গর্ব করেন যে, গুজরানওয়ালা জেলায়—রাউলাট আইন নিয়ে গোলযোগের সময় এই জেলাটি বিশেষভাবে জঙ্গী হয়ে উঠেছিল—ঠিক এক বছরে সৈন্য ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির অনুপাত ১ : ১৫০ থেকে

জোর করে বাড়িয়ে ১ : ৪৪-এ নিয়ে আসা হয়েছে। সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল নিংড়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ১০ জানুয়ারি ১৯১৯-এ মন্টাগু-কে বোম্বাই-এর লাট লয়েড-এর নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত মন্তব্যটি বোধের সহায় : 'সমরদপ্তর বিপুল পরিমাণে দামী পশুখাদ্য এখান থেকে মেসোপটেমিয়া-য় রপ্তানি করছে।...সৌভাগ্যের বিষয় হর্নিম্যান প্রেস [বি জি হর্নিম্যান-সম্পাদিত জাতীয়তাবাদী *বোম্বাই ক্রনিকল*-এর উল্লেখ] ধরতে পারে নি যে, দাক্ষিণাত্য যখন অনাহারে আছে পশুখাদ্য রপ্তানি করা হয়েছে সেইসময়ে' (এ ডি ডি গর্ডন, *বিজনেসমেন : অ্যান্ড পলিটিক্স : রাইজিং ন্যাশনালিজম অ্যান্ড এ ম্যার্ডানাইজিং ইকনমি ইন বোম্বাই*, ১৯১৮-১৯৩৩, দিল্লী, ১৯৭৮, পৃ. ৩৩-৪-এ উদ্ধৃত)।

প্রতিরক্ষা খাতে ৩০০% ব্যয়বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী অর্থ শুধু যুদ্ধ-ঋণ নয়। (আবারও, যা মাঝেমাঝেই প্রায় বাধ্যতামূলক), সেইসঙ্গে তীব্র করবৃদ্ধি ও বস্তুত পুরো আর্থিক কাঠামোয় নানান তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন। ভূমিরাজস্ব প্রধান বোঝা হয়ে থাকলেও (যার ফলে ভারতে গান্ধীর অভিযানের ইন্ধন জোগানো হয়, অর্থাৎ ১৯১৮-র খেড়া সত্যাগ্রহ) সাধারণভাবে ভূমিকর এবার যেসব নিয়মকানুনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয় তাতে সাময়িক আবাদী এলাকায় একমাত্র ৩০ বছর ব্যবধানে কর বাড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয় এবং যে-শ্রেণী সৈন্য-নিযুক্তির বড় অংশ সরবরাহ করছে, ব্রিটিশরাও আর তাকে বেশি বিচ্ছিন্ন করার ঝুঁকি নিতে পারে নি। তাই প্রথম বাণিজ্য ও শিল্পের ওপর খাঁড়ার ঘা দিতেই হলো। ১৯১৩-১৪ ও ১৯২০-২১-এর মধ্যে ভারত সরকারের মোট রাজস্বে সীমাশুল্কের ভাগ ৮.৯ % থেকে বেড়ে ১৪.৮% হয়। আমরা আগেই দেখেছি, ১৯১৭-য় সুতির কাপড়ের ওপর ৭$\frac{১}{২}$% । আমদানি শুল্ক বসানোর ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করতে হয়েছিল ল্যাঙ্কাশায়ার-এর প্রতিবাদ। আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হলো আয়করের নতুন গুরুত্ব। ১৯১১-১২-য় এই খাতে আদায় ছিল মোট রাজস্বের মাত্র ২% , কিন্তু ১৯১৯-২০-তে তা দাঁড়ায় ১১.৭৫% ১৯১৭-১৮-য় সর্বপ্রথম ব্যক্তিপিছু দাখিল দাবি করা হয়, ও তার ফলে যেসব ভারতীয় ব্যবসাদার সনাতন ব্যবসাপ্রথা মেনে চলতেন তাঁদের একটা বড় অংশকে জালে টেনে আনা সম্ভব হয়। ঐ একই বছরে কম্পানি ও অবিভক্ত হিন্দু ব্যবসায়ী পরিবার—দুই-এরই ওপর চাপানো হয় এক অতিকর, আর ১৯১৯-এ সাময়িকভাবে চাপে অতিরিক্ত লাভ-শুল্ক।

যুদ্ধব্যয় ও পরিবহণে অচলাবস্থা ও বিপত্তির (যেমন, অসামরিক প্রয়োজনে জাহাজের স্থান-সঙ্কুলান প্রচণ্ড কমে যাওয়ায় আমদানিতে ভাঁটা পড়ে) ফলে বড় রকমে দাম বাড়ে। দাম নিয়ে একটি সরকারি পরিসংখ্যান-সারাংশে নিচের সর্বভারতীয় সূচক-সংখ্যা পওয়া যায় : (১৮৭৩ = ১০০)

১৯১৩	১৯১৪	১৯১৫	১৯১৬	১৯১৭	১৯১৮	১৯১৯	১৯২০	১৯২১	১৯২২	১৯২৩
১৪৩	১৪৭	১৫২	১৮৪	১৯৬	২২৫	২৭৬	২৮১	২৩৬	২৩২	২১৫

(জুডিথ ব্রাউন, *গান্ধী'জ রাইজ টু পাওয়ার* ১৯১৫-১৯২২, পৃ. ১২৫)

দামের এই সার্বিক বৃদ্ধির চেয়ে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ তার প্রভেদমূলক চরিত্র। যুদ্ধের দাবিতে শিল্পজাত জিনিসের দাম ফেঁপে ওঠে এবং বিদেশে তৈরি জিনিসের দামও প্রচণ্ড বেড়ে যায়, কারণ পণ্যসামগ্রী রাখার স্থানাভাব ও ইওরোপীয় শিল্পগুলিকে সামরিক প্রয়োজনমুখী করার সরবরাহ কমে যায়। কিন্তু বিশ্বব্যাপী আর্থনীতিক সম্পর্কের অব্যবস্থার ফলে ভারতীয় কৃষিজ

পণ্যের (বিশেষভাবে কাঁচা পাট) রপ্তানী-দাম ঐ একই অনুপাতে বাড়ে নি। অতএব, দৃষ্টান্ত হিসেবে ১৯১৭-য় চম্পারনের কোনো কৃষক দেখতেন যে, তাঁকে জামাকাপড়, নুন বা কেরোসিনের জন্যে অনেক বেশি খরচ করতে হচ্ছে, কিন্তু তাঁর জেলার কৃষিজ রপ্তানিসামগ্রী, যেমন নীল বা চালের দাম ঐ একই অনুপাতে বাড়ার মতো কিছু হচ্ছে না। ফলত, যেসব সম্পন্ন কৃষকগোষ্ঠী উৎপাদন করতেন বাজারের জন্যে, তাঁরা বাণিজ্য বনাম কৃষির সম্পর্কের হেরফেরে ক্ষতিগ্রস্ত হন। তুলনায় গরিব চাষী বা ভূমিহীন শ্রমিক, যাঁদের নিজেদের খাবারের বেশির ভাগটাই কিনতে হতো, তাঁরা আবার অন্য এক ধরনের প্রভেদের ফলে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছিলেন। তার একটা দীর্ঘমেয়াদি ঝোঁক ছিল—উঁচু-জাতের শস্য, যেমন, চাল বা গমের চেয়ে গরিবদের খাদ্যের প্রধান উপাদান, মোটাদানার শস্যের দাম আরও বেশি বাড়ার ঝোঁক দেখা যায় (যদিও গমের দাম আক্রাই থেকে যায়)। এই ঝোঁকটি পরিষ্কারভাবেই বাণিজ্যিক রূপায়ণের সঙ্গে জড়িত ছিল,যার ফলে একর-পিছু উঁচু দামের শস্য চাষের দিকে সরে আসায় উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। গোড়ার দিকের অন্য একটি গান্ধীপন্থী ঘাঁটিকে আবার দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যায়। ১৮৭৩ = ১০০ ধরনে আহ্‌মেদাবাদ জেলায় ১৯১৪-য় ও ১৯১৮-য় গমের দাম ছিল যথাক্রমে ১৬৬ ও ২৫৯, বাজরার দাম ২২০ ও ৪১০। যুক্ত প্রদেশের দামের পরিসংখ্যান থেকে অনুরূপ ছবিই ফুটে ওঠে ঃ ১৮৬১-৬৫ ও ১৯১৭-২১-এর মধ্যে গমের দাম বেড়েছিল ২৫০%, কিন্তু বার্লি ৩০০% ও অড়হর ৪০০%।

অধিকাংশ ভারতীয় জনগণের কাছে যুদ্ধের অর্থ ছিল দুর্দশা ও জীবনযাত্রার মান পড়ে যাওয়া (যেমন, সুতির থানের ভোগ্যমাত্রা ১৯১৩-১৪-র ৫১০২০ লক্ষ গজ থেকে ১৯১৯-২০-তে ২৮৯৯০ লক্ষ গজে এসে দাঁড়ায়)। তাহলেও যুদ্ধের চাহিদা (যেমন, উর্দির কাপড়), বিদেশী প্রতিযোগিতার হ্রাস, কৃষিজ কাঁচামাল (কাঁচা পাট বা কাঁচা তুলো) ও শিল্পজাত জিনিসের মধ্যে দামের প্রভেদ ও প্রকৃত মজুরির অচলাবস্থা বা হ্রাস ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ীগোষ্ঠী যুদ্ধের দরুন অকল্পনীয় মুনাফা করে, অত্যধিক ডিভিডেন্ড-এর ফলে এই অতি-মুনাফা খানিকটা ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু একটি সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র যুদ্ধোত্তর তেজি পর্বে (১৯১৯-২০ থেকে ১৯২১-২২) এই মুনাফার দৌলতে তবু বেশ খানিকটা শিল্পোদ্যোগের প্রসার সম্ভব হয়। পূর্ব-ভারতে এই সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করেছিলেন প্রধানত ব্রিটিশ পাট-চূড়ামণিরাই। ইওরোপের চাহিদা ছেঁটে দেওয়ার ফলে যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে কাঁচা পাটের দাম মারাত্মকভাবে পড়ে যায়, যুদ্ধের প্রয়োজনে পাটজাত জিনিসের (যেমন, বালির বস্তা বা ক্যানভাস) দাম চড়চড় করে বেড়ে যায়, আর পাটকলগুলোর নিট মুনাফা (সুদ বাদে) ও নিয়োজিত পুঁজির অনুপাত অনেক চড়ে যায়—১৯১৬-য় ৭৫-এর মতো। পাট ব্যবসায় ফাটকাবাজি করে কলকাতা-আবাসী মারোয়াড়ি ব্যবসাদারদের একটা উঠতি গোষ্ঠীও এই বছরগুলোয় যথেষ্ট সম্পদ সঞ্চয় করে। আর যুদ্ধের ঠিক পরেই কলকাতার কাছে প্রথম ভারতীয় মালিকানাধীন পাটকল চালু করবেন জি ডি বিড়লা ও স্বরূপচন্দ হুকুমচন্দ। কিন্তু সত্যিকারের চূড়ান্ত পরিবর্তন এসেছিল বোম্বাই ও আহ্‌মেদাবাদের সুতিবস্ত্র শিল্পে। ল্যাঙ্কাশায়ার-এর প্রতিযোগিতা এখানে দুর্বল হওয়ার ফলে ভারতীয় পুঁজিবাদ সত্যিই বাঁধ ভেঙে এগিয়ে যায়। সরকারের আর্থিক প্রয়োজনে খানিকটা রাজকোষঘটিত রক্ষাব্যবস্থা (১৯১৭-য় ৭$\frac{1}{2}$% আমদানি

শুল্ক, ভারতীয় সুতিবস্ত্রের ওপর ৩½% অন্তঃশুল্কে কোনো পরিবর্তন হয় নি), থান ও সুতো আমদানির প্রচণ্ড হ্রাস, ভারতীয় কাপড়ের কলে উৎপাদন বৃদ্ধি, তাঁতশিল্পের অবনতি (আমদানি করা বোনা সুতোর চড়া দাম ও ভারতীয় কারখানার প্রতিযোগিতা—দু-এর ফলেই এই শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়) এবং ভারতীয় বাজারে জাপানি সুতিদ্রব্যের আক্রমণের সূচনা—ভাবী সমস্যাবলির সঙ্কেত—এগুলো দেখা দেয় যুদ্ধের ফলেই। এইসব প্রবণতাকে বোঝার জন্যে অমিয় বাগচী নিচের এই পরিসংখ্যান দিয়েছেন (*প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ২২৬-৭, ২৩৮)

(সব সংখ্যাই লক্ষ গজের হিসেবে)

	ব্রিটেন থেকে আমদানি করা সুতির থান	জাপান থেকে আমদানি করা সুতির থান	ভারতীয় তাঁতে সুতির থানের উৎপাদন	ভারতীয় কলে সুতির থানের উৎপাদন
১৯১৩-১৪	৩১০৪০	৯০	১০১৮৮	১১৭১১
১৯১৪-১৫	২৩৭৮০	১৬০	১১৩৬০	১১৭৫৯
১৯১৫-১৬	২০৪৯০	৩৯০	৯৪৩২	১৪৯৬১
১৯১৬-১৭	১৭৮৬০	১০০০	৬৪৫৬	১৬০৩১
১৯১৭-১৮	১৪৩০০	৯৫০	৭৪১২	১৬১৫৬
১৯১৮-১৯	৮৬৭০	২৩৮০	৮৯০০	১৪৮১৮
১৯১৯-২০	৯৭৬০	৭৬০	৫০৬০	১৬৩০০
১৯২০-২১	১২৯২০	১৭০০	৯৩১২	১৫৬৩১
১৯২১-২২	৯৫৫০	৯০০	৯৩৮০	১৭১৬০
১৯২২-২৩	১৪৫৩০	১০৮০	১০৮৪০	১৭২০৮

এইভাবে ভারতীয় কলের উৎপাদন ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে আমদানিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল—এ এক চূড়ান্ত পরিবর্তন, যাকে আর উল্টো দিকে ফেরানো যায় নি।

আর্থিক চাহিদা (যার ফলে আমদানি শুল্ক বেড়ে যায়) ও রাজনীতির দিক দিয়ে অন্তত খানিকটা আর্থনীতিক স্বনির্ভরতার প্রয়োজনের উপলব্ধি—এই দু-এর মিলিত কারণে যুদ্ধের বছরগুলোয় ভারতীয় শিল্পবিকাশ বিষয়ে ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারি নীতির কিছুটা দিক্‌পরিবর্তন হয়। ১৯১৬-য় টমাস হল্যান্ড-এর অধীনে একটি ভারতীয় শিল্প কমিশন বসানো হয়, আর মন্টফোর্ড প্রতিবেদনের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল 'রাজকোষ স্বাধিকার কনভেনশন'। এটি ছিল এক যৌথ সংসদীয় কমিটির সুপারিশ। এতে বলা হয়, ভারত সরকার ও নতুন আইনসভার মধ্যে যতদিন অবধি মতৈক্য থাকবে ততদিন লন্ডন যেন রাজকোষঘটিত বিভিন্ন ভারতীয় সিদ্ধান্তকে খারিজ না করে। এইসব ঘটনায় অবশ্যই পূর্বতন ব্রিটিশ নীতির খানিকটা হেরফের সূচিত হয়। আলফ্রেড চ্যাটারটন (মাদ্রাজের জনৈক বিরল উদ্যোগী সিভিলিয়ান যিনি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অ্যালুমিনিয়াম ও ক্রোম ট্যানিং শিল্পে উন্নতি করার চেষ্টা করছিলেন) যে-প্রচেষ্টা করছিলেন, বেআক্রুভাবে অবাধ বাণিজ্য নীতির বিঘোষণা করে একটি 'নোট' মারফত ১৯১০-এ মর্লি তা রুখে দেন। এই পরিবর্তনের তাৎপর্যের ওপর অতিগুরুত্ব দেওয়াটা অবশ্য অনৈতিহাসিক হবে। মাইশোর রাজ্যের শিল্প বিভাগের প্রধান হিসেবে চ্যাটারটন-এর পরবর্তী কর্মজীবন থেকে দেখা যায়, তিনি

খুব বেশি হলে কিছু লঘুশিল্পের (যেমন, মাইশোরের চন্দন তেল ও সাবান) উন্নতির চেষ্টা করছিলেন। এর ফলে সম্পূর্ণ নির্ভরতাভিত্তিক গোটা কাঠামোটিতে কোনো মৌলিক ইতরবিশেষ হতো না। উল্টোদিকে মাইশোরের অসাধারণ দেওয়ান, বিশ্বেশ্বরায়া (১৯১১-১৮) তাঁর প্রচণ্ড উচ্চাশী প্রকল্প, কৃষ্ণরাজ সাগর বাঁধ ও ভদ্রাবতী লৌহ শিল্পের মাধ্যমে সর্বাত্মক পরিবর্তনের মতো কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন—১৯১৮-য় তাঁকে দেওয়ানের পদ ছাড়তে বাধ্য করায় ব্রিটিশরা লক্ষণীয় ভূমিকা নিয়েছিল। অতিপ্রশংসিত রাজকোষ স্বাধিকার কনভেনশন-এর ক্ষেত্রে বড়লাট ও আইনসভার মধ্যে মতৈক্যের শর্তটির ফলে তার মূল্য অনেকখানিই হারিয়ে যায়, কারণ সবশেষে, বড়লাট ছিলেন একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা।

ভারতীয় পুঁজিবাদের নতুন শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশব্যাপী যোগাযোগের উন্নতি (বিশেষভাবে মারোয়াড়িদের মধ্যে) আর যুদ্ধ-কর ও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে টাকা-স্টার্লিং বিনিময় হারের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি বিষয়ে পুঞ্জীভূত অভিযোগ-বোধ। বোম্বাই-এর উদীয়মান জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ভুলাভাই দেসাই সেপ্টেম্বর ১৯১৮-য় বাধ্যতামূলক আয়কর দাখিলের বিরুদ্ধে আরজি সংগঠিত করেন। যেসব খুদে ব্যবসায়ী সনাতন ব্যবসায়ী প্রথা অনুসরণ করতেন তাঁদের কাছে এই দাখিলের ব্যাপারটি বিশেষ করে বিরক্তিকর হয়ে উঠছিল। বিনিময়-হারে মাত্রাছাড়া ওঠা-পড়া হতে থাকে—ডিসেম্বর ১৯১৯-এ এটি বেড়ে হয় ২ শি. ৪ পে. আর ১৯২৬-এ হিল্টন-ইয়ং কমিশন এই হার ১ শি. ৬ পে.-এ বেঁধে দেওয়ার আগে ১৯২১-এর গোড়ার দিকে এটি নেমে আসে ১ শি.-এ। বিনিময় হার উঁচু রাখার জন্যে ব্রিটিশরা বারবার চেষ্টা করে, কারণ তাহলে হোম ব্যয় খাতে সরকারের স্টার্লিং খরচ কমে যেত, যেসব ইংরেজ অবসর-ভাতা বা মুনাফা দেশে পাঠাতে আগ্রহী ছিলেন তাঁরা লাভবান হতেন, আর দাম কমে গেলে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর মাল আমদানিতে উৎসাহ জোগানো যেত। উল্টোদিকে পুরো ১৯২০-র ও ১৯৩০-এর দশক জুড়ে ভারতীয় ব্যবসাদার গোষ্ঠী নাছোড়বান্দাভাবে আরও কম হার, ১ শি. ৪ পে.-এর দাবি করতে থাকেন, যাতে আমদানি খরচ আর ভারতীয় সুতিদ্রব্য ও কৃষিজ কাঁচা মালের দাম কমে গিয়ে রপ্তানি বেড়ে যায়। ১৯১৯-২১-এর স্বল্পকালীন প্রসঙ্গসূত্রে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর জিনিসপত্রের ভারতীয় আমদানিকারীরাও বিনিময় হারের ওঠা-নামাতে আপত্তি করেন, কারণ এর ফলে ব্রিটিশ রপ্তানিকারী প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে চুক্তি বজায় রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছিল—ডিসেম্বর ১৯২০-র নাগপুর কংগ্রেসে এ-বিষয়ে একটি বিশেষ প্রস্তাব পাশ করতে হয়।

অতএব, বৃহত্তর ব্যবসায়ী স্বার্থ ও জাতীয়তাবাদের সঙ্গে যোগ ছিল ঘটনার যুক্তিসূত্রে গাঁথা। আমরা পরে দেখব, গোড়া থেকেই এটি গান্ধীপন্থী আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট হবে। আহ্‌মেদাবাদের মিল-মালিক অম্বালাল সারাভাই-এর কাছ থেকে সাবরমতী আশ্রম (১৯১৫) তাই মোটা আর্থিক সমর্থন পায়, মার্চ ১৯১৯-এ গান্ধীর সত্যাগ্রহ শপথের সময় বোম্বাই শহরের ৬৮০ জন স্বাক্ষরকারীর মধ্যে ৭৪% ছিলেন ব্যবসাদার, ১৯২১-এ টিলক স্বরাজ তহবিলের জন্য সংগৃহীত ১ কোটি টাকার মধ্যে বোম্বাই-এর অবদান ছিল কম করেও ৩৭$\frac{1}{2}$ লাখ। ব্রিটিশ জিনিসের বরাত না-দেওয়ার জন্যে ভারতীয় ব্যবসাদারদের সম্মিলিত শপথ হয়ে দাঁড়ায় বয়কটের এক প্রধান রূপ (স্বদেশীযুগের বাঙলার ঠিক উল্টো)। তাহলেও ব্যবসাদারদের সমর্থন দোলাচলগ্রস্তই থেকে যায়, তার চেহারাও এক থাকে নি। এখন খালি লক্ষ্য করা দরকার যে,

বড় শিল্পপতিদের চেয়ে খুদে ও মাঝারি বণিকরা আরও বেশি জাতীয়তাবাদের সমর্থক হওয়ার ঝোঁক দেখিয়েছিলেন (১৯২১-২২-এ, আবার আইন অমান্য আন্দোলনেও)। অতএব, ১৯১৮ থেকে ১৯৩৩-এর মধ্যে বোম্বাইয়ের ব্যবসা-জগৎ নিয়ে এ ডি গর্ডন-এর সাম্প্রতিক অণু-সন্ধানে ঠিক যুদ্ধোত্তর বছরগুলিতে কাঁচা তুলোর দাম নিয়ন্ত্রণ ও কমানোর জন্যে মিল-মালিক ও তুলো রপ্তানিকারীদের তরফে সরকারি যোগাযোগকে কাজে লাগানোর এক জটিল বিন্যাস বেরিয়ে আসে। সুতো রপ্তানিতে বণিক চূড়ামণি পুরুযোত্তমদাস ঠাকুরদাসের যথেষ্ট স্বার্থ জড়িয়ে ছিল। তিনি যখন অসহযোগ-বিরোধী সমিতি করছিলেন (১৯২০-২১) তখন যেসব 'মার্কেটিয়ার' বা পরম্পরাগত ব্যবসায়ী বোম্বাই শহরে কাঁচা সুতো আনতেন, তাঁরা জাতীয়তাবাদকেই সমর্থন করে তাঁদের অসন্তোষ আংশিকভাবে প্রকাশ করছিলেন।

বেশির ভাগ বড় শিল্পপতির রাজভক্তির সঙ্গে শ্রমিক অশান্তির বিরুদ্ধে তাঁদের রাষ্ট্রীয় সমর্থনের প্রয়োজনীয়তাকে যুক্ত করা যায়। ইতোমধ্যে শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছিল। সংগঠিত শিল্পে ও বাগিচায় নিযুক্তের সংখ্যা ১৯১১-য় ২,১০৫,৮২৪ থেকে বেড়ে ১৯২১-এ ২,৬৮১,১২৫-এ দাঁড়ায়, চড়া দাম ও নিয়োগকর্তাদের অতি-মুনাফার পর্বে মজুরি বাড়ে নি, আর ঠিক যুদ্ধোত্তর পর্বের বছরগুলিতে আপেক্ষিকভাবে শ্রমিক ঘাটতি পড়ে (এর কারণ ঃ এমন একটা সময়ে শিল্পের দ্রুত বিস্তার হচ্ছিল যখন ১৯১৯-এর ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির প্রকোপে শহরে আসায় ভাঁটা পড়ে যায়)। তার দরুন একটা স্বল্পকালীন কিন্তু জোরালো দর-কষাকষির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। এর ফলকেই চেমসফোর্ড ডিসেম্বর ১৯২০-এ ধর্মঘটের 'এক ধরনের মহামারি-জ্বর' বলে বর্ণনা করেছেন। সত্যিকারের বড় ধর্মঘটের ঢেউ দেখা দেয় ১৯১৯-এর শেষদিকে। পরের একটি অংশে তা আলোচনা করা হবে। সে-ঢেউ-এর পূর্বসূচনার মধ্যে ছিল গান্ধী-পরিচালিত মার্চ ১৯১৮-র আহ্‌মেদাবাদ ধর্মঘট আর জানুয়ারি ১৯১৯-এ বোম্বাই সুতিশিল্পের বিশাল ধর্মঘট। ধর্মঘট নিয়ে রবীন্দর কুমার-এর আনুপুঙ্খিক পর্যালোচনায় মূলত এর স্বতঃস্ফূর্ত প্রকৃতির ওপরেই জোর দেওয়া হয়েছে, যদিও ১৯০৮-এর মতোই সংগঠনের ক্ষেত্রে অস্থায়ী কর্মীরাও খানিকটা ছুটে গিয়েছিলেন। ২৫% মজুরি বৃদ্ধি ও বোনাস হিসেবে একমাসের মাইনের দাবিতে সি এন ওয়াড়িয়ার সেঞ্চুরি মিলস্-এর শ্রমিকরা ৩১ ডিসেম্বর থেকে ধর্মঘট করেন। ১৯১৪-১৮-র মধ্যে বোম্বাই শহরে খাবারের দাম ৮০-১০০% বাড়ে, কিন্তু মজুরি বাড়ে মাত্র ১৫%, যদিও ২০ লাখ টাকা পুঁজি বিনিয়োগ করে ১৯১৮-য় ওয়াড়িয়া উদ্যোগগুলো ২২.৫ লাখ টাকার মতো কল্পনাতীত মুনাফা করে। সেঞ্চুরি মিলস্-এর কর্মীরা ৯ জানুয়ারি থেকে প্যারেল শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য শ্রমিকদের তাঁদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে বোঝাতে শুরু করেন। অচিরেই গোটা বস্ত্রশিল্পের ১০০,০০০-এরও বেশি শ্রমিক রাস্তায় নেমে পড়েন, তাঁরা ৮৩ টি মিলই বন্ধ করে দেন, আর বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার কেরানি, রয়াল ইন্ডিয়ান মেরিন-এর ডক শ্রমিক ও প্যারেল রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের কর্মীদের মধ্যে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু র‍্যাডিকাল আইনজীবী ও হোম রুল লীগের রাজনীতিকরা (এইচ বি মন্ডাভালে, কানজি দ্বারকাদাস, উমর শোভানি) নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করেন ও শ্রমিক সভায় ভাষণ দেন। আর সেই সঙ্গে ঐ একই ভূমিকা ছিল এস কে বোলে-র কামগার হিতবর্ধক সভা-র ১৯০৯ থেকে তাঁরা তাঁদের কর্মীদের মাধ্যমে শ্রমিকদের অপ্রাপ্মণ পথে

সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো ঃ শ্রমিক জমায়েতে এই ধরনের ভাবী নেতাদের সংযমের উপদেশ বারবার খারিজ করে দেওয়া হয়। ধর্মঘট একমাত্র তখনই থামল (২১ জানুয়ারি) যখন পুলিশ কমিশনার সি এ ভিনসেণ্ট-এর মধ্যস্থতার প্রচেষ্টায় মিল-মালিকদের সমিতি-কে ২০% মজুরি বৃদ্ধি ও বিশেষ বোনাস দিতে রাজি করানো গেল।

ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রকৃত সূচনা হয় যুদ্ধের ও তার ঠিক পরের বছরগুলিতে। নিয়মিত সদস্যপদের তালিকা ও চাঁদা সহ প্রথম সংগঠন, এপ্রিল ১৯১৮-র মাদ্রাজ শ্রমিক ইউনিয়ন শুরু করেন জি রামানাজুলু নাইডু ও জি চেলাবাপতি নাইডু। এঁরা যুক্ত ছিলেন অ্যানি বেসাণ্ট-এর 'নতুন ভারত' (নিউ ইন্ডিয়া)-এর সঙ্গে, আর ঐ ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন বেসাণ্ট-এর সহকর্মী বি পি ওয়াড়িয়া । এ-ব্যপারে টি ভি কল্যাণসুন্দর মুদালিয়ার-এর (সাধারণভাবে তিরু বি ক নামে পরিচিত) ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ইনি ছিলেন মাদ্রাজ শহর কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় ও অব্রাহ্মণ জাতীয়তাবাদী নেতা, সেইসঙ্গে তামিল সাহিত্যজগতের এক ব্যক্তিত্ব। বোম্বাই-এ ট্রেড ইউনিয়ন শুরু করার ক্ষেত্রে বাপ্টিস্টার মতো হোম রুল লীগপন্থী ও *বোম্বে ক্রনিকল*-এর বি জি হর্নিম্যান-এরও কিছু অবদান ছিল। ১৯২০-তে বন্যার মতো ইউনিয়ন তৈরি হয়। যখন বোম্বাই-এ সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস-এর প্রথম অধিবেশন হয়, তখন ঐ বছরের নভেম্বরে নথিভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল ১২৫-এর মতো। কিন্তু জানুয়ারি ১৯১৯-এ বোম্বাই-এ যেমন হয়েছিল, সেভাবেই জঙ্গী চাপ আসে তলা থেকে, এইসব গোড়ার দিকের ইউনিয়নগুলো থেকে নয়। এইসব ইউনিয়ন সাধারণত রাশ টেনে ধরার কাজই করত। খুব বেশি হলে, গোড়ার দিকের মধ্যশ্রেণীর ইউনিয়ন নেতারা উদ্দীপিত হয়েছিলেন জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাঁরা ছিলেন প্রায়শই বেশ রাজভক্ত, যেমন বোম্বাই-এ এন এম জোশী বা কলকাতায় কে সি রায়চৌধুরী। আমরা দেখব যে, আহ্‌মেদাবাদের গান্ধীপন্থী বস্ত্রশিল্প শ্রমিক সভার (মজুর মহাজন) ক্ষেত্রে রাশ টেনে ধারার ভূমিকা ছিল সবচেয়ে স্পষ্ট; সৈন্যদের উর্দি দরকার—এই যুক্তিতে ওয়াড়িয়া-ও কিন্তু জুলাই ১৯১৮-য় চিনির কারখানায় ধর্মঘটের বিরোধিতা করেন।

মূল্যবৃদ্ধি, ১৯১৮-১৯-এ দেশের বেশির ভাগ অংশে খারাপ ফলন ও খাদ্যাভাবের পরিস্থিতি, ১৯১৮-১৯-এ মহামারি রূপে ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং কারিগরদের বেকারি (পৃ. ১৭৩-এর তালিকা থেকে দেখা যাবে, তাঁদের সুতো উৎপাদন সবচেয়ে কমে গিয়েছিল ১৯১৯-২০-তে)— ইত্যাদি কারণের ফলে সাধারণ মানুষের তীব্র দুরবস্থা ও অসন্তোষের মাত্র এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ ছিল ধর্মঘট। আরও বেশি আকাঁড়া ধরন হলো খাদ্য-দাঙ্গা ঃ ছোটো মফস্বল শহরের হাট ও শহরের খাদ্যশস্যের দোকান লুঠ, আর ঋণপত্র ছিনিয়ে নেওয়া। ১৯১৮-র গোড়ার দিকে বোম্বাই মিল অঞ্চলের খাদ্য-দাঙ্গায় ১১৫ টি খাদ্যশস্যের দোকান লুঠ হয়, আর রেলকর্মীরা মারোয়াড়িদের হিসেবের খাতা ছিনিয়ে নেন। মে ১৯১৮-য় কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে খাদ্য-দাঙ্গা হয়, তারপর সেপ্টেম্বর মাসে মাদ্রাজ শহরে তিনদিন তীব্র দাঙ্গা চলে। সুতিশিল্প ও রেলপথ-কর্মীরা ঐ দাঙ্গায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯১৯-২০ তে বাঙলায় নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, ২৪ পরগনা ও যশোর জেলা থেকে ৮৫৯টি দণ্ডাজ্ঞাসমেত ৩৮টি হাট লুঠের মামলার খবর পাওয়া যায়। আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি

অনুযায়ী এই ধরনের বিস্ফোরণে নানারকম তাৎপর্য দেখা দিত। সেপ্টেম্বর ১৯১৮-য় মধ্য কলকাতায় এই ধরনের বিস্ফোরণে মুসলমানরা মারোয়াড়ি-বিরোধী দাঙ্গায় যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু এপ্রিল ১৯১৯-এ ভারতের অনেককটি শহরে ঐ একই ব্যাপার বহুব্যাপ্ত রাওলাট আইন বিরোধী উত্থানে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

কিন্তু যুদ্ধোত্তর পর্বের গণজাগরণকে শুধুই বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট আর্থনীতিক উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিত করা আদৌ সমীচীন হবে না। ভুললে চলবে না যে, ভারতে যা ঘটছিল তা কিন্তু ব্যাপকতম অর্থে বিশ্বব্যাপী তরঙ্গভঙ্গের এক অংশ। উন্নত দেশগুলিতে তা ছিল পুঁজিবাদ-বিরোধী আর উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। দূর দূর দেশ থেকে যেসব ভারতীয় সৈন্য ঘরে ফিরছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই নতুন বিশ্বব্যাপী বিপ্লবী মেজাজের কিছুটা তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। যদিও এই ব্যাপারটির সপক্ষে দলিলপত্র হাজির করা প্রায় অসম্ভব, তাতে কিন্তু এর গুরুত্ব কমে না। বাঙলার কাজী নজরুল ইসলাম সুনির্দিষ্ট সমাজবাদ-প্রবণ কবিতে পরিণত হয়েছিলেন। তার পেছনে অবশ্যই সামরিক কর্মজীবনের ভূমিকা ছিল। মার্চ ১৯২১-এ কারহাইয়া-য় (যুক্ত প্রদেশের রায় বেরেলী ও প্রতাপগড় জেলার সীমানায়) কৃষি-দাঙ্গার পুলিশি প্রতিবেদনে জনৈক আঞ্চলিক নেতা ব্রিজলাল সিং-কে একজন প্রাক্তন সেপাই বলা হয়েছে। 'জনতার ওপর স্পষ্টতই [তাঁর] বিরাট নিয়ন্ত্রণ ছিল যার মধ্যে খানিক মাত্রায় সামরিক শৃঙ্খলারও অভাব ছিল না।'

শেষত সবচেয়ে বেশি সুদূরপ্রসারী ছিল নভেম্বর ১৯১৭-য় বলশেভিক বিপ্লবের অভিঘাত। এ বাবদে ব্রিটিশদের ভয় ছিল নিশ্চিতভাবেই চূড়ান্ত মাত্রাছাড়া। আতঙ্কের চোটে—যা ফরাসি বিপ্লবজনিত প্রতিক্রিয়া মনে করিয়ে দেয়—১৯১৯-২০-র পর থেকে সরকারি প্রতিবেদনে সর্বত্র বলশেভিক ভাবনাচিন্তা ও সোভিয়েত আড়কাঠি (এজেন্ট)আবিষ্কার করা হতে থাকে। এমনকি গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাসের মতো লোকেও এই সন্দেহ থেকে নিস্তার পান নি (৫ মে ১৯১৮-য় বোম্বাই-এর লাট উইলিংডন-এর বিবরণে গান্ধী হলেন 'সৎ, কিন্তু বলশেভিকও সেই কারণে খুবই বিপজ্জনক')। এ-ব্যাপারে শুধু দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এ যুক্ত প্রদেশের কিসান বিক্ষোভ সংক্রান্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনে এমন ধারণা আবিষ্কার করা হয় যাতে 'নিশ্চিতভাবে বলশেভিকবাদের গন্ধ পাওয়া যায়'। ঐ একই বছরে সুদূর মেবারে একটি কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে উইলকিনসন-এর বিবরণে অভিযোগ করা হয় যে, মহারানাকে নাকি 'ভয় দেখানো হয়েছে তাঁরও জার-এর মতোই দশা হবে।' যদি সুনির্দিষ্ট যোগাযোগের বিষয়টি বিচার করা যায় তাহলে একেবারেই বেঠিক হলেও, ১৯১৭ সম্বন্ধে যে-গুজব ভারতীয় জনগণের এক ব্যাপক অংশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই সাম্রাজ্যবাদী আতঙ্কের একটা বিষয়গত ভিত্তি তখনও পর্যন্ত ছিল। বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীরা অচিরেই পরাজিত জার্মানির জায়গায় বলশেভিক রাশিয়ার মধ্যে একটি সম্ভাব্য শক্তি দেখতে পেয়েছিলেন। আমরা দেখব, গোড়ার দিকের মস্কো-যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন মহেন্দ্র প্রতাপ, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনী মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। ব্রিটিশ যে স্পষ্টতই বিপ্লবী রাশিয়াকে এত ঘৃণা করে ও ভয় পায়—ঠিক এই বিষয়টিই জাতীয়তাবাদী মনোভাবাপন্ন শিক্ষিত ভারতীয় মানুষদের কাছে রাশিয়া সম্পর্কে সহানুভূতিশীল আগ্রহ ও সাড়া দেওয়ায় সাহায্য করে। লেনিন

ও ট্রট্স্কি-র পরিচালনায় গোড়ার দিকের সোভিয়েত বিদেশনীতির অত্যুচ্চ আদর্শবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ বড় একটা অভিঘাত আনে ; অর্থাৎ দখল ও ক্ষতিপূরণ ছাড়া তৎক্ষণাৎ শান্তির আহ্বান, বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণা (ফিনল্যান্ড-এর ক্ষেত্রে যা সঙ্গে সঙ্গে কাজে পরিণত করা হয়) আর সব গোপন চুক্তির প্রকাশ, যাতে রাশিয়াকে বিরাট বিরাট অঞ্চল লাভের (কনস্টান্টিনোপল সমেত) ও সুবিধে পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি জানানো হয়েছিল। বলশেভিকদের ক্ষমতা দখলের কয়েকদিনের মধ্যে সবকটি চুক্তি 'ছিঁড়ে ফেলা হয় ও খারিজ করা হয়'। রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ বিকাশ সম্বন্ধে সঠিক খবর পাওয়া খুবই কঠিন হলেও, সর্বাত্মক পরিবর্তন ও একটি জগৎ ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে, নিঃস্বরা সেখানে নিজেদের পায়ে দাঁড়াচ্ছেন— এই ধরনের অস্পষ্ট গুজব ছড়িয়ে পড়ছিল।

১৯১৫-য় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার সময় ভারতীয় রাজনীতিতে মহাত্মা গান্ধী ছিলেন বহিরাগত। ১৯২০-এর শেষ নাগাদ তিনি শীর্ষতম নেতৃত্বের অবস্থান অর্জন করেন। তার উত্থানকে এই গোটা প্রসঙ্গের সূত্রে উপস্থাপন করতে হবে।

মহাত্মা গান্ধী

গান্ধীর আবেদন

গান্ধীর ভাবাদর্শ ও পদ্ধতির ভিত্তি আর ভারতে তাঁর পরবর্তী কৃতিত্বের ক্ষেত্রে নানাভাবে অবদান রেখেছিল দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা (১৮৯৩-১৯১৪)। নাটাল-এ যে বর্ণবৈষম্য ভারতীয়দের ক্ষতি করেছিল (ভোট দেওয়ার অধিকার-রদ আর জমিজমার মালিকানা ও ব্যবসায় বাধানিষেধ) তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে ১৯০৬ অবধি একজন উদীয়মান আইনজীবী-রাজনীতিক হিসেবে গান্ধী সাধারণত প্রার্থনা ও আবেদনের 'নরমপন্থী' কলাকৌশলই অনুসরণ করেছিলেন। মূলত তাঁর আন্দোলন ছিল একান্তভাবেই ব্যবসায়ী ও আইনজীবীদের আন্দোলন। কিন্তু ১৯০৭-০৮, ১৯০৮-১১ ও ১৯১৩-১৪-য় তিনটি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অভিযানের (১৯০৭-এ অচিরেই যার নতুন আখ্যা দেওয়া হয় 'সত্যাগ্রহ') মাধ্যমে পুরোপুরি নতুন এক পথান্তরের সূচনা হয়। এই অভিযানে যেসব বিষয় জড়িত ছিল সেগুলি হলো ঃ ১৯০৬-এ ট্রান্সভাল অর্ডিনান্স যেখানে ভারতীয়দের জন্য পঞ্জীকরণ ও ছাড়পত্র (পাস) বাধ্যতামূলক করা হয় ; ১৯১৩-য় অভিবাসনে বাধানিষেধ, নতুন প্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত দেওয়ার ব্যাপারে অ-খ্রীস্টান ভারতীয় বিবাহকে স্বীকৃতি-না দেওয়া, ও প্রাক্তন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের ওপর ৩ পাউন্ড কর। দক্ষিণ আফ্রিকার অদ্ভুত পরিস্থিতির ফলে পুরোপুরি পৃথক ধর্ম, সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মানুষ, যেমন,হিন্দু, মুসলমান, পার্সি ও খ্রীস্টান, গুজরাটি ও দক্ষিণ ভারতীয়, উঁচু শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও আইনজীবী আর নিউক্যাসল খনিশ্রমিকদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছিল এক সফল আন্দোলন। অক্টোবর ১৯১৩-য় একটি স্মরণীয় ধর্মঘট ও দেশজোড়া পদযাত্রায় ঐ সবাইকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন গান্ধী। ভারতে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই এই অভিজ্ঞতা যে তাঁকে অন্যান্য রাজনীতিকদের চেয়ে সম্ভাবনার দিক দিয়ে অনেক বেশি সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছিল—এই

ব্যাপারটির ওপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। অন্যান্য সব রাজনীতিকের (যেমন, টিলক, লাজপত রায় বা বিপিনচন্দ্র পালের) ভিত্তি ছিল মূলত অঞ্চলনির্ভর। হিন্দু-মুসলমান একতার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতাকে গান্ধী যে আজীবন স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন তা অবশ্যই পিছন ফিরে খুঁজে পাওয়া যায় তাঁর দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের মধ্যে, মুসলমান ব্যবসায়ীরা যাতে ছিলেন প্রবল সক্রিয়। দক্ষিণ আফ্রিকা তাঁকে এক ধরনের আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়। আর তখনও পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার যেসব ভারতীয়দের দেশের নানা অংশে তাদের আদি বসতের সঙ্গে যোগ ছিল, সেই সূত্রেও সারা ভারতে গান্ধীর নাম ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে। সাবরমতী আশ্রমের (১৯১৫) প্রথম ২৫ জন অধিবাসীর মধ্যে ১৩ জন আসেন তামিলনাড়ু থেকে—অন্য যে-কোনো ভারতীয় নেতার ক্ষত্রে তখন এই ধরনের ব্যাপার হতো ধারণার বাইরে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মৌলিক গান্ধীপন্থী কৌশলটি খাড়া করা হয় ১৯০৬-এর পরে। এর মধ্যে ছিল শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্মীদের যত্নসহকারে প্রশিক্ষণ (ফিনিক্স আবাসন ও টলস্টয় খামারে), অহিংস সত্যাগ্রহ—যার অন্তর্গত ছিল বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট আইনকানুনকে (বাধ্যতামূলক পঞ্জীকরণ, প্রবেশপত্র, ব্যবসার লাইসেন্স ইত্যাদি) শান্তিপূর্ণভাবে অমান্য করা, গণ-কারাবরণ, আর মাঝে মাঝে হরতাল ও দর্শনীয় মিছিল। এই গান্ধীবাদী কৌশলটির অন্তর্ভুক্ত ছিল আপাত কুইক্‌সোট-সুলভ (উদ্ভট) নানা পদ্ধতি, সাংগঠনিক, বিশেষত আর্থিক খুঁটিনাটির ব্যাপারে অখন্ড মনোযোগ, আর আলাপ-আলোচনা ও আপসের জন্যে তৈরি থাকা—এর ফলে মাঝে মাঝে আচমকা একতরফাভাবে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটে, যা একেবারেই জনপ্রিয় ছিল না। (যেমন জানুয়ারি ১৯০৮-এ প্রথম সত্যাগ্রহ তুলে নেওয়া হয় স্মাট্‌স্‌-এর মৌখিক প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ; ঐ প্রতিশ্রুতি অচিরেই ভঙ্গ করা হয়—আর এই অপ্রত্যাশিত পশ্চাদপসরণের পরে গান্ধী এক জঙ্গী পাঠানের হাতে মার খান) এবং অ-শিষ্যরা যেগুলিকে সাধারণত গান্ধীপন্থী 'খ্যাপামো' বলে মনে করতেন তার চর্চা (নিরামিষ আহার, প্রাকৃতিক চিকিৎসা, যৌন ব্যাপারে আত্মসংযমের পরীক্ষণ ইত্যাদি)। কিন্তু প্রকৃত অভিঘাতের একটি পরিষ্কার দ্বিমুখী চরিত্র ছিল ঃ জনগণকে টেনে আনা, কিন্তু সেই সঙ্গেই গণ-সক্রিয়তাকে নেতার পূর্বনির্ধারিত কয়েকটি নির্দিষ্ট ধরনে, আর সবার ওপরে, অহিংস পদ্ধতির গণ্ডিতে কঠোরভাবে বেঁধে রাখা।

গান্ধীর কাছে অহিংসা বা সত্যাগ্রহের ব্যক্তিগত তাৎপর্য ছিল একটি গভীরভাবে অনুভূত ও খাড়া করা দর্শন। এমারসন, থোরো বা টলস্টয়-এর কাছে তার কিছুটা ঋণ ছিল। কিন্তু এতে যথেষ্ট মৌলিকতাও দেখা যায়। সত্যের অনুসন্ধানই মানবজীবনের লক্ষ্য এবং যেহেতু কেউই চূড়ান্ত সত্য অর্জনের ক্ষেত্রে কখনও নিশ্চিত হতে পারে না, তাই সত্যের অবধারিতভাবেই আংশিক উপলব্ধি কারও ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়াটা পাপ। পুরোপুরি সন্ত হিসেবে নয়, কিন্তু রাজনীতিক হিসেবে গান্ধী মাঝে মাঝে কার্যত পূর্ণ অহিংসার চেয়ে কিছু কমের জন্যে আপস করেছেন (যুদ্ধোত্তর পর্বে কিছু রাজনৈতিক ছাড়ের আশায় তিনি ১৯১৮-য় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সপক্ষে জোর প্রচার চালান)। কিন্তু অন্যায়ের কাছে ভীরু আত্মসমর্পণের চেয়ে এমনকি হিংসাও অভিপ্রেত—এ ব্যাপারে তাঁর পৌনঃপুনিক উপরোধের দরুন কখনও কখনও ব্যাখ্যানের সূক্ষ্ম সমস্যা তৈরি হয়েছে, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিগত দর্শনের (তুলনায় ছোট একটি শিষ্যগোষ্ঠীই শুধু এটিকে পুরোপুরি গ্রহণ করেন) চেয়ে ঐতিহাসিকভাবে

অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হলো, যেভাবে এর পরিণামে নিয়ন্ত্রিত গণ-অংশগ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতটি ভারতীয় জনগণের সামাজিকভাবে নির্ধারক অংশের স্বার্থ ও মানসিকতার সঙ্গে বিষয়গত দিক দিয়ে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। গান্ধীর আগে ভারতীয় রাজনীতিকরা যে নরমপন্থী 'ভিক্ষাবৃত্তি' ও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের মধ্যে দোলাচলপ্রবণতা দেখিয়েছেন তার মূল কারণ হলো অনিয়ন্ত্রিত গণ-আন্দোলন সম্পর্কে সামাজিক অস্বস্তিবোধ। ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও সেই সঙ্গে কৃষকসম্প্রদায়ের তুলনায় সম্পন্ন বা স্থানীয় কর্তৃত্বসম্পন্ন অংশের কাছেও গান্ধীপন্থী ধাঁচটি গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ হয়, কারণ রাজনৈতিক সংগ্রাম যদি লাগামছাড়া বা হিংসাত্মক সামাজিক বিপ্লবে পরিণত হয় তাহলে এদের সকলেরই কিছু-না-কিছু হারানোর ছিল। কিন্তু আমরা পরে দেখব, আরও সাধারণভাবে গান্ধী ও গান্ধীপন্থী কংগ্রেস যে মূলত ঐক্যবিধায়ক 'সামিয়ানা-ধরনের' ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তার মর্মে নিহিত ছিল অহিংসার তত্ত্ব। তিনি ও তাঁর কংগ্রেস অভ্যন্তরীণ সামাজিক সঙ্ঘর্ষের মধ্যে সালিশি করতেন, বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংযুক্ত জাতীয় সংগ্রামে বিরাট অবদান রাখছিলেন, কিন্তু মাঝে মধ্যে পশ্চাদপসরণ ও কিছু বড় রকমের বিপত্তির দিকেও নিয়ে যেতেন।

গান্ধীর আবেদনের তৃতীয়, নির্ণায়ক দিকটি নিহিত ছিল তাঁর সামাজিক আদর্শবিধির মধ্যে। এটিকে তিনি সবচেয়ে দ্ব্যর্থহীনভাবে হাজির করেন *হিন্দ স্বরাজ* (১৯০৯)-এ। এই পুস্তিকায় যে মূল বিষয়টি তুলে ধরা হয় তা হলো ঃ প্রকৃত শত্রু ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য নয়, বরঞ্চ গোটা আধুনিক শিল্পভিত্তিক সভ্যতা। কার্লাইল ও রাস্কিন (যাঁর *অন্ত্যোদয়* শেষ অবধি গান্ধীর প্রিয় বই ছিল)-এর মতো উনিশ শতকের ইংরেজ লেখকরা শিল্পায়নের যে রোমান্টিক সমালোচনা গড়ে তোলেন সেখান থেকে নিয়ে ও তাকে আরও বিস্তৃত করে গান্ধী যুক্তি দেন যে, শুধুই রাজনৈতিক স্বরাজের অর্থ হবে 'ইংরেজ ছাড়া ইংরেজ শাসন', আর 'একজন ভারতীয় রকফেলার মার্কিন রকফেলার-এর চেয়ে ভালো হবে এমন আশা করা নির্বুদ্ধিতা। রেলপথ, আইনজীবী ও চিকিৎসকরা দেশকে নিঃস্ব করেছে'—রেলপথ মড়ক ছড়িয়েছে আর খাদ্যশস্য দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করেছে রপ্তানিতে উৎসাহ দিয়ে। মামলার লোভে আইনজীবীরা ইন্ধন জুগিয়েছে বিবাদে, আর লোক জুগিয়ে ব্রিটিশ শাসন বজায় রাখতে সাহায্য করেছে, পশ্চিমী ওষুধপত্র ব্যয়বহুল ও স্বাভাবিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার নাশক। এই পুস্তিকাটির কেন্দ্রস্থানীয় অংশে বলা হয়েছে ; 'ভারত গত ৫০ বছর বা ঐ রকম সময়ে যা শিখেছে তা ভুলে যাওয়ার মধ্যে তার মুক্তি। ডাক-তার ব্যবস্থা, হাসপাতাল, আইনজীবী, চিকিৎসক ও এই ধরনের সবাইকে চলে যেতে হবে। আর তথাকথিত উঁচুশ্রেণীকে সচেতনভাবে, নিষ্ঠাসহকারে, সুবিবেচিতভাবে কৃষকের সরল জীবনযাপন শিখতে হবে'।

হিন্দ স্বরাজ-এ গান্ধীর সামাজিক কল্পরাজ্যের যে-রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তাকে যদি ভারতের বা পৃথিবীর সব অমঙ্গলের চূড়ান্ত দাওয়াই বলে ধরা হয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে অবাস্তব ও বাস্তবিকই ভাবাবদ্ধ। বিভিন্ন পরিশীলিত নাগরিক গোষ্ঠীর কাছে কখনোই তার খুব একটা আবেদন ছিল না। ১৯৩০-এর ও ৪০-এর দশক নাগাদ এইসব গোষ্ঠী ক্রমেই আরও বেশি করে শিল্পায়ন-ভিত্তিক পুঁজিবাদী বা সমাজবাদি সমাধানের দিকে ঝুঁকছিল। কিন্তু এই রূপরেখা অবশ্যই আধুনিকীকরণে'র (বিশেষভাবে ঔপনিবেশিক অবস্থার অধীনে) গভীর

বিচ্ছেদজনক প্রভাবের বিরুদ্ধে অনুঘাত হিসেবে দেখা দেয়। যেসব কারিগর কারখানা শিল্পের ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলেন, যে-কৃষকের কাছে আদালত ছিল একটি বিপর্যয়-সূচক ফাঁদ ও শহরের হাসাতালে যাওয়ার অর্থ সাধারণত এক ব্যয়বহুল মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা এবং সেই সঙ্গে যেসব গ্রামীণ বা শহরতলির বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের কাছে শিক্ষা বিশেষ কোনো জাগতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসে নি—এঁদের সবার কাছে শিল্পায়ন-বিরোধী ভাববস্তুর সত্যিই একটা আকর্ষণ ছিল, অন্তত কিছুকালের জন্যে। ভারতে ফেরার পর খাদি, গ্রাম পুনর্গঠন ও (খানিক পরে) হরিজন কল্যাণের কর্মসূচির মাধ্যমে গান্ধী তাঁর বাণীকে মূর্ত রূপ দেন। আবারও সামাজিক বা আর্থনীতিক সম্পর্ক পরিবর্তনের অর্থে এইসব কর্মসূচির একটিও কোনো সমস্যার প্রকৃত সমাধান করতে পারে নি। কিন্তু গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী কর্মীরা যখন আন্তরিকতা ও ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা করেছেন তখন খানিকটা সীমিতভাবে এগুলি গ্রামীণ জনগণের অবস্থার উন্নতি করতে পেরেছিল। স্বদেশী পর্যায়ের আত্মনির্ভরতা ও আত্মশক্তির বাণী এইভাবে আরও ব্যাপক মাত্রা অর্জন করে। এর সঙ্গে অবশ্যই যোগ করতে হবে যে, কৃষকদের কাছে গান্ধীর আবেদনের ক্ষেত্রে বিরাটভাবে সাহায্য করেছিল তাঁর রাজনৈতিক চালচলন ঃ ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে চড়া, সরল হিন্দুস্থানীতে কথা বলা, ১৯২১-এর পর থেকে শুধুই একটা কৌপীন পরা, এবং উত্তর-ভারতের হিন্দু গ্রামীণ জনসাধারণের লোকপ্রিয় ধর্মের মধ্যে যে তুলসীদাসী রামায়ণ এত গভীরে নিহিত রয়েছে তার বিম্ব (ইমেজারি) ব্যবহার (মুসলমানদের কথা ধরলে এই ধরনের ব্যবহারের সমস্যাও ছিল। কিন্তু সেকথা পরে আসবে)।

গুজবের ভূমিকা

কিন্তু এসব সত্ত্বেও ব্যক্তিত্ব হিসেবে গান্ধী কী ভেবেছিলেন, কিসের সপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন বা কার্যত কী করেছিলেন—শুধুই তার ভিত্তিতে গান্ধীবাদী আন্দোলনের প্রচণ্ড ব্যাপ্তিকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। আমাদের যা আরও বুঝতে হবে তা হলো ঃ প্রধানত নিরক্ষর একটি সমাজ যখন প্রচণ্ড চাপ ও টানাপোড়েনের পর্বের মধ্যে দিয়ে যায়, সেখানে গুজবের ভূমিকা কী। ভারতীয় জনগণের নানান অংশ তাঁদের দুর্দশা ও আশার মধ্য থেকে গান্ধী সম্পর্কে তাঁদের নিজ নিজ ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছিলেন বলে মনে হয়—বিশেষভাবে গোড়ার দিকে বেশির ভাগ লোকের কাছে তিনি তখনও পর্যন্ত এক দূরবর্তী, আবছায়ায় দেখা বা গল্প কথায় শোনা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক পুণ্যাত্মা। কৃষকরা যেমন বিশ্বাস করতে পারতেন, গান্ধী জমিনদারি শোষণের অবসান করবেন ; যুক্ত প্রদেশের কৃষি-শ্রমিকদের বিশ্বাস ছিল তিনি 'তাঁদের জন্য জোতের ব্যবস্থা করবেন' (ভারত-সচিবকে বড়লাট রিডিং, ১৩ অক্টোবর ১৯২১—*রিডিং ক্যালেকশন*)। মে ১৯২১-এ আসামের কুলিরা সবাই মিলে চা-বাগান ছেড়ে চলে আসেন এই বলে যে, তাঁরা গান্ধীর আদেশ পালন করছেন। জানুয়ারি ১৯২১-এ এলাহাবাদ জেলায় কিসান আন্দোলন সম্পর্কে বিভাগীয় একটি প্রতিবেদনে ঐ একই কথা সজীব ও আনুপুঙ্খিকভাবে বলা হয়েছে ঃ 'এমনকি সুদূরতম গ্রামেও শ্রীগান্ধীর নামে যেভাবে প্রচলন লাভ করেছে তা আশ্চর্যজনক মনে হয়। কেউই জানে না তিনি কে বা কী, কিন্তু স্বীকৃত তথ্য হলো তিনি যা বলেছেন তা-ই ঘটনা, আর তিনি যা আদেশ দেবেন তা করতেই হবে। তিনি একজন মহাত্মা বা সাধু, পণ্ডিত,

এলাহাবাদবাসী ব্রাহ্মণ, এক দেওতা (দেবতা)...তাঁর নামের প্রকৃত ক্ষমতা বোধহয় খুঁজে পাওয়া যাবে এই ধারণার মধ্যে যে তিনিই প্রতাপগড়ে 'বেদখলি' (বেআইনী উচ্ছেদ) বন্ধ করিয়েছেন ...সাধারণভাবে গান্ধীকে সরকারের বিরোধী বলে ধরা হয় না, [তিনি] শুধু জমিনদারদেরই বৈরী।...আমরা গান্ধীজী ও সরকারের পক্ষে' ('হোম পলিটিকাল ডিপোজিট', ফেব্রুয়ারি ১৯২১, সংখ্যা ১৩)। আমরা পরে দেখব, এই পর্বে শক্তিশালী ধর্মীয় মাত্রাসম্পন্ন গান্ধীধাঁচের নেতৃত্ব যে খানিকটা ঐতিহাসিক অবধারণের মতো ছিল তার আভাস পাওয়া যায় ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে, কিছুটা একই ধরনের বেশ কিছু আঞ্চলিক বা স্থানীয় নেতার উদ্ভবের মধ্যে ঃ (যেমন) বাঙলা ও বিহারের খনিশ্রমিকদের মধ্যে স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী দর্শনানন্দ, উত্তর বিহারে স্বামী বিদ্যানন্দ, প্রতাপগড়ে বাবা রামচন্দ্র, স্বামী কুমারানন্দ, মহারাষ্ট্রে আনন্দস্বামী এবং অন্ধ্রের 'রাম্পা' জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে আল্লুরি সীতারাম রাজু। ভাবমূর্তি তৈরির এই প্রক্রিয়াটির দ্বৈত চরিত্রের ওপর জোর দেওয়া দরকার। এলাহাবাদ গোয়েন্দা (সি আই ডি) বিভাগের প্রতিবেদন থেকে যেমন আভাস পাওয়া যায়, কৃষকরা গান্ধী সম্পর্কে স্পষ্ট গুজবগুলোকে একটা র‍্যাডিকাল, জমিনদার-বিরোধী মোচড় দিচ্ছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব কৃতিত্বকেও গান্ধীর ওপর আরোপ করেছিলেন—কারণ, যদি প্রতাপগড়ে 'বেদখলি'-কে আটকানো হয়ে থাকে তাহলে তার কারণ ছিল বাবা রামচন্দ্রের মতো স্থানীয় নেতাদের পরিচালনায় কৃষকদের সংগ্রাম। আমরা দেখব এই সংগ্রামের সঙ্গে গান্ধী বা কংগ্রেস নেতৃত্বের সরাসরি বিশেষ কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৯২২-এর পর থেকে যা বারবারই ঘটবে তা হলো ঃ মহাত্মা যদি পরিষ্কারভাবে পশ্চাদপসরণের আদেশ দেন, জনগণের বৃহৎ অংশ তা মেনে নেবে। তখনও পর্যন্ত কৃষকদের ওপর-থেকে-আসা একজন ত্রাতার প্রতিনিধির প্রয়োজন ছিল—এ এক মারাত্মক সীমাবদ্ধতা। সাম্প্রতিক কিছু গবেষক বোধহয় এটিকে মাঝে মাঝে ছোট করে দেখেছেন। শিরোমণি ইতিহাস রচনার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে গ্রামীণ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিপ্লবী সম্ভাবনাকে তাঁরা খানিকটা রোমান্টিক করে তুলতে চেয়েছেন।

ভাবী সুখরাজ্যের কল্পদৃষ্টি কালক্রমে মিলিয়ে যায়, আর বাস্তবিকই এটি খর্বিত হয় গান্ধীপন্থী কংগ্রেস সংগঠন ও নিয়মশৃঙ্খলা বাড়ার জন্যেই। এইভাবে গান্ধীপন্থী আন্দোলনের এক পৌনঃপুনিক বিন্যাস হয়ে দাঁড়ায় সাংগঠনিক ক্ষমতা ও প্রায়ই উগ্র ও র‍্যাডিকাল জন-বিস্ফোরণের মধ্যে এক ধরনের বিপরীত সম্পর্ক।

চম্পারন, খেড়া, আহ্‌মেদাবাদ

দক্ষিণ আফ্রিকায় আংশিক জয়লাভ করে গান্ধী ১৯১৫-য় সেখান থেকে ফিরে আসেন। স্মাট্‌স্-এর জুন ১৯১৪-র ভারতীয় ত্রাণ আইনে ৩ পাউন্ড কর তুলে দেওয়া হয় আর স্বীকৃতি দেওয়া হয় ভারতীয় বিবাহকে, যদিও বৈষম্য অবশ্যই ঘোচে নি। আর আফ্রিকান ও ভারতীয় জনগণ—দুপক্ষের ওপরেই শ্বেতাঙ্গ বর্ণবিদ্বেষবাদীদের শোষণের ব্যাপকতর প্রশ্নটিকে তখনও পর্যন্ত ধরা হয় নি বললেই হয়। পরের তিন বছরে গান্ধী এমন একজন মানুষ হিসেবে বিখ্যাত হয়ে ওঠেন যিনি বিভিন্ন আঞ্চলিক অন্যায়ের ব্যাপারে হাত লাগাবেন (চম্পারনের নীলচাষী, আহ্‌মেদাবাদের সুতি-শিল্প-শ্রমিক ও খেড়া কৃষকদের বিষয়ে) আর সাধারণত সেসব ক্ষেত্রে সত্যিই কিছু করতে

পারবেন—এ ছিল এক রাজনৈতিক রীতি যা প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের (ও হোম রুল লীগের) পুরো উল্টো। এঁদের ধরনটি ছিল খানিকটা বিমূর্ত সর্বভারতীয় বিষয় বা কর্মসূচি নিয়ে শুরু করা ও ওপর থেকে এগিয়ে যাওয়া। জুডিথ ব্রাউন যুক্তি হাজির করেছেন যে, গোড়ার দিকের এই সব আন্দোলনের প্রধান গুরুত্ব নিহিত ছিল 'ফিরতি ঠিকাদার' (সাব-কনট্রাক্টর) নিয়োগের মধ্যে, যাঁরা আজীবন গান্ধীর সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন—যেমন চম্পারনে রাজেন্দ্র প্রসাদ, অনুগ্রহণারায়ণ সিংহ ও জে বি কৃপালনী ও গুজরাটের দুটি আন্দোলনে বল্লভভাই প্যাটেল, মহাদেব দেসাই, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার। কিন্তু তাঁর নিজস্ব ও অন্যান্য বিবরণ থেকে আরও সব গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা বেরিয়ে আসে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তলার থেকে চাপ ছিল। মাঝে মাঝে ভাবী সুখরাজ্যের আবেদনের সুর ও সেইসঙ্গে এবং সংযমকারীর ভূমিকার প্রথম আভাসও মেলে।

আমরা আগেই দেখেছি চম্পারনে কুঠিয়াল-বিরোধী অসন্তোষ ও বিক্ষোভের একটি দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। জাক পুশেপাদাস-এর আনুপুঙ্খিক বিশ্লেষণ থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, কৃষক জমায়েত করার ক্ষেত্রে শহরতলির বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের মধ্যে গান্ধীপন্থায় দীক্ষিতদের (রাজেন্দ্র প্রসাদ, এ এন সিংহ বা ব্রজকিশোর প্রসাদ-এর মতো উকিল বা মুজফ্ফরপুর কলেজের শিক্ষক জে বি কৃপালনী (জুডিথ ব্রাউন-এর 'ফিরতি-ঠিকাদাররা') যত না ভূমিকা ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন খানিকটা নিচু স্তরের ধনী ও মধ্য কৃষকরা (রাজকুমার শুক্ল, যিনি লখনউ গিয়েছিলেন গান্ধীকে আমন্ত্রণ জানাতে, সন্ত রাউত, খেন্ডার রায়), আঞ্চলিক মহাজন ও ব্যবসায়ী (এঁরা মহাজনী ও ব্যবসাতে কুঠিয়ালদের প্রতিযোগিতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন) আর গ্রামের কিছু মোক্তার ও স্কুল শিক্ষক (পীর মহম্মদ, হরবংশ সহায়)। প্রথম চোটে জুলাই ১৯১৭-য় একটি প্রকাশ্য তদন্তের ব্যবস্থা করা (সত্যাগ্রহের ভয় দেখানোয় উচ্চতর কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রবেশের ব্যাপারে একটি আঞ্চলিক নিষেধাজ্ঞা তুলে দেওয়ার পরে) এবং চম্পারন নীলচাষীদের অভিযোগ সম্পর্কে সর্বভারতীয় প্রচারের মধ্যেই গান্ধীর নিজস্ব ভূমিকা সীমাবদ্ধ ছিল—এই তদন্ত ও প্রচারের ফলে 'তিন কাঠিয়া' উঠে যায়। কিন্তু বাস্তব কার্যকলাপকে অনেক দূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল মনস্তাত্ত্বিক অভিঘাত : ২৯ এপ্রিল ১৯১৭-য় বেতিয়া-র উপমহকুমা আধিকারিক জানান যে 'এক আসন্ন ভাবী সুখরাজ্যের কল্পদৃষ্টি প্রচার করে গান্ধী অজ্ঞ জনসাধারণের কল্পনায় প্রতিদিন রূপান্তর ঘটাচ্ছেন।' জনৈক রায়ত গান্ধীকে রামচন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করেন ও তদন্ত কমিটিকে জানান যে 'এখন যেহেতু গান্ধী এসে গেছেন অতএব ঠিকাচাষীরা আর রাক্ষস-কুঠিয়ালদের ভয় করবে না'। গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, সব স্থানীয় কর্মকর্তা ও বাগিচামালিকদের কর্তৃত্ব খর্ব করার জন্যে বড়লাট বা (ইংল্যান্ডের) রাজা গান্ধীকে পাঠিয়েছেন ; আর এমনকি ব্রিটিশরাও কয়েকমাসের মধ্যে চম্পারন ছেড়ে চলে যাবে। গান্ধীপন্থী সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো জঙ্গীভাবের কিছু লক্ষণ দেখা যায়—যেমন, কয়েকটি নীলকুঠির ওপর আক্রমণ ও আগুন লাগানোর ঘটনা। গান্ধী-অনুমোদিত চুক্তিতে 'শ্যারাহ্‌বেশি'-র যে-হ্রাস মেনে নেওয়া হয়, ১৯১৭-র শেষদিকে চাষীরা মাঝেমাঝে সেটাও দিতে অস্বীকার করছিলেন। গান্ধী ১৫ জন স্বেচ্ছাসেবকের একটি দল রেখে যান যাঁরা গঠনমূলক গ্রামীণ কাজ শুরু করার চেষ্টা করেন। রাজেন্দ্র প্রসাদকে তিন বলেন যে, একমাত্র প্রকৃত সমাধান হলো 'রায়তদের শিক্ষা এবং তাঁদের ও কুঠিয়ালদের মধ্যে নিরন্তর সালিশি'। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টা

বিশেষ সফল হয় নি বলেই মনে হয়। যে ১৯১৮ নাগাদ গ্রামস্তরে মাত্র তিনজন কর্মী তখনও অবধি কাজ করছিলেন।

গান্ধীর হস্তক্ষেপের সাফল্য অনেক বেশি স্থায়ী প্রমাণিত হয় গুজরাটের খেড়া জেলায়। এই জেলাটি ছিল তুলনায় সমৃদ্ধিশালী কনবি পাটীদার কৃষক-স্বত্বাধিকারী অঞ্চল। এঁরা কাছাকাছি আহ্‌মেদাবাদের জন্যে খাদ্যশস্য, তুলো ও তামাক চাষ করতেন (চম্পারনের মতো এই জেলাটিতে বড় জমিনদার, কুঠিয়াল ও চূড়ান্ত নিঃস্ব ছোটো ঠিকাচাষী ছিলেন না)। অনেক পাটীদারই বণিক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বেশ ব্যাপক প্রসার ছিল। খেড়া বিষয়ে একটি অণু-সন্ধানে ডেভিড হার্ডিমান যেমন দেখিয়েছেন, এখানে একটি প্রান্ত-উনিশশতকীয় 'স্বর্ণযুগে'র শেষে ১৮৮৯-এর পর বারবার দুর্ভিক্ষ ও মড়ক হয়, ফলে রাজস্ব দেওয়া (যা কদাচিৎ কমানো হতো) খুব কঠিন হয়ে পড়ে। জাতের মধ্যে বিবাহবিন্যাসে যেসব গ্রামের অবস্থান নিচের দিকে ছিল, সেখানে যে 'কমতি পাটীদাররা' থাকতেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি, কারণ উন্নততর পাটীদাররা পণের মাধ্যমে সঞ্চয় করতে পারতেন বাড়তি সম্পদ, আর প্রায়ই চাকরি পেয়ে যেতেন কাছাকাছি বরোদা রাজ্যের অসামরিক পরিষেবায়। গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে স্থায়ী সমর্থন জুগিয়েছিলেন এই 'কমতি' পাটীদাররাই। ১৯১৭-১৮-য় মন্দা ফসলের সঙ্গে সঙ্গে কেরোসিন, লোহার জিনিসপত্র, কাপড় ও নুনেরও দাম বাড়ে, কিন্তু যেসব নিচুজাতের বারাইয়াদের পাটীদাররা আবাদে শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ করতেন, তাঁরা জোর করে মজুরি বাড়িয়ে নেন। এপ্রিল ১৯১৮-য় জনৈক পাটীদার অভিযোগ করেন যে 'আমরা তিন আনা দিয়ে যে শ্রম পেতাম তার জন্যে ছ আনা দিতে হয়।' আসলে নভেম্বর ১৯১৭-য় রাজস্ব-বন্ধের (খারাপ ফসলের দরুণ মকুবের জন্যে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে) উদ্যোগ এসেছিল খেড়া-র কাপডভঞ্জ তালুকের মোহনলাল পান্ড্য-র মতো আঞ্চলিক নেতাদের তরফ থেকে, গান্ধী বা আহ্‌মেদাবাদের রাজনীতিকদের থেকে নয়। বহু দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর গান্ধী এই ব্যাপারটিকে গ্রহণ করেন অনেক পরে, ২২ মার্চ ১৯১৮-য়। এই বিলম্ব অসমীচীন প্রতিপন্ন হয়, কারণ ততদিনে দরিদ্রতর চাষীদের আগেই রাজস্ব জমা দিতে বাধ্য করা হয়েছে, আর ভালো রবিশস্য রাজস্ব মকুবের বাহানাটিকে কমজোরি করে দেয়। পরিণামে খেড়া, ভারতে প্রথম প্রকৃত গান্ধীপন্থী কৃষক সত্যাগ্রহ বরং খানিকটা জোড়াতালি ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, এর ছাপ পড়ে ৫৫৯টি গ্রামের মধ্যে মাত্র ৭০টিতে। নামমাত্র ছাড়ের চেয়ে বেশি কিছু না-পেয়েই জুন মাসে এই সত্যগ্রহ তুলে নিতে হয়। কিন্তু অনলস গ্রামীণ 'গঠনমূলক' কাজ আগামী বছরগুলিতে গুজরাটে একটি দৃঢ় গান্ধীপন্থী ঘাঁটি গড়ে তুলবে, বিশেষভাবে খেড়া-র তামাক ও গো-পালনে সমৃদ্ধ চারোটার ভূখণ্ডের আনন্দ ও বোরসাড তালুকের আর সুরাটের বারডোলি তালুকে (এখানে কুঁবরজী মেহতা-র পাটীদার যুবক মণ্ডল আগেই যে গঠনমূলক কাজ শুরু করেছিলেন, গান্ধীপন্থীরা তার সঙ্গে যুক্ত হন)। গান্ধীপন্থী অহিংসায় পাটীদারদের গভীর বিশ্বাস শুধুই সনাতন বৈষ্ণব ভক্তির প্রভাব থেকে আসে নি। 'সম্পত্তির মালিক হিসেবে তাঁরা হিংসাত্মক বিপ্লব চান নি'—এই ব্যাপারটিও তার সঙ্গে ছিল। বস্তুতপক্ষে খেড়া সত্যাগ্রহের পরই বারাইয়ারা পাটীদারদের বাড়িতে একের পর এক ডাকাতি করেন। মনে হয়, তাঁদের ধারণা হয়েছিল, ব্রিটিশ আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে।

গুজরাটের চাষীদের যে নিজস্ব চিন্তাধারা ছিল এবং তাঁরা শুধু গান্ধীর 'বিরতি-ঠিকাদারদের' হাতের পুতুলে পরিণত—জুডিথ ব্রাউন যেমন ধরে নিতে চান—হন নি তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯১৮-র গ্রীষ্মে। এইসময় গান্ধী ও তাঁর অনুচররা যুদ্ধে যোগ দেওয়ার সপক্ষে খেড়ায় প্রচার করতে গিয়ে চাষীদের কাছ থেকে প্রচণ্ড হতাশজনক সাড়া পান—'আগে যে গ্রামবাসীরা তাঁদের মালা হাতে অভ্যর্থনা করেছিলেন এখন তাঁরা তাঁদের খাবার দিতে অস্বীকার করেন' (হার্ডিমান, *পেজেন্ট অ্যাজিটেশন্ ইন খেড়া ডিস্ট্রিক্ট : ১৯১৭-১৯৩৪*, সাসেক্স গবেষণানিবন্ধ, ১৯৭৫, পৃ. ১১৩, ১৫১ থেকে উদ্ধৃত)।

শ্বেতাঙ্গ কুঠিয়াল ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে চম্পারন ও খেড়ায় যে আন্দোলন তার বদলে ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯১৮-য় আহ্‌মেদাবাদে যে-পরিস্থিতিতে গান্ধী হস্তক্ষেপ করেন, সেটি ছিল একান্তভাবেই গুজরাটের মিলমালিক ও তাঁদের শ্রমিকদের মধ্যেকার সঙ্ঘর্ষ। সাবরমতী আশ্রমের গোড়ার দিকের আর্থিক সহায় ছিলেন বস্ত্রশিল্প চূড়ামণি অম্বালাল সরাভাই। তাঁর বোন অনসূয়া বেন গান্ধীর শিষ্যায় পরিণত হন। সত্যাগ্রহের সময়ে তিনি খেড়া পরিদর্শন করেন আর মিলশ্রমিকদের মধ্যে শুরু করেন নৈশ বিদ্যালয়। ১৯১৭-র দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সময়ে মিলমালিকরা 'মড়কের বোনাস' বন্ধ করার উদ্যোগ করলে গান্ধীর সালিশির চেষ্টা সত্ত্বেও মোকাবিলা বেধে যায়। মড়কের বোনাসের বদলে শ্রমিকরা ৫০% মজুরি বৃদ্ধি (পরে গান্ধীর উপদেশে কমিয়ে ৩৫% করা হয়) দাবি করেন আর মালিকরা দিতে চান মাত্র ২০%। মার্চ ১৯১৮-য় গান্ধীর নেতৃত্বে আহ্‌মেদাবাদ ধর্মঘটটি স্মরণীয়—মহাত্মার তরফে প্রথম অনশন ধর্মঘটের অস্ত্র ব্যবহারের সুবাদে (১৫ মার্চ থেকে)। প্রথাগতভাবে এই ব্যাপারটিকে শ্রমিকদের ভাঙা মনকে চাঙ্গা করার সার্থক প্রচেষ্টা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। গান্ধী যে জঙ্গী পিকেটিং কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন, অনশন ছিল তার বিকল্প। কিন্তু জুডিথ ব্রাউন জেলাশাসকের যে প্রতিবেদন উদ্ধৃত করেছেন সেখান থেকে একটি কৌতূহলজনক অন্য ভাষ্য পাওয়া যায়। বলা হয়েছে যে, শ্রমিকরা 'তাঁকে (গান্ধীকে) প্রচণ্ড অপমান করেছিলেন, কারণ তিনি মিল-মালিকদের বন্ধু, তাঁদের মোটরে চেপে ঘুরছেন, ও তাদের সঙ্গে চর্বচুষ্য খাচ্ছেন আর তাঁতিরা রয়েছেন অনাহারে।' এইসব 'বিদ্রূপে জর্জরিত হয়ে' গান্ধী নাকি তাঁর অনশন শুরু করেছিলেন। যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, অনশন ধর্মঘট শ্রমিকদের মজুরি ৩৫% বাড়াতে সফল হয়। ১৯২০-র ব স্ত্র শি ল্প শ্রমিক স ভা-র মাধ্যমে আহ্‌মেদাবাদ শ্রমিকদের ওপর গান্ধীর প্রভাব আরও সুসংহত হয়। এই সভা প্রতিষ্ঠার তিনটি ভিত্তি ছিল। যেমন, বিবাদের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সালিশির দর্শন, পুঁজি ও শ্রমের পারস্পরিক নির্ভরতা, আর মালিকরাই শ্রমিকদের 'অছি' এই ধারণা। আহ্‌মেদাবাদের মিলমালিক ও শ্রমিক—দুপক্ষের সঙ্গেই গান্ধীর চমৎকার ব্যক্তিগত যোগাযোগই এখানে এইসব পদ্ধতির সাফল্যের কারণ। এই গান্ধীপন্থী ধাঁচে শুধু 'শ্রেণীযুদ্ধে'র পথে রাজনৈতিক সক্রিয়তাকেই বর্জন করা হয় নি, সেই সঙ্গে জঙ্গী আর্থনীতিক সংগ্রামও বর্জিত হয়েছে। কিন্তু এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই ধাঁচটি কখনোই আহ্‌মেদাবাদের বাইরে ছড়ায় নি। এ আই টি ইউ সি-তে কমিউনিস্টরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার অনেক আগে, একেবারে গোড়া থেকেই গান্ধী নিজেকে ঐ সংস্থা থেকে কঠোরভাবে দূরে সরিয়ে রাখেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য অনেক জাতীয়তাবাদী নেতার সঙ্গে তাঁর কোনো মিল ছিল না। শ্রেণীতে শান্তি ও পারস্পরিক

সমঝওতার বাণী সর্বহারার চেয়ে কৃষককুলের ক্ষেত্রে অনেক বেশি কার্যকর হয়েছিল, কারণ গ্রামাঞ্চলের শোষণ মাঝে মাঝে 'পিতৃসুলভ' রূপ গ্রহণ করে, আর ভূমিরাজস্ব বা লবণ করের মতো বিষয় ঐক্যবিধায়ক অভিযোগের কারণ জোগান দিয়েছিল।

১৯১৯-এর গোড়া অবধি সর্বভারতীয় রাজনীতির বিভিন্ন ব্যাপারে গান্ধীর হস্তক্ষেপ ছিল তুলনায় নগণ্য। অ্যানি বেসান্ট-কে অন্তরীণ করার প্রতিবাদ ও আলী ভাইদের মুক্ত করার জন্যে (যাঁদের মাধ্যমে তিনি লখনউ-এর আবদুল বারি-র মতো মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আগের থেকেই গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ গড়ে তুলতে শুরু করেছিলেন) বারবার আবেদনের মধ্যেই এই হস্তক্ষেপ সীমাবদ্ধ ছিল। যে-সংস্কার প্রস্তাব অন্যান্য বেশির ভাগ রাজনৈতিক নেতাদের প্রচণ্ড মনোযোগ দাবি করছিল, তাতে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান নি। কিন্তু তাঁকে সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সত্যাগ্রহের দিকে ঝুঁকতে বাধ্য করে ফেব্রুয়ারি ১৯১৯-এ প্ররোচনামূলক রাওলাট আইনের প্রবর্তন।

রাওলাট সত্যাগ্রহ

৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮ মার্চ ১৯১৯-এর মধ্যে তথাকথিত 'রাওলাট' আইনটিকে (১৯১৮-য় বিচারপতি রাওলাট-এর পরিচালনাধীন রাজদ্রোহ কমিটির (সিডিশন কমিটি) কতকগুলি সুপারিশ এই আইনের অন্তর্ভূত করা হয়েছিল) সাম্রাজ্য-পরিষদে তৎপরতার সঙ্গে অনুমোদন করিয়ে নেওয়া হয়, যদিও সমস্ত অ-সরকারি ভারতীয় সদস্যরা এর বিরোধিতায় একমত ছিলেন। বিশেষ আদালত ও বিনা বিচারে অধিকতম দুবছর আটকের (এমনকি রাজদ্রোহমূলক বলে ঘোষিত কোনো পুস্তিকা বাড়িতে রাখার মতো কাজও তার আওতায় পড়ত) একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে এই আইনে নাগরিক অধিকারের ওপর যুদ্ধকালীন বাধানিষেধকে স্থায়ী করার একটি প্রচেষ্টা প্রতিফলিত হয়। সরকারি ও অ-সরকারি শ্বেতাঙ্গ জনমতের একটা বড় অংশ মন্টাগু-র উদারনৈতিক বিভিন্ন প্রতিশ্রুতি ও দ্বৈত শাসন অনুমোদনের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছিলেন, সম্ভবত এই আইনের মাধ্যমে তাঁদের শান্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর সঙ্গে বড়লাট আশ্বাস দেন যে, আসন্ন বিভিন্ন সংস্কারের ফলে বেসামরিক পরিষেবা ও ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থের কোনো ক্ষতি হবে না। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাওলাট আইন শুধু সক্রিয় রাজনীতিকদেরই ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল, কিন্তু খুদে উৎপীড়ক হিসেবে সর্বত্র পুলিশের কুখ্যাতির কথা বিবেচনা করলে তাদের আরও ক্ষমতা দেওয়ার যে-কোনো প্রচেষ্টা অনেক বড় রকমের আতঙ্ক সৃষ্টি করতে বাধ্য।

ভারতীয় রাজনৈতিক মতামতের সব অংশেই রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানালেও একমাত্র গান্ধীই একটি বাস্তবসম্মত সর্বভারতীয় গণ-প্রতিবাদের পরামর্শ দেন। এই প্রতিবাদ আবেদন-নিবেদনের সীমা অতিক্রম করে, কিন্তু তার মধ্যে রাশছাড়া বা হিংসাত্মক হওয়ার কোনো মতলব ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে বরং পরিকল্পনাটি ছিল যথেষ্ট সংযত, অর্থাৎ নিষিদ্ধ বইপত্র প্রকাশ্যে বিক্রি করে স্বেচ্ছাসেবকরা কারাবরণ করবেন। ২৩ মার্চ গান্ধী সেই পরিকল্পনাকে বাড়িয়ে ৩০ মার্চ একটি সর্বভারতীয় হরতাল ডাকার (পরে ৬ এপ্রিল অবধি মুলতুবি রাখা হয়) নতুন ও অনেক বেশি র‍্যাডিকাল ধারণা যোগ করেন। কিন্তু রাশ টানার

ব্যাপারটি ছিল প্রথম থেকেই : ইচ্ছাকৃতভাবে হরতালের দিন ঠিক করা হয় একটি রবিবার। আর গান্ধী পরিষ্কারভাবে জানান, 'যেসব কর্মচারীকে রবিবারেও কাজ করতে হয়, তাঁরা নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে আগাম ছুটি নেওয়ার পর তবেই কাজে বিরতি দিতে পারেন।' আর্যসমাজী নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-র রাজস্ববন্ধের প্রস্তাব তিনি খারিজ করে দেন ('ভাইসাহেব, আপনি তো মানবেন যে, সত্যাগ্রহের ব্যাপারে আমি একজন বিশেষজ্ঞ!') আর বয়স্ক নরমপন্থী নেতা দিনশা ওয়াছা-কে তাঁর কর্মসূচি মেনে নিতে উপরোধ করেন এই যুক্তিতে যে 'উঠতি প্রজন্ম আবেদন ইত্যাদিতে সন্তুষ্ট হবে না ... আমার মনে হয়, সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করার একমাত্র পথ হলো সত্যাগ্রহ' (ওয়াছা-কে চিঠি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯)।

তাঁর সত্যাগ্রহ সংগঠনের জন্য গান্ধী তিন ধরনের রাজনৈতিক যোগসূত্র কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন—বিভিন্ন হোম রুল লীগ, কয়েকটি ইসলামপন্থী গোষ্ঠী, আর একটি সত্যাগ্রহ সভা, যেটি তিনি নিজে ২৪ ফেব্রুয়ারি বোম্বাইতে চালু করেছিলেন। দুটি হোম রুল লীগের কনিষ্ঠ র‍্যাডিকাল সদস্যদের একটি নেতার প্রয়োজন ছিল, কারণ অ্যানি বেসান্ট হঠাৎ নরমপন্থী হয়ে গিয়েছিলেন (১৯১৮-র দিল্লী কংগ্রেসে মণ্টফোর্ড সংস্কার সমর্থন করায় তাঁকে চিৎকার করে থামিয়ে দেওয়া হয়) আর সেপ্টেম্বর ১৯১৮-য় টিলক ইংল্যাণ্ড যাত্রা করেন। যমনাদাস দ্বারকাদাস, শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, ওমর শোভানি ও বি জি হর্নিম্যান-এর মতো বেসান্টপন্থী হোম রুল লীগের উৎসাহীরা সত্যাগ্রহ সভা-র জন্য সবচেয়ে বেশি লোকবল ও অর্থ জোগান। টিলকের কিছু তরুণ অনুগামীও গান্ধীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন, যদিও তাঁর প্রধান সহচররা, যেমন এন সি কেলকর বা জি এস খাপার্ডে সরে থাকেন। কিছু মুসলমান নেতার সঙ্গে গান্ধী আগেই চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য লখনউ-তে ফিরঙ্গী মহাল উলেমা গোষ্ঠীর আবদুল বারি (তখনও পর্যন্ত অন্তরীণ আলী ভাইদের ধর্মগুরু)। অটোমান তুর্কী হেরে গেছে, আর বিজেতা মিত্রশক্তি প্রচণ্ড নির্মম শান্তির শর্তাবলি তৈরি করেছে—এই গুজব ছড়িয়ে পড়ার দরুন ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সুলতান খলিফার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ছিল। নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্যে মুসলিম লীগের দিল্লী অধিবেশন (ডিসেম্বর ১৯১৮) ছিল লক্ষণীয়, কারণ এই অধিবেশনে জওয়ান দলের (ইয়ং পার্টির) বেশি নরমপন্থী যে-অংশ (ওয়াজির হাসান, মাহমুদাবাদ) মণ্টফোর্ড সংস্কার মেনে নিতে চেয়েছিলেন, তাঁরা একটি মৈত্রীবদ্ধ শক্তির হাতে ক্ষমতাচ্যুত হন। ঐ মৈত্রীতে ছিলেন আনসারি-র মতো র‍্যাডিকাল রাজনীতিক ও উলেমার একটি বড় গোষ্ঠী যাঁদের নিয়ে এসেছিলেন আবদুল বারি। আনসারি ঐ অধিবেশনে গান্ধীকে 'ভারতের নির্ভীক নেতা হিসেবে স্বাগত জানান...যিনি... নিজেকে যতটা হিন্দুদের ততটাই মুসলমানদের কাছে প্রিয় করে তুলেছেন।' মধ্য মার্চ ১৯১৯-এ গান্ধীর সঙ্গে একটি সাক্ষাতের পর বারি রাওলাটের আইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের সপক্ষে সম্মতি জানান। বিশেষভাবে এই আন্দোলনের জন্যেই যে সংগঠন শুরু করা হয়েছিল সেই সত্যাগ্রহ সভা প্রচারমূলক রচনা প্রকাশ ও সত্যাগ্রহের পক্ষে শপথপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহে মনোনিবেশ করে। আর গান্ধী নিজেও নামলেন এক ঘূর্ণিযাত্রায়, মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে তিনি বোম্বাই, দিল্লী, এলাহাবাদ, লখনউ ও দক্ষিণ-ভারতের বেশ কয়েকটি শহর সফর করেন। দল হিসেবে কংগ্রেস এ-ব্যাপারে আদৌ আসে নি। দেশের বেশির ভাগ অংশে প্রকৃত

বিক্ষোভমূলক রাজনীতির জন্যে প্রয়োজনীয় কাঠামো তখনও অবধি কংগ্রেসের ছিল না। যেখানে এজাতীয় কিছু ছিল, যেমন বাঙলা ও মহারাষ্ট্রের পুরোনো চরমপন্থী যোগসূত্র, সেখানে বাস্তবে গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধই হয়ে উঠেছিল শক্তিশালী।

এইসব থেকে যা বেরিয়ে আসে তা হলো, সাংগঠনিক প্রস্তুতি ছিল খুবই সীমাবদ্ধ ও খাপছাড়া, আর এপ্রিল ১৯১৯-এ যে ঝড় ওঠে তার অনুপাতে লক্ষণীয়ভাবে দুর্বল। ১৮৫৭-র পর এটিই ছিল ভারতে দেখা বৃহত্তম ও উগ্রতম ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থান। মার্চের মাঝামাঝি সত্যাগ্রহ-শপথপত্রে স্বাক্ষরকারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৯৮২ : বোম্বাই শহরে ৩৯৭, গুজরাটে ৪০০, সিন্ধুতে ১০১ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বাইরে মাত্র ৮৪। যে-প্রদেশটি সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় তা হলো পাঞ্জাব। এখানে হোম রুল লীগের হাল ছিল সবচেয়ে দুর্বল (যুদ্ধকালীন বাধানিষেধের কারণে) এবং আন্দোলন ফেটে পড়ার আগে গান্ধী পাঞ্জাব সফর করার সময় পান নি।

হান্টার কমিশন ও কংগ্রেসের পাঞ্জাব তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন (১৯২০) এবং রবীন্দর কুমার-সম্পাদিত সাম্প্রতিক মূল্যবান গবেষণাপত্রের সংগ্রহ (*এসেস্ অন গান্ধীয়ান পলিটিক্স*)—এসব মিলিয়ে আমরা একটা আকাঁড়া উত্থানের ছবি পাই। তা জ্বলে ওঠার পেছনে যেসব কারণের সম্মিলন হয়েছিল সেগুলি হলো : যুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক অভিযোগ, গান্ধী সম্পর্কে নানান গুজব—অস্পষ্টতা ও ভ্রান্তির কারণেই যেগুলি শক্তিমান—এবং বিশেষভাবে পাঞ্জাবে নির্মম প্ররোচনা ও দমনপীড়ন। আন্দোলনটি সম্পূর্ণ নগরকেন্দ্রিক বলে মনে হয়। শিল্পশ্রমিকদের চাইতে এই আন্দোলনে সব মিলিয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন বিভিন্ন নিম্ন-মধ্যশ্রেণী ভুক্ত গোষ্ঠী ও কারিগররা। ৩০ মার্চ ও ৬ এপ্রিল ভারতের বেশির ভাগ শহরে হরতাল হলেও তার পরবর্তী গোলযোগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত স্থানগুলি ছিল অমৃতসর, লাহোর, গুজরনওয়ালা। পাঞ্জাবের বেশ কয়েকটি ছোটোছোটো শহর, গুজরাটের আহমেদাবাদ, বীরামগাম ও নাদিয়াড়, দিল্লী, বোম্বাই এবং (পরিমাণে কিছু কম) কলকাতা।

নির্মমভাবে সৈন্য-সংগ্রহ ও যুদ্ধকালীন দাবি আদায়, ১৯১৫-র গদর উত্থানের পর প্রচণ্ড অত্যাচার এবং বিভিন্ন শিক্ষিত গোষ্ঠীকে অপমান করে আনাড়ির মতো বক্তৃতার (কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি ধরে নিয়েছিলেন যে 'শিক্ষিতরাই হলেন জনগণের স্বাভাবিক নেতা', পৃ. ২৪) ফলে এই কমিটির প্রতিবেদনে ঐ বিষয়টির ওপর সম্ভবত অতিরিক্ত জোর দেওয়া হয়। এ কারণে ছোটোলাট ও'ডায়ার-এর পাঞ্জাব প্রশাসন লোকের কাছে পুরোপুরি অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ১৯১৯-এর আগেই। লাহোর নিয়ে রবীন্দর কুমারের অনুসন্ধানে আরও সুনির্দিষ্ট কয়েকটি উপাদানকে চিহ্নিত করা হয় : ১৯১৭ থেকে ১৯১৯-এর মধ্যে খাদ্যশস্যের দাম বেড়েছিল ১০০%, কিন্তু কারিগরদের মজুরি বৃদ্ধি হয় মাত্র ২০-২৫%; ১৯১৩-য় শীর্ষস্থানীয় স্বদেশী উদ্যোগী হরকিষণ লালের পিপলস্ ব্যাঙ্ক অফ পাঞ্জাব ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারে ও'ডায়ার-এর সক্রিয় যোগসাজসের ফলে লাহোরে হিন্দুপ্রধান বণিক সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক সাধবাঞ্ছা বড়রকম ঘা খায়; মুকুন্দলাল পুরী ও গোকুলচন্দ নারাঙ-এর মতো ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আর্যসমাজী ব্যারিস্টারদের (সেই সঙ্গে পুরনো চরমপন্থী রামভজ দত্ত ও সনাতন ধর্মসভা-র পৃষ্ঠপোষক রামশরণ দাসের) ব্রিটিশবিরোধী রাজনৈতিক ধ্যানধারণা প্রচার এবং মুসলমানদের

জাগরণ। এর প্রেরণা জুগিয়েছিলেন সাংবাদিক জাফর আলী খান, ও সবের ওপর ইকবালের প্রথম জাতীয়তাবাদী পর্যায়ের কবিতা (যখন তিনি তাঁর বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমের কবিতা 'হিন্দুস্তাঁ হামারা' লিখেছিলেন এবং ঘোষণা করছিলেন : 'বিরক্ত হয়ে ছেড়েছি আজিকে তাই মন্দির ভজনালয়, / মোল্লার কথা শুনি না, ছেড়েছি উপদেশ তব কাহিনীময় / ... আমার কাছে তো স্বদেশের এই ধূলিকণাগুলি দেবতাময়')।*

১৯১৯-এর গোড়ার দিকে কিছু হিন্দু-মুসলমান-শিখের লক্ষণীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল এমন একটি প্রদেশে যেটি তার আগে ও পরে সাম্প্রদায়িক বিভেদের জন্য চিহ্নিত। এই ব্যাপারটিই মনে হয় ও'ডায়ার ও অন্যান্য ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের সবচেয়ে বেশি আতঙ্কিত করে তুলেছিল। ৩০ মার্চ ও ৬ এপ্রিল অমৃতসরে হরতাল ছিল শান্তিপূর্ণ কিন্তু বিশাল ব্যাপার। আর ৯ এপ্রিলের রামনবমী মিছিলের বর্ণনা হাণ্টার কমিশন দিয়েছিল এইভাবে, 'মুসলমানরা বিশাল সংখ্যায় যোগ দিয়েছিল ... হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে অগ্রগতির ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য নমুনা—নানান মতের মানুষ প্রকাশ্যে একই পাত্র থেকে জল খাচ্ছে।' ঐ সন্ধ্যাতেই অমৃতসরের আঞ্চলিক নেতা কিচলু ও সত্যপাল-কে বহিষ্কার করা হয় আর জারি হয় দিল্লী ও পাঞ্জাবে গান্ধীর প্রবেশ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা। ১০ এপ্রিল অমৃতসরে হল্ সেতুর কাছে শান্তিপূর্ণ মিছিলে গুলি চালানোর পর ব্রিটিশ কর্তৃত্বের প্রতীক ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, রেলওয়ে স্টেশন ও টাউন হল্-এর ওপর আক্রমণ করা হয়। ১১ এপ্রিল শহরে জারি হয় সামরিক আইন, অধিনায়ক ছিল জেনারেল ডায়ার। ১৩ এপ্রিল এক শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র জনতা (বেশির ভাগই গ্রামবাসী) একটি মেলার জন্যে জড়ো হয়েছিলেন, সভার ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা তাঁদের জানানো হয় নি। একটি ঘেরা মাঠ জালিয়ানওয়ালাবাগে বিন্দুমাত্র হুঁশিয়ারি না-দিয়ে ডায়ার ঐ জনতার ওপর আক্রমণ করে। পরে সরকারি হিসেবে মৃতের সংখ্যা বলা হয় ৩৭৯, বেসরকারি বিবরণে তার সংখ্যা আরও অনেক বেশি। হাণ্টার কমিশনের সামনে ডায়ার-এর একমাত্র দুঃখ ছিল এই যে, তার গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল, আর গলিটা সরু হওয়ার ফলে সে সাঁজোয়া গাড়ি আনতে পারে নি—কারণ জনতাকে শুধু ছত্রভঙ্গ করা নয়, এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল 'একটা নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি করা'র প্রশ্ন। ছোটোলাটের পুরো সমর্থন নিয়ে এর পরের কয়েক সপ্তাহও ডায়ার তার 'নৈতিক প্রভাব সৃষ্টি'র কাজ চালিয়ে যায়। তার পদ্ধতি ছিল : নির্বিচারে গ্রেপ্তার, অত্যাচার, বিশেষ আদালত, প্রকাশ্যে বেত মারা, বিশেষ কন্‌স্টেবল হিসেবে নিচু কাজে আইনজীবীদের নিয়োগ, 'নেটিভ'রা যাতে সব সায়েবকে সেলাম জানায় তার জন্যে জবরদস্তি, আর যে কুচা কুচিয়ানওয়ালা লেন-এ জনৈক শ্বেতাঙ্গ মহিলা অপমানিত হয়েছিলেন সেখানে ভারতীয়দের হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা।

লাহোরে ৬ ও ৯ এপ্রিলের শান্তিপূর্ণ হরতাল ও মিছিল আর-একবার অসাধারণ সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে ওঠে। এরপর গান্ধীর বহিষ্কার ও অমৃতসরের ঘটনার গুজব পৌঁছলে ১০ তারিখে পুলিশের সঙ্গে রক্তাক্ত সংঘর্ষ ঘটে। মুসলমান কারিগর ও শ্রমিকরা বিশেষভাবে জঙ্গী হয়ে ওঠেন আর জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন রামভজ দত্তের মতো প্রতিষ্ঠিত নেতারা। ১১ এপ্রিল মুঘলপাড়া রেলওয়ে কর্মশালায় (কর্মীর সংখ্যা ১২,০০০) ও অনেক কারখানায় ধর্মঘট হয়। পরিস্থিতি এত ঘোরালো হয়ে ওঠে যে ব্রিটিশরা শহর থেকে সেনা-

* মনিরুদ্দীন ইউসুফের তর্জমা—সম্পা.।

ছাউনি এলাকায় সরে আসে। বাদশাহী মসজিদে এক বিশাল জমায়েত গণ-কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। ১১ থেকে ১৪ এপ্রিল অবধি শহরের নিয়ন্ত্রণ কার্যত এই কমিটির হাতেই ছিল। কিন্তু এটি গঠিত হয়েছিল মধ্যশ্রেণীর রাজনীতিকদের নিয়ে, আর এত আকস্মিকভাবে জনগণ তাঁদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ায় তাঁরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাঁরা ছিলেন চাপ দেওয়ার রাজনীতিতে অভ্যস্ত, আর বিপ্লবের জন্যে নিশ্চয়ই তৈরি ছিলেন না। ফলে হরতালের সময় খাবার জোগানোর জন্যে কয়েকটি লঙ্গরখানা খোলা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন নি। ১৩ এপ্রিল টাউন হল্‌-এর সভায় হরতাল তুলে নেওয়া বাবদে তাঁদের প্রচেষ্টা একমাত্র গণ-ক্ষোভের ফলেই ব্যর্থ হয়। বিকল্প হিসেবে খুবই অল্পস্থায়ী, আরও জঙ্গী নেতৃত্বের আভাসও পাওয়া যায়। যেমন, চমন দিন-এর পরিচালনাধীন ৪০ জন সদস্যের 'ডাণ্ডা ফৌজ' লাঠি ও খেলনা বন্দুক নিয়ে পথ পরিক্রমা করে আর জ্বালাময়ী পোস্টার সাঁটে : 'হে হিন্দু, মুসলমান ও শিখ ভাইরা এক্ষুনি ডাণ্ডা ফৌজে নাম লেখাও আর ইংরেজ বাঁদরদের বিরুদ্ধে হিম্মতদার লড়াই করো...ইংরেজদের সঙ্গে লেনদেন ছেড়ে দাও, বন্ধ করো দপ্তর ও কর্মশালা। লড়াই চালিয়ে যাও। এই হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর হুকুম।' ১৪ এপ্রিল ব্রিটিশরা সবলে ফিরে আসে, গণ-কমিটির নেতাদের নির্বাসনে পাঠায়, আর সামরিক আইন দিয়ে চুরমার করে উড়িয়ে দেয় গণ-আন্দোলন।

রাওলাট আইন নিয়ে গোলযোগে গুরুতর ঘা খেয়েছিল পাঞ্জাবের পাঁচটি জেলা : অমৃতসর ও লাহোর ছাড়াও গুজরানওয়ালা, গুজরাট ও লয়ালপুর। দিল্লীর সঙ্গে গুজরাট, গুজরানওয়ালা, লাহোর ও অমৃতসরের যোগসূত্র উত্তর-পশ্চিম রেলপথ লাইনে সাধারণ ধর্মঘটের আশঙ্কায় ব্রিটিশরা প্রচণ্ড উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। ধর্মঘট না হলেও হান্টার কমিশন লক্ষ্য করে, 'শহরের জনসংখ্যার নিচু স্তরের সঙ্গে সঙ্গে রেলকর্মচারীরাও বিশেষভাবে সংক্রামিত' হয়েছেন। ঐ কমিশন কংগ্রেস কমিটির প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত হয় যে, 'কৃষক সম্প্রদায়ের বিশাল অংশ প্রভাবিত হয় নি'। সরকারি বাড়িঘর, যোগাযোগ ব্যবস্থা (১০ থেকে ২২ এপ্রিলের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার নষ্ট করে দেওয়ার ঘটনা ছিল ৫৪ টি) ও মাঝে মাঝে এক-একজন শ্বেতাঙ্গের ওপর বিক্ষিপ্ত আক্রমণ—সবত্রই হুক ছিল এই। এর পরিণামে আসে অনেক বেশি উগ্র নৃশংস ও নির্মম পীড়ন। তার মধ্যে ছিল ১৪ এপ্রিল গুজরানওয়ালা ও তার আশপাশের গ্রামগুলোয় আকাশ থেকে বোমা ফেলা, সামরিক আইন ট্রাইব্যুনাল মারফত বেত মারার ২৫৮টি দণ্ডাজ্ঞা, আর 'মজা মারা-র শাস্তি', যেমন, মাটিতে নাক ঘসে দেওয়া ও পাঞ্জাবের গা-পোড়ানো রোদে সমস্ত লোককে সারা দিন ঠায় দাঁড় করিয়ে রাখা (১ মে কসুর-এ—এখানে একটি ১১ বছরের ছেলের নামে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগ আনা হয়); জনতা ও সরকারি হিংসার মধ্যে বিষম অনুপাতের আভাস পাওয়া যায় এই তথ্য থেকে যে, গোটা পাঞ্জাবে নিহত হয়েছিলেন মাত্র ৪ জন শ্বেতাঙ্গ, আর ভারতীয় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল : অন্ততপক্ষে ১২০০ মৃত ও ৩৬০০ আহত। কংগ্রেসের প্রতিবেদনে এই তথ্য পাওয়া যায়।

১৯১২-য় (কলকাতা থেকে) দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে নেওয়ার পরে সেখানে রাজনৈতিক জাগরণ গোছের একটা ব্যাপার ঘটেছিল। আনসারি-র পরিচালনায় হোম রুল লীগের একটি শাখা ফেব্রুয়ারি ১৯১৭ থেকে দিল্লীতে সক্রিয় ছিল এবং শহরটি হয়ে দাঁড়ায় সর্ব-ইসলামি

ক্রিয়াকলাপের এক কেন্দ্র। হিন্দু নিম্নমধ্যশ্রেণীর ওপর শ্রদ্ধানন্দের অনন্য প্রভাব ছিল। নভেম্বর ১৯১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯১৯-এর মধ্যে স্থানীয় ভাষার পাঁচটি র‍্যাডিকাল সংবাদপত্র বার করা হয়। এপ্রিল ১৯১৯-এ প্রতিষ্ঠিত নেতা আনসারি বা হাকিম আজমল খানের চেয়ে অনেক বেশি র‍্যাডিকাল ভূমিকা ছিল ঐ সব কাগজের সম্পাদকদের (যেমন *বিজয়*-এর ইন্দ্র, *কংগ্রেস* ও *ইনকিলাব*-এর আসিফ হুসেন হাসবি আর *কউম*-এর কাজী আব্বাস হুসেন)। ডি ডবলিউ ফেরেল-এর গবেষণায় বিভিন্ন আর্থনীতিক উপাদানের গুরুত্বও লক্ষ্য করা হয়েছে। শহরে ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারির বলি হয়েছিলেন ৭০০০ মানুষ। নুন বিকোচ্ছিল ১৯১৪-র চেয়ে চারগুণ বেশি দামে কেরোসিন পাওয়া যাচ্ছিল না। (সংখ্যায় ভারি) হিন্দু ব্যবসায়ীরা যুদ্ধকালীন করের ফলে তিতিবিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন, আর হস্তশিল্পের পতনের ফলে কারিগরদের বৃহৎ সম্প্রদায়ের (বেশির ভাগই মুসলমান) প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল। যেমন, লেস ও সূচিশিল্পের কাজে নিযুক্তের সংখ্যা ১৯১১-১৯২১-এর মধ্যে ১৮,০০০ থেকে নেমে আসে ৪০০০-এ। দিল্লী শহরে রাওলাট (- বিরোধী) আন্দোলন হয়েছিল তিনটি পর্যায়ে। ৩০ মার্চ-এর হরতাল চিহ্নিত হয়ে আছে রেল স্টেশনের কাছে ও চাঁদনী চক-এ পুলিশের গুলি চালানোর ঘটনা দিয়ে। এরপর আসে তুলনায় নিশ্চুপ অবস্থা। এইসময়ে জামা মসজিদে একটি স্মরণীয় জমায়েত হয় (৪ এপ্রিল) যেখানে মুসলমান ও হিন্দু দুইপক্ষই স্বামী শ্রদ্ধানন্দের চরণ চুম্বন করেন। গান্ধীর বহিষ্কারের খবরে ১০ থেকে ১৮ এপ্রিল অবধি টানা হরতাল চলে, সেইসঙ্গেই ধর্মঘট করেন ব্যাঙ্কের কেরানিরা। রেল ধর্মঘটের চেষ্টা হয় ১৩ এপ্রিল। লাহোরের মতোই এখানেও অচিরেই প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দ ও এমনকি আরও র‍্যাডিকাল সাংবাদিকদের আতঙ্কিত করে তোলে নিচুশ্রেণীর জঙ্গীভাব—'মধ্যশ্রেণী ও নিচুশ্রেণীর মধ্যে অলিখিত সমঝওতা যেমন আচমকা গড়ে উঠেছিল ঠিক তেমনিভাবেই মিলিয়ে যেতে শুরু করে' (ফেরেল)। ১৭ এপ্রিল চাঁদনী চক-এ আরও এক দফা গুলি চালানোর পর অচিরেই শহর আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়।

গান্ধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার (= বহিষ্কার) খবর পেয়ে ১১ এপ্রিল আহ্‌মেদাবাদে এক বিশাল ও সত্যিই উগ্র অভ্যুত্থান হয়। এই সময়ে দাঙ্গাকারীরা (প্রধানত সুতোকল শ্রমিক) ৫১টি সরকারি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। তারপরে সামরিক আইনে যে-ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে সরকারি হিসেব অনুযায়ী, নিহতের সংখ্যা ছিল ২৮ এবং আহত হল ১২৩ জন। ১২ এপ্রিল নিকটবর্তী শহর বিরামগম-এও মজুর-জনতা মারমুখী হয়ে ওঠে। আর বোম্বাই শহরে ১০-১১ এপ্রিল দুদিন স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল হয়। কিন্তু পরিস্থিতি ছিল মোটামুটি শান্ত। এখানে শিল্প-শ্রমিকদের চেয়ে গুজরাটি ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন পেশানির্ভর গোষ্ঠী ছিল অনেক বেশি লক্ষণীয়। বিক্ষোভের মূল কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ-মধ্য বোম্বাই ('সি' ও 'ডি' ওয়ার্ড), সর্বহারা-প্রধান পারেল নয়। গান্ধী এখানে হাজির থাকায় অবশ্যই বিক্ষোভ সংযত থাকে আর খেড়া জেলার নাদিয়াড়-এ 'শ্রীযুক্ত গান্ধীর জনৈক অনুগামীর শিক্ষার সুবাদে' গণ-হিংসা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। 'তিনি ১১ এপ্রিল আহ্‌মেদাবাদ থেকে আসেন ও জনগণকে শান্ত থাকতে রাজি করান' (হান্টার প্রতিবেদন)। বোম্বাই সরকারের প্রতিক্রিয়াও ছিল পাঞ্জাবের চেয়ে অনেক বেশি সংযত। পাঞ্জাব ছিল সীমান্ত প্রদেশ, সেখান থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বড় অংশের জোগান আসত।

কলকাতায় হরতাল হয় ৬ ও ১১ এপ্রিল। ১১ এপ্রিল নাখোদা মসজিদে হিন্দু-মুসলমানের

একটি যৌথ জমায়েত হয়, আর ১২ তারিখে পাঁচমেশালি বাসিন্দাদের হ্যারিসন রোড ও চিৎপুর-বড়বাজার অঞ্চলে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ বাধে। ব্রিটিশরা মেশিনগান চালিয়ে ৯ জনকে খতম করে। কলকাতায় বিক্ষোভের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল অ-বাঙালি হিন্দু মারোয়াড়ি ও মুসলমানদের মুখ্য ভূমিকা আর বাঙালি ছাত্রদের তুলনায় গুরুত্বহীনতা—স্বদেশী দিনগুলোর ঠিক উল্টো। মাদ্রাজ শহরে প্রতিবাদ ছিল অহিংস কিন্তু সমুদ্রতটে বেশ কয়েকটি শ্রমিকসভা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন টি ভি কল্যাণসুন্দর মুদালিয়ার (তিরু বি ক —)। তিনি ছিলেন কংগ্রেসপন্থী ও ১৯১৮-র পথিকৃৎ মা দ্রা জ শ্র মি ক ই উ নি য় ন-এর অন্যতম প্রধান সংগঠক) ও সুব্রহ্মণ্য শিব (১৯০৮-এর টুটিকোরিন ধর্মঘটের প্রবীণ চরমপন্থী)। দেশের অন্যত্র খুব একটা লক্ষণীয় সাড়া দেখা যায় নি। যেমন মধ্যপ্রদেশে কেবল ছিন্দোয়ানা, আকোলা ও অমরাবতীতেই আংশিক বা পূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল।

অভূতপূর্ব মাত্রায় ব্রিটিশ পীড়নে ভারতীয় রাজনীতিকদের বেশির ভাগই কিছুকাল ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন বলে মনে হয়। যেমন, কলকাতায় একটি প্রকাশ্য প্রতিবাদসভার ব্যবস্থা করা অসম্ভব বলে প্রমাণ হয়। জাতির যন্ত্রণা ও ক্রোধকে ভাষা দেওয়ার ভার পড়ে রবীন্দ্রনাথের ওপর। একটি বিখ্যাত চিঠি মারফত তিনি তাঁর নাইট উপাধি ত্যাগ করেন। ৩০ মে ১৯১৯-এ পাঞ্জাব বিভীষিকার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া সেই বহুজীর্ণ বেসরকারি তদন্ত কমিটির কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্বয়ং গান্ধীর ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া ছিল এই : এই ব্যাপক হিংসার ফলে—বিশেষ ভাবে আহ্‌মেদাবাদে তার স্ব-ভূমে—তিনি তাঁর 'হিমালয়প্রমাণ ভুল' স্বীকার করেন (১৮ এপ্রিল), ও তাড়াতাড়ি সত্যগ্রহ প্রত্যাহার করে নেন। এর পর থেকে পর্যাপ্ত সাংগঠনিক ও ভাবাদর্শগত প্রস্তুতি ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আন্দোলন শুরু করার ব্যাপারে তিনি চূড়ান্ত সতর্ক হয়ে যান।

সংস্কার প্রস্তাবে আনুষ্ঠানিক সম্মতি জানানো হয় ১৯১৯-এ, আর সেই সঙ্গে যেসব বন্দীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগ ছিল না, তাঁদের ক্ষেত্রে রাজকীয় ক্ষমাপ্রদর্শনের ফলে কিছু ক্ষণস্থায়ী আশা জেগে ওঠে। সব মিলিয়ে এই সাবধানতা দিয়ে সম্ভবত ঐ একই মাসের অমৃতসর কংগ্রেসে (খানিকটা অবাক করার মতো) বিভিন্ন জোটের ব্যাখ্যা করা যায়। আগের বছর দিল্লীতে কংগ্রেস ইতোমধ্যেই মণ্টফোর্ড সংস্কারের বিরুদ্ধে সমালোচনামূলক অবস্থান নিয়েছিল। এর ফলে অবশিষ্ট পুরনো নরমপন্থীরা দলত্যাগ করেন ও সপ্রু, জয়কর ও চিন্তামণির নেতৃত্বে গঠন করেন একটি জাতীয় উদারপন্থী সভা (ন্যাশনাল লিবারেল অ্যাসোসিয়েশন)। অমৃতসরে একটি প্রস্তাবে মণ্টাগুকে ধন্যবাদ জানানো হয় ও নতুন কাউন্সিল-এর কাজকর্মে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবকে পরিপূর্ণ সমর্থন জানান গান্ধী। গান্ধীর বিরোধিতা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন দাস, টিলক, রামভজ দত্ত চৌধুরী ও হসরত মোহানি-র উপরোধে সংস্কার আইনটিকে হতাশাজনক বলে একটি আপসসূচক ধারা যোগ করা হয়। সেপ্টেম্বর ১৯২০ নাগাদ কিন্তু এইসব জোট পুরো উল্টে যায়। এই সময়ে গান্ধী কাউন্সিল বয়কট ও অসহযোগের জন্যে প্রচণ্ড চাপ দিতে থাকেন, আর চিত্তরঞ্জন ও টিলকের অনুগামীরা তা আটকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু খিলাফতের ব্যাপারটিকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেস ও গোটা জাতীয় রাজনীতি—দুক্ষেত্রেই গান্ধী ততদিনে আধিপত্য করার অবস্থায় পৌঁছে গেছেন।

১৯১৯-১৯২০ : নেতৃবৃন্দ ও জনসাধারণ

গান্ধী, খিলাফত ও কংগ্রেস

১৯১৯-২০-র ঘটনাধারায় গান্ধীর ক্ষমতায় 'উত্থান' বা জাতির নেতৃত্ব 'দখলে'র প্রক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে রিচার্ড গর্ডন, জুডিথ ব্রাউন ও ফ্রান্সিস রবিনসন-এর সাম্প্রতিক রচনায়। ব্যাপারটা মোটের ওপর খুব কৌশলী উঁচুস্তরের রাজনৈতিক খেলার চেয়ে বেশি কিছু নয়—জোরটা সর্বদাই এই দিকে।

পরাজিত অটোমান সাম্রাজ্যের ওপর এক নির্মম শান্তিচুক্তি চাপিয়ে দেওয়া হবে—এই গুজব অচিরাৎ নিশ্চিত হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে ১৯১৯-২০-তে খিলাফত আন্দোলনও দ্রুত বেগ অর্জন করছিল। মার্চ ১৯২০-তে প্যারীতে মহম্মদ আলী কূটনীতিকদের কাছে এই আন্দোলনের যে তিনটি কেন্দ্রীয় দাবি হাজির করেন সেগুলি হলো : মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলির নিয়ন্ত্রণ যেন অবশ্যই তুর্কীর সুলতান অর্থাৎ খলিফার হাতে থাকে, খলিফা যাতে ইসলামি ধর্মবিশ্বাসকে রক্ষা করতে পারেন তার জন্যে তাঁকে পর্যাপ্ত জায়গা দিতে হবে, এবং জাজিরাত-উল-আরব (আরব, সিরিয়া, ইরাক ও প্যালেস্টাইন) যেন অবশ্যই মুসলিম সার্বভৌমত্বের অধীনে থাকে। যথারীতি এই আন্দোলনে গড়ে ওঠে একটি নরমপন্থী ও একটি র‍্যাডিকাল ধারা। প্রথমটির কেন্দ্রবিন্দু ছিল কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি, এটি সংগঠিত করেন বোম্বাই-এর সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ীরা। দ্বিতীয় ধারাটি গড়ে উঠেছিল নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর সাংবাদিক ও উলেমাদের নিয়ে। এঁদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল ছোটো ছোটো শহরে ও গ্রামে, বিশেষভাবে যুক্ত প্রদেশ, বাঙলা, সিন্ধু ও মালাবারে। বোম্বাই নেতৃবৃন্দ (গোড়ায় টাকাপয়সার নিয়ন্ত্রণ ছিল তাঁদেরই কব্জায়, যতদিন-না আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার পর গণ-তহবিল সংগ্রহ সম্ভব হয়) বিক্ষোভটিকে ভব্যসভ্য স্মারকপত্র এবং লন্ডন ও প্যারীতে প্রতিনিধিদল পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাইতেন। কিন্তু ১৯২০-র গোড়ার দিকে দুই আলী ভাই অন্তরীণ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তাঁদের নেতৃত্বে র‍্যাডিকালরা দেশব্যাপী হরতালের জন্যে চাপ দেন (যেমন ১৭ অক্টোবর ১৯১৯ ও ১৯ মার্চ ১৯২০)। ২২-২৩ নভেম্বর ১৯১৯-এ দিল্লীতে সারা ভারত খিলাফত সম্মিলনে এই গোষ্ঠীর তরফ থেকেই সর্বপ্রথম অসহযোগের ডাক আসে।

জুডিথ ব্রাউন বলেছেন, সালিশির ভূমিকায় নেমে গান্ধী গোড়ায় নিজেকে দুপক্ষের কাছেই অবশ্যগণ্য করে তোলেন। তাঁকে ছাড়া হিন্দু রাজনীতিকদের সঙ্গে যোগসূত্র রাখাও সম্ভব ছিল না, আর খিলাফত নেতারা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্যে প্রচণ্ড উৎসুক ছিলেন, কারণ তা না হলে কোনো অসহযোগ আন্দোলন—যার মধ্যে [সরকারি] চাকরি ও কাউন্সিল বয়কট থাকবেই—স্পষ্টতই ছিল অসম্ভব। ডিসেম্বর ১৯১৯ নাগাদ মুসলিম লীগের প্রস্তাবে বকরিদে গো-হত্যা বর্জনের জন্যে যে-ডাক দেওয়া হয় তার থেকে তাঁদের আগ্রহ ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা উচিত যে, তখন বা তারপরে কোনদিনই হিন্দু নেতৃবৃন্দ ঐ প্রস্তাবের স্বাভাবিক প্রতিদান হিসেবে মসজিদের সামনে গান-বাজনা বন্ধ করার কথা বলেন নি, যদিও সেটি হিন্দুত্বের ঠিক অপরিহার্য অংশ নয়, আর বকরিদ ছিল একটি কেন্দ্রীয় ধর্মানুষ্ঠান। মে ১৯২০ অবধি গান্ধী মোটের ওপর বোম্বাই গোষ্ঠীরই পক্ষে ছিলেন। যেমন নভেম্বর ১৯১৯-এ খিলাফত

সম্মেলনে হসরত মোহানি ব্রিটিশ জিনিসপত্র বয়কট করার ডাক দিলে তিনি তার বিরোধিতা করেন (বোম্বাই ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগই ছিলেন এইসব জিনিসপত্রের আমদানিকার ও খুচরো বিক্রেতা)। ঘটনা মোড় নিল ১৪ মে ১৯২০-তে তুর্কীর সঙ্গে সেভর্স-এর চুক্তির প্রচণ্ড কঠোর শর্তাবলি প্রকাশ পাওয়ার পর, তারপরেই বেরল পাঞ্জাবের গোলযোগ সম্পর্কে হান্টার কমিশনের সংখ্যাগুরু প্রতিবেদন, তিক্তভাবে গান্ধী যাকে 'পাতার পর পাতা অপটুভাবে চাপা-দেওয়া সরকারি সাফাই' বলে অভিহিত করেন। একটি সংরক্ষণ (ইনডেম্‌নিটি) আইনের মাধ্যমে ভারত সরকার আগে থেকেই নিজের আধিকারিকদের নিরাপত্তা দিয়ে রেখেছিল—এবার ও'ডায়ার-কে দোষারোপ থেকে রেহাই দেওয়া হয়, ডায়ার-কে নিন্দা-প্রস্তাব সংসদের উচ্চকক্ষ (হাউস অফ লর্ডস) খারিজ করে দেয়, আর জালিয়ানওয়ালাবাগের কসাই-এর জন্যে 'মর্নিং পোস্ট' পত্রিকা ২৬,০০০ পাউণ্ড চাঁদার তোড়া তোলে।

কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির এলাহাবাদ সভায় (১-৩ জুন ১৯২০) যোগ দেন কিছু জাতীয়তাবাদী হিন্দু নেতা। এখানে র‍্যাডিকালরা জয়ী হন, গান্ধী এবার তাঁদের সমর্থন করেন। চার পর্যায়ের অসহযোগ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় (উপাধি, অসামরিক পরিষেবা, পুলিশ ও সেনাবাহিনী বয়কট, আর শেষে কর-বন্ধ)। 'পাঞ্জাব অন্যায়', 'খিলাফত অন্যায়' ও 'স্বরাজ'—এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে একই ধরনের একটি আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়ার জন্যে গান্ধী কংগ্রেসের ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। শেষ বিষয়টির, পুরোপুরি ইচ্ছে করেই, কোনো সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয় না। গোড়ায় পূর্ণ সমর্থন আসে শুধু গুজরাট ও বিহার থেকে। কাউন্সিল নির্বাচন (নভেম্বর ১৯২০-তে ধার্য) বয়কটের মতো সংশয়িত ব্যাপারে মোতিলাল নেহরু প্রথমে দোলামনা করছিলেন (তাঁর ছেলের মতো নয়) আর চিত্তরঞ্জন দাস ও টিলকপন্থীরা এর প্রবল বিরোধিতা করেন। সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর ১৯২০-র মধ্যে গান্ধীর কর্মসূচির সপক্ষে প্রতিষ্ঠিত নেতৃবৃন্দের এই নাটকীয় পরিবর্তনকে গর্ডন ও ব্রাউন অনেকটাই নির্বাচনী সম্ভাবনার রাজনৈতিক হিসেব-নিকেশের নিরিখে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই আমরা শুনি, লাজপত রায় ২৫ জুন নির্বাচন বয়কট সমর্থন করেছিলেন, কারণ মধ্য-জুনে পাঞ্জাবে নির্বাচনের যে-নিয়মকানুন ঘোষণা করা হয় তাতে ঐ প্রদেশের শহরবাসী হিন্দুভিত্তিক কংগ্রেসের জেতার সম্ভাবনা ছিল অল্প। এর উল্টোদিকে, পুরনো চরমপন্থী শক্ত ঘাঁটি বাঙলা ও মহারাষ্ট্রে কাউন্সিল বয়কটের বিরোধিতা ছিল সবচেয়ে শক্তিশালী, যেহেতু এই দুজায়গার নির্বাচনী সম্ভাবনা ছিল তুলনায় উজ্জ্বল। মোতিলাল নাকি বুঝতে পারেন যে, যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস নির্বাচনের ব্যাপারে সাংগঠনিকভাবে তৈরি নয়, কলকাতা বিশেষ কংগ্রেসে (৪-৯ সেপ্টেম্বর ১৯২০) তাঁর সমর্থনই নির্ণায়ক বলে প্রমাণ হয়। খেতাব ত্যাগ, 'ত্রিমুখী বয়কট' (বিদ্যালয়, আদালত ও কাউন্সিল), বিদেশী জিনিস বয়কট, এবং জাতীয় স্কুলের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান, সালিশি আদালত ও খাদি— এই কর্মসূচি ঐ বিশেষ কংগ্রেসের বিষয়নির্বাচনী কমিটিতে ১৪৪ বনাম ১৩২ ভোটে, ও প্রকাশ্য অধিবেশনে আরও এনেক বেশি ব্যবধানে (১৮৫৫ বনাম ৮৭৩) গৃহীত হয়। অবশ্য অসামরিক পরিষেবা, পুলিশ বা সেনাবাহিনী থেকে পদত্যাগ অথবা কর-বন্ধের উল্লেখ মাত্র করা হয় নি। নাগপুর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২০) চিত্তরঞ্জন দাস নাটকীয়ভাবে অন্য পক্ষে চলে যান। বাঙলা থেকে বড় বিরোধী প্রতিনিধিদল আনতে তিনি ৩৬,০০০ টাকা খরচ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

তিনিই কেন্দ্রীয় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন ও সেটিকে মেনে নেন : 'অহিংস অসহযোগ পরিকল্পনার সম্পূর্ণ বা যে-কোনো অংশ, যার একদিকে থাকবে সরকারের সঙ্গে স্বেচ্ছাকৃত সম্পর্ক ত্যাগ ও অন্যদিকে কর দিতে অস্বীকৃতি এবং এই পরিকল্পনাটি কার্যকর করার সময় স্থির করবে হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, না-হলে এ আই সি সি' (সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি)। যাই হোক না কেন, কাউন্সিল নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছিল। আর গান্ধীর 'এক বছরের মধ্যে স্বারাজ' প্রতিশ্রুতির (*ইয়ং ইণ্ডিয়া*-র ২২ সেপ্টেম্বরের একটি প্রবন্ধে এটি প্রথম দেওয়া হয়) তাৎপর্য ছিল সম্ভবত একটি অনুচ্চারিত বোঝাপড়া; যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অসহযোগের মাধ্যমে স্বরাজ না আসে তাহলে গোটা ব্যাপারটা আবার খতিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু অন্তত সেই সময়ের জন্যে গোটা কংগ্রেস ছিল গান্ধীর পায়ের তলায়। কংগ্রেসের অঙ্গীকারের বয়ান সংশোধন করে বলা হলো : 'সমস্ত রকম আইনানুগ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ অর্জন' —'স্বরাজ' ব্যাপারটিকে আবার ইচ্ছে করেই আবছা রাখা হয়। কংগ্রেসকে এই প্রথম সত্যিকারের গণ-রাজনৈতিক দলে পরিণত করার ব্যাপারে গান্ধীর নির্বন্ধে কংগ্রেস সংগঠনে বিভিন্ন চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হয় : চার আনা চাঁদা দিয়ে নিয়মিত সদস্যপদ ; গ্রাম-তালুক-জেলা বা শহর কমিটির একটি ক্রমবিন্যাস ; ভাষাগত ভিত্তিতে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি ঢেলে সাজানো, যেখানে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধির সংখ্যা বেঁধে দেওয়া হবে; আর যথার্থ কার্যকর শীর্ষভাগ হিসেবে একটি ছোটো ১৫ সদস্য-বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী (ওয়ার্কিং) কমিটি।

তলার থেকে চাপ

ব্যক্তিগতভাবে নেতাদের অসহযোগের সপক্ষে 'ঘুরে যাওয়া'র ক্ষেত্রে নির্বাচনী হিসেব-নিকেশ হয়তো খানিক ভূমিকা নিয়েছিল, কিন্তু এখানেও খিলাফত ও পাঞ্জাবের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে প্রকৃত আবেগ ও ক্রোধের যে-উপাদান জেগে উঠেছিল তাকে কোনোমতেই ছোটো করে দেখলে চলবে না। 'তুমি [হাণ্টার প্রতিবেদনের] যে সংক্ষিপ্তসার পাঠিয়েছ তা পড়ার পর থেকে আমার রক্ত টগবগ করে ফুটছে। আমাদের এখন অবশ্যই একটা বিশেষ কংগ্রেস ডাকতে হবে এবং শয়তানগুলোকে নাস্তানাবুদ করে তুলতে হবে' (জওহরলালকে মোতিলাল নেহরু, ২৭ জুন ১৯২০)। একধরনের জনশক্তিতরঙ্গ যে খিলাফত ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের দুপক্ষকেই আরও বেশি র‍্যাডিক্যাল পথ নিতে বাধ্য করেছিল তার যথেষ্ট সাক্ষ্য জুডিথ ব্রাউন নিজেই হাজির করেছেন : অগাস্ট ১৯২০-তে ভাগলপুরে বিহার প্রাদেশিক সম্মিলনে ১৮০ সদস্যের কৃষক প্রতিনিধি, যাঁদের সমর্থনের ফলে অসহযোগ প্রস্তাবের জয় সুনিশ্চিত হয়, কলকাতায় বিষয়নির্বাচনী কমিটি ও প্রকাশ্য অধিবেশনের মধ্যে ভোটদানের সংখ্যার বিশাল ব্যবধান, নাগপুরে ১৪,৫৮২ জন প্রতিনিধি (কংগ্রেস ইতিহাসে তখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি)। কলকাতা ও নাগপুরে গান্ধীর পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন আসার উৎস ছিল মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী ও বণিকদের দেশব্যাপী যোগসূত্র, মুসলমান খিলাফতিরা এবং অন্ধ্রের মতো তুলনায় নিস্তরঙ্গ বিভিন্ন অঞ্চল। ভাষাভিত্তিক পুনর্বিন্যাসের জন্যে অন্ধ্রের দাবিকে গান্ধী এপ্রিল ১৯২০ থেকেই বিবেচনা করতে থাকেন, নাগপুরে সংশোধিত কংগ্রেস সংবিধানে এই দাবিটিকে স্থান দেওয়া হয়। বিভিন্ন স্থানীয় স্তরে খিলাফতের প্রশ্নটির বহু বিচিত্র ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, ফলে এই আপাত সুদূর ও অবাস্তব

বিষয়টি দ্রুত এক নতুন মাত্রা অর্জন করে। যুক্ত প্রদেশের নিচুশ্রেণীর মুসলমানরা নাকি খিলাফতকে উর্দু শব্দ 'খিলাফ' (বিরুদ্ধে)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত করেন ও কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্রোহের প্রতীক হিসেবে এটি কাজে লাগান। আর মালাবারের চির-অস্থির মোপলারা অচিরেই এই শব্দটিকে ভূস্বামী-বিরোধী বিদ্রোহের ধ্বজায় পরিণত করেন।

মুসলমানদের মানসিকতা ও আশা উদ্দীপিত করার ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত উপাদান ছিল আফগানিস্তান-এর নতুন আমির আমানুল্লাহ্-র ব্রিটিশ-বিরোধী অবস্থান। মে জুন ১৯১৯-এ-ব্রিটিশ ভারতের বিরুদ্ধে তিনি একটি অল্পস্থায়ী যুদ্ধ করেন ও কিছু যোগাযোগ গড়ে তোলেন বলশেভিক রাশিয়ার সঙ্গে। জুন ১৯২০-তে কম করেও ২০,০০০ মুসলমান মুহাজিরিন সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে পায়ে হেঁটে বিশাল 'হিজরত' করে আফগানিস্তানে যান। যে-সরকার খলিফাকে বেইজ্জত করেছিল এই হিজরত ছিল সেই সরকারের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগ। অগাস্ট ১৯২০-তে *জমিনদার* পত্রিকার সম্পাদক জাফর আলী খান একটি বক্তৃতায় ঘোষণা করেন যে 'মাহ্‌দি (ইসলামি ত্রাণকর্তা)-র আবির্ভাবের সময় হয়েছে'। এর জন্যে তাঁকে পাঁচ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়। গান্ধীর এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতিতে অস্পষ্টতা ও বাস্তবতার অভাবের জন্যেই জলোচ্ছ্বাসের মতো ভাবী সুখরাজ্যের আশা জেগে ওঠে। সবচেয়ে বড় কথা, ১৯১৯ ও ১৯২০ এই বছর দুটিও ছিল শ্রমিকদের ব্যাপক অস্থিরতা, সংগঠন ও কৃষক জাগরণের সময়—এই দিকগুলিকে কেমব্রিজ বিদ্বান্‌রা পুরোপুরি উপেক্ষা করেছেন।

১৯১৯-এর শেষ থেকে ১৯২০-র গোড়া অবধি ধর্মঘটের যে-তরঙ্গ আসে, প্রায় সমসাময়িক একটি বিবরণ থেকে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যগুলির এই তালিকাটি পাওয়া যায় : 'নভেম্বর ৪ থেকে ডিসেম্বর ২, ১৯১৯, উলের মিল, কানপুর, বাইরে ১৭০০০ জন ; ডিসেম্বর ৭, ১৯১৯ থেকে ৯ জানুয়ারি ১৯২০, রেলকর্মী, জামালপুর, বাইরে ১৬০০০ জন ; জানুয়ারি ৯-১৮, ১৯২০, চটকল, কলকাতা, বাইরে ৩৫০০০ জন ; জানুয়ারি ২ থেকে ফেব্রুয়ারি ৩, সাধারণ ধর্মঘট, বোম্বাই, বাইরে ২০০,০০০ জন ; জানুয়ারি ২০-৩১, মিলশ্রমিক, রেঙ্গুন, বাইরে ২০,০০০ জন ; জানুয়ারি ৩১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া নেভিগেশন কম্পানি, বোম্বাই, বাইরে ১০,০০০ জন ; জানুয়ারি ২৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৬, মিলশ্রমিক, শোলাপুর, বাইরে ১৬,০০০ জন ; ফেব্রুয়ারি ২৪ থেকে মার্চ ২৯, টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিলের ৪০,০০০ জন শ্রমিক বাইরে; মার্চ ৯, মিলশ্রমিক, বোম্বাই, বাইরে ৬০,০০০ জন ; মার্চ ২০-২৬ মিলশ্রমিক, মাদ্রাজ, বাইরে ১৭,০০০ জন ; মে ১৯২০, মিলশ্রমিক, আহ্‌মেদাবাদ বাইরে ২৫,০০০ জন' (আর কে দাস, *ফ্যাক্টরি লেবার ইন ইন্ডিয়া*, বার্লিন,১৯২৩, পৃ. ৩৬-৭)। শুধু ১৯২০-র দ্বিতীয় অর্ধেই বাঙলায় ১১০টি ধর্মঘট হয়েছিল। ধর্মঘটের সামনের সারিতে না থেকে ট্রেড ইউনিয়নগুলো বরং থাকত পেছনে, আর সেগুলি অল্পজীবী ধর্মঘট কমিটির বেশি কিছু ছিল না। তাহলেও ইউনিয়ন-এর সংখ্যা শ্রমিক সংগঠনের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। বাঙলা সরকারের এক গোপন প্রতিবেদনের হিসেব অনুযায়ী তুলনায় স্থায়ী 'শ্রমিক ইউনিয়ন ও অ্যাসোসিয়েশন'-এর সংখ্যা ১৯২০-তে ছিল ৪০, ১৯২১-এ ৫৫ ও ১৯২২-এ ৭৫। আর ১৯২৬-এ বোম্বাই-এ সক্রিয় ৫৩টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৭টি ১৯২০-র আগের। ১৯২০ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে তৈরি হওয়া ইউনিয়নের সংখ্যা ছিল অন্যূন ২৯টি।

আন্দোলন ছিল শান্তিপূর্ণ ও সংযত। ব্যতিক্রম শুধু জোর করে কিছু গাছ কাটার ঘটনা আর কোঠিয়া দুমাই-এ একটি সঙ্ঘর্ষ (২০ জুন ১৯২০) যখন নিকটবর্তী ভাওয়ারা নীলকুঠির (দারভাঙ্গা থেকে লিজ নেওয়া) লাঠিয়ালরা বিদ্যানন্দের একটি সভা ভেঙে দেয়। দারভাঙ্গা রাজের আমলাতন্ত্র ছিল সুদক্ষভাবে সংগঠিত, জানুয়ারি ১৯২০-তে সম্পন্ন রায়তদের কিছু ছাড় (যেমন, জমি হস্তান্তরের ফি কমানো ও কাঠের ব্যাপারে কিছু অধিকার ছেড়ে দেওয়া) দিয়ে তারা পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করে দেয়। ১৯২০-র শেষ দিকে বিদ্যানন্দ নিজে নির্বাচনী রাজনীতির দিকে ঘুরে যান (জমিনদারের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে উত্তর-দারভাঙ্গা ও উত্তর ভাগলপুরে জয়ী হন পাঁচজন কিসান প্রার্থী) আর ঐ বছরের শেষদিকে আন্দোলন শেষ হয়ে যায়। বিহার কংগ্রেস নেতৃত্বের মনোভাবের দরুন দারভাঙ্গার রাজ যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিল। আন্দোলন সমর্থনের জন্যে বিদ্যানন্দের আবেদনকে বিহার কংগ্রেসের নেতৃত্ব বারবার নাকচ করে দেয়। এপ্রিল ১৯২০-তে রাজেন্দ্র প্রসাদের উপরোধে বিহার প্রাদেশিক সম্মিলন দারভাঙ্গা রায়তদের অভাব-অভিযোগ সংক্রান্ত তদন্তের আরজি শিকেয় তুলে রাখে, আর ভাওয়ারার ঘটনার পর বিহার কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, অর্থাৎ হাসান ইমাম, মজহারুল হক ও রাজেন্দ্র প্রসাদকে বিদ্যানন্দের সভায় যোগ না দিতে রাজি করানো সম্ভব হয় সহজেই। বিহার সরকারের একটি গোপন প্রতিবেদন অনুযায়ী—'তিরহুত মহকুমার ভারতীয় জমিনদারদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপকভাবে। এই ব্যাপারটিকে তাঁরা শ্রেণী হিসেবে জমিনদারদের ওপর সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ বলে মনে করেন ও এর বিরুদ্ধে নীলকরদের সঙ্গে তাঁরা একজোটে লড়তে তৈরি। জমিনদারদের এক প্রতিনিধিদল পাটনায় শ্রীযুক্ত হাসান ইমাম-এর সঙ্গে মোলাকাত করতে এসেছিল....'। (৭ অগাস্ট ১৯২০-র চিঠি, 'গভর্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া হোম পলিটিকাল ডিপোজিট', সেপ্টেম্বর ১৯২০, সংখ্যা ৫০)।

১৯২০-২১-এ যুক্ত প্রদেশের অবধ অঞ্চলের প্রতাপগড়, রায় বেরেলী, সুলতানপুর ও ফৈজাবাদ জেলায় যে কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে, গোড়ার দিকের কৃষক আন্দোলনগুলির মধ্যে সেটিই সবচেয়ে সুপরিচিত। সাম্প্রতিককালে মজিদ সিদ্দিকি ও কপিল কুমার এটি নিয়ে বিশদ পর্যালোচনা করেছেন। হারকোর্ট বাটলার (১৯২০-র দশকে যুক্ত প্রদেশের ছোটোলাট) যেটিকে 'সহানুভূতির নীতি' বলেছেন, তার মাধ্যমে ব্রিটিশরা অবধ তালুকদারদের (যারা ১৮৫৭-য় অত দুর্ধর্ষরূপে দেখা দেন) সমর্থন অর্জনের জন্যে সাধ্যমতো চেষ্টা করে। কার্যত এর অর্থ দাঁড়ায় নিজেদের (অবধ-এ দখলী অধিকার ছিল না বললেই হয়, এটি আগ্রা প্রদেশের একেবারে উল্টো ছবি) ক্ষেত্রে তালুকদারদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া, যাতে খাজনা রাজস্ব-দাবির নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধিকে ছাড়িয়ে যেতে পারে (১৯২১-২২-এ অবধ-এ অধিবাসীদের ওপর মাথাপিছু ভূমিরাজস্ব ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বাঙলার চেয়ে প্রায় চারগুণ বেশি)। ১৮৮৬-র আউধ খাজনা আইন কার্যত প্রায় কোনো নিরাপত্তাই দেয় নি। নতুন ধরনের বিধিবদ্ধ রায়তদের জন্যে ৭ বছর খাজনা বেঁধে দেওয়া ও বৃদ্ধির উর্ধ্বসীমা ৬$\frac{1}{4}$% এর ব্যবস্থা করা হয়। ভূস্বামীরা উচ্ছেদের ('বেদখলি') ভয় দেখিয়ে জবরদস্তি-নজরানা (প্রতি বছরের পর রায়তি স্বত্ব নবীকরণের জন্যে প্রদেয় সেলামি—এটি প্রায়ই খাজনার চেয়ে বেশি হয়ে যেত) আদায় করে তা এড়িয়ে যেত। নানারকম উপকর ও বেগার খাটনি (যখন ভূস্বামীরা কৃষকদের লাঙল চালানোর দলকে

নিখরচায় কাজে লাগাত, যাকে বলা হতো 'হরি') আদায়ের দরুনও কৃষকরা নির্যাতিত হয়েছেন। যজমানী ব্যবস্থাকে শোষণের একটি কার্যকর অস্ত্র করে তোলে শ্রেণী-আধিপত্যের সঙ্গে জাতপাতের গাঁটছড়া। উঁচু জাতের ভূস্বামী বা সম্পন্ন কিসানদের নিচু জাতের মানুষরা বিনা পয়সায় বা বাজারদরের চেয়ে কমে ঘি, জামা কাপড় বা চামড়া দিতে বাধ্য হতেন। জিনিসপত্রের চড়া দাম এইসব প্রথাগত প্রদেয়কে করে তোলে আরও নিপীড়নমূলক। আর যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে কৃষকদের অভাব-অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত হয় সেনাদলে বাধ্যতামূলক ভুক্তি ও তালুকদারদের 'লড়াই চাঁদা' সংগ্রহ।

আমরা আগেই দেখেছি, ফেব্রুয়ারি ১৯১৮-য় মালবীয়-র প্রতিভূ ইন্দ্রনারায়ণ দ্বিবেদী একটি যু ক্ত প্র দে শ কি সা ন স ভা পত্তন করেছিলেন। এলাহাবাদ হোম রুল লীগ ও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে প্রধানত আগ্রা প্রদেশে এই সভার ৪৫০টির মতো শাখা স্থাপিত হয়। ওপর থেকে মূলত ভাসাভাসা এই আন্দোলন কাউন্সিল বর্জনকে কেন্দ্র করে ১৯২০-র শেষদিকে ভেঙে যায়। দ্বিবেদী উদারনৈতিক প্রার্থীদের সমর্থনে কিসান ভোট জোটানোর চেষ্টা করতে থাকেন আর সহকর্মী গৌরীশঙ্কর মিশ্র যোগ দেন অসহযোগে। তত দিনে রায় বেরেলী-প্রতাপগড় অঞ্চলে যে মাটি-ঘেঁষা কৃষক আন্দোলন উঠে আসছিল, মিশ্র তার সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলেন। এই আন্দোলনের ভিত তৈরি করেছিলেন ঝিঙ্গুরী সিং নামে জনৈক বিক্ষুব্ধ উপস্বত্বাধিকারী ও বাবা রামচন্দ্র। রামচন্দ্র ছিলেন সন্ন্যাসী, ফিজি-তে কিছুদিন খতবন্দী শ্রমিক হিসেবে কাজ করে ঐ জেলায় এসেছিলেন। বাবা রামচন্দ্রের আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ছিল কিসানদের কাছে জোটবাঁধার আবেদন ও তার সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে 'রামায়ণ' ও জাতপাতের নারা ব্যবহারের মিশেল। অতএব, প্রতাপগড়ের রুর গ্রামটিকে যে প্রথম কিসান সভার ঘাঁটি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল, মনে হয় তার কারণ : তুলসীদাসে নাকি এই গ্রামের নাম আছে। বাবা রামচন্দ্রের সম্প্রতি আবিষ্কৃত ব্যক্তিগত কাগজপত্রে একটি 'কুরমি-ক্ষত্রিয় সভা'র কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সভাটি তিনি নাকি পরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আন্দোলনের দাবি ও পদ্ধতি ছিল যথেষ্ট নরমপন্থী : উপকর বা বেগারের বিলোপ (বা সাধারণত বেশির ভাগ সময়ে, হ্রাস), বেদখলি জমি চাষ করতে অসম্মতি, আর পঞ্চায়েতের মাধ্যমে অত্যাচারী ভূস্বামীদের নাপিত-ধোপা বন্ধের ব্যবস্থা ('নাই-ধোবী বন্ধ')। সেপ্টেম্বর ১৯২০-তে কিসান আন্দোলনের শক্তি ছবির মতো ফুটে ওঠে যখন প্রতাপগড়ে কৃষকদের একটি শান্তিপূর্ণ কিন্তু বিশাল মিছিল বাবা রামচন্দ্রকে কারামুক্ত করতে সমর্থ হয়। কয়েকদিন আগে তাঁকে চুরি করার সাজানো অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এদিকে জুন ১৯২০-তে রামচন্দ্র কয়েক'শ কৃষককে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদ ঘুরে আসার পর গৌরীশঙ্কর মিশ্র ও জওহরলাল নেহরুর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ গড়ে ওঠে। ফলে জওহরলাল 'কৃষকদের মধ্যে ঘোরাঘুরি' শুরু করে দেন। এই ব্যাপারটিকে তিনি পরে তাঁর আত্মজীবনীতে বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। অক্টোবর ১৯২০ নাগাদ নেহরু, মিশ্র ও রামচন্দ্রের নেতৃত্বে আউধ কিসান সভা প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর (ঐ মাসের শেষে প্রতাপগড়, রায় বেরেলী, সুলতানপুর ও ফৈজাবাদে ঐ সভার ৩৩০টি শাখা স্থাপন করা হয়) গান্ধীপন্থী কংগ্রেস যুক্ত প্রদেশ কৃষক আন্দোলনে তার কর্তৃত্ব কায়েম করার পথে বেশ ভালোমতো এগিয়ে যায়। আমরা পরে দেখব যে, কৃষকদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যাপারটির

ফলাফল কোনোদিক দিয়েই একান্ত সৌভাগ্যজনক হয় নি।

১৯২১-১৯২২ ঃ অসহযোগ ও খিলাফত

১৯২১-২২-এর অসহযোগ অভ্যুত্থানকে ভালোমতো বুঝতে গেলে এই তিনটি স্তরে তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন ঃ গান্ধীপন্থী কংগ্রেসি নেতৃত্ব সর্বভারতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় যেভাবে ঠিক করে দিতে চেয়েছিল, বিশিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠী ও শ্রেণীগুলির ভূমিকা, এবং এদের সবার মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে আগ্রহজনক ও গুরুত্বপূর্ণ—নানারকম আঞ্চলিক ও স্থানীয় বৈচিত্র্য।

সর্বভারতীয় আন্দোলন

যাকে 'সরকারি' আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যায়, তার মধ্যে চারটি পর্যায় শনাক্ত করা সম্ভব। (কংগ্রেস) কার্যনির্বাহী কমিটি বা সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির একের পর-এক আহ্বানে সে-আন্দোলনে সুনির্দিষ্ট সাড়া মিলেছিল। ১৯২১-এর জানুয়ারি থেকে মার্চ অবধি কেন্দ্রীয় গুরুত্বের বিষয় ছিল ছাত্রদের সরকার-নিয়ন্ত্রিত স্কুল ও কলেজ ত্যাগ আর আইনজীবীদের ওকালতি বর্জন। এমনকি চরখা কর্মসূচির প্রথমদিকেও প্রবল অভিমুখিতা ছিল বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের দিকেই। তখন গ্রামীণ জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়া এবং স্বদেশীর চট্জলদি পথের প্রতীক হিসেবে ছাত্র ও সাধারণভাবে শিক্ষিত নাগরিকদের স্বেচ্ছায় চরখা কাটতে উপরোধ করা হয়। কলকাতায় ও লাহোরে একাধিক বিশাল ছাত্র ধর্মঘট হলো, চিত্তরঞ্জন দাস ও মোতিলাল নেহরু-র মতো শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীরা ওকালতি ছেড়ে দিলেন। এই দর্শনীয় সূচনার পর একান্তভাবেই বুদ্ধিবৃত্তিজীবী-কেন্দ্রিক এই আন্দোলনে অচিরেই ভাঁটার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এপ্রিলে সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি-র বিজয়ওয়াড়া অধিবেশনে লক্ষ্য করা হয় যে, অসহযোগ চালানোর পক্ষে দেশ 'এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে নিয়মনিষ্ঠ, সংগঠিত ও পরিণত নয়'। এই অধিবেশনেই ঠিক হয়, ৩০ জুনের মধ্যে টিলক স্বরাজ তহবিলের জন্যে এক কোটি টাকা তোলা হবে, এক কোটি কংগ্রেস সদস্যের নামভুক্তি ও কুড়ি লাখ চরখা বসানোর কাজে মনোযোগ দেওয়া হবে। তলার থেকে চাপ বাড়ার দরুন ২৮-৩০ জুলাই বোম্বাই-এ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি-র সভা যেন আরও খানিক বেশি জঙ্গী মনোভাব নেয়। বিদেশী কাপড় বয়কট (প্রকাশ্য বহ্ন্যুৎসব সমেত) ও নভেম্বরে যুবরাজ (প্রিন্স অফ ওয়েলস)-এর আসন্ন সফর বর্জনের ব্যাপারেই লক্ষ্য কেন্দ্রীভূত করা হয়, যদিও কর দেওয়া বন্ধ করে পূর্ণমাত্রায় আইন অমান্যের বিষয়টি আবার মুলতুবি থাকে। গান্ধী এই সময় স্বেচ্ছাসেবক দিয়ে জেল ভরার ডাক দেন— 'কসাইখানায় ভেড়া নিয়ে যাওয়ার মতো হাজার হাজার লোককে জেলে নিয়ে যাওয়াতেই আমাদের জয়।' আর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠনই এখন হলো প্রথম কাজ। বিশাল সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবকদের নামভুক্তি, জঙ্গী ধর্না ও হাজার হাজার মানুষের কারাবরণ—এই রণকৌশলের মধ্যে যে নতুন গণ-অভিমুখিতা নিহিত আছে, বড়লাট রিডিং দ্রুত তার তাৎপর্য উপলব্ধি করেন ঃ '...বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদনের বদলে অজ্ঞ জনসাধারণের কাছে গান্ধীর আবেদন...পরিস্থিতি

বদলে দিয়েছে। কিন্তু বুদ্ধিজীবী ও বিত্তবান্ লোকেদের এটি আমাদের আরও কাছে নিয়ে আসবে—এই সুবিধা আছে' (ভারত-সচিবকে তারবার্তা, ১৫ অক্টোবর ১৯২১, *রিডিং কালেকশন*)। ১৭ নভেম্বর যুবরাজকে অভ্যর্থনা জানানো হয় এক প্রচণ্ড সফল দেশব্যাপী হরতাল করে। আর বোম্বাই-এ ঘটেছিল রক্তাক্ত সঙ্ঘর্ষ যার ফলে গান্ধী ঘোষণা করেন, 'স্বরাজ...আমার নাকে (তার) দুর্গন্ধ লেগেছে' বারডোলি-র একটি মাত্র বাছাই-করা তালুকে অসহযোগের পরিকল্পনা আর-একবার তিনি মুলতুবি রাখেন।

এইসব রাশ-টানা সত্ত্বেও নভেম্বর ১৯২১ ও ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এর মধ্যে চতুর্থ পর্যায়ের ঘটনাধারা সরকারকে প্রায় নতজানু করে দিয়েছিল। নভেম্বরে আলী ভাইদের জেলে পাঠানোর (জুলাই-এ করাচী খিলাফত সম্মিলনে সেনাবাহিনী থেকে মুসলমানদের বেরিয়ে আসার ডাক দিয়ে ভাষণ দেওয়ার কারণে) রাগে হসরত মোহানি-র মতো খিলাফত নেতারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা (যেমন, ডিসেম্বরে আহমেদাবাদ কংগ্রেসে) ও অহিংসার বর্জনের দাবি জানাচ্ছিলেন। ব্যাপক গ্রেপ্তার আর সভা-সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবক দলগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়; এই নতুন সরকারি নীতির ফলে লিবারেলরা সরে যাবেন—এমন আশঙ্কা দেখা দেয়। অন্য দিকে, মনে হয়েছিল দেশের একটা বড় অংশই (যেটি আমরা পরে দেখব) প্রভূত বিক্ষিপ্ত, অসংগঠিত প্রচণ্ড বিদ্রোহের কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছে। ডিসেম্বর ১৯২১-এ মণ্টাগু-র কাছে গোপন তারবার্তায় রিডিং বন্দীদের ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করেন। এ ছাড়াও তিনি একটি গোল টেবিল বৈঠক ও সদ্যপ্রযুক্ত সংস্কার প্রকল্পটি তাড়াতাড়ি শুধরে নেওয়ার পরামর্শ দেন (১৫, ১৭, ও ১৮ ডিসেম্বরের তারবার্তা)— ১৯৩০-এর দশকের পরিপ্রেক্ষিতে এটি একটি কৌতূহলজনক পূর্বসূচনা। যে-কোনো রকম আপসে গান্ধীর অস্বীকৃতিতে ও তার সঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তরফে এতদূর এগোনোর অনিচ্ছায় এটি চাপা পড়ে যায়। মতপ্রকাশ, সংবাদপত্র ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা খর্ব করা নিয়ে গান্ধী শেষে বারডোলি-তে একটি রাজস্ব-বন্ধ অভিযানের সিদ্ধান্ত করেন। ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এটি শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরী চৌরা-য় ৫ ফেব্রুয়ারি উত্তেজিত জনতা ২২ জন পুলিশকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরেছে—তার খবর পেয়ে এই অভিযান, ও তার সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে গোটা আন্দোলনই যে হঠাৎ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়, সে-কথা সুবিদিত।

সামাজিক বিন্যাস

অসহযোগ আন্দোলনের অভিঘাত বিষয়ে যা খবর পাওয়া যায় তার থেকে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর নানা প্রতিক্রিয়ার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীগুলোর কাছে আত্মত্যাগের যে-আবেদন করা হয়েছিল তা আদৌ খুব একটা সফল হয় নি। ৫১৮৬টি খেতাবের মধ্যে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাত্র ২৪টি, আর ওকালতি ছেড়েছেন এমন আইনজীবীর সংখ্যা মার্চ ১৯২১-এ দাঁড়িয়েছিল [মাত্র] ১৮০। নভেম্বর ১৯২০-এর নির্বাচনে ভোট কম পড়েছিল অনেক জায়গাতেই, বোম্বাই শহরে ও লাহোরে তা নেমে এসেছিল যথাক্রমে মাত্র ৮% ও ৫%-এ। কিন্তু ৬টি বাদে ৬৩৭টি আসনের সবক'টিতেই প্রার্থীরা দাঁড়িয়েছিলেন এবং কাউন্সিল-এর কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটানো যায় নি। শিক্ষাক্ষেত্রে বয়কট ছিল আরও বেশি কার্যকর, বিশেষ করে

বাঙলায়, যেখানে এপ্রিল ১৯২১ অবধি প্রতিমাসে প্রায় ২০ জন করে প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক পদত্যাগ করছিলেন, আর সরকারি বা তার সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানে পাঠরত ১০৩,১০৭ ছাত্র-র মধ্যে বেরিয়ে গিয়েছিলেন ১১,১৫৭ জন। গোয়েন্দা কর্মচারী ব্যামফোর্ড-এর গোপনীয় *হিস্ট্রি অফ দি নন্-কোঅপারেশন অ্যান্ড খিলাফৎ মুভমেন্ট* (১৯২৫)-এ সংগৃহীত সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, এই অভিঘাত কলেজগুলিতে যথেষ্ট হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে গরহাজির :

ছাত্র সংখ্যা

	কলাবিভাগীয় কলেজ	মাধ্যমিক বিদ্যালয়	প্রাথমিক বিদ্যলয়
১৯১৯-২০	৫২,৪৮২	১,২৮১,৮১০	৬,১৩৩,৫২১
১৯২১-২২	৪৫,৯৩৩	১,২৩৯,৫২৪	৬,৩১০,৪৫১

(ব্যামফোর্ড, পৃ. ১০৩)

বেশ কিছু জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজও খোলা হয়েছিল (যেমন, আলীগড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, পরে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়; বেনারসে কাশী বিদ্যাপীঠ, ও গুজরাট বিদ্যাপীঠ)। এইভাবে বিহার ও ওড়িশায় শুরু করা হয়েছিল ৪৪২টি প্রতিষ্ঠান, বাঙলায় ১৯০টি, বোম্বাই-এ ১৮৯টি ও যুক্ত প্রদেশে ১৩৭টি। এদের অনেকগুলিই উঠে গিয়েছিল, কারণ এক বছরের মধ্যে স্বারাজ না-আসায় প্রথাগত ডিগ্রি ও চাকরির টান স্বাভাবিকভাবেই আবার জোরদার হয়ে ওঠে—কিন্তু জাতীয়তাবাদের মূল্যবান শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে কাজ করার জন্যে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান টিকেও গিয়েছিল।

১৯০৫-০৮-এর চেয়ে আর্থনীতিক বয়কট ছিল অনেক বেশি তীব্র ও সফল। ১৯২০-২১-এ বিদেশী কাপড়ের আমদানি মূল্য ছিল ১০২ কোটি টাকা। ১৯২১-২২-এ সেটি ৫৭ কোটি টাকায় নেমে আসে। ঐ একই বছরগুলোয় ব্রিটিশ সুতির থানের আমদানি ছিল যথাক্রমে ১২৯২ লক্ষ গজ ও ৯৫৫ লক্ষ গজ। ধর্নার গুরুত্ব বজায় থাকলেও একটি নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল নির্দিষ্ট কালপর্বের জন্যে বিদেশী কাপড়ের বায়না না-দেওয়ার পক্ষে ব্যবসায়ীদের মিলিত শপথ। বিভিন্ন ধরনের কৌতূহলজনক ব্যবসায়িক চাপের কথাও জানা যায়। যেমন, দিল্লীর এক কারবারি রোহটক-এর হুন্ডি নিতে অস্বীকার করার হুমকি দিয়েছিলেন। ফলে ফেব্রুয়ারি ১৯২০-তে রোহটক একটি হরতালে যোগ দেয়। ল্যাঙ্কাশায়ার কাপড়ের আমদানিকারীদের পক্ষে ১৯২১-এর জাতীয়তাবাদ স্বল্পমেয়াদি ব্যবসায়িক স্বার্থের সঙ্গে চমৎকার খাপ খেয়ে গিয়েছিল, কারণ ১৯২১-এর শেষদিকে টাকা-স্টার্লিং বিনিময় হার ২ শিলিং থেকে ১ শিলিং ৪ পেন্স-এ নেমে যায়। ফলে ব্রিটিশ মালপত্রের জন্যে ভারতীয় ব্যবসাদারদের আগে যা চুক্তি হয়েছিল তার থেকে অনেক বেশি দিতে বলা হচ্ছিল। গান্ধী তাঁর *ইয়ং ইন্ডিয়া*-য় অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে শিল্পপতিদের তরফে চরখার ব্যাপারে সম্ভাব্য শত্রুতা কমানোর চেষ্টা করেন। এইসব প্রবন্ধে যুক্তি দেওয়া হয় যে, তাঁর আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো 'বর্তমান কলে তৈরি সুতো ও কাপড়ের পূরণ' (*ইয়ং ইন্ডিয়া*, ১৯ জানুয়ারি ১৯২১)। ঐ একই প্রবন্ধে বলা হয়, 'খোদ যন্ত্রপাতির ব্যাপারে' গান্ধীর 'সেরকম কোনো অভিসন্ধি নেই, অন্তত এখনকার মতো'।

কংগ্রেস তহবিলের অবস্থায় গুণগত পরিবর্তন আনার ব্যাপারে ব্যবসাদারদের সমর্থন ছিল নির্ধারক। ১৯২০-তে এ আই সি সি-র ভাঁড়ারে ছিল মাত্র ৪৩,০০০ টাকা, কিন্তু ১৯২১ ও ১৯২৩-এর মধ্যে তাঁরা ১৩০ লক্ষরও বেশি টাকা জোগাড় করতে পারলেন—আর টিলক স্বরাজ তহবিলের এক কোটি টাকার মধ্যে বিরাট এক পরিমাণ, ৩৭½ লক্ষ টাকা এসেছিল শুধু বোম্বাই থেকেই। ভারতীয় শিল্পের মূল্যমান সংরক্ষণ করার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে অক্টোবর ১৯২১-এ একটি রাজকোষ-ঘটিত কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। সম্ভবত অসহযোগে ব্যবসাদারদের সমর্থন দেখে ব্রিটিশ আতঙ্কই তার উপাদান কারণ। বড় ব্যবসাদারদের একটি লক্ষণীয় অংশ কিন্তু তখনও ছিল প্রতিকূল। পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, যমনাদাস, দ্বারকাদাস, কোবাসজী জেহাঙ্গীর, ফিরোজ সেঠনা ও সেতলবড মিলে ১৯২০-তে একটি অ স হ যো গ-বি রো ধী স ভা পত্তন করেন। জাতীয়তাবাদী স্বদেশী উত্থানে বস্ত্রশিল্প নিশ্চিতভাবে উপকৃত হয়েছিল (১৯১৩-য় ১০০ ধরলে, শেয়ারের সাধারণ গড় দাম ছিল তখন ২৪৮, আর অক্টোবর ১৯২১-এ সুতোকলের শেয়ারের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ২৭৫)। তবে শ্রমিক-অশান্তির (১৯২০-২১-এ তুঙ্গে পৌঁছেছিল) আশঙ্কাই সম্ভবত শিল্পপতিদের— ব্যবসাদারদের থেকে আলাদা—দোলাচল মনোভাব বজায় রাখার ক্ষেত্রে ছিল নির্ণায়ক। কলকাতায় ব্রিটিশ ব্যবসার মুখপত্র *ক্যাপিটাল* ১৩ জুলাই ১৯২২-এ কথাটা সাঁটে বলে দেয়। জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, পত্রিকাটি লেখে, 'মিল-মালিকদের প্রভাব বাড়িয়ে দিয়েছে, তাদের মালপত্রের দাম চড়িয়ে দিয়েছে। এই গুড়ে একমাত্র বালি হলো শ্রমিকদের খেপে যাওয়ার সম্ভাবনা' (সব্যসাচী ভট্টাচার্য, 'কটন মিলস্ অ্যান্ড স্পিনিং হুইলস্, স্বদেশী অ্যান্ড দি ইন্ডিয়ান ক্যাপিটালিস্ট ক্লাশ ১৯২০-২২', *ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিকাল উইকলি*, ২০ নভেম্বর ১৯৭৬)।

গোটা ১৯২১ জুড়ে শ্রমিকরা যেন সত্যিই 'খেপে উঠেছিলেন' বলে মনে হয়। এই সময়ে ৩৯৬টি ধর্মঘট হয়। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ৬০০,৩৫১ জন শ্রমিক এবং নষ্ট শ্রম-দিবসের পরিমাণ ছিল ৬,৯৯৪,৪২৬। যুদ্ধোত্তর জোয়ারের পর ভাঁটার পর্ব আসে ১৯২০-র মাঝামাঝি, বিশেষ করে কলকাতার পাটশিল্পে। মিল-মালিকরা চারদিনের হপ্তা চালু করে উৎপাদন কমানোর চেষ্টা করে। শ্রমিকরা তার বিরুদ্ধে লড়াই করেন ; ১৯২১-এ বাঙলার চটকলগুলোয় ১৩৭টি ধর্মঘট হয়, তাতে যুক্ত ছিলেন ১৮৬,৪৭৯ জন শ্রমিক। স্বামী বিশ্বানন্দ ও স্বামী দর্শনানন্দ রাণীগঞ্জ-ঝরিয়া অঞ্চলের খনি-শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। ইওরোপীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ভারতীয় খনি-মালিকদের থেকে গোড়ায় কিছু সাহায্যও তাঁরা নেন। ডিসেম্বর ১৯২১-এ এ আই টি ইউ সি-র ঝরিয়া অধিবেশনের বৈশিষ্ট্য এই যে, যথেষ্ট সংখ্যায় প্রকৃত শ্রমিক এতে যোগ দিয়েছিলেন—১৯২২ থেকে পরের কয়েক বছর ধরে তাঁদের গরহাজিরাই চোখে পড়ে। কিছু কিছু ধর্মঘটে আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতারা সক্রিয় ছিলেন, সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে আমরা দেখব, বাঙলায় ও মাদ্রাজে। কিন্তু গান্ধীর নিজস্ব অবস্থান ছিল দ্ব্যর্থহীন 'ধর্মঘট অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনার আওতায় পড়ে না' ('স্ট্রাইক্স', *ইয়ং ইন্ডিয়া* ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২১)। 'ভারতে কোনো রাজনৈতিক ধর্মঘট আমরা চাই না... সমস্তরকম অসংযত ও ব্যাঘাত করার উপাদানের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতেই হবে...পুঁজি বা পুঁজিপতিদের আমরা ধ্বংস করতে চাই না, বরং চাই পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করতে ঃ পুঁজিকে আমরা

আমাদেরই দিকে কাজে লাগাতে চাই। সহানুভূতিসূচক ধর্মঘটে উৎসাহ দেওয়া হবে মূর্খামি' ('দি লেসন অফ আসাম, *ইয়ং ইন্ডিয়া*, ১৫ জুন১৯২১)।

কৃষকদের ক্ষেত্রে---মহাত্মা যাঁদের সর্বদাই তাত্ত্বিক অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন—স্বনির্ভরতার মাধ্যমে গ্রামীণ পুনর্গঠনের গান্ধীপন্থী কর্মসূচিতে কল্পনা করা হয়েছিল এক আর্থনীতিক পুনরুত্থানের। তার মাধ্যম হবে ঃ চরখা ও খাদি, পঞ্চায়েত বা সালিশি আদালত, জাতীয় বিদ্যালয় ও হিন্দু-মুসলমান একতার সপক্ষে প্রচার এবং মাদকদ্রব্য ও অস্পৃশ্যতার কুফলের বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান। বিহার ও ওড়িশায় পঞ্চায়েত খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল আর ফেব্রুয়ারি ১৯২১ ও এপ্রিল ১৯২২-এর মধ্যে বাঙলায় ৮৬৬টি সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়। অগাস্ট ১৯২১-এ ছিল তার তুঙ্গক্ষণ---'সংখ্যার দিক দিয়ে সেগুলি সরকারি আদালতকে যথেষ্ট পেছনে ফেলে দেয়' ('হিস্ট্রি অফ নন-কোঅপারেশন ইন বেঙ্গল—বেঙ্গল গভর্নমেন্ট, পলিটিকাল কনফিডেনশিয়াল, ৩৯৫/১৯২৪')। মাদক বর্জনের প্রচার বেশ জোরদার হয়ে উঠে, তার আংশিক কারণ বোধহয় এই যে, নিচু জাতের মানুষরা এর মধ্যে 'সংস্কৃতীকরণের সামাজিক উন্নতির সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯২১-২২-এ পাঞ্জাবের আবগারি রাজস্ব ৩৩ লক্ষ টাকা কমে যায় এবং মাদ্রাজের অর্থসংস্থানে ঘাটতি হয় ৬৫ লক্ষ টাকা। চরখা প্রচারের অভিঘাত সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না বলেই মনে হয়, কিন্তু ১৯২০ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে হাতে-বোনা কাপড়ের উৎপাদন তরতরিয়ে বেড়ে গিয়েছিল (আগে পৃ. ১৪৬ দ্র.)। খিলাফত মৈত্রী হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে সাময়িকভাবে হলেও একটি শক্তিশালী ঘটনায় পরিণত করে। অস্পৃশ্যতার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল অনেক কম লক্ষণীয়, যদিও বিষয়টিকে জাতীয় রাজনীতির সামনের সারিতে সর্বপ্রথম নিয়ে আসার পুরো কৃতিত্ব গান্ধীরই প্রাপ্য। এমনকি তাঁর নিজের গুজরাটেও যেসব প্রতিষ্ঠানে অন্ত্যজদের ঢুকতে দেয় না সেগুলিকে জাতীয় বিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃতি না-দেওয়ার সিদ্ধান্ত ১৯২০-র শেষদিকে প্রায় এক সঙ্কটের কারণ হয়েছিল (*ইয়ং ইন্ডিয়া*, ২৪ নভেম্বর ১৯২০)। পরের বছর বারডোলি-র এক গ্রামে গান্ধীর জন্যে অপেক্ষারত অস্পৃশ্যদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল উঁচু জাতের গ্রামবাসীরা—যতক্ষণ না কল্যাণজী মেহতা তাদের ধমক দেন (কৃষ্ণদাস, *সেভেন মান্থস্ উইথ মহাত্মা গান্ধী*, খণ্ড ২, পৃ. ৩৭)।

অতএব, বিভিন্ন ঐক্যবিধায়ক বিষয় এবং শ্রেণীবিভাগকে ছাড়িয়ে যাওয়া বা মিলমিশ করার প্রচেষ্টার ওপরেই সব সময় জোর দেওয়া হতো। রাজস্ব-বন্ধের পরিকল্পনা তাই করা হয়েছিল—তাও প্রচণ্ড দ্বিধার পর—বারডোলির মতো একটি রায়তওয়ারি তালুকে, কোনো জমিনদারি অঞ্চলে নয়, যেখানে খাজনা-বন্ধের ব্যাপারটি অবধারিতভাবে এসে পড়ত। ১৯২১-এর গোড়ায় যুক্ত প্রদেশে কৃষিঘটিত হাঙ্গামার (নিচে পৃ. ১৯০ দ্র.) পর, ফৈজাবাদে একটি বক্তৃতায় গান্ধী 'জমিনদার ও ভাগচাষীদের মধ্যে ভেদসৃষ্টির সবরকম প্রচেষ্টার নিন্দা করেন এবং লড়াই-এর বদলে ভাগচাষীদের কষ্ট সহ্য করতে উপদেশ দেন, কারণ সবচেয়ে শক্তিশালী জমিনদারের, অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য তাদের সর্ব শক্তি নিয়ে যোগ দিতে হবে' (*লিডার*, ১৩ ফেব্রুয়ারি ১৯২১ ; *রচনাসংগ্রহ*, খণ্ড ১৯ পৃ. ৩৫২-য় উদ্ধৃত)। পরের মাসে, যুক্ত প্রদেশের কৃষকদের প্রতি নির্দেশ-এ, কিসান নেতারা গ্রেপ্তার হলে যাতে গোলমাল না বাধে সে-বাবদে সতর্ক করে দেওয়া হয়, ও স্পষ্ট হুকুম করা হয় ঃ 'সরকারকে প্রদেয় কর বা ভূস্বামীকে

প্রদেয় খাজনা হয়তো আমরা আটকাতে পারব না... মনে রাখা উচিত, জমিনদারদের আমরা বন্ধুতে পরিণত করতে চাই' (*ইয়ং ইন্ডিয়া*, ৯ মার্চ ১৯২১; *ঐ*, পৃ. ৪১৯-২০-তে উদ্ধৃত)।

আঞ্চলিক তারতম্য

অসহযোগের নানা মাত্রা ও বিরোধ কিন্তু সবচেয়ে ভালো বোঝা যাবে প্রদেশ ও অঞ্চল-ভিত্তিক সমীক্ষা দিয়ে ; আর সাম্প্রতিক সমীক্ষায়—ও বলতে গেলে সাম্প্রতিক গবেষণায়—তাই দ্রুত তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে, যদিও এখনো অনেক ফাঁক রয়ে গেছে।

জানুয়ারি ১৯২১-এ লাজপত রায়ের অনুপ্রেরণায় লাহোরে ছাত্রদের সরকারি শিক্ষা-বর্জনের মধ্যে দিয়ে পাঞ্জাবে অসহযোগ বেশ সফলভাবেই শুরু হয়, কিন্তু বিভিন্ন শহরে আন্দোলন এপ্রিল ১৯১৯-এর চেয়ে দুর্বলই ছিল বলে মনে হয়। এর সঠিক কারণ বোধহয় এই যে, নির্মম ব্রিটিশ প্রত্যাক্রমণের স্মৃতি তখনও ছিল যথেষ্ট তাজা। শিখ-প্রধান মধ্য-পাঞ্জাবের গ্রামাঞ্চলের একেবারে ভেতর অবধি কিন্তু শক্তিশালী অকালি উত্থানে অস্থির হয়ে ওঠে। এই উত্থান ছিল প্রথমদিকে একটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র ধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন। কিছু সময়ের জন্য সেটি অসহযোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশে যায়। যেসব দুর্নীতিগ্রস্ত মোহান্ত ব্রিটিশ কর্মচারীদের সঙ্গে উভয়ত লাভজনক যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের হাত থেকে গুরুদ্বারার নিয়ন্ত্রণ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য লড়ছিলেন অকালিরা। অমৃতসর স্বর্ণমন্দিরের সরকার-নিযুক্ত প্রবন্ধক অরুর সিং এতদূর এগিয়েছিলেন যে, এমনকি জেনারেল ডায়ার-কে তিনি সম্মানসূচক শিখ হওয়ার জন্যে আহ্বান জানান—'যেমন নিকলসেয়ান সাহিব' (নিকলসন, ১৮৫৭-য় দিল্লীর কসাই) 'শিখ হয়েছিলেন।' উত্তেজনা চড়ে যায় ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এ নানকানার মর্মদন্ত ঘটনার পর, প্রায় একশজন আকালিকে মোহান্ত যখন জবাই করে। আর শিখরা এ-ব্যাপারে লাহোর-এর বিভাগীয় মহাধ্যক্ষ (কমিশনার)-এর খানিকটা যোগসাজস ও প্ররোচনা সম্বন্ধে যে সন্দেহ করেছিলেন তার কিছু কারণও ছিল। নভেম্বর ১৯২১-এ ব্রিটিশরা স্বর্ণমন্দিরের চাবি হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় আর অকালিরা দলে দলে কারাবরণ করেন। অসহযোগ আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থার সঙ্গে অকালিদের ঘটনা একই সঙ্গে ঘটায় ব্রিটিশরা পিছু হঠে, ১৯২২-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি মন্দিরের চাবি ফেরত দেওয়া হয়। জানুয়ারি ১৯২২-এর সরকারি প্রতিবেদনে তালিকাভুক্ত ১৫,৫০৬ জন আকালি স্বেচ্ছাসেবকের বড় অংশই এসেছিলেন জাঠ শিখ কৃষককুল থেকে, এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জলন্ধর, হোশিয়ারপুর, অমৃতসর, শেইখুপুরা ও লয়ালপুর জেলা। শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি-পরিচালিত, স্বীকৃত আন্দোলন অহিংস পদ্ধতিতে অবিচল থাকলেও কিষাণ সিং ও মোটা সিং-এর নেতৃত্বে মার্চ ১৯২১-এ একটি বিক্ষুব্ধ 'ববর অকালি' গোষ্ঠী দেখা দেয়। রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলন ও শেষ পর্যন্ত বশংবদদের ও (মাঝে মাঝে) মহাজনদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতি গ্রহণের ডাক দেন তাঁরা। নভেম্বর ১৯২৫-এ শিখ গুরুদ্বারা ও ধর্মস্থান আইন-এ বিভিন্ন গুরুদ্বারার ওপর শিরমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি-এর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা না-করা অবধি অকালিদের সংগ্রাম চলতে থাকে। ১৯২২-এর পর যা ক্রমে নষ্ট হয়ে যায় তা হলো ব্যাপকতর জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র ও ১৯২১-এর অসাধারণ সাম্প্রদায়িক একতা। এই একতা এসেছিল এমন একটি প্রদেশে যেটি অন্যথায়

ধর্মীয় ভাগাভাগির জন্যেই লক্ষণীয় ছিল। আর আতঙ্কিত হয়ে বড়লাট এই ব্যাপারটিকে বর্ণনা করেছিলেন 'বিভিন্ন খিলাফত ও কংগ্রেস কমিটি এবং নানান শিখ সংগঠনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সম্ভাব্য যোগাযোগ' হিসেবে (ভারত সচিবকে তারবার্তা, ৯ নভেম্বর ১৯২১, *রিডিং কালেকশন*)।

রাজস্থানের বিভিন্ন আমূল-সামন্ত রাজন্যশাসিত রাজ্যে অন্য এক চিত্তাকর্ষক ধরনের শক্তিশালী কৃষক-আন্দোলন দেখা দেয়। ব্রিটিশ অধিবেষ্টিত আজমীর-এ রাজস্থান সেবা সঙ্ঘ-র মাধ্যমে যে নাগরিক জাতীয়তাবাদ অনেক পরে, ১৯২০-তে সবে দেখা দিচ্ছিল, এইসব কৃষক-আন্দোলন হয়েছিল তার আগেই। ঐ জাতীয়তাবাদের ব্যাপারে তার অবদানও ছিল প্রত্যক্ষ। মেবার-এর বিজোলিয়া আন্দোলন, আমরা আগেই দেখেছি, ১৯২২-এ আংশিক বিজয় লাভ করে আর উপকর ও উদয়পুরের মহারাণার খালিসা জমিতে বেগারির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়েছিল মে ১৯২১-এ, পরম্পরাগত বাৎসরিক মাতৃকুণ্ডিয়া মেলায়, এক কৃষক সমাবেশের মাধ্যমে। সেখানে অনেক পরে, এপ্রিলে ১৯৩৮-এ বিজোলিয়া নেতা মানিকলাল বর্মা জাতীয়তাবাদী মেবার প্রজা মন্ডল-এর পত্তন করেন। ১৯২১-২২-এ মোতিলাল তেজাওয়াত-এর নেতৃত্বে ভিল জনগোষ্ঠীর আন্দোলন আরও জঙ্গী ভাবী সুখরাজ্যের চরিত্র অর্জন করেছিল। আর ডিসেম্বর ১৯২১-এ আলওয়ার-এর মেও-রা আক্রমণ করেছিলেন পাশের গুরগাঁও জেলার একটি থানা। ব্রিটিশ ভারতীয় পুলিশ ও আলওয়ার রাজ্য সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযান চালিয়ে তবে তাঁদের দমন করা যায়।

খিলাফত-এর ডাকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে মুসলমান ব্যবসাদার ও সিন্ধু প্রদেশের কৃষকদের মধ্যে জেগে ওঠে প্রবল উৎসাহ। হিন্দু সংখ্যালঘুদের মধ্যে থেকে জয়রামদাস দৌলতরাম ও স্বামী গোবিন্দানন্দ নামে দুজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা উঠে আসেন। প্রথমজন ছিলেন গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহযোগী আর দ্বিতীয়জনকে রাজদ্রোহের অপরাধে মে ১৯২১-এ পাঁচ বছর কারারুদ্ধ করা হয়। তিনি পরে কংগ্রেস গোঁড়ামির একজন র‍্যাডিকাল সমালোচকে পরিণত হন।

সুনির্দিষ্টভাবে গান্ধীপন্থী আন্দোলন স্বভাবতই সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল গুজরাটে। এই অঞ্চলের বারডোলি তালুকে ডিসেম্বর ১৯২১-এ মহাত্মার সঙ্গে কৃষ্ণদাসের 'পরিদর্শন-যাত্রা'-র বিবরণ থেকে কৃষক-জাগরণের একটি জীবন্ত ধারণা পাওয়া যায়। এ জাগরণ ছিল একই সঙ্গে বিশাল, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত ও নিয়মনিষ্ঠ (*সেভেন মান্থস্ উইথ মহাত্মা গান্ধী*, খণ্ড ২, পৃ. ২৭-৪০)। অহিংসার নিয়মনিষ্ঠা পাটীদার কৃষক-মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে নিখুঁতভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল, কারণ বেশি লাগামছাড়া আন্দোলন নিয়ে আসতে পারত নিচুজাতি বা জনগোষ্ঠীয় কৃষি-শ্রমিক ও গ্রামের সেবকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে নানান সমস্যা। (যেমন, 'ফর্সা-চামড়া'র বর্ণহিন্দু 'উজালিয়াত'দের থেকে আলাদা খেড়া-র বারাইয়া বা বারডোলির 'কলিপরাজ' বা কালো মানুষজন)। খেড়া-র আনন্দ ও বরসাড গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি হিসেবে থাকলেও, প্রথম সত্যাগ্রহের কেন্দ্র হিসেবে গান্ধী শেষ পর্যন্ত পছন্দ করেছিলেন বারডোলিকে। এর কারণ সম্ভবত চির-অস্থির বারাইয়াদের থেকে কলিপরাজ-রা ছিলেন আরও পশ্চাৎপদ ও শিষ্ট। বস্তুত বারাইয়াদের সামাজিক ডাকাতি ১৯২১-এ নতুন তুঙ্গে পৌঁছেছিল—৭০টি। তার বেশির ভাগের পেছনেই ছিল বাবর দেব-পরিচালিত একটি দল। তিনি নিচু জাতের মধ্যে একধরনের লোকনায়কে পরিণত হয়েছিলেন (হার্ডিমান, *পেজান্ট অ্যাজিটেশনস্*, পৃ. ২০১, ২০৬)।

বোম্বাই শহরে অবস্থা ছিল আরও জটিল। গুজরাটি ব্যবসাদার, পেশাজীবী ও করণিক গোষ্ঠীর থেকে উৎসাহী সমর্থন এলেও, মহারাষ্ট্রীয়রা তখনও টিলক-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন (১ অগাস্ট, ১৯২০-তে তাঁর শবযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন ২০০,০০০-এর বেশি মানুষ)। গান্ধীর সম্বন্ধে তাঁদের খানিকটা সন্দেহের ভাব ছিল। আর শিল্পশ্রমিক ও নিচু শ্রেণীর মুসলমানদের নিয়ে গুরুতর সমস্যা ছিল তাঁদের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। ১৭ নভেম্বর ১৯২১-এর হরতাল খুব তাড়াতাড়িই হয়ে দাঁড়ায় বড়মাপের কয়েকটি দাঙ্গা। আলী ভাইদের জেলে পাঠানোয় জ্বলে ওঠেন মহারাষ্ট্রীয় মিল-শ্রমিক ও মুসলমানরা। শ্বেতাঙ্গ, খ্রীস্টান, ইঙ্গ-ভাবাপন্ন পারসি, আবার কখনও কখনও ইওরোপীয় পোশাক-পরা যে-কোনো লোককে তাঁরা আক্রমণ করেন। প্রায় কুড়িজন নিহত হন, যদিও গান্ধী এতে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিলেন যে, তাঁর অনশন করার সিদ্ধান্ত ২৩ নভেম্বর-এর মধ্যে দাঙ্গা থামাতে সাহায্য করে। এই সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণের চেয়ে বৃহত্তর দীর্ঘমেয়াদি তাৎপর্যের বিষয় হলো ১৯২১-এই এস এ ডাঙ্গে, আর এস নিম্বকর, ভি ডি সাঠায়ে ও আর ভি নডকর্ণী-র নেতৃত্বে একটি র‍্যাডিকাল ছাত্রগোষ্ঠীর উদ্ভব (পরে যোগ দেন এস ভি দেশপান্ডে ও কে এন জোগলেকর)। অসহযোগে তাঁরা খুবই সক্রিয় ছিলেন, কিন্তু ক্রমেই আরও বেশি করে হয়ে ওঠেন গান্ধীর সমালোচক। আর বি লোটবালা নামে সমাজবাদ-ঘেঁষা জনৈক লক্ষপতির জোগানো বইপত্র পড়ে তাঁরা মার্কসবাদে আগ্রহী হয়ে পড়েন। ডাঙ্গে এপ্রিল ১৯২১-এ লেখা *গান্ধী-ভার্সাস লেনিন* বইতে গান্ধী ও লেনিন-এর দর্শনের (গান্ধীর দর্শনের উদ্ভব তিনি খুঁজে পান তলস্তয়-এ) দফা-ওয়ারি তুলনার চেষ্টা করেন, আর তুলে ধরেন এক স্বরাজের ছবি যেখানে বড় বড় কারখানা জাতীয়করণ, সম্পদের ঊর্দ্ধসীমা বেঁধে দেওয়া ও চাষীদের মধ্যে জমিনদারি ভূমি বিক্রি করা হবে। অহিংসাকে একটি যোগ্য কৌশল হিসেবে মেনে নিয়েও পুস্তিকাটিতে কর-বন্ধ ও রাজনৈতিক হরতালের মতো অস্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজনের ওপর জোর দেওয়া হয়—'আমরা যদি জিতি, তাহলে একমাত্র সর্বহারার, অর্থাৎ শ্রমিক ও কৃষককূলের সাহায্য নিয়েই জিতব।'

মহারাষ্ট্রে অসহযোগ তুলনায় দুর্বলই রয়ে গেল। এখানে প্রতিষ্ঠিত টিলকপন্থী রাজনৈতিক নেতৃত্ব গান্ধীর সম্বন্ধে নিরুৎসাহ ছিলেন আর ১৯৩০ অবধি অব্রাহ্মণরা খানিকটা সকারণেই মনে করতেন, কংগ্রেস হলো চিৎপাবন [ব্রাহ্মণ]-পরিচালিত একটা ব্যাপার। যা-ই হোক, অন্যান্য জায়গার মতোই এখানেও গান্ধীপন্থী নিয়ন্ত্রণের দুর্বলতার পরিণামে কিছু বিক্ষিপ্ত আঞ্চলিক বিস্ফোরণ ঘটে। নাসিক জেলার মুসলমান-অধ্যুষিত একটি অঞ্চল, মালেগাঁও-তে ২৫ এপ্রিল ১৯২১-এ খিলাফত-সমর্থক এক জনতা, তাঁদের কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার হওয়ায়, তিনজন পুলিশকে পুড়িয়ে মারেন। পুণার কাছে মুলশি পেটা-র চাষীরা তাঁদের জমি বাঁচাতে সত্যাগ্রহের পথ ধরেন। সরকারের সমর্থন নিয়ে টাটা একটি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্যে এই জমি দখল করার চেষ্টা করছিলেন। এপ্রিল ১৯২১-এ চাষীদের স্বার্থরক্ষায় পুণা কংগ্রেস এগিয়ে আসে ; বেশ কয়েক বছর ধরে লড়াই চলতে থাকে ছাড়া-ছাড়া ভাবে।

অসহযোগ-খিলাফত অভ্যুত্থানের সর্বভারতীয় প্রকৃতির সেরা নিদর্শন পাওয়া যায় দক্ষিণে তার অনুপ্রবেশ থেকে। দক্ষিণ ভারতের চারটি ভাষাভিত্তিক অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র কর্ণাটকে কোনো দাগ পড়ে নি—এই অঞ্চলে রাজনৈতিক জাগরণ এল ১৯৩০-এর দশকে। যেমন অন্যত্র,

তেমনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও উচ্চ ও মধ্য শ্রেণীর বিভিন্ন পেশাজীবী গোষ্ঠীর কাছে (অসহযোগের) প্রাথমিক পর্যায়ের আবেদন অল্পই সফল হয়েছিল। এখানে ৬৮২ জন খেতাবধারীর মধ্যে মাত্র ৬ জন তাঁদের সম্মান ফিরিয়ে দেন, ৩৬ জন তামিল ও ১০৩ জন অন্ধ্রবাসী আইনজীবী ওকালতি ত্যাগ করেন এবং মোটামুটি ৫০০০ ছাত্র নিয়ে মাত্র ৯২টি জাতীয় বিদ্যালয় খোলা হয়। বরং মাদ্রাজ শহরের আন্দোলনের মুখ্য দিক ছিল শ্রমিক অভ্যুত্থান। তার পরিণামে শ্বেতাঙ্গ-পরিচালিত বাকিংহাম ও কর্ণাটিকে সুতোকলগুলোয় জুলাই থেকে অক্টোবর ১৯২১ অবধি চার মাস ধরে ধর্মঘট হয় এবং তিরু বি ক-র মতো অসহযোগের স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে তা পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। সরকার (যেখানে ১৯২১-এর নির্বাচনের পর ব্রাহ্মণ-বিরোধী জাস্টিস দলের মন্ত্রীরাও তাতে ছিলেন) বর্ণহিন্দু ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে অস্পৃশ্য আদি-দ্রাবিড়দের প্ররোচিত ক'রে এই আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করে, আর ধর্মঘট তহবিলের জায়গায় চরখা বিতরণ করে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব শ্রমিক আন্দোলনকে গান্ধীপন্থী আন্দোলনের রীতির সঙ্গে যুক্ত করার খানিকটা অবাস্তব চেষ্টা করেন। জাতীয়তাবাদ ও শ্রমিক-আন্দোলনকে মেলানোর এই প্রয়াসজাত অভিজ্ঞতাই জনৈক বয়স্ক মাদ্রাজী আইনজীবী ও স্বেচ্ছাসেবক-সংগঠন সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ার-কে দক্ষিণ ভারতের প্রথম কমিউনিস্টে পরিণত হওয়ার পথে নিয়ে যায়। ৫মে ১৯২১-এ গান্ধীকে লেখা এক খোলা চিঠিতে, কিসান আন্দোলনের মুখে গান্ধী যেসব লাগাম চাপিয়ে দিচ্ছিলেন সেগুলোকে তিনি ধিক্কার জানান এবং 'পুঁজিবাদী স্বৈরতন্ত্রে'র বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ প্রয়োগের উপরোধ করেন। এই সঙ্গে তিনি এক ধরনের পাঁচমেশালি 'সাম্যবাদে'র প্রস্তাব দেন যার মধ্যে থাকবে চরখা আর তার মাধ্যমে দেশের 'কোনো ঘরই নিয়োগকর্তার অধীন হবে না..., তেমনি, আমার ইচ্ছা, আমাদের প্রত্যেকেরই এক টুকরো করে জমি থাকা উচিত...'।

গোঁড়া ব্রাহ্মণ ভাবসাব, নাদার, সৌরাষ্ট্র ও কোমতি-র মতো অব্রাহ্মণ জাতের সংস্কৃতায়নের উচ্চাশা এবং অনুমতিপত্রের হার বাড়িয়ে রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মদব্যবসায়ীদের অসন্তোষ—এই সব কারণ মিলে উপকূলবর্তী অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুর অভ্যন্তরে অসহযোগের অন্যতম সফল রূপ হয়ে উঠেছিল ঃ মদের দোকানে ধরনা। মাদ্রাজ সরকার ভয়ানক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে, কারণ ১৯২০-র দশকের গোড়ার দিকে রাজস্বের ২০% -এরও বেশি আসত আবগারি থেকে, এই অনুপাত ছিল অন্যান্য প্রদেশের থেকে অনেক বেশি। এইসব আন্দোলনের ফলে তামিলনাড়ুর অভ্যন্তর ভাগকে ভিত্তি করে এক নতুন সুনির্দিষ্টভাবে গান্ধীপন্থী নেতৃত্ব উঠে আসছিল, যার পুরোভাগে ছিলেন রাজাগোপালচারী। তিনি ছিলেন সালেম-এর একজন আইনজীবী, ১৯২১-এ ওকালতি ত্যাগ করেন। উল্টো দিকে, মাদ্রাজ শহরের জাতীয়তাবাদীরা, যেমন সত্যমূর্তি বা কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গার, মহারাষ্ট্রের টিলকপন্থী বা বাঙলায় চিত্তরঞ্জন দাসের মতো, নিমরাজি হয়েই গ্রহণ করেছিলেন অসহযোগকে।

কোন্ডা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া, এ কালেশ্বর রাও, টি প্রকাশম ও পট্টাভি সীতারামাইয়া-র মতো সব তাবড় নেতা, ব্যবসাদারদের পর্যাপ্ত সমর্থন (যেমন, এলোর-এর মোথে পরিবার থেকে, বা রাজামুন্দ্রী বণিকসভা, যেটি বস্তুত আঞ্চলিক অসহযোগ কমিটির কাজ করেছিল) এবং (তামিলনাড়ুর 'শুখা' এলাকার উল্টো) মধ্যচাষীদের এক বিস্তৃত স্তর—এই সব কারণে অন্ধ্রের

ব-দ্বীপ অঞ্চলে অসহযোগ অবশ্য সবচেয়ে বেশি শক্তি অর্জন করেছিল। ১৯২১-এ অন্ধ্রে রাজনৈতিক জাগরণের এই ব্যাপক ঝোড়ো গতি ও সেইসঙ্গে ভেতরকার টানাপোড়েন ছবির মতো প্রতিফলিত হয়েছে উন্নাভ লক্ষ্মীনারায়ণের তেলুগু উপন্যাস *মালপল্লী* (১৯৯২)-তে। বর্ণহিন্দু ভূস্বামী ও অস্পৃশ্যদের মধ্যে উত্তেজনা কমানোর জন্যে এর নায়ক গান্ধীপন্থী পদ্ধতির সুপারিশ করে। কিন্তু তার একটি অধীর ভাই আছে যে একধরনের সামাজিক ডাকাতে পরিণত হয়, আর মানুষের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সাম্যকে জাগিয়ে ও খেটে-খাওয়া লোকদের আন্তর্জাতিক সংহতির কথা বলে একটি গীতিকা রচনা করে।

অন্ধ্রে অভ্যুত্থানের অন্যতম লক্ষণীয় দিক হলো গুন্টুর জেলার ছোটো শহর চিরালা-পারালাকে পৌরসভা (মিউনিসিপালিটি)-য় পরিণত করার (যার মানে, আঞ্চলিক কর ৪০০০ থেকে লাফিয়ে বেড়ে ৩০,০০০ টাকা হতো) সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে তার প্রতিরোধ। ডুগ্গিরালা গোপালকৃষ্ণাইয়া-র নেতৃত্বে এই শহরের ১৫,০০০ অধিবাসী কর দিতে নারাজ হন, আর সবাই মিলে এগারো মাসের জন্যে রামনগর বলে একটি নতুন বস্তিতে চলে যান। ডিসেম্বর ১৯২১ ও ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এর মধ্যে ভূমি-রাজস্ব না-দেওয়ার জন্যে ব-দ্বীপ অঞ্চলে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে ওঠে। আন্দোলনের শুরুতেই গ্রামীণ কর্মচারীরা গণ-ইস্তফা দেন। তাঁদের পর্যাপ্ত সুযোগসুবিধা সঙ্কোচনের সাম্প্রতিক সরকারি উদ্যোগের বিরুদ্ধে তাঁদের নিজস্ব অভিযোগ ছিল, কিন্তু আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়েছিল ঠিকমত বর্ষা না হওয়ায় কৃষকদের দুরাবস্থা, আর একটি সাধারণ অনুভূতি—গুন্টুরের এক সাধারণ গ্রামবাসী যা ব্রিটিশ কর্মচারীকে জানিয়েছিলেন। 'বলা হচ্ছে গান্ধী-স্বরাজ আসছে এবং তাঁদের আর কর দিতে হবে না।' (এম ভেঙ্কটরঙ্গাইয়া, *ফ্রিডম স্ট্রাগল্ ইন অন্ধ্র প্রদেশ*, খণ্ড ৩, পৃ. ২৭৬)। গুন্টুর শহরের কাছে বাপাতলা তালুকের পেডানন্দীপড মহকুমা এবং রাজামুন্দ্রীর কাছে রঘুদেবপুরম্ ফিরকা'-য় এই আন্দোলন সবচেয়ে বেশি তীব্রতা অর্জন করে। ১০ ফেব্রুয়ারি গান্ধীর পেড়াপিড়িতে অন্ধ্র কংগ্রেস নেতারা আন্দোলন তুলে নেন। তার আগে রাজস্ব সংগ্রহ ১৪.৭৩ লাখ টাকা থেকে জানুয়ারি ১৯২২-এ মাত্র ৪ লাখে নেমে গিয়েছিল।

জঙ্গলের বাধানিষেধের বিরুদ্ধে জনগোষ্ঠীয় মানুষ ও গরীব চাষীদের ক্ষোভের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের পথ-দেখানো সংযোগের ক্ষেত্রও ছিল ১৯২১-২২-এর অন্ধ্র, যেমন কুড্ডাপাহ্ রায়াচোটি তালুক ও গুন্টুরের পালনাড তালুকে 'অরণ্য সত্যাগ্রহ'। স্থানীয় মালিকানাধীন ছাড়া অন্য গবাদি পশুর ওপর বেশি হারে পশুচারণের মাশুল চাপানোর বিরুদ্ধে উপকূলবর্তী অঞ্চলের সমৃদ্ধিশালী গবাদি পশুপালকদের স্বার্থের অনকূলে বিক্ষোভ—এই হিসেবে ঘটনাটিকে লঘু করার চেষ্টা করেছেন কেমব্রিজ ঘরানার ঐতিহাসিক সি জে বেকার। কিন্তু এটি যে আরও অনেক মাটিঘেঁষা ও নিচু শ্রেণীর মানুষদের আন্দোলন ছিল—তার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য আছে। সেপ্টেম্বর ১৯২১-এ কুড্ডাপা-য় গ্রামবাসীদের এক 'বিশাল জনতা' গান্ধীকে অভ্যর্থনা জানায় এই বিশ্বাসে যে 'তিনি তাঁদের কর কমানো ও জঙ্গল সংক্রান্ত নিয়মকানুন রদ করার ব্যবস্থা করবেন'। বেঙ্কটাপ্পায়্যা-র মতো কংগ্রেস নেতারা বিক্ষোভকে জঙ্গলের কর্মচারীদের সামাজিক বয়কটের মধ্যেই আটকে রাখার চেষ্টা করেন। কৃষকরা কিন্তু চারণের মাশুল না দিয়েই জঙ্গলে গবাদি পশু পাঠাতে শুরু করেছিলেন। পালনাড-এ কিছু অরণ্য-গ্রাম স্বরাজ ঘোষণা করে ও

পুলিশদলের ওপর আক্রমণ চালায়। 'গান্ধীরাজ হয় এসে গেছে নয় এল বলে, আর জঙ্গল তাঁদের ইচ্ছেমতো কাজ করার জায়গা—এই বিশ্বাসে উদ্‌বুদ্ধ লোকের বড় বড় দঙ্গলের' মুখে পড়ে পালনাড ও রায়াচোটি দু জায়গাতেই অরণ্য প্রশাসন কার্যত ধ্বসে পড়ে, (*ম্যাড্রাস ফরেস্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্ট*, ১৯২১-২২, পৃ. ৩০)। আসন্ন সত্যযুগ ধরনের কিছু গুজব ১৯২১-২২-এ বারবারই অনুঘটকের কাজ করেছিল ঃ যেমন, মে ১৯২১-এ ত্রিচিনোপোলি-তে সাধারণ কয়েদিদের জেল ভাঙার 'ভিত্তি ছিল এই বিশ্বাস যে গান্ধীর স্বরাজ ব্রিটিশ শাসনকে সরিয়ে দিতে চলেছে' (ভারত-সচিবকে বড়লাট, ২০ জুন ১৯২১, *রিডিং কালেকশন*)।

কিন্তু ১৯২১-এর সত্যযুগ বিশ্বাসের হিংসাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে মালাবারের সদা অশান্ত মোপলাদের মধ্যে। আগের মোপলা বিক্ষোভগুলোর একটা 'আচারধর্মী' চরিত্র ছিল, তাতে সত্যিই যোগ দিতেন মুষ্টিমেয় লোক। কিন্তু এখন ব্রিটিশ কর্তৃত্বের আসন্ন পতনের গুজবে স্থানীয় প্রতিবাদ রূপান্তরিত হয়েছিল বিশাল জন-বিদ্রোহে। মুসলমান ইজারাদার ও কৃষকরা হিন্দু 'জেন্‌মি'দের হাতে শোষিত হতেন, আর মুসলমানদের ধর্মীয় জঙ্গীভাবের দীর্ঘ পরম্পরার কথা আগেই বর্ণনা করা হয়েছে (আগে অধ্যায় ৩ দ্র.)। এই সামাজিক প্রসঙ্গসূত্রে অবধারিতভাবেই মোপলা বিক্ষোভের একটি 'সাম্প্রদায়িক' দিক ছিল—যদিও সেটিকে অনেকখানি অতিরঞ্জিত করা হয়েছে বলে মনে হয়। ১৯১৬ থেকে মালাবারে একটি প্রজাস্বত্ব বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। এপ্রিল ১৯২০-তে মানজেরি সম্মিলনের পর খিলাফত আন্দোলন ঐ বিক্ষোভ নিজের হাতে তুলে নেয়। বিভিন্ন খিলাফত সভায় কৃষকদের নিজেদের অভিযোগ তুলে ধরার ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়। স্থানীয় নেতা আলী মুসালিয়ার নাকি কথা দিয়েছিলেন, আসন্ন মুসলিম রাজ্যে 'কোনো ব্যয় সাপেক্ষ মামলা-মোকদ্দমা থাকবে না...কোনো ব্যক্তির যা প্রকৃত প্রয়োজন তার বেশি সে পাবে না...আমরা বর্তমান পুলিশ ব্যবস্থা চাই না....।' ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এ কে মাধবন নায়ার, ইউ গোপাল মেনন, ইয়াকুব হাসান ও মোইদীন কোয়ার মতো প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস ও খিলাফত নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার এই ধরনের র‍্যাডিকাল নেতাদের পক্ষে এক সমতাবাদী সত্যযুগ প্রচারের পথ পরিষ্কার করে দেয়। ২০ অগাস্ট ১৯২১-এ অস্ত্রের তল্লাশি করার জন্যে তিরুরঙ্গাডি মসজিদে পুলিশি অভিযানের ফলে একটি বড়সড় বিদ্রোহ ফেটে পড়ে। এই বিদ্রোহে পুলিশ চৌকি সরকারি দফ্‌তর, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অত্যাচারী ভূস্বামীদের বাড়িতে ব্যাপক হামলা হয়। দক্ষিণ মালাবারের এরনাড ও বাল্লুবানাড তালুকে ব্রিটিশরা কয়েকমাস পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, আর বেশ কিছু জায়গায় কুনহাম্মদ হাজী, কলাথিঙ্গল মাম্মদ, আলী মুসালিয়ার, সিথি কোয়া থঙ্গল ও ইমবিচি কোয়া থঙ্গল—এই 'রাষ্ট্রপতি'-দের অধীনে 'খিলাফত সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর জনৈক ব্রিটিশ সেনাধ্যক্ষ (জি ও সি) অতিরিক্ত গোলন্দাজ শক্তির প্রয়োজন জানিয়ে তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, 'এখন পরিষ্কারভাবে প্রকৃত যুদ্ধের পরিস্থিতি'—'গেরিলা যুদ্ধনীতির ধাঁচে গড়া' মোপলা প্রতিরোধ...'আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে...মোট সশস্ত্র লড়াই-এর দলের সংখ্যা সম্ভবত ১০,০০০....'। (ভারত-সচিবকে বড়লাট, ২৮ সেপ্টেম্বর ১৯২১, *রিডিং কালেকশন*)।

হিন্দুদের মতে, মোপলারা সাম্প্রদায়িক ধর্মোন্মাদের চেয়ে বেশি কিছু নয়, তাই তাঁরা মোপলাদের ধিক্কার জানিয়েছিলেন। একথা ঠিক যে, প্রায় ৬০০ হিন্দুকে হত্যা করা হয় আর

(একটি আর্যসমাজী সূত্র অনুযায়ী) জোর করে ধর্মান্তরিত করা হয়েছিল প্রায় ২৫০০ জনকে। 'ধর্মোন্মাদ'রা কয়েক মাস জুড়ে এমন একটি অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন যেখানে বাস করতেন চার লাখ হিন্দু,তাঁদের মধ্যে ছিলেন অনেক অত্যাচারী ভূস্বামী ও মহাজন আর ব্রিটিশের বিশ্বস্ত সহযোগী—এই সব তথ্যের বিচারে ওপরের সংখ্যাগুলো সত্যিই বেশ কম। জোর করে ধর্মান্তরণের প্রথম ঘটনাটি ঘটে একমাত্র ১০ সেপ্টেম্বর-এ। কে এন পানিক্কর তাঁর এক সাম্প্রতিক প্রবন্ধে হিন্দু এলাকার মধ্যে দিয়ে একটি মোপলা গোষ্ঠীর ২৩ মাইল অভিযানের এক কৌতূহলজনক বিবরণ দিয়েছেন। এই অভিযানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বিশেষভাবে অত্যাচারী জনৈক হিন্দু ভূস্বামীর নথিপত্র পুড়িয়ে দেওয়া। পথে তাঁরা কারও ক্ষতি করেন নি, এমনকি 'জেন্‌মি'র পরিবারেরও নয়। আরও চমৎকৃত হওয়ার মতো তথ্য হলো ঃ মোপলা বন্দীদের একেবারে প্রথম দলেই ছিলেন একজন নাম্বুদ্রি ও চারজন নায়ার (ভারত-সচিবকে বড়লাট, ৩ নভেম্বর ১৯২১, কোয়েম্বাটুর জেলাশাসকের চিঠি সংলগ্ন করে)। মূল ব্যাপারটা এই যে, এটি ছিল এক বিশাল সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বিদ্রোহ, যেটিকে নির্মমভাবে দমন করার ফলে ২৩৩৭ জন বিদ্রোহী নিহত, ১৬৫২ জন আহত, আর কম করেও ৪৫,৪০৪ জন বন্দী হন। প্রকৃতই দুর্ধর্ষ একটি প্রতিরোধের মুখে পড়ে ১৮৫৭ বা ১৯১৯-এর মতোই ব্রিটিশ উদারনীতিবাদের মুখোশ পুরোপুরি খসে পড়ে, ২০ নভেম্বর পোডানুর-এ মালগাড়ির একটা কামরা থেকে ৬৬ জন শ্বাসরুদ্ধ মোপলা-র দেহ পাওয়া যায় ; ঐ কামরায় তাঁদের বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। প্রতিটি ইংরেজ স্কুলের ছেলে সিরাজ-উদ্-দৌলা-র অন্ধকূপের কথা জানে—পুরোপুরি কল্পকথা যদি না-ও হয়, সে এক চূড়ান্ত অতিরঞ্জিত গল্প। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পোডানুর-এর সম্পূর্ণ তর্কাতীত 'অন্ধকূপে'র কথা এমনকি স্বাধীন ভারতেও অল্প লোকই শুনেছে।

সচরাচর বিচ্ছিন্ন আসাম প্রদেশে অসহযোগ এমন শক্তি অর্জন করে, যার কাছে জাতীয় আন্দোলনের কোনো পরবর্তী পর্যায়-ই কোনোদিন পৌঁছতে পারবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছিল সুরমা উপত্যকার চা-বাগানগুলোয়। মে ১৯২১-এ এখানকার চারগোলায় 'গান্ধী মহারাজ কী জয়' ধ্বনি দিয়ে কুলিরা বড় রকমের মজুরি বাড়ানোর দাবি তোলেন। তারপর প্রায় ৮,০০০ মানুষের এক বিশাল গণ-দেশান্তরী হওয়ার ঘটনা ঘটে (এখানকার শ্রমশক্তির ৫২%)। এটিও হয়েছিল এই ঘোষণার মধ্যে যে, গান্ধীর হুকুমই এ-ই। বোঝাই যায়, একটা গুজব ছড়িয়েছিল যেসব গ্রাম থেকে জোর করে বা ঠকিয়ে তাঁদের উৎখাত করা হয়েছে সেইসব গ্রামে তাঁদের জমি দেওয়ার জন্যে গান্ধীরাজ আসছে। এটি তাৎপর্যপূর্ণ যে চারগোলা-র চা-বাগান-শ্রমিকদের বড় অংশই এসেছিলেন যুক্ত প্রদেশের পূর্বভাগের বস্তী ও গোরখপুর-এর জেলাগুলি থেকে, অসহযোগ যেখানে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অক্টোবরে ও আবার ডিসেম্বরে দারাং ও শিবসাগর-এর বিভিন্ন জেলার চা-বাগানগুলো থেকে বিক্ষিপ্ত ধর্মঘট ও গোলমালের খবর পাওয়া যাচ্ছিল। রাজকর্মচারীরা বারবার অভিযোগ করছিলেন, চা-বাগানের শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছে অসহযোগীরা। আসাম কংগ্রেসের নেতাদের বেশির ভাগই কিন্তু বাগানগুলোয় ধর্মঘটের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না, কারণ তাঁদের কয়েকজন (যেমন এন সি বরদলৈ) নিজেই ছিলেন বাগান-মালিক। জনৈক কংগ্রেস কর্মীর স্মৃতিচারণে

স্মরণ করা হয়েছে, এক রাত্তিরে শ্রমিকেরা যখন তাঁর কাছে ধর্মঘটের প্রস্তাব নিয়ে আসেন, তখন তাঁর বুক কেমন 'প্রায় হিম' হয়ে গিয়েছিল (পি বরঠাকুর, 'স্বাধীনতা রণর সংস্পর্শত', অমলেন্দু গুহ-র *প্লান্টার রাজ টু স্বরাজ,* পৃ. ১৩৭-৯-এ উদ্ধৃত)। কৃষকদের মধ্যে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের লক্ষণও দেখা যায়। বারডোলি-তে গান্ধীর পিছুহটার পরেও, 'চা বাগানের কুলিদের বিশেষ সুবিধার্থে' আসাম রাইফেল-কে শিবসাগরে কুচকাওয়াজ করার হুকুম দেওয়া হয় (ভারতসচিবকে বড়লাট, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯২২)। *আসাম-কেশরী* অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরীর কবিতা ও অসংখ্য লোকসঙ্গীতের—যেখানে বৈষ্ণব পদাবলীর কৃষ্ণের জায়গায় এসেছেন 'গান্ধীরাজা'—মাধ্যমে অসমিয়া সাহিত্যে গভীর ছাপ ফেলেছিল ১৯২১-এর দিনগুলি।

বাঙলায় জাতীয় আন্দোলনের গোটা ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি শক্তি ও ঐক্যের বিষয় ছিল সম্ভবত ১৯২১-২২-এ গড়ে ওঠা অসহযোগ-খিলাফত সমঝওতা। একথা ঠিক যে, বাঙলার রাজনৈতিক নেতারা গান্ধীকে স্বীকার করেছিলেন অনেক পরে, তাও একমাত্র নাগপুরে চিত্তরঞ্জন দাসের মত পরিবর্তনের ফলে। তার পরে এমনকি সন্ত্রাসবাদীরাও গান্ধীপন্থী পদ্ধতিকে এক বছরের জন্যে পরখ করতে রাজি হন। গান্ধীপন্থার কয়েকটি দিক সম্পর্কে কলকাতার পরিশীলিত বুদ্ধিজীবীরা কখনোই বিশেষ উৎসাহ দেখান নি। একটি বিখ্যাত বিতর্ক শুরু করেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কল অফ্ ট্রুথ' প্রবন্ধে (*মডার্ন রিভিউ,* অক্টোবর ১৯২১)। হতভাগ্য লক্ষ লক্ষ মানুষকে জাগানোর ক্ষেত্রে মহাত্মার কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানালেও তার সঙ্কীর্ণতা, অন্ধতা ও চরখাভজনায় চিন্তাহীন অনুসারিতার উপাদানের এতে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। ১৯০৫-এর দিনগুলোর তুলনায় বাঙলায় অসহযোগ-কেন্দ্রিক সাহিত্যিক ফসল নিতান্তই কম। ১৯২০-র ও ৩০-এর দশকের জাতীয়তাবাদীদের প্রায়ই পুরনো স্বদেশী গান নিয়ে কাজ চালাতে হতো। কিন্তু এ সবকিছুই তুলনায় অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে যখন এর পাশাপাশি ভাবা হয় অনন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্যের কথা (বাঙলার ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেখানে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যা ছিল মোটামুটি সমান), চিত্তরঞ্জন দাস ও তাঁর তিন তরুণ অনুগামীর (মেদিনীপুরে বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও কলকাতায় সুভাষচন্দ্র বসু) দেওয়া যোগ্য রাজনৈতিক নেতৃত্বের কথা, আর—সবার ওপরে—শহর ও গ্রামের জনগণের সত্তার জাগরণকে।

১৯২১-এর গোড়ার দিকে ছাত্র-অভ্যুত্থানের প্রাথমিক পর্যায়ের পর বাঙলায় অসহযোগের দ্বিতীয় বড় পরিণতি আসে পূর্ববঙ্গের চাঁদপুর বন্দরে ২০-২১ মে আসামের চা-বাগান থেকে পালানো কুলিদের ওপর গুরখা আক্রমণের পর। ১৯২৪-এর এক সরকারি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'অবিশ্বাস্য কম সময়ে গোটা পূর্ববঙ্গ-আলোড়িত হয়ে উঠেছিল'। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ব্যাপক হরতাল হয় ও তারপর রেলপথ ও স্টিমার পরিবহণকে বিপর্যস্ত করে দেয় দুটি ধর্মঘট। স্টিমার ধর্মঘট চলে জুলাই-এর গোড়া অবধি, আর আসাম-বাঙলা রেলপথে সেপ্টেম্বর অবধি ; দুটি ঘটনাকেই পুরোপুরি অপছন্দ করেন কলকাতার মারোয়াড়ি ব্যবসাদার চক্র তথা গান্ধী। এরপর জুলাই থেকে অক্টোবর অবধি এক আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তার পর্ব আসে, যদিও জাতীয়তাবাদীরা তার সদ্ব্যবহার করেন। তাঁরা মন দেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন, সালিশি আদালত সংগঠন ও অসংখ্য সভা করায় (জুলাই-এর গোড়া ও নভেম্বর-এর

মাঝামাঝি সময়ে কম করেও ৪২৬৫ টি সভা হয়েছিল)। তৃতীয় ও বৃহত্তম ঢেউ ওঠে নভেম্বরে যুবরাজ (প্রিন্স অফ ওয়েলস)-এর আসা নিয়ে ; ফেব্রুয়ারি ১৯২২ অবধি, এমনকি তার পরেও তা চলতে থাকে। কলকাতায় ১৭ নভেম্বর-এর হরতাল বিপুলভাবে সফল হয়। রাস্তাঘাটের নিয়ন্ত্রণ স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে চলে আসে ও বেশ কিছু পুলিশ পদত্যাগ করেন। ডিসেম্বর ১৯২১-এ পুলিশের জনৈক কর্তা কম করেও সাতটি জেলায় তাঁর অধীনস্থদের মধ্যে অসন্তোষের কথা জানান। দমনীতির মোকাবিলায় গণ-কারাবরণ করা হয় (ঐ বছরের শেষে কলকাতায় জেলে গিয়েছিলেন ৩০০০-এরও বেশি মানুষ)। জেলে যাওয়া স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে এই প্রথম উচ্চশ্রেণীর মহিলা (চিত্তরঞ্জন দাসের সহধর্মিণী বাসন্তীদেবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে) ও প্রচুর সংখ্যক কারখানা-শ্রমিক (প্রধানত মুসলমান) দু পক্ষই ছিলেন। কলকাতার শিল্পভিত্তিক শহরতলিতে মুহম্মদ ওসমান-এর মতো খিলাফত নেতারা ১৯২২-এর গোড়া থেকেই মুসলমান শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করছিলেন। তাঁরা একই সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করেন। জানুয়ারি ১৯২২-এর প্রথম সপ্তাহে গ্রেপ্তার হওয়া ৩৪৯ জন স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে ছিলেন ১২৩ জন মিলকর্মী, যথেষ্ট সংখ্যায় 'নৌকোর মাঝি ও নিচু শ্রেণীর মুসলমান এবং মাত্র ৩৯ জন ছাত্র—স্বদেশী দিনগুলোর চেয়ে একেবারেই আলাদা এক সামাজিক বিন্যাস। বোম্বাই ও মাদ্রাজের মতোই ১৯২১-এর অভিজ্ঞতা ও পরবর্তী আশাভঙ্গের ফলে কলকাতায় একটি অগ্রণী কমিউনিস্ট গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে নেতৃত্বে ছিলেন মুজফ্ফর আহ্মদ। ১৯২১-এর শেষ দিকে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দূত, নলিনী গুপ্ত।

ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এ অসহযোগীরা গ্রামাঞ্চলে পাট বয়কটের চেষ্টা করেন ব্রিটিশ মালিকানাধীন চটকলের ক্ষতি, খাদ্যশস্যের দাম কমানো, ও খাদিকে উৎসাহ দেওয়ার পরিকল্পিত উপায় হিসেবে তাঁরা কৃষকদের পাটচাষ বর্জন করে ধান ও তুলোচাষের জন্যে উপরোধ করেন। কৃষকদের কাছ থেকে সাড়া ছিল নামমাত্র, কারণ, যে যা-ই বলুক, পাটই বেশি লাভজনক। রাজশাহী-নদীয়া পাবনা-মুর্শিদাবাদ সীমান্তে শ্বেতাঙ্গ মালিকানাধীন মেদিনীপুর জমিনদারি কম্পানি-র বিরুদ্ধে প্রচার ছিল অনেক বেশি সুফল। এখানে নীলচাষের বিরুদ্ধে আগের থেকেই সংগ্রামরত কৃষকদের উপযুক্ত নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কলকাতার ছাত্র, সোমেশ্বরপ্রসাদ চৌধুরী। পরবর্তীকালে তাঁর আত্মজীবনীতে চৌধুরী লেখেন যে, চিত্তরঞ্জন অপ্রকাশ্যে তাঁকে উৎসাহ দেন, কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধান করে দেন যে, খাজনা বন্ধের উদ্যোগ কংগ্রেস সরকারিভাবে সমর্থন করবে না।

গ্রামের আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত ছিল মেদিনীপুরের কাঁথি ও তমলুক মহকুমায় বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে ইউনিয়ন বোর্ড-বিরোধী বিক্ষোভ। সদ্য প্রচলিত ইউনিয়ন বোর্ডের মানে দাঁড়িয়েছিল : স্থানীয় কর প্রচণ্ড বেড়ে যাওয়া। মেদিনীপুরের সংখ্যাগুরু, প্রধানত মাহিষ্য-স্বত্বভোগীদের মধ্যে বীরেন্দ্রনাথ নভেম্বর-ডিসম্বর ১৯২১-এ খুব ফলদায়ী কর-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে সমর্থ হন। এর ফলে সরকার জেলা থেকে নতুন নিয়ম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। ১৯২১-২২-এর শীতে পবন, বোগরা ও বিশেষভাবে বীরভূমের রামপুরহাট মহকুমায় (এখানে নেতৃত্বে ছিলেন জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) কৃষকরা প্রজাবিলির কাজকর্মের বিরাধিতা করেন।

এ সবই ছিল মূলত তুলনায়-সচ্ছল কৃষকদের আন্দোলন, যার নেতৃত্বে ছিলেন আইনজীবী-রাজনীতিকরা। কিন্তু আরও মাটি-ঘেঁষা আলোড়নের লক্ষণ বেশি করে দেখা যাচ্ছিল। গান্ধীরাজ এসে গেছে—এই ঘোষণা করে, ২৪ মার্চ ১৯২১-এ প্রচুর কয়েদি, ৬৬৯ জন রাজশাহী জেল থেকে বেরিয়ে যান। একটি সরকারি প্রতিবেদনে ১৯২২-এর প্রথম তিনমাসে 'বিশৃঙ্খলার এক বিরাট ঢেউ'-এর কথা বলা হয়—'আন্দোলন নেতাদের হাতছাড়া হয়ে গেছে...হিংসা ও সবরকম কর্তৃত্বের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব...নেতাদের মধ্যে নেই, বরং আছে জনসাধারণের মধ্যে'। 'এমনকি সুসংগঠিত মেদিনীপুরেও ইউনিয়ন বোর্ড প্রত্যাহারের পর (ডিসেম্বর ১৯২১) চৌকিদারি কর দেওয়ার জন্য জেলা-নেতাদের আবেদন প্রায়ই বিফলে গেল। না-দেওয়া খাজনার পরিমাণও ছিল যথেষ্ট এবং ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সাঁওতালরা হাট ও জমিনদারদের মালিকানাধীন জঙ্গল লুঠ করেন। ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এ জলপাইগুড়িতে পুলিশদের আক্রমণ করেন গান্ধীটুপি-পরা সাঁওতালরা। তাঁরা দাবি করেন, এই টুপি পরলে গুলিতে তাঁদের কিছু হবে না। পাশেই উত্তরবঙ্গের রঙপুর জেলায় চৌকিদারি কর না-দেওয়া 'অচিরেই পরিণত হয় খাজনা দিতে গররাজিতে'। আর, নিলফামারি-র মুসলমান কৃষকরা জনৈক 'গান্ধী দারোগা'-র অধীনে একটি 'স্বরাজ থানা' পত্তন করেন। চট্টগ্রামে সংরক্ষিত অরণ্যের ওপর সত্যিই ঝাঁপিয়ে পড়া হয়—ব্যাপক লুঠপাট চলে, যা 'স্বেচ্ছাসেবকদের কাজ নয়, বরং নিজেদের উপকারের জন্যে সাধারণ গ্রামবাসীদের কাজ'। ত্রিপুরার চৌদ্দগ্রাম মহকুমায় নভেম্বর ১৯২১ থেকে গ্রামের পুলিশ কাজ বন্ধ করে দেয়। 'কোনো কর জমা পড়ে নি ; এবং সরকার বা ব্যক্তিগত ভূস্বামীরা কেউই কোনো কৃষি-খাজনা সংগ্রহ করতে পারেন নি....বিক্ষোভ পুরোপুরি মুসলমানদের কিন্তু ধর্মীয় নয়। মানুষ শুধু নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে...' (*গভর্ণমেন্ট অফ বেঙ্গল, পলিটিকাল কনফিডেনশিয়াল*, ৩৯৫ অফ ১৯২৪ ঃ *হিস্ট্রি অফ্ দি নন-কো অপারেশন অ্যান্ড খিলাফৎ মুভমেন্টস্ ইন বেঙ্গল*)। এখানে লক্ষ্য করা দরকার যে, রঙপুর, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা—সবই ছিল প্রান্তীয় জেলা যেখানে শীর্ষস্থানীয় নেতারা যেতেন না বললেই হয়, আর স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক বা রাজনীতিকদের পক্ষে জনসাধারণকে সংযত করার নিষ্ফল প্রয়াসের কথা সরকারি প্রতিবেদনে বারবারই বলা হয়েছে। 'ফিরতি-ঠিকাদার' বা শিরোমণি রাজনীতিকদের প্ররোচনার তত্ত্ব এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

বাঙলায় যদি গান্ধীপন্থী গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার প্রবণতা বারবারই দেখা গিয়ে থাকে, বিহার কিন্তু মহাত্মার প্রশংসা অর্জন করেছিল 'এমন একটি প্রদেশ' হিসেবে 'যেখানে অসহযোগ সংক্রান্ত সবচেয়ে পাকা কাজ চলছে। তার নেতারা অহিংসার প্রকৃত মর্ম বোঝেন' (*ইয়ং ইন্ডিয়া*, ২ মার্চ ১৯২১)। জুন ১৯২২-এর মধ্যে মোট ২১,৫০০ ছাত্র নিয়ে ৪১টি উচ্চ-ও ৬০০টি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়, আর সুতো ও চরখা বিলি করার জন্য ১১টি জেলায় খোলা হয়েছিল ৪৮টি ভাণ্ডার। অগাস্ট ১৯২২-এ বিহার থেকে ৩০০,০০০ চরখা, ৮৯,০০০ হাতে-চালানো তাঁত ও প্রতিমাসে ৯৫,০০০ গজ খাদি উৎপাদনের খবর পাওয়া যায়, যদিও কংগ্রেস নেতারা স্বীকার করেন যে খাদির চড়া দামের জন্যে সেটি 'খুব জনপ্রিয় নয়', আর জনসংখ্যার মাত্র ১% তা পরেন। মদ বয়কটে যথেষ্ট অগ্রগতি হয় ; ছোটোনাগপুর-এর বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে তানা ভগত গোষ্ঠীর সঙ্গে কিছু যোগাযোগ

তৈরি হয়েছিল। শক্তিশালী কিন্তু কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত এক আন্দোলনের এই সাধারণ ছবির উল্টো দিকে কিন্তু কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনাকেও রাখতে হবে : যেমন, জানুয়ারি ১৯২১-এ মুজফ্ফরপুর, ভাগলপুর, মুঙ্গের ও পূর্ণিয়া-য় হাট লুঠ করার ৩৫টি দৃষ্টান্ত (এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা দাবি করেন যে তাঁরা গান্ধীর শিষ্য, কয়েকটি জায়গায় ন্যায্য দাম কায়েম করার চেষ্টা করছেন), জনৈক খিলাফত স্বেচ্ছাসেবকের গ্রেপ্তার হওয়ার পরই গিরিডি (থানা)-র ওপর আক্রমণ ও তার পরিণামে ২৫ এপ্রিল ১৯২১-এ গুলি চালনা, কিছু কিছু জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলে বেআইনি চোলাই-এর সংক্রমণ এবং চম্পারণ ও মুজফ্ফরপুর জেলায় গ্রামের পরম্পরাগত চারণভূমি জমিনদার ও নীলকররা দখল করায় বহুব্যাপ্ত উত্তেজনা। জানুয়ারি ১৯২১-এ ভাগলপুরের সোনপারসা-র ভূমিহার গ্রামবাসীরা জনৈক ইওরোপীয় ভূস্বামীর নিযুক্ত গুরখাদের আক্রমণ করেন, পশুচারণের অধিকার সংক্রান্ত বিবাদের ফলে চম্পারন জেলার মোতিহারির কাছে চৌতেরওয়া-র' নীলকুঠি পুড়িয়ে দেওয়া হয় নভেম্বর ১৯২১-এ। আর, ঝড়ের কেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে মুজফ্ফরপুরের সীতামারী মহকুমা। এখানে জানুয়ারি ১৯২২-এ সম্ভাব্য কর বিরোধী আন্দোলন আটকানোর জন্যে পাঠানো হয়েছিল দণ্ডদাতা পুলিশ। ১৯২০-তে যে জমিনদার-বিরোধী কৃষক বিক্ষোভ দারভাঙ্গা রাজ্যকে বিপর্যস্ত করে তোলে, বিহার কংগ্রেস নেতৃত্ব তার থেকে নিজেকে দৃঢ়ভাবে দূরে রাখে। আর কিন্তু কোনো পুনরুত্থান হয় নি। ১৯২১-এর গ্রীষ্মে ছোটোনাগপুর অঞ্চলের শ্বেতাঙ্গ কয়লাখনি-মালিকরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, শ্রমিক-সংগ্রহের বিভিন্ন অঞ্চলে অসহযোগের প্রচার ও তার সঙ্গে স্বামী বিশ্বানন্দের (যিনি ঝরিয়া-র রামযশ আগরওয়ালার মতো মারোয়াড়ি খনিমালিকদের কাছ থেকে খানিক সমর্থন পেয়েছিলেন) কার্যকলাপের ফলে খনিগুলি থেকে আসাম ধাঁচে গণ-দেশান্তরীর ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি কংগ্রেসিরা ঢোকার আগেই 'খনি-শ্রমিকরা নিজেরাই একটি ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠিত করেছিলেন' ('হোম পলিটিকাল', ৪৩/১৯২১)।

অসহযোগের সময়ে কংগ্রেসের অন্যতম শক্তিশালী ঘাঁটি হয়ে ওঠে যুক্ত প্রদেশ। জুলাই ১৯২১-এ এখানে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩২৮, ৯৬৬ (এই সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায় একমাত্র বিহার, যেখানে সদস্যসংখ্যা ৩৫০,০০০ বলে দাবি করা হয়েছিল)। এই সময় থেকেই যুক্ত প্রদেশ জাতীয় রাজনীতিতে অগ্রণী অবস্থান নেয়, আজও তা বজায় আছে। একদল অগ্রণী জাতীয়তাবাদীর ধারাবাহিক রাজনৈতিক জীবনক্রমের সূচনা হয় ১৯২০-২১ থেকে—জওহরলাল নেহরু, পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, লালাবাহাদুর শাস্ত্রী। ১৯২২-এর গোড়ার দিকে কংগ্রেস যুক্ত প্রদেশে ৯০,০০০ স্বেচ্ছাসেবকের নামভুক্তি করে আর খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক সঙ্ঘগুলিও প্রচণ্ড বেড়ে ওঠে। জুলাই ১৯২১-এর মধ্যে এই প্রদেশে ১৩৭টি জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল কাশী বিদ্যাপীঠ। যুক্ত প্রদেশের বুদ্ধিজীবীদের ওপর গভীর গান্ধীপন্থী অভিঘাতের জীবন্ত প্রতিফলন হয়েছে প্রেমচন্দ-এর উপন্যাসে। জাতীয়তাবাদী পত্রিকা *আজ* ও কাশী বিদ্যাপীঠে-র জন্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে ফেব্রুয়ারি ১৯২১-এ তিনি গোরখপুরের সরকারি বিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করেন। তাঁর *প্রেমাশ্রম* (১৯২১)-এ একজন ভূস্বামীর ছবি পাওয়া যায়, গান্ধীপন্থার দিকে যাঁর ঝোঁক। আর *রঙ্গভূমি* (১৯২৫)-র নায়ক একজন অন্ধ ভিখিরি, সুরদাস। তাঁর গ্রামের চারণভূমি একটি ইঙ্গ-

ভারতীয় সিগারেট কলের দখলে চলে যাওয়া রুখতে তিনি এক দীর্ঘকালীন অহিংস লড়াই-এ ব্রতী হন। এই দ্বিতীয় উপন্যাসটিতে বিনয় সিং ও সোফিয়া নামে আরও দুটি চরিত্র আছে যারা পরিণত হয় বিপ্লবীতে।

যুক্ত প্রদেশে অসহযোগ ছিল প্রধানত বিভিন্ন বড় ও ছোটো শহরের ব্যাপার, কিন্তু অন্যান্য জায়গার মতোই গ্রামাঞ্চলে আরও আকাঁড়া ধাঁচের আন্দোলন বোধহয় একইরকম তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কৃষক-বিক্ষোভের ক্ষেত্রে যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতৃত্ব বিহারের চেয়ে একটু বেশি অনুক্রিয়াশীল ছিলেন। এর কারণ বোধহয় অবধ তালুকদারের কুখ্যাত রাজভক্তি, যদিও বিভিন্ন সঙ্কট-মুহূর্তে নেতৃত্বের রাশ টেনে ধরার ভূমিকা বারেবারে দেখা যায়। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অবধ-এ বাবা রামচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কৃষক অভ্যুত্থান জানুয়ারি ও মার্চ ১৯২১-এর মধ্যে রায় বেরেলী, প্রতাপগড়, ফৈজাবাদ ও সুলতানপুর এক ব্যাপক কৃষি-কেন্দ্রিক দাঙ্গায় পরিণত হয়। এই দাঙ্গায় তালুকদারদের বাড়ি ও ফসল ছাড়াও লক্ষ্যবস্তুর মধ্যে ছিল বাজার ও ব্যবসাদারদের সম্পত্তি। যেমন, ৬ জানুয়ারি রায় বেরেলী-র ফুরসতগঞ্জ বাজার আক্রমণ করেন ১০,০০০-এর এক জনতা ; 'খাদ্যশস্য ও জামা কাপড়ের চড়া দাম' নিয়ে তাঁরা অভিযোগ তোলেন আর দাবি করেন, 'সমস্ত দোকান মালিককে এক্ষুনি গজপিছু ৪ আনা দরে কাপড় ও টাকায় ৮ সের করে আটা বিক্রি করার হুকুম দিতে হবে'—জনতা-দাম বেঁধে দেওয়ার চেষ্টার এটি এক উদাহরণ। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে ও তার আগে মারদাঙ্গা করে অকুলীনরা যে দামের সর্বোচ্চ সীমা ('মাক্সিমাম') বেঁধে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন এই ঘটনা তার কথা মনে করিয়ে দেয়। পুলিশের সঙ্গে কয়েকবার রক্তারক্তি সঙ্ঘর্ষ বাধে ও জনতার আদালতের কড়া কৃষকসুলভ ন্যায়বিচারের কিছু দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। জনৈক শাহ নাইম আটা নিজেকে 'সালোন-এর রাজা' বলে ঘোষণা করেন ; ফৈজাবাদে আবির্ভূত হন 'রামচন্দ্র'-র এক নকল দাবিদার। দুজনেই খাজনা-বন্ধ ও ভূমিহীনদের জন্য ভূমীর কথা প্রচার করেন, সবই গান্ধীর নামে।

অকুলীনদের এই বিক্ষোভ সম্পর্কে গান্ধীর নিজের ধিক্কারের কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কৌতূহলের ব্যাপার হলো : (তার থেকে) ১৯২১-এ জওহরলালের অবস্থানও আলাদা কিছু ছিল না। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে স্মরণ করেছেন, যাঁরা হিংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন, ফৈজাবাদের একটি সমাবেশে তিনি তাঁদের হাত তুলতে রাজি করান—যদিও তাঁর খুব ভালোই জানা ছিল যে, পুলিশ হাজির আছে ও ঐসব লোককে জেলে পাঠানো হবে। খিলাফতি ও কংগ্রেস নেতারা বাবা রামচন্দ্রকে আক্রান্ত এলাকা থেকে দূরে থাকতে রাজি করান। ১০ ফেব্রুয়ারি তিনি গ্রেপ্তার হলে মোতিলাল নেহরু ও গৌরীশঙ্কর মিশ্র তাড়াতাড়ি একটি প্রচারপত্র বার করেন। সেখানে জোর দিয়ে বলা হয়, 'আমাদের এ-ব্যাপারে অসুখী হলে চলবে না এবং আমরা যেন এমনকি তাঁকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা না করি।' ১৯৩০-এর দশকে আত্মজীবনীর এক খণ্ডাংশে রামচন্দ্র কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বেইমানির অভিযোগ আনেন। কিন্তু ১৯২১-এ, মনে হয়, তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর জাতীয়তাবাদী গুরুদের অনুসরণ করেছিলেন।

১৯২১-এর গ্রীষ্মের মধ্যে কিসান আন্দোলনকে অসহযোগ মোটের ওপর কুক্ষিগত করে ফেলেছিল বলে মনে হয়। কৃষকদের বিভিন্ন সুনির্দিষ্ট দাবিকে ঠেলে দেওয়া হয় পেছনে আর আতঙ্কিত যুক্ত প্রদেশ সরকার ১৯২১-এর আউধ খাজনা আইন-এর মাধ্যমে তালুকদারদের

বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কিছু ছাড় দিতে রাজি করায় (যেমন সাত বছরের ইজারার জায়গায় আজীবন রায়তি)। ১৯২১-এর শেষদিকে ও ১৯২২-এর গোড়ায় উত্তর-পশ্চিম অবধে (হরদোই, বাহরাইচ, বড়া বাঁকি ও সীতাপুর জেলায়) ব্যাপার-স্যাপার আবার হাতের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এখানে কিছু স্থানীয় কংগ্রেসি যে 'একা' আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা চলে যায় আও অনেক বেশি র‍্যাডিকাল মাদারি পাসির কব্জায়। আন্দোলনের মূল দাবি ছিল বস্তুগত খাজনা (বটাঈ)-কে নগদে পরিণত করা। (তাতে কৃষকদের সুবিধে হতো, কারণ দাম বাড়ছিল)। (সে-বাবদে) মন্ত্র ও শপথের এক এলাহি আচার-অনুষ্ঠান উদ্ভাবন করা হয়েছিল বলে মনে হয়। অনেক পরে, জুন ১৯২২-এর পুলিশ এই আন্দোলন ভাঙতে ও মাদারি পাসিকে গ্রেপ্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

এমনকি সামাজিক স্তরবিন্যাসের আরও নিচের পর্যায়েও অসন্তোষের লক্ষণ দেখে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল যুক্ত প্রদেশের ব্রিটিশরা। ১৯২১-এর গ্রীষ্মে বিভিন্ন পার্বত্য জনগোষ্ঠী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, কুমায়ুন মহকুমায় তাঁরা পুড়িয়ে দেন হাজার হাজার একর সংরক্ষিত অরণ্য (ভারত-সচিবকে বড়লাট, ১০ জুলাই ১৯২১, *রিডিং কালেকশন*)। অক্টোবর ১৯২১-এ রিডিং এই বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, অবধ-এর গ্রামাঞ্চলে 'নামে কৃষকদের জন্য সমাবেশ হলেও সেগুলিতে যারা হাজির থাকে তাদের বেশির ভাগই সেইসব লোক যারা নিজেদের জমি হারিয়েছে আর বিশ্বাস করে, গান্ধী সেই জমি ফিরিয়ে দেবেন। সেইসঙ্গে নিচু শ্রেণীর শ্রমিকরাও হাজির থাকে যাদের বিশ্বাস গান্ধী তাদের জন্যে জোতের ব্যবস্থা করে দেবেন' (ঐ, ১৩ অক্টোবর, ১৯২১)।

চৌরীচৌরা

চৌরীচৌরার যে-ঘটনা গান্ধীর পক্ষে শাকের আঁটি হয়ে দাঁড়ায় তা ঘটেছিল গোরখপুরের একটি গ্রামে। গ্রামটি কিসান সভা বা 'একা' বিক্ষোভে প্রভাবিত না হলেও এখানে একটি সুসংগঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ছিল। তাঁরা স্থানীয় বাজারে ধর্না শুরু করেছিলেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল মদ বিক্রি ও খাদ্যশস্যের চড়া দাম—দু-এরই বিরোধিতা। গান্ধী নিজেই পরে স্বীকার করেছিলেন, যথেষ্ট প্ররোচনার ব্যাপার ছিল—পুলিশ স্বেচ্ছাসেবীদের নেতাকে (ভগবান আহীর নামে সেনাবাহিনীর এক অবসরভাতা-ভোগী) পিটিয়েছিল আর থানার সামনে প্রতিবাদ করতে আসা জনতার ওপর তারা গুলি চালায়। প্রথমদিকে দায়রা আদালত ২২৫ জন অভিযুক্তের মধ্যে নিদেনপক্ষে ১৭২ জনকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা দেয় (শেষ পর্যন্ত ১৯ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়, বাকিদের দ্বীপান্তর)। এর থেকেই ব্রিটিশের আতঙ্ক যথাযথ প্রতিফলিত হয়। এটি নিশ্চয়ই লজ্জার ব্যাপার যে ২২ জন নিহত পুলিশের বদলে ১৪২ জনের জীবননাশের এই বর্বর প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সত্যিকারের কোনো জাতীয়তাবাদী প্রতিবাদই ছিল না।—নথিবদ্ধ প্রতিবাদ বলতে একমাত্র মানবেন্দ্রনাথ রায়ের প্রবাসী কমিউনিস্ট পত্রিকা *ভ্যানগার্ড* ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যনির্বাহি সমিতির। এমনকি আজও চৌরীচৌরায় একটি পুলিশ স্মৃতিস্তম্ভ আছে, কিন্তু কৃষক শহিদদের সম্মানে কিছুই নেই।

জওহরলাল নেহরু পরে স্মরণ করেছেন যে, চৌরীচৌরার পর গোটা আন্দোলন স্থগিত রাখার ব্যাপারে গান্ধীর আকস্মিক ও একতরফা সিদ্ধান্তে 'প্রায় সব অগ্রগণ্য কংগ্রেস নেতাই'

গভীরভাবে অসন্তুষ্ট হন, 'তরুণরা স্বভাবতই আরও বেশি' (*অ্যান অটোবায়গ্রাফি*, পৃ. ৮২)। গান্ধীর আত্মসমর্থনে, ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এর *ইয়ং ইণ্ডিয়া*-য় যেভাবে বলা আছে, দুটি যুক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রবল আবেগভরে আবার অহিংসায় আস্থা ঘোষণা (আন্দোলন হিংসাত্মক হয়ে ওঠা আটকাতে আমি সব অপমান, সব অত্যাচার, নির্বিকল্প সম্পর্কচ্ছেদ ও মৃত্যুও সইব'), আর সেই সঙ্গে একটি প্রকট অনুযোগ—'ধরা যাক বারডোলি-র অহিংস আইন-অমান্য ঈশ্বরের কৃপায় সফল হলো, ভারত সরকার বারডোলি-র জয়ীদের হাতে রাজ্যভার ত্যাগ করলেন, (তখন) বিশৃঙ্খল শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করবে কে...?' রজনী পাম দত্ত দেখিয়েছেন (যা প্রামাণ্য বামপন্থী সমালোচনায় পরিণত হয়েছে) কার্যনির্বাহী কমিটির যে প্রস্তাবে (১২ ফেব্রুয়ারি) আন্দোলন প্রত্যাহার অনুমোদন করা হয়, তার সাতটি ধারার মধ্যে দুটি ধারায় জোর দিয়ে বলা ছিল যে, 'জমিনদারদের খাজনা আটকে রাখা কংগ্রেস প্রস্তাবসমূহের বিপরীতধর্মী' (৬ নং) আর জমিনদারদের আশ্বাস দেওয়া হয় যে 'তাঁদের আইনি অধিকারের উপর আক্রমণ করার কোনোরকম অভিসন্ধি কংগ্রেস আন্দোলনের নেই' (৭নং) (*ইন্ডিয়া টুডে* পৃ, ২৯০)। তাহলেও চৌরীচৌরার ঘটনার সঙ্গে আদৌ খাজনার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, আর কাপড় বা মদের বিরুদ্ধে ধর্না বা রাজস্ব-বন্ধের চেয়ে খাজনা-বন্ধ নিজগুণেই অবধারিতভাবে আরও বেশি হিংসাত্মক ছিল না।

গান্ধীর সপক্ষে সঙ্গত যুক্তি দেওয়া যায়, তিনি বারেবারে ও প্রভূত পরিমাণে সতর্কবাণী দিয়েছিলেন যে, তিনি শুধু এক বিশেষ ধরনের নিয়ন্ত্রিত গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত, এবং শ্রেণীসংগ্রাম বা সমাজ-বিপ্লবে তাঁর আদৌ কোনো আগ্রহ নেই। গান্ধী যেই আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিলেন, গোটা আন্দোলনই ভেঙে পড়ল—এর থেকেই তার নিজস্ব মৌল দুর্বলতাও ধরা পড়ে—১৯১৯-২২-এর ভারতে দাহ্যবস্তু ছিল পর্যাপ্ত, বোধহয় সময় বিশেষে বিষয়গত দিক দিয়ে বিপ্লবী পরিস্থিতিও ছিল, কিন্তু বিকল্প বিপ্লবী নেতৃত্ব বলতে কিছুই ছিল না। জনগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন গান্ধীরাজ সম্বন্ধে এক আবছা মনশ্চিত্র-র মাধ্যমে, সেটিকে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব, বহুবিচিত্র ও কখনও কখনও প্রায়-বিপ্লবীভাবে বুঝে নিয়েছিলেন। কিন্তু নির্দেশের জন্যে তখনও অবধি তাঁরা তাকিয়ে থাকতেন শুধু মহাত্মার দিকেই। মোতিলাল নেহরু, লাজপত রায় বা চিত্তরঞ্জন দাসের মতো জেলবন্দী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ, বারডোলির পেছু-হটাকে যাঁরা পছন্দ করেন নি, তাঁরা নিঃসন্দেহে কোনোভাবেই গান্ধীর চেয়ে বেশি র‍্যাডিকাল বা সামাজিকভাবে কম সংস্কার-আচ্ছন্ন ছিলেন না। মতভেদটি সম্ভবত কৌশলগত ব্যাপারের চেয়ে বড় কিছু ছিল না, অর্থাৎ সময় ঠাহর করার প্রশ্ন। মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জন দাস কিছুটা ন্যায্যতই বুঝেছিলেন যে, ডিসেম্বর ১৯২১-এ যুবরাজের আগমনের সময়ে ব্রিটিশদের শান্তিপ্রস্তাব মেনে নিলে সাংবিধানিক ছাড় মারফত কিছু সুনির্দিষ্ট লাভ হতো, কিন্তু গান্ধী তখন সবরকম আপস বর্জন করেছিলেন, আর এখন কোনোরকম প্রতিদান ছাড়াই প্রত্যাহার করে নিলেন আইন অমান্য আন্দোলন।

কার্যত প্রায় সব মুখ্য কংগ্রেসি নেতাকে গ্রেপ্তার করলেও, ব্রিটিশরা এতদিন পর্যন্ত গান্ধীকে ছুঁতে সাহস পায় নি। কিন্তু ১০ মার্চ ১৯২২-এ তারা গান্ধীকে গ্রেপ্তার ও ছ বছর কারাদণ্ড দেওয়ার সাহস পেল। এটা আর কিছু নয়, গান্ধী তাদের যে-ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন, তার

বিরুদ্ধে এক বিশুদ্ধ শাস্তিমূলক প্রতিশোধ। আদালতে একটি সুচারু বক্তৃতা দিয়ে গান্ধী ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখেন : 'অতএব, আইনের কাছে যা ইচ্ছাকৃত অপরাধ কিন্তু আমার কাছে যা নাগরিকের সর্বোচ্চ কর্তব্য বলে মনে হয়, তার জন্য আমার বিরুদ্ধে যে চূড়ান্ত শাস্তি দেওয়া যেতে পারে তা স্বাগত জানাতে ও সানন্দে মেনে নিতে আমি এখানে এসেছি।' কিন্তু আসল ঘটনা হলো গান্ধী জেলে যাওয়াতে ভারতে কোথাও কোনো প্রতিবাদের মৃদু কম্পনও দেখা যায় নি।

১৯২২-১৯২৭ : অবনতি ও বিখণ্ডন

প্রথম নজরে, মনে হয়, ১৯২২ থেকে ১৯২৭ অবধি সময়টায় পুরোপুরি কায়েম হয়েছিল এক হঠাৎ-আশাভঙ্গের বোধ। এটি আরও বেশি তীব্র হয়ে ওঠে, কারণ ১৯২০ -তে এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেওয়ার যে-প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গান্ধী, সেটি জাগিয়ে তুলেছিল এক উচ্চপ্রত্যাশা। মার্চ ১৯২৩-এর মধ্যে কংগ্রেস সদস্যসংখ্যা নেমে আসে ১০৬,০৪৬-এ (২০টি প্রদেশের মধ্যে যে ১৬টি সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিল সেগুলোর ক্ষেত্রে)। দু বছর আগে যুক্ত প্রদেশ একাই যা দাবি করেছিল এই সংখ্যাটি তার তিনভাগের একভাগও নয়। পরিবর্তন-বিরোধী আর স্বরাজীদের মধ্যে বিরোধে জাতীয় আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় ; প্রায় ভিক্ষুকসুলভ রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ফেরার এক প্রবল প্রবণতাও ছিল, আর ১৯১৯-২২-এর হিন্দু-মুসলমান একতার পরেই দ্রুত এসে পড়ে অভূতপূর্ব মাত্রার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তাহলেও মাটির নিচে নিশ্চয়ই অন্যান্য ধারা শক্তি সঞ্চয় করছিল, কারণ নভেম্বর ১৯২৭-এ পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত সাইমন কমিশন ঘোষণার পরিণাম হিসেবে এল এক জাতীয় পুনরুত্থান। সেটি পরিণতি লাভ করে আইন অমান্য আন্দোলনে। মধ্যবর্তী বছরগুলোর বিবরণে এই দুটি দিকই খেয়াল রাখতে হবে, অর্থাৎ অবনতির দিক, কিন্তু সেই সঙ্গে এক নবায়নের সূচনাকেও।

পরিবর্তন-বিরোধী ও স্বরাজী

জুন ১৯২২-এ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি ভবিষৎ কর্মপন্থা সুপারিশ করার জন্যে এক আ ই ন-অ মা ন্য ত দ ন্ত ক মি টি তৈরি করে। তার মধ্যে আনসারি, রাজাগোপালচারি, ও কস্তুরিরঙ্গ আয়েঙ্গার গ্রামে গান্ধীপন্থী গঠনমূলক কাজে মন কেন্দ্রীভূত করার পরামর্শ দেন, আর মোতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল ও হাকিম আজমল খান যুক্তি দেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের কাউন্সিল নির্বাচনে যোগ দেওয়া উচিত। বল্লভভাই প্যাটেল ও রাজেন্দ্রপ্রসাদের মতো গোঁড়া গান্ধীপন্থীরা ছিলেন প্রথম মতের সপক্ষে, আর গয়া কংগ্রেসের সভাপতি (ডিসেম্বর ১৯২২) চিত্তরঞ্জন দাসের কাছ থেকে দ্বিতীয় মত লাভ করে জোরালো সমর্থন। র‍্যাডিকাল ভিত্তিতে কাউন্সিলে প্রবেশের এক যৌক্তিকতা হাজির করেন চিত্তরঞ্জন। তাঁর মতে, ভেতর থেকে কাউন্সিলের কাজকর্মে সর্বাত্মক বাধা দিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করার

জন্যে কংগ্রেসের কাউন্সিলগুলোয় প্রবেশ করা উচিত। এর ফলে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে ব্রিটিশরা আরও বেশি সংস্কার মেনে নিতে বাধ্য হবে। গয়া কংগ্রেসের দুমাস আগে দেরাদুনে যুক্ত প্রদেশ প্রাদেশিক সম্মিলনে চিত্তরঞ্জন তাঁর বিখ্যাত সূত্রটি ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'স্বরাজ' অবশ্যই 'জনসাধারণের'র জন্যে, শুধু 'কিছু শ্রেণী'র জন্যে নয়। গয়া অধিবেশনে কাউন্সিল প্রবেশ (-এর প্রস্তাব) খারিজ হয়ে যায় ১৭৪০ বনাম ৮৯০ ভোটে। কিন্তু মার্চ ১৯২৩-এ চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল তাঁদের পরিকল্পনা অনুযায়ী এগিয়ে গিয়ে নভেম্বরে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্যে একটি স্বরাজ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ দিল্লী কংগ্রেস (সেপ্টেম্বর ১৯২৩) ও নিয়মমাফিক অনুষ্ঠিত কোকনদ অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯২৩) একটা আপসে আসা সম্ভব হয়। এই আপস অনুযায়ী কংগ্রেসিদের নির্বাচনে দাঁড়াতে অনুমতি দেওয়া হলো, যদিও গঠনমূলক কর্মসূচিতে আস্থা আবার ঘোষণা করা হয়, ও তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি সংগঠিত করার জন্যে একটি সর্বভারতীয় খাদি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯২৪-এ গান্ধীর কারামুক্তির ফলে কিছুদিনের জন্য পাল্লা আবার 'পরিবর্তন-বিরোধী'দের দিকে ভারী হয়েছিল বলে মনে হয়। জুন ১৯২৪-এ আহ্মেদাবাদ অধিবেশনে গান্ধী কয়েকটি বিষয় নিয়ে চাপাচাপি করেন। সেগুলি হলো ঃ কংগ্রেস সদস্যপদের জন্য ন্যূনতম সূতো কাটার যোগ্যতা, যাঁরা কংগ্রেস দপ্তর-নির্বাহী পদ থেকে কাউন্সিলে ঢুকেছেন তাঁদের অপসারণ ও সেইসঙ্গে বাঙলার সাম্প্রতিক সন্ত্রাসবাদী ঘটনাকে সর্বাত্মক ধিক্কার জ্ঞাপন। প্রথম দুটি প্রস্তাব পরাস্ত হয় এবং চিত্তরঞ্জন ও বাঙলার বেশির ভাগ প্রতিনিধির তরফ থেকে তীব্র বিরোধিতার পর গোপীনাথ সাহাকে ধিক্কার জানিয়ে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় মাত্র ৭৮ বনাম ৭০ ভোটে। গান্ধী নিজেকে 'পরাস্ত ও পর্যুদস্ত' (*ইয়ং ইণ্ডিয়া*, ৩ জুলাই ১৯২৪) বলে ঘোষণা করেন আর নভেম্বর ১৯২৪-এ চিত্তরঞ্জন ও মোতিলাল নেহরুর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসেন। বোঝাপড়া অনুযায়ী স্বরাজীরা কাউন্সিলের মধ্যে 'কংগ্রেস সংগঠনের এক অখণ্ড অংশ' হিসেবে কাজ করার অনুমতি পাবেন, ও তার বদলে কংগ্রেস সদস্যপদের জন্য সুতো কাটার শর্ত প্রচলন করা হবে। (কিন্তু এই শর্ত পূরণ করা যাবে হয় ব্যক্তিগতভাবে নয়তো অন্য কাউকে দিয়ে যথাবশ্যক ২০০০ গজ সুতো কাটিয়ে)। পরের বছর গান্ধী সিদ্ধান্ত করেন যে কংগ্রেসের পুরো সাংগঠনিক কাঠামো স্বরাজীদের হাতে তুলে দেবেন, আর নিজস্ব ধ্যানধারণা প্রয়োগ করার জন্য আলাদা একটি সর্বভারতীয় বয়নকারী সমিতি প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর কাছে ১৯২৬ হবে 'মৌনের বছর'। এর ফলে এমনকি এই গুজবও রটে যে গান্ধী রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন।

নাগপুর, বোরসাড ও ব্যাইকোম

আভ্যন্তরীণ বিবাদ অবধারিতভাবেই কংগ্রেসের পক্ষে বড় আকারের বিক্ষোভ পরিচালনার সামর্থ্য কমিয়ে দিয়েছিল। নাগপুর শহরের কিছু অঞ্চলে কংগ্রেস পতাকার ব্যবহার স্থানীয় আদেশবলে নিষিদ্ধ করা হয়। তার প্রতিবাদে ১৯২৩-এর মাঝামাঝি যে নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল তা একটি নির্জীব ব্যাপার বলে প্রমাণ হয়, আর শেষ হয় এক আপসরফায়, যদিও বল্লভভাই প্যাটেলের গুজরাট প্রচুর সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক পাঠিয়ে আবার তার সাংগঠনিক ক্ষমতা দেখিয়ে দেয়। নিরবচ্ছিন্ন অকালি বিক্ষোভ জওহরলালের মতো অস্থির র‍্যাডিকালদের উদ্যমকে

অল্প সময়ের জন্যে একটা লক্ষ্যমুখী করেছিল বলে মনে হয়। ধর্মস্থানের ক্ষমতাচ্যুত মোহান্ত আর শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি-র মধ্যে, বিতর্কিত জমিতে একটি গাছ কাটা নিয়ে বিবাদের মতো খুবই তুচ্ছ ব্যাপার থেকে শুরু হয় গুরু-কে-বাস সত্যাগ্রহ (অগাস্ট ১৯২২—এপ্রিল ১৯২৩)। কিন্তু একেবারেই শান্তিপূর্ণ হাজার হাজার অকালি স্বেচ্ছাসেবকের ওপর নির্মম পুলিশি অত্যাচারের কারণে এই সত্যাগ্রহ দেশব্যাপী সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে। পরের বছর অকালি আন্দোলনের জনৈক প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাভা-র মহারাজা রিপুদমন সিং ব্রিটিশদের চাপের ফলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। এর ফলে জৈতো-তে একটি সত্যাগ্রহ শুরু হয়। অল্প সময়ের জন্য জওহরলাল এতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯২৫-এর শিখ গুরুদ্বারা ও ধর্মস্থান আইনের মাধ্যমে শিখ ধর্মীয় কেন্দ্রগুলির ওপর শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি-র নিয়ন্ত্রণ মেনে নিয়ে পাঞ্জাবের নতুন ধুরন্ধর লাট ম্যালকম হেলি কিন্তু গোটা অকালি বিক্ষোভকেই প্রশমিত করতে সমর্থ হন। বাঙলায় জনৈক দুর্নীতিগ্রস্ত মোহান্তের বিরুদ্ধে তারকেশ্বর সত্যাগ্রহের মাধ্যমে খানিকটা একই ধরনের—যদিও অনেক বেশি আঞ্চলিক—বিক্ষোভ শুরু হয় ১৯২৪-এ। এই সত্যাগ্রহ শুরু করেন স্বামী বিশ্বানন্দ ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যান চিত্তরঞ্জন দাস।

এই বছরগুলোতে দুটি সত্যিকারের তাৎপর্যপূর্ণ সত্যাগ্রহ অবশ্য ১৯২৩-২৪-এ বোরসাড-এর (খেড়া জেলায়) এবং ১৯২৪-২৫-এ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের বাইকোম-এর সত্যাগ্রহ। বল্লভভাই প্যাটেল-এর বোরসাড আন্দোলনকে গ্রামীণ গুজরাটের প্রথম প্রকৃত সফল গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহ বলে অভিহিত করেছেন হার্ডিমান। ঘন ঘন ডাকাতি (এইসব ডাকাতির বেশির ভাগই করতেন নিচুজাতের বারাইয়ারা, এবং পাটীদাররা ভেবেছিলেন, কংগ্রেসকে সমর্থন করার দরুন তাঁদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে) দমন করার জন্যে প্রয়োজনীয় পুলিশের খরচ মেটানোর উদ্দেশ্যে সেপ্টেম্বর ১৯২৩-এ বোরসাড-এর প্রতিটি সাবালক পুরুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় ২ টাকা ৭ আনা সর্বজনীন কর। এই সত্যাগ্রহ ছিল তার প্রতিবাদে। আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ১০৪টি গ্রামের সবকটিতেই নতুন উদ্‌গ্রহ (লেভি) জমা দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়, আর ৭ জানুয়ারি ১৯২৪-এ সেটি বাতিল করতে হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এর আচমকা পশ্চাদপসরণের ফলে গান্ধীপন্থী কংগ্রেসের যে-সম্মান খানিকটা নেমে গিয়েছিল, সেটিকে পুনরুদ্ধার করে এই বিজয়। ১৯২৪-এ এক সাম্প্রতিক করবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বরোদা-র পেটলাড় তালুকে (খেড়া-র পাশে) রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়। তার মাধ্যমে একটি দেশীয় রাজ্যে গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহ প্রসারের এই প্রথম প্রয়াস সফল হয় নি, কারণ বরোদা রাজ্যের আমলারা তাড়াতাড়ি কিছু ছাড় দিয়ে ব্রিটিশদের থেকে অনেক বেশি নমনীয়তা দেখান। প্রথম 'মন্দির প্রবেশ' আন্দোলন ছিল বাইকোম সত্যাগ্রহ—আরো সঠিকভাবে, এটি ছিল নিচুজাতের এজাভা ও অচ্ছুতদের পক্ষে ত্রিবাঙ্কুরের একটি মন্দিরের কাছের রাস্তাগুলি ব্যবহার করার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে কঠোরভাবে গান্ধীপন্থী ধারায় এক প্রচেষ্টা। কে কেলাপ্পন ও কে পি কেশব মেনন-এর মতো কংগ্রেসিদের সঙ্গে মিলে এই সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব দেন এজাভা কংগ্রেস নেতা টি কে মাধবন। নায়ার জাতিসভা-র নেতা মন্নত পদ্মনাভ পিল্লাই-এর অংশগ্রহণ থেকে অন্যান্য জাতির সমর্থনেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে হিন্দুদের ব্যাপার থেকে দূরে থাকতে বলে গান্ধী এক বিবৃতি দেন। ফলে তাঁরা অনাবশ্যকভাবে এই সত্যাগ্রহ

থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। মার্চ ১৯২৫-এ গান্ধী বাইকোম পরিদর্শন করেন, কিন্তু সত্যাগ্রহ থেমে যায় ২০ মাস পরে, যখন সরকার অচ্ছুতদের জন্যে কয়েকটি ঘুরপথের রাস্তা তৈরি করে দেয়।

গঠনমূলক কাজ

মাঝেমধ্যে আঞ্চলিক বিষয় নিয়ে সত্যাগ্রহের কথা ছেড়ে দিলে, গান্ধীপন্থী 'পরিবর্তন-বিরোধীরা' এই বছরগুলোয় বিভিন্ন গ্রামে গঠনমূলক কাজে মনোনিবেশ করেন। এর মধ্যে ছিল বন্যার মতো আপৎকালীন সময়ে (যেমন বাঙলায় ১৯২২-এ ও গুজরাটে ১৯২৭-এ) প্রশংসনীয় ত্রাণকার্য (প্রায়ই সরকারি প্রচেষ্টাকে অনেক পেছনে ফেলে), জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, খাদি ও অন্যান্য কুটিরশিল্পের উন্নয়ন, মাদক-বিরোধী প্রচার, আর নিচুজাত ও অচ্ছুতদের মধ্যে সমাজসেবা। গ্রাম-ভারতের সামাজিক ও আর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হিসেবে দেখলে এই কর্মসূচি স্পষ্টতই ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯০৫ থেকে অসংখ্য প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা পরিষ্কারভাবে দেখিয়ে দেয় যে, জাতীয় বিদ্যালয়ের বাড়বাড়ন্ত হয় একমাত্র প্রচণ্ড রাজনৈতিক উত্তেজনার সংক্ষিপ্ত পর্বে, আরও স্বাভাবিক সময়ে সেগুলি ডিগ্রি ও চাকরির প্রলোভন অতিক্রম করতে পারে না। ১৯২৭-এ মোতিলালের কাছে গান্ধী অপ্রকাশ্যে স্বীকার করেন যে, খাদি হয়ে দাঁড়াচ্ছে এক পাহাড়প্রমাণ দায়িত্ব (জওহরলাল নেহরুকে মোতিলাল ১১ অগাস্ট, ১৯২৭), কারণ শেষ পর্যন্ত এটি আমদানি-করা কাপড় বা ভারতীয় মিলের কাপড়ের থেকে তখনও অবধি অনেক বেশি আক্রা ছিল। 'অচ্ছুতোদ্ধার'—যার নাম পাল্টে করা হয় 'হরিজন' কল্যাণ ও ১৯৩২-এর পর নানান রাজনৈতিক কারণে যেটিকে প্রভূত প্রসারিত করা হয়—'অস্পৃশ্য'দের যে সংখ্যাগুরু অংশ ভূমিহীন ও প্রায়ই আধা-দাসসুলভ কৃষিশ্রমিকদের নিয়ে তৈরি, তাঁদের মৌল আর্থনীতিক সমস্যা নিয়ে তা একেবারেই কিছু করে নি। এমনকি বিশুদ্ধ সমাজ সংস্কার হিসেবেও এটি যথেষ্ট বাধা পায়, কারণ ১৯২০-র দশকে গান্ধী জাতিপ্রথাকে নীতিগত কারণে ধিক্কার দিতে রাজি হন নি। ১৯২৫-এ ত্রিবাঙ্কুর পরিদর্শনের সময় গান্ধী এজাভা ধর্মীয় নেতা শ্রীনারায়ণ গুরু-র র‍্যাডিকাল জাতিবিরোধী ধ্যানধারণা সম্পর্কে তাঁর মতান্তরের কথা জানান, আর ১৯২৭-এ মাদ্রাজে তাঁর বর্ণাশ্রম আদর্শের সমর্থনসূচক বক্তৃতা ই ভি নায়কর-এর মতো তামিলনাড়ুর জঙ্গী অব্রাহ্মণদের চূড়ান্ত হতাশ করে।

এসব সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের প্রতি সমর্থন গড়তে ও, সবচেয়ে বড় কথা, নিচু জাতি ও অচ্ছুতদের ওপর কংগ্রেসের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গান্ধীপন্থী গঠনমূলক কাজের যে পর্যাপ্ত রা জ নৈ তি ক গুরুত্ব ছিল তা ক্রমেই বেশি করে ধরা পড়েছে সাম্প্রতিক বিভিন্ন আনুপুঙ্খিক গবেষণায় (যেমন, বাঙলা, যুক্ত প্রদেশ ও খেড়া সম্বন্ধে যথাক্রমে হিতেশ সান্যাল, জ্ঞান পাণ্ডে ও ডেভিড হার্ডিমান)। জাতীয় বিদ্যালয়, খদ্দর ভাণ্ডার ও নানারকম সমাজসেবা সমিতি (যেমন লাজপত রায়ের লোক সেবক মণ্ডল সক্রিয় ছিল পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে) বেশ কিছু সংখ্যক সর্বক্ষণের কংগ্রেস কর্মীদের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করে। জাতীয় শিক্ষা যদি প্রধানত শহরবাসী নিম্ন মধ্যশ্রেণী ও ধনী কৃষক গোষ্ঠীর কাজে লেগে থাকে (১৯২০-র দশকে যুক্ত প্রদেশের এই ধরনের বিদ্যালয়গুলি থেকে একটিও অচ্ছুত কংগ্রেস কর্মী উঠে আসেন নি), তাহলেও খাদির ক্ষেত্রে 'শিরোমণি রাজনৈতিকদের কৃষকের মতো

জামাকাপড় পরতে বাধ্য করা'র (হার্ডিমান) পরিষ্কার রাজনৈতিক সুবিধা ছাড়াও, এটি অবশ্যই গ্রামাঞ্চলের গরিবদের প্রান্তিক ত্রাণের কাজে লেগেছিল। এমনকি বাঙলার মতো প্রদেশে, সাধারণভাবে যার একটি 'গান্ধীপন্থা-বিরোধী' খ্যাতি ছিল, সেখানেও সোদপুরে সতীশ দাশগুপ্ত-র খাদি প্রতিষ্ঠান ও কুমিল্লায় সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের খাদি আশ্রমের মতো সংস্থা যথেষ্ট উপযোগী কাজ করেছিল। আর হুগলি জেলার প্রচণ্ড পেছিয়ে-পড়া দারিদ্রপীড়িত আরামবাগ অঞ্চলে ১৯২২ থেকে প্রফুল্ল সেনের মতো ব্যক্তিদের অবিরত কার্যকলাপের ওপর জোর দিয়েছেন হিতেশ সান্যাল। নিশ্চিতভাবেই আরামবাগ ধনী কৃষক বিকাশের অঞ্চল ছিল না, যদিও এদিক দিয়ে এটি হয়তো বেশিরভাগ গান্ধীপন্থী গ্রামীণ ঘাঁটির মতো দৃষ্টান্তস্থানীয় নয়। প্রত্যাশিতভাবেই গঠনমূলক কাজ সবচেয়ে সাফল্য অর্জন করেছিল গুজরাটে, বিশেষ করে প্রচুর সংখ্যক আশ্রমের এক বিন্যাস ও অগণিত গ্রামসেবক সহ খেড়া ও বারডোলিতে। এখানে প্রাথমিক পর্যায়ের 'কমতি পাটীদার' ভিত্তি পেরিয়ে গান্ধীবাদী প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করেছিল এই গঠনমূলক কাজ। বারডোলির 'কালিপরাজ' ও খেড়া-র বারাইয়া-দের ভেতর কাজের মধ্যে মিলে ছিল, অকিঞ্চিৎকর হলেও অবস্থার যথার্থ উন্নয়ন ও সেইসঙ্গে বিভিন্ন অবাধ্য উপাদানকে 'বশে' আনার এক প্রক্রিয়া। যেমন, বারাইয়া-র গ্রামগুলিতে রবিশঙ্কর মহারাজ সাধু ও সমাজ সংস্কারক রূপে ঘুরে বেড়ানোর ফলে বোরসাড তালুকে ডাকাতির সংখ্যা ১৯২১-এ ২০টি থেকে কমে গিয়ে ১৯২৭-২৯-এ বছরে একটিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। সর্বত্রই গঠনমূলক কাজের প্রতিটি কেন্দ্র ১৯৩০ -এর আইন অমান্যের প্রাথমিক ভিত্তিভূমিতে পরিণত হয়েছিল, আর খেড়া-র কৃষকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ যে গভীর শেকড় ছড়িয়েছিল তা দেখা যায় যখন ডান্ডী অভিযানের সময়ে ১৪টি বোরসাড গ্রাম স্ব-উদ্যোগেই রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলনের জন্যে চাপ দেয়। সে-বছর ফসল হয়েছিল খুবই ভালো,হালে রাজস্ব বাড়ানো হয় নি, আর ১৯৩০-এর শেষ দিকে কৃষিজ পণ্যের দাম পড়ে যাওয়া তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সঙ্কীর্ণ বস্তুগত স্বার্থ দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ক্রিয়াশীলতা সবসময়ে বা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না।

স্বরাজী রাজনীতি

এইসব বছরে স্বরাজীদের নির্বাচনী ও কাউন্সিল কার্যকলাপ বাহ্যত ছিল অনেক বেশি চমকদার, যদিও শেষ অবধি তার স্থায়ী তাৎপর্য বোধহয় কমই। কেন্দ্রীয় প্রদেশগুলিতে ১৯২৩-এর নির্বচনে স্বরাজীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। এইসব অঞ্চলে এন সি কেলকর-এর মতো টিলকের পুরনো মহারাষ্ট্রীয় অনুগামীরা—যাঁরা কখনোই অসহযোগ সম্পর্কে বিশেষ মোহিত হন নি—দৃঢ়ভাবে মোতিলাল ও চিত্তরঞ্জন দাসকে সমর্থন করার দিকে ঘুরে যান। বাঙলাতেও দলের ফল ভালোই হয়েছিল। এখানকার প্রার্থী বিধানচন্দ্র রায় প্রাচীন প্রধানপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কে (যিনি ১৯২১ সালে মন্ত্রী হয়েছিলেন) হারিয়ে দেন। ৮৫টি নির্বাচিত সাধারণ হিন্দু ও মুসলমান আসনের মধ্যে স্বরাজ্য দল ৪৭টি দখল করতে সমর্থ হয়। এর মধ্য অন্যূন ২১টি ছিল মুসলমান কেন্দ্র। বাঙলায় বিজয় সম্ভব হওয়ার কারণ ছিল 'দেশবন্ধু' চিত্তরঞ্জন দাসের প্রচণ্ড কুশলী ও ফলপ্রসূ নেতৃত্ব। জুন ১৯২৫-এ অকালমৃত্যু অবধি তিনি বিভিন্ন কংগ্রেস রাজনীতিক, বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের মতো গণ-অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জেলান্তরের নেতৃবৃন্দ, বিপ্লবী

কর্মী (১৯২৪ নাগাদ ২৮ জন প্রাক্তন আটক বন্দীকে বি পি সি সি-তে নেওয়া হয়েছিল), আর যেটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, মুসলমান নেতাদের মধ্যে মোটামুটি একটা বোঝাপড়া বজায় রাখতে পেরেছিলেন। মুসলমান নেতাদের সমর্থন দেশবন্ধু জয় করেন তাঁরা বা ও লা চু ক্তি-র মাধ্যমে (ডিসেম্বর ১৯২৩)। এই চুক্তিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে স্বরাজের পর প্রাদেশিক প্রশাসনিক পদের ৫৫% পাবেন মুসলমানরা, মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ হবে, আর বকরিদে গরু জবাই-এর ব্যাপারে হাত দেওয়া হবে না। ভেতর থেকে কাউন্সিলকে বেইজ্জত করার কর্মসূচি রমরমা করে শুরু হয় মধ্য প্রদেশে ও বাঙলায়। দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের বেতন নিতে অস্বীকার করা হয়। ফলে তাঁদের পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়, আর আইন প্রণয়নের কাজকে এগোনোর জন্যে লাটদের পক্ষে বারবার তাঁদের 'সার্টিফিকেট' ক্ষমতার প্রয়োগ ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। এইভাবে দ্বৈতশাসন-ব্যবস্থার 'মুখোশ খুলে দেওয়া' হয় এই দেখিয়ে যে এটি কোনো প্রকৃত সাংবিধানিক অগ্রগতি নয়। বিভিন্ন সংস্কার আলোচনা করে দায়িত্বশীল সরকার তৈরির জন্যে গোল টেবিল বৈঠকের দাবি করে স্বরাজীদের উদ্যোগে ফেব্রুয়ারি ১৯২৪-এ একটি প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় পাশ হয়। আর মোতিলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল-এর মতো ব্যক্তিরা সাংসদ হিসেবে যথেষ্ট দক্ষতা দেখান। আর একটি পরিণাম হলো : ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও স্বরাজী রাজনীতিকদের মধ্যে যোগসূত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটে,কারণ সরকারকে ঠেলেঠুলে ১৯২১-এ অর্থ কমিশন-ঘোষিত 'বিভেদমূলক সংরক্ষণে'র নতুন নীতির অধীনে টাটা-র ইস্পাত শিল্পকে ১৯২৪-এ সংরক্ষণ পাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে স্বরাজীরা খুবই সহায়ক বলে প্রমাণিত হন। এর মধ্যে সারা দেশ জুড়ে সব আঞ্চলিক সংস্থা ও পৌরসভা দখল করে নেয় কংগ্রেস। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কলকাতা আর জওহরলাল নেহরু ও বল্লভভাই প্যাটেল-এর নেতৃত্বে যথাক্রমে এলাহাবাদ ও আহ্‌মেদাবাদ। ১৯২৪ থেকেই সীমিত কল্যাণমূলক কাজ, যার হয়তো আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক, পৃষ্ঠপোষণ ও তহবিলের মূল্যবান উৎস হিসেবে এগুলি খুবই উপযোগী ক্ষেত্র বলে প্রমাণ হয়। কলকাতা পৌরসভার রাজনৈতিক ছলাকলা সম্পর্কে বাঙলার রাজনীতিকরা অবশ্য বরাবরই এমন ভাবনা দেখাবেন যা ঠিক পুরো ভদ্রোচিত নয়।

যা-ই হোক, কাউন্সিলে ঢোকার রাজনীতি খুবই তাড়াতাড়িইএকরাশ সমস্যা ও অভ্যন্তরীণ বিভেদের দিকে নিয়ে গিয়েছিল, কারণ একবার দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে শূন্যগর্ভ প্রতিপন্ন করার পর প্রশ্ন আসে : এরপর কী করা হবে, যখন তারপরেও বড়লাট বা লাটরা তাঁদের খুশিমতো যে-কোনো আইনকে সার্টিফিকেট পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পার করিয়ে দিতে পারতেন। যুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা নিয়মকানুন-এর মতো একটি আদেশবিধিকে এপ্রিল ১৯২৫-এ সার্টিফিকেট পদ্ধতির মাধ্যমে আইনে পরিণত করা হয়। অক্টোবর ১৯২৪-এ সুভাষচন্দ্রকে ও সেইসঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে যোগসাজস আছে এইরকম ৮০ জনকে ঐ আইনের বলে বিনা বিচারে আটক করা হলো। বাঙলার স্বরাজীরা এর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারেন নি। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় নির্বাচিত মন্ত্রীদের প্রকৃত কোনো ক্ষমতা না-থাকলেও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষণের ক্ষমতা ছিল—তাঁরা তা নিয়ন্ত্রণও করতেন। আর দফতরের যদি কলাটা-মুলোটা পাওয়া যায়, তবে তার কাছাকাছি থাকলে শিগ্‌গিরই কার্যনির্বাহী পদ নিয়ে 'সংবেদী সহযোগিতা'র একটা ঝোঁক বেড়ে ওঠে। এমনকি

চিত্তরঞ্জন দাসও তাঁর মৃত্যুর আগে এই ধারণাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছিলেন বলে মনে হয়। যে ১৯২৫-এর ফরিদপুর সম্মিলনে তাঁর বক্তৃতায় তিনি বন্দীমুক্তি ও সাংবিধানিক সংস্কার নিয়ে কথাবার্তার বিনিময়ে সহযোগিতার প্রস্তাব দেন। অক্টোবর ১৯২৫-এ যুক্ত প্রদেশে মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করে এস বি তাম্বে আসরে নেমে পড়েন, তাঁর ঘোর অখ্যাতি করেন মোতিলাল নেহরু, কিন্তু এন সি কেলকর, বি এস মুঞ্জে ও এম আর জয়কর-এর মতো মহারাষ্ট্রীয় ও বোম্বাই-এর স্বরাজীদের কাছ থেকে তিনি সমর্থন পান। যে দলীয় আমলাতন্ত্র উঠে আসছিল তার মধ্যে ও সেইসঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক সংস্থা ও সরকারি দফতরে পৃষ্ঠপোষণের সম্ভাবনা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে প্রচণ্ড বাড়িয়ে তোলে। বাঙলায় চিত্তরঞ্জন দাসের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকার নিয়ে এক কটু লড়াই বাধে। এই লড়াই-এ ১৯২৭-এ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত উচ্ছেদ করেন বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে। কিন্তু কিছুদিন পরেই আটক অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে সুভাষচন্দ্র তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানান। ১৯২৬-এর নির্বাচনের আগে লাজপত রায় ও সং বে দী স হ যো গী-দের সঙ্গে সমঝওতা করে মোতিলালের পুরনো প্রতিদ্বন্দ্বী মদনমোহন মালবীয় একটি স্বা ধী ন ক ং গ্রে স দ ল গঠন করেন। এই দলের কর্মসূচিতে রাজনৈতিক নরমপন্থীর সঙ্গে মিশে ছিল লাগামছাড়া হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা।

সাম্প্রদায়িকতা

বাস্তবিকই এই বছরগুলোয় শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী নঞর্থক বিকাশ হলো হিন্দু ও মুসলমান দুই সাম্প্রদায়িকতারই বেশ অভূতপূর্ব বৃদ্ধি। সেপ্টেম্বর ১৯২৪-এ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কোহাট-এ একটি উগ্র হিন্দুবিরোধী বিক্ষোভ হয়, এতে নিহত হন ১৫৫ জন। কলকাতায় ১৯২৬-এর এপ্রিল থেকে জুলাই-এর মধ্যে তিনদফা দাঙ্গায় নিহতের সংখ্যা ছিল ১৩৮। ঐ একই বছরে ঢাকা, পাটনা, রাওয়ালপিণ্ডি ও দিল্লীতে গোলমাল বাধে : সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যুক্ত প্রদেশ : ১৯২৩ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিস্ফোরণের সংখ্যা ছিল অন্যূন ৯১টি। মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ করা নিয়ে মুসলমানদের দাবি ও গোহত্যা নিষেধের জন্যে হিন্দুদের চাপ—এই ছিল বারেবারে ঘোষিত বিষয়। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সংস্থার সংখ্যা ছড়িয়ে পড়ে, আর রাজনৈতিক জোট ক্রমেই বেশি করে গড়া হতে থাকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে।

১৯১৯-২২-এ হিন্দু-মুসলমান ভ্রাতৃত্ব যখন তুঙ্গে, তখনও কংগ্রেস ও খিলাফত স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনগুলি সাধারণত আলাদা আলাদা সংস্থা হিসেবে থাকত। সেগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল নেতাদের ভেতর সমঝওতার ফলে, কিন্তু নেতাদের মধ্যে ঝগড়া বাধলে ভাগাভাগির সম্ভাবনাও ছিল। গোঁড়া মোল্লাদের রাজনীতিতে নিয়ে এসেছিল খিলাফত : ডিসেম্বর ১৯২১-এ জামিয়াত-আল-উলামা-এ-হিন্দ-এর কর্মসূচিতে স্বাধীন ভারতকে ভাবা হয়েছিল বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এক ধরনের যুক্তরাষ্ট্র রূপে। কংগ্রেস প্রচারও, বিশেষ করে নিচু স্তরে, বরাবরই বিনা ব্যত্যয়ে ধর্মনিরপেক্ষ থাকে নি—যা-ই হোক না কেন, মুসলমানদের কাছে রামরাজ্যের ধারণা বিশেষ অর্থবহ বা আকর্ষণীয় ছিল না। ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এ গান্ধীর একতরফা প্রত্যাহারের পর কংগ্রেস ও খিলাফত নেতাদের ভেতর সমঝওতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯২৫-এর গোড়া অবধি তা-ই

বজায় থাকে। এরপর, ডিসেম্বর ১৯২৩-এর মতো অত পরেও যিনি কোকনদ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেছিলেন, সেই মহম্মদ আলী ক্রমাগত দাঙ্গার পরে গান্ধীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন। খিলাফতিরা অবশ্য তাঁদের প্রধান নারা থেকে বঞ্চিত হন যখন ১৯২৪-এ কামাল আতাতুর্ক অটোমান খলিফা-শাসন বিলোপ করেন।

শুধু রাজনীতিক ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিভেদের ব্যাপারটিকে যদি ধরা যায়, তাহলে ১৯২০-র দশকে সাম্প্রদায়িকতার বৃদ্ধির পেছনে নির্ণায়ক কারণ ছিল ১৯১৯-উত্তর রাজনৈতিক কাঠামোয় যোগ দেওয়ার হেতুপরম্পরার মধ্যেই। মন্টফোর্ড সংস্কারে ভোটদানের অধিকার প্রসারিত হলেও পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বজায় থাকে, এমনকি তা বেড়েও যায়। ফলে এই ব্যবস্থার মধ্যে সক্রিয় রাজনীতিকদের পক্ষে খণ্ডাত্মক স্লোগান ব্যবহার করা ও নিজস্ব ধর্মীয়, আঞ্চলিক বা জাতগোষ্ঠীর মধ্যে আনুকূল্য ছড়িয়ে অনুগামী তৈরির এক সহজাত প্রলোভন কাজ করেছিল। এরই সঙ্গে সম্পর্কিত দ্বিতীয় কারণটি হলো : ১৯২০-র দশকে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার। কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে চাকরির সুযোগ ছিল না। ক্রমবর্ধমান আশা ব্যর্থ হওয়ায় স্কুল, দফতর ও দোকানে....ক্ষোভ ও তিক্ততা তীব্র' হয়েছিল (পি হার্ডি, *মুসলিমস্ অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া,* পৃ. ২০৪)—এটি শুরু হয় ১৮৮০-র দশক থেকে, কিন্তু এখন ঘটে অনেক বড় মাত্রায়। অকিঞ্চিৎকর সম্পদের জন্যে কাড়াকাড়ি ইন্ধন জোগায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে। সমাজবিন্যাসের তলার দিকে আর্থনীতিক ও সামাজিক টানাপোড়েন আগের মতোই প্রায়ই বিকৃত সাম্প্রদায়িক চেহারা নিতে পারছিল, বিশেষ করে এখন, যখন একটি উপযুক্ত ভাবাদর্শ ভালোভাবেই হাজির রয়েছে। যেমন, কানপুরের মতো শহরে মার্চ ১৯৩১-এর বিশাল দাঙ্গার পটভূমি অংশত তৈরি হয়েছিল ১৯২০-র দশকে, যখন প্রধানত মুসলমান-নিয়ন্ত্রিত তাঁতশিল্পের অবনতি হচ্ছিল, আর হিন্দু ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা এগিয়ে যাচ্ছিলেন জোর কদমে। ময়মনসিংহ-র গ্রামাঞ্চলে উত্তেজনা বিষয়ে বাঙলা সরকারের একটি প্রতিবেদনে (নভেম্বর ১৯২৬) বলা হয় 'এই জেলায় হিন্দু ভূস্বামী ও মুসলমান তালুকদার বা জোতদারের মধ্যে আর্থিক রেষারিষি'র কথা, 'যার প্রতিফলন হয়েছে বাঙলা প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনী বিল-এর ভাগ্য নিয়ে মুসলমান নির্বাচকদের তীব্র আগ্রহে' (*গভর্নমেন্ট অফ বেঙ্গল পলিটিকাল কনফিডেনশিয়াল,* ১৯২৬-এর ৫১৬ [১-১৪])। ১৯২৩ থেকে ১৯২৮-এর মধ্যে প্রজাস্বত্ব সংশোধন নিয়ে মাঝেমাঝে যে আলোচনা চলছিল তাতে বাঙলার পুরো স্বরাজী নেতৃবৃন্দ, এমনি 'বামপন্থী' সুভাষচন্দ্রও, জমিনদারদের সপক্ষে থাকেন। ফলে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেন।

শিরোমণি-ও জন-সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে যোগসূত্র তৈরি করে দিয়েছিল বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক সমিতি ও ভাবাদর্শের দ্রুত বৃদ্ধি। এক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান সুপরিচিত—১৯২৩ থেকে শুরু করে 'তবলিগ' (প্রচার) ও 'তনজিম' (সংগঠন)-এর বিস্তার, ১৯২৪-এ কোহাট বিক্ষোভ, বিভিন্ন খিলাফত সংস্থা উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম লীগের পুনরুত্থান, ১৯২৬-এ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ-হত্যা। জিন্নার সভাপতিত্বে ১৯২৪-এ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে (১৯১৮-র পর এই প্রথম কংগ্রেস অধিবেশন থেকে আলাদা করে তা হয়) যুক্তরাষ্ট্রের দাবি তোলা হয় যেখানে, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ছাড়াও, 'হিন্দু আধিপত্য'র বিপদ থেকে মুসলমানপ্রধান

অঞ্চলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বশাসন থাকবে। ১৯৪০-এ পাকিস্তান দাবি করার আগে অবধি এই শেষ স্লোগানটিই মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে থাকবে। অবশ্য এই বছরগুলোয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার অতিদ্রুত বৃদ্ধির বিরুদ্ধ-প্রতিক্রিয়া হিসেবেই যে এই ব্যাপারগুলি এসেছিল সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া খুবই দরকার। 'তবলিগ' ও 'তনজিম'-এর অনেকখানি ছিল আর্যসমাজীদের 'শুদ্ধি' ও 'সংগঠন'-এর জবাব। 'শুদ্ধি' ইত্যাদি শুরু হয় মোপলা-দের জোর করে ধর্মান্তরণের পরে। ইসলামে ধর্মান্তরিত মালকানা রাজপুত, গুজর ও বানিয়াদের হিন্দুধর্মে ফেরানোর দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে ১৯২৩-এ পশ্চিম-যুক্ত প্রদেশে এগুলির বিস্তার ঘটান স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। ১৯১৫-য় হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় কিছু পাঞ্জাবী নেতাকে নিয়ে মদনমোহন মালবীয় যে হিন্দু মহাসভা শুরু করেছিলেন, অসহযোগের বছরগুলোয় তা কার্যত অকেজো হয়ে পড়ে। বিরাট (হিন্দু) পুনরুত্থান শুরু হয় ১৯২২-২৩-এ। মহাসভার অগাস্ট ১৯২৩-এর বারাণসী অধিবেশনে—যেখানে 'শুদ্ধি' কর্মসূচির অন্তর্ভুক্তি ও হিন্দু আত্মরক্ষা বাহিনীর ডাক দেওয়া হয়—দেখা দেয় এক সাধারণ সাম্প্রদায়িক মোর্চার জন্যে আর্যসমাজী সংস্কারকদের সঙ্গে স না ত ন ধ র্ম স ভা-পন্থী রক্ষণশীলদের সমঝওতা। যথারীতি এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মালবীয়। মহাসভার প্রচারে হিন্দু ও হিন্দীর যোগসূত্রের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হতো। এটির সুনির্দিষ্ট আবেদন তাই অনেকাংশেই উত্তর-ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকে (১৯২৩-এর অধিবেশনে ৮৬.৮% প্রতিনিধি এসেছিলেন যুক্ত প্রদেশ দিল্লী, পাঞ্জাব ও বিহার থেকে ; উল্টো দিকে বাঙলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ মিলিয়ে মাত্র ৬.৬%)। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হলো ১৯২৬-এ নাগপুরে কে বি হেডগেবর-এর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা। ইনি ছিলেন টিলক-এর প্রাক্তন অনুগামী মুঞ্জে-র সহযোগী।

পরিবর্তন-বিরোধী ও স্বরাজীরা তত্ত্বের দিক দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ হলেও, দুপক্ষই হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে রুখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন, বা এমনকি তার সংগঠন ও ভাবাদর্শ থেকে প্রায়শই নিজেদের পরিষ্কারভাবে আলাদা করতে পারেন নি। সেপ্টেম্বর ১৯২৪-এ কোহাট দাঙ্গার পর গান্ধী ২১ দিন অনশন করেন। এই সময়ে তিনি মহম্মদ আলী-র দিল্লীর বাড়িতে থাকেন ও নেতাদের ঐক্য সম্মেলনের মাধ্যমে টোরাটান কমানোর ব্যবস্থা করেন, যা ছিল খুবই সাময়িক। গরুর জীবনের জন্যে মানুষকে হত্যা করার বর্বর মূঢ়তাকে তিনি ধিক্কার জানান (*ইয়ং ইন্ডিয়া*, ২৯মে ১৯২৪) তাঁর সেই ধিক্কারবাণীর এখন বিরাট প্রাসঙ্গিকতা আছে। তাহলেও, যুক্ত প্রদেশে পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন-এর মতো পরিবর্তন-বিরোধীরা মালবীয়-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখতেন, আর গান্ধী নিজেও কখনো মালবীয়-র সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন নি। বেনারসের মতো বিভিন্ন জায়গায় স্বরাজ দল ও হিন্দু মহাসভা ছিল বলতে গেলে একই সংগঠন। মোতিলাল নেহরু-র সঙ্গে তাঁর তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ১৯২৫ থেকে মালবীয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকে প্রচণ্ড ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করেন। লাজপত রায়ের সাহায্যে তিনি সংগঠিত করেন একটি স্বা ধী ন ক ং গ্রে স দ ল, যেটি হিন্দু মহাসভার বাহ্যিক সংগঠনের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না, নির্বাচনী প্রস্তুতির জন্যে প্রায়ই হিন্দু সাম্প্রদায়িক একগুঁয়েমিকে প্রত্যক্ষ উৎসাহ দেওয়া হতো। যেমন, ১৯২৫-২৬-এ এলাহাবাদে মসজিদের-সামনে-গানবাজনার ব্যাপারে মুসলমানরা বারবার আপসের প্রস্তাব দিয়েছিলেন (মে ১৯২৬-এ এমন অনুরোধও করা হয়েছিল যে, সন্ধের নামাজের

সময়ে যেন মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিটের জন্যে গানবাজনা বন্ধ থাকে)। সে সব খারিজ করা হয়। ১৯২৬-এ বাঙলায় চিত্তরঞ্জন দাসের হিন্দু-মুসলমান চুক্তি বাতিল করে দেওয়া হলো, আর শাসমল, যিনি এই চুক্তি সমর্থনের চেষ্টা করেন, তাঁকে তাঁর সহ-কংগ্রেসিরা, 'হিন্দুধর্মের বিপদ' এই ধুয়ো তুলে পরের বছর মেদিনীপুরের একই নির্বাচনে হারিয়ে দেন। এমনকি মোতিলালও ১৯২৬-এর নির্বাচনের আগে মাঝেমাঝে সাম্প্রদায়িক আবেদনের পর্যায়ে নেমে এসেছিলেন। তিনি মুসলমান-ঘেঁষা ও গরুর মাংস খান—এই প্রচারের মোকাবিলার জন্যে মরিয়া হয়ে মোতিলাল কিছু হি ন্দু স ভা গোষ্ঠীকে দলে টানার ব্যর্থ চেষ্টা করেন।

১৯২৬-এর নির্বাচনে মাদ্রাজ বাদে আর সব জায়গায় স্বরাজীরা হিন্দু মহাসভা ও সংবেদী সহযোগিতার প্রবক্তাদের আঁতাতের কাছে হেরে যান। সাম্প্রদায়িক জোট যে আরও তীব্র হয়ে উঠছে তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, বাঙলায় স্বরাজীরা ৪৭টি হিন্দু আসনের মধ্যে ৩৫টিতে জেতেন, কিন্তু ৩৯টি মুসলমান আসনের মধ্যে মাত্র একটিতে। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো ১৯৩০-৩৪-এ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে পরের দফার লড়াই-এ মুসলমানদের পক্ষে এক অসাধারণ উদাসীনতা বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল ২০-র দশকের মাঝামাঝি সময়কার জ্বালাময় স্মৃতি। আসল জয় হলো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের। সবসময়ে এটা মনে রাখা হয় না যে, ব্রিটিশ শাসনকে জোরদার করার ক্ষেত্রে হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের অবদান মুসলিম লীগের চেয়ে কম লক্ষণীয় নয়—'হিন্দ-হিন্দী-হিন্দু'-র প্রতিমূর্তি মালবীয় যিনি ১৯২১-এ অসহযোগের তীব্র বিরোধিতা করেন, তাঁর থেকে শুরু করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অবধি (পরে জনসঙ্ঘ-র প্রতিষ্ঠাতা), যিনি বাঙলার মন্ত্রী ছিলেন অগাস্ট ১৯৪২-এ, যখন ব্রিটিশরা ভা র ত ছা ড়ো আন্দোলনকে রক্তে ডুবিয়ে দিচ্ছিল।

নতুন নতুন শক্তির উদ্ভব : ১৯২২-১৯২৭

গভীর নিরাশাগ্রস্ত মোতিলাল নেহরু ৩০ মার্চ ১৯২৭-এ ছেলেকে লিখেছিলেন : 'সংক্ষেপে বলতে গেলে, ভারতে কখনও এত খারাপ অবস্থা হয় নি। অসহযোগ আন্দোলনের যে-প্রতিক্রিয়া ১৯২২-২৩-এ শুরু হয় তা আস্তে আস্তে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সবরকমের জনকর্ম ক্ষুণ্ণ করে দিচ্ছে...জনসাধারণ শুধু একটাই শিক্ষা পাচ্ছে—তা হলো সাম্প্রদায়িক ঘৃণা' আর সরকারি আনুকূল্য পাওয়ার জন্যে কংগ্রেসিরা একে অপরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এসব সত্ত্বেও ১৯২৭-এর শেষ দিকটি চিহ্নিত হবে জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন অগ্রগামী আলোড়নের সূচনা হিসেবে। এখন এই নাটকীয় পশ্চাদ্‌গতির পেছনের কারণগুলি বিবেচনা করার সময় হয়েছে।

রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক টানাপোড়েন

ব্রিটিশ রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক প্রভুত্বের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের বেশির ভাগ অংশের মৌলিক বিষয়গত দ্বন্দ্ব ছিল : ফলে আপস ও যোগসাজসের দিকে নানারকমের টানকে খুব

বেশি দূরে নিয়ে যাওয়া ছিল অসম্ভব। যুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী অভ্যুত্থান শেষ হওয়ার পর ভারতে ব্রিটিশ নীতি হয়ে উঠেছিল আরও কঠোর। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে তার একাধিক স্পষ্ট লক্ষণ দেখে সবরকমের রাজনীতিকরাই আরও বেশি করে হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। অগাস্ট ১৯২২-এ লয়েড জর্জ তাঁর কুখ্যাত 'ইস্পাত কাঠামো' বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, 'যে-একটি প্রতিষ্ঠানকে আমরা তার কার্যকারিতা ও সুযোগসুবিধে থেকে বঞ্চিত করব না সেটি ভারতে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভিস'। এর গূঢ় অর্থ পরিষ্কার হয় ১৯২৪-এর রয়্যাল কমিশন ও ১৯২৬-এর ভারতীয় স্যান্ডহার্স্ট কমিটি থেকে, যেখানে ধরা হয় যে আই সি এস এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে ৫০% ভারতীয়করণ হবে যথাক্রমে ১৫ ও ২৫ বছর পরে (অর্থাৎ সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে ১৯৫২-র আগে নয়!) ১৯২০-র দশক ছিল সেই সময় যখন শ্বেতাঙ্গদের ডোমিনিয়নগুলো কার্যত অর্জন করছিল পূর্ণ স্বাধীনতা, আর এই প্রক্রিয়াটি শেষ হয় ১৯৩১-এর ওয়েস্টমিনিস্টার-এর আইনপত্রে (স্ট্যাটিউট)। সরকারি মুখপাত্ররা, যেমন ফেব্রুয়ারি ১৯২৪-এ ম্যালকম হেলি-র মতো হোম সদস্য, দ্রুত ব্যাখ্যা করেন যে, '(১৯১৯-এর) ভারত সরকার আইন-এর উদ্দেশ্য পূর্ণ ডোমিনিয়ন মর্যাদা নয়, বরং এক দায়িত্বশীল সরকার'। ১৯২৫-এর টোরি ভারত-সচিব বার্কেনহেড-এর ক্ষেত্রে লিটন বা কার্জন-এর সময় থেকে আপাতভাবে কিছুই পাল্টায় নি। ৭ জুলাই ১৯২৫-এ তিনি সংসদের উচ্চকক্ষ কাঁপিয়ে ঘোষণা করেন, (সংস্কার) তরান্বিত করার (স্বরাজীরা যা দাবি করেছিলেন) দ্বার মুক্ত করা মানে বিপদ ডেকে আনা নয়', ভারতের একক সত্তার কথা বলা অর্থহীন :

'এ ধরনের কোনো জাতি কদাপি ছিল না...আমরা যদি আগামীকাল ভারত থেকে চলে আসি তৎক্ষণাৎ তার পরিণাম হবে মুসলমান ও হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে চরম সংগ্রাম।'

নানারকম ছাড়ের একটি সংক্ষিপ্ত পর্বের পর (১৯২১-এর অর্থ কমিশন ও ১৯২৪-এর ইস্পাত সংরক্ষণ) ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে আর্থনীতিক দ্বন্দ্ব যে নিশ্চিতভাবেই তীব্র হয়ে উঠছিল—এই ঘটনাটি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষম্যমূলক সংরক্ষণ নীতির অর্থ ছিল আসলে প্রচুর টালবাহানা, যতদিন ভারতীয় শিল্পের বিভিন্ন অনুযোগ নিয়ে মাশুল বোর্ডগুলোর বিচার-বিবেচনা চলত। তারপর সরকারও মাঝে মাঝে উচ্চতর আমদানিশুল্কের সুপারিশ কার্যকর করত না—যেমন হয়েছিল ১৯২৭-এর বস্ত্র মাশুলবিধি বোর্ডের ক্ষেত্রে। পূর্ব-ভারতে পাটশিল্পে দৃঢ়মূল ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল বিড়লা গোষ্ঠী, আর বোম্বাই-এ ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদ ও লালজী নারায়ণজী-র সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন-এর উদ্যোগ লর্ড ইনচ্‌কেপ-পরিচালিত ব্রিটিশ নৌ-পরিবহণ স্বার্থের প্রচণ্ড ও নীতিবর্জিত বিরোধিতার মুখে পড়ে। ১৯২৬-এ হিল্টন-ইয়ং কমিশন-নির্ধারিত ১ শি. ৬ পে. টাকা-স্টার্লিং বিনিময়হারই ছিল সবার তরফে সবচেয়ে গুরুতর বুর্জোয়া অভিযোগের হেতু। ঐ বিনিময়-হারের বিরোধিতায় ভারতীয়রা ছিলেন একমত। তার সামনের সারিতে ছিলেন ১৯২১-এর প্রায় রাজভক্ত পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস। তাঁদের মত ছিল : টাকার অতিমূল্যের ফলে বিদেশী আমদানি শস্তা হবে ও ফলে জাতীয় সুতিবস্ত্রের ক্ষতি করে ঐ আমদানিকে উৎসাহ জোগাবে, কাঁচামাল রপ্তানির দাম বাড়াবে ও এইভাবে ভারতীয় কৃষিজীবীদের বাজার সম্ভবত কমে যাবে (এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে যে, ঠাকুরদাসের নিজের ব্যবসায়িক স্বার্থের বেশির ভাগই ছিল তুলো রপ্তানি)

আর পরিণামে মুদ্রা সঙ্কোচনমূলক ব্যবস্থা তৈরি হবে যাতে বিনিয়োগের সম্ভাবনা যাবে কমে। যেসব ব্রিটিশ বড়কর্তা ও ব্যবসাদার অবসর-ভাতা বা মুনাফা ভারত থেকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁদের কাছেও ১ শিলিং ৬ পেনি অনুপাতের পরিষ্কার মানে ছিল বোনাস। আরও বেশি ক্ষোভ হচ্ছিল এইসব ব্যাপারে, কারণ এই বছরগুলোয় ভারতীয় পুঁজিবাদ নিজেই শক্তি সঞ্চয় করছিল, আর জাতিব্যাপী মাত্রায় নিজেকে সংগঠিত করতে শুরু করেছিল। বিড়লা ৭ ডিসেম্বর ১৯২৩-এ ঠাকুরদাসকে লিখেছিলেন : 'অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার-এর [১৯২০-তে স্থাপিত ব্রিটিশ পুঁজিবাদীদের সর্বভারতীয় সংগঠন] কার্যকলাপের দিকে আমি গত কয়েক বছর খুব ভালোভাবে নজর রাখছি। আমার মনে হয় তাদের শক্তিশালী সংগঠন ভারতীয় স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড ক্ষতিকর হবে যদি-না আমরা এখুনি ভারতীয়দের জন্যে ঐ একই ধরনের একটা সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নিই' (*ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ৪২ [তিন])। বিড়লা ও ঠাকুরদাস মিলে ১৯২৭-এ স্থাপন করেন ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। যদিও টাটারা সরকারি আনুকূল্যের ওপর এত বেশি নির্ভরশীল ছিলেন যে তাঁদের পক্ষে এতে যোগ দেওয়া হয়ে উঠত না, আর বোম্বাই-এর মিলমালিকদের বেশির ভাগই নিজেদের সরিয়ে রাখেন, তৎসত্ত্বেও কয়েক বছরের মধ্যেই ভারতীয় বুর্জোয়াদের এক প্রমুখ অংশের শ্রেণীস্বার্থের স্বীকৃত মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায় এফ আই সি সি আই।

জনসাধারণের ক্ষেত্রে ১৯২০-র দশকে জীবনযাত্রার কোনো উন্নতি তো হয়ই নি, বোধহয় খানিকটা অবনতিই হয়েছিল। ১৯২১-এর আদমশুমারির পর ভারতের জনসংখ্যা-রেখা অতিদ্রুত ওপরের দিকে উঠে গেলেও, পাঞ্জাব ও খানিকটা মাদ্রাজ বাদ দিয়ে, আর সর্বত্রই কৃষি-উৎপাদন ক্ষমতা হয়ে ছিল স্থাণু। ১৯৩৮-৩৯-এর দামে সব রকম শস্যের একর পিছু গড় উৎপাদনশীলতা ১৯২০-২১ থেকে ১৯২৪-২৫-এর দামে যা ২৬.৫ টাকা হিসেবে ছিল, ১৯২৫-২৬—১৯২৯-৩০-এ তা নেমে এসেছিল ২৫.৭ টাকায় (অমিয় বাগচী, পৃ. ৯৫)। ১৯২০-র দশকই ছিল সেই দশক যখন ৩০ বছর রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত অনুযায়ী বোম্বাই ও মাদ্রাজের অনেক জায়গায় রাজস্ব সংশোধনের সময় এসে গিয়েছিল। সুতিবস্ত্র, পাট ও রেলপথের কর্মশালায় মজুরিহ্রাস ও পুনর্বিন্যাসের ভেতর দিয়ে নিয়োগকর্তাদের তরফ থেকে এক বড় আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণী। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে আবার নতুন করে ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানি প্রতিদ্বন্দ্বিতার মোকাবিলা করতে হচ্ছিল (থান কাপড়ের আমদানি ১৯২১-২২-এর ১০,৯০০ লক্ষ গজ থেকে বেড়ে গিয়ে ১৯,৭৩০ লক্ষ গজে এস দাঁড়ায়—বাগচী, পৃ. ২৩৮), আর এমনকি ১৯৩০-এর দশকের আগেই পাট রপ্তানি স্থাণু হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় ও ব্রিটিশ পুঁজিপতি—দুপক্ষই শ্রমিকদের ঘাড়ে ভার চালান করে দেওয়ার চেষ্টা করে ; ১৯২৬-এ বিভিন্ন রেলপথের কর্মশালা থেকে ৭৫,০০০ শ্রমিক ছাঁটাই-এর বিশাল পরিকল্পনা করেছিল একটি সরকারি কমিটি।

জনগোষ্ঠীর ও কৃষক আন্দোলন

অসহযোগ আন্দোলন মারফত নানা এলাকায় নিচুশ্রেণীর লেকড়ে যে-অভ্যুত্থান অজান্তে জেগে উঠেছিল, বারডোলিতে পিছু-হটার সঙ্গে সঙ্গেই তা দমে যায় নি। যেমন, মার্চ ১৯২২-এও যুক্ত

প্রদেশের বড়কর্তাদের দুশ্চিন্তায় ফেলছিল বরাবাঁকী-র 'একা' আন্দোলন, আর বাঙলার ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামে জুলাই-এর আগে পুরোপুরি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা যায় নি। কিন্তু জনগণের অব্যাহত জঙ্গীভাবের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর নিদর্শন পাওয়া যায় গোদাবরী-র উত্তরে চির-অস্থির অর্ধ-জনগোষ্ঠীর 'রাম্পা' অঞ্চল থেকে। অগাস্ট ১৯২২ থেকে মে ১৯২৪-এর মধ্যে এই অঞ্চলটি ছিল সত্যিই এক গেরিলা যুদ্ধক্ষেত্র, যার নেতৃত্বে ছিলেন আল্লুরি সীতারাম রাজু। বাস্তবিকই ইনি ছিলেন অসাধারণ এক মানুষ, যিনি অন্ধ্রে পরিণত হন লোকনায়কে কিন্তু অন্যত্র প্রায় অপরিচিত। অগাস্ট ১৯২৪-এর একটি সরকারি প্রতিবেদনে অভিযোগগুলি বিস্তারিতভাবে নথিবদ্ধ রয়েছে। তার সবই মূলত পুরনো : মহাজনদের শোষণ, আর ঝুমচাষ ও সনাতন চারণ-অধিকার খর্ব-করা বিভিন্ন অরণ্য-আইন। জনগোষ্ঠীর মানুষদের বেগার খাটিয়ে জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা তৈরির চেষ্টা করেছিল সাধারণের অপ্রিয় জনৈক তহশীলদার, গুডেম-এর বাস্তিয়ান। এই ছিল অব্যবহিত কারণ। কিন্তু এবারে কোনো স্থানীয় প্রধানের কাছ থেকে নেতৃত্ব আসে নি, এসেছিল একজন বহিরাগতের কাছ থেকে, যিনি জ্যোতিষ ও নিরাময়ের ক্ষমতা দাবি করে ১৯১৫ থেকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষদের মধ্যে ঘুরে বেড়াতেন। অসহযোগের মারফত তিনি গ্রামে পঞ্চায়েত চালু করা ও মাদক-বিরোধী অভিযানে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। হব্‌স্‌বম যাকে 'আদিম বিদ্রোহ' আখ্যা দেবেন, তার উপাদানের সঙ্গে এই আন্দোলনে চমৎকার এক পদ্ধতিতে যুক্ত হয়েছিল আধুনিক জাতীয়তাবাদ। রাজু নাকি দাবি করেন যে, তিনি বুলেট-অভেদ্য, আর বিদ্রোহীদের একটি ঘোষণাপত্রে জানানো হয় : কল্কি অবতারের আবির্ভাব আসন্ন। এসব সত্ত্বেও বিদ্রোহ চলাকালীন স্থানীয় কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় সীতারাম রাজু 'গান্ধীর উচ্চ প্রশংসা করেন, কিন্তু তাঁর মতে 'হিংসার প্রয়োজন আছে'। দুঃখপ্রকাশ করে তিনি বলেন, 'ইওরোপীয়দের তিনি গুলি করতে পারছেন না, কারণ ভারতীয়রা সবসময় তাঁদের সঙ্গে থাকে ও ঘিরে রাখে। আর ভারতীয়দের তিনি মারতে চান না'। ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯২২-এ ডামারাপল্লী-তে অতর্কিত আক্রমণের সময়ে বিদ্রোহীরা সত্যিই ভারতীয়দের একটি অগ্রবাহিনীকে চলে যেতে দেয়, তারপর দুজন ব্রিটিশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে গুলি করে মারে। একজন দুর্ধর্ষ গেরিলা রণনীতিবিদ্ হিসেবে রাজু ব্রিটিশদের অনিচ্ছুক প্রশংসাও অর্জন করেন। থানায় থানায় আক্রমণ চালিয়ে তিনি তাঁর সহগামীদের সশস্ত্র করে তোলেন। তাঁর প্রায় একশ জনের বিদ্রোহীর দল যেন জলের মধ্যে মাছের মতো বলে ছিলেন মনে হয়। প্রায় ২৫০০ বর্গমাইলেরও বেশি এলাকা জুড়ে তাঁরা পাহাড়ি জনসাধারণের অধিকাংশেরই সহানুভূতি অর্জন করেন। মালাবার বিশেষ পুলিশবাহিনী ও আসাম রাইফেলস-এর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করতে মাদ্রাজ সরকারের খরচ হয় ১৫ লাখ টাকা। ৬ মে ১৯২৪-এ রাজু ধরা পড়েন। সঙ্গে সঙ্গেই [সরকারি খবরে] জানানো হয় যে, পালানোর চেষ্টা করার সময়ে তাঁকে গুলি করা হয়েছে...অস্বস্তিকর রকমের চেনা বুলি—আর শেষ পর্যন্ত প্রতিরোধ নির্মূল করা হয় ১৯২৪-এ।

পুরো ১৯২০-এর দশক জুড়ে রাজস্থান ছিল সামন্ত-বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র। মোতিলাল তেজাওয়াত-অনুপ্রাণিত ভিল আন্দোলনকে দমন করার উদ্দেশ্যে মে ১৯২২-এ মেবার পুলিশ দুটি পুরো গ্রাম পুড়িয়ে দেয়। আর ১৯২৭ থেকে বিজোলিয়া আবার চলে এসেছিল সামনের সারিতে। এখানে নতুন নতুন আবওয়াব ও বেগারের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্যে বিজয়সিং

পথিক, মানিকলাল বর্মা ও হরিভাউ উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৃষকরা সত্যাগ্রহের পথ বরণ করেন। যে ১৯২৫-এ আলওয়ার রাজ্যের নিমুচানা-য় কৃষকদের দস্তুরমতো গণহত্যা করা হয়। তাঁরা ৫০% ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছিলেন। রাজ্য পুলিশ ১৫৬ জনকে নিহত ও ৬০০ জনকে আহত করে। বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের কোনো আন্দোলনের সঙ্গেই কংগ্রেস কিন্তু নিজেকে দলগতভাবে জড়াতে রাজি হয়নি (অনেক পরে, হরিপুরা-য় ১৯৩৮-এর পর এই নীতি বদলানো হয়), যদিও এইসব রাজ্যে জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণাসহ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্র জা-প রি ষ দ-গুলি দেখা দিতে শুরু করেছিল (তার প্রথমটি হয় বরোদা-য় ১৯১৭-য় ও তারপর ১৯২১-এ কাঠিয়াবাড় অঞ্চলে আর-একটি ; দু'ক্ষেত্রেই গুজরাটের কাছাকাছি থাকাটা ছিল গুরুত্বের)। ১৯২৩ থেকে শুরু করে প্রতিবছর একটি (দেশীয়) রাজ্য প্রজা (পরে নাম পাল্টে হয় পিপল্স্, 'জনগণের') সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, যদিও তখনও অবধি এটি ছিল খুবই মামুলি ব্যাপার। মেবারের মতো দেশীয় রাজ্যে নিঃসন্দেহে শহুরে জাতীয়তাবাদের আগে দেখা দিয়েছিল চাষীদের র‍্যাডিক্যাল ক্রিয়াকলাপ।

চাষীদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া দ্ব্যর্থহীনভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে কংগ্রেস বারে বারে ব্যর্থ হয়। মোহমুক্ত হয়ে ২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে কিছু কৃষককর্মী নতুন নতুন ভাবাদর্শের সন্ধান শুরু করেন। ১৯২২-এ স্বামী বিদ্যানন্দ জমিদারি বিলোপের দাবি তোলেন, আর নভেম্বর ১৯২৫-এ বাবা রামচন্দ্র 'কৃষকদের প্রিয় নেতা' হিসেবে নাম করেন লেনিন-এর : 'রাশিয়ার ছাড়া কৃষকরা এখনও দাসই হয়ে আছে' (*প্রতাপ,* ২৩ নভেম্বর ১৯২৫, মজিদ সিদ্দিকি-র *অ্যাগ্রারিয়ান আনরেস্ট ইন নর্থ ইন্ডিয়া,* পৃ. ১৯৫-এ উদ্ধৃত)। জমির খাজনা কমানোর জন্যে কৃষকদের দাবি, আর বাঙলা, বিহার ও যুক্ত প্রদেশে ফসলের ন্যায্যতর ভাগ পাওয়া নিয়ে ভাগচাষীদের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে কংগ্রেসিরা—স্বরাজী বা পরিবর্তন-বিরোধী যা-ই হোন—সাধারণত ছিলেন নির্বিকার, কারণ জমিনদারি বা মধ্যস্বত্বের সঙ্গে তাঁদের গভীর যোগাযোগ ছিল। ১৯২০-র দশকে যেখানে ভাগচাষ (বর্গা) দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল সেই বাঙলায় ব্যাপারটি ছিল সবচেয়ে পরিষ্কার ও পরিণামে সবচেয়ে সর্বনাশা। এখানে বর্গাদারদের রায়তি স্বত্ব দেওয়ার যে-কোনো প্রস্তাবেরই তীব্র বিরোধিতা করেন স্বরাজীরা। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ময়মনসিংহ, ঢাকা, পাবনা, খুলনা ও নদীয়ার মতো বিভিন্ন জেলায় নমশূদ্র ও মুসলমান বর্গাদারদের আন্দোলনে তাঁরা কোনো সহানুভূতি দেখান নি। যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস অবশ্য কৃষকদের প্রতি আরও খানিক অনুকূল ভাব দেখিয়েছিল। ১৯২৪-এ তারা একটি যুক্ত প্রদেশ কিসান সঙ্ঘ-ও শুরু করে। ঐ সময়ে আগ্রা প্রদেশে যে প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল-এর আলোচনা হচ্ছিল, তার জমিনদার-পক্ষীয় কিছু ধারা পাল্টানোর জন্যে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। যা-ই হোক, এটা কিন্তু পরিষ্কার করে বলা হয়েছিল যে, 'সঙ্ঘের নীতি জমিনদারদের বিরুদ্ধে এমন একটি কথাও না-বলা যাতে তাঁরা বিরূপ হন, বরং জমিনদাররা যে-সরকারের হাতে অন্ধের মতো খেলছেন, সেই সরকারকে আক্রমণ করাই তার লক্ষ্য'। (এ আই সি সি, এফ এন ২৩/১৯২৪)।

কৃষকদের মাত্র একটি অভিযোগ সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব ছিল সাধারণত দ্ব্যর্থহীন : বিভিন্ন রায়তওয়ারি অঞ্চলে রাজস্ববৃদ্ধি। ১৯২৩-২৪-এ সমৃদ্ধিশালী মিরাসদারদের রাজ্য

তাঞ্জোরে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিরোধ খানিকটা সফল হয়। উপকূলবর্তী অন্ধ্রে এন জি রঙ্গ আরও সম্পন্ন কৃষকদের স্তরে সংগঠন শুরু করেন ১৯২৩-এ, আর ঐ বছর গুন্টুরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন প্রথম রা য় ত স মি তি। কৃষ্ণ-গোদাবরী ব-দ্বীপ অঞ্চলে ১৯২৭-এ ১৮$\frac{3}{4}$% রাজস্ব বৃদ্ধির ব্রিটিশ প্রচেষ্টার ফলে উপকূলবর্তী অন্ধ্রে দেখা দেয় শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন। পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী-তে এই আন্দোলনের ভার নেন যথাক্রমে বেন্নেতি সত্যনারায়ণ ও ডান্তু নারায়ণ রাজু-র মতো স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবর্গ, আর সেই সঙ্গে টি প্রকাশম্ ও কোন্ডা বেঙ্কটপ্পয়্যার মতো আরও সুপরিচিত জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিরা। ১৯২৮-এর পর থেকে এই অঞ্চলের সব আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা জোগাবে বল্লভভাই প্যাটেল-এর নেতৃত্বে বারডোলি।

জাত-ভিত্তিক আন্দোলন

আগের বিভিন্ন পর্বের মতোই ভারতীয় সমাজের নানা বিচিত্র দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেত প্রায়শই নানারকম জাত-ভিত্তিক সমিতি ও আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। সেগুলো ছিল বিভেদমূলক ও মূলত রক্ষণশীল, কিন্তু সময়বিশেষে যথেষ্ট র‍্যাডিকাল সম্ভাবনাময়ও বটে। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ-বিরোধী জাস্টিস দল ছিল খোলাখুলিই রাজভক্ত। ব্রিটিশ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, তাঁরা ঐ প্রদেশে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থাকে সফল করে তুলেছিলেন। রাজকর্মচারী ও নির্বাচিত মন্ত্রীদের মধ্যে মসৃণ সহযোগিতার আর একমাত্র অন্য উদাহরণটি পাওয়া যাবে পাঞ্জাবে। এখানে মুখ্যত শহুরে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ফজল-এ-হুসেন-এর ইউনিয়নিস্ট পার্টি একটি শক্তিশালী 'কৃষিজীবী' (অর্থাৎ ভূস্বামী ও ধনী কৃষক) প্রভাবগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পেরেছিলেন, যার মধ্যে ছিলেন জাঠ ও সেইসঙ্গে মুসলমানরাও। মহারাষ্ট্রে একইরকম রাজভক্তের ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করেছিল ভাস্কররাও যাদবের অব্রাহ্মণ দল ; তাঁরা ছিলেন প্রচণ্ড কংগ্রেস-বিদ্বেষী। কংগ্রেসকে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য উচ্চাকাঙ্ক্ষার মুখোশ বলে ফরিয়াদ করতেন—এই অভিযোগটিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে টিলকপন্থী ভাবাদর্শের কয়েকটি দিক।

তা সত্ত্বেও, জাস্টিস দল ও অব্রাহ্মণ নেতারা (যেমন যাদব) কার্যত বিপরীত-শিরোমণিদের জন্য চাকরি সংরক্ষণ ও প্রধানত উচ্চবর্ণের সংস্কৃতায়ণের অনুকরণের জন্যে নিজেদের আগ্রহী হিসেবে হাজির করলেও, অন্যান্য আরও র‍্যাডিকাল ও আরও প্রকৃতই অনভিজাত মানুষদের আন্দোলনও ১৯২০-র শেষ দশকে উঠে আসছিল।

মে ১৯২৫-এ বিহার সরকারের একটি প্রতিবেদনে জানানো হয় যে, পাটনা, মুঙ্গের, দ্বারভাঙা ও মজফ্‌ফরপুর জেলার গোয়ালা বা যাদবরা 'তাদের জাতের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়নের জন্যে বিক্ষোভ করছে। তারা পৈতে নিচ্ছে, আর, সেইসঙ্গে ভূস্বামীদের জন্যে এতদিন পর্যন্ত যেসব হীন কাজ ও অন্যান্য সেবা করত তা করতে গররাজি হওয়ার প্রস্তাব করছে।' এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে যে, এর পরের দশকের বিহার ও সত্যিই সারা ভারতের বিশিষ্টতম কিসান নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ১৯২০-র দশকে কাজ শুরু করেন একটি ভূ মি হা র ব্রা হ্ম ণ স ভা-র সংগঠক হিসেবে ; পাটনা জেলার বিহ্‌টা-য় তিনি একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

মহারাষ্ট্রে সত্যশোধক আন্দোলনের ভেতরের কয়েকটি উপাদানের র‍্যাডিকাল সম্ভাবনার

কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯১৯-২১-এ সাতারা জেলায় একটি জমিদার ও মহাজন-বিরোধী উত্থানে নেতৃত্ব দেন গ্রামীণ সত্যশোধক বিক্ষোভকারীরা। এই বিক্ষোভে জড়িয়ে পড়ে ৩০টি গ্রাম, কিছু রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষও হয়। আর ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে পুণা থেকে কেশবরাও জেধে ও দিনকররাও জাবলকর এক নতুন ধরনের অব্রাহ্মণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে শুরু করেন। ব্রাহ্মণ-প্রধান টিলকপন্থী কংগ্রেসের মতোই এটি ছিল সমান ব্রিটিশ-বিরোধী। পরের দশকেই কিন্তু মহারাষ্ট্র কংগ্রেস এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে ও শেষ পর্যন্ত এই ধারাটিকে আত্মসাৎ করে নেবে। ১৯৪২ নাগাদ সাতারা-কে তাঁরা বোম্বাই-এ জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গে পরিণত করবেন।

কিন্তু মারাঠা জমি-মালিক কৃষকদের দলে টানা গেলেও, ১৯২০-র দশক থেকে অস্পৃশ্য মাহাররা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন ড. আম্বেডকরের নেতৃত্বে (তিনি ছিলেন তাঁদের প্রথম স্নাতক)। তাঁদের দাবির মধ্যে ছিল পৃথক প্রতিনিধিত্ব, পুকুর ব্যবহার ও মন্দিরে ঢোকার অধিকার, আর 'মাহারওয়াতন' (গ্রামের মোড়লদের জন্যে প্রথাগত বিভিন্ন সেবাকর্ম)-এর বিলোপ। ১৯২৭ নাগাদ, অর্থাৎ প্রথম মাহার রাজনৈতিক সম্মিলনের সময়েই হিন্দুধর্মের সঙ্গে প্রচণ্ডতর বিচ্ছেদের প্রতীক হিসেবে *মনুস্মৃতি* পোড়াতে শুরু করেন আম্বেডকরের কিছু অনুগামী।

তামিলনাড়ুর কংগ্রেস নেতৃত্ব মহারাষ্ট্রের চেয়ে কম নমনীয় বলে প্রমাণ হয়। এখানে 'পেরিয়ার' ই ভি রামস্বামী নায়কর অসহযোগে সক্রিয় ছিলেন। জাস্টিস দলের শিরোমণিতন্ত্রের একটি জনমুখী ও র‍্যাডিকাল বিকল্প গড়তে ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ঝরঝরে তামিলে লেখা তাঁর পত্রিকা *কুডি অরাসু* (১৯২৪) ও পরের বছর তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আত্মমর্যাদা' আন্দোলন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ছাড়াই বিয়ে থেকে শুরু করে মন্দিরে জবরদস্তি প্রবেশ, *মনুস্মৃতি* পোড়ানো ও কখনও কখনও পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদ পর্যন্ত এগোয়।

কেরলেও মৃদু ধরনের বায়কোম সত্যাগ্রহ এজাভা নেতা শ্রীনারায়ণ গুরুকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। তিনি চাইছিলেন সত্যাগ্রহীরা যেন 'বাধা টপকে যায়' আর শুধু নিষিদ্ধ রাস্তা দিয়ে চলাচলই নয়, সব মন্দিরেও ঢোকে। এস এন ডি পি যোগম্-এ টি কে মাধবনের সংস্কৃতায়নপন্থী ও গান্ধীবাদী নেতৃত্বকে (১৯২৭-এ তিনি এর সচিব হন) আক্রমণ করেন কে আয়্যাপ্পন ও সি কেশবনের মতো র‍্যাডিকাল এজাভারা। তাঁরা মন্দির-প্রবেশকে ক্রমেই আরও বেশি করে নগণ্য বিষয় হিসেবে গণ্য করতে থাকেন ও সোচ্চার নিরীশ্বরবাদীতে পরিণত হন।

এও কৌতূহলের যে, এই সবক'টি অঞ্চলে বামপন্থী ধারার উন্মেষে সাহায্য করেছিল কিছু নিচুজাতের আন্দোলন। সহজানন্দ কংগ্রেস সমাজবাদীদের সঙ্গে যোগ দেন, তারপরে কমিউনিস্টদের সঙ্গে। আর, নানা পাটিল, যিনি সাতারায় ১৯১৯-২১-এ সত্যশোধক আন্দোলনে ছিলেন, তিনি সেখানে ১৯৪২-এর পাল্টা সরকারের প্রধান হন ও পরে গণ্য হন মহারাষ্ট্রের সবচেয়ে পরিচিত কমিউনিস্ট কৃষকনেতা রূপে। সিঙ্গারাভেলু ও পি জীবানন্দনের মতো গোড়ার দিকের তামিল কমিউনিস্টরা ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায় 'পেরিয়ার'দের সঙ্গে কিছুকাল সহযোগিতা করেন, আর আয়্যাপ্পন ও কেশবন কেরলে এজাভাদের অনেককে কমিউনিস্ট পার্টিতে যাওয়ার পথে চালিত করেন, যদিও নিজেরা কোনোদিন পার্টিতে যোগ দেন নি।

শ্রমিক

শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে, ১৯২২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত বছরগুলিতে প্রথম দৃষ্টিতে সুস্পষ্ট অবনতি লক্ষ্য করা যায়। রয়্যাল কমিশন অফ লেবর (১৯৩১)-এর হিসেব অনুযায়ী ধর্মঘটের সংখ্যা নেমে আসে: ১৯২১-এর সর্বাধিক ৩৭৬ থেকে ১৯২৪ ও ১৯২৭-এর মধ্যে বছরে ১৩০-এ। জানুয়ারি ১৯২৫-এর তালিকায় এ আই টি ইউ সি-র অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়ন ছিল ১৮৩টি। তার সদস্য-সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। তাহলেও নেতৃত্ব ছিল খুবই নরমপন্থী, রাজনৈতিক মেজাজে উদারপন্থী, না হলে কংগ্রেসি। তার অধিবেশনগুলিতেও ১৯২১-এর ঝরিয়া সম্মিলনের মতো তেজস্বিতার ও সাধারণ সদস্যদের যোগদানের অভাব দেখা যায়। কিন্তু ধর্মঘটের সংখ্যা কম হলেও, এইসব বছরে মালিকপক্ষের তরফ থেকে গুরুতর আক্রমণের মুখোমুখি হয়ে সেগুলির আরও দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র হওয়ার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। ১৯২১-এ নষ্ট-হওয়া শ্রম-দিবসের সংখ্যা ছিল ৭০ লাখ, ১৯২৪ থেকে শুরু করে প্রতিবছর এই সংখ্যা আরও বেড়ে যায়। ১৯২৭ ছিল নিঃসন্দেহে এক নতুন শ্রমিক অভ্যুত্থানের সূচনা। এই বছরে নষ্ট-হওয়া শ্রমদিবসের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০২ লাখ, আর কিছু কিছু কেন্দ্রে অনেক বেশি র‍্যাডিকাল ও ক্রমবর্ধমান কমিউনিস্ট নেতৃত্ব উঠে আসে। ১৯২৬-এ ট্রেড ইউনিয়নগুলি সর্বপ্রথম কিছু আইনি নিরাপত্তা পায় এমন একটি আইনের মাধ্যমে অন্যথায় যেটি ছিল যথেষ্ট পরিমাণে শ্রমিক স্বার্থ-বিরোধী—অ-নথিবদ্ধ ইউনিয়নগুলির তহবিল সংগ্রহ কার্যত বেআইনি করে দেওয়া হয়, ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের মধ্যে 'বহিরাগত'র উপস্থিতির ঊর্ধ্বসীমা ৫০%-এ বেঁধে দেওয়া হয়, আর পৌর ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন তহবিল ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয় (এটি ব্রিটিশ প্রথার একেবারে বিপরীত, ব্রিটেনে লেবর পার্টির বড় আর্থিক সহায় ট্রেড ইউনিয়নগুলি)।

অসহযোগের শেষ দিনগুলিতে দর্শনানন্দ ও বিশ্বানন্দ পূর্ব-ভারতীয় রেলপথে একটি শক্তিশালী ধর্মঘট পরিচালনা করেন। এটি চলে ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল ১৯২২ অবধি। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, এই আন্দোলনের সম্ভাব্য ক্ষমতাকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্যে কাজে লাগানোর কথা কোনো কংগ্রেস নেতাই ভাবেননি। ১৯২০-র ধর্মঘটের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ হালদারের মতো বাঙলা কংগ্রেসের নেতাদের প্রতিষ্ঠিত জামশেদপুর শ্রমিক সমিতি (জে এল এ) কোনো প্রেরণাদায়ী শক্তি ছিল না, বরং ছিল রাশ টানার শক্তি। সাম্প্রতিক একটি বিশদ পর্যালোচনায় দেখানো হয়েছে যে, সেপ্টেম্বর ১৯২২-এ টাটা-য় ধর্মঘট হয়েছিল প্রায় পুরোপুরিই শ্রমিকশ্রেণীর স্বতঃস্ফূর্ত চাপের ফলে। শ্রমিকদের অন্যান্য দাবিকে অল্পবিস্তর অবহেলা করে ইউনিয়ন ধর্মঘটটিকে নিজের স্বীকৃতি আদায়ের কাজে লাগানোর চেষ্টা করে। কংগ্রেসের সঙ্গে জে এল এ-র খুব ভালো যোগাযোগের সুবাদে টাটা-কে চাপ দিয়ে তারা একটি সালিশি বোর্ড বসাতে সমর্থ হয়। এই বোর্ডের প্রধান ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস ও সি এফ অ্যান্ড্রুজ। ১৯২৪-এ ব্যবস্থাপক সভায় ইস্পাত সংরক্ষণ নিয়ে তখন আলোচনা চলছিল, তাতে স্বরাজীদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। শেষ পর্যন্ত সি এফ অ্যান্ড্রুজ ইউনিয়নের সভাপতি হওয়ার পর অগাস্ট ১৯২৫-এ এটি স্বীকৃতি পায়। গান্ধীর জামশেদপুর পরিদর্শনের সময় কর্তৃপক্ষ তাঁকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জানায়। তার প্রত্যুত্তরে একটি বক্তৃতায় তিনি পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে সুসম্পর্ক রাখার প্রয়োজনের ওপর জোর দেন। কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় ইউনিয়নের চাঁদা শ্রমিকদের

মজুরি থেকে সরাসরি কেটে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। আর এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, ১৯২৮ নাগাদ সি এফ অ্যান্ডরুজ-এর পরিচালনাধীন জে এল এ-কে শ্রমিকরা 'কম্পানির ইউনিয়ন' বলতে শুরু করেন। আহ্‌মেদাবাদ-এ ২০% মজুরি কমানোর প্রতিবাদে এপ্রিল ১৯২৩-এ এক বিশাল ধর্মঘট হয়। তার ফলে ৬৪টি কাপড়ের কলের মধ্যে ৫৬টি বন্ধ হয়ে যায়। এটি হয়েছিল এমন সময়ে যখন গান্ধী ছিলেন জেলে। বোধহয় তার তাৎপর্য আছে—কারণ ১৯২৫-এ তিনি আহ্‌মেদাবাদ শ্রমিকদের অনুরোধ করেছিলেন, তাঁরা যেন বাণিজ্যিক মন্দার পর্বে নিয়োগকর্তাদের লজ্জায় না ফেলেন : 'বিশ্বস্ত ভৃত্যরা বিনা পারিশ্রমিকেও তাদের প্রভুর সেবা করে।'

এসব সত্ত্বেও, শ্রমিক আন্দোলনের রাশ টানার চেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন যে ফেটে পড়তে চাইছিল তার লক্ষণ বারেবারে দেখা গেছে। আগের মতোই মাদ্রাজ শহর ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এখানে বাকিংহাম কর্নাটিক মিলস্‌-এ ১৯২২-২৩-এ আরও চারটি ধর্মঘট হয়। মাদ্রাজ সমুদ্রতীরেই সিঙ্গারাভেলু-সংগঠিত একটি জমায়েতে প্রথম উদ্‌যাপিত হয় মে দিবস। জনৈক ইউনিয়ন-নেতাকে ছাঁটাই-এর ফলে এপ্রিল থেকে জুন ১৯২৫-এ উত্তর-পশ্চিম রেলপথে লেগে যায় এক বিশাল ধর্মঘট। সেটি স্মরণীয় হয়েছিল লাহোরের এক মিছিলে, শ্রমিকদের নিজ রক্তে রাঙানো একটি লাল পতাকা সেখানে বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। যা-ই হোক, এর মধ্যে সবচেয়ে বড় ধর্মঘট হয় বোম্বাই-এর কাপড়ের কলগুলোয়, জানুয়ারি-মার্চ ১৯২৪-এ ও আবার সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯২৫-এ। ১৯২৪-এ ১৫০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘট হয় বোনাস না-দেওয়ার প্রতিবাদে (আগের চার বছর ধরে যা দেওয়া হয়েছিল)। সরকার একটি তদন্ত কমিটি বসানোর পর (যেটি বোনাসকে এক ধরনের বিলম্বিত মজুরি হিসেবে না-দেখে লাভের সঙ্গে জুড়ে দেয় ও পরিণামে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে যায়) বাপটিস্টা ও এন এম জোশী শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের পরামর্শ দেন, কিন্তু জাতীয় আন্দোলনের থেকে অল্প বা কোনো সাহায্য না-পেয়েও, পুলিশি অত্যাচার ও গুলির মোকাবিলা করে তাঁরা দু'মাস ধর্মঘট চালিয়ে যান, যতক্ষণ-না অনাহার তাদের হারিয়ে দেয়। পরের বছর বস্ত্রশিল্পে তথাকথিত সঙ্কটের সুবাদে ১১.৫% মজুরি কমানোর ফলে দ্বিতীয় বিশাল ধর্মঘট হয় সেপ্টেম্বরে। বোম্বাই-এর মিলমালিকরা যুক্তি দেন, এই হ্রাস প্রত্যাহার করা যাবে না, যদি-না সরকার ৩½% অন্তঃশুল্ক তুলে নিয়ে তাঁদের শিল্পকে ছাড় দেয়। ১৮৯৪-এ ল্যাঙ্কাশায়ারকে সাহায্য করার জন্যে এই শুল্ক চাপানো হয়, সেই থেকে এটি ছিল জাতীয়তাবাদী ও বুর্জোয়াদের বাঁধা অভিযোগ। ধর্মঘট ভেঙে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তাই ১ ডিসেম্বর ১৯২৫-এ সরকার সুতির অন্তঃশুল্ক রদ করে আর মিলমালিকরা মজুরি-হ্রাস প্রত্যাহার করে নেয়। ৩০ বছরের পুরোনো একটি কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী দাবিকে বোম্বাই-এর সর্বহারারা দেশের হয়ে জিতে নেন—অনেক পরেও, সেপ্টেম্বর ১৯২৫-এ শুল্কটি রদ করার জন্যে স্বরাজীদের প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হলেও বড়লাট তৎক্ষণাৎ (তার বিরুদ্ধে) ভেটো প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সর্বহারাদের এই সাফল্য বড় একটা মনে রাখা হয়নি। এমনকি ১৯২৮-এর বিরাট ধর্মঘটের আগেই বোম্বাই-এর বস্ত্রশিল্পে শ্রমিকদের জঙ্গীভাব ও সংগঠন কলকাতার ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত পাটকলের চেয়ে মজুরি বেশ খানিকটা বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল—১৯১৯-এ গড় মাসিক মজুরি বোম্বাই ও কলকাতায় ছিল যথাক্রমে ২৪.৭৫ টাকা ও ১৬.৪০ টাকা। ১৯২৭-এ এসে সেটি দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩৪.৫৬ টাকা ও ১৯.৬০ টাকায়

(বাগচী, পৃ. ১২৬)। স্বীকৃত বোম্বাই সুতিবস্ত্র শ্রমিক ইউনিয়ন (১৯২৬-এ নথিভুক্ত, নতুন আইনের অধীনে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে এটিই ছিল প্রথম ইউনিয়ন) উদারপন্থী মানবপ্রেমী এন এম জোশীর পরিচালনাধীন হলেও, গিরণী কামগার মহামণ্ডল-এর মাধ্যমে বোম্বাই-তে ১৯২৩ থেকে শুরু হয়েছিল এক ধরনের স্বতন্ত্র মাটিঘেঁষা আন্দোলন। তার নেতৃত্বে ছিলেন দুজন জঙ্গী নেতা, এ এ আলবে ও জি আর কাসলে। তাঁরা নিজেরাই তখন বা আগে ছিলেন মিলশ্রমিক। এই ধারাটি গ্রহণ করেছিলেন কমিউনিস্টরা, আর ১৯২৮-এ এটিকে রূপান্তরিত করেছিলেন বিখ্যাত গিরণী কামগার (লাল বাওয়টা) ইউনিয়নে।

কমিউনিস্টদের উদ্ভব

ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও পরবর্তীকালের কিছু পণ্ডিত বারবার অভিযোগ করেছেন, পুরো আন্দোলনটি মস্কো থেকে সংগঠিত একটি বিদেশী চক্রান্তের বেশি কিছু ছিল না। তাহলেও, আমরা আগেই দেখেছি, ভারতীয় কমিউনিজমের মূল আন্দোলন উঠে এসেছিল জাতীয় আন্দোলনের ভেতর থেকেই, যখন মোহমুক্ত বিপ্লবী, অসহযোগী, খিলাফতি এবং শ্রমিক ও কৃষককর্মীরা রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির জন্য নতুন নতুন পথের সন্ধান করছিলেন। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন যুগান্তর দলের বিখ্যাত বিপ্লবী নরেন ভট্টাচার্য (নামান্তরে মানবেন্দ্রনাথ রায়)। ১৯১৯-এ তিনি মেক্সিকোয় বলশেভিক মিখাইল বোরোদিন-এর সংস্পর্শে আসেন ও সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। ১৯২০-র গ্রীষ্মে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্যে তিনি যান রাশিয়ায়। সেখানে লেনিন-এর সঙ্গে ঔপনিবেশিক জগতে কমিউনিস্টদের রণকৌশল সংক্রান্ত একটি বিখ্যাত ও তাৎপর্যপূর্ণ বিতর্কে অবতীর্ণ হন তিনি। লেনিন জোর দেন উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশে প্রধানত বুর্জোয়া-পরিচালিত জাতীয় আন্দোলনকে বিস্তৃতভাবে সমর্থনের প্রয়োজনীয়তার ওপরে। নবদীক্ষিতের উৎসাহ ও সঙ্কীর্ণতাবাদ নিয়ে মানবেন্দ্রনাথ যুক্তি দেন যে, গান্ধীর মতো বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী নেতাদের সম্পর্কে ভারতীয় জনগণ ইতিমধ্যেই মোহমুক্ত হয়ে গেছেন, আর 'বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী' আন্দোলন-নিরপেক্ষভাবে এগিয়ে চলেছেন বিপ্লবের দিকে।' 'জাতীয় বুর্জোয়া' ও সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী মূলধারা সম্পর্কে এই মনোভাব ভারতে ও অন্যত্র স্বাধীনতা পাওয়া অবধি ও এমনকি তার পরেও কমিউনিস্ট বিতর্কের মৌল বিষয় থেকে যাবে।

অক্টোবর ১৯২০-তে মানবেন্দ্রনাথ, অবনী মুখোপাধ্যায় (আর-একজন প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী, পরে কমিউনিস্ট, মানবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁর প্রচণ্ড ঝগড়া হয়) এবং কিছু মুহাজির (খিলাফতে উৎসাহী, যাঁরা ১৯২০-এ 'হিজরতে' যোগ দেন, ও আফগানিস্তান পেরিয়ে সোভিয়েত এলাকায় ঢোকেন), যেমন মহম্মদ আলী ও মহম্মদ সফিক তাশখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও সেইসঙ্গে একটি রাজনৈতিক-তথা-সামরিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২১-এর গোড়ার দিকে যখন আফগানিস্তান দিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশের আশা মিলিয়ে যায়, তখন কিছু সদ্য দলভুক্ত ভারতীয় মস্কোয় প্রাচ্যের শ্রমিকদের জন্যে কমিউনিস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯২২-এ মানবেন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর সদর দফতর সরিয়ে নিয়ে আসেন বার্লিনে, সেখানে তিনি *ভ্যানগার্ড অফ্ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স* নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বার করতে শুরু

করেন, আর সেইসঙ্গে প্রকাশ করেন (অবনী মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায়) *ইন্ডিয়া ইন ট্র্যানজিশন*। এটি ছিল ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজ সম্পর্কে মার্কসবাদী বিশ্লেষণের অগ্রণী প্রয়াস। এই সময়ে অন্যান্য বিদেশবাসী ভারতীয় গোষ্ঠীগুলিও মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকছিল। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বরকাতুল্লা-র নেতৃত্বে পুরনো বার্লিন গোষ্ঠী। ১৯২১-এ সোভিয়েত সমর্থন পাওয়ার জন্যে এঁদের প্রয়াসকে মানবেন্দ্রনাথ বাধা দেন মূলত উপদলীয় অভিসন্ধি থেকে, কিন্তু পরের বছর তাঁরা বার্লিনে একটি ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স পার্টির পত্তন করেন। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি রত্তন সিং, সন্তোখ সিং ও তেজা সিং স্বতন্ত্র-র নেতৃত্বে, নির্বাসিত গদর আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশও কমিউনিস্ট হয়ে যান।

বোম্বাই (এস এ ডাঙ্গে), কলকাতা (মুজফ্ফর আহ্‌মেদ), মাদ্রাজ (সিঙ্গারাভেলু) ও লাহোরে (গুলাম হুসেন) অসহযোগ ও খিলাফতের অভিজ্ঞতা থেকে যেসব কমিউনিস্ট গোষ্ঠী সবে উঠে আসছিল, ১৯২২-এর শেষে নলিনী গুপ্ত (আর-একজন প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী) ও শওকত উসমানি (যিনি ছিলেন 'মুহাজির')-এর মতো দূত মারফত মানবেন্দ্রনাথ সেগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এইসব সম্পর্ক ছিল খানিকটা ক্ষীণ প্রকৃতির আর প্রায়ই ছিন্ন হয়ে যেত। মানবেন্দ্রনাথের প্রতিদ্বন্দ্বী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গোষ্ঠীর তরফে অবনী মুখোপাধ্যায় একই রকম চেষ্টা করেন, যদিও তা অতটা সফল হয়নি। বাম জাতীয়তাবাদী পত্রিকা, যেমন কলকাতায় *আত্মশক্তি* ও *ধূমকেতু*, আর গুন্টুরে *নবযুগ* লেনিন ও রাশিয়া সম্বন্ধে সপ্রশংস প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করে, আর মাঝে মাঝে *ভ্যানগার্ড* থেকে নেওয়া অংশের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদও ছাপা হতো। বোম্বাই-এ অগাস্ট ১৯২২ থেকে ডাঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা *সোশালিস্ট* বার করতে আরম্ভ করেন। এটি ছিল ভারতে প্রকাশিত প্রথম অবধারিত কমিউনিস্ট পত্রিকা। ২ নভেম্বর ১৯২২-এ ডাঙ্গেকে লেখা এক চিঠিতে মানবেন্দ্রনাথ একটি 'দ্বৈত সংগঠন' পরিকল্পনার রূপরেখা দেন, 'যার একটি আইনি ও অন্যটি বেআইনি'—সেটি হবে শ্র মি ক ও কৃ ষ ক দ লে র বিস্তৃত মোর্চার মধ্যে সক্রিয় এক গুপ্ত কমিউনিস্ট কেন্দ্র। ঘটনা এই যে, ১৬ সেপ্টেম্বরের *সোশালিস্ট* এই ধরনের একটি প্রস্তাব আগেই দিয়েছিল। সেখানে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি সমাজবাদী শ্রমিক দলে'র প্রস্তাব করা হয়। মে ১৯২৩-এ এক শ্র মি ক কি সা ন পা র্টি গঠনের কথা ঘোষণা করেন সিঙ্গারাভেলু। গয়া কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২২) তিনি প্রকাশ্যেই 'বিশ্ব কমিউনিস্টদের মহাসঙ্ঘ'র হয়ে কথা বলেন। কোনোরকম রাখঢাক না করে বারডোলি পশ্চাদপসরণকে তিনি বলেন একটি 'বিপর্যয়' এবং 'জাতীয় ধর্মঘটে'র সঙ্গে অসহযোগকে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। তাঁর কথায় মৃদু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, ১৯২৮-এ ষষ্ঠ কমিন্টার্ন কংগ্রেসের 'বাঁয়ে' মোড় নেওয়ার আগে অবধি বিভিন্ন ভারতীয় কমিউনিস্ট গোষ্ঠী মোটের ওপর জাতীয়তাবাদী মূলধারার মধ্যেই কাজ করার চেষ্টা করতেন, যদিও সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নানারকম আপসের জন্যে তীব্র সমালোচনাও করতেন কংগ্রেস নেতৃত্বের। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনগুলিতে প্রতিনিধিদের মধ্যে বিলি করার জন্যে মানবেন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে কমিউনিস্ট কর্মসূচিভিত্তিক বিবৃতি তৈরি করতেন। *ভ্যানগার্ড*-এর গোড়ার দিকের সংখ্যাগুলিতে (মে-জুন ১৯২২) গান্ধী

সম্পর্কে বিশ্লেষণ তীব্র সমালোচনাত্মক হলেও, ১৯২৮-পরবর্তী পর্যায়ে গান্ধীকে নেহাৎ এক বুর্জোয়া 'দুলাল' (ম্যাস্কট) বলা অবধি যায় নি। এতে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল 'নিপীড়িত স্বদেশবাসীর জন্য গান্ধীর গভীর ভালোবাসাকে, কৌশলগত বড় বড় ভুল করলেও এই ভালোবাসা মহান,' এবং গান্ধীর অন্তর্নিহিত 'শক্তি'কে উষ্ণ অভিনন্দন জানিয়ে বলা হয়েছিল, 'এই শক্তিকে বিজিত করতে পারবে না যুদ্ধজাহাজ, দাবিয়ে রাখতে পারবে না মেশিনগান...।' (গঙ্গাধর অধিকারী, *ডকুমেন্টস্ অফ হিস্ট্রি অফ সি পি আই*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৫৮, ৪৩৮)

ভারতে কয়েকটি খুদে খুদে কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর উদ্ভবের ফলে ব্রিটিশদের রীতিমতো আতঙ্ক—১৯২০-র দশকের স্বরাষ্ট্র রাজনৈতিক ফাইলগুলিতে মাঝে মাঝে 'বলশেভিক আপদ' নিয়ে উৎকণ্ঠা দেখা যায়—এই ধরনের কার্যকলাপের আসল তাৎপর্যের চেয়ে অনেক গুণ বেশি হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করা যায় একমাত্র ১৯১৭-র (বিপ্লবের) ফলে বিশ্ব জুড়ে শাসকশ্রেণীর মধ্যে যে ভয় জেগেছিল সেই দিয়ে, ফরাসি বিপ্লব-পরবর্তী আতঙ্কের কথাই তা বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। যেসব মুহাজির ভারতে আবার ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন, ১৯২২ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে পরপর পাঁচটি পেশওয়ার ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁদের বিচার করা হয়, আর যে ১৯২৪-এ 'কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলা'য় কয়েদ হন মুজফ্ফর আহ্মদ, এস এ ডাঙ্গে, শওকত উসমানি ও নলিনী গুপ্ত। এইসব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার ফলে যে বিপর্যয় আসে, তা কিন্তু নেহাৎই সাময়িক বলে প্রমাণ হয়। ডিসেম্বর ১৯২৫-এ কানপুরে অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রকাশ্য 'ভারতীয় কমিউনিস্ট সম্মিলন'। এটি সংগঠিত করেন সত্যভক্ত—তিনি অবশ্য দু-চারদিন বাদেই মায়া কাটান। হসরত মোহানি ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান, সভাপতি সিঙ্গারাভেলু। নানান ধরনের গোষ্ঠী, যারা নিজেদের আইনি অবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কমিন্টার্ন নিরপেক্ষতার ওপর জোর দিয়েছিল, তারা ছিল এর উদ্যোক্তা। তাহলেও সম্মিলনে যে প্রাথমিক পর্যায়ের সংগঠন খাড়া করা হয়, সেটিকে কিছুদিনের মধ্যেই নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন বোম্বাই-এর এস ভি ঘাটে-র মতো আরও দৃঢ়সঙ্কল্প কমিউনিস্টরা। ১৯৫৯ সালে অবিভক্ত সি পি আই ১৯২৫-এর সমাবেশটিকেই পার্টির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠারূপে চিহ্নিত করে স্বীকৃতি দেয়। শ্র মি ক ও কৃ ষ ক দলের বিস্তৃত মোর্চাটিকে আইনি মুখোশ হিসেবে কাজে লাগানোর ধারণাটি আসে ১৯২২-২৩-এ। আর ১৯২৫ থেকে ১৯২৭-এর মধ্যে স্থাপিত বেশ কয়েকটি সংগঠনের মধ্যে ঐ ধারণাই অন্তর্গত হয়—এর ব্যবহারিক তাৎপর্য কিন্তু অনেক বেশি। বাঙলায় ১৯২৫-২৬-এ লে ব র স্ব রা জ পা র্টি—অচিরেই যার নতুন নামকরণ হয়েছিল শ্র মি ক ও কৃ ষ ক পা র্টি—স্থাপন করেন মুজফ্ফর আহ্মেদ, তাঁর বন্ধু সুপরিচিত র‍্যাডিকাল কবি নজরুল ইসলাম, কুতুবুদ্দীন আহ্মেদ এবং র‍্যাডিকাল স্বরাজী হেমন্তকুমার সরকার, যিনি ছিলেন চিত্তরঞ্জন দাসের সচিব। ১৯২৭-এ গোপেন চক্রবর্তী ও ধরণী গোস্বামীর নেতৃত্বে অনুশীলনের একদল প্রাক্তন কর্মী ঐ দলে যোগ দেন। তাঁরা দুটি বাঙলা পত্রিকা প্রকাশ করেন, প্রথমে *লাঙ্গল*, তারপরে *গণবাণী*। ১৯২৬-এ *কীর্তি* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে পাঞ্জাবে একই ধরনের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন গদর দলের প্রধান নেতা সন্তোখ সিং। র‍্যাডিকাল বব্বর অকালি আন্দোলনের কিছু অবশিষ্ট কর্মীকে এই গোষ্ঠী টেনে নেয়, আর সোহন সিং জোশ-এর নেতৃত্বে এটি পরিণত হয় কী র্তি কি সা ন পা র্টি-তে। এস এস মিরাজকর,

কে এন জোগলেকর ও এস ভি ঘাটে মারাঠি পত্রিকা *ক্রান্তি* সমেত বোম্বাই-এ ১৯২৭-এ একটি শ্র মি ক ও কৃ ষ ক পা র্টি প্রতিষ্ঠা করেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, কমিউনিস্টরা অবশেষে শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে প্রকৃত যোগ গড়ে তুলতে পারছিলেন। ফেব্রুয়ারি ও সেপ্টেম্বর ১৯২৭-এ খড়গপুর রেলপথ কর্মশালার ধর্মঘটে কমিউনিস্টদের ভূমিকা ছিল বেশ লক্ষণীয়। এই ধর্মঘট ছিল ভি ভি গিরি ও সি এফ অ্যান্ড্রুজ-এর অতীব নরমপন্থী ইউনিয়ন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে শ্রমিক-অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। ধর্মঘটকে খড়্গপুর ছাড়াও লিলুয়ার মতো অন্যান্য কর্মশালায় ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত—অ্যান্ড্রুজ কমিউনিস্টদের এই খুবই যথার্থ পরামর্শের বিরোধিতা করলে ডাঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করে বলেন যে, 'তিনি ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের হিউম হতে চান—ধর্মঘটকে বিপথে চালাতে ও বিভ্রান্ত করতে (চান)। কিন্তু তা হবে না—শ্রমিকরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্যের নিয়ন্তা হবেন।' ১৯২৬-এর পর থেকে বোম্বাই-এর সুতোকল শ্রমিকদের মধ্যেও কমিউনিস্টদের প্রভাব খুব দ্রুত বাড়ছিল, কিন্তু তখনও পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল অল্পই। ব্রিটিশ সংসদের কমিউনিস্ট সদস্য হয়েছিলেন একজন ভারতীয়, সাপুরজী সকলতওয়ালা। ১৯২৭-এ তিনি ভারতে আসেন ও কমিউনিজম সম্বন্ধে একটা সাধারণ আগ্রহ জেগে ওঠে। কংগ্রেস-নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন পৌরসভা তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা জানায়, এমনকি গান্ধীও তাঁর সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুত্বপূর্ণ একটি বিতর্কে অবতীর্ণ হন। মহাত্মা 'কমরেড সকলতওয়ালা-র স্বচ্ছ আন্তরিকতা'র প্রশংসা করেন। কৃষকদের অবহেলা করার জন্যে তিনি (গান্ধী) কমিউনিস্টদের সমালোচনা করেন (তার খানিক যুক্তি ছিল), কিন্তু তাঁর বক্তব্য শেষ হয় এই আশা নিয়ে যে, 'যদিও এখনকার মতো আমরা পরস্পরের বিপরীত দিকে যাচ্ছি বলে মনে হয়, তাহলেও আমার ভরসা কোনো একদিন আমরা মিলব।' চীন বিপ্লবের অভিজ্ঞতার আগে অবধি শহরের সর্বহারাদের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারেই তাত্ত্বিক অগ্রাধিকার দেওয়া হতো। এছাড়াও গোড়ার দিকের কমিউনিস্টদের সপক্ষে একথা বলা যায় যে, ১৯২০-র দশকে কর্মীরও একান্ত অভাব ছিল। গ্রামের দিকে ছড়িয়ে না-পড়ার তাও যথেষ্ট কারণ। কমিউনিস্টদের কর্মসূচিভিত্তিক দলিলপত্রে জমিনদারি বিলোপ ও জমি পুনর্বণ্টনের দাবি একেবারে গোড়া থেকেই তোলা হয়েছিল। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি এসে তবে কংগ্রেস প্রবল দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে এই বিষয়টি গ্রহণ করতে শুরু করবে।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ

প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাদের সম্পর্কে ১৯২২-এর পরের মোহভঙ্গের মনোভাব বাঙলা, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাবের শিক্ষিত যুবকদের কিছু কিছু অংশের মধ্যে বিপ্লবী সন্ত্রাসপন্থার দিকে নতুন আগ্রহ জাগিয়ে তোলে। ১৯২২ থেকে, পুরনো বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অসংখ্য স্মৃতিকথা ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে *আত্মশক্তি*, *সারথি* ও *বিজলী*-র মতো বিভিন্ন বাঙলা পত্রিকা। প্রায়শই ভূতপূর্ব রাজবন্দীরা ছিলেন এগুলির সম্পাদক। শচীন সান্যালের *বন্দী জীবন*—যেটির হিন্দি ও গুরুমুখী সংস্করণও প্রচারিত হয়—তরুণ প্রজন্মের ওপর বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিল। শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সশস্ত্র 'বিপ্লবে'র পথকে গৌরবান্বিত করে বাঙলার সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পথের দাবী* প্রকাশিত হয় ১৯২৬-এ।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞার একমাত্র ফল হয়েছিল : সেটির জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায়। ১৯২৩-২৪-এ বাঙলায় সন্ত্রাসবাদের একটি স্বল্পস্থায়ী পুনরুত্থান পরিণতি পায় জানুয়ারি ১৯২৪-এ, গোপীনাথ সাহার হাতে ডে নামক জনৈক ইংরেজ হত্যায় (আসল লক্ষ্য ছিল কলকাতার কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট)। এর ফলে অক্টোবর ১৯২৪-এর বাঙলা অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। ১৯২৭-২৮-এ বন্দীরা ক্রমে ছাড়া পাওয়ার আগে অবধি এই প্রদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপকে—ভাবধারার প্রসারকে যদি আলাদা করে ধরা হয়—কার্যত বন্ধ করে দিয়েছিল এই অর্ডিন্যান্স। এদিকে যুক্ত প্রদেশে যে দুজন বাঙালি বাস করছিলেন, সেই শচীন সান্যাল ও যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংগঠিত করেন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন (এইচ আর এ)। ডাকাতি করে তাঁরা তহবিল জোগাড় করতে শুরু করেন। অগাস্ট ১৯২৫-এ কাকোরি ট্রেন আটকের পর এই সমিতির বেশিরভাগ সভ্যই গ্রেপ্তার হন, কিন্তু অবশিষ্টরা নতুন নতুন সভ্য সংগ্রহ করেন (এঁদের মধ্যে ছিলেন অজয় ঘোষ, সি পি আই-এর ভবিষ্যৎ সাধারণ সম্পাদক)। এক উজ্জ্বল তরুণ ছাত্র, ভগৎ সিং-এর নেতৃত্বে উদীয়মান একটি পাঞ্জাব গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁরা যোগাযোগ গড়ে তুলেছিলেন। আর সেপ্টেম্বর ১৯২৮-এ তাঁরা গঠন করেন বিখ্যাত হিন্দুস্থান সোশালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যে-সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ হয়েছিল, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪-এর মধ্যে আন্দোলনের শেষ ও তীব্রতম পর্যায়ে যা হওয়ার কথা ছিল, তার সঙ্গে অবশ্যই ২০-র দশকের মাঝামাঝি সময়ের কার্যকলাপের তুলনা করা যায় না। কিন্তু এই সময়ে যা তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা হলো কয়েকটি বিপ্লবী গোষ্ঠীর মধ্যে একটি ক্রমপরিণতি ও নতুন চিন্তাভাবনার প্রক্রিয়া। বাঙলায়, অভিজ্ঞ 'দাদারা', অতীতই যাঁদের সম্বল, তখনও পর্যন্ত যুগান্তর বনাম অনুশীলনের পুরনো ঝগড়াতেই প্রচণ্ড ব্যস্ত ছিলেন। ক র্মী স ঙ্ঘ-র মাধ্যমে তাঁরা আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়েন কংগ্রেসের উপদলীয় রাজনীতিতে, আর উৎসাহী নবাগতরা তাঁদের ওপর আস্থা হারাতে শুরু করেন। যেমন, চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে 'বিদ্রোহী গোষ্ঠী', সেই মুহূর্তেই নাটকীয় কিছু করার জন্যে তাঁরা উৎসুক হয়ে ছিলেন। কমিউনিজমে মতান্তরিত কিছু ব্যক্তি আর পুরনো ও নতুনকে মেলাবার খানিক প্রচেষ্টা (যেটিকে পরে 'সন্ত্রাসবাদী-কমিউনিজম', 'টেরো-কমিউনিজম' বলা হয়) বাদ দিলে হিন্দু ধার্মিকতা, ব্যক্তিসন্ত্রাস ও কয়েকজনের বীরত্বপূর্ণ আত্মবিসর্জন নিয়ে অর্চনা—এসব বিষয় সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ নতুন চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে বাধা দেওয়ার ব্যাপারে তখনও পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী ধারার ভারই ছিল যথেষ্ট। হেমচন্দ্র কানুনগো ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—১৯০৫-০৮-এর এই দুই প্রধান কর্মী কিন্তু ১৯২০-র দশকে গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথা লিখেছেন, যেখানে তাঁরা পুরনো ধারার বেশ কিছু দিককে তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু এ ব্যাপারে আরও এগিয়ে গিয়েছিল ১৯২৫-এ লেখা একটি ইস্তাহার। হিন্দুস্তান রিপাবলিকান এ্যাসোসিয়েশন-এর তরফে এটি বোধহয় লিখেছিলেন শচীন সান্যাল। 'নতুন তারার জন্মের জন্যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা প্রয়োজন'—এই যুক্তিতে ব্যক্তিসন্ত্রাস তখনও পর্যন্ত সমর্থন করলেও ইস্তাহারটিতে ঘোষণা করা হয় যে, চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো 'মানুষকে শোষণ করতে পারে এমন সব ব্যবস্থার বিলোপ' আর বিভিন্ন 'শ্রমিক ও কৃষক সংগঠন' গড়ার প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করা হয়। ভগৎ সিং আসার ফলে এই ধরনের নতুন নতুন চিন্তাভাবনা অচিরেই পুরোপুরি নিরীশ্বরবাদ ও সুস্পষ্ট সমাজবাদী লক্ষ্য সমর্থনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

সুভাষ ও জওহরলাল

সুনির্দিষ্ট কমিউনিস্ট ও সন্ত্রাসবাদী প্রবণতা ছেড়ে দিলেও, ২০-র দশকের মাঝে ও শেষ উঠতি প্রজন্মের সাধারণ অস্থিরতার ফলে নানা ধরনের যুবক ও ছাত্র সংগঠনের জন্ম হয়। সেগুলি ছিল স্বরাজী ও পরিবর্তন-বিরোধী—দু'পক্ষের নেতাদেরই বিরূপ সমালোচক। তাঁরা পূর্ণ স্বরাজ ধ্বনির অনুরূপ আরও বেশি অবিচল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা দাবি করছিলেন। আর বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ধারা সম্বন্ধে ও জাতীয়তাবাদকে সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে তাঁরা অবহিত ছিলেন—অস্পষ্ট হলেও তা গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২৭-এ ছাড়া পাওয়ার পর সুভাষচন্দ্র খানিকটা এই ধরনের ইতস্তত অনুসন্ধিৎসা দেখিয়েছিলেন, যদিও শহুরে বাঙালি যুবকদের মধ্যে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পেছনে আঞ্চলিক ভাবাবেগকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দেওয়ার ভূমিকাও কিছুমাত্র কম নয়। ভারতীয় যুবকদের অন্য উদীয়মান নক্ষত্র, জওহরলাল নেহরুর কাছে ১৯২৬-২৭-এর ইওরোপ ভ্রমণ চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রমাণ হয়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতায় তাঁর আগেই প্রত্যয় হয়েছিল যে 'ভারতে ধর্মকে যদি দাবিয়ে রাখা না যায় তাহলে তা দেশটাকে ও তার মানুষজনকে খতম করে দেবে'। এস গোপাল জোর দিয়ে বলেছেন যে, ফেব্রুয়ারি ১৯২৭-এ ঔপনিবেশিক নিপীড়ন ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ব্রাসেলস কংগ্রেসে সক্রিয়ভাবে যোগ দেওয়ার ফলেই 'জওহরলালের মানসিক বিকাশ অন্যদিকে মোড় নিয়েছিল'। সমাজবাদী ও তৃতীয় বিশ্বের নানান জাতীয়তাবাদী শক্তির এক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতির ভবিষ্যৎদৃষ্টি তিনি পেয়েছিলেন এই কংগ্রেস থেকে। এ ব্যাপারে তিনি প্রায়শই একনিষ্ঠ থাকতে পারেন নি, আবার কখনোই পুরোপুরি বিসর্জনও দেননি। ব্রাসেলস-এ সাম্রাজ্যবাদের বিপক্ষে ও জাতীয় স্বাধীনতার সপক্ষে লীগ শুরু হলে জওহরলাল তার সাম্মানিক সভাপতি নিযুক্ত হন। নভেম্বর ১৯২৭-এ তাঁকে ও তাঁর বাবাকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই ভ্রমণ বিষয়ে হিন্দু-তে তিনি যেসব প্রবন্ধ (১৯২৮-এ *সোভিয়েত রাশিয়া* নামে প্রকাশিত) লেখেন সেগুলি থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, 'কাস্তে হাতুড়ির দেশ, যেখানে শ্রমিক ও কৃষকরা দোর্দণ্ডপ্রতাপদের সিংহাসনে বসে', তা জওহরলালের মনে কত গভীর দাগ কেটেছিল। আর বইটির আখ্যাপত্রে ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে ওয়র্ড্‌স্ওয়র্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয় : 'ঐ প্রত্যূষে বেঁচে থাকাই ছিল মহানন্দ। কিন্তু তারুণ্য স্বর্গেরই সমান'।

নভেম্বর ১৯২৭-এ পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গদের দিয়ে গঠিত সাইমন কমিশন ঘোষণার ফলে পুনর্জাগরণের বিভিন্ন শক্তি দানা বাঁধতে থাকে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের এক নতুন বিশাল তরঙ্গের দিকে তা এগিয়ে নিয়ে যায়।

৬

জাতীয়তাবাদী অগ্রগতি ও আর্থনীতিক মন্দা ১৯২৮-১৯৩৭

দৃষ্টিপাত

রাজনীতির ধারা-প্রতিধারা

নভেম্বর ১৯২৭-এ সাইমন কমিশন নিয়োগ আর জুলাই ১৯৩৭-এ প্রদেশগুলিতে জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা তৈরির মধ্যবর্তী সাড়ে ন'বছর ছিল জটিল ও প্রায়ই পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক ঘটনাধারায় ভরা। সাংবিধানিক পরিবর্তনের পরবর্তী পর্যায় বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে পুরোপুরি শ্বেতাঙ্গদের দিয়ে গঠিত কমিশনের হাতে ইচ্ছাকৃত ও অপমানজনকভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল জাতীয় আন্দোলন। তার লড়াই চলেছিল প্রথম আইন অমান্য অভিযানের মাধ্যমে, আর এইভাবে মার্চ ১৯৩১-এ গান্ধী-আরউইন চুক্তি মারফত প্রায়-সমতার অবস্থা আসে। এর পরে আসে উইলিংডন ও র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর অধীন জাতীয় সরকারের মাধ্যমে একটি বৃহৎ ব্রিটিশ প্রতি-আক্রমণ ; ১৯৩৩-৩৪ নাগাদ সেটি আপাতভাবে কংগ্রেসকে চুরমার করে দেয়। কিন্তু মার্চ ১৯৩৭-এ কংগ্রেসের ব্যাপক নির্বাচনী বিজয়ের ফলে ব্রিটিশ সাফল্য অচিরেই অলীক বলে প্রমাণিত হয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রাদেশিক স্তরে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর জাতীয় আন্দোলন সর্বপ্রথম, খুবই আংশিক হলেও, কিছুটা প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পেরেছিল।

সুস্পষ্ট উত্থান-পতন সত্ত্বেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সাধারণ অগ্রগতি ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়। কিন্তু তা ছিল পরস্পর বিরোধিতায় ভরা একটি প্রক্রিয়া। যুক্ত প্রদেশ সম্বন্ধে জ্ঞান পান্ডের একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় এই ব্যাপারটি পরিস্ফুট হয়েছে (*দি আসসেনডেন্সি অফ দি কংগ্রেস ইন ইউ পি, ১৯২৬-৩৪*)। ইতোমধ্যেই এই ধরনটি ১৯১৯-২২-এ অস্পষ্টভাবে ধরা পড়লেও, ১৯৩০-এর দশকে তা আরও পরিষ্কার হয়ে যায়। কংগ্রেস সংগঠনের অগ্রগতি ও সংহতির আরও একটা অর্থ ছিল ঃ আরও শেকড়ঘেঁষা ও র‍্যাডিকাল সম্ভাবনাময় নিচু শ্রেণীর বিস্ফোরণকে (মূলস্রোতের সঙ্গে) মিলিয়ে নেওয়া ও রাশ টেনে রাখা। এই বই-এর প্রথমে আমরা যেমন লক্ষ্য করেছি, (ব্রিটিশ) রাজ-এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে কংগ্রেস নিজেও রাজ-এ পরিণত হচ্ছিল, অর্থাৎ ১৯৪৭-এর বিরাট কিন্তু অপূর্ণ রূপান্তরের পূর্বচ্ছায়া। পার্টি সংগঠন নিচু স্তরের স্বতঃস্ফূর্ততাকে দাবিয়ে দিচ্ছে—প্রশ্নটা কিন্তু শুধু এই ছিল না ; বরং যা হচ্ছিল তা হলো জাতীয় আন্দোলনের ওপর বুর্জোয়া ও নানান প্রতিপত্তিশালী গোষ্ঠী ক্রমেই এক ধরনের প্রাধান্য বিস্তার করছিল (কিন্তু আমরা দেখব যে তা কখনোই চূড়ান্ত বা নিঃশর্ত ছিল না)। বারেবারেই কংগ্রেস অনেক আশাআকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে, কিন্তু পূরণ করতে পারে নি। ফলে ১৯৩০-এর দশকের মাঝ থেকে দেশের জীবনের ক্রমেই আরও বেশি করে একটা

গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়াল ট্রেড ইউনিয়ন, কিসান সভা, র‍্যাডিকাল ছাত্র সংগঠন, কংগ্রেস সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মাধ্যমে বামপন্থী চ্যালেঞ্জ'-এর বৃদ্ধি, আর কংগ্রেস সংগঠনের নিজের ভেতরেই দক্ষিণ-বামের মোকাবিলা। গান্ধীপন্থার রাশ-টানা সম্পর্কে মধ্যশ্রেণীর র‍্যাডিকাল-যুবকদের মোহভঙ্গ—যেটি বাঙলা ও পাঞ্জাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯২৮ থেকে ৩৪-এর মধ্যে শেষ সন্ত্রাসবাদী বিস্ফোরণের মাধ্যমে—এই পর্যায়ের শেষে বামপন্থার প্রসারে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছিল, যখন বিপ্লবীরা গণসংগ্রাম ও মার্কসবাদকে বেছে নিয়ে ব্যক্তিহত্যার পথ বর্জন করেন।

আগের বিভিন্ন পর্যায়ের মতোই রাজনৈতিক জাগরণ প্রায়ই খণ্ডিত আকার ধারণ করছিল; ক্রমেই আরও কোণঠাসা-হয়ে-পড়া ব্রিটিশ সরকার এই ব্যাপারটিকে আগের চেয়েও বেশি করে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। এইভাবে তৈরি হয় একটি 'ভারতীয় ঐক্যের সঙ্কট', যেটিকে আর জে মুর সঠিকভাবেই (ঐ নামের একটি বই-এ) ধাপে ধাপে ক্ষমতা 'হস্তান্তরে'র মূল ব্রিটিশ কৌশলের সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। ১৮৫৭-র পরবর্তী পর্যায়ে জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দেশীয় রাজাদের কাজে লাগানোর যুক্তিসঙ্গত পরিণতি হয় ১৯৩০-এর দশকের 'ফেডারেশন' গড়ার প্রয়াস; আর কেন্দ্রে একটি দায়িত্বশীল সরকারের (অসংখ্য 'নিষেধ' ও 'রক্ষাকবচে'র শর্তাধীন) প্রস্তাবটিকে কেন্দ্রীয় আইনসভায় একটি মনোনীত শক্তিশালী রাজন্যগোষ্ঠী গঠনের সঙ্গে শক্ত গাঁটছড়ায় বেঁধে দেওয়া হয়। আগের মতোই হিন্দু প্রাধান্য সম্পর্কে মুসলমানদের ভয়কে সর্বাত্মক উৎসাহ দেওয়া হয়। আম্বেডকরের আন্দোলনের মাধ্যমে 'অস্পৃশ্য'দের অত্যন্ত ন্যায্য ও স্বাভাবিক অসন্তোষ নিজস্ব প্রকাশ খুঁজে পাচ্ছিল। স্বাধীনতার দিকে দ্রুত অগ্রগতির জন্যে জাতীয়তাবাদী দাবির প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হলো। ছোটোনাগপুরের মতো নানান অঞ্চলে জনগোষ্ঠীয় বিচ্ছিন্নতাবাদকে উৎসাহ দেওয়া ছিল ঔপনিবেশিক কৌশলনীতির আর-একটি বৈশিষ্ট্য, আর ১৯৩৫-এর আইন থেকে জনপ্রিয় মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ না-করেই লাটরা বিভিন্ন 'পেছিয়ে-পড়া' জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলে প্রশাসন চালানোর 'স্ববিবেচনাজাত ক্ষমতা' পেয়েছিলেন।

জাতীয় আন্দোলন এই ধরনের বিভেদ ও শাসননীতির পদ্ধতি রোখার চেষ্টা করেছিল কমবেশি সফলভাবে। দেশীয় রাজাদের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে রাজ্যে রাজ্যে গণ-আন্দোলন ক্রমেই হয়ে উঠছিল আরও গতিশীল, যদিও কংগ্রেস নেতৃত্ব (বিশেষভাবে গান্ধী) এইসব বিক্ষোভকে প্রকাশ্যে সমর্থন জানানোর ব্যাপারে অনেককাল দোনামনা করেছিলেন। কিন্তু প্রায় কোনো রাজনৈতিক অধিকারই না-থাকা বল্গাহীন সামন্ততান্ত্রিক অত্যাচারের পটভূমিতে অনেক রাজ্যেরই সামাজিকভাবে র‍্যাডিকাল সম্ভাবনা ছিল যথেষ্ট। আম্বেডকরের আন্দোলনকে (কংগ্রেসের সঙ্গে) না মেলাতে পারলেও ১৯৩২ থেকে গান্ধী তাঁর সময়ের অনেকটাই নিয়োগ করেন হরিজনদের মধ্যে কাজে। ১৯৩০-এর দশকে মহারাষ্ট্র, মাইশোর ও (খানিকটা কম পরিমাণে) তামিলনাড়ুর মতো অঞ্চলের অব্রাহ্মণ মধ্যবর্তী জাতিগুলির আন্দোলনকে কংগ্রেস তার নিজের উদ্দেশ্যে শামিল করতে পেরেছিল। কল্যাণমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে জনগোষ্ঠীয় সমর্থনকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়; অরণ্য সত্যাগ্রহ আইন অমান্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে ওঠে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে, পশ্চাদ্‌দৃষ্টিতে দেখে, চূড়ান্ত বিচ্ছেদকে খুঁজে বার করার

চেষ্টা হচ্ছে ১৯২৮-২৯-এর নেহরু প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনায়, আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ বাদ দিলে এই সম্প্রদায় অবশ্য আইন অমান্য থেকে নিজেদের অনেকটাই দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে পরিস্থিতি বোধহয় আরও বেশ কিছুকাল খোলাই ছিল, কারণ ১৯৩৭-এর নির্বাচনে ৪৮২টি মুসলমান আসনের মধ্যে জিন্না-র লীগ মাত্র ১০৯টি আসন জিততে পেরেছিল। আর যা-ই হোক না কেন, আমরা পরে দেখব যে মুঞ্জে, জয়কর ও মালবীয়-র মতো উগ্র হিন্দু নেতাদের কাছে বারবার প্রতিহত হওয়ার পরেই তবে জিন্না নিজে আপসহীন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিতে পরিণত হন। বাঙলা ও পাঞ্জাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলিতে ১৯৩৭-এ লীগ হেরে যায়—কংগ্রেসের কাছে নয়, বরং প্রধানত মুসলিম আঞ্চলিক দলগুলির কাছে (কৃষক প্রজা ও ইউনিয়নিস্ট) যারা নিজেদের দাবি করত ভূস্বামী বা শহুরে ব্যবসায়ী ও মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষকদের স্বার্থরক্ষাকারী বলে। এই দুই প্রদেশেই র‍্যাডিকাল কৃষিভিত্তিক কর্মসূচি তৈরি করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের ব্যর্থতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ব্যাপারটি শেষত দেশের একতার ক্ষেত্রে বিপর্যয়ী বলে প্রমাণ হয়।

ব্রিটিশ নীতি ও জাতীয় আন্দোলনের উত্থান-পতনের মধ্যে ব্যাপকতর রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলন সম্পর্কে গবেষণায় অগ্রগতির ফলে ১৯৩০-এর দশকের সংবিধান-রচনার প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আগ্রহ চলে গিয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে 'কেমব্রিজ স্কুল' ঐ দু-এর মধ্যে সরাসরি কার্যকারণ সূত্র প্রস্তাব করে আবার ঐ ব্যাপারে আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করেছে। জুডিথ ব্রাউন তাঁর সাম্প্রতিকতম বই-এ এই যুক্তি হাজির করেছেন যে 'গান্ধীর সর্বভারতীয় ভূমিকা অংশত সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশের জন্যে' (*গান্ধী অ্যান্ড সিভিল ডিস্ওবিডিয়েন্স*, ১৯৭৭, পৃ. ১২)। এক্ষেত্রে তিনি উইলিংডন-এর মূল্যায়নেরই প্রতিধ্বনি করেন, যাঁর মতে মহাত্মার সঙ্গে সরকার 'যেরকম আচরণ করেছিল সেই অনুযায়ী তাঁর [গান্ধীর] প্রভাবের প্রচুর তারতম্য ঘটেছিল' (ভারত-সচিবকে বড়লাট, ২৫ জুন ১৯৩২, টেম্পেলউড [হোর] সংগ্রহ)। সাইমন কমিশনের পরে পুনর্জীবিত কংগ্রেস সাংবিধানিক পরিবর্তনকে একটি অব্যবহিত জাতীয় প্রশ্ন হিসেবে দাঁড় করায়। আর গান্ধীকে সমপর্যায়ের গণ্য করে তার সঙ্গে কথা বলে আরউইন তাঁকে একটি নতুন মর্যাদা দেন। আম্বেডকরকে ব্রিটিশরা ব্যবহার করার ফলে গান্ধী হরিজনদের ব্যাপারে মন দিতে বাধ্য হন। কংগ্রেসের সঙ্গে যে-কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা চালাতে উইলিংডন নারাজ ছিলেন। তার ফলে ১৯৩২-৩৩-এ জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ধস নামে। তাহলেও ১৯১৯-২২-এর অভ্যুত্থানের সঙ্গে মন্টফোর্ড সংস্কারের তথাকথিত যোগাযোগের মতোই এই ব্যাপারটিকে একটু ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখলে পুরো তত্ত্বটি সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে, কারণ ব্রিটিশ নীতিতে প্রায়ই রদবদল হতো জাতীয়তাবাদী চাপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে, তার উল্টোটা নয়। জাতীয়তাবাদের ভাঁটার সময়ে বসানো সব শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত সাইমন কমিশন যদি মন্টাগু উদারনীতিবাদের বেশ কয়েকটি দিক থেকে সরে আসার পরিকল্পনা করে থাকে, তাহলে ১৯২৮-এর পর থেকে জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণ অচিরেই আরউইন-কে তাঁর ৩১ অক্টোবর ১৯২৯-এর 'প্রস্তাব' দিতে বাধ্য করে, আর জানুয়ারি ১৯৩১-এ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড কেন্দ্রে এক ধরনের দায়িত্বশীল সরকারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করতে বাধ্য হন। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আইন অমান্যে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হয়তো গোল টেবিল বৈঠকগুলোয়

সাংবিধানিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মতা নিয়ে যে-বিতর্ক চলছিল তার অল্পই বুঝতে পারতেন বা আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু তাঁদের চাপ ও বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগই ছিল সবচেয়ে বড়ো কারণ যার ফলে আরউইন গান্ধীর সঙ্গে আপস-আলোচনায় বসতে বাধ্য হন, আর ১৯৩২-৩৩-এ কংগ্রেসের আপাত পরাজয় পরিণত হয় ১৯৩৭-এর ব্যাপক নির্বাচনিক বিজয়ে। ইতিহাস শুধু শিরোমণি-রাজনীতিকদের নিয়ে তৈরি হয় না, তাঁরা ব্রিটিশ বা ভারতীয় যা-ই হোন না কেন।

আর্থনীতিক মন্দা ও ভারত

১৯৩০-এর দশকের গণ-অভ্যুত্থানগুলি ছিল বিভিন্ন নির্ধারক আর্থনীতিক পরিবর্তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। ১৯২৯-এর শেষদিকে যে বিশ্বব্যাপী মন্দা শুরু হয় তা ভারতকে ঘা দিয়েছিল দুটি প্রধান উপায়ে : (এক) বিশেষভাবে কৃষিজ পণ্যের ক্ষেত্রে দাম প্রচণ্ডভাবে পড়ে যাওয়া, আর (দুই) সম্পূর্ণ রপ্তানিকেন্দ্রিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে এক বিশাল সঙ্কট ডেকে আনা। ১৯২৯-এর দামের সর্বভারতীয় সূচক (১৮৭৩ = ১০০) ২০৩ থেকে পড়ে গিয়ে ১৯৩০-এ হয় ১৭১, ১৯৩১-এ ১২৭, ১৯৩২-এ ১২৬, ১৯৩৩-এ ১২১ এবং ১৯৩৪-এ ১১৯ ; এটি তারপর খানিকটা বাড়ে, কিন্তু ১৯৩৭-এও ছিল মাত্র ১৩৬। কৃষিপণ্যের দাম আসলে পড়তে থাকে ১৯২৬ থেকেই। কিন্তু ১৯৩০ থেকে যে ধস নামে তা ছিল সত্যিই সর্বনাশা, কাঁচা তুলোর সর্বভারতীয় গড় দাম (১৮৭৩ = ১০০) ১৯২৯-এর ১৩৩ থেকে পড়ে গিয়ে ১৯৩১-এ ৭০-এ এসে দাঁড়ায়। বাঙলায় আউশের দাম (১৯২৯ = ১০০) ১৯৩২-এ ৪৫.৯-এ নেমে আসে, আর ১৯৩৪-এর মধ্যে পাটের দাম পড়ে গিয়ে হয় ৪৩.৫। যুক্ত প্রদেশে পাইকারি দাম (১৯০১-০৫ = ১০০) ১৯২৯-এর ২১৮ থেকে পড়ে গিয়ে ১৯৩০-এ হয় ১৬২, ১৯৩১-এ ১১২ আর ১৯৩৪-এ ১০৩ (সি জে বেকার, *পলিটিক্স অফ সাউথ ইন্ডিয়া* ১৯২০-৩৭, পৃ. ১৭৪ ; বি বি চৌধুরী, 'দি প্রসেস্ অফ ডিপেজান্টাইজেশন্ ইন বেঙ্গল অ্যান্ড বিহার ১৮৮৫-১৯৪৭', *ইন্ডিয়ান হিস্টরিকাল রিভিউ*. জুলাই ১৯৭৫, পৃ. ১১৭; জ্ঞান পান্ডে, পৃ, ১৬০)। আর্থনীতিক মন্দার ফলে রাজস্ব, খাজনা ও সুদ দেওয়ার বোঝা প্রচণ্ড বেড়ে যায়। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তুলনায় স্বচ্ছল বা 'মধ্য' চাষীরা, যাঁদের বিক্রি করার মতো উদ্বৃত্ত হাতে ছিল (এটি ১৯১৮-উত্তর মুদ্রাস্ফীতির মতো নয়, যখন দরিদ্রতম অংশই ঘা খেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি)। ১৯৩০-এর দশকের গতিপ্রকৃতির বিন্যাস সম্বন্ধে আমরা যা জানি, এই আর্থনীতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তা ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়। রাজস্ব, সেচহার, খাজনা ও ঋণের বোঝা কমানো, হাতছাড়া জমি ফিরিয়ে দেওয়া বা—এই সময়ের সবচেয়ে র‍্যাডিকাল স্লোগান—জমিনদারি বিলোপ—এসব বিষয়কে কেন্দ্র করে কংগ্রেস (ও কিছু পরে কয়েকটি অঞ্চলে বামঘেঁষা কিসানসভাগুলি) সম্পত্তিবান কৃষক ও ছোটো ছোটো রায়তদের (ভাগচাষী বা কৃষিশ্রমিক নয় কিন্তু) সমবেত করেছিল। গ্রামাঞ্চলে এই আন্দোলন অসহযোগের চেয়ে অনেক ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পড়ে, এর ফলে তৈরি হয় তুলনায়-স্থায়ী বিভিন্ন সংগঠন। কিন্তু এই আন্দোলনে, মোটের ওপর ১৯১৯-২২-এর বিক্ষিপ্ত ও শেকড়ঘেঁষা ভাবী সুখরাজ্যের মেজাজটা ছিল না। জমিদারদের সঙ্গে কংগ্রেসের যোগসূত্র থাকার ফলে এই ধরনের সুনির্দিষ্ট কিসান দাবিগুলির ক্ষেত্রেও তার সমর্থনে প্রায়ই বাধা পড়ছিল, আর হার্ডিমান যেমন দেখিয়েছেন, গুজরাটের মতো

নানা অঞ্চলে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি নাগাদ ধনী চাষীদের মধ্যে ক্রমেই প্রকট হচ্ছিল রক্ষণশীল প্রবণতা। এর ফলে শেষত দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসের প্রাণপুরুষে পরিণত হন বারডোলি-র নায়ক বল্লভভাই প্যাটেল।

ভারতের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়লেও, ১৯২৯ অবধি মূলত একই রয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই শোষণের সার্বিক বিন্যাসে একটি গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে আর্থনীতিক মন্দা। এমনকি ১৯২০-এর দশকের শেষভাগ পর্যন্ত ব্রিটিশ রপ্তানির ১১% মতো নিত ভারত (এর মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ার সুতিকাপড়ের ভাগ ছিল কম করেও ২৮%)। যুক্তরাজ্য (ইউ কে) ছাড়া অন্যান্য দেশের সঙ্গে কৃষিজ কাঁচা মালে রপ্তানি-উদ্বৃত্ত ব্রিটেনের লেনদেন অবশেষের পক্ষে চূড়ান্ত গুরুত্বপূর্ণ থেকে গিয়েছিল, আর নিষ্কাশনযোগ্য ও রপ্তানিমূলক শিল্পে (খনি, চা ও পাট) ব্রিটিশ পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে ভারত ছিল তখনও পর্যন্ত অপরিহার্য। মন্দার ফলে ভারতীয় রপ্তানির মূল্য ১৯২৯-৩০-এর ৩১১ কোটি টাকা থেকে ১৯৩২-৩৩-এ ১৩২ কোটি টাকায় নেমে আসে (ঐ একই কালপর্বে আমদানি ২৪১ কোটি থেকে পড়ে গিয়ে ১৩৩ কোটি টাকায় দাঁড়ায়) এবং হোম ব্যয় মেটানোর একমাত্র উপায় ছিল ভারতীয়দের আপৎকালীন বিক্রির মাধ্যমে বিশাল পরিমাণে সোনা রপ্তানি (ক্লড মার্কোভিট্স, *ইন্ডিয়ান বিজনেস অ্যান্ড ন্যাশনালিস্ট পলিটিক্স*, পৃ. ১৯-২০)। ল্যাঙ্কাশায়ার-এর বাণিজ্য এক বড় সঙ্কটের মুখে পড়ে, তা আর কাটিয়ে ওঠা যায় নি, যুক্তরাজ্য থেকে আমদানি করা ১৯২৯-৩০-এর ১২৪৮০ লক্ষ গজ সুতির থানকাপড় ১৯৩১-৩২-এ ৩৭৬০ লক্ষ গজে নেমে আসে, আর—অবস্থা খানিক ফেরার পরে—১৯৩৯-৪০-এ ১৪৫০ লক্ষ গজে এসে দাঁড়ায়। (অমিয় বাগচী, পৃ. ২৩৮)।

১৯৩২-এর পর থেকে জাতীয় সরকারের রাজনৈতিক প্রতি-আক্রমণের অনেকখানির পেছনে ছিল ব্রিটিশের—বিশেষ করে ল্যাঙ্কাশায়ারের—তরফে পরিস্থিতি ফেরানোর চেষ্টা। ভারত যে ১৯৪৭-এর অনেক আগেই প্রকৃত আর্থনীতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছিল তার প্রমাণ হিসেবে বলা হয় যে, ল্যাঙ্কাশায়ার-এর ব্যবসাকে বাঁচনো যায় নি। আর আর্থিক অসুবিধার কারণে নয়া দিল্লী আরও বেশি সংরক্ষণমূলক শুল্কের (তুলো, কাগজ ও চিনির ওপর) দিকে এগিয়ে গিয়েছিল যার ফলে ভারতীয় শিল্পবিকাশের ক্ষেত্রে যথেষ্ট লাভ হয়। 'নির্বাচিত ভারতীয় আইনসভাগুলির হাতে লন্ডন যদি নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে না-ও থাকে [১৯৩৫-এর আইনের আর্থিক বিধানের মাধ্যমে], ভারত সরকারকে সে অবশ্যই ক্ষমতা তুলে দিয়েছিল' (বি আর টমলিনসন, *ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ* ১৯২৯-১৯৪২, পৃ. ৩০)। আসলে ঘটনা ছিল অনেক বেশি জটিল, কারণ আমরা দেখব যে, সংরক্ষণমূলক প্রশুল্ককে বারেবারেই ব্রিটিশদের বিশেষ সাম্রাজ্যিক সুবিধা-র সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে, আর ব্রিটিশ পুঁজিবাদী উপনিবেশবাদের গোটা কাঠামোর মধ্যে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর স্বার্থের দিকটা কমেই আসছিল। ১৯৩৫-৩৬-এর মধ্যে অ-প্রথাগত জিনিসপত্র, যেমন বৈদ্যুতিক উপকরণ, দূরসংযোগ (টেলিকমিউনিকেশন) ও বেতারের সরঞ্জাম, আর চিনি তৈরির যন্ত্রপাতি ভারতে ব্রিটিশের সুতিকাপড়ের রপ্তানিকে মূল্যের দিক থেকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। ভারতে প্রশুল্কের নিরাপত্তার আড়ালে বিভিন্ন বিদেশী কম্পানির নানান অধীনস্থ উৎপাদনকারী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা (১৯৩৩-এ লিভার ব্রাদার্স ও মেটাল বক্স, আর

১৯৩৬-৩৭-এ ডানলপ ও ইম্পিরিয়াল কেমিকালস্) আর সেই সঙ্গে বিদেশ-নিয়ন্ত্রিত 'ভারতে সীমাবদ্ধ' (ইন্ডিয়া মিলিটেড) গোষ্ঠীর কৌশলটিও নির্দিষ্ট কয়েকটি ধাঁচের নির্ভরশীল ভারতীয় শিল্পায়নে এক নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিচায়ক। আসলে ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে পরোক্ষ আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের এসব প্রয়াস চলছিল ঐ একই পর্বের নানান সাংবিধানিক রদবদলের পাশাপাশি। যদি ধরা হয় যে, বাণিজ্যিক প্রভুত্ব শেষ হয়ে আসছিল, তাহলে আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণকে টিকিয়ে রাখার তীব্র চেষ্টা চলে, আর তা যথেষ্ট সফলও হয়। টাকা বাঁধা থাকে স্টার্লিং-এর সঙ্গে ১ শি. ৬ পে.-এর কৃত্রিম চড়া হারে, আর রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে আইনসভার প্রভাবের আওতা থেকে আলাদা করে রাখা হয়। ১৯৩৫-এর আইন বড়লাটের হাতে তুলে দিয়েছিল আর্থিক 'সংরক্ষণ' ও 'রক্ষাকবচ'-এর বিশাল সাজসরঞ্জাম। সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় যেমন দেখিয়েছেন, যুক্তরাজ্যে ভারতের অদৃশ্য অর্থ পাঠানোর (হোম ব্যয়, ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজি বিনিয়োগের ওপর লভ্যাংশ, বীমা ও ব্যাঙ্কে জমা, মালভাড়ার খরচ, স্বত্বদেয়—যেগুলিকে শব্দান্তরে খানিকটা স্থূলভাবে জাতীয়তাবাদীরা বলতেন 'সম্পদ নির্গম') পরিমাণ ছিল ১৯২২-এ মোট ব্রিটিশ অদৃশ্য উপার্জনের ১৬.৩১%, ১৯৩১-এ ১৪.৭৭%, ও ১৯৩৬-এও ১৫.৭৫%। (*ল্যাঙ্কাশায়ার কটন ট্রেড অ্যান্ড ব্রিটিশ পলিসি ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ২৭)।

ভারতীয় বুর্জোয়াজির দিক থেকে দেখলে আর্থনীতিক মন্দা বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি করলেও, অন্তত পুরনো ধাঁচের ঔপনিবেশিক আর্থনীতিক বন্ধন ঢিলে হওয়ার অর্থ ছিল একটা বড় মাপের অগ্রগতির সুযোগ। ভারতীয় কলে থানকাপড়ের উৎপাদন ১৯২৯-৩০-এর ২৩৫৬৫ লক্ষ গজ থেকে বেড়ে ১৯৩২-৩৩-এ ২৯৮২৭ লক্ষ ও ১৯৩৮-৩৯-এ ৩৯০৫৩ লক্ষ গজে এসে দাঁড়ায়। এই উৎপাদন ল্যাঙ্কাশায়ার-এর আমদানিকে অনেক পেছনে ফেলে দেয়। জাপান তখনও পর্যন্ত বোম্বাই-এর কাছে প্রধান আশঙ্কার হেতু হলেও, ১৯৩০-এর দশকে চিনি, সিমেন্ট ও কাগজশিল্প বাড়ছিল দ্রুতহারে। ১৯৩৪-এর পরে সংরক্ষণ ছাড়াই দাঁড়াবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে ওঠে টাটা স্টিল। ভারতীয় পুঁজিবাদী অগ্রগতি আর বোম্বাই-আহ্মেদাবাদ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল না, কারণ ১৯৩০-এর দশকে কলকাতা, যুক্ত প্রদেশ, দক্ষিণ-ভারত (যেমন, মাদ্রাজ প্রদেশে সুতোকলের সংখ্যা ছিল ১৯৩২-এ ২৬ আর ১৯৩৭-এ ৪৭) ও সেইসঙ্গে কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে (বরোদা, মাইশোর, ভূপাল ইত্যাদি) দেখা যায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি। ল্যাঙ্কাশায়ার সঙ্কট ও সরকারি প্রশুল্কের মাধ্যমে প্রাপ্ত বাজার-সংরক্ষণের ব্যাপারটি ছাড়াও ভারতীয় শিল্পের উপকৃত হবার আর-একটি কারণ ছিল শিল্পজাত পণ্যের চেয়ে কৃষিজ পণ্যের দাম অনেক বেশি পড়ে যাওয়া, আর বাণিজ্যিক ও গ্রামীণ মন্দার পরিণামে সম্ভবত বাণিজ্য, সুদি কারবার ও জমি কেনার থেকে পুঁজি চলে গিয়েছিল শিল্পে।

ভারতীয় পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর এই ক্রমবর্ধমান শক্তির রাজনৈতিক পরিণতি কোনোভাবেই পরিষ্কার ছিল না, কারণ (পরের অংশগুলিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে) মনোভাবের বিভিন্নতা এবং দীর্ঘস্থায়ী ও স্বল্পস্থায়ী স্বার্থের মধ্যে বারবার সঙ্ঘর্ষের ক্ষেত্রে যথেষ্ট আঞ্চলিক তারতম্য দেখা যায়। এখনকার মতো আমরা এই সাধারণ উক্তির গণ্ডিতেই থাকতে পারি যে, ১৯৩০-এর দশক চলাকালীনই জাতীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সর্বাত্মক ভার প্রচণ্ড ছড়িয়ে

পড়েছিল, আর মাঝেমাঝে অসহযোগ, সাংবিধানিক আলোচনা ও মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে এর ভূমিকা নির্ধারক বলে প্রমাণ হয়। ব্রিটিশ বড়কর্তাদের (যেমন, আরউইন, হোর বা বোম্বাই-এর লাট সাইক্‌স্) ব্যক্তিগত কাগজপত্রে ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মনোভাব সম্বন্ধে অবশ্য প্রায় বাতিকগ্রস্ত ভাবনা দেখা যায়, আর সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকজন অগ্রণী ব্যবসায়ীর (ভারতীয়দের মধ্যে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, এইচ পি মোদি, ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ ও ফিরোজ সেঠনা, ব্রিটিশদের মধ্যে এডওয়র্ড বেন্টহাল) যেসব কাগজপত্র লোকচক্ষে আনা হয়েছে, সেগুলিও পরিণত হয়েছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সূত্রে। তার থেকেও ঐ একই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

ঔপনিবেশিক আধিপত্য দুর্বল হয়ে পড়েছে কিন্তু তখনও পর্যন্ত তা প্রতাপশালী এবং বিশ্বব্যাপী মন্দা—বিশেষভাবে এই পরিস্থিতির মধ্যে পুঁজিবাদী বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী অর্থ হলো শ্রমিক শ্রেণীর ওপর ভারবৃদ্ধি। বারবার 'নিয়োগ সঙ্কোচনে'র উদ্যোগ (১৯২৮-২৯-এ, আবার ১৯৩৪ এর পরে) মজুরি কমানো ও সাময়িক ছাঁটাই-এর মাধ্যমে কাজের শোচনীয় পরিবেশকে আরও খারাপ করে তোলা হয়। এর পরিণামে শ্রমিক বিক্ষোভের ধাঁচটা তুঙ্গে পৌঁছোয় ১৯২৮-২৯-এ (এই সময় ২০৩টি ধর্মঘট ও লক-আউট হয়, যাতে জড়িত ছিলেন ৫০৬,৮৫১ জন শ্রমিক আর ১৯২৮-এ ৩১,৬৪৭,৪০৪টি শ্রমদিবস নষ্ট হয়), তারপর অত্যাচার (১৯২৯-৩৩-এর মিরাট মামলা) ও ভাঙনের মুখোমুখি হয়ে তা নেমে আসে, আর ১৯৩০-এর মাঝামাঝি আবার জেগে ওঠে (১৯৩৭-এ ৩৭৯টি ধর্মঘট ও লক-আউট যাতে জড়িত ছিলেন ৬৪৭,৮০১ জন—রজনী পাম দত্ত, *ইন্ডিয়া টুডে*, পৃ. ৩৩৭)। ১৯১৯-২২ পর্বের ক্ষেত্রে যেমন আগেই লক্ষ্য করা হয়েছে সেইরকমই, শ্রমিকদের জঙ্গীভাবের বিভিন্ন ঊর্ধ্ববিন্দু ও সাধারণ জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থান কিছুতেই মেলে নি, আর এই বিযুক্তি সম্ভবত আমাদের দেশের আধুনিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়।

ব্রিটেন ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির সঙ্গে সম্বন্ধ কমজোরি হয়ে পড়ার ফলে কিছু দেশজ শিল্পের বৃদ্ধি হলেও, কৃষির ক্ষেত্রে গভীর মন্দার কারণে গোটা দেশের ভারসাম্য রক্ষা পায় নি। শিবসুব্রহ্মণিয়ানের গণনা থেকে ১৯৩০-এর দশকে মাথাপিছু জাতীয় আয় হ্রাসের লক্ষণ দেখা যায়, আর জনসংখ্যাঘটিত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের ফলে ১৯২০-র দশক থেকে বিভিন্ন সমস্যা হয়ে ওঠে আরও তীব্র। ১৯০১ থেকে ১৯২১-এর মধ্যে জনসংখ্যা ২৮৪০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৩০৬০ লক্ষ হয়। অর্থাৎ ২০০ লক্ষের চেয়ে একটু বেশি বাড়ে, কিন্তু ১৯৩১ ও ১৯৪১-এর ক্ষেত্রে ঐ একই সংখ্যা হলো ৩৩৮০ লক্ষ ও ৩৮৯০ লক্ষ—সমতুল্য পর্যায়ে এক লাফে প্রায় ৮০০ লক্ষ বাড়ল। ঔপনিবেশিক ভারতের শেষ পর্বে প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে রইল আর্থনীতিক অচলাবস্থা ও গণদারিদ্র্য : ধ্রুব মূল্যসূচকে (১৯৩৮-৩৯) ১৯১৬-১৭-য় মাথাপিছু জাতীয় আয় হিসেব করা হয়েছে ৬০.৪ টাকা ; ১৯৪৬-৪৭-এ তা হয় মাত্র ৬০.৭ টাকা।

১৯২৮-১৯২৯ ঃ সাইমন বয়কট ও শ্রমিক অভ্যুত্থান

সাইমন কমিশন ও নেহরু প্রতিবেদন

সব শ্বেতাঙ্গদের নিয়ে গঠিত সাইমন কমিশনের ঘোষণা (৮ নভেম্বর, ১৯২৭) ভারতীয় রাজনীতিতে দ্বিমুখী ও খানিকটা পরস্পরবিরোধী অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল। ইচ্ছাকৃত অপমানের জ্বালায় (এর সঙ্গে যোগ হয় বার্কেনহেড-এর বিদ্রূপ ঃ কোনো কার্যকর রাজনৈতিক কাঠামোর ব্যাপারে একমত হওয়ার ক্ষেত্রে ভারতীয়রা একেবারেই অপারগ) সপ্রুর মতো উদারনৈতিক রাজনীতিকরা এবং জিন্নার নেতৃত্বে মুসলমান নেতারা একটি ডোমিনিয়ন মর্যাদাসম্পন্ন সংবিধানের রূপরেখা তৈরির কাজে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলান। এই ধরনের তুলনায়-নরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির যুক্ত মোর্চাটি সাম্প্রদায়িক বিভেদের ফলে ভেঙ্গে যাওয়ার আগে অবধি, ১৯২৮-এর শেষ ভাগ পর্যন্ত বজায় থাকে। একই সময়ে নানান র‍্যাডিকাল শক্তির দ্রুত বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করে তোলে সাইমন বয়কট আন্দোলন। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তো আছেই, তা ছাড়াও এঁরা সমাজবাদের লক্ষ্যের অভিমুখে নানা ধরনের সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবর্তনের দাবি তোলেন।

১৯২৭-এর শেষ দিকে মনে হয়েছিল, ভারতীয় ঐক্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল, কারণ সবকটি প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল (মাদ্রাজের জাস্টিস দল ও পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্টরা ছাড়া) সাইমন কমিশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্যে তারা এক সর্বদলীয় সম্মিলনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। মার্চ ১৯২৭-এ দিল্লীতে একটি সম্মিলনে জিন্না আগেই মুসলমান নেতাদের একটি আপস সূত্র নিয়ে এগিয়ে আসতে রাজি করান। সূত্রটি হলো ঃ যে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী সেই ১৯০৬ থেকে মুসলিম কর্মসূচির কেন্দ্রীয় দাবি ছিল তা ছেড়ে দিয়ে তার বদলে সংখ্যালঘুদের জন্যে সংরক্ষিত আসন সমেত যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী, কেন্দ্রীয় ব্যাবস্থাপক সভায় এক-তৃতীয়াংশ মুসলিম প্রতিনিধিত্বের প্রতিশ্রুতি, পাঞ্জাব ও বাঙলায় জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব, আর তিনটি নতুন মুসলমান প্রধান প্রদেশ (সিন্ধু, বালুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ)। মুসলিম লীগের ডিসেম্বর ১৯২৭-এর অধিবেশনে (যেখানে সাইমন কমিশন বয়কটের ডাক দেওয়া হয়) আবার ঐ প্রস্তাবটিই দেওয়া হয়, যদিও মুহম্মদ শফি-র নেতৃত্বে লাহোরে লীগের একটি ভেঙে-আসা অধিবেশন হয়। তাতে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি ছেড়ে দিতে গররাজি আর কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মে ১৯২৭-এ এ আই সি সি ও ডিসেম্বর ১৯২৭-এ মাদ্রাজ কংগ্রেস অধিবেশনে জিন্নার প্রস্তাব মেনে নেওয়া হলো। তাহলেও পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র থেকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক চাপের দরুন অচিরেই এক বিপর্যয়ী পশ্চাদপসরণে বাধ্য হতে হয়। ফেব্রুয়ারি ১৯২৮-এ দিল্লীতে ও মে মাসে বোম্বাই-এ যে সর্বদলীয় সম্মিলন বসে সেটি তথাকথিত নে হ রু প্র তি বে দ নে র (প্রধানত মোতিলাল নেহরু ও তেজবাহাদুর সপ্রু-র তৈরি খসড়া) চূড়ান্ত রূপ দেয় অগাস্ট মাসে লখনউ-তে। কিন্তু সাম্প্রাদায়িক প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে এই সম্মিলন এক প্যাঁচালো আলোচনা ও বাদবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। অহিন্দুদের ধর্মান্তরিত করার ডাক দিয়ে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক প্রস্তাব নেওয়া হয় এন সি কেলকর-এর নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভার জব্বলপুর অধিবেশনে (এপ্রিল ১৯২৮)। নতুন মুসলমানপ্রধান প্রদেশ তৈরি আর পাঞ্জাব ও বাঙলায়

সংখ্যাগুরুদের জন্যে আসন সংরক্ষণের (এর ফলে দুজায়গাতেই ব্যবস্থাপক পরিষদে মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত হতো) তীব্র বিরোধিতা করেন প্রায় সব হিন্দু সাম্প্রদায়িকই। তাঁরা কঠোরভাবে এক কেন্দ্রীয় কাঠামোর দাবিও তোলেন। এইভাবে তাঁরা একটি ধাঁচ খাড়া করলেন যেটি ১৯৩০-৩১-এর গোল টেবিল বৈঠকে আবার তোলা হয়। নে হ রু প্র তি বে দ নে হিন্দু মহাসভাকে বেশ কিছু ছাড় দেওয়া হয়। সর্বত্র যৌথ নির্বাচকমণ্ডলী হলেও সংরক্ষিত আসন দেওয়া হয় একমাত্র কেন্দ্রে ও সেইসব প্রদেশে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যালঘু (পাঞ্জাব ও বাঙলায় নয়)। ঠিক হয় যে, সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে আলাদা করে পৃথক প্রদেশ করা হবে—ভারতের ডোমিনিয়ন মর্যাদা লাভ ও সেইসঙ্গে সেখানকার হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্যে ভারনির্ধারণের মীমাংসা হওয়ার পরে, তার আগে নয়। আর সিন্ধুর রাজনৈতিক কাঠামো হবে মোটামুটিভাবে এককেন্দ্রীয়, অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রের হাতে। যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যাপারে যে-জিন্না পাঞ্জাবি মুসলমানদের শফি-ফজল-ই-হুসেন গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন, ১৯২৭-এর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার জন্যে কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধে তিনি ন্যায্যতই অভিযোগ করতে পারতেন। কিন্তু ডিসেম্বর ১৯২৮-এ কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মিলনের অধিবেশনে ঐক্যের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন জিন্না। অবিলম্বে সিন্ধুর পৃথককরণ, প্রদেশগুলিকে অবশিষ্ট ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের এক-তৃতীয়াংশ আসন, আর প্রাপ্তবয়স্কদের মতদান প্রতিষ্ঠা না-হওয়া অবধি পাঞ্জাব ও বাঙলায় সংরক্ষিত আসন—এগুলির জন্যে তিনি আরজি জানান ও শেষ করেন ঐক্যের জন্যে এক আবেগময় আবেদন দিয়ে : 'আমরা সবাই এই ভূমির সন্তান। আমাদের একসঙ্গে থাকতে হবে...আমাকে বিশ্বাস করুন, যতদিন-না মুসলমান ও হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ হয় ততদিন ভারতের কোনো অগ্রগতি হবে না।' (উমা কাউরা, *মুসলিমস্ অ্যান্ড ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম্*, দিল্লী, ১৯৭৭, পৃ. ৪৫)। হিন্দু মহাসভার নেতা এম আর জয়কর এই ধরনের আপসের সব আবেদনই নাকচ করে দেন। তার ফলে জিন্না আবার শফি গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগ দেন ও মার্চ ১৯২৯-এ তাঁর বিখ্যাত 'চোদ্দো দফা' হাজির করেন। এই 'দফাগুলি'তে নতুন প্রদেশ, কেন্দ্রে এক-তৃতীয়াংশ আসন ও সম্পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সমেত যুক্তরাষ্ট্রের দাবি আবার তোলা হয়, আর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবিকেও পুনর্জীবিত করা হয়—যতদিন-না হি ন্দু রা অ ন্যা ন্য দফা মেনে নেন।

সর্বদলীয় সম্মিলনের তরফে জয়কর-এর অবস্থান মেনে নেওয়ার ব্যাপারটিকে জিন্না পরে 'পথ-ছাড়াছাড়ি' বলে বর্ণনা করেন। এখানে সম্ভবত যথেষ্ট অতিরঞ্জন রয়েছে : ১৯২৭-এর প্রস্তাবের ভিত্তিতে রাজনীতিকদের মধ্যে ঐকমত্য সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের গভীরতর আর্থিক-সামাজিক ও ভাবাদর্শগত শেকড়গুলিকে ছুঁতে পারত না, আর পাঁচটি প্রদেশে অনড় মুসলমান সংখ্যাগুরুত্বের বদলে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি ছেড়ে দিলেই যে পৃথক মুসলমান রাজনৈতিক সত্তার বোধ নির্ঘাত দূর হতো, বা এমনকি দুর্বল হয়ে পড়ত তা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু দুবছর পরে আইন-অমান্য সম্পর্কে বেশির ভাগ মুসলমান নেতার উদাসীনতা বা নিশ্চিত বৈরিতার ক্ষেত্রে ১৯২৮-এর ভাঙন-এর অবদান ছিল যথেষ্টই। এক সঙ্কটমুহূর্তে জাতীয় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থানকে বেশ খানিকটা দুর্বল করে দিয়েছিল হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা—প্রথম বা শেষবারের মতো নয়।

সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সমস্যা সমাধানের ব্যর্থ উদ্যোগটি বাদ দিলে, কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক বিষয় আর মৌলিক অধিকারের তালিকা সমেত নে হ রু প্র তি বে দ ন দেশের জন্যে এক খসড়া সাংবিধানিক কাঠামো তৈরির প্রথম প্রধান ভারতীয় প্রয়াস হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে। এই প্র তি বে দ ন কেন্দ্র ও বিভিন্ন প্রদেশ—দুক্ষেত্রেই দায়িত্বশীল সরকারের দাবি করলেও, সর্বদলীয় সম্মিলন-এর মতো একটি প্রধানত নরমপন্থী সংগঠনের পক্ষে যা স্বাভাবিক সেই অনুযায়ী এতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, বরং ডোমিনিয়ন মর্যাদার কথাই বলা হয়েছিল। ফলে যথেষ্ট ক্ষোভের সঞ্চার হয় কংগ্রেসে ক্রমবর্ধমান তরুণ র‍্যাডিকালদের মধ্যে, যাঁদের ভেতর দ্রুত বিশিষ্টতম হয়ে উঠছিলেন মোতিলালের ছেলে। এই প্র তি বে দ ন অবশ্য স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের দাবি তুলেছিল যেটি ১৯৪৭ অবধি ভারতের জন্যে ব্রিটিশের তৈরি কোনো সংবিধানে কখনও মেনে নেওয়া হয় নি। ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা ছিলেন শিরোমণি রাজনীতিক গোষ্ঠী আর শ্বেতাঙ্গ শাসকরা জনগণের স্বার্থ রক্ষা করতে চেষ্টা করছিল—এই বহুকথিত যুক্তির সারবত্তা যে কতটুকু তা এর থেকেই বোঝা যায়।

রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ মর্যাদার বিষয়টি কংগ্রেস এতদিন পর্যন্ত মোটামুটি এড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সংবিধান তৈরির প্রয়াসে এই প্রশ্নটি অনিবার্যভাবে উঠল। জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ঢাল হিসেবে রাজন্যদের সঙ্গে সমঝওতাকে দৃঢ় করার চেষ্টা ব্রিটিশরা করে আসছিল সেই মিন্টো-র সময় থেকে। একটি পরামর্শমূলক রা জ ন্য স ভা স্থাপন করা হয়েছিল মন্টফোর্ড সংস্কারের সময়ে (ফেব্রুয়ারি ১৯২১)। এই সভাটি বিকানির ও পাতিয়ালার মতো মাঝারি আয়তনের রাজ্যগুলির মঞ্চ হয়ে দাঁড়ায়। আরও বড় বড় রাজ্য (হায়দরাবাদ, মাইশোর, ত্রিবাঙ্কুর অথবা বরোদা) এর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে। তারা মনে করে, নতুন দিল্লীর সঙ্গে স্বাধীন আলাপ-আলোচনা আরও বেশি সম্ভ্রমের। ১৯২২-এর গোড়ার দিকে অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে পৌঁছলে রা জ ন্য স ভা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। সর্বভারতীয় স্তরে গণতন্ত্রে সম্ভাব্য উত্তরণের পরিপ্রেক্ষিতে, সর্বময় কর্তৃত্বের ওপর কেন্দ্রীয় দাবিকে তারা লাঘব করার আবেদন জানায়। 'আয়ারল্যান্ডে রাজভক্তদের দশা' এড়ানোই—বিকানির যেমন রিডিং-কে খোলাখুলি জানান—ছিল এই আবেদনের উদ্দেশ্য। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে ব্রিটিশদের মনে হয়, রাজন্যবর্গকে তুষ্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা কমে গেছে, কারণ কংগ্রেসের চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়েছিল শক্তিহীন। বেরার-কে হায়দরাবাদে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারটি নিষ্পত্তি করার জন্যে একটি স্বাধীন সালিশি আদালত বসানো হোক—১৯২৬-এ নিজাম-এর এই দাবিটি খারিজ করে রিডিং তাঁকে বড় রকমের একটা ঘা দেন। রিডিং-এর যুক্তি ছিল : সর্বময় কর্তৃত্ব শুধুই নির্দিষ্ট চুক্তির ওপর নির্ভর করে নেই, বরং চুক্তি-নিরপেক্ষভাবেই তা বহাল থাকে, এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ব্রিটিশদের হস্তক্ষেপের অধিকারও আছে, কারণ শেষ পর্যন্ত সারা দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব তাদেরই। ১৯২৭-২৮-এ জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যদের ও সর্বময় কর্তৃত্ব খর্বের ব্যাপারে তাঁদের দাবিকে তুষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা ব্রিটিশের কাছে আর একবার মুখ্য হয়ে ওঠে। নে হ রু প্র তি বে দ নে দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাৎক্ষণিক অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের কোনো সুপারিশ করা হয়নি, কিন্তু ভবিষ্যতে মূলত এককেন্দ্রীয় ও গণতান্ত্রিক প্রকৃতির যে কেন্দ্র তৈরি হবে, সর্বময় কর্তৃত্বকে তার কাছে পরিপূর্ণ হস্তান্তরের বিষয়টি অবশ্যই

সেখানে ভাবা হয়েছিল। আর কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিশীল রাজনীতিকরা যে অল ইন্ডিয়া স্টেটস পিপলস কনফারেন্স-এর প্রথম অধিবেশন সংগঠিত করেন (বোম্বাই, ডিসেম্বর, ১৯২৭) সেখানে রাজন্যশাসিত ভারতকে দায়িত্বশীল সরকারের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়। ঐ একই মাসে সর্বময় কর্তৃত্বের প্রশ্নটি খতিয়ে দেখার জন্যে হারকোর্ট বাটলার (যুক্ত প্রদেশে তালুকদারদের সপক্ষে নীতির জন্যে বিখ্যাত)-এর নেতৃত্বে একটি কমিটি স্থাপন করে আরউইন ঐ পর্যন্ত রিডিং-এর নীতিটি রদবদল করেন। বা ট লা র প্র তি বে দ নে (মার্চ ১৯২৯) আবার জোর দিয়ে বলা হয়, 'সর্বময় কর্তৃত্ব অবশ্যই সর্বময় থাকবে', সুস্পষ্টভাবে জানানো হয় যে, রাজশক্তির (অধিকার) থেকে ডোমিনিয়ন মর্যাদাসম্পন্ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণশীল কোনো ভাবী কেন্দ্রের হাতে তা আপনা থেকেই হস্তান্তরিত হবে না। সর্বময় কর্তৃত্ব সরাসরি প্রয়োগ করতে পারবেন বড়লাট, মন্ত্রিপরিষদের লাট নন। অর্থাৎ এটি ছিল সম্ভাব্য কংগ্রেস-প্রভাবিত কেন্দ্রীয় সরকারের কক্ষপথ থেকে রাজন্যদের দূরে রাখার এক সুস্পষ্ট প্রয়াস—আর দেশের ঐক্যের পক্ষে এক অশুভ ভবিষ্যৎ-লক্ষণ।

'বেসরকারি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি সংক্রান্ত সব মালিকানা' রক্ষার পূর্বস্বীকৃতি নিয়ে একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেন মালবীয়, আর অগাস্ট ১৯২৮-এ নে হ রু প্র তি বে দ ন-রচয়িতারা তা মেনেও নেন। এতেই তাঁদের মৌল রক্ষণশীলতা ধরা পড়ে। এই প্রস্তাবটিকে আক্রমণ করা হয় সর্বদলীয় সম্মিলনের কলকাতা অধিবেশনে। কৌতূহলের বিষয় হলো, তাঁদের মধ্যে ছিলেন 'বাবু রামচন্দ্র (যুক্ত কিসান সভার সদস্য)' ও সেই সঙ্গে বাঙলার দুই প্রতিনিধি, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা ঘোষণা করেন যে, 'নতুন রাজ্য বাঙলার অন্যতম প্রথম কর্তব্য হবে...চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত রদ করা'। কিন্তু মালবীয় তাঁর বক্তব্য নিয়ে সহজেই জিতে যান (*ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার*, ১৯২৮)। সাইমন-এর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া কিন্তু কোনো অর্থেই সাংবিধানিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল না। কমিশনের দেশব্যাপী পরিদর্শনের সময়ে একের পর এক শহর কাঁপিয়ে তুলেছিল 'সাইমন ফিরে যাও' বিক্ষোভ, কালো পতাকা ও হরতাল। আর ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ব্যাপারে এক নবজাগ্রত আন্দোলনের সূচনা হয় ১৯২৮-এ। সাইমন-বিরোধী অভিযানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল ৩ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল, ১৯ ফেব্রুয়ারি সাইমন কলকাতায় পৌঁছলে এক বিশাল বিক্ষোভ, ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের আহ্বান জানিয়ে ১ মার্চ কলকাতার মোট ৩২টি পল্লীর (ওয়ার্ড) সব ক'টিতে একসঙ্গে সমাবেশের আয়োজন, ৩০ অক্টোবর লাহোরে পুলিশের সঙ্গে একটি বড় রকম সঙ্ঘর্ষ (এতে লাজপত রায় গুরুতর আহত হন ও ১৭ নভেম্বর মারা যান), আর ২৮-৩০ নভেম্বর লখনউ-তে প্রচণ্ড কার্যকর একাধিক প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। কাইজারবাগে জনৈক তালুকদার কমিশনকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। সেখানে খালিকুজ্জামান 'সাইমন ফিরে যাও' স্লোগান লেখা ঘুড়ি ও বেলুন ওড়ান, এবং জওহরলাল ও গোবিন্দবল্লভ পন্থ পুলিশের হাতে মার খান।

যুব আন্দোলন

এই ধরনের শহরকেন্দ্রিক বিক্ষোভে প্রাধান্য ছিল মধ্যবিত্ত ছাত্র ও যুবকদের, আর ১৯২৮ ও ১৯২৯—এই দুটি বছর ছিল ছাত্র-যুব সম্মিলন ও সমিতিতে ভরপুর। এখানে তাঁরা পূর্ণ স্বাধীনতা

আর র‍্যাডিকাল সামাজিক ও আর্থনীতিক পরিবর্তনের দাবি তোলেন। হয়তো যুব-অস্থিরতার এই তরঙ্গে শিক্ষিতদের বেকারি খানিকটা ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে। দ্বৈত শাসনব্যবস্থায় নির্বাচিত মন্ত্রীদের দায়িত্বে শিক্ষা হস্তান্তর করার ফলে ছাত্রসংখ্যার তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি হয় (সাইমন প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৯২২-এ মোট জনসংখ্যার ৫.০৪% থেকে ১৯২৭-এ ৬.৯১%,) আর চাকরির সুযোগ আগের চেয়ে একটু ভালো হয়। ১৯২৯-এ এফ আই সি সি আই ও বিড়লা-প্রভাবিত ভারতীয় বণিকসভা—দুপক্ষই এই ঘটনা সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি কর্ণাটকে এন জি হার্ডিকর যে হিন্দুস্তানী সে বা দ ল পত্তন করেন তার মাধ্যমে যুবকদের জমায়েত করার চেষ্টা করে কংগ্রেস। আর পুরো ১৯২৮ ও ১৯২৯ জুড়ে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষ বসুকে দেশের বিভিন্ন অংশে যুব সম্মিলনে ভাষণ দেওয়াতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। যেমন, ডিসেম্বর ১৯২৮-এ জওহরলাল কলকাতায় সমাজবাদী যুব কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন, যেখানে 'কমিউনিস্ট ধাঁচের এক সমাজের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসেবে' স্বাধীনতার জন্যে ডাক দেওয়া হয়। আর অন্য একটি যুব কংগ্রেসে খানিকটা অস্পষ্টভাবে বাছবিচার না করেই সুভাষ বসু 'জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া ও চীন'-এর যুব আন্দোলনকে অভিনন্দন জানিয়ে ভাষণ দেন। কংগ্রেস বামের এই দুই উদীয়মান তারকার মধ্যে সম্পর্ক কিন্তু জোরালো ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ও ঈর্ষার কারণে আগের থেকেই কলুষিত হয়েছিল।

এক বছর আগে জওহরলাল মাদ্রাজে এক রিপাবলিকান কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এই কংগ্রেসে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানানো হয়েছিল। এখানে সা ম্রা জ্য বা দ- বি রো ধী লী গ (লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম)-এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার ডাক দেওয়া হয়, এবং আল্লুরি সীতারাম রাজু আর সেই সঙ্গে সাক্কো ও ভানজেত্তি-কে (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতালীয় শ্রমিক শহিদ) অভিনন্দন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মাদ্রাজ কংগ্রেসেই (ডিসেম্বর ১৯২৭)—যেটিতে গান্ধী যোগ দেন নি—নেহরু একটি আকস্মিক প্রস্তাব গ্রহণ করাতে সমর্থ হন। এই প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়, যদিও যেসব পরিপূরক ধারায় তার অর্থ নির্দিষ্ট করা হয়েছিল অবিলম্বে ও সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশদের ভারতত্যাগ—প্রতিনিধিরা সেগুলিকে খারিজ করে দেন, আর সংজ্ঞার্থহীন স্বরাজের কংগ্রেসি প্রত্যয়টি অপরিবর্তিত থাকে। গান্ধী আড়ালে জওহরলালকে কড়া করে সতর্ক করে দেন যে, তিনি (জওহরলাল) বড্ড তাড়াতাড়ি এগোচ্ছেন। আর ভবিষ্যতেও যে-ধাঁচটি বারবারই দেখা দেবে সেইভাবেই জওহরলাল কোনো প্রকাশ্য বা সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ থেকে পিছিয়ে আসেন : 'আমি কি রাজনীতিতে আপনার সন্তান নই, যদিও হয়তো এক ঘরপালানো ও খামখেয়ালি সন্তান?' (গান্ধীকে নেহরু, ২৩ জানুয়ারি, ১৯২৮—গোপাল, পৃ. ১১২)। নে হে রু প্র তি বে দ ন ডোমিনিয়ন মর্যাদা বেছে নেওয়ায় জওহরলাল ও সুভাষ কংগ্রেসের মধ্যেই চাপদায়ী গোষ্ঠী হিসেবে ভা র তে র স্বা ধী ন তা র জ ন্য লী গ (ইন্ডিপেন্ডেন্স ফর ইন্ডিয়া লীগ) সংগঠিত করেন। এই লীগের উদ্দেশ্য ছিল : দুটি লক্ষ্য যাতে গৃহীত হয় তার জন্যে প্রচার চালিয়ে যাওয়া : (এক) সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও (দুই) এপ্রিল ১৯২৯-এ লীগের যুক্ত প্রদেশ শাখা যাকে বলেছিল 'একটি সমাজবাদী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যেখানে প্রতিটি ব্যক্তির বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ থাকবে...[সেইসঙ্গে] উৎপাদনের উপকরণ ও বণ্টনের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ'। কংগ্রেস

বামের তাত্ত্বিক র‍্যাডিকাল ভঙ্গি কিন্তু সুনির্দিষ্ট কার্যকলাপ বা সংগঠনের মাধ্যমে পর্যাপ্ত বহিঃপ্রকাশ করার মতো কিছু খুঁজে পায় নি। আর এই ধাঁচটিও ভবিষ্যতে আবার ঘটার জন্যে ঠিক হয়ে রইল। জুলাই ১৯২৯-এ গান্ধীর কাছে জওহরলাল স্বীকার করেন যে ভা র তে র স্বা ধী ন তা-র জ ন্য লী গ 'নৈরাশ্যজনক রকমের ব্যর্থ' বলে প্রমাণ হয়েছে, '...গোষ্ঠী বা পার্টি তৈরির জন্যে প্রয়োজনীয় রাজনীতিকের স্বভাবদক্ষতা আমার নেই'। (*সিলেক্টেড ওয়ার্কস্*, খণ্ড ৪, পৃ. ১৫৬)

এইচ এস আর এ

এই ধরনের প্রধানত বাক্‌সর্বস্ব র‍্যাডিকাল ভাবসাবে সন্তুষ্ট না-হয়ে শিক্ষিত শহুরে যুবকদের কিছু কিছু অংশ আর-একবার বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী পদ্ধতির দিকে চলে যান। বাঙলায় অনুশীলন ও যুগান্তরের বয়োজ্যেষ্ঠ 'দাদা'রা ধৈর্য ধরে প্রস্তুতির পরামর্শ দেন। তাঁরা সেই মুহূর্তে কিছু করায় নিরুৎসাহ করেন, আর ইতোমধ্যে নিজেরা কংগ্রেসি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ডুবে যান। সুভাষচন্দ্র ছাড়া পাওয়ার পরই ১৯২৮ থেকে যে প্রচণ্ড লড়াই শুরু হয় তাতে যুগান্তর সমর্থন করে সুভাষ বসুকে আর অনুশীলন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে। দাদাদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে কমবয়সি বিভিন্ন 'বিদ্রোহী গোষ্ঠী' দেখা দেয়, আর ডিসেম্বর ১৯২৯-এ মেছুয়াবাজার বোমা মামলায় সেগুলির একটি যায় চুরমার হয়ে। কিন্তু প্রকৃতই অভূতপূর্ব এক আঘাত হানার জন্যে কার্যকর প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে চট্টগ্রামের সূর্য সেনের নেতৃত্বাধীন সবচেয়ে দুর্ধর্ষ গোষ্ঠীটি। কিন্তু বাঙলায় মোটের ওপর বৃহত্তর সামাজিক লক্ষ্য বা পদ্ধতি সম্পর্কে যথেষ্ট নতুন চিন্তা-ভাবনাকে বাধা দেয় প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ঐতিহ্যের ভার। মেছুয়াবাজার গোষ্ঠী 'বাঙলার যুবক' (*ইউথস্ অফ বেঙ্গল*) নামে একটি প্রচারপত্র বার করেছিল। তখনও মুষ্টিমেয় মানুষদের বীরত্বপূর্ণ আত্মবিসর্জন-অর্চনার ওপরেই জোর দেওয়া হয় : '...রক্তলোলুপ ইংরেজের স্বৈরাচারতন্ত্রের বিরুদ্ধে গোড়ায় যদি তোমায় একলা দাঁড়াতে হয়, তা হবে গর্বের বিষয়'—আর আর্থনীতিক সামাজিক কর্মসূচির কোনো চিহ্ন সেখানে ছিল না।

এর পুরোপুরি উল্টো দিকে, নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার প্রতি অসাধারণ খোলামন ছিল হিন্দুস্তান সাধারণতন্ত্রী সমাজবাদী বাহিনীর (হিন্দুস্তান সোশালিস্ট রিপাবলিকান আর্মি, সংক্ষেপে এইচ আর এস এ) অন্তত কয়েকজন নেতার লক্ষণীয় দিক। সেপ্টেম্বর ১৯২৮-এ দিল্লির ফিরোজশা কোটলা-র ধ্বংসাবশেষের এক রোমান্টিক পরিবেশে এই বাহিনী প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন ভগৎ সিং ও তাঁর পাঞ্জাব গোষ্ঠী, যুক্ত প্রদেশ থেকে শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ভাই যতীন্দ্রনাথ ও অজয় ঘোষ, আর বিহার থেকে ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ। বিশেষ করে আলাদা ছিলেন ভগৎ সিং, মার্কসবাদী সমাজবাদ ও জঙ্গী নিরীশ্বরবাদের প্রতি তাঁর ক্রমেই আরও গভীর অনুগতির কারণে। আগের সন্ত্রাসবাদীদের দৃঢ় হিন্দু ধর্মভাবের পরিপ্রেক্ষিতে ভগৎ সিং-এর এই দ্বিতীয় ব্যাপারটিও বোধহয় সমান অসাধারণ। এইচ এস আর এ-র সক্রিয়তার মধ্যে ছিল লাজপত রায়ের ওপর আক্রমণের বদলা হিসেবে ডিসেম্বর ১৯২৮-এ লাহোরে স্যান্ডার্স হত্যা। ৮ এপ্রিল ১৯২৯-এ ব্যবস্থাপক সভায় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের বোমা ছোঁড়া, ডিসেম্বর ১৯২৯-এ দিল্লির কাছে আরউইন-এর ট্রেন উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা, আর

১৯৩০-এ পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের শহরগুলিতে একের পর এক সন্ত্রাসবাদী আঘাত (শুধু পাঞ্জাবেই ঐ বছর ২৬টি ঘটনা নথিবদ্ধ আছে)—শুধু এইসব কার্যকলাপ দেখলে সেগুলিকে সনাতনী সন্ত্রাসবাদী ধরনের বলে মনে হতে পারে। তাহলেও এইচ এস আর এ এবং তার প্রভাবাধীন প্রকাশ্য যুব সংগঠন ন ও জো য়া ন ভা র ত স ভা-র কিন্তু সত্যিই আরও অনেক ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিত ছিল। ভগৎ সিং যেমন তাঁর বিচারের সময়ে পরিষ্কার বলেন যে, তাঁর কাছে বিপ্লবের অর্থ 'বোমা ও পিস্তলের অর্চনা নয়', বরং সমাজের সর্বাত্মক পরিবর্তন, যার পরিণাম হবে বিদেশী ও ভারতীয় দুই পুঁজিবাদেরই উৎখাত ও সর্বহারার একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। 'বিপ্লব মানবজাতির অবিচ্ছেদ্য অধিকার। স্বাধীনতা সকলের অনপনেয় অধিকার। সমাজের প্রকৃত ধারক হলো শ্রমিক...বিপ্লবের এই বেদিতে আমরা নিয়ে এসেছি আমাদের যৌবনের অর্ঘ্য, কারণ এইরকম এক অসাধারণ লক্ষ্যের কাছে কোনো ত্যাগই যথেষ্ট মহান নয়। আমরা তৃপ্ত। বিপ্লবের আবির্ভাবের জন্যে আমরা প্রতীক্ষারত। ইনকিলাব জিন্দাবাদ।' ব্যবস্থাপক সভায় বোমা ছোঁড়া ছিল পুরোপুরি প্রদর্শনমূলক ; এটি যথেষ্ট তাৎপর্যের ব্যাপার যে, তার উপলক্ষ্য ছিল শিল্প-বিবাদ সংক্রান্ত শ্রমিক-বিরোধী খসড়া আইন। স্যান্ডার্স হত্যার অভিযোগে ফাঁসির অপেক্ষারত ২৩ বছরের এই তরুণ পরিকল্পিতভাবে মার্কসবাদের চর্চা শুরু করেন আর লেখেন 'কেন আমি নিরীশ্বরবাদী' এই নামে প্রগাঢ় নাড়া দেওয়ার মতো রচনা। মানুষের মর্যাদা ও যুক্তিবাদী তর্কের ভিত্তিতে তিনি সবরকম ধর্মকে পুরোপুরি খারিজের পক্ষে বক্তব্য রাখেন। ভগৎ সিং-এর একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী, অজয় ঘোষ একদিন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হবেন।

অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এইচ এস আর এ-র বীর ও শহিদেরা। রাজনৈতিক বন্দীদের মর্যাদা উন্নতির দাবিতে ৬৪ দিন অনশনের পর সেপ্টেম্বর ১৯২৯-এ কারাগারে যতীন দাসের মৃত্যু হয়। কলকাতায় তাঁর শবাধার অনুগমন করেছিল দু'মাইল দীর্ঘ এক মিছিল। পাঞ্জাব ও উত্তর-ভারতে ভগৎ সিং-এর 'আকস্মিক ও আশ্চর্য জনপ্রিয়তা'র কথা জওহরলাল পরে স্মরণ করেছেন তাঁর 'আত্মজীবনী'তে। আর গোয়েন্দা বিভাগের একটি গোপন বিবরণ, টেররিজম্ ইন ইন্ডিয়া (১৯১৭-১৯৩৬)'-এ এতদূর অবধি বলা হয়েছে যে, 'কিছু সময়ের জন্যে ঐ সময়ের সর্বাগ্রগণ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে শ্রীযুত গান্ধীকে উচ্ছেদ করার সম্ভাবনাও তিনি (ভগৎ সিং) দেখিয়েছিলেন।'

শ্রমিক অভ্যুত্থান ও কমিউনিস্টরা

বেশ কয়েকটি দিক থেকে ১৯২৮-২৯-এর সবচেয়ে লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল এক বিশাল শ্রমিক অভ্যুত্থান (বিশেষভাবে রেলপথ, সুতিকাপড় ও চটকলে) আর তার সঙ্গে যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যথেষ্ট পরিমাণে কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ। ভগৎ সিং-এর মার্কসবাদে উত্তরণকে এই প্রসঙ্গসূত্রেই রাখতে হবে।

বাঙলায় ১৯২৭-এর খড়গপুর ধর্মঘটের পর এল লিলুয়ায় রেলের কর্মশালায় এক দীর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড সংগ্রাম (জানুয়ারি-জুলাই ১৯২৮)। এই সংগ্রামের নেতৃত্বে ছিলেন গোপেন চক্রবর্তী, ধরণী গোস্বামী (দুজনেই কমিউনিস্ট), কিরণ মিত্র ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর লক্ষণীয়

দিকগুলির মধ্যে ছিল বামুনগাছিতে পুলিশের গুলি চালানো (২৮ মার্চ) ও কলকাতার শিল্পাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে শ্রমিকদের বেশ কয়েকটি দর্শনীয় মিছিল। প্রভাবতী দাশগুপ্তার মতো স্বাধীন শ্রমিকনেত্রী আর বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় ও রাধারমণ মিত্রের মতো কমিউনিস্টদের প্রতি ক্রমবর্ধমান সহানুভূতিসম্পন্ন কংগ্রেসিদের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত শ্র মি ক ও কৃ ষ ক পা র্টি-র কর্মীরাও ১৯২৮-এ কলকাতা পুরসভার ধাঙড় ধর্মঘটে এবং চেঙ্গাইল ও বাউড়িয়া-র চটকল ধর্মঘটে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। অন্যান্য জায়গার চেয়ে বাঙলায় শ্রমিকদের পক্ষে জাতীয়তাবাদীদের সমর্থন আরও সহজে পাওয়া যায়, কারণ বড় বড় নিয়োগকর্তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন ব্রিটিশ, তা নাহলে অন্তত অবাঙালি। এক্ষেত্রে বাঙলার উঁচু পর্যায়ের কংগ্রেসের যোগাযোগ ছিল খানিকটা বিক্ষিপ্ত ও নগণ্য। যেমন, বাউড়িয়া ধর্মঘটীদের জন্যে সুভাষচন্দ্র-র কাছে অর্থের অনুরোধ জওহরলালের মাধ্যমে পাঠাতে হয়। (সুভাষকে নেহরু, ২৪ জানুয়ারি ১৯২৯—*সিলেক্টেড ওয়ার্কস্*, খণ্ড ৪)

শ্রমিকশ্রেণী যে ক্রমেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ছিলেন ও সাবালক হয়ে উঠছিলেন তার একটি চোখে পড়ার মতো নজির পাওয়া গেল ডিসেম্বর ১৯২৮-এ। এই সময়ে শ্র মি ক ও কৃ ষ ক পা র্টি-র নেতৃত্বে হাজার হাজার শ্রমিক মিছিল করে কংগ্রেস অধিবেশনে গিয়ে দু'ঘন্টার জন্য সভামণ্ডপ দখল করে নেন ও পূর্ণ স্বরাজ দাবি করে প্রস্তাব পাশ করেন। কংগ্রেসি সংগঠকরা এইসব একদমই পছন্দ করেননি। বলা হয় যে, স্বেচ্ছাসেবকদের 'সর্বাধিনায়ক' ('জি ও সি') সুভাষচন্দ্র এমনকি পুলিশ ডাকতে চেয়েছিলেন, যদিও শেষ পর্যন্ত মোকাবিলা এড়ানো যায়।

সুভাষ আরও বেশি আগ্রহ দেখান জামশেদপুর শ্রমিক আন্দোলনে : সেখানে সি এফ অ্যান্ডরুজ-পরিচালিত জামশেদপুর শ্রমিক সমিতি-র অত্যন্ত নরমপন্থী নেতৃত্বে অসন্তুষ্ট হয়ে শ্রমিকরা ১৯২৮-এ বেশ কয়েকবার ধর্মঘট করেন। টাটাদের বিরুদ্ধে মানিক হোমি নামে খানিকটা সুবিধাবাদী ধাঁচের জনৈক আঞ্চলিক আইনজীবীর ক্ষোভ ছিল। তিনি ও সেইসঙ্গে সুভাষ পরিস্থিতিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। এর পরিণামে যে উপদলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিল, তাতে এই আন্দোলন পরাজিত হলো। ভারতীয় মালিকানাধীন বিভিন্ন উদ্যোগের শ্রমিক-সংগ্রামে জাতীয়তাবাদীরা কতখানি যুক্ত ছিলেন, তা খুবই কৌতূহলজনকভাবে বেরিয়ে আসে পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাসকে লেখা জি ডি বিড়লার একটি চিঠি থেকে (১৬ জুলাই ১৯২৯)। সেখানে তিনি সুভাষের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার একটি বিবরণ দিয়েছেন। বিড়লার মন্তব্য : 'শ্রীযুত বসুকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়নি', কিন্তু 'আমার মনে হয় আমি এই ভরসা দিতে পারি, যখনই প্রয়োজন তখনই টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল ওয়ার্কস-কে সাহায্য করার ক্ষেত্রে শ্রীযুত বসুর ওপর আস্থা রাখা যেতে পারে, অবশ্য যদি তাঁর সঙ্গে ঠিকমতো ব্যবহার করা হয়। যখন আমরা তাঁদের সঙ্গে কাজ-কারবার করি তখন তাঁদের মানসিকতা আমাদের অনুধাবন করা উচিত'। (*ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ৪২)

দক্ষিণ ভারতীয় রেলপথে একটি স্বল্পস্থায়ী কিন্তু খুবই প্রচণ্ড ধর্মঘট হয় ২ জুলাই ১৯২৮-এ। তীব্র সরকারি নিপীড়নে এই ধর্মঘট গুঁড়িয়ে যায়। ধর্মঘটের নেতা সিঙ্গারাভেলু ও মুকুন্দলাল সরকারকে দেওয়া হয় কারাদণ্ড আর পেরুমল নামে জনৈক জঙ্গী শ্রমিককে বাস্তবিকই

আন্দামানে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে পাঠানো হয়। কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল এপ্রিল থেকে অক্টোবর ১৯২৮ অবধি বোম্বাই সুতোকল শ্রমিকদের ধর্মঘট। ল্যাঙ্কাশায়ার ও জাপানের বিরুদ্ধে প্রশুল্ক সংরক্ষণ করতে সরকার রাজি হয় নি। এই অস্বীকৃতির ফলে সুতিশিল্পের উপর যে ভার নেমে আসে সুতোকল-মালিকরা তা শ্রমিকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। এই ব্যাপারটি চলেছিল পুরো ১৯২০-র দশকের শেষভাগ জুড়ে। আর ১৯২৮-এ ধর্মঘটের উদ্দেশ্য হলো নিয়োগসঙ্কোচন প্রচেষ্টার (যার মধ্যে মজুরি-কমানোও ছিল) বিরোধিতা। এই ধর্মঘট চলার সময়ে এন এম জোশীর নরমপন্থী টেক্সটাইল লেবর ইউনিয়ন-এর র‍্যাডিকাল বিকল্প হিসেবে দেখা দেয় কমিউনিস্ট-পরিচালিত বিখ্যাত গিরণী কামগার ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের ভিত্তি ছিল এক ধরনের মাটিঘেঁষা 'শ্রমিকদের স্বপরিচালনা' আন্দোলন, যার নেতা ছিলেন এ এ আলভে ও জি আর কাসলে। এঁরা ১৯২৬-২৭ থেকে জোগলেকর, মিরজকর ও ডাঙ্গে-র মতো বোম্বাই-এর কমিউনিস্টদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। গিরণী কামগার ইউনিয়নের সবচেয়ে শক্তির সময়ে তার মূল সত্যিই নিহিত ছিল নির্বাচিত 'গিরণী সমিতি' বা মিল কমিটিগুলির মধ্যে। এপ্রিল ১৯২৯-এ এইরকম সক্রিয় কমিটির সংখ্যা ছিল ৪২টি। ইউনিয়ন-পরিচালিত ১৯২৮-এর ধর্মঘট ছিল বিশাল, সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ। ১৬ অগাস্ট ভারত-সচিবকে লেখা একটি গোপন চিঠিতে বোম্বাই-এর লাট স্বীকার করেন, 'লোকগুলো যেভাবে জুঝছে তা সত্যিই আশ্চর্যজনক...। মিলমালিকরা তাদের মিলের একটি অংশ বেশ কয়েকবার খুলেছে এবং পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়া সত্ত্বেও একটি লোকও যে কাজে ফিরে আসেনি এতে আমি যথেষ্ট বিচলিত হয়েছি।' একটি সরকারি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন সাপেক্ষে মিলমালিকরা ১৯২৭-এর মজুরি বহাল রাখতে রাজি হলে তবে ধর্মঘট শেষ হয়। গিরণী কামগার-এর তুঙ্গ-অবস্থায় তার সদস্যসংখ্যা ছিল প্রায় ৬০,০০০। এর বিপরীতে এন এম জোশীর নেতৃত্বাধীন প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের সদস্য ছিল ৯৮০০ জন, আর এমনকি সুপ্রতিষ্ঠিত গান্ধীপন্থী আহ্‌মেদাবাদ টেক্সটাইল লেবর অ্যাসোসিয়েশন-এর সদস্যসংখ্যা ছিল মাত্র ২৭,০০০। ১৯২৮-এর শেষদিকে বোম্বাই-এ কমিউনিস্ট প্রভাব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, বিশেষভাবে জি আই পি রেলশ্রমিক তৈলাগারের কর্মীদের মধ্যে।

এইরকম পরিস্থিতি অবধারিতভাবেই বিশাল সাম্রাজ্যবাদী ও সরকারি প্রত্যাঘাত ডেকে আনে। বোম্বাই-এ ধর্মঘট ভাঙার জন্যে ইচ্ছে করে পাঠানদের নিয়োগ করা হলে ফেব্রুয়ারি ১৯২৯-এ এক বিশাল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়। প্রধানত নিচুজাতি থেকে আসা সুতোকল-শ্রমিকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ-বিরোধী মনোভাব জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেন অব্রাহ্মণ মন্ত্রী ভাস্কররাও যাদব (কমিউনিস্ট নেতারা ছিলেন মূলত ব্রাহ্মণ)। তিনি কাসলে-কে নিজের দলে টানতে সমর্থ হন। গুজব ওঠে, এই প্রচারের আংশিক অর্থ এসেছিল হোমি মোদীর কাছ থেকে, যিনি ছিলেন বোম্বাই মিলমালিক সমিতির পাণ্ডা। বাঙলার লাট জ্যাকসন ও বোম্বাই-এর দুই লাট উইলকিনসন ও সাইক্‌স্-এর ১৯২৮-২৯-এর পত্রালাপ থেকে দুটি জিনিস বেরিয়ে আসে : সত্যিকারের সন্ত্রস্তভাব, আর ভারতীয় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সপক্ষে দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের সুর। প্রশুল্ক সংরক্ষণ বা টাকা-স্টার্লিং অনুপাত ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু তার লক্ষণমাত্রও দেখা যায়নি। ২২ অগাস্ট ১৯২৮-এ উইলসন যেমন আরউইনকে জানান

যে 'তিনি তাদের [মিলমালিকদের] প্রায় প্রত্যেকের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে দেখা করছেন, আর তাঁরা হাল ছেড়ে দিলে যে কী বিপদ হবে তা বোঝাচ্ছেন...।' সরকার একটি জননিরাপত্তা বিল-এর জন্যে চাপাচাপি করে, যে-বিল তার হাতে ফিলিপ স্প্র্যাট ও বেন ব্র্যাডলি-কে পত্রপাঠ দেশছাড়া করার ক্ষমতা দেবে। এই দুই ব্রিটিশ কমিউনিস্ট বাঙলা ও বোম্বাই-এর শ্রমিকদের সংগঠিত হতে সাহায্য করছিলেন। এপ্রিল ১৯২৯-এর শ্রমবিবাদ আইনের মারফত, একটি সালিশি আদালত ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়, আর 'শ্রম সংক্রান্ত বিবাদে মিটমাটের উদ্দেশ্য ছাড়া অথবা যদি সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ও/বা জনসাধারণের দুর্দশা আরোপের পরিকল্পনা নিয়ে যেসব ধর্মঘট হবে' সেগুলিকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কংগ্রেস সরকারিভাবে দুটি বিলেরই বিরোধিতা করে যদিও *ইন্ডিয়ান কোয়ার্টার্লি রেজিস্টার*-এ লক্ষ্য করা হয় যে 'জননিরাপত্তা বিলের উপর আলোচনার সময়ে অস্বাভাবিকভাবে বিরাট সংখ্যক কংগ্রেস সদস্য অনুপস্থিত ছিলেন।' কিন্তু ২০ মার্চ ৩২ জন শ্রমিকনেতাকে গ্রেপ্তার করাই ছিল সরকারের প্রধান পদক্ষেপ (এঁদের বেশির ভাগই ছিলেন কমিউনিস্ট, অবশ্যই সকলে নয়)। এঁদের মধ্যে ছিলেন বোম্বাই থেকে ডাঙ্গে, মিরজকর, ঘাটে, জোগলেকর, অধিকারী, নিম্বকর, আলভে ও কাসলে ; কলকাতা থেকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, কিশোরীলাল ঘোষ, ধরণী গোস্বামী, গোপেন চক্রবর্তী, রাধারমণ মিত্র, গোপাল বসাক ও শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ; পাঞ্জাব থেকে সোহন সিং জোশ ; যুক্ত প্রদেশ থেকে পূরণচন্দ জোশী ও বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ; আর সেইসঙ্গে তিনজন ইংরেজ—ব্র্যাডলি, স্প্র্যাট ও হাচিনসন। ঠিক করা হয় ষড়যন্ত্রের বিচার হবে মিরাটে, যেহেতু, হোম-সদস্য এইচ জি হেগ ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯-এর একটি গোপন নোট-এ স্বীকার করেন যে, ব্রিটিশদের পক্ষে 'মামলাটি জুরির সামনে...হাজির করার ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব হবে না।' শেষ পর্যন্ত বিচারটি খানিকটা বিফল বলেই প্রমাণ হয়, কারণ আত্মপক্ষ সমর্থনে ভাষণের ভেতর দিয়ে কমিউনিস্টরা তাঁদের আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে মামলাটিকে ভালোভাবে কাজে লাগান। কিন্তু যেহেতু এটি প্রায় চার বছর চলে ও জানুয়ারি ১৯৩৩-এ গুরুভার কারাদণ্ড দেওয়া হয় (যদিও আপিল আর যথেষ্ট পরিমাণে আন্তর্জাতিক বিক্ষোভের ফলে তা অনেকটা কমানো হয়), তাই সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও সক্রিয় শ্রমিকনেতারা ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকের বেশির ভাগটাই ছিলেন কারাবন্দী। গোটা জাতীয় আন্দোলনের তরফ থেকে মিরাট দণ্ডাজ্ঞাকে ধিক্কার জানানো হয়, আর ঘটনাচক্রে তার মধ্যে অন্তত আটজন ছিলেন এ আই সি সি-র সদস্য।

মিরাটের ফলে শ্রমিকদের জঙ্গীভাব কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই নুয়ে পড়েনি। ফসিট কমিটির প্রতিবেদন প্রতিকূল প্রমাণ হওয়ায় আর ওয়াডিয়ারা বড় মাপের ছাঁটাই শুরু করায় গিরণী কামগার (ইউনিয়ন) সংগঠিত করেন এক দ্বিতীয় সাধারণ ধর্মঘট। এই সময়ে (এপ্রিল-অগাস্ট ১৯২৯) তার নেতা ছিলেন দেশপান্ডে ও বি টি রণদিভে। মিলকমিটিগুলি এর আগে কখনোই এত জঙ্গী হয়ে ওঠেনি আর একটি সরকারি তদন্তে 'বিশৃঙ্খলা' ডেকে আনার জন্য দায়ী করা হয় 'তরুণ, অনভিজ্ঞ ও নিরক্ষর কর্মীদের, যারা নানান উপায়ে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করছে'। কিন্তু ধর্মঘটটিকে বোধহয় ভ্রান্তভাবে বেশিদিন চালিয়ে যাওয়া হয়। এর ব্যর্থতা জি কে ইউ-কে প্রচণ্ড দুর্বল করে দেয়। বেঙ্গল জুট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের নেতৃত্বে চটকলগুলিতে প্রথম সাধারণ ধর্মঘট হয় জুলাই-অগাস্ট ১৯২৯-এ। এই ইউনিয়ন প্রধানত কমিউনিস্টদের নিয়ন্ত্রণে

ছিল। সপ্তাহপিছু কাজের সময় ৫৪ থেকে বাড়িয়ে ৬০ ঘণ্টা করার যে-চক্রান্ত নিয়োগকর্তারা করেছিল, ধর্মঘট সেটিকে বানচাল করতে সফল হয়। ডিসেম্বর ১৯২৯-এ নাগপুর অধিবেশনে এ আই টি ইউ সি-র ওপর কমিউনিস্টদের প্রভাব আগের চেয়ে বেড়েছিল বলে মনে হয়, কারণ এন এম জোশীর নেতৃত্বে উদারনৈতিক গোষ্ঠী অধিবেশন থেকে বেরিয়ে এসে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন গঠন করেন। কিন্তু নেহরু থেকে যান ও অধিবেশনের অবশিষ্ট অংশে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৯-এ এ আই সি সি বাকর আলি মির্জা-র পরিচালনায় একটি শ্রমিক গবেষণা বিভাগ স্থাপন করে। সুভাষ বসু ও বোম্বাইতে বুলাভাই দেশাই-এর মতো কিছু কংগ্রেস-নেতা, শ্রমিকদের ওপর তাঁদের নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের অপসারণের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন—এমন কিছু লক্ষণও দেখা যায়। যেমন, জামশেদপুরের কাছে গোলমুরির টিনপ্লেট ধর্মঘটে কংগ্রেস প্রচুর আগ্রহ দেখায়। এটি ছিল বিদেশী মালিকানাধীন এক সংস্থা, আর ঘটনাক্রমে সংরক্ষণের জন্যে স্বরাজীদের আবেদন থেকে এটির লাভ হয়েছিল। সুভাষ বসু বজবজে একটি সহানুভূতিজ্ঞাপক ধর্মঘট সংগঠিত করেন, আর এমনকি রাজেন্দ্র প্রসাদও গোলমুরি পরিদর্শন করেন। কংগ্রেস ও শ্রমিকদের মধ্যে সংযুক্তির সম্ভাবনায় ব্রিটিশ বড়কর্তারা যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন, কিন্তু এই চিন্তা করে সান্ত্বনা পান যে, 'যেসব নেতা কমিউনিস্ট মতাবলম্বী তাঁদের কাছ থেকে কংগ্রেসি প্রচেষ্টা খুবই সক্রিয় বাধা পাবে আর এইসব নেতারাই এতদিন পর্যন্ত শ্রমিকদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব জাহির করেছেন বলে মনে হয়' (গোয়েন্দা-প্রধান পেট্রি-র 'নোট', ৯ অক্টোবর ১৯২৯)।

জি আই পি রেলওয়েতে কমিউনিস্টদের পরিচালনায় একটি বড় ধর্মঘট হয়েছিল ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৩০-এ, যদিও এটি শেষ অবধি ব্যর্থ হয়। কলকাতায় আইন অমান্যের ঠিক প্রাক্কালে (এপ্রিল ১৯৩০) বিকেলবেলা মাল পরিবহনের ওপর নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে একটি প্রচণ্ড সফল গাড়োয়ান ধর্মঘট পরিচালনা করেন আবদুল মোমিন নামে জনৈক তরুণ কমিউনিস্ট জঙ্গী কর্মী। ঠেলাগাড়িকে সত্যিই ব্যারিকেড হিসেবে ব্যবহারের জন্যে মোমিন একটি প্রচণ্ড কার্যকর পরিকৌশল বার করেন, যার ফলে শহরের যানবাহন অচল হয়ে পড়ে। পুলিশের সঙ্গে উগ্র সংঘর্ষ হয় আর জাতীয়তাবাদী যুবকরা সাগ্রহে যোগ দেন গাড়োয়ানদের সঙ্গে। পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সঙ্গে সঙ্গে একটি শান্তিপূর্ণ সমঝোওতায় আসার জন্যে সরকারের ওপর চাপ দেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রমিক আন্দোলন যে দ্রুত ভেঙে পড়ছিল তার যথেষ্ট লক্ষণ দেখা যায় ১৯৩০ নাগাদ। কমিউনিস্টদের দুর্বল হয়ে পড়ার কারণ শুধু দমন-পীড়নই নয় (যদিও তা ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তখনও পর্যন্ত তাঁদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়র বেশি ছিল না), বরং তাঁদের পরিকৌশলে একটি বড় পরিবর্তন। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে তাঁরা যুগপৎ ঐক্য ও সংগ্রামের নীতি অনুসরণ করেছিলেন একেবারে ১৯২৮-এর শেষ অবধি। তাঁরা কংগ্রেসের সীমাবদ্ধতাকে সমালোচনা করতেন কিন্তু তখনও পর্যন্ত একটি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যুক্ত মোর্চা তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাঙলার শ্রমিক ও কৃষক পার্টির কার্যনির্বাহী সমিতি তার ১৯২৭-২৮-এর প্রতিবেদনে প্রস্তাব করে যে, কংগ্রেসকে একমাত্র বিভিন্ন সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রেই বাধা দেওয়া উচিত, কারণ তা না-হলে 'আমাদের শত্রুরা এই দাবি করতে পারবে

যে, আমরা হলাম কংগ্রেস-বিরোধী বা এমনকি জাতীয়তা-বিরোধী, আর আমরা শুধুই শ্রমিকদের নিজস্ব দাবির ধারক'। কিন্তু ডিসেম্বর ১৯২৮-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর ষষ্ঠ কংগ্রেস এক তীব্র 'বাম' বাঁক নেয় আর প্রচণ্ড সঙ্কীর্ণতাবাদী কায়দায় ভারতীয় কমিউনিস্টরা জাতীয়তাবাদী মূলস্রোত থেকে দূরে থাকতে শুরু করেন। 'মধ্যপন্থী শক্তির ওপর আঘাত কেন্দ্রীভূত করতে হবে'—স্তালিন-এর এই অদ্ভুত নীতি অনুসরণ করে তাঁরা সবার ওপরে তুলনায়-বাম কংগ্রেসিদের আক্রমণ করেন (নেহরুকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগ থেকে বহিষ্কার করা হয় ১৯৩০-এ)। শ্রমিকদের সম্পর্কে কংগ্রেসের আগ্রহ ছিল বরাবরই এলোমেলো ও সীমিত। আর আইন অমান্য শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীপন্থী নেতৃত্ব আবার পাকাপোক্তভাবে কাণ্ডারীর ভূমিকায় ফিরে আসে ; সাধারণ ধর্মঘটকে কাজে লাগানোর কোনো ইচ্ছেই তাঁদের ছিল না। এটিকে তাঁরা প্রচণ্ড বিভেদমূলক ও বিপজ্জনক অস্ত্র বলে মনে করতেন। এ সবের ওপরে, আর্থনীতিক পরিস্থিতি শ্রমিক আন্দোলনের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে উঠেছিল। মন্দা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেকারি বাড়ে ও জিনিসপত্রের দাম পড়ে যায়। এর ফলে শ্রমিকদের দর-কষাকষির ক্ষমতা কমজোরি হয়ে পড়ে, আর কর্মরতদের অসন্তোষ খানিকটা কমে যায়।

কৃষক আন্দোলন ও বারদোলি

বিভিন্ন শ্র মি ক ও কৃ ষ ক পা র্টি তাত্ত্বিকভাবে নানারকম প্রচণ্ড র‍্যাডিকাল ও সামন্তবাদ-বিরোধী কর্মসূচির কথা বললেও, গ্রামাঞ্চলে তারা অল্পই অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল, কারণ তাদের মুষ্টিমেয় কর্মীদের পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্মের মধ্যেই ডুবে থাকতে হতো। পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জে মুসলমান-প্রধান কৃষকদের মধ্যে পার্টির বাঙলা শাখা অবশ্যই কিছু প্রভাব অর্জন করে। ভগৎ সিং-এর এইচ এস আর এ 'সর্বহারার একনায়কত্ব' সম্পর্কে কথা বলত, কিন্তু কৃষকদের ব্যাপারে অস্পষ্টই থেকে গিয়েছিল। তবুও দেশের বেশ কিছু অংশে অসন্তোষ ক্রমেই গভীর হয়ে উঠছিল, কারণ কৃষিপণ্যের মূল্য অনড় হয়ে থাকে বা ধীরে ধীরে পড়ে যায় আর রায়তওয়ারি অঞ্চলগুলিতে এসে যায় রাজস্বের পুনর্নির্ধারণের সময়।

কৃষকদের দাবিদাওয়া সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রচণ্ড গরমিল ছিল। বাঙলায় তার একটি প্রান্ত দেখা যায়। এখানে বাঙলা প্রজাস্বত্ব সংশোধনী বিল-এর ওপর আলোচনার সময়ে (অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯২৮) স্বরাজীদের সব অংশই (যতটা র‍্যাডিকাল সুভাষ বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তও ঠিক ততটাই) কৃষক ও ভাগচাষীদের স্বার্থরক্ষা করতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হন। জমিনদারদের বিরুদ্ধে রায়তদের সপক্ষে কিছু অতিরিক্ত অধিকারকে জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্যই সমর্থন জানিয়েছিলেন, কিন্তু জোতদারদের প্রভুত্ব কমানোর উদ্দেশ্যে বর্গাদারদের (ভাগচাষী) স্বত্ব-অধিকার দেওয়ার একটি সংশোধনীকে এমনকি তিনিও বিরোধিতা করেন। অগাস্ট ১৯২৬-এ পাবনায় একটি 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা'-র হিন্দু জোতদার ও মুসলমান বর্গাদারদের মধ্যে ইতোমধ্যেই সজ্ঘাত বেধেছিল। কলকাতার একটি হিন্দু কাগজ এই ঘটনাকে 'শ্রেণীযুদ্ধ' বলে ঘোষণা করে। ১৯২৮-এ কাউন্সিলের মুসলমান সদস্যরা কৃষকদের সপক্ষে দাঁড়ান (সময়ে-সময়ে খানিকটা বাগাড়ম্বর করে) যদিও অনেক মুসলমান জমিনদারই বর্গাদার ধারাটির বিরোধিতাও করেছিলেন। প্রজাস্বত্ব বিল-এর বিষয়টি প্রজা পার্টি (জুলাই ১৯২৯-এ

আক্রাম খাঁ, আবদুর রহিম ও ফজলুল হক-এর নেতৃত্বে) গঠনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিকভাবে র‍্যাডিকাল কিছু হিন্দু প্রথমদিকে এর মধ্যে ছিলেন (জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত)। কিন্তু আর সবদিক থেকে এর নেতৃত্বের সবচেয়ে বড় অংশই ছিলেন মুসলমান ও সামাজিক অবস্থানের দিক দিয়ে মুসলমান জোতদার।

খানিকটা একই ধরনের ধাঁচ দেখা দিচ্ছিল পাঞ্জাবে। এখানে শহরের হিন্দু মহাজনদের হাত থেকে কৃষিজীবীদের বাঁচানোর জন্যে ফজল-এ-হুসেনের যে-প্রয়াস, কংগ্রেস-হিন্দু মহাসভা জোট সাধারণভাবে তার বিরোধীই ছিল। ছোটুরামের সঙ্গে ফজল-এ-হুসেনের সমঝওতা আর কৃষিকেন্দ্রিক বনাম নাগরিক কর্মসূচির ওকালতি করে ইউনিয়নপন্থীরা বেশ কিছু দিনের জন্য হরিয়ানার জাঠদের সমর্থন ধরে রাখতে পেরেছিলেন, যদিও তাঁরা ছিলেন প্রধানত মুসলমান (যেমন, ১৯২৬-এ পার্টির নির্বাচিত ৩৬ জন কাউন্সিল সদস্যের মধ্যে ৩৩ জনই ছিলেন তাই)। প্রজা পার্টি ও ইউনিয়নপন্থীদের 'কৃষকপক্ষীয়' অবস্থানে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল, কার্যত দুক্ষেত্রেই কৃষক, ভাগচাষী বা কৃষিশ্রমিক জনতার চেয়ে তুলনায়-সম্পন্ন চাষীদের দিকেই ছিল তার মুখ। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা আর সীমিত সংস্কারবাদী একটি কৃষি কর্মসূচি তৈরি করার ক্ষেত্রেও ব্যর্থতা—এই দু-এর ফলে দু-প্রদেশেই কংগ্রেস মূল্যবান সম্ভাব্য সমর্থন হারাচ্ছিল। পূর্ব-পাঞ্জাবে শিখ কৃষকসম্প্রদায়ই ছিল প্রধান আর ১৯২০-র দশকের শেষে সেখানে আকালিরা পাতিয়ালার মহারাজা ভূপিন্দর সিং-এর সঙ্গে লড়াই-এ রত ছিলেন। ১৯২৩-এ নাভার শাসক রিপুদমন সিং-এর বাধ্যতামূলক সিংহাসন-ত্যাগের জন্যে প্রধানত পাতিয়ালার মহারাজাই দায়ী বলে সন্দেহ করা হয়। আকালি কর্মী সেওয়া সিং ঠিকরিওয়ালাকে ক্রমাগত পাতিয়ালায় আটকে রাখাই (বিক্ষোভের) প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সংগ্রামে দলাদলি, ও এমনকি রাজন্য-উপাদান নিয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেইসঙ্গে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার আর পূর্ব-পাঞ্জাবের রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিতে কৃষিসংস্কারের জন্যে কৃষকভিত্তিক আন্দোলন হিসেবে এক ব্যাপকতর মাত্রা অর্জন করে এই সংগ্রাম। আকালি নেতা খড়ক সিং-এর পাতিয়ালা পরিক্রমার সময়ে জুলাই ১৯২৮-এ মনসা-য় প্রতিষ্ঠিত হয় পা ঞ্জা ব রি য়া স্তি প্র জা ম ণ্ড ল। তারা যেসব দাবি করেন তার মধ্যে ছিল পাতিয়ালা যে ১৯% ভূমিরাজস্ব বাড়তি চাপিয়ে ছিল তা রদ করা আর মহারাজার জন্যে সংরক্ষিত শিকারজমির ব্যবস্থা তুলে দেওয়া (কারণ সেখানে বন্যজন্তুরা কৃষকদের সমস্যায় ফেলছিল)। অগাস্ট ১৯২৯-এ ঠিকরিওয়ালা ছাড়া পাওয়ার পর কয়েকজন আকালি ভূপিন্দর সিং-এর মিটমাটের প্রস্তাবে সাড়া দিতে শুরু করেন, আর রিয়াস্তি প্রজামণ্ডলের আরও বেশি র‍্যাডিকাল কর্মীরা মার্কসবাদের দিকে এগিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জগীর সিং জোগা ও মাস্টার হরি সিং, ভবিষ্যতের দুই পাঞ্জাবি কমিউনিস্ট কৃষক নেতা।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জায়গা বিহারেও কংগ্রেসের জমিনদারি পিছুটান ছিল শক্তিশালী, কিন্তু এখানে সাম্প্রদায়িক ও কৃষিকেন্দ্রিক শ্রেণীপার্থক্যের মধ্যে কোনো সমাপতন নেই, আর মাঝে-মাঝে মাঝারি ও খুদে জমিনদারও এবং কৃষকদের উচ্চতর স্তরকে ঐক্যবদ্ধ করে দিত নানান জাতিগত বন্ধন (যেমন ভূমিহার ব্রাহ্মণদের মধ্যে)। ১৯৪৭-এর আগে ব্রিটিশ ভারতে যেটি বৃহত্তম কিসান আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল তার মূল নিহিত ছিল ১৯২০-র দশকে স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী-র কার্যকলাপের মধ্যে। সহজানন্দ গাজীপুরের (পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ) একটি খুদে জমিনদার

পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সন্ন্যাসী হয়ে যান ১৯০৭-এ, অসহযোগের সময়ে কংগ্রেসি রাজনীতিতে সক্রিয় থাকেন এবং ১৯২৭-এ বিহ্টা-য় (পাটনা জেলা) একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই আশ্রমের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল ভূমিহারদের সামাজিক অগ্রগতি। তারপর তিনি সাংগঠনিক কাজ আরম্ভ করেন কিসানদের মধ্যে। নভেম্বর ১৯২৯-এ তিনি প্রতিষ্ঠা করেন বিহার প্রাদেশিক কিসান সভা (কংগ্রেস কাউন্সিল নেতা, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন এর প্রথম সম্পাদক)। কিন্তু প্রাথমিকভাবে খুবই নরমপন্থী ভিত্তিতে হলেও সহজানন্দ নিজে ও যে-আন্দোলনে তিনি অনুপ্রেরণা দেন—দুই-ই এই নগণ্য সূত্রপাত ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর এগিয়ে যায়।

কৃষক আন্দোলনের সপক্ষে রায়তওয়ারি অঞ্চলগুলিতে কংগ্রেসি সমর্থন আরও বেশি দ্বিধাহীন হতে পেরেছিল। তার কারণ ঃ এইসব অঞ্চলে সরকারি খাজনা বৃদ্ধি একটি ঐক্য-সৃষ্টিকারী ও সামাজিকভাবে নিরাপদ বিষয়ের জোগান দেয়। উপকূলবর্তী অন্ধ্রে ১৯২৭-এ মাদ্রাজ সরকার ১৮$\frac{৩}{৪}$% খাজনা বৃদ্ধির যে প্রস্তাব করেন তার ফলে ১৯২৮-২৯-এ একটি শক্তিশালী বিক্ষোভ গড়ে ওঠে। এই বিক্ষোভটি যে-অঞ্চলে হয় সেখানে ছিল এক বিরাট সংখ্যক ধনী ও মধ্য চাষী। পশ্চিম গোদাবরীতে টি প্রকাশম ও দান্তু নারায়ণরাজু, পূর্ব গোদাবরীতে কোন্ডা ভেঙ্কটাপ্পায়্যা ও বেন্নাটি সত্যনারায়ণ, আর গুন্টুরে উন্নাভ লক্ষ্মীনারায়ণ (*মালপল্লী* উপন্যাসের সুপরিচিত লেখক)-এর মতো নেতারা আইন অমান্যের প্রাক্কালে কংগ্রেসের জন্যে একটি শক্ত কিসান ঘাঁটি গড়ে তোলেন। পূর্ণমাত্রায় খাজনাবিরোধী অভিযানের জন্যে যথেষ্ট চাপ আগের থেকেই ছিল। অন্যান্য প্রদেশের নানান বিক্ষিপ্ত অঞ্চলেও গান্ধীপন্থী পরিবর্তন-বিরোধীরা তাঁদের অনাড়ম্বর কিন্তু অবিচল গঠনমূলক গ্রামসেবার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিভিন্ন গ্রামীণ ঘাঁটি গড়ে তুলছিলেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে বাঙলার হুগলী জেলায় প্রফুল্ল সেনের নেতৃত্বে আরামবাগ ও পূর্ব-যুক্ত প্রদেশের গোরখপুরে বাবা রাঘব দাসের কথা—কালক্রমে দুজনেই তাঁদের নিজ নিজ অঞ্চলের 'গান্ধী' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

গ্রামীণ সংগঠন ও বিক্ষোভের সুনির্দিষ্ট গান্ধীপন্থার ক্ষেত্রে প্রথম প্রকৃত লক্ষ্যভেদ হলো ১৯২৮-এ বারডোলি-র (গুজরাটের সুরাট জেলায়) সাফল্যের কাহিনী। এই তালুকে গ্রাম ছিল ১৩৭টি, জনসংখ্যা ৮৭,০০০। ১৯২২ থেকে গান্ধীপন্থী কর্মকেন্দ্রগুলি এখানে প্রচণ্ড সফল জনসেবামূলক ও সাংগঠনিক কাজে নিযুক্ত ছিল। পা টী দা র যু ব ক ম ণ্ড ল, *পাটেল বন্ধু* পত্রিকা আর সুরাটে ছাত্রাবাস পরিচালনাকারী পাটীদার আশ্রম—এই তিনের মাধ্যমে প্রতিপত্তিশালী কৃষক জমিমালিক জাতি কণবী-পাটীদাররা কুনওয়ারজী ও কল্যাণজী মেহতার মতো আঞ্চলিক নেতার অধীনে সংগঠিত হয়েছিলেন সেই ১৯০৮ থেকে। পাটীদাররা তাঁদের জমি চাষ করাতেন পরম্পরাগত ঋণদাসদের মাধ্যমে, যাঁরা ছিলেন 'কলিপরাজ' (কালো মানুষ) নামে পরিচিত দু ব লা জনগোষ্ঠীয় মানুষ ও বারডোলির জনসংখ্যার ৫০%। কলিপরাজরা ছিলেন প্রচণ্ড পেছিয়ে-থাকা ; গান্ধীর সচিব মহাদেব দেশাই তাঁর *বারডোলির কাহিনী*-তে (১৯২৯) এঁদের খুবই 'নির্দোষ ও অকপট' এবং 'আইন মান্যকারী' বলে প্রশংসা করেছেন। দক্ষিণ-গুজরাটের আনাবিল ব্রাহ্মণ ও দু ব লা দের মধ্যে মোটামুটিভাবে একই ধরনের সম্পর্ক নিয়ে তাঁর গবেষণায় আয়ান ব্রেমান যেমন দেখিয়েছেন, ঋণদাসত্ব ছিল 'এক ধরনের পরাধীন শ্রম, পৃষ্ঠপোষণের সম্পর্ক দিয়ে যা জটিল ও লঘু হয়ে যায়' (*প্যাট্রোনেজ অ্যান্ড এক্সপ্লয়টেশন,*

ক্যালিফোর্নিয়া, ১৯৭৪, পৃ. ৬৭)। কলিপরাজ বেগার শ্রমিকরা পাটীদারদের কাছ থেকে পেতেন ন্যূনতম খাদ্য ও জামা-কাপড়ের নিশ্চিতি আর পরম্পরাক্রমে কিছুটা পারস্পরিক সম্পর্ক থাকায় শোষণের বাস্তবতা খানিকটা ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। গান্ধীপন্থী সাংগঠনিক কর্মীরা কলিপরাজদের মধ্যেও সক্রিয় ছিলেন (১৯২০-র দশকের গোড়া থেকে 'কালো মানুষ'-এর বদলে তাঁরা এঁদের নতুন নাম দেন 'রাণীপরাজ'—'অরণ্যবাসী')।

সুতোর দাম পড়তে থাকা সত্ত্বেও বোম্বাই সরকার ১৯২৭-এ বারডোলিতে ২২% রাজস্ববৃদ্ধি ঘোষণা করে। এর ফলে মেহতা ভাইরা বল্লভভাই প্যাটেলকে একটি খাজনা-বন্ধ অভিযান সংগঠিত করতে রাজি করান। এই অভিযান যেমন দৃঢ়সঙ্কল্প, তেমনই শান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণ হয়। সরকার প্রচুর পরিমাণে গবাদি পশু ও জমি দখল করা সত্ত্বেও কৃষকরা দমে যান নি। সরকারি বড়কর্তারা কলিপরাজদের সহজ শর্তে জমি দেওয়ার টোপ দিলে তাঁরা মোটের ওপর তা প্রত্যাখ্যান করেন। জাতপাতের যোগ, সামাজিক বয়কট, ধর্মীয় আবেদন ও ভজন গানের প্রচণ্ড কুশলী ব্যবহার করেন প্যাটেল ও অন্যান্য আঞ্চলিক নেতারা। জনগোষ্ঠীয় নেতাদের বলা হয়, তাঁদের দেবতা সিলিয়া ও সিমালিয়া বুড়ো হয়ে গেছেন, আর তাঁদের দেখাশোনার জন্যে এখন নিযুক্ত করেছেন গান্ধীকে। আর গান্ধী কি তাঁদের মতোই নেংটি পরেন না, ও বেশি দামের মোষের দুধের চেয়ে ছাগলের দুধ খান না? (ঘনশ্যাম শাহ, 'ট্রাডিশনাল সোসাইটি অ্যান্ড পলিটিকাল মবিলাইজেশন', *কন্ট্রিবিউশন টু ইন্ডিয়ান সোসিওলজি,* ১৯৭৪)। দৈনিক *সত্যাগ্রহ পত্রিকা*-য় (সুরাট থেকে বেরোত, ১০,০০০ কপির সংস্করণ) একটি কথা বারবার বলা হয়ঃ কৃষক ও গ্রামীণ শ্রমিকরাই 'সম্পদের প্রকৃত উৎপাদক...রাষ্ট্রের দুই প্রধান স্তম্ভ'। এর সঙ্গে যোগ করা হয় গ্রামীণ শ্রেণীগত ঐক্য ও পরম্পরাগত পারস্পরিক সম্পর্কের ওপর পৌনঃপুনিক গুরুত্ব আরোপ—'সাহুকার (মহাজন) রায়তের সঙ্গে জলের মধ্যে দুধের মতো মিশে যায়। এদের আলাদা করা সম্ভব নয়' (প্যাটেলের একটি বক্তৃতা, মহাদেব দেশাই-এর বই, পৃ. ১৬৯-এ উদ্ধৃত)।

বারডোলি অচিরেই একটি জাতীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আহ্‌মেদাবাদের কর্মীরা এক আনা করে চাঁদা তুলে ১৩০০ টাকা জোগাড় করেন, আর জুলাই-এর বোম্বাই-র ব্যবসায়ীদের মধ্যস্থতা ব্যর্থ হলে তার প্রতিবাদে বোম্বাই কাউন্সিলে ভারতীয় বণিকসভার প্রতিনিধি লালজী নারায়ণজী ইস্তফা দেন। ঐ একই সময়ে বোম্বাইতে কমিউনিস্ট-পরিচালিত গিরণী কামগারদের যে-ধর্মঘট চলছিল তার থেকে নেতৃত্ব ও ভাবাদর্শের দিক দিয়ে বারডোলি আন্দোলনের অবস্থান অবশ্যই অনেক দূরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও লাট উইলসন ও ভারত-সচিব বার্কেনহেড-এর মধ্যে গোপন পত্রালাপ থেকে এই কৌতূহলজনক তথ্য বেরিয়ে আসে যে, ব্রিটিশরা অবশ্যই এই দুই আন্দোলনের মধ্যে গাঁটছড়ার ভয় পাচ্ছিল। জুলাই-এর শেষদিকে বারডোলিতে সশস্ত্র পুলিশ ও এমনকি সেনাবাহিনী পাঠানোর পরিকল্পনা হঠাৎ অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে পালটে দেওয়া হয়, আর বিচারবিভাগীয় তদন্ত ও বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত দেওয়ার ভিত্তিতে একটা রফা হয়ে যায়। 'আমার পুলিশ অধিকারীরা আমাকে জানিয়েছেন, তাঁরা এ ব্যাপারে কার্যত নিশ্চিত যে সরকার যদি বারডোলিতে কিছু করেন তাহলে কমিউনিস্টরা ঐ পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে বি বি সি আই, জি আই পি (রেলপথ) এই দু জায়গাতেই সাধারণ ধর্মঘট ডাকবে। তারা এও মনে করে যে তারা

(কমিউনিস্টরা) কর্মীদের ধর্মঘটে টেনে আনতে পারবে' (বার্কেনহেড-কে উইলসন, ৭ অগাস্ট ১৯২৮, *বার্কেনহেড কালেক্শন*)। ম্যাক্সওয়েল-ব্রুমফিল্ড তদন্ত কমিটি স্বীকার করে যে বারডোলিতে রাজস্ব নির্ধারণ (এবং সেই সূত্রে ঐ প্রদেশের অন্য অঞ্চলের নির্ধারণও) ত্রুটিপূর্ণ। বারডোলিতে রাজস্ববৃদ্ধি ১৮৭,৪৯২ টাকা থেকে কমিয়ে ৪৮,৬৪৮ টাকা করা হয়। পুরো গুজরাট ও মহারাষ্ট্র জুড়ে প্যাটেল একটি (রাজস্ব) সংশোধন-বিরোধী অভিযানের পরিকল্পনা করেন। বোম্বাই-এ একটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ভূমি লীগ সংগঠিত করা হয়। এর ফলে ১৬ জুলাই ১৯২৯-এ বোম্বাই সরকার তৎকালীন সাংবিধানিক সংস্কারের কাজ শেষ না-হওয়া অবধি রাজস্ব সংশোধন মুলতুবি রাখে। খেড়ায় ১৮৯০-এর দশকের রাজস্ব হার বজায় থাকে, কার্যত ১৯৪০-এর দশকের আগে অবধি তার আর বিশেষ হেরফের হয়নি। গুজরাটের কৃষিজ সম্পত্তিবানদের জন্যে গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদ অবশ্যই কিছু নগদ লাভ এনে দিয়েছিল।

ব্যবসায়ীদের মনোভাব

১৯২৮ ও ১৯২৯ যদি শহরের শিক্ষিত যুবক, শ্রমিক ও কৃষকদের ক্রমবর্ধমান জঙ্গিভাবের জন্যে চিহ্নিত হয়ে থাকে, ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলিও এই বছর-দুটিতে কয়েকটি ব্রিটিশ নীতি সম্পর্কে ক্রমেই আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছিল। জাপান ও ল্যাঙ্কাশায়ার-এর প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে আমদানি শুল্কের হার ১১% থেকে বাড়িয়ে ১৫% করার ব্যাপারে সুতা প্রশুল্ক বোর্ড-এর প্রস্তাব সরকার জুন ১৯২৭-এ খারিজ করে দেয়। আর এই বিষয়টি যুক্ত হয় ১ শিলিং ৬ পেন্স বিনিময় হার নিয়ে বহাল সাধারণ অভিযোগের সঙ্গে। জানুয়ারি ১৯২৮-এ বোম্বাই ভারতীয় বণিকসভা সাইমন বয়কট-এর ডাক অনুমোদন করে ; আট বছর আগে এই বণিকসভা-র নেতা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস ও লালজী নারায়ণজী অসহযোগের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিলেন। লর্ড ইন্চ্‌কেপ-এর পরিচালনাধীন ব্রিটিশ নৌ-বাণিজ্যস্বার্থের সঙ্গে ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ ও লালজী নারায়ণজী-র সিন্দিয়া স্টিম নেভিগেশন কম্পানি এক দুঃসাধ্য লড়াই-এ রত ছিল। দেশীয় কম্পানিগুলির জন্যে ভারতীয় নৌবাণিজ্য কমিটি উপকূলবর্তী নৌচলাচল সংরক্ষণের যেসব সুপারিশ করে, সরকার তা কার্যকর করতে রাজি হয় নি। এই বিষয়ে হাজী-র বিল (মার্চ, ১৯২৮) শ্বেতাঙ্গদের ও সরকারের তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়ে। কলকাতার মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও পাটের বাজারে পাকাপোক্ত ব্রিটিশ স্বার্থের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান সঙ্ঘর্ষ তা ছবির মতো ধরা পড়ে ঠাকুরদাসকে লেখা জি ডি বিড়লার চিঠিপত্র ও এডওয়ার্ড বেন্টল-এর (বার্ড কম্পানির কর্তা) ব্যক্তিগত কাগজপত্র থেকে। 'আমরা কলকাতায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ভারতীয় ব্যবসা সংগঠিত করছি এবং সবকটি সদ্যগঠিত সমিতি ভারতীয় বণিকসভার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে...এইসব ব্যাপারে ইওরোপীয়রা প্রচণ্ড ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ছে...কয়েকটি ক্ষেত্রে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক সঠিক আচরণ করছে না' (ঠাকুরদাসকে বিড়লা, ২ মে ১৯২৮)। ইম্পিরিয়াল ও বিনিময় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ব্রিটিশ আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ছিল ভারতীয় পুঁজিবাদীদের অন্যতম প্রধান অভিযোগ। বিনিময় ব্যাঙ্কগুলি যে একচেটিয়া ক্ষমতা প্রয়োগ করত, ভারতীয় ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন বিষয়ে (১৯২৯-৩০) বিরোধ-সূচক মন্তব্যে ঠাকুরদাস সেটিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন।

এসব সত্ত্বেও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মনোভাব দোলাচলগ্রস্ত ও বহুবিভক্তই রয়ে গেল।

বিশেষ করে বোম্বাই মিলমালিকদের সরকারের ওপর নির্ভরশীল করে তুলেছিল শ্রমিকদের জঙ্গীভাব। মার্চ ১৯২৯-এ বোম্বাই মিলমালিক সভায় সভাপতি হোমি মোদী-র বার্ষিক প্রতিবেদনে বিনিময় হার, প্রশুল্ক নিরাপত্তার অভাব ইত্যাদি ব্যাপার অবশ্যই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু খুবই সুনির্দিষ্টভাবে তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল 'অভূতপূর্ব সাধারণ ধর্মঘট'। 'স্বভাবতই' তিনি শিল্প বিবাদ বিল সমর্থন করেন ও ধর্নার ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা দাবি করেন—'আসলে শান্তিপূর্ণ ধর্না বলে কিছু নেই' (জাতীয়তাবাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে এই মন্তব্যটির তাৎপর্য খুবই মজার)। ল্যাঙ্কাশায়ার-এর বদলে বোম্বাই সুতিশিল্পের কাছে ক্রমেই ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিল শস্তা জাপানি জিনিসপত্র। ল্যাঙ্কাশায়ার-এর আরও পাতলা সুতিবস্ত্র বরং প্রতিযোগিতা করছিল আহ্‌মেদাবাদের সঙ্গে। ব্রিটিশের সপক্ষে জোট বাঁধার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটিও খানিকটা আর্থনীতিক দিক দিয়ে ন্যায্য কারণ জুগিয়েছিল। সবচেয়ে সফল ও উদ্যোগী ভারতীয় শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদী গোষ্ঠী টাটারাও মোটের ওপর ছিলেন খুবই রাজভক্ত। ইস্পাতের মতো একটি শিল্প প্রচণ্ডভাবে সরকারি কাজের ঠিকা ও পৃষ্ঠপোষণের ওপর নির্ভরশীল ছিল। আর যা-ই হোক না কেন, ১৯২৪-এ তারা প্রশুল্ক সংরক্ষণ পেয়েছিল। ১৯২৯-এ গিরণী কামগার-এর তৈরি কার্যত 'লাল আতঙ্ক'র পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্টভাবে পুঁজিবাদী একটি সংগঠন পত্তনের চেষ্টা করেন দোরাবজী টাটা, কাওয়াসজী জেহাঙ্গীর ও ইব্রাহিম রহিমতুল্লা। এই সংগঠনটি ছিল কংগ্রেসের থেকে আলাদা আর 'বিশৃঙ্খলার লাল নেতাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর' জন্যে এটি খোলাখুলিভাবে ইউরোপীয় নিয়োগকর্তাদের সঙ্গে জোট বাঁধে (ঠাকুরদাসকে লেখা টাটা কম্পানির এন এন মজুমদারের চিঠি, ২২ মে ১৯২৯)। এইচ পি মোদী, নেস ওয়াডিয়া ও এম আর জয়কর (উদারপন্থী আইনবিদ, পুঁজিপতিদের সঙ্গে তাঁর প্রভূত যোগাযোগ ছিল)-ও বোম্বাই-এর একটি মারাঠি কাগজে অর্থ বিনিয়োগের ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেন যাতে 'পুঁজি ও শ্রমিকদের মধ্যে আরও ভালো বোঝাপড়ার পরিবেশ তৈরি করা যায়' (জয়কর-কে লালজী নারায়ণজী, ১৮ অক্টোবর ১৯২৯, *জয়কর পেপারস্*)। ছমাস আগে বোম্বাই-এর লাটও একইরকম ভেবেছিলেন। 'অনুকূল প্রকৃতির পুঁজিবাদীদের একটি ভালো 'ডেলি মিরর' প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসাহ দিন'। (আরউইন-কে সাইক্স্, ২২ মে ১৯২৯, *সাইক্স্ কালেক্শন*)

বিড়লা একটা আলাদা রণনীতি অবলম্বন করেন, তা ছিল আরও 'জাতীয়তাবাদী' ও নিঃসন্দেহে অনেক বেশি সূক্ষ্ম ও সুদূরদর্শী। ল্যাঙ্কাশায়ার-এর আমদানি পড়ে যাওয়ার ফলে মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আরও বেশি মুৎসুদ্দি অংশের ক্ষতি হচ্ছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু করার জন্যে কলকাতার মারোয়াড়ি সভা-র (এই সংস্থাটি নিজ ঘোষণা মতোই 'থানকাপড় ও সুতোর কারবারে খুব বেশি আগ্রহী' ছিল) প্রস্তাবকে অগাস্ট ১৯২৮-এ বিড়লার ভারতীয় বণিকসভা বাতিল করে দেয়। আলাদা একটি পুঁজিবাদী পার্টি তৈরির জন্যে টাটার যে ভাবনা, বিড়লা তাকে সমর্থন করেন নি। বরং ১৯২৯-এ মালবীয় (টাটা যাঁকে ১৯২৬-এর নির্বাচনে সমর্থন করেছিলেন) ও মোতিলালের মধ্যে মধ্যস্থতা করে তিনি কাউন্সিলে স্বরাজীদের শক্তিশালী করার চেষ্টা করছিলেন। টাটার প্রস্তাবকে বিড়লা ও ঠাকুরদাস দুজনেই তীব্রভাবে বিরোধিতা করেন। 'কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ সংগ্রাম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি পুরোপুরি পুঁজিবাদী সংগঠন যে শেষ সংস্থা হবে, সে ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহই

নেই। আমরা পুঁজিবাদীরা যা করতে পারি ... তা হলো ... যাঁরা সাংবিধানিক উপায়ে বর্তমান সরকারের পরিবর্তে একটি জাতীয় সরকার গড়তে চান তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা করা' (ঠাকুরদাসকে বিড়লা, ৩০ জুলাই ১৯২৯)। তাহলেও, পুঁজিবাদীদের মধ্যে বিভেদকে অতিরঞ্জিত বা অতিসরলীকরণ করা একেবারেই উচিত নয়। মে ১৯২৯-এ বিড়লার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথাবার্তার পর বেন্টল এই আশাপ্রকাশ করেন যে 'একবার বাজারে নিজেদের অবস্থান তৈরি করে নেওয়ার পর আমরা হয়তো দেখব, তিনি [বিড়লা] ভবিষ্যতে কম আক্রমণাত্মক কলাকৌশল অবলম্বন করছেন' (*বেন্টল ডাইরি,* ১৫ মে ১৯২৯-এর লেখা)। টাটার প্রস্তাব খারিজ করে এন এন মজুমদারকে লেখা ঠাকুরদাসের চিঠিটির (৭ জুন ১৯২৯) আসল সুর আরও খুঁটিয়ে দেখাটা লাভজনক : 'আমরা আগে ভারতীয়, পরে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি—এই ব্যাপারটি ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের কাছে পরিষ্কার না-করে তাদের সঙ্গে হাত মেলানোর' প্রচেষ্টার পরিবর্তে ঠাকুরদাস জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সংযোগ বজায় রাখার উপর জোর দেন। কিন্তু তাঁর পরের বাক্যটিই হলো : 'একটু পরে এবং আজকের চেয়ে আরও নিশ্চিত জমিতে দাঁড়িয়ে [তাদের সঙ্গে] হাত মেলানো যে আরও ভালো এ-বিষয়ে আমি দৃঢ়প্রত্যয়'।

ডোমিনিয়ন মর্যাদা থেকে পূর্ণ স্বরাজ

আরও একদফা সর্বভারতীয় গণসংগ্রামের ক্রমবর্ধমান চাপের ক্ষেত্রে পুরো ১৯২৮ ও ১৯২৯ জুড়ে গান্ধী কাজ করেন বল্গার মতো, আর এবারে এই সংগ্রামের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ। মাদ্রাজ কংগ্রেসে (১৯২৭) গান্ধীর অনুপস্থিতিতে স্বরাজের ব্যাপারে জওহরলালের যে প্রস্তাব হঠাৎ পাশ হয় তাতে গান্ধী প্রবল অসম্মতি জানান আর পরের বছর কলকাতায় একটি আপস সূত্র মানিয়ে নিতে সমর্থ হন। এই সূত্রে নে হ রু প্র তি বে দ নে উল্লিখিত ডোমিনিয়ন মর্যাদার লক্ষ্য মেনে নেওয়া হয়—যদি ব্রিটিশরা ১৯২৯-এর শেষদিকে তা মঞ্জুর করে, আর তা না-হলে কংগ্রেসের পক্ষে আইন অমান্য ও পূর্ণ স্বরাজের দিকে এগোনোয় কোনো বাধা থাকবে না। অবিলম্বে আবার পূর্ণ স্বরাজের লক্ষ্যের ডাক দেওয়ার জন্যে যে সংশোধনী প্রস্তাব সুভাষ বসু আনেন, সেটিকে সমর্থন জানান জওহরলাল, তামিলনাড়ুর সত্যমূর্তি, বাঙলার প্রচুর সংখ্যক প্রতিনিধি আর বোম্বাই-এর কমিউনিস্ট নিম্বকর ও জোগলেকর। কিন্তু প্রস্তাবটি বিপক্ষে ১৩৫০ পক্ষে ৯৭৩ ভোটে হেরে যায়। গ্রামে গঠনমূলক কাজ, মদ্যপান নিবারণ ও ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জন আর তার সঙ্গে বারডোলির পথ অনুসরণ করে 'নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রতিকার—১৯২৯-এ কংগ্রেস কার্যকলাপকে গান্ধী এইসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন। বিদেশী কাপড়ের গণ-বহ্ন্যুৎসবকে তিনি উৎসাহ দেন (এর জন্যে তিনি কলকাতায় মার্চে গ্রেপ্তার হন ও তাঁকে নামমাত্র অর্থদণ্ড দেওয়া হয়)। খাদির তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি দেশের মধ্যে পরিক্রমা করেন, কিন্তু কোনোরকম সর্বাত্মক সংগ্রামের চাপ বারবার খারিজ করে দেন।

১৯২৮-২৯-এ গান্ধীর রাশ-টানা অবশ্যই বুর্জোয়া দ্বিধা ও অস্পষ্টতার সঙ্গে মিলে যায়। তাহলেও এর মূল বোধহয় এই কারণের মধ্যেই নিহিত যে, এই বছরগুলিতে সেইসব অঞ্চল ও গোষ্ঠীই প্রধান হয়ে উঠছিল (বাঙলা, পাঞ্জাব ও বোম্বাই-এর শহুরে শিক্ষিত যুবক, আর বোম্বাই ও কলকাতার শিল্পশ্রমিক) যাদের ওপর তাঁর প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সবচেয়ে কম।

জুলাই ১৯২৯-এ তিনি সাদাসাপ্টা বলে দেন : 'যেসব মানুষ আমার শর্তে অসহযোগে নামতে তৈরি আছে তাদের কীভাবে নেতৃত্ব দিতে হয় তা আমি ভালোভাবেই জানি। দিগন্তে তেমন কোনো লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি না'। কংগ্রেস সংগঠনের অবস্থাও ছিল এই (ন্যায্য) দ্বিধার অন্যতম কারণ : মে ১৯২৯-এ সদস্যসংখ্যা নেমে এসেছিল মাত্র ৫৬,০০০-এ। জওহরলালের পরিচালনায় একটি উদ্যোগী প্রচেষ্টার ফলে ছ মাস পরে সদস্যসংখ্যা পাঁচ লক্ষে এসে দাঁড়ালেও তখনও পর্যন্ত বেশির ভাগ প্রদেশই সদস্য ও তহবিলের বরাদ্দ পূরণ করতে পারে নি। বেশির ভাগ পি সি সি সদস্যের বিরোধিতার মুখে পড়ে (১০ জন চেয়েছিলেন গান্ধীকে, ৫ জন বল্লভভাইকে ও মাত্র ৩ জন নেহরুকে) নিজের যথেষ্ট অনিচ্ছা সত্ত্বেও গান্ধী আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনে জওহরলালকে সভাপতি করার ওপর জোর দেন। আর এই ব্যাপারটি থেকে বিভেদমূলক ও বিদ্রোহী ধাঁচের বিভিন্ন সম্ভাব্য শক্তির ওপর গান্ধীর নিজের আধিপত্য বিস্তারের চূড়ান্ত পারঙ্গমতা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। জওহরলাল, গান্ধী বলেন, 'নিঃসন্দেহে প্রান্তবাদী, নিজের চারপাশের চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে ভাবছে। কিন্তু গতিবেগ যাতে জোর করে একেবারে ভেঙে পড়ার দিকে না-যেতে পারে—এ-ব্যাপারে সে যথেষ্ট বিনয়ী ও ব্যবহারবুদ্ধি-সম্পন্ন ... বাষ্প তখনই পরাক্রান্ত শক্তি হয়ে ওঠে যখন সেটি নিজেকে বন্দী হতে দিতে রাজি হয় ... এইরকম ব্যাপার হবে যদি আমাদের দেশের যুবকেরা স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁদের অফুরন্ত উদ্যমকে বন্দী ও নিয়ন্ত্রিত হতে দিতে রাজি হন এবং কঠোরভাবে মাপা ও প্রয়োজনীয় পরিমাণে সেই উদ্যমকে অর্গলমুক্ত হতে দেন।' (*ইয়ং ইণ্ডিয়া*, সেপ্টেম্বর ১৯২৯)

ঘটনাপ্রবাহ যে মোকাবিলার পথে এগিয়ে চলছিল জওহরলালকে বেছে নেওয়া ছিল তখনও পর্যন্ত তারই এক লক্ষণ, বিশেষত কলকাতা কংগ্রেসের একবছরের নিষ্পত্তিসীমা শেষ হয়ে আসছিল। ৩১ অক্টোবর ১৯২৯-এর 'আরউইন প্রস্তাবে' পরিস্থিতি কিছুদিনের জন্য ঘোরালো হয়ে যায়। ঐ 'প্রস্তাবে' বড়লাট ঘোষণা করেন যে, ডোমিনিয়ন মর্যাদা ভারতের সাংবিধানিক অগ্রগতির 'স্বাভাবিক পরিণতি' আর সাইমন প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর একটি গোল টেবিল বৈঠকের প্রতিশ্রুতি তিনি দেন। সাইমন বয়কটের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে ডিসেম্বর ১৯২৮ থেকেই বড়লাট গোপনে উপরোধ করছিলেন যে, এই ধরনের একটি চাল দেওয়া দরকার। নতুন লেবর সরকার (জুন ১৯২৯) তাঁর প্রচেষ্টায় সম্মতি জানায়, কিন্তু টোরি ও লিবারেলদের বেশির ভাগই এটিকে আদৌ পছন্দ করে নি। প্রস্তাবের পর সংসদের নিম্নকক্ষের একটি বিতর্কে তাঁরা সেকথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। ফলে পুরো প্রচেষ্টাটির বিশ্বাসযোগ্যতা যথেষ্ট কমে যায়। ২ নভেম্বর গান্ধী, মোতিলাল ও মালবীয় ঐ প্রস্তাব মেনে নেওয়ার সপক্ষে লিবারেলদের সঙ্গে যোগ দেন, কিন্তু চারটি শর্তসাপেক্ষে। শর্তগুলি হলো : গোল টেবিল বৈঠকে ডোমিনিয়ন মর্যাদা নিয়ে আনুপূর্বিক আলোচনা করতে হবে, যে-মূলনীতিকে ব্রিটিশরা সঙ্গে সঙ্গেই মেনে নেবে সেটিকে নিয়ে নয় ; বৈঠকে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে ; আর বন্দীমুক্ত ও একটি সাধারণ সমঝওতার নীতি কার্যকর করতে হবে। সুভাষ এই 'দিল্লী বিবৃতি'তে সই করতে অস্বীকার করেন। নেহরু সই করেন, কিন্তু অচিরেই তাঁর মনে গভীর সন্দেহ জাগে, আর পদত্যাগ করতে চান। অবশ্য ২৩ নভেম্বর গান্ধীর সঙ্গে আরউইন-এর বৈঠকে সমস্ত আলোচনা ভেঙে যায়, কারণ কংগ্রেসের শর্তগুলিকে বড়লাট সরাসরি খারিজ করে দেন।

জওহরলাল তাঁর উদ্দীপনাময় সভাপতির অভিভাষণগুলির প্রথমটি লাহোর কংগ্রেসে (ডিসেম্বর ১৯২৯) দিয়ে সেটিকে গৌরবমণ্ডিত করেন। ঐ অভিভাষণে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তিনি দৃঢ়ভাবে তুলে ধরেন একটি রূপরেখা যার পরিপ্রেক্ষিত ছিল অভিনব আন্তর্জাতিকতাবাদী ও সামাজিকভাবে র‍্যাডিকাল—এতদিন অবধি যা ছোটো ছোটো বামপন্থী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 'আমি নিশ্চয়ই খোলাখুলি স্বীকার করব যে, আমি একজন সমাজবাদী ও সাধারণতন্ত্রী। রাজা-রাজড়া অথবা যে-ব্যবস্থা আধুনিক শিল্পরাজ তৈরি করে তাতে আমি বিশ্বাসী নই...' জমিনদার-চাষী আর পুঁজিপতি-শ্রমিক সঙ্ঘর্ষে গান্ধীর প্রিয় সমাধান 'অছিতত্ত্ব'কে জওহরলাল আক্রমণ করেন ঃ 'অনেক ইংরেজ সত্যিই নিজেদের ভারতের অছি বলে মনে করেন, তা হলেও আমাদের দেশকে তাঁরা কী অবস্থায় নামিয়ে এনেছেন!' তবুও কার্যবিবরণীর আনুপুঙ্খিক বিবরণ থেকে দেখা যায় গান্ধী দৃঢ়ভাবে কর্তৃত্বে আসীন। এখুনি 'খাজনা দেওয়া বন্ধ করা', 'যেখানে এবং যখন সম্ভব সাধারণ ধর্মঘট' ও 'পাল্টা সরকার'—সুভাষের এই বিকল্প প্রস্তাবগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়। আরউইন-এর ট্রেনে বোমা-আক্রমণকে ধিক্কার জানিয়ে একটি প্রস্তাবের জন্যে গান্ধী জিদ ধরেন (৯৪২-৭৯৪—এই নিতান্ত ক্ষীণ সংখ্যাধিক্যে এটি গৃহীত হয়) আর প্রতিনিধিদের হয় 'পুরোপুরি' মেনে নিতে হবে, নইলে খারিজ করতে হবে—এই যুক্তিতে তিনি মূল প্রস্তাবটিকেও গ্রহণ করিয়ে নেন। ঐ প্রস্তাবে আরউইন-এর সম্পর্কে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ উল্লেখ থাকে, সেইসঙ্গে আরউইন প্রস্তাব সম্পর্কে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রাথমিক অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয় ও ভবিষ্যৎ আলাপ-আলোচনার দরজা পুরো বন্ধ করতে অস্বীকার করা হয়। আইন অমান্য আন্দোলন, যার পরিণতি হবে সাধারণ ধর্মঘট—যদিও নেহরু ও সেইসঙ্গে সুভাষ এইরকম একটি মানসচিত্র দেখেছিলেন, তাহলেও কর্মসূচির ভার পুরোপুরি এ আই সি সি অর্থাৎ কার্যত গান্ধীর হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ-বিষয়ে জোর দিতে হবে যে, পৃথিবীর বৃহত্তম উপনিবেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন অবশ্যই একটি নতুন র‍্যাডিকাল পর্যায়ে প্রবেশ করেছিল, যখন নববর্ষের প্রাক্কালে মধ্যরাত্রিতে কংগ্রেস অবশেষে পূর্ণ স্বরাজের অঙ্গীকার গ্রহণ করে এবং শুধুই 'বন্দে মাতরম্' নয়, সেইসঙ্গে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' ধ্বনির মধ্য দিয়ে জাতীয় তেরঙ্গা পতাকা মোচন করা হয়।

১৯৩০-১৯৩১ ঃ আইন অমান্য

লবণ সত্যাগ্রহের অভিমুখে

লাহোর কংগ্রেসের পর একটি দুমাসব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার পর্ব আসে, আর পূর্ণ স্বরাজ অর্জনের উদ্দেশ্যে গান্ধী অহিংস সংগ্রামের কী সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি স্থির করবেন তার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে দেশ ও সরকার। ২৬ জানুয়ারি সারা দেশ জুড়ে অসংখ্য সভায় স্বাধীনতার শপথ নেওয়া হয়। 'ভারতকে আর্থিক , রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিকভাবে ধ্বংস করার জন্য' ব্রিটিশদের এই শপথে ধিক্কার জানানো হয়। তাছাড়াও ঘোষণা করা হয় যে, এই ধরনের শাসকের কাছে

আর নতিস্বীকার করা 'মানুষ ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ' এবং 'আইন অমান্য ও সেইসঙ্গে কর বন্ধ করা'র প্রস্তুতির জন্যে ডাক দেওয়া হয়। কংগ্রেসি বিধায়কদের ৬ জানুয়ারি পদত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হয়। এই নির্দেশ মোটামুটি মানা হয়েছিল, কিন্তু সর্বাত্মকভাবে নয়। প্রতিবাদীদের মধ্যে ছিলেন এন সি কেলকর, সত্যমূর্তি, আর আনসারি-র মতো মুসলিম কংগ্রেস নেতারা (নে হ রু প্র তি বে দ ন নিয়ে আলাপ-আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই এই নেতারা কোনোরকম সাম্প্রদায়িক চুক্তি ছাড়াই আরও এক দফা জাতীয় সংগ্রামের ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন)। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে বোম্বাই ও নাগপুরকে ভিত্তি করে কমিউনিস্ট-পরিচালিত শক্তিশালী জি আই পি রেলপথ ধর্মঘটকে ফেব্রুয়ারি ১৯৩০-এ হেরে যেতে দেওয়া হয়। ৩১ জানুয়ারি আরউইন-এর কাছে গান্ধীর ১১ দফা হুঁশিয়ারি অনেকের কাছেই পূর্ণ স্বারজ থেকে দুঃখজনকভাবে পিছু-হঠা বলে মনে হয়, কারণ রাজনৈতিক কাঠামোয় কোনোরকম পরিবর্তনের দাবি করা হয় নি, এমনকি ডোমিনিয়ন মর্যাদাও নয়। নুনকে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়াও প্রথমদিকে খানিকটা উৎকেন্দ্রিক বলে মনে হয়েছিল। নেহরু পরে তাঁর প্রাথমিক বিমূঢ়তার কথা স্মরণ করেছেন (*অ্যান অটোবায়গ্রাফি*, পৃ. ২১০)। ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০-এ আরউইন হৃষ্টচিত্তে ভারত-সচিব ওয়েজউড-বেন-কে জানান, 'লবণ অভিযানের সম্ভাবনা এখন আমার রাতের ঘুম কেড়ে নেয় না'।

অচিরেই বিভিন্ন ঘটনায় সন্দেহবাদীরা ভুল ও গান্ধী অন্তত আংশিকভাবে ঠিক বলে প্রমাণ হন। ১১ দফা হুঁশিয়ারি যদি পিছুহঠা হয়ে থাকে, তাহলেও সেগুলি কিন্তু জাতীয় দাবিকে মূর্ত ও কিছু নির্দিষ্ট অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। আরউইন-কে লেখা চিঠি সাধারণ স্বার্থের বিভিন্ন বিষয়ের (সামরিক ব্যয় ও আমলাদের বেতন খাতে ৫০% হ্রাস, মাদকের ওপর পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, গোয়েন্দা বিভাগের সংস্কার, আর আগ্নেয়াস্ত্রের অনুমতিপত্র দেওয়ার ব্যাপারে সর্বজনীন নিয়ন্ত্রণ অনুমোদন করে অস্ত্র আইনের পরিবর্তন) সঙ্গে যোগ করেছিল তিনটি সুনির্দিষ্ট বুর্জোয়া দাবি (টাকা-স্টার্লিং বিনিময় হারকে ১ শি. ৪ পে.-এ নামিয়ে আনা, সুতি কাপড়ের (দাম) সংরক্ষণ ও উপকূলবর্তী নৌ-বাণিজ্যকে একান্তভাবে ভারতীয়দের জন্যে রাখা) আর দুটি মূলত কৃষকদের বিষয়—ভূমি-রাজস্বের ৫০% হ্রাস ও নুনের উপর কর ও সে-ক্ষেত্রে সরকারি একচেটিয়া অধিকার বিলোপ। এটি কৌতূহলজনক ও তাৎপর্যপূর্ণ যে জানুয়ারি ১৯৩০-এ একটি নৌ-বাণিজ্য সম্মিলন ব্রিটিশ নৌ-স্বার্থ আর ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ ও লালজী নারায়ণজীর সিন্ধিয়া স্টিম নেভিগেশন-এর মধ্যে বিবাদ মেটাতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর মার্চ ১৯৩০-এ বোম্বাই মিলমালিক সভার বার্ষিক প্রতিবেদনে ঘোষণা করা হয় যে, ব্রিটিশ ও জাপানি প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে সংরক্ষণ 'শিল্পের পক্ষে জীবন-মরণের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে'। মার্চ ১৯৩০-এ ব্রিটিশ ও অ-ব্রিটিশ থান-কাপড় আমদানির ওপর যথাক্রমে ১৫% ও ২০% শুল্ক বাড়িয়ে সরকার খানিকটা সাফল্যের সঙ্গে বোম্বাই সুতিশিল্প-প্রধানদের আলাদা করতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিশেষ সাম্রাজ্যিক সুবিধা-র নিহিত সুরটিতে বোম্বাই-এর বাইরের বেশির ভাগ ভারতীয় ব্যবসায়ী-প্রধানই প্রচণ্ড আপত্তি জানান। 'বোম্বাই তার স্নায়ুকেন্দ্র হারিয়েছে'—এই বলে ব্যবস্থাপক সভায় বিল-এর বিরুদ্ধে কক্ষত্যাগে যোগ দেন বিড়লা। তিনি মিলমালিকদের সতর্ক করে বলেন, যদি জাপানকে বিশেষ সাম্রাজ্যিক সুবিধা-র

মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয় তাহলে 'ভবিষ্যতে কোনো সংরক্ষণ চাওয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা পাথরের দেওয়ালে মাথা ঠুকবেন' (জি ডি বিড়লা, *দি পাথ অফ প্রসপারিটি*, পৃ. ১৯৩)। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০-এ এফ আই সি সি আই-এর বার্ষিক অধিবেশনে ১ শি. ৬ পে. বিনিময়-হারকে ধিক্কার জানিয়ে ঠাকুরদাস একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করান। ঐ একই সভার সভাপতি হিসেবে বিড়লা ভারতীয় অর্থনীতির ওপর ব্রিটিশ পুঁজির ফাঁসকে তীব্র আক্রমণ করেন। সরকারের রাজকোষ-ঘটিত নীতিকে তিনি আক্রমণ করেন প্রভেদমূলক সংরক্ষণের বদলে 'প্রভেদমূলক অবাধ বাণিজ্য' বলে। ৫ মার্চ ভারতীয় বণিকসভার এক বিশেষ সম্মিলনে বিড়লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডি পি খৈতান ঘোষণা করেন, '...অবশেষে এতদিন পরে আমাদের মনে এই রূঢ় বাস্তবের উপলব্ধি হয়েছে যে, ভারত যদি স্বরাজ অর্জন করতে না পারে তাহলে তার আর্থনীতিক অবস্থার উন্নতি হওয়া কঠিন।'

৫ ফেব্রুয়ারি রায় বেরিলীতে এক কিসান জমায়েতে জওহরলাল জমিনদার-বিরোধী খাজনা-বন্ধ প্রচারের এক র‍্যাডিকাল প্রস্তাব দেন। আর সেই সঙ্গে বলেন, 'আমার মতে জমিনদার সম্প্রদায় বাহুল্য মাত্র'। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, কৃষকদের ক্ষেত্রে জওহরলালের এই প্রস্তাবে সময় দেওয়ার প্রায় কোন ইচ্ছেই গান্ধীর ছিল না। ২৬ ফেব্রুয়ারি যুক্ত প্রদেশের পি সি সি-র সভায় ভূমির ক্ষেত্রে মধ্যবর্তীদের বিলোপ করার আহ্বান জানিয়ে জওহরলালের প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গেই শিকেয় তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি ১৯৩০-এ গান্ধীর বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধে কৃষকদের দুর্দশার ব্যাপারে অবশ্যই জোর দেওয়া হয়েছিল, আর স্বরাজের আদর্শের সঙ্গে গ্রামের গরিবদের সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন অভিযোগকে আচম্বিতে যুক্ত করে দিয়েছিল নুন (আর, খাজনা-বন্ধের মতো এটির কোন সামাজিকভাবে ভেদমূলক তাৎপর্য ছিল না)। খাদির মতো নুনও কৃষকদের আত্মসহায়ের মাধ্যমে অল্প কিন্তু মানসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বাড়তি রোজগারের সুযোগ এনে দিয়েছিল, ও—আবার খাদির মতোই—এটি জনগণের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে শহরের অনুগামীদের প্রতীকী একাত্মতার সম্ভাবনা এনে দেয়। 'নুনের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আপনি একটি চমৎকার রণনীতি তৈরি করেছেন'—ফেব্রুয়ারি ১৯৩১-এ গান্ধীর কাছে স্বীকার করেছিলেন আরউইন।

গান্ধীর ডান্ডী অভিযান (১২ মার্চ - ৬ এপ্রিল) শুরু হয় সাবরমতী থেকে গুজরাটের ভেতর দিয়ে সমুদ্রের দিকে। সারা ভারত থেকে ৭১ জন আশ্রমবাসীকে নেওয়া হয়েছিল। গোটা দেশ জুড়ে, এমনকি বিশ্বব্যাপী প্রচণ্ড প্রচারদৃষ্টি আকর্ষণ করে এই অভিযান। ১১ মার্চ ডান্ডী-তে নিজে আইন অমান্য করার পর গান্ধী ঘোষণা করেন যে, পাইকারিভাবে নুনের বেআইনি উৎপাদন ও নিলাম শুরু হওয়া উচিত। আর সেই সঙ্গে বিদশী কাপড় ও মদ বর্জন যুক্ত হতে পারে। তাঁর গ্রেপ্তারের পর অহিংসা ও সত্যের প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষে এই ব্যাপারে 'প্রত্যেকের নিজস্ব স্বাধীনতা থাকবে', যদিও আঞ্চলিক নেতাদের মান্য করা উচিত। নিচের থেকে যে চাপ ছিল তা ছবির মতো ধরা পড়ে একেবারে শুরু থেকেই, যখন গান্ধীর পুরো যাত্রাপথ জুড়ে গ্রামের কর্মচারীরা পদত্যাগ করতে শুরু করেন, আর ১৯ মার্চ রাস-এর পাটীদাররা (খেড়া জেলার বোরসাড তালুকে) অবিলম্বে রাজস্ব-বন্ধ শুরু করার অনুমতি দাবি করেন—যথেষ্ট অনিচ্ছা সহকারে গান্ধী তা মেনে নেন। মে-র মাঝামাঝি গান্ধী গ্রেপ্তার হওয়ার পর কার্যনির্বাহী

কমিটি এই ব্যবস্থাগুলি অনুমোদন করেন : 'যেসব প্রদেশে রায়তওয়ারি ব্যবস্থা বজায়' আছে সেখানে রাজস্ব-বন্ধ, জমিনদারি প্রদেশগুলিতে চৌকিদারি কর-বন্ধ প্রচার (যথেষ্ট তাৎপর্যের ব্যাপার হলো : খাজনা-বন্ধ নয়) ও কেন্দ্রীয় প্রদেশে অরণ্য-আইন লঙ্ঘন।

চট্টগ্রাম, পেশোয়ার, শোলাপুর

এপ্রিলের শেষ অবধি ব্রিটিশদের প্রতিক্রিয়া ছিল যথেষ্ট নরম। যদিও প্যাটেল ও জওহরলালকে যথাক্রমে ৬ মার্চ ও ১৪ এপ্রিল গ্রেপ্তার করা হয়, আর করাচী, কলকাতা ও মাদ্রাজে পুলিশ ও জনতার মধ্যে রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষ ঘটে। চট্টগ্রাম, পেশোয়ার ও শোলাপুরে তিনটি বড়সড় বিস্ফোরণে পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে পালটে যায়। এর প্রত্যেকটিই ছিল গান্ধীপন্থী আইন অমান্য সীমার বাইরে বা তাকে অতিক্রম করে। গোটা সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসের নিরিখে ১৮ এপ্রিল সবচেয়ে চমকপ্রদভাবে অন্তর্ঘাত করেন সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিপ্লবীদের চট্টগ্রাম গোষ্ঠী। তাঁরা আঞ্চলিক অস্ত্রাগার দখল করে নেন, 'ভারতীয় সাধারণতন্ত্রী বাহিনী'-র নামে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারি করেন, আর ২২ এপ্রিল বীরত্বপূর্ণ খণ্ডযুদ্ধ করেন জালালাবাদ পাহাড়ে, যার ফলে ১২ জন বিপ্লবী নিহত হন। যদিও বিপ্লবীদের পদ্ধতি ছিল নিঃসন্দেহে গান্ধীর থেকে অনেক দূরে, তাহলেও অস্ত্রাগার দখলকে তাঁরা অভিনন্দিত করেন 'গান্ধীজীর রাজ এসে গেছে!' এই ধ্বনি দিয়ে। চট্টগ্রাম বাঙলায় প্রচণ্ড তীব্র সন্ত্রাসবাদী ঢেউ-এর সূচনা বলে প্রমাণ হয়। এর পরেই ১৯৩০-এ কম করেও ৫৬ টি ঘটনার খবর পাওয়া যায় (তুলনায় ১৯১৯-২৯-এর গোটা দশক জুড়ে এই সংখ্যা ছিল ৪৭)। এইসব ঘটনার মধ্যে ছিল ৮ ডিসেম্বর কলকাতায় মহাকরণে সরকারের সদর দফতরে এক চমকপ্রদ অভিযান। পাঞ্জাবেও এইচ এস আর এ প্রচণ্ড সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, এখান থেকে ১৯৩০-এ ২৬ টি ঘটনার খবর পাওয়া যায়।

বরাবরই অস্থির উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারে জনগণের অভ্যুত্থান বোধহয় ব্রিটিশের দিক থেকে ছিল আরও বেশি আতঙ্কজনক। পেশোয়ারের কাছে উতমানজাই-এর এক সমৃদ্ধিশালী মোড়লের ছেলে আবদুল গফ্ফর খান ১৯১২ থেকে তাঁর স্বদেশবাসী পাঠানদের মধ্যে শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের কাজ শুরু করেছিলেন। দেওবন্দ মুসলিম জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী, খিলাফত আন্দোলন ও আমীর আমানুল্লার (আফগানিস্তানের বাদশা, যিনি তাঁর প্রগতিশীল ও সোভিয়েতপন্থীয় নীতির জন্যে ১৯২৮-এ উৎখাত হন) আধুনিক ধাঁচের সংস্কার থেকে গফ্ফর খান একের-পর-এক অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে তিনি 'বাদশা খান' নামে পরিচিত হতে শুরু করেন। তিনি প্রথম পুশ্‌তু রাজনৈতিক মাসিক পত্রিকা *পাখতুন* বার করতে আরম্ভ করেন মে ১৯২৮-এ, আর খুদা-এ-খিদমতগার নামে পরের বছর একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন। এই বাহিনীর সদস্যরা লাল রঙের কুর্তা পরতেন, কারণ গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময়ে তা কম ময়লা হতো। ১৯২৯ নাগাদ গফ্ফর খান গান্ধীর একনিষ্ঠ শিষ্যে পরিণত হন। অহিংসার ইষ্টনীতি পাঠানদের মধ্যে পরম্পরাগত রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষ এড়াতে সাহায্য করে, আর অন্যত্র সেটি অভ্যন্তরীণ সামাজিক টানাপোড়েনের রাশ টেনে ধরে (কারণ খুদা-এ-খিদমতগারদের মধ্যে ছিলেন ছোটো ও মাঝারি ভূস্বামী, রায়ত, আর গরিব চাষী ও খেতমজুর)। পাঠানদের এক বিশাল বাহিনী

নিয়ে গফ্‌ফর খান লাহোর কংগ্রেসে যোগ দেন ; তারপর ছমাসের মধ্যে খুদা-এ-খিদমতগারদের সদস্যসংখ্যা ৫০০ থেকে লাফিয়ে ৫০,০০০-এ পৌঁছে যায়। ৫ মে ১৯৩০-এর একটি সরকারি সংবাদে এও বলা হয় যে, নওজওয়ান ভারত সভা-র একটি আঞ্চলিক শাখা পেশোয়ারের আশপাশের নানা গ্রামে কমিউনিস্ট ধাঁচের কাজকর্ম চালাচ্ছে। ২৩ এপ্রিল বাদশা খান ও বেশ কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার ফলে পেশোয়ারে এক বিশাল অভ্যুত্থান ঘটে। জনতা সাঁজোয়া গাড়ির মুখোমুখি হয় ; কিস্‌সাকহানী বাজারে তিনঘন্টা ধরে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের তারা পরোয়া করে নি। সরকারি সংবাদ সূত্র অনুযায়ী এতে নিহতের সংখ্যা ৩০ আর বেসরকারি হিসেবে ২০০ থেকে ২৫০। হিন্দু সৈন্যদের নিয়ে তৈরি গাড়োয়াল রাইফেলস-এর একটি বাহিনী মুসলমান জনতার বিরুদ্ধে গুলি চালাতে অস্বীকার করে। পরে তাঁদের সামরিক বিচারের সময়ে তাঁরা ঘোষণা করেন, 'আমাদের নিরস্ত্র ভাইদের আমরা গুলি করে মারব না, কারণ ভারতের সৈন্যদের কাজ বাইরের শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করা। আপনাদের যদি ইচ্ছে হয় তাহলে আপনারা আমাদের কামানের মুখে উড়িয়ে দিতে পারেন।' ৪ মে, অর্থাৎ ঘটনার ১০ দিন পার হলে তবে ব্রিটিশরা পেশোয়ারে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সমর্থ হয়, আর উত্তর-পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ-এ বল্‌গাহীন সন্ত্রাসের রাজত্ব ও সামরিক আইন জারি হয়। ওয়েজউড-বেন-কে আরউইন জানান যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এর প্রধান কমিশনার 'মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত অবস্থায় আছেন', আর যে প্রদেশে ৯২% মুসলমান সেখানে আকস্মিক ও বিশাল ব্রিটিশ-বিরোধী অভ্যুত্থানের ফলে সবরকম সরকারি ছক ও হিসেব ওলটপালট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। গফ্‌ফর খানের নিজস্ব আন্দোলন পেশোয়ার, কোহাট, বান্নু, ডেরা ইসমাইল খান ও হাজারা-র মতো স্থায়ী বসতির জেলাগুলিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও সেইসঙ্গে ১৯৩০-এর শেষদিকে জনগোষ্ঠীয় মানুষরা একের-পর-এক আচমকা অভিযান চালান। তার বিরুদ্ধে আকাশ থেকে নির্বিচারে বোমা ফেলা হয়। এই সময় জনগোষ্ঠীয় অভিযানকারীরা যে গ্রামে লুঠপাট করা থেকে বিরত থাকেন তা তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা বাদশা খান, 'মালাং বাবা' (নাঙ্গা ফকির, গান্ধী) ও 'ইনকিলাব'-কে (তাঁরা 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগান শুনেছিলেন আর ধরে নিয়েছিলেন যে 'ইনকিলাব' হলেন আর একজন কারাবন্দী মহান নেতা) ছেড়ে দেওয়ার দাবি তোলেন। তাঁদের এই সরলতা মনকে নাড়া দেয়।

মহারাষ্ট্রের শিল্পশহর শোলাপুরে গান্ধীর গ্রেপ্তারের খবর পেয়ে ৭ মে সুতিশিল্পে ধর্মঘট হয়। প্রধানত মিল-শ্রমিকদের এক জনতা মদের দোকান পুড়িয়ে দেয় আর পুলিশ চৌকি, আদালত, পৌরসভার বাড়ি ও রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করে। ১৬ মে-র পরে সামরিক আইন জারি করে তবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারা যায়। যদিও সব মদের দোকান ভেঙে ঢোকা হয়েছিল, তবু কর্তৃপক্ষের সুস্পষ্ট বিরক্তির কারণ হবে এমন কোনো মাতলামোর ঘটনা ঘটে নি বললেই হয়। কোনো সাম্প্রদায়িক ঘটনা ছাড়াই ১০ মে বকর্ ইদ শান্তিতে কেটে যায়, যদিও তার দু দিন আগে তিনজন মুসলমান পুলিশকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কয়েক দিনের জন্যে পাল্টা সরকার-জাতীয় একটা ব্যাপার কায়েম করা হয়েছিল বলে মনে হয়। ১৩ মে শোলাপুরের জেলাশাসক জানান যে 'কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা যানবাহন চলাচলের নির্দেশ দিচ্ছে এবং আমাকে খবর দেওয়া হয়েছে যে, জেলাশাসক থেকে তলায় অবধি বিভিন্ন

স্তরে কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে' ('হোম পলিটিকাল', ৫১২/১৯৩০)। শোলাপুর অভ্যুত্থানে প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন শ্রমিকশ্রেণী, কিন্তু আইন অমান্যের গোড়ার দিকে অন্যান্য জায়গাতেও যে তাঁরা যথেষ্ট সক্রিয় ছিলেন—এও আগ্রহজনক। করাচী-তে ডক শ্রমিক ও মাদ্রাজে চুলাই মিল শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন, আর এপ্রিলের মাঝামাঝি নেহরু ও ৪ মে গান্ধী গ্রেপ্তার হওয়ার পর কলকাতার পশ্চিমা পরিবহণ কর্মী ও বজবজের মিলশ্রমিকদের সঙ্গে পুলিসের সঙ্ঘর্ষ বাধে। ১১ দফা দাবিতে ও সাধারণভাবে কংগ্রেসের রণনীতিতে শ্রমিক শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলিকে পুরোপুরি উপেক্ষা করা সত্ত্বেও, আর কমিউনিস্টরা তাঁদের নতুন অতিবামপন্থার কারণে আইন অমান্য থেকে মোটের ওপর সরে থাকলেও, এসব ঘটনা ঘটে।

আইন অমান্যের নানা পর্যায়

চট্টগ্রাম, পেশোয়ার ও শোলাপুরে বিভিন্ন রক্তক্ষয়ী ঘটনা সত্ত্বেও গান্ধী আন্দোলন প্রত্যাহার করার কোনো উদ্যোগ নেন নি ; চৌরীচৌরা-র পর যা হয়েছিল এটি, তার একেবারে উল্টো। ঘটনা এই যে, *ইয়ং ইণ্ডিয়া*-য় ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩০ গান্ধী আশ্বাস দিয়েছিলেন, 'এখন তিনি পথ জানেন—বারডোলি-র সময়ের মতো আর পিছিয়ে আসা নয়'। কিন্তু বিভিন্ন ঘটনাকে এখন বাস্তবসম্মতভাবে মোটামুটি অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে তিনি অহিংসার মূলস্রোতটিকে এগিয়ে নিয়ে যান ঃ 'আইন অমান্য একবার শুরু করলে আর বন্ধ করা যায় না এবং কোনোমতেই বন্ধ করা হবে না...'। এক্ষেত্রে এবং অন্যান্য বেশ কয়েকটি দিক দিয়ে, ১৯২১-২২-এর চেয়ে ১৯৩০-এ র‍্যাডিকাল অবস্থানের দিকে নির্দিষ্ট অগ্রগতি ধরা পড়ে। এবার ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ স্বরাজ, আগের মতো দুটি নির্দিষ্ট 'অন্যায়ে'র প্রতিকার ও সেইসঙ্গে খুবই অস্পষ্ট স্বরাজের ব্যাপার নয়। প্রথম থেকেই অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে ছিল ইচ্ছাকৃত আইন লঙ্ঘন, শুধু বিদেশী শাসনের সঙ্গে অসহযোগ নয়। ফলে কারাবরণকারীর সংখ্যা ছিল ১৯২১-২২-এর চেয়ে অন্তত তিনগুণ বেশি। পরে, জওহরলালের হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা ছিল ৯২,১২৪ (এ আই সি সি, জি আই / ১৯৩১)। সংখ্যার দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশি ছিল যথাক্রমে বাঙলা (১৫,০০০), বিহার (১৪,২৫১), যুক্তপ্রদেশ (১২,৬৫১), পাঞ্জাব (১২,০০০), উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ (৫,০০০), বোম্বাই শহর (৪,৭০০), দিল্লী (৪,৫০০), গুজরাট (৩,৫৪৯), তামিলনাডু (২,৯৯১), অন্ধ্র (২,৮৭৮) ও কেন্দ্রীয় প্রদেশ হিন্দুস্থানী (২,২৫৫)। এখানে জোর দেওয়া উচিত যে, এবারে যোগদানের ক্ষেত্রে ১৯২১-এর চেয়ে ঝুঁকি ছিল অনেক বেশি, কারণ এক সন্ত্রস্ত সরকার মে মাস থেকে এমনকি সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহীদের ওপরেও এক নির্বিচার নৃশংসতার নীতি অবলম্বন করে। মে ১৯৩০-এ বোম্বাই-এর উপকূল ধারাসন-এ জনৈক আতঙ্কিত বিদেশী সাংবাদিক, ওয়েব মিলার লক্ষ্য করেন যে, 'বাধা দিচ্ছে না এমন মানুষদেরও পরিকল্পিতভাবে পিটিয়ে রক্তপিণ্ডে পরিণত করা হচ্ছে'। আর ঠাকুরদাস তিক্ত অভিযোগ করেন যে, 'পুলিশ মহিলা ও দশ-বারো বছরের ছোটো ছোটো বাচ্চাদের মারছে'। গরিবদের দেহপ্রাণ ছাড়াও তাঁদের সামান্য সম্পত্তিও প্রচণ্ড বিপন্ন হয়েছিল, কারণ ভূমিরাজস্ব বা চৌকিদারি কর না-দেওয়ার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে সরকারিভাবে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছিল গৃহস্থালীর জিনিসপত্র, (চাষের) উপকরণ ও এমনকি জমিও। আর-একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলো মহিলা ও কিশোরদের যোগদান ঃ ১৫ নভেম্বর ১৯৩০-এ ২৯,০৫৪ জন বন্দীর মধ্যে কম

করেও ২০৫০-এর বয়স ছিল ১৭-র নিচে আর মহিলা ছিলেন ৩৫৯ জন। বাস্তবিকই আইন অমান্য আন্দোলন ভারতীয় নারীর মুক্তির দিকে অগ্রগতির একটি বড় পদক্ষেপ সূচিত করে। যুক্ত প্রদেশের জনৈক পুলিশ কর্মচারী চড়া পুংপ্রাধান্যবাদী সুরে ভরা একটি মন্তব্যে বিষয়টি স্বীকার করেন : 'ভারতীয় নারী তার গার্হস্থ্য ও জাতীয় স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, কিন্তু একইসঙ্গে নারীর মতোই সে তার বিভিন্ন দাবি ও পদ্ধতির ক্ষেত্রে একেবারেই যুক্তি-তর্কের ধার ধারে না। আবার, নারীর মতোই পুরুষের ওপর তার প্রচণ্ড প্রভাব, পুলিশ অফিসাররা সমেত অনেক বিশ্বস্ত রাজকর্মচারী অন্যান্য যে-কোনো জায়গার চেয়ে তাঁদের আত্মীয়াদের কাছ থেকে অনেক বেশি বিদ্রূপ ও গালাগালির শিকার' হয়েছেন (যুক্ত প্রদেশের ইনস্পেক্টর জেনারেল ডড-এর 'নোট', ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩০, 'হোম পলিটিকস', ২৪৯/১৯৩০)।

এসব সত্ত্বেও আইন অমান্যকে অসহযোগের চেয়ে সবদিক দিয়ে নির্বিকল্প অগ্রগতি হিসেবে হাজির করাটা যথেষ্ট অতিসরলীকরণ হবে। ১৯১৯-২২-এর উদ্দীপনাময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ১৯৩০-এ অবশ্যই অতীতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, কারণ দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী পর্যায়ে শুধু নে হ রু প্র তি বে দ নে র ওপরে আলাপ-আলোচনাই ভেঙে যায় নি, সেইসঙ্গে তার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল এক-দশকব্যাপী সুতীব্র সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত। সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এর সরকারি পাক্ষিক প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এর বাইরে ও দিল্লীর মতো কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে এক বিশাল সংখ্যক নিচু শ্রেণীর মুসলমানদের সমর্থন জয় করার ক্ষেত্রে কংগ্রেস 'লক্ষণীয় সাফল্য' লাভ করেছে ('হোম পলিটিকাল', ১৮/১৯৩০), কিন্তু তাছাড়া আইন অমান্যের পুরো পর্যায় জুড়েই মুসলমানদের যোগদানের মাত্রা ছিল কম। যেমন, যুক্ত প্রদেশ, যেখানে ১৯২১-২২-এ কংগ্রেস-খিলাফত মৈত্রী এত জোরদার ছিল, আর এলাহাবাদে ১৯৩০-১৯৩৩-এর মধ্যে ৬৭৯ জন আইন অমান্যকারী বন্দীর মধ্যে মুসলমান ছিলেন মাত্র ৯ জন (জ্ঞান পাণ্ডে, পৃ. ১১২)। আবার অসহযোগের মতো আইন অমান্যের সময়েও একইসঙ্গে কোনো বড় শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে নি। জুন ১৯৩০-এ অন্যথায় আতঙ্কগ্রস্ত একটি সরকারি প্রতিবেদনে লক্ষ্য করা হয় যে, 'বোম্বাই শহরের পরিস্থিতির সবচেয়ে সন্তোষজনক লক্ষণ এই যে, বর্তমানে মিলকর্মীদের উপর [আইন অমান্যের] কোনা ছাপই পড়ে নি বলে মনে হয়...। কর্মীরা গত বছরের ধর্মঘটের পরিণাম ভুলে যায় নি' ('হোম পলিটিকাল' ২৫৭/১৯৩০)। আইনজীবীরা নিজেদের পেশা বর্জন করেছেন আর ছাত্ররা সরকারি প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে জাতীয় বিদ্যালয় ও কলেজের পত্তন করেছেন—এই ধরনের প্রথাগত ও একেবারেই বুদ্ধিবৃত্তিজীবীসুলভ প্রতিবাদ সুস্পষ্টভাবে কমে যাওয়ার মধ্যেও অসহযোগ ও আইন অমান্যের আর-একটি তফাত ধরা পড়ে। লাহোর কংগ্রেসে গান্ধী বিদ্যালয় ও আদালত বয়কটের ডাককে ব্যবহারসম্মত নয় বলে খারিজ করে দেন—'আজকে আমাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে এই ধরনের বয়কটের কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমাদের মনে হয় না'। জুলাই ১৯৩০-এ বিহার কংগ্রেসের একটি প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয় যে, 'বস্তুতপক্ষে আইনজীবী ও ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি' (এ আই সি সি এফ এন জি /৮০/১৯৩০) আর বোম্বাই কংগ্রেস-প্রকাশিত সাইক্লোস্টাইল-করা পুস্তিকায় 'আমাদের নির্জীব ছাত্রদের' বারবার ধিক্কার জানানো হয়।

বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ও কৃষক সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ থেকে যে বিশাল সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, তা কিন্তু শ্রমিক ও শহুরে বুদ্ধিবৃত্তিজীবীদের তরফের ঐ অভাবকে পূরণ করে দেয়। এই দুটি মৌল সামাজিক শ্রেণীর অসহযোগে যোগদানের ক্ষেত্রে স্থান-কালভেদে তারতম্য ছিল, কিন্তু প্রধানত তাঁদের যোগদানের ভিত্তিতেই অসহযোগের একটি সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে হবে। ১৯২১-২২-এ কংগ্রেস একটি গণপার্টি হয়ে ওঠার পথে সবে প্রথম পদক্ষেপ করছিল, কিন্তু এখন এটি দেশের বেশির ভাগ অংশেই সাংগঠনিকভাবে তার চেয়ে আরও অনেক বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। যেমন আগেই প্রসঙ্গত একবার উল্লেখ করা হয়েছে, এর ফলে খানিকটা বিরোধী অভিঘাতের সৃষ্টি হয়। বাছাই-করা নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আন্দোলনকে আরও বেশি কার্যকর করে তোলার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও শক্তি কিন্তু এই একই ব্যাপার মাঝে-মাঝে জনগণের আকাঁড়া উৎসাহ ও র‍্যাডিকাল মনেভাবের ক্ষেত্রে রাশ টেনে ধরার কাজ করে। স্থান-কালের তারতম্য এক্ষেত্রে আবারও প্রচণ্ড গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের মতো প্রদেশে বা মধ্য-ভারতের নানান জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলে, যেখানে অসহযোগ খুব বেশি ঢুকতে পারে নি ও তখনও পর্যন্ত নতুনত্বের স্বাদ ও অস্পষ্টতা বজায় ছিল, সেসব জায়গায় সে-অবধি এক মৌল ও প্রায় ক্রান্তিপর্বের উত্তাপ অনুভব করা যেত। কিন্তু সুপ্রতিষ্ঠিত গান্ধীপন্থী ঘাঁটি, যেমন, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ, বিহার বা উপকূলবর্তী অন্ধ্রে আর এই ধরনের বিশেষ কিছু ছিল না। এসব সত্ত্বেও গান্ধীপন্থী প্রাথমিক রণকৌশল, অর্থাৎ কারাবরণের অর্থ ছিল প্রতিষ্ঠিত নেতা ও কর্মীদের বেশ তাড়াতাড়িই ময়দান থেকে সরিয়ে নেওয়া, আর তার ফলে প্রায়ই নিচের থেকে বিক্ষিপ্ত কিছু জঙ্গী আন্দোলন করার সুযোগ পাওয়া যেত। কৃষিজ পণ্যের মূল্য পড়ে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এক ধরনের কম বাধাগ্রস্ত 'দ্বিতীয় তরঙ্গ' শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল গ্রামাঞ্চলে, বিশষভাবে ১৯৩০-এর শরতের পর থেকে।

বাস্তবিকই সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৩০-কে আইন অমান্যের এই পর্যায়ের মধ্যে মোটামুটি বিভাজন-রেখা হিসেবে ধরা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে দেখা গিয়েছিল বিভিন্ন শহুরে বুর্জোয়াদের যোগদানের তুঙ্গ অবস্থা আর গ্রামে গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের বাছাই-করা বিষয়ে (নুন, খাজনা-বন্ধ, মদের দোকানে ধর্না চৌকিদারি কর না-দেওয়া) নিয়ন্ত্রিত কৃষক জমায়েত। ২৪ এপ্রিল ১৯৩০-এ ওয়েজউড- বেন-কে আরউইন জানান, 'সাইক্‌স্ (বোম্বাই-এর লাট) আমাকে জানিয়েছেন যে, বোম্বাই-এর ব্যবসায়ী সম্প্রদায় গান্ধীকে ইতোমধ্যেই কতকটা সমর্থন দিয়ে দিয়েছে যেটা তারা ১৯২১-২২-এ অসহযোগের পরবর্তী, পর্যায়গুলিতে দিতে রাজি হয় নি।' ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের হিসেব অনুযায়ী, ব্যবসায়ী-প্রধানদের মধ্যে জি ডি বিড়লা ঐ আন্দোলনে এক থেকে পাঁচ লাখ টাকা দান করেন, আর ঠাকুরদাস কাগজপত্রে সংরক্ষিত তাঁর চিঠিপত্র থেকে দেখা যায়, কলকাতার বিদেশী থানকাপড়ের মারোয়াড়ি আমদানিকারীদের (বিকল্প হিসেবে, আহ্‌মেদাবাদ ও বোম্বাই-এর সুতোকলগুলোর সঙ্গে) ব্যবসায়িক যোগাযোগ গড়ে তুলতে রাজি করানোর জন্যে তিনি সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছেন। পুঁজিবাদীদের মধ্যে পুরোপুরি সক্রিয় কংগ্রেস কর্মী হিসেবে যমনালাল বাজাজ ছিলেন অনন্য (তিনি বহু বছর ধরে এ আই সি সি-র কোষাধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেন ও ১৯৩০-এ জেলে যান), আর ২৮ এপ্রিল ১৯৩০-এ এফ আই সি সি আই-এর কাছে লেখা এক চিঠিতে ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ সহ-

ব্যবসায়ীদের 'কোনোদিকে না যাওয়ার' নীতি পরিত্যাগ করতে উপরোধ করেন—'যদি ভারত সরকার ভারতীয় বণিকদের অভিমতের সঙ্গে একমত হতে না চায় তাহলে যাঁরা স্বরাজের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে লড়ছেন আমরা তাঁদের সঙ্গে শামিল হতে বাধ্য হব' (*ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ পেপার্স,* এফ এন ৮(১))। মে ১৯৩০-এ এফ আই সি সি আই সিদ্ধান্ত নেয় যে, যতদিন অবধি গান্ধী গোল টেবিল বৈঠক থেকে দূরে থাকবেন আর যতক্ষণ না বড়লাট ডোমিনিয়ন মর্যাদার ক্ষেত্রে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ততদিন তাঁরা ঐ বৈঠক বর্জন করবেন। ১৯২১-এর রাজভক্তরা, লালজী নারায়ণজী ও ঠাকুরদাস এফ আই সি সি আই-এর প্রতিবাদপত্রে সই করেন, আর ঠাকুরদাস যদিও উচ্চপদস্থ সরকারি বড়কর্তাদের সঙ্গে সর্বদাই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখতেন, এমনকি তিনিও ১২ মে ১৯৩০-এ আরউইন-এর কাছে 'অর্থব্যবস্থা, মুদ্রা, আর্থিক নীতি ও রেলপথে'র ওপর পূর্ণ ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ দাবি করেন (*ঠাকুরদাস পেপার্স* এফ এন ৯৯/১৯৩০)। একথা সত্যি যে কাপড়ের অত্যধিক দাম, মিলের কাপড়কে খাদি বলে চালানো, বিদেশী সুতার ব্যবহার ও কিছু মিলের দালালদের তরফে থানকাপড় আমদানির ব্যবসা ইত্যাদি সমস্যার ফলে কংগ্রেসের সঙ্গে বোম্বাই মিল-মালিকদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠছিল। অগাস্ট ১৯৩০-এ বোম্বাই-এর ২৪টি মিলকে অ-স্বদেশী হিসেবে কালো মার্কা মেরে দেওয়া হয়। আহ্‌মেদাবাদের মিলমালিক, অম্বালাল সরাভাই ও কস্তুরভাই লালভাই এইসব অসুবিধে কাটানোর চেষ্টা করেন মোতিলাল নেহরু-র সঙ্গে সহযোগিতা করে। তাহলেও জাতীয় আন্দোলনে শিল্পপতিদের চেয়ে মোটের ওপর আরও অনেক বেশি উৎসাহী ছিলেন বণিক ও খুদে ব্যবসায়ীরা। বিদেশী জিনিসের জন্য বরাত দেওয়া হবে না—এই বলে ব্যবসায়ীদের সম্মিলিত শপথ নেওয়াটা বোম্বাই, অমৃতসর, দিল্লী ও কলকাতায় (এখানে মারোয়াড়িরা এই ধরনের শপথ নিয়েছিলেন ৩০ এপ্রিল) খুবই স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়। স্বেচ্ছাসেবকদের (বেশির ভাগ সময়েই প্রধানত মহিলা) দর্শনীয় ধর্নার চেয়ে তা আরও বেশি কার্যকর উপায় হয়ে ওঠে। বিশ্বব্যাপী মন্দায় দাম পড়ে যাওয়ার ফলে আমদানির বরাদ্দ আরও খারিজ-করা মাঝে মাঝে একইসঙ্গে লাভজনক ও দেশপ্রেমিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, কিন্তু এক্ষেত্রে বোম্বাই থেকে পরপর দুটি সরকারি প্রতিবেদনকে আরও দীর্ঘমেয়াদি ও মতাদর্শগত বিবেচনার সাক্ষ্য হিসেবে হাজির করা যায় : 'ভারত সরকার অনুসৃত আর্থনীতিক ও আর্থিক নীতি সম্পর্কে বোম্বাই-এর ব্যবসায়ীরা অনেকদিন ধরেই অসন্তুষ্ট...তাঁরা মনে করেন যে, যথেষ্ট পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করার এখনই উপযুক্ত সময়—যদি এর ফলে তাঁরা আর্থনীতিক ও আর্থিক স্বনিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে পারেন। আর সেটাই তাঁরা প্রবলভাবে চান' (এইচ জি হেগ, ১৩ জুন ১৯৩০, 'হোম পলিটিকাল', এফ এন ৪৫৭/৫/১৯৩০)...'আরেকটি লক্ষণও মনে খুব দাগ কাটে। সেটি হলো সাধারণ শান্তশিষ্ট ও বিবেচক ব্যবসায়ীদের অনেকেই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত বলে মনে হয়, এমনকি যদিও তাঁরা ধ্বংসের মুখোমুখি পৌঁছেছেন' (পেট্রি, ২০ অগাস্ট ১৯৩০, 'হোম পলিটিকাল', এফ এন ৫০৪/১৯৩০)।

আসল অভিঘাত ছিল ব্রিটিশ কাপড় আমদানির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় অবনতি ; ১৯২৯-এর ২৬০ লক্ষ পাউণ্ড থেকে তা ১৯৩০-এ ১৩৭ লক্ষে এসে দাঁড়ায়, আর পরিমাণের হিসেবে ১৯২৯-৩০-এর ১২৪৮০ লক্ষ গজ থেকে ১৯৩০-৩১-এ মাত্র ৫২৩০ লক্ষ গজে। একথা ঠিক

যে, মন্দার ফলে সারা পৃথিবীতেই বাণিজ্য সঙ্কুচিত হচ্ছিল, তবু মার্চ ১৯৩১-এ বোম্বাই মিলমালিক সভায় হোমি মোদী-র সভাপতির ভাষণটি তাৎপর্যপূর্ণ : 'স্বদেশী আন্দোলন...এক প্রচণ্ড অসুবিধার সময়ে নিঃসন্দেহে (ভারতীয়) শিল্পকে সাহায্য করেছে' আর এখন 'ভবিষ্যৎকে আশায় ভরা বলে ধরা যায়'। অন্যান্য ব্রিটিশ আমদানিরও ক্ষতি হয়েছিল ; মে থেকে অগাস্ট ১৯৩০ অবধি ব্রিটিশ বাণিজ্য অধিকর্তার দফ্‌তর ইম্পিরিয়াল টোবাকো, ডানলপ ও অন্যান্য 'শ্বেতাঙ্গ' প্রতিষ্ঠানের আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিবেদনে ও অভিযোগে ভেসে যায়।

গ্রামাঞ্চলে গোড়ার দিকের 'নিয়মতান্ত্রিক' ধাঁচের গান্ধীপন্থী অসহযোগের প্রারম্ভবিন্দু ও সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল স্বাভাবিকভাবেই সেইসব অঞ্চল যেখানে আঞ্চলিক আশ্রমগুলির মাধ্যমে আগেই খানিকটা গান্ধীপন্থী গ্রামীণ গঠনমূলক কাজ করা হয়েছে—সুপরিচিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলো : গুজরাটে বারডোলি ও খেড়া, বাঙলায় বাঁকুড়া ও আরামবাগ, আর বিহারের ভাগলপুর জেলায় বিহ্‌পুর। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল নুন। কিন্তু বর্ষা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেআইনি নুন উৎপাদন কঠিন হয়ে পড়ে। নুনকে কেন্দ্র করে বিনা ছেদে প্রচারের ভিত্তি হতে পারত একমাত্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, ওড়িশার বালাসোর বা বাঙলার মেদিনীপুরে। ছোটো ছোটো শহর ও গ্রাম—দুজায়গাতেই মদের দোকান ও আবগারি অনুমতিপত্রের নিলামে ধর্না দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, আর প্রচণ্ড পরিমাণে দৈহিক অত্যাচার ও সম্পত্তি বিক্রি করা হলেও বহু জায়গায় (যেমন, উত্তর ও মধ্য-বিহারের জেলাগুলিতে আর মেদিনীপুরে) কৃষকরা চৌকিদারি কর দিতে দৃঢ়ভাবে নারাজ হন, প্রচুর সংখ্যক গ্রাম-কর্মচারীদের পদত্যাগের মাধ্যমে গ্রামীণ প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ার চেষ্টা চলে। ফলে ২১ জুন নাগাদ খেড়ায় ৬৫৫ জন মুখী-র মধ্যে ২২৪ জন পদত্যাগ করেন. খেড়া জেলার আনন্দ, বোরসাড ও নাড়ীআর তালুক এবং সুরাটের বারডোলি প্রচণ্ড সফল রাজস্ব-বন্ধ অভিযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এখানকার পাটীদাররা এক 'হিজরত' (দেশত্যাগ)-এ পার্শ্ববর্তী বরোদা রাজ্যে আশ্রয় নেন। অক্টোবরে আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থায় খেড়ায় ১৫,০০০-এরও বেশি কৃষক এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সই হওয়া অবধি বারডোলির ধার্য রাজস্ব ৩৯৭,০০০ টাকার মধ্যে মাত্র ২০,০০০ টাকা আদায় হয়েছিল। কেন্দ্রীয় প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে দরিদ্র কৃষক ও জনগোষ্ঠীয় মানুষদের অরণ্য-আইন সংক্রান্ত নানান অভিযোগকে কেন্দ্র করে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা ছিল। এই ব্যাপারটিকে কংগ্রেস নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রিত উপায়ে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। সত্যাগ্রহের কেন্দ্রগুলি সাবধানে বাছাই করে (যেমন, জুলাই ও সেপ্টেম্বর-এর মধ্যে বেরার-এ ১০৬ টি কেন্দ্র) তাঁরা 'অরণ্য-সত্যাগ্রহীদের' জন্য কয়েকটি প্রশিক্ষণ শিবিরের পত্তন করেন (যেমন, আহ্‌মেদাবাদ জেলার সঙ্গমনার-এ)। অরণ্যবিভাগের নিলাম বর্জন, চারণে ও কাঠ কাটায় বাধানিষেধ শান্তিপূর্ণভাবে গণ-অমান্য করা ও বেআইনিভাবে সংগৃহীত অরণ্যের উৎপাদনকে নিলাম করে প্রকাশ্যে বিক্রি—কংগ্রেস নেতৃত্ব আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করেন এই সবের মধ্যে। কর্ণাটক সত্যাগ্রহ মণ্ডল এমনকি কোন্‌ কোন্‌ জাতের গাছ কাটা হবে তাও ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করে।

য়েরবাড়া কারাগারের ব্যর্থ আলাপ-আলোচনায় জাতীয় নেতৃত্ব যে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন তার থেকে আইন অমান্যের প্রথম পর্যায়ের শক্তি ছবির মতো প্রতিফলিত হয়। জুলাই-

অগাস্ট ১৯৩০-এ মধ্যস্থ হিসেবে এই আলোচনার জন্যে উদ্যোগ নেন সাপ্রু ও জয়কর। সাপ্রু-র মাধ্যম নেহরুকে পাঠানো প্রাথমিক মন্তব্যে (২৩ জুলাই) গান্ধী অবশ্যই একটু দ্বিধার ভাব দেখান। তিনি অন্তর্বর্তীকালীন 'রক্ষাকবচ' সংক্রান্ত একটি সম্ভাব্য আলোচনা মেনে নেন, কিন্তু একই সঙ্গে পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, 'জওহরলালের কথাই চূড়ান্ত...লাহোর প্রস্তাবকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে যদি কোনো দৃঢ়তর অবস্থান নেওয়া হয় তাহলে তা সমর্থন করার ক্ষেত্রে আমার কোনা আপত্তি থাকবে না।' য়েরবাড়া থেকে ১৫ অগাস্ট গান্ধী ও নেহরুর যুক্ত চিঠিতে যেসব দাবি দ্বিধাহীনভাবে আবার উল্লেখ করা হয় সেগুলি হলো : বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার, প্রতিরক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থার উপর নিয়ন্ত্রণ-সহ একটি 'পরিপূর্ণ জাতীয় সরকার' আর ব্রিটিশদের আর্থিক দাবিদাওয়া নিষ্পত্তির জন্যে একটি স্বাধীন ট্রাইবুনাল। এই অবস্থায় আলোচনা যে ভেঙে যায় তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এ ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন মোটামুটি সাফল্যের সঙ্গে বর্জন করার মধ্যে দিয়েও আন্দোলনের শক্তি প্রকাশ হয়। বোম্বাই-এর নাগরিক হিন্দু নির্বাচনী কেন্দ্রগুলি থেকে ভোট দেন মাত্র ৮%, আর ভোটদানের সর্বভারতীয় গড় ১৯২৬-এর ৪৮.০৭% থেকে ২৬.১% -এ নেমে আসে।

ঠিক ছ মাস পরেই ফেব্রুয়ারী-মার্চ ১৯৩০-এ দিল্লীতে আরউইন-এর সঙ্গে আলোচনায় গান্ধী লক্ষণীয়ভাবে অন্য ধরনের ও অনেক বেশি নরমপন্থী অবস্থান নিলেন। এর ব্যাখ্যার অনেকখানি অবশ্যই পাওয়া যাবে আইন অমান্যের পরিবর্তিত ধারার মধ্যেই।

সেপ্টেম্বর ১৯৩০-এর পর থেকে সরকারি প্রতিবেদনগুলিতে শহরাঞ্চলের উৎসাহে ও সমর্থনে ভাঁটা পড়ার ওপর বারবার জোর দেওয়া হয়। এর মধ্যে ছিল বেনারসে পাইকারদের বিদেশী কাপড়ের ওপর কংগ্রেসের মারা সিল ভেঙে ফেলা, অমৃতসরের ব্যবসায়ীদের কাজিলকা-য় চুপিচুপি বিদেশী কাপড় বিক্রি ও এমনকি বোম্বাই-এও ব্যবসায়ীরা 'নিজেদের হাতে গত বছরের জিনিসপত্রের বিশাল মজুত নিয়ে কংগ্রেসি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের লক্ষণ' দেখাতে শুরু করেছে ('হোম পলিটিকাল', ১৮/১০/১৯৩০)। ব্যবসায়ীরা টালবাহনা করলেও মিলমালিকরা কখনোই খুব বেশি উৎসাহী ছিলেন না, কারণ স্বদেশী জিনিসের চাহিদা থেকে যা লাভ হয়েছিল সেটি আবার উল্টে যায় মার্চ ১৯৩১-এ হোমি মোদী যার কথা বলেছিলেন তার মাধ্যমে, অর্থাৎ 'ঘনঘন হরতাল যা ব্যবসা ও শিল্পকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে ও যথেষ্ট অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করেছে।' য়েরবাড়ায় বিড়লা গান্ধীর অবস্থানকে সমর্থন করেছিলেন (ঠাকুরদাসকে লেখা চিঠি, ৬ সেপ্টেম্বর)। তাহলেও কয়েকদিন পরে লালা শ্রীরাম এফ আই সি সি আই-কে মে মাসের গোল টেবিল বৈঠক বর্জনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে বলেন, আর লালজী নারায়ণজীর মাধ্যমে ঠাকুরদাস মোতিলালকে হুঁশিয়ার করে দেন যে 'ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সহ্যশক্তি শেষ সীমায় পৌঁছেছে' (*ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ১০৪ / ১৯৩০)। বিড়লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী দেবীপ্রসাদ খৈতানকে লেখা ৮ অক্টোবর-এর চিঠিতে ঠাকুরদাস ঐ বিষয়টিই আবার আরও তীক্ষ্ণ ভাষায় উল্লেখ করেন : 'ভ্রমণের সময় আমার ধারণা হয়েছে যে দিল্লী, অমৃতসর, কানপুর ইত্যাদি জায়গায় থানকাপড়ের আমদানিকারী ও পাইকারি কারবারিরা ধর্নার ফলে এবং আমদানি কাপড়ের পাইকারি কারবারিদের যে-ক্ষতি হচ্ছে তার জন্যে দুপক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে... বোম্বাই বাদ দিয়ে বাকি ভারত বেশ ভালোভাবেই

নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ও অচিরেই ফুরিয়ে যাবে...আমার আশঙ্কা ঃ কংগ্রেস একটা বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে ও সেই সঙ্গে দেশের প্রচণ্ড ক্ষতি হবে।' (*ঐ*, এফ এন ৯৯/১৯৩০)

আপসের ডাক দিয়ে বিভিন্ন ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর তরফ থেকে নানান বিপদসঙ্কেত ও সেই সঙ্গে সেগুলির ব্যাপারে জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়া সম্ভবত গ্রামাঞ্চলের ঘটনাধারার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এখানে আরও বিশুদ্ধ ধরনের গান্ধীপন্থী কাজের ভিত ছিল বিত্তবান কৃষক গোষ্ঠী। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্মম ব্রিটিশ নীতির মুখের পড়ে, সেই ভিত তার গোড়ার দিকে ক্ষমতা খানিকটা হারিয়ে ফেলছিল। একইসঙ্গে একটি 'দ্বিতীয় তরঙ্গ'-র লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল। সেটি তুলনায় কম নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও সামাজিকভাবে বিপজ্জনক আকার পরিগ্রহ করছিল, যেমন খাজনা-বন্ধ বা জনগোষ্ঠীয় বিদ্রোহ। নভেম্বর ১৯৩০-এ বোম্বাই-এর *পাক্ষিক প্রতিবেদন*-এ বলা হয় যে, খেড়ার পাটীদাররা বরোদা সীমান্তে শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে বসে আছেন—তাঁদের ভঙ্গিতে ঔদ্ধত্যের কোনো চিহ্ন নেই, সক্রিয় প্রতিরোধ তো আরও কম। তাঁদের নিরাশ বলে মনে হয়।' তা সত্ত্বেও, ঐ একই সময়ে, ২০ অক্টোবর চনকপুর-এ (নাসিক) 'ব্রিটিশরাজের বদলে গান্ধী রাজ এসেছে এই গল্পে ভর করে' কোলি জনগোষ্ঠীর মানুষরা 'বর্শা, তলোয়ার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে...কংগ্রেসি স্লোগান দিতে শুরু করে...তারা ছত্রভঙ্গ হতে নারাজ হয় (ও) পুলিশের গুলির মুখে পাথর ছোঁড়ে ('হোম পলিটিকাল', ১৮/১১-১৮/১২/১৯৩০)। পশ্চিমঘাটের কোলি ও কেন্দ্রীয় প্রদেশের গোণ্ডদের মধ্যে অরণ্য সত্যাগ্রহ অনেকদিন আগেই গান্ধীপন্থীদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। তাঁরা বারবার পুলিশ চৌকির ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করেন, ও নির্বিচারে অসংখ্য গাছ কেটে ফেলেন। সারা দেশ জুড়ে নানান বিক্ষিপ্ত ঘটনায়, সারা দেশের অন্যত্রও কৃষকরা তাঁদের নেতাদের গ্রেপ্তার ও সম্পত্তি আটকের প্রতিরোধ করেছিলেন। তারা শাঁখ বাজিয়ে আশপাশের গ্রামের মানুষদের জড়ো করতেন ও পুলিশ দলকে ঘিরে ফেলে আক্রমণ করতেন। দাম পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খাজনা-বন্ধের জন্যে চাপ বাড়তে থাকে। অক্টোবর ১৯৩০-এ যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস অনিচ্ছা সত্ত্বেও তা অনুমোদন করতে বাধ্য হয়।

অঞ্চলভিত্তিক সমীক্ষা

এই অবধি আমরা আইন অমান্যকে একটি সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসেবে দেখছিলাম। কিন্তু যেসব পরস্পরবিরোধী ঘটনার বিস্তার ও অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েনের ফলে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদিত হয় সেগুলিকে বোঝার জন্যে অসহযোগের মতনই এখন আঞ্চলিক তারতম্য নিয়ে স্পষ্টতই একটি সংক্ষিপ্ত সমীক্ষার প্রয়োজন।

গোটা ১৯৩০ জুড়ে বোম্বাই মহানগর ছিল আইন অমান্যের প্রধান ঘাঁটি। ১৩ জুন হোম সদস্য এইচ জি হেগ গভীর আতঙ্কের সঙ্গে জানান ঃ 'গান্ধী টুপিতে পথঘাট ভরে গেছে। ঠিক পুলিশ কনস্টেবল-এর মতো নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে উর্দি-পরা স্বেচ্ছাসেবকদের ধর্না দেওয়ার জন্যে মোতায়েন করা হচ্ছে', আর 'যানবাহনের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে পুলিশের নিত্যকর্মকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে' বড় বড় মিছিল (২৩ শে মে কম করেও ২৮টি ভারতীয় বাণিজ্যিক সংস্থা মিলে এরকম একটি মিছিল সংগঠিত করেন)। একথা ঠিক যে, মুসলমানরা অনেকটাই দূরে সরে ছিলেন। ১৯২৯-এর ধর্মঘটে পরাজয়, আর্থনীতিক মন্দার ফলে জিনিসের

দাম পড়ে যাওয়া ও বেকারির আশঙ্কা, আর কমিউনিস্টদের অতি-বাম নীতি—এইসবের সম্মিলিত প্রভাব বেশির ভাগ শ্রমিককেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু 'আমাদের একটি সীমিত রাজনৈতিক চক্রকে সামলাতে হচ্ছে—এই তত্ত্বের ভিত্তিতে' বোম্বাই শহরের আন্দোলনকে মোকাবিলা করা যাবে না বলে বোম্বাই-এর লাট স্বীকার করেন। আর তার কারণ, আইন অমান্য 'কার্যত বোম্বাই শহরের অতিশয় বিশাল গুজরাটি জনসংখ্যার সকলেরই সমর্থন অর্জন করেছে, আর তাঁদের এক বিরাট সংখ্যক অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য বা কেরানি হিসেবে নিযুক্ত...' (আরউইন-কে সাইক্‌স্‌, ৫ ও ২০ জুন, *আরউইন পেপার্স*)। শহরবাসী গোঁড়া গান্ধীপন্থী নেতৃত্বের প্রতিনিধি ছিলেন যমনালাল বাজাজ ও প্যাটেলের ভাবশিষ্য এস কে পাটীল। কিন্তু কংগ্রেসি যুবকদের মধ্যে থেকে একটি র‍্যাডিকাল ধারা উঠে আসছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন কে এফ নরিমান ও ইউসুফ মেহের আলি। কয়েক বছর পরে এঁরা সুপরিচিত সমাজবাদী নেতা হয়ে উঠবেন। ১৯৩০-এর শেষপাদে কংগ্রেসি স্বেচ্ছাসেবকরা মিল ও জাহাজঘাটা অঞ্চলের শ্রমিকশ্রেণীর সমর্থন আদায়ের জন্য নিষ্ঠাভরে চেষ্টা করছিলেন আর বোম্বাই সত্যাগ্রহ কমিটির সাইক্লোস্টাইল-করা কাগজপত্রে ঠাকুরদাসের মতো ব্যবসায়ী-প্রধানদের প্রবল আক্রমণ করা হচ্ছিল।

বরাবরের মতোই গুজরাট ছিল গান্ধীপন্থীদের নিয়ন্ত্রিত গণ-আন্দোলনের চিরায়ত ভূমি—বা, আরও সঠিকভাবে খেড়া-র আনন্দ, বোরসাড ও নাড়ীআর তালুক, ভরুচ-এ জম্বুসর, আর সুরাটে বারডোলি, ১৯৩০-৩১-এ এই সবকটি অঞ্চল থেকেই রাজনৈতিক কারণে রাজস্ব আদায়ে বেশ কিছু বকেয়ার খবর পাওয়া যায়। তাহলেও, এমনকি খেড়াতেও ১৯৩১-র গোড়ার দিকে পাইকারিভাবে জমি বাজেয়াপ্ত হওয়ার মুখোমুখি হয়ে 'পাটীদাররা অহিংসা থেকে হিংসায় উত্তরণের পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন' (হার্ডিমান)। কয়েকটি ক্ষেত্রে কৃষকরা তাঁদের নেতাদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা প্রতিরোধ করেন। তাঁরা ঢোল বাজিয়ে আশপাশের গ্রাম থেকে সাহায্য চেয়ে পাঠান (যেমন ৩০ অগাস্ট খেড়া-র ওড-এ)। বোরসাডে জনৈক গ্রামীণ কর্মচারী পদত্যাগ করতে অস্বীকার করায় নিচুজাতের ধরালা-রা তাঁকে হত্যা করেছিলেন। এইরকম দৃষ্টান্ত অন্তত একটি পাওয়া যায়। ('হোম পলিটিকাল' ১৪/২০/১৯৩১)

করাচীতে ১৬ এপ্রিল জনতা-পুলিশ সঙ্ঘর্ষ ও স্বামী গোবিন্দানন্দ-র মতো দু-একজন র‍্যাডিকাল নেতার উপস্থিতি সত্ত্বেও সিন্ধুতে আইন অমান্য ছিল দুর্বল, কারণ মুসলমানরা ছিলেন মোটের উপর উদাসীন (গ্রামগুলিতে তাঁরা ছিলেন প্রায় ৯০%)। অগাস্ট ১৯৩০-এ সুক্কুর-এ এমনকি একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও ঘটে। অসহযোগের সঙ্গে আইন অমান্যের বৈপরীত্য মহারাষ্ট্রের গ্রামগুলিতে উল্টোদিক দিয়ে কার্যকর হয়, কারণ এখানে কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত তার চিরাচরিত খ্যাতি—অর্থাৎ এটি প্রধানত চিৎপাবন ব্রাহ্মণদের ব্যাপার—তা কাটিয়ে উঠেছিল। এন ভি গাডগীল (তাঁর খানিকটা সমাজবাদী ঝোঁক ছিল)-এর নেতৃত্বে এক নতুন প্রজন্মের কংগ্রেস-কর্মীরা পুণার কেশবরাও জেধে-র মতো অ-ব্রাহ্মণ সত্যশোধক সমাজী র‍্যাডিকালদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে সফল হন। এর জন্যে তাঁরা ১৯২৯-এ মন্দির প্রবেশ আন্দোলন সমর্থন করেন। আর এদিকে কেলকর ও মুঞ্জে-র মতো পুরোনো টিলকপন্থীরা হিন্দু মহাসভার নেতা হওয়ার দরুন জাতীয়তাবাদী মূলস্রোত থেকে সরে যাচ্ছিলেন। অস্পৃশ্য মাহার-দের যে

রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠছিল, কংগ্রেস কিন্তু তার সমর্থন আদায় করতে পারে নি। এই আন্দোলনের নেতা বি আর আম্বেডকর ১৯৩০-এ গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেন ও সেখানে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি তোলেন।

একইরকম একটি বিন্যাস দেখা যায় কেন্দ্রীয় প্রদেশে ; ২৩ জুলাই এখান থেকে লাটের পাঠানো প্রতিবেদন অনুযায়ী অসহযোগ 'বোম্বাই থেকে বেরার ও মাহরাট্টা-য় হু-হু করে ছড়িয়ে পড়ছিল। এই আন্দোলনের প্রতি জনগণের মনোভাব আধা-ধর্মীয়। ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতিকে তারা অনেকাংশে ধর্তব্যের মধ্যে আনছে না' (*সাইক্‌স্ পেপার্স*)। মহারাষ্ট্র, কেন্দ্রীয় প্রদেশ ও সেইসঙ্গে কর্ণাটকে (এটি ছিল মোটামুটিভাবে অসহযোগের প্রভাবমুক্ত আর একটি অঞ্চল) দ্রুত অরণ্য অসহযোগের সব-চেয়ে বেশি বিস্তৃত ও জঙ্গী রূপ হয়ে দাঁড়ায় অরণ্য সত্যাগ্রহ, শান্তিপূর্ণ কিন্তু সত্যিই বিশাল মাত্রায় অরণ্য-আইন অমান্যের প্রতিবেদন পাওয়া যায় এ আই সি সি-র দপ্তর থেকে ; যেমন, আহ্‌মেদনগরের সঙ্গমনার-এর ১০০,০০০ (২২ জুলাই) ও নাসিকের বাগালন-এ ৭০, ০০০ (৫ অগাস্ট) গ্রামবাসীর যোগদান আর সেইসঙ্গে ২৮ অগাস্ট সাতরা জেলার ৩২টি জায়গায় (জি/১৪৮/১৯৩০) আর কেন্দ্রীয় প্রদেশের বড় বড় অঞ্চলে (এর মধ্যে ছিল চন্দ্রা, অমরাবতী, বেতুল, রায়পুর, ভাণ্ডারা ও সেওনি-র মতো জেলা) এবং উত্তর কানাড়া-র সিরমি ও সিদ্দাপুর তালুকও পরিণত হয় ঝটিকাকেন্দ্রে। সর্বত্রই জনগোষ্ঠীয় মানুষদের নিজেদের ভেতর থেকে বিভিন্ন নেতা তৈরি হয়ে ওঠেন (যেমন, বেতুল-এর গোণ্ডদের মধ্য থেকে গঞ্জন কোরকু)। অরণ্য-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার ঝোঁক দেখা যায়। এই সবকটি অঞ্চলেই অরণ্যরক্ষক ও পুলিশ দলের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ নিত্যকার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে 'কংগ্রেসি হিংসা' সংক্রান্ত একটি সরকারি তালিকায় এই ধরনের ঘটনার খতিয়ান হলো : ১৯৩০-র জুলাই ও অক্টোবরের মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রদেশে ১০টি, আর মে ও অক্টোবরের মধ্যে বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ২০টি ('হোম পলিটিকাল', ১৪/১৪ ও ১৪/১৯/১৯৩১)। ১৯৩১-এর গোড়ার দিকে কর্ণাটকের কয়েকটি জেলায়, রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল, আর ডিসেম্বর ১৯৩০-এ 'পাক্ষিক প্রতিবেদনে' উল্লেখ করা হয় যে, মহারাষ্ট্রের কিছু অংশে 'খোট ভাগচাষীদের খাজনা আটকে রাখতে রাজি করিয়ে তাঁদের (অর্থাৎ খোটদের) রাজস্ব না-দেওয়ার জন্য প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে।' পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার কিছু লক্ষণ দেখা যায়, মাইশোরের স্বেচ্ছাসেবকরা কানাড়া আন্দোলনে যোগ দেন, আর অক্টোবর ও ডিসেম্বরের মধ্যে বুন্দেলখণ্ডের মধ্যভারতীয় দেশীয় রাজ্য ছতারপুরে গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী কর-বন্ধ অভিযান। এক্ষেত্রে যথেষ্ট কৌতূহলের ব্যাপার হলো এই যে, অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন 'কুখ্যাত ডাকাত মঙ্গল সিং', তিনি ভূমিরাজস্ব কমানোর দাবি তোলেন ও তাঁর নাকি 'নিজস্ব রাজ্য বার করে আনার স্বপ্ন ছিল'। ৩০ ডিসেম্বর ব্রিটিশ-ভারত থেকে সময়মতো সৈন্যবাহিনী আসার পরে তবেই প্রায় হাজারখানেক রাইফেলধারী সমেত ২০,০০০-এর এক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা যায়। তা না হলে তারা 'ছতারপুরের দিকে এগিয়ে যেত ও মহারাজকে তাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করত'। ('হোম পলিটিকাল', ১৮/১১-১৮/১৩/১৯৩০)

গান্ধীপন্থী পরিবর্তন-বিরোধী নেতা সি রাজাগোপালচারী-র (১৯২৫-এ তিনি সালেম

জেলার তিরুচেনগোড়ু আশ্রমে তাঁর সদর দফ্‌তর স্থাপন করেন) প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন স্বরাজী নেতা সত্যমূর্তি ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। তাঁরা সক্রিয় ছিলেন মাদ্রাজে। কিন্তু তামিলনাড়ুতে আইন অমান্য হওয়ার ফলে রাজাগোপালচারী তাঁদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে মার্চ ১৯৩০-এ বহিষ্কার করতে সক্ষম হন। এপ্রিল ১৯৩০-এ লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্যে তাঞ্জোর উপকূলের ত্রিচিনোপোলী থেকে ভেদারাণ্যিয়াম অবধি একটি অভিযান সংগঠিত করে রাজাজী তাঁর প্রভুর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। এর পরেই আসে বিদেশী কাপড়ের দোকানে ব্যাপক ধর্না। ১৯২১-এর মতোই মাদকবিরোধী অভিযান যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল তামিলনাড়ুর অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন শহরে, যেমন কোয়েম্বাটুর, মাদুরাই এবং বিরুধনগর (নাডার জাতের সঙ্গে যুক্ত রাজভক্ত জাস্টিস দলের রাজনীতি থেকে বেরিয়ে এসে কামরাজ এখানেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনক্রম শুরু করেন)। আইন অমান্যকে কঠোরভাবে একটি অহিংস ও নিয়ন্ত্রিত ব্যাপার হিসেবে রাখার জন্যে রাজাজী যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। দরিদ্র চাষী ও শ্রমিক কল্লার-রা যেসব অঞ্চলে বাস করতেন, সমুদ্রের দিকে যাত্রা করার সময়ে রাজাজী সেইসব অঞ্চলে ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেন। কিন্তু যেমন অন্যত্র হয়েছিল, তেমনি তামিলনাড়ুতেও আইন অমান্যের শক্তিবৃদ্ধির পেছনে কারণ ছিল 'জনগণের হিংসাত্মক বিস্ফোরণ ও পুলিশের নির্মম পীড়ন' (*কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*-এ আর্নল্ড, পৃ. ২৬৫)। ব্যাপারটি শুরু হয় মাদ্রাজে সমুদ্রতটে ব্যাপক সঙ্ঘর্ষের মধ্যে দিয়ে (২৭ এপ্রিল) এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় লবণ সত্যাগ্রহীদের বিরুদ্ধে পুলিশি সক্রিয়তা ও চুলাই কারখানায় ধর্মঘট ভাঙার জন্যে সরকারি প্রচেষ্টা। জুলাই-এ উত্তর আরকোট-এর গুড়িয়াট্টম-এ বেকার তাঁতিরা মদের দোকান ও পুলিশ চৌকি আক্রমণ করেন, দাম পড়ে যাওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা অগাস্টে মাদুরা-র বোড়িনায়কানুর-এ হাঙ্গামা করেন। মন্দা ও অসন্তোষের মধ্যে যোগসূত্র মাদুরা শহরেও সুস্পষ্ট বলে মনে হয়, এখানে সৌরাষ্ট্র সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ী ও তাঁতিদের থেকে সমর্থন লাভের ফলে আন্দোলন যথেষ্ট শক্তি লাভ করে। আন্দোলনে এই ধরনের সংযুক্তিকে পুরোপুরি পৌরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি) দখলের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন বেকার (তাঁর *পলিটিক্স অফ সাউথ ইন্ডিয়া*, পৃ. ১৭৯-তে), কিন্তু তা একান্তই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়।

মালাবারে লবণ অভিযানের সংগঠক ছিলেন নায়ার কংগ্রেসি নেতা, কেলাপ্পন। ১৯২০-এর দশকের মাঝামাঝি ভাইকোম মন্দির সত্যাগ্রহের মাধ্যমে নিচুজাতির এজাভা-দের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১১ নভেম্বর ১৯৩০-এ কালিকটের সমুদ্রতটে পুলিশের লাঠির মুখে বীরের মতো জাতীয় পতাকা বাঁচানোর মধ্যে দিয়ে শুরু হয় পি কৃষ্ণ পিল্লাই-এর রাজনৈতিক খ্যাতি। তিনিই কেরলের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠাতা।

সাংগঠনিক দিক দিয়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কংগ্রেসের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল উপকূলবর্তী অন্ধ্র। এখানে পরিবর্তন-বিরোধী ও স্বরাজীদের মধ্যে বিভেদ তামিলনাড়ুর মতো অত তীব্র ছিল না। আমরা আগেই দেখেছি, এখানে রাজস্ব বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল ১৯২৭ থেকে। পূর্ব ও পশ্চিম গোদাবরী, কৃষ্ণা ও গুন্টুরে জেলাভিত্তিক লবণ অভিযান সংগঠিত করা হয়। ব্যবসায়ীরা সোৎসাহে কংগ্রেসি তহবিলে দান করেন আর কাম্মা ও রাজু কৃষকরা (যাঁরা ছিলেন মুখ্য জাত) উপেক্ষা করেছিলেন বিভিন্ন নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা, যার মধ্যে ছিল

পশ্চিম গোদাবরীতে ১৪২০ একর জমিতে সেচের জল আটকে দেওয়া (*কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*-এ স্টেভার্ট, পৃ. ১২১)। কার্যকর সংগঠন থাকা সত্ত্বেও (বা বোধহয় সেই কারণেই) উপকূলবর্তী অন্ধ্রে ১৯২১-২২-এর মাটিঘেঁষা উত্তাপ খুব একটা ছিল না। নেলোর-এর একটিমাত্র গ্রাম বাদে রাজস্ব বিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত সরকারি আশঙ্কা অমূলক বলে প্রমাণ হয়। শ্রেণীগত প্রশ্নকে কেন্দ্র করে অন্ধ্রে পরে একটি খুবই শক্তিশালী কিসান আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, কিন্তু লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই ঘটনা ঘটে ১৯৩১-এ, ও আবার ১৯৩৪-এর পর থেকে, যখন অসহযোগ প্রত্যাহার করা হয় বা ভেঙে পড়ে। জনগোষ্ঠীর এলাকায় ২২ জানুয়ারি, ১৯৩১-এ বিশাখাপত্তনম এজেন্সির কল্যাণসিঙ্গাপুরে একদল পুলিশের ওপর হামলার একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটে। কিন্তু ১৯২১-এ যে অরণ্য সত্যাগ্রহ ছিল কংগ্রেসের প্রাথমিক ভিত্তি, তাকে জাগিয়ে তোলার কোনো চেষ্টা কংগ্রেস আর করে নি। ১৯৩০-এ অন্ধ্রে অসহযোগে দণ্ডিত লোকের মোট সংখ্যা ছিল মাত্র ২৮৭৮। এর সঙ্গে তামিলনাড়ুর ২৯৯১ যোগ করলে তার ফলটি সর্বভারতীয় সংখ্যা ৯০,০০০-এর ৬%-এরও কমে নেমে যায়।

ওড়িশায় ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি থেকেই গোপবন্ধু চৌধুরীর পরিচালনায় একটি শক্তিশালী গান্ধীপন্থী নেতৃত্ব বহাল ছিল। এখানকার উপকূলবর্তী অঞ্চলের বালাসোর, কটক ও পুরী জেলায় লবণ সত্যাগ্রহ খুবই কার্যকর আন্দোলন বলে প্রমাণ হয়। বিশেষভাবে বালাসোর সম্বন্ধে এপ্রিল ১৯৩০-এর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, 'আঞ্চলিক জনসমষ্টির একটি যথেষ্ট বড় অংশ' (এই সত্যাগ্রহ) সম্পর্কে 'পরিষ্কারভাবে সহানুভূতিশীল, ওড়িশার প্রাচীন লবণ তৈরি শিল্পের ওপর আইনি নিষেধাজ্ঞাকে অপছন্দ করা হলো নিঃসন্দেহে তার আংশিক কারণ' ('হোম পলিটিকাল', ২৫২/১/১৯৩০)।

আসামে, অন্ধ্রের মতোই, আইন অমান্য আবার তার ১৯২১-২২-এর তুঙ্গবিন্দুতে পৌঁছতে পারল না। এর জন্য প্রধানত দায়ী ছিল একসার ভেদ-সূচক কারণ : অসমিয়া ও বাঙালি আর হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সঙ্ঘর্ষ, আর ঘন অধ্যুষিত পূর্ব বাঙলা থেকে মুসলমান কৃষক অভিবাসীদের আগমন। প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে তরুণরাম ফুকন ছিলেন আইন অমান্যের প্রতি বিমুখ, আর এন সি বরদলৈ ছিলেন অনুৎসাহী। রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করে যে কানিংহাম সার্কুলার জারি হয়েছিল, তার বিরুদ্ধে মে মাসে যথেষ্ট সফল একটি ছাত্র ধর্মঘট হয়, আর ১৫,১৮৬ জন সরকারি স্কুল-ছাত্রদের মধ্যে ৩১১৭ জন তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে। সিলেট হয়ে ওঠে আন্দোলনের প্রধান ঘাঁটি, আর ১৯৩০-৩১-এ গ্রেপ্তার হওয়া ২৩৭৩ জনের মধ্যে ৮৯২ জনই ছিলেন এই জেলার লোক। সংরক্ষিত অরণ্যগুলিতে কিছু বে- আইনি শিকার চলার ফলে জানুয়ারি ১৯৩১-এ উত্তর কামরূপের রাস্তায় আসাম রাইফেলস্-এর কুচকাওয়াজ (রুটমার্চ)-এর দরকার পড়ে। ডিসেম্বরে খবর পাওয়া যায় যে, শ্রীমতী চন্দ্রপ্রভা সাইকিয়ানি কাচারি গ্রামগুলিতে আদিবাসীদের অরণ্য আইন ভাঙার জন্যে প্ররোচিত করছেন। কিন্তু আসাম কংগ্রেস নেতৃত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে অরণ্য সত্যাগ্রহ শুরু করতে নারাজ হন। এ সময়ে বাগিচা-শ্রমিকদের সঙ্গে আদৌ কোনো যোগাযোগ ছিল না, আর আবার অন্ধ্রের ধরনেই, রা য় ত স ভা ও লি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে একমাত্র ১৯৩১-এর পরই।

উপদলের কারণে বাঙলায় কংগ্রেস আজুতভাবে দীর্ণ হয়ে পড়েছিল। এখানে অসহযোগ

পরিচালনা করার জন্যে সুভাষচন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত দুটি পাল্টা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন, আর এমনকি ১৯৩০-এর আন্দোলনের তুঙ্গ অবস্থাতেও কলকাতা পৌরসভার নির্বাচনী ব্যাপারে তাঁদের প্রভূত উদ্যম অপচয় করেন। কলকাতার ভদ্রলোক নেতাদের গ্রামীণ জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার জন্যে যে উপদলীয় কোন্দলই দায়ী—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিচ্ছিন্নতা আর ১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের আপেক্ষিক ব্যর্থতা—গোটা ১৯৩০-এর দশক জুড়ে বাঙলা কংগ্রেস যে 'ক্ষয়িষ্ণু' হয়ে পড়ছিল সেই প্রতিপাদ্যের প্রমাণ হিসেবে এই দুটি ব্যাপারকেই ধরা হয়েছে (*লোকালিটি, প্রভিন্স অ্যান্ড নেশন*-তে গালাগার)। তাহলেও ১৯৩০-৩১-এর সবচেয়ে বেশি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন (১৫,০০০) বাঙলা থেকেই, আর সেই সঙ্গে এখানে হিংসাত্মক ঘটনাও ছিল সর্বাধিক (একটি সরকারি হিসেব অনুযায়ী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ছাড়াও এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা ১৩৬ ('হোম পলিটিকাল', ১৪/২০/১৯৩১)। আর বোধ হয় কংগ্রেস সংগঠনের আপেক্ষিক দুর্বলতার (গুজরাট, অন্ধ্র, যুক্ত প্রদেশ বা বিহারের তুলনায়) কারণে আরও বহুসংখ্যক ও সশস্ত্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, যদিও সেগুলি ছিল আরও খণ্ডিত। মেদিনীপুরে, আরামবাগে ও অন্যান্য বেশ কয়েকটি গ্রামীণ এলাকায় নুন ও চৌকিদারি করকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে শক্তিশালী আন্দোলন। গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত যে গান্ধীপন্থী কর্মীরা এখানে প্রাথমিক উদ্যোগ সঞ্চার করেছিলেন, তাঁরাও, পরবর্তী কালের যে-কোনো ঐতিহাসিকের মতোই, শহরে ভদ্রলোকদের সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বের ব্যাপারে কলকাতার নেতাদের বিরুদ্ধে সমান বিরূপ ছিলেন। যেসব অঞ্চলে আগে গান্ধীপন্থী কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয় নি (যেমন, মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমা, যার পাশে আরামবাগ থেকে গিয়েছিল কঠোরভাবে অহিংস) সেখানে এবং অন্যত্রও সামনের সারির নেতাদের অপসারণের পর কৃষকদের জমায়েত প্রায়শই পুলিশের সঙ্গে জঙ্গী সঙ্ঘর্ষের রূপ ধারণ করেছিল। আর এপ্রিল ১৯৩০-এ চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর মধ্যশ্রেণীর সন্ত্রাসবাদ পৌঁছয় তার শেষ ও সবচেয়ে উদ্যমী পর্যায়ে। তবুও ১৯২১-এর সঙ্গে তফাত পরিষ্কার ধরা পড়ে। তার কারণ একটি কার্যকর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অভাব, যেটি তখন জোগান দিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাস। এ ছাড়াও তফাতের অন্যান্য কারণ ছিল শিল্প শ্রমিকদের তুলনামূলক নিষ্ক্রিয়তা, মাটিঘেঁষা জনগোষ্ঠীর মানুষ ও কৃষকদের অভ্যুত্থানের অনুপস্থিতি (সেই সময়ে যেমন দেখা গিয়েছিল ঝাড়গ্রাম, রংপুর, চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার মতো দূরস্থিত জায়গায়), আর সবার ওপরে সাধারণভাবে মুসলমানদের উদাসীনতা। গোড়ার দিকে মুসলমানদের যোগ দেওয়ার যে খানিকটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছিল, মে ১৯৩০-এ ঢাকা শহরে ও জুলাই-এ কিশোরগঞ্জের গ্রামগুলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে, তাতেও ছেদ পড়ে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, ঐ দু জায়গাতেই সাম্প্রদায়িকতা ছিল সামাজিক টানাপোড়েনের বিকৃত বহিঃপ্রকাশ। আরও বেশি র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ঐ টানাপোড়েনকে হয়তো সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লক্ষ্যে কাজে লাগাতে পারত। (দাঙ্গার) মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীদের বাড়ি, দোকান ও গুদোমঘর। গোহত্যা বা মসজিদের সামনে গান-বাজনার মতো বিষয়ের চেয়ে দাঙ্গাকারীরা যেন ঋণপত্র ছিনিয়ে নেওয়াতেই বেশি আগ্রহী ছিল। কিশোরগঞ্জে গোলমাল শুরু হয় মুসলমান তালুকদারের বাড়িতে আক্রমণ দিয়ে। শ্রমিক ও কৃষক দলের একটি শাখা এখানে শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলন

শুরু করেছিল, কিন্তু গ্রেপ্তারের ফলে কমিউনিস্টরা অপসারিত হওয়ার পর ঐ আন্দোলনের দখল নিয়ে নেয় সাম্প্রদায়িক মোল্লারা। স্বদেশী দিনগুলিতে যে-বিন্যাস প্রথম প্রকট হয়ে উঠেছিল সেটি আর-একবার ফিরে আসে : বাঙলায় মৌল জাতীয়তাবাদী দুর্বলতা কোনো সুস্পষ্ট জমিনদার-বা মহাজন-বিরোধী কর্মসূচী গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। ব্যাপারটি ঘটে এমন এক সময়ে যখন জিনিসপত্রের দাম প্রচণ্ডভাবে পড়ে যাওয়ায় গ্রামাঞ্চলে উত্তেজনা বাড়ছিল। গ্রামীণ গান্ধীপন্থীদের কোনো শহুরে ভদ্রলোক-মার্কা পক্ষপাত ছিল না, কিন্তু ১৯৩০-৩১-এ তাঁরাও কোনোরকম খাজনা-বন্ধের ডাক দিতে ভরসা পান নি, আর জোতদার-ভাগচাষী সম্পর্কের প্রশ্নগুলিও কংগ্রেসের তত্ত্ব বা প্রয়োগের পরিধির বাইরেই থেকে যায়।

খানিকটা একই ধরনের বিন্যাস দেখা যায় পাঞ্জাবেও। এখানে প্রধানত শহুরে হিন্দু ব্যবসায়ীদের দল হিসেবে কংগ্রেসের খ্যাতি মুসলমান ও শিখ কৃষকদের সমবেত করার ক্ষেত্রে অসুবিধের সৃষ্টি করে, কারণ এখন খিলাফত বা গুরুদ্বারা পরিচালনার শুদ্ধিকরণের মতো ঐক্যবিধায়ক কোনো ধর্মীয় বিষয়ও ছিল না। ইউনিয়নপন্থী গোষ্ঠী ছিল অনড় রাজভক্ত, আর আকালিদের মনোভাব এক থাকত না। তারা সিং কংগ্রেসকে সমর্থন করেন, কিন্তু খড়ক সিং দূরে থেকে যান। ব্রিটিশরা তখনও পর্যন্ত পাঞ্জাব সম্বন্ধে প্রচণ্ড স্নায়ুচাপের মধ্যে ছিল। সেনাবাহিনীর সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগাযোগ, একটি সীমান্ত প্রদেশের কাছে তার অবস্থান (যেখানে খুদা-এ-খিদমত্-গাররা ছিলেন ঘোর সমস্যার বিষয়), আর সেই সঙ্গে প্রান্তিক র‍্যাডিকালদের উপস্থিতি যাঁরা সন্ত্রাসবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যসীমায় সক্রিয় ছিলেন : নওজওয়ান ভারত সভা ও কীর্তি কিসান গোষ্ঠী। ব্যবসায়ীদের সমর্থনের ফলে প্রথম দিকে বয়কট প্রচণ্ড সফল হয়। অমৃতসরের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রে জুলাই মাসে ব্রিটিশ কাপড়ের মাসিক বিক্রি ২৫ লাখ থেকে মাত্র ২ লাখ টাকায় নেমে আসে। কিন্তু সেপ্টেম্বর নাগাদ *পাক্ষিক প্রতিবেদন*-গুলিতে অন্যান্য প্রদেশের মতো এখানেও কাপড় ব্যবসায়ীদের 'ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা' সম্বন্ধে বলা হতে থাকে, 'যাঁদের অনেকেই আসন্ন দেউলিয়া অবস্থার মুখোমুখি হয়েছিলেন' ('হোম পলিটিকাল', ১৮/১০/১৯৩০)। এর পুরোপুরি উল্টো পিঠে, শহরের যুবকদের মধ্যে র‍্যাডিকাল মনোভাব ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এটি আরও বেশি উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল ৭ অক্টোবর ভগৎ সিং-এর মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা জারি হওয়ার ফলে। ১৮ অক্টোবর পাঞ্জাবের লাট কৃষিজাত পণ্যের দাম পড়ে যাওয়ায় 'তীব্র উৎকণ্ঠা' প্রকাশ করেছিলেন— 'দুষ্কৃতিকারীরা এখনই জমিনদার ও কৃষকদের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তারা জমির খাজনা না দিতে উপরোধ করছে' (*আরউইন কালেকশন*)। অক্টোবর-এ প্রতিষ্ঠিত আকালি-পরিচালিত পা ঞ্জা ব জ মি ন দা র স ভা যথেষ্ট পরিমাণে নরমপন্থী থেকে গিয়ে ব্রিটিশদের অবাক্‌খুশি করলেও, রি য়া স তি প্র জা ম ণ্ড ল কিন্তু অসহযোগকে সমর্থন করার সঙ্গে সঙ্গে ফুলকিয়ান রাজ্যগুলিতে শিখ কৃষকদের মধ্যে পাতিয়ালার মহারাজার বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। বোধহয় এর থেকে আরও বেশি আগ্রহজনক হলো বেশ কয়েকটি মোটামুটি স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ : এপ্রিলে হিসার জেলায় চাষীদের খাজনা দিতে নারাজ হওয়া আর জোর করে ভূস্বামীদের শস্য আটক ; সেপ্টেম্বরে কাংড়ায় বনে পশুচারণ সংক্রান্ত আইন উপেক্ষা ; আর ডিসেম্বরে রোহটাকে ব্যাপক সামাজিক ডাকাতি। এই ডাকাতিতে জাঠেরা 'অন্যান্য নিচু বর্ণের সাহায্যে' মহাজন ও শস্য ব্যবসায়ীদের আক্রমণ করেন, তাদের সম্পত্তি লুঠ করেন ও হিসেবের খাতা পুড়িয়ে দেন। '...জাঠ

গ্রামবাসীরা যে এই সব ডিক টার্পিন [রঘু ডাকাত]-দের প্রতি অনেকটাই সহানুভূতিশীল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।...এটা যদি দুতরফেই হিন্দুদের ব্যাপার না হতো, তাহলে আমরা এ সম্বন্ধে সংবাদপত্র থেকে আরও অনেক বেশি জানতে পারতাম' (আরউইন-কে লাট মন্টমোরেন্সি, ৭ ডিসেম্বর, ১৯৩০)।

পি সি সি-র ২১ জুলাই ১৯৩০-এর প্রতিবেদন থেকে বিহারে অসহযোগের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা দুইই পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে। 'কার্যত আইনজীবী ও ছাত্রদের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি'। 'আন্দোলন কার্যত পুরোপুরি গ্রামেই সীমাবদ্ধ ও গ্রামবাসীদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে' ; আর নবনিযুক্ত প্রাদেশিক 'পরিচালক' দীপনারায়ণ সিংহ-কে একজন 'বড় জমিদার ও প্রবীণ জাতীয়তাবাদী' হিসেবে কার্যকর সমিতির সদস্যপদের জন্যে সুপারিশ করা হচ্ছিল (এ আই সি সি, জি / ৮০/১৯৩০)। বেশির ভাগ বড় জমিদার রাজভক্তই থেকে গিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীপন্থী গঠনমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে কংগ্রেস ছোটো ছোটো ভূস্বামী (বিশেষভাবে বিহারে যাদের সংখ্যা ছিল বিরাট) এবং সম্পন্ন রায়তদের মধ্যে একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত ভিত্তিভূমি গড়ে তোলে। আর ঐ সংগঠনের শক্তি সম্পর্কে আন্দাজ পাওয়া যায় পি সি সি-এর ঐ একই প্রতিবেদন থেকে। সেখানে দাবি করা হয় যে 'আমরা আমাদের নিজস্ব ডাকব্যবস্থা গড়ে তুলেছি'। সাংগঠনিক শক্তি হয়তো প্রথমদিকে আকাঁড়া বিস্ফোরণকে দমিয়ে রাখতে পারে, কারণ জুলাই-এ লাট স্টিফেন্সন জানান যে, 'পরিস্থিতি অসহযোগের সময়ের চেয়ে অনেক ভালো আর বোম্বাই ও কেন্দ্রীয় প্রদেশে যে আধা-ধর্মীয় উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল এখন আর তা নেই' (*সাইক্‌স্ পেপার্স*-এর অন্তর্ভুক্ত সিমলায় লাটদের সম্মিলনের প্রতিবেদন)। কিন্তু নিষ্ফল লবণ অভিযান (যার পক্ষে বাস্তব পরিস্থিতি ছিল নিঃসন্দেহে অনুপযুক্ত) থেকে গুরুত্ব সরে গেল প্রচণ্ড শক্তিশালী চৌকিদারি কর-বন্ধ বিক্ষোভে। তার সঙ্গে সঙ্গে সরকারি বড়কর্তারা অন্য সুরে গাইতে শুরু করলেন। নভেম্বর নাগাদ কারাবন্দীর সংখ্যা ছিল প্রায় ১১,০০০, গোটা জেলা জুড়ে চৌকিদারি কর দিতে অস্বীকার করা হয়, বিদেশী কাপড় ও মদের বিক্রি নাটকীয়ভাবে পড়ে যায়, আর মুঙ্গের অঞ্চলের বারহী-র মতো জায়গায় প্রশাসন কার্যত ভেঙে পড়ে (*কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*-এ জি ম্যাকডোনাল্ড)। কিন্তু ছোটো ছোটো ভূস্বামীদের সঙ্গে প্রাদেশিক নেতৃত্বের যোগাযোগ ছিল জোরদার। তাঁরা খাজনা-বন্ধ আন্দোলন করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন, যদিও দাম পড়ে যাওয়ার ফলে কৃষকদের দুর্দশা বেড়েই চলেছিল। বিহারে ১৯২৯-এ স্বামী সহজানন্দের নেতৃত্বে একটি স্বতন্ত্র কিসান সভা আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ঐক্যের আবহাওয়ায় ঐ আন্দোলন চাপা পড়ে যায় ও পরের বছরে পুরোপুরি মিলিয়ে যায় বলে মনে হয়। এই ব্যাপারটি তাৎপর্যপূর্ণ। অন্ধ্র বা আসামে যে-ধরনটি আগেই লক্ষ্য করা হয়েছে সেইভাবে এই আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠেছিল একমাত্র ১৯৩৩-৩৪-এর আইন অমান্যের পরাজয়ের পরেই। ১৯৩০-এর শেষে ও ১৯৩১-এর গোড়ায় পুলিশ দলের ওপর একের-পর-এক আক্রমণের ফলে এমনকি বিহারেও কিন্তু অহিংসার ওপর গান্ধীপন্থী লাগাম আলগা হয়ে আসছিল। ডিসেম্বরে সারন জেলার এক গ্রামে চৌকিদারি কর-বিরোধী বিক্ষোভে ২৭ রাউণ্ড ছর্‌রা (বাক্‌শট) চালিয়েও কোনো ফল হয় নি। পরের মাসে স্বাধীনতা দিবসে বেগুসরাই (মুঙ্গের)-তে জনতা মহকুমা-অধিকারীকে তাড়া করে খালে ফেলে দেয়। ১৪৬ রাউণ্ড গুলি চালানোর পর তবে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করা যায়।

ছোটোনাগপুরের জনগোষ্ঠীয় অঞ্চলও অস্থির হয়ে উঠেছিল। এখানকার হাজারিবাগে আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন বোঙ্গা মাঝি ও সোমরা মাঝি। সংস্কৃতায়নের ধারায় সামাজিক-ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে এই আন্দোলনের কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতি মনোভাবও গড়ে ওঠে (অনুগামীদের মাংস-ও মদ-বর্জন এবং শুধু খাদি পরতে বলা হয়েছিল)। আবার অন্যত্র গান্ধীর পতাকার নিচে সাঁওতালরা ব্যাপকভাবে বেআইনি মদ চোলাই-এর কাজ করছেন বলে খবর পাওয়া যায়। কিন্তু নিচুশ্রেণীর এই জঙ্গীভাবের বিভিন্ন দৃষ্টান্তের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশরা নির্মমভাবে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার ফলে ঐ সময়েই ছোটো ছোটো জমিনদার ও সম্পন্ন রায়তদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ছিল। আর মার্চ ১৯৩১-এর আন্দোলনই বিরতিকে বিহার কংগ্রেস নেতৃত্ব হাঁফ ছেড়ে স্বাগত জানায় (*কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*-এ ম্যাকডোনাল্ড)।

আইন অমান্যের দুটি পর্যায়ের ধাঁচ বোধহয় সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল যুক্ত প্রদেশে। আর ১৯৩০-এর অক্টোবরের মাঝামাঝি কিছুদিন জেলে থাকার সময় জওহরলাল নেহরু তাঁর অভিজ্ঞতাজাত মন্তব্যে ঐ ধাঁচ সুষ্ঠুভাবে সংক্ষেপে তুলে ধরেন—'শহরগুলো ও মধ্যশ্রেণীরা হরতালে ও মিছিলে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে', কিন্তু 'এখনও কৃষককুল থেকে তাজা রক্তের জোগান পাওয়া যেতে পারে। কৃষকদের ক্ষেত্রে...সংরক্ষিত ভাণ্ডার...বিশাল' (*অটোবায়গ্রাফি*, পৃ. ২৩২)। গোড়ার থেকেই বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যোগ দিয়েছিল ১৯২১-এর চেয়ে কম। স্কুল বা আদালত ত্যাগের সংখ্যা ছিল সামান্য আর শহরের ব্যবসায়ীদের উৎসাহ স্বল্পস্থায়ী বলে প্রমাণ হয়। ১৯৩০-এর শরতের পর থেকে দাম প্রচণ্ড পড়ে যাওয়ার ফলে গ্রামাঞ্চলে কিন্তু খাজনা-বন্ধের চাপ ও সেপ্টেম্বর-এর গোড়ার দিকে *পাক্ষিক প্রতিবেদন*-এ যাকে 'হিংসার ও কর্তৃপক্ষকে উপেক্ষা করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা' বলা হয়েছে, এই দুটি ব্যাপারই বাড়তে থাকে। যুক্ত প্রদেশের ২১টি জেলা পরিদর্শনের পর ৩ সেপ্টেম্বর পুলিশের ইনস্পেক্টর-জেনারেল জানান যে, কানপুর হলো অন্যতম মুখ্য নগরকেন্দ্র যার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রামে, বিশেষ করে জাঠ-অধ্যুষিত বুলন্দশহর-মিরাট অঞ্চলে পরিস্থিতি আতঙ্কজনক হয়ে উঠছে। মুসলমানরা কার্যত ব্যাপকভাবে যোগ দেন নি—এটি হলো অসহযোগের আর-একটি বিপরীত দিক এর ফলে শহরের আন্দোলন আরও দুর্বল হয়ে পড়ে (যুক্ত প্রদেশে শহরের জনসংখ্যার ৩৭% ছিলেন মুসলমান, যদিও সব মিলিয়ে তাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৪.৫%), আর সক্রিয় আইন অমান্যের কেন্দ্র বাছাই করার সময়ে কংগ্রেস, মনে হয়, ইচ্ছে করেই গ্রামাঞ্চলের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি এড়িয়ে গিয়েছিল। ফেব্রুয়ারি ১৯৩১-এ বারাণসীতে একটি গুরুতর দাঙ্গা হয়। তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল জনৈক মুসলমানের কাপড়ের দোকানে ধর্না। মার্চে ভগৎ সিং-এর সম্মানে কংগ্রেস হরতাল ডাকায় কানপুরে বড় মাত্রায় সাম্প্রদায়িক গোলযোগ হয় ; তাঁর ফলে নিহত হন ২৯০ জন। এই গোলযোগের সময়ে পুলিশ অদ্ভুতভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে, ফলে পরোক্ষে দুপক্ষকেই জমায়েত হতে সাহায্য করে। আগের বছর ঢাকাতে এই ধরনটি দেখা গিয়েছিল।

অসহযোগের সঙ্গে আইন অমান্যের বৈপরীত্য ছিল দ্বিমুখী, কারণ যুক্ত প্রদেশের বেশ কিছু জায়গায় আইন অমান্য অবশ্যই অনেক বেশি করে গ্রামবাসীদের অভিযানে পরিণত হয়েছিল। এবার কংগ্রেসের সংগঠন ছিল নিঃসন্দেহে বহু বিস্তৃত, ব্যাপক ও সুশৃঙ্খল (জ্ঞান পাণ্ডে, *অ্যাসেনডেন্সি অফ দি কংগ্রেস ইন ইউ.পি.*, পৃ. ৪০, ১৫৪)। ১৯২০-২১-এ অবধে কিসান অভ্যুত্থান সম্পর্কে

অভিজ্ঞতা থাকার ব্রিটিশ গোড়া থেকেই খাজনা-বন্ধের ব্যাপারে শঙ্কিত ছিল। আর যুক্ত প্রদেশের প্রাদেশিক নেতৃত্ব অক্টোবরে খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের ডাকও দিয়েছিলেন (বিহার নেতৃত্ব যা দেন নি)। তাঁরা জমিনদারদের রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করতে ও কৃষকদের খাজনা না-দিতে পরামর্শ দেন। এইভাবে ঝাঁপ দেওয়ার ব্যাপারে জওহরলালের র‍্যাডিকাল অবস্থান হয়তো খানিকটা দায়ী ছিল। যুক্ত প্রদেশের জমিনদাররা প্রকাশ্যেই রাজভক্তি দেখাতেন (জমিনদারদের লখনউ সম্মিলনে ফেব্রুয়ারি ১৯৩০-এর স্বাধীনতা প্রস্তাবকে ধিক্কার জানানো হয়েছিল), আর জিনিসের দাম এক বিপর্যয়ী ও অভূতপূর্ব মাত্রায় পড়ে যাওয়ার ফলে, দশবছর আগের অংশত সফল সংগ্রামের স্মৃতি যাঁদের মনে ছিল সেই কৃষকদের সামলে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু কংগ্রেস সংগঠন ও কৃষকদের জঙ্গীভাবের মধ্যে দোটানার সম্পর্ক যুক্ত প্রদেশের ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট ছিল—আঞ্চলিক তারতম্যের গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান পাণ্ডে যেমন দেখিয়েছেন। কংগ্রেসি শৃঙ্খলা সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় ছিল শ্রীকৃষ্ণ পালিওয়াল-এর পরিচালনাধীন আগ্রায়। এই অঞ্চলে বড় জমিনদার ছিলেন খুব কম, ছোটো ভূস্বামী ও ধনী কৃষকের সংখ্যা ছিল বিরাট। এই কৃষকদের বেশির ভাগই দখলি স্বত্ব ভোগ করতেন। এখানকার বারাউড়া ও ভিলাউতি-র মতো গ্রামে বারদোলির ধাঁচটি সফলভাবে অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ কর না-দেওয়া, পুলিশি অত্যাচারের মুখে গণ-গ্রামত্যাগ আর ভূস্বামী-বিরোধী বিক্ষোভ তথা হিংসাত্মক ঘটনা এড়িয়ে যাওয়া। রায় বেরেলীতে বড় তালুকদারদের উপস্থিতি ছিল অনেক প্রকট, এখানে জমির মাত্র ১.৫% ছিল দখলি রায়তদের হাতে আর ১৯২০-২১-এর কিসান বিক্ষোভ ছিল স্মৃতিতে উজ্জ্বল। ফলে নিচের থেকে র‍্যাডিকাল চাপ ছিল অনেক বেশি তীব্র। জুন মাস থেকেই জনৈক আঞ্চলিক নেতা, কালকা প্রসাদ খাজনা-বন্ধের প্রচার শুরু করেছিলেন ও স্বরাজের আমলে কম খাজনার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন। কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর কংগ্রেসি সংগঠন জেলার ওপর তার দখল সুদৃঢ় করে তোলার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩১-এর মধ্যেই কালকা প্রসাদের মতো মানুষদের বাগে আনা হয়। কয়েকজন অত্যাচারী ভূস্বামীকে হত্যা সমেত সবচেয়ে বেশি হিংসাত্মক বিক্ষোভের ঘটনা ঘটে মার্চ ১৯৩১-এর পরে, আন্দোলন চলার সময়ে নয়, আর সাধারণত সেইসব অঞ্চলে যেগুলি তুলনামূলকভাবে কংগ্রেসি বিক্ষোভ ও সংগঠনের সংস্পর্শে আসে নি। যেমন, এলাহাবাদের দোআব তেহশিলগুলিতে। কংগ্রেস এই তেহশিলগুলিকে এড়িয়ে গিয়েছিল, কারণ এখানে মুসলমান ভূস্বামীরা মুখোমুখি হয়েছিলেন হিন্দু রায়তদের, আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আশঙ্কা ছিল। বারা বাঁকী-তে খাদি বা চরখা বিশেষ দেখা যায় নি কিন্তু আঞ্চলিক, আনুষ্ঠানিকভাবে 'কংগ্রেস' কর্মীরা ১৯৩১-এর মাঝামাঝি থেকে প্রচার করছিলেন, জমি হলো ভগবানের দান, তা শুধু জমিনদারদের হতে পারে না (জ্ঞান পাণ্ডে, অধ্যায় ৬-৭)। অক্টোবর ১৯৩০-এ খাজনা বন্ধের স্লোগান একবার মঞ্জুর হওয়ার পর কংগ্রেসি সংগঠন যুক্ত প্রদেশে ঐ আন্দোলনকে সফল করে তুলেছিল। কিন্তু সর্বভারতীয় রাজনীতি মার্চ ১৯৩১-এ তাকে পিছিয়ে আসতে ও বিরতিকালীন মাসগুলি জুড়ে কৃষকদের সংযত থাকতে বাধ্য করে। আমরা পরে দেখব, কিসানদের দিক থেকে এইটিই ছিল সম্ভবত সেই মানস-মুহূর্ত যা চিরকালের মতো হারিয়ে যায়। মিরাটের জনৈক ভূবাসন-আধিকারিক (সেটলমেন্ট অফিসার) ১৯৩৪-এ স্মরণ করেছেন: '১৯৩১-এর শরতে কংগ্রেস যখন অবশেষে সুস্পষ্টভাবে তাদের "খাজনা-বন্ধ" প্রচার শুরু করল তখন তারা দেখল...'বাস চলে গেছে' (সুযোগ ফস্কে গেছে)।' (*ঐ*, পৃ ১৯৩)

এইভাবে, নানারকম স্থানীয় তারতম্য সত্ত্বেও যা আঞ্চলিক তথ্য পাওয়া যায়, তাতে ১৯৩০-এর শরতের পর থেকে মোটামুটি একই ধরনের ছক বেরিয়ে আসে। সেই বিন্যাসটি হলো একইসঙ্গে অবনতি ও র‍্যাডিকাল হয়ে ওঠার প্রসার : বিভিন্ন বুর্জোয়া গোষ্ঠী ও কৃষকদের ওপরমহলের সঙ্গে সংযুক্ত নানান ধরনের সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়া (যেমন, শহরের বয়কট ও রাজস্ব-বন্ধ) আর সেইসঙ্গে কম নিয়ন্ত্রণযোগ্য নানান সংগ্রামী ধাঁচের দিকে বিক্ষিপ্ত কিন্তু মোটামুটি ব্যাপক প্রবণতা (খাজনা-বন্ধ, জনগোষ্ঠীয় বিস্ফোরণ ও গণ-হিংসাত্মক কার্যকলাপ)। গান্ধীপন্থী নেতৃত্ব জনগণের নিয়ন্ত্রিতভাবে অংশগ্রহণে বিশ্বাসী ছিলেন; পাটওয়ারি মনোভাবসম্পন্ন ও কৃষকদের র‍্যাডিকাল অবস্থান সম্পর্কে সন্ত্রস্ত ছিলেন। ব্যবসায়ী নেতৃবর্গ (তাদের অনেকেরই স্বার্থ জড়িয়ে ছিল জমির সঙ্গে—১৯৩৯-৪০-এর *ইন্ডিয়ান ইয়ার বুক*-এ এমনকি ঘনশ্যামদাস বিড়লাকেও 'মিলমালিক, ব্যবসায়ী ও জমিনদার' বলে বর্ণনা করা হয়েছে)। এই দুপক্ষের ক্ষেত্রেই এই ধরনের পরিস্থিতিতে কোনো এক জাতের আপসরফার দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা খুবই স্বাভাবিক। এদিকে প্রথম দফার গোল টেবিল বৈঠকের (নভেম্বর ১৯৩০-জানুয়ারি ১৯৩১) সময়ে লন্ডনের ঘটনা-প্রবাহ আপসের একটা সুযোগ এনে দিয়েছিল বলে মনে হয়।

গোল টেবিল বৈঠক

হাজারে হাজারে ভারতীয় যখন কারাবরণ করছিলেন, কিংবা লাঠি-গুলি আর সম্পত্তি ক্রোকের মুখোমুখি হচ্ছিলেন, তখন, অনেকটাই অ-প্রতিনিধিমূলক মুষ্টিমেয় কিছু লোক গেলেন লন্ডনে, বহুদলীয় ব্রিটিশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা চালাতে। কংগ্রেস দূরে সরে রইল, যেমন রইলেন হোমি মোদী ছাড়া ভারতীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকাংশ কর্তাব্যক্তিরা। মুসলিম রাজনীতিবিদরা কিন্তু সদলবলে হাজির হলেন (মহম্মদ আলী, মহম্মদ শফি, আগা খান, ফজলুল হক, জিন্না—আর ছিল বড়লাটের শাসন-পরিষদের সদস্য হিসেবে ফজল-এ-হুসেন-এর গুরুত্বপূর্ণ নেপথ্য প্রভাব)। আর, তাঁদের সঙ্গে গেলেন হিন্দু মহাসভার নেতারা (মুঞ্জে ও জয়কর), লিবারেল-রা (সপ্রু, চিন্তামণি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী) এবং রাজন্যবর্গের এক বিরাট বাহিনী। মে ১৯৩০-এর সাইমন কমিশন প্রতিবেদনে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল রাজ্যগুলিতে দ্বৈতশাসনের বদলে দায়িত্বশীল সরকার ; জরুরি কিছু ক্ষমতা অবশ্য রাজ্যপালের হাতেই সংরক্ষিত থাকবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কোনোরকম রদবদলের ইঙ্গিতই এতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু ভারতের উত্তাল গণবিক্ষোভে এই রিপোর্ট কার্যকর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠল। ১৯ জুন ওয়েজউড-বেন-এর কাছে আরউইন স্বীকার করেন যে 'কোনোখানেই ডোমিনিয়ন মর্যাদার কথা উল্লেখ করতে একদম রাজি না হওয়ায়' এই প্রতিবেদন 'এখানে এক বিস্ফোরণে ইন্ধন জোগাবে'। স্পষ্টতই কেন্দ্রে কোনো এক ধরনের পরিবর্তনের আশ্বাস ছিল জরুরি ; আর এইখানেই, রাজন্যশাসিত ভারত সমেত যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাটি ব্রিটিশদের কাছে এল সত্যি সত্যিই দৈবপ্রেরিত হয়ে। কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার একটা বড় অংশ যদি হয় রাজন্যবর্গের মনোনীত, তাহলে সেই সংস্থা অবশ্যই যথেষ্ট নিরাপদ হবে। আর তাই ১৯ জানুয়ারি ১৯৩১-এর সম্মিলনের পর প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড ঘোষণা করেন যে, 'আইন-প্রণয়ন বিভাগের

কাছে শাসন বিভাগের দায়ী থাকার নীতি স্বীকার করতে রাজকীয় সরকার প্রস্তুত থাকবে'। এই ধারণাটি আনুষ্ঠানিকভাবে এসেছিল রাজন্যবর্গের কাছ থেকে ; বিশেষত হায়দরাবাদের দেওয়ান আকবর হায়দারি ও মাইশোরের দেওয়ান মির্জা-ইসমাইল ছিলেন এর প্রবক্তা। কিন্তু প্রথম দিকে হায়দারিকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছিলেন আবাসী ব্রিটিশ প্রতিনিধি লেফটেন্যান্ট কর্নেল টেরেন্স এইচ কিস। আর প্রস্তাবটিকে সাগ্রহে লুফে নেন ম্যলকম হেইলি প্রমুখ ব্রিটিশ আমলা, রিডিং, হোর, জেটল্যাণ্ড প্রমুখ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এবং অতীব নরমপন্থী লেবর দলীয় ভারত-সচিব ওয়েজউড-বেন। ভারতীয় রাজন্যবর্গ একটি দুর্বল কেন্দ্রেই আগ্রহী ছিলেন ; তাঁরা সেখানে ঢুকে পড়লে সেটির অগণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় থাকবে, বিশেষত সেই সময়ে যখন জনগণের চাপের ফলে কমপক্ষে ডোমিনিয়ন মর্যাদা চালু হওয়ার একটা আশঙ্কা ছিল। সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারে আধিপত্য থাকত কংগ্রেসের। আর এইখানেই হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের সম্ভাবনায় শঙ্কিত মুসলিম রাজনীতিবিদদের সঙ্গে রাজন্যবর্গের স্বার্থের একটা বিষয়গত সাদৃশ্য ছিল। তাছাড়া ম্যাকডোনাল্ড-এর ১৯ জানুয়ারির বক্তৃতায় স্পষ্টভাবেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধরা পড়ে, যেমন প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, অর্থসংস্থান তথা আর্থনীতিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, যা ব্রিটিশরা কেন্দ্রীয় দায়িত্বের প্রতিশ্রুতিতে ঘিরে রেখেছিলেন বেশ কিছু 'সংরক্ষণ ও রক্ষাকবচ' দিয়ে। এই পরিকল্পনার খুঁটিনাটি ঠিক করতে প্রায় পাঁচ বছর লাগে, কারণ একটা ব্যাপার দ্রুত স্পষ্ট হয়ে যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র ছিল বহুরূপীর মতো, এবং জানুয়ারি, ১৯৩১-এ এটিকে মেনে নেওয়ার পেছনে কাজ করছিল নানা ধরনের উদ্দেশ্য। রাজন্যবর্গ মনে করেছিলেন যে, এটি ব্রিটিশ সর্বময় ক্ষমতার দাবিকে খর্ব করবে, দুর্বল কেন্দ্রের ধারণা পছন্দ হয়েছিল মুসলমানদের, সপ্রুর মতো উদারপন্থীরা আকৃষ্ট হয়েছিলেন দায়িত্বশীল কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতিতে, আর অধিকাংশ ব্রিটিশ রাজনীতিবিদের মনে হয়েছিল, যদিও এর মাধ্যমে তাঁরা 'দায়িত্বশীল সরকার জাতীয় একটা কিছু মঞ্জুর করেছেন', তাহলেও 'ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের বাস্তবতা ও যথার্থ্য রক্ষিত হচ্ছে'। (আর জে মুর, *ক্রাইসিস অফ ইন্ডিয়ান ইউনিটি*, পৃ. ১৫৫)।

ব্রিটিশদের ফাঁদে পা দেওয়ার দ্বিতীয় ঘটনা হলো বৈঠকের সংখ্যালঘু সমিতি কোনো ব্যাপারেই একমত হতে পারল না। এর জন্যে অনেকটাই দায়ী ছিলেন হিন্দু মহাসভার দুই নেতা মুঞ্জে ও জয়কর, আর তাঁদের সঙ্গে শিখ প্রতিনিধিবৃন্দ। লিবারেলদের সপ্রু গোষ্ঠীর সঙ্গে জিন্না, শফি ও আগা খান প্রায় একটা চুক্তিই করে ফেলেছিলেন। চুক্তির ভিত্তি ছিল ১৯২' -এর আপসের অবস্থান, অর্থাৎ মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত আসন সমেত যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলী কিন্তু ১৯২৮-২৯-এর মতো এখানেও সব ভেস্তে গেল, কারণ পাঞ্জাব ও বাঙলার মুসলমানদে জন্য আসন সংরক্ষণের বিরোধিতা করল হিন্দু মহাসভা। তার ওপর আবার শিখরা পাঞ্জা ৩০% আসন দাবি করায় (সেখানে তাঁরা ছিলেন জনসংখ্যার ১১% এবং ইতোমধ্যেই তাঁদে প্রতিনিধি ছিলেন প্রায় ১৯%) অবস্থা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। মহাসভার যুক্তি ছিল : পাঞ্জ আর বাঙলায় মুসলমানদের জন্যে আসন সংরক্ষণের কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ সেখ তাঁরাই সংখ্যাগুরু। মহম্মদ আলী কিন্তু এর বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি দেখান যে, সংখ্যার বিচ এই দুই রাজ্যে মুসলমানদের যৎসামান্য গরিষ্ঠতা থাকলেও, সার্বজনীন ভোটাধিকার যে চালু হচ্ছে না, তাই পাঞ্জাবে বানিয়া ও বাঙলায় হিন্দু জমিনদারদের সামাজিক ক্ষমতার দ

সেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু জয়কর আর মুঞ্জে এতটুকুও ছাড়তে রাজি হলেন না, তাই হারিয়ে গেল অন্তত শিরোমণি স্তরে একতার আরও একটা সুযোগ।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি

গোল টেবিল বৈঠককে ভারতের পক্ষে এত তাৎপর্যপূর্ণ জয় হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেন উদারনৈতিক প্রতিনিধিরা। তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এটাই ছিল স্বাভাবিক। লন্ডন থেকে ফিরে তাঁরা কংগ্রেস নেতৃবর্গকে (২৬ জানুয়ারি তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল) আপস করার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু ১৯৩০ জুড়েই সপ্রু আর জয়কর মীমাংসার জন্য অগাধা দিচ্ছিলেন। তাঁদের আবেদন য়েরবাড়ায় দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। আর এবারেও মনে হয় গান্ধীর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল যথেষ্টই না-সূচক। ৩১ জানুয়ারি তিনি ঘোষণা করেন, 'আমি মনে করি না যে, ম্যাকডোনাল্ড-এর বিবৃতিতে আমাদের আদৌ কিছু দেওয়া হয়েছে।' এমনকি ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত, প্রকাশ্য বিবৃতি তথা ব্যক্তিগত চিঠিপত্র দু ক্ষেত্রেই, কোনোরকম মীমাংসার সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি গভীর নিরাশা ব্যক্ত করেন। কিন্তু হঠাৎই এক পিছু-হঠা শুরু হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি (বড়লাটের সাক্ষাৎকার চেয়ে গান্ধীর চিঠি লেখার দিন) থেকে এবং আরউইন -এর সঙ্গে দিল্লীর আলোচনায়। আরউইন জোর দিচ্ছিলেন -যে-তিনটি 'লিন্‌চ্-পিন (যোজক) যুক্তরাষ্ট্র ; ভারতীয়দের প্রতি দায়িত্ব ; সংরক্ষণ ও রক্ষাকবচ'-এর ওপর, গান্ধী সেগুলি অবিলম্বে মেনে নেন (আরউইন-কথিত ১৭ ফেব্রুয়ারি সাক্ষাৎকারের বিবরণ)। প্রথম গোল টেবিল বৈঠকে যে-প্রকল্পের খসড়া করা হয়েছিল তার মধ্যেই ভবিষ্যৎ আলাপ-আলোচনার সীমা একেবারে বেঁধে দেওয়া হয়। ৫ মার্চের দিল্লী চুক্তির ২ নং ধারায় স্থির করা হয় যে, 'সংরক্ষণ ও রক্ষাকবচ'-এর আওতায় পড়বে 'এই সব বিষয়, যেমন, প্রতিরক্ষা ; বিদেশ-নীতি ; সংখ্যালঘুদের অবস্থা ; ভারতের আর্থিক ঋণ, তথা দায়মুক্তি।' আইন অমান্য আন্দোলনের বন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু সেই তুলনায় মনে হয় ভগৎ সিং-এর প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করা হলো যৎসামান্য। লবণ ও অরাজনৈতিক স্বদেশী প্রচার সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ছাড় দেওয়া হলো, কিন্তু তার পাল্লা হালকা হয়ে গেল যখন গান্ধী, কিছুদিন আয়াসসাধ্য আলাপ-আলোচনা চালানোর পর, তাঁর দুটি দাবি ছেড়ে দিলেন। সে দুটি হলো : পুলিশি অত্যাচারের তদন্ত এবং ইতোমধ্যেই তৃতীয় কোনো পক্ষের কাছে বেচে দেওয়া বাজেয়াপ্ত জমি ফেরত (দ্বিতীয় ছাড়টি অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, বিশেষ করে গুজরাটে)। পুরো ১৯৩০ জুড়ে কংগ্রেস বারবার যেসব 'শেষ অবধি লড়াই'-এর বিবৃতি দিয়েছিল, তার সঙ্গে য়েরবাড়া চুক্তির বৈপরীত্য প্রায় চূড়ান্ত প্রকট। তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে জওহরলালের মতো র‍্যাডিকালরা আশাভঙ্গের বেদনায় ভুগবেন : 'এই চালে ভাই দুনিয়ার শেষ / হাঁক দিয়ে নয় কাতরানিতেই' (*অটোবায়গ্রাফি*, পৃ. ২৫৯)।

গান্ধীর মনোভাবে কেন যে পরিবর্তন হয়েছিল সে এক ঐতিহাসিক প্রহেলিকা। শুধু উদারনৈতিক নেতৃবর্গের (যাঁরা ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধেয়, কিন্তু কার্যত দেশে তাঁদের কোনো সমর্থক ছিল না) চাপের যুক্তি দিয়ে তার উত্তর মেলে না। এমন কথাও গুরুত্ব দিয়ে বলা যায় না যে, গান্ধী নেহাতই আরউইন-এর মায়ায় মজে গিয়েছিলেন। আবার এও বলা যায়

না যে, দায়িত্বশীল সরকার সম্বন্ধে গোল টেবিল বৈঠকে যে অতীব ধোঁয়াটে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, গান্ধী তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন হঠাৎই। সেই সরকার এমন এক যুক্তরাষ্ট্রীয় হতো যেখানে রাজন্যবর্গের কথাই বেশি মূল্য পাবে, আর যার খুঁটিনাটির কিছুই তখনও ঠিক করা হয় নি। আর ছিল একরাশ সংরক্ষণ তথা রক্ষাকবচ এবং এক অসমাধিত সাম্প্রদায়িক জট। যুক্তরাষ্ট্র ছিল এই সব দিক দিয়েই সীমিত। ব্যবসায়ীদের চাপের ও যে একটা নির্ধারক ভূমিকা ছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ আছে। মন্ত্রিসভার কিঞ্চিৎ বিরোধিতা তথা মন্দা-আক্রান্ত ল্যাঙ্কাশায়ার থেকে সোচ্চার প্রতিবাদ সত্ত্বেও, ফেব্রুয়ারির গোড়ায় সুতির থান কাপড়ের আমদানির ওপর ৫% অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়েছিল। এইবার কিন্তু অন্তত কিছুদিনের জন্যে রাজনৈতিক কারণে বিশেষ সাম্রাজ্যিক সুবিধা এড়িয়ে অ-ব্রিটিশ আমদানির ওপর কোনো বাড়তি শুল্ক চাপানো হয় নি। ৭ ফেব্রুয়ারি বোম্বাই-এর লাট বড়লাটকে জানান যে বেশ কিছু গান্ধী-অনুগামী, বিশেষত ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকে ভাবছেন যে, তিনি যদি যথাযুক্ত মনোভাব না নেন, তাহলে তাঁর সঙ্গ তাঁরা ছেড়ে দেবেন।' আর আরউইন ১১ ফেব্রুয়ারি ওয়েজউড-বেন-কে খবর দেন যে. 'গান্ধীর ওপর ব্যবসায়ীদের তরফে চাপ দেওয়ার জন্যে পুরুষোত্তমদাস সম্ভবত এলাহাবাদে তাঁর কাছে যাবেন।' আলোচনার সময়ে ঠাকুরদাস ছিলেন দিল্লীতে, এবং ৪ মার্চ তিনি গুজরাটে জমি বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে শেষ গাঁটটি খোলার সাহায্য করেন। আর ১১ ফেব্রুয়ারি বিড়লার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ডি পি খৈতান কলকাতায় ভারতীয় বণিক সভার সভাপতির ভাষণে ঘোষণা করেন ঃ 'মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসকে এমন পরামর্শ দেওয়া বোধহয় ভুল হবে না যে, সেই সময় এসে গেছে যখন সম্মানজনক মীমাংসার সম্ভাবনা সন্ধানের প্রয়াস চালানো উচিত। আমরা সকলেই চাই শান্তি।' তারিখগুলির সমাপতন আবারও লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্চ-ডিসেম্বর ১৯৩১ ঃ স্বাচ্ছন্দ্যহীন সন্ধি

দ্বিমুখিতা

মার্চ ১৯৩১ এবং সর্বাত্মক ব্রিটিশ প্রত্যাঘাতের মধ্যবর্তী ঘটনাপরম্পরা অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় গান্ধী-আরউইন চুক্তির সুগভীর দ্বিমুখী ফলাফল দিয়ে। এই প্রত্যাঘাতের ফলেই কংগ্রেস জানুয়ারি ১৯৩২-এ দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করতে বাধ্য হয়।

করাচী কংগ্রেস উদ্বোধনের ঠিক আগে ২৩ মার্চ ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসির ঘটনায় তীব্র হয় র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদীদের হতাশা ও ক্রোধ। করাচী রেল স্টেশনে গান্ধীর বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের আয়োজন করেন নওজওয়ান ভারত সভা। তাহলেও, করাচী অধিবেশন ছিল তাৎপর্যপূণ। কারণ, মুখ্যত, এখানেই প্রকাশ পায় গান্ধীর বামপন্থী সমালোচকদের দুর্বলতা। অক্টোবর থেকে জানুয়ারি অবধি কারাবাসের সময়টুকু কাজে লাগিয়ে জওহরলাল তৈরি করেন মোটমুটি র‍্যাডিকাল এক কৃষি-কর্মসূচি ; এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে একটি সংবিধান রচনা পরিষদের প্রস্তাব দেন। তাঁর এই সূত্রই হয়ে ওঠে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি

বাম-জাতীয়তাবাদী রণকৌশলের মূল উপাদান (নৈনি জেলের 'নোট', ডিসেম্বর ১৯৩০, *সিলেক্টেড ওয়ার্কস*, খণ্ড ৪, পৃ. ৪৩৭-৫১)। দিল্লী চুক্তি জওহরলালের রাতের ঘুম কেড়ে নিলেও, সহজেই তিনি কিন্তু গান্ধীর কাছে নতিস্বীকার করেন আর করাচীতে ঐ চুক্তি অনুমোদন করে প্রধান প্রস্তাবটি পেশ করতে রাজি হন। সম্ভবত মোতিলালের মৃত্যু (৬ ফেব্রুয়ারি) তাঁকে মানসিকভাবে গান্ধীর ওপর আরও নির্ভরশীল করে তোলে। কৃষককুলের সঙ্গে সমানুভূতির ব্যাপারে গান্ধীর তুলনায় তাঁর ক্ষমতার সীমাও তিনি খুব ভালো করেই বুঝতেন। লক্ষণীয় যে, পাঁচ বছর পরে প্রকাশিত *অটোবায়গ্রাফি*-তে দিল্লী চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনার ঠিক পরেই আছে 'ভরতীয় কৃষক জনতা'র প্রতিনিধি হিসেবে গান্ধীর প্রশস্তি। করাচীতে, দিল্লী চুক্তির অন্যান্য সমালোচকদের বক্তব্যেও অসহায় তথা নিষ্ক্রিয়ভাব লক্ষ্য করা যায়। ইউসুফ মেহের আলী (যিনি কিছুদিনের মধ্যেই এক বিশিষ্ট সমাজবাদী নেতা হয়ে ওঠেন) দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই 'সমঝওতার রাজনীতি' ও 'হৃদয়-পরিবর্তনে'র বিরোধিতা করেন এবং তীব্রভাবে আক্রমণ করেন 'বিড়লা, পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরদাস, ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ, হুসেনভাই লালজীদের, যাঁরা এখন অন্যদের কষ্টস্বীকার ও ত্যাগের ফল হাতানোয় উঠে পড়ে লেগেছেন।' কিন্তু উপসংহারে তাঁর সুর আশ্চর্য রকমের নরম ঃ গোল টেবিল বৈঠক যেহেতু ব্যর্থ হতে বাধ্য, তাই গান্ধীকে আবার আন্দোলনের ডাক দিতে হবে, আর তখনই র‍্যাডিকালরা পাবেন তাঁদের সুযোগ—'লড়াই-এর ডাকের জন্যে আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করে আছি, ইনকিলাব জিন্দাবাদ'।

করাচী অধিবেশনে মৌলিক অধিকার ও আর্থিক নীতি বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয়। প্রায়শই এটির ব্যাখ্যা করা হয় এই বলে যে, এটি হলো বামেদের তুষ্ট করার জন্যে একটি বিশেষ ছাড়। একথা ঠিক যে কোনো-কোনো আমলা এর পেছনে মানেবন্দ্রনাথ রায়ের হাত আছে বলে সন্দেহ করেছিলেন, এবং কয়েকমাস পরে অম্বালাল সারাভাই এফ আই সি সি আই-এর সদস্যদের মধ্যে একটি 'নোট' বিলি করেন। সেখানে এই প্রস্তাবের কিছু কিছু অংশকে তীব্রভাবে আক্রমণ করা হয় এই বলে যে, তাতে 'রাশিয়ার ধাঁচের সরকার' সৃষ্টির ভয় আছে (*ওয়ালচাঁদ হিরাচাঁদ পেপার্স,* এফ এন ৮ (২))। আসলে কিন্তু করাচী প্রস্তাবের ২০-দফায় 'সমাজবাদ' ছিল নামমাত্র। ১৯৩০-এ গান্ধীর যে ১১ দফা, তার সঙ্গে এতে জোড়া হয়েছিল সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবি-দাওয়া (নাগরিক অধিকার, আইনগত সমতা, প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার, অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার রাষ্ট্রীয় নীতি)। আর ছিল শ্রমিকদের জন্যে যথেষ্ট ক্ষীণ কিছু প্রতিশ্রুতি (বাঁচার মতো মজুরি, বেগারির অবসান, ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার ইত্যাদি), প্রধান প্রধান শিল্পক্ষেত্র তথা খনিজ সম্পদের ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অস্পষ্ট ভাষায় লেখা একটি বাক্যাংশ এবং কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন সম্বন্ধে খুবই পরিমিত এক কর্মসূচি। ভূমিরাজস্ব ও খাজনা 'বেশ কিছুটা কমানো'র প্রতিশ্রুতি মাত্র দেওয়া হলো, গ্রামীণ ঋণের বর্দ্ধিমান্ বিষয়টি উল্লেখই করা হলো না, আর অবশ্যই রইল না জমিনদারি প্রথা বিলোপ বা ভূমি পুনর্বন্টনের ইচ্ছে।

সুতরাং করাচী কংগ্রেস যথারীতি নতিস্বীকার করল গান্ধীর কাছে, এবং ফেব্রুয়ারি ১৯২২-এর মতোই এটিও শুধু নেতার দুর্বলতা নয়, গোটা আন্দোলনেরই কয়েকটি মৌল দুর্বলতার ইঙ্গিত দেয়। বিচ্ছিন্নভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের বহু র‍্যাডিক্যাল দিক লক্ষ্য করা যায়,

কিন্তু কোনো প্রকৃত বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠে নি। আর, এরই অভাবে গ্রামীণ জঙ্গীপনা থেকে গিয়েছিল সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত, বিচ্ছিন্ন ও অসংলগ্ন অথবা সীমিত দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন গ্রামীণ গান্ধীপন্থীদের হাতে। ১৯২৮-২৯ থেকে শ্রমিক সংগঠন তথা জঙ্গীপনার দ্রুত অবনতি হয়। মীরাট মামলায় গ্রেপ্তারের ফলে, ইতোমধ্যেই দুর্বল কমিউনিস্টরা তখন এক বাম-সঙ্কীর্ণতার পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলছিলেন। বাম-জাতীয়তাবাদীরাই তখন তাঁদের আক্রমণের লক্ষ্য। তাই এপ্রিল ১৯৩০-এ নেহরুকে তাঁরা বার করে দিলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগ থেকে আর সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে এমন ঝগড়া করলেন যে, জুলাই ১৯৩১-এ কলকাতা অধিবেশনের সময় এ আই টি ইউ সি দ্বিতীয়বার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হলো। আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁরা যোগ দিলেন না, আর প্রায় সব শক্তিই নিঃশেষ করে ফেললেন নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে।

কমবেশি খানিকটা নির্দিষ্ট সমাজবাদী ঝোঁক আছে এমন সচেতন র‍্যাডিকালদের কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ গণ্ডির বাইরের বহু লোককেও নিরাশ করল এই চুক্তি। হার্ডিমান দেখিয়েছেন, খেড়া-র পাটীদাররা 'এই চুক্তিকে মনে করেছিলেন বিশ্বাসঘাতকতা'। কারণ রাজস্ব কমানো হয় নি, এবং এমনকি বাজেয়াপ্ত জমির বেশির ভাগই ফেরত পাওয়া যায় নি, যেমন হয়েছিল ১৯২৮-এর বারডোলি বিজয়ে। 'পুলিশের লাঠি নয়, পাটীদারদের মনের জোর ভেঙে দিয়েছিল এই চুক্তি' (হার্ডিমান, *পেজান্ট অ্যাজিটেশনস্ ইন খেড়া ডিস্ট্রিক্ট*, পৃ. ২৮৯)। অন্ধ্রের উপকূলবর্তী অঞ্চল ও যুক্ত প্রদেশ সম্পর্কে ব্রায়ান স্টৌডার্ট ও জ্ঞান পাণ্ডেও একই ধরনের সিদ্ধান্তে এসেছেন। কারণ, মন্দার প্রথম ধাক্কার মুখে-পড়া ঐ দুটি এলাকাতেই পুরোদমে রাজস্ব-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের পক্ষে সম্ভবত ১৯৩১-ই ছিল উপযুক্ত মুহূর্ত। কিন্তু সন্ধি চুক্তির মান রাখতে কংগ্রেস মূল্যবান নটি মাস কৃষকদের এগোতে দেয় নি। 'সরকারের দমন নীতির ফলে নয়, অন্ধ্রের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে কংগ্রেসের প্রভাব বদলে গিয়েছিল গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের ফলে।' (*কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*, পৃ. ১২১-২-এ স্টৌডার্ট)

সেই সঙ্গে এও বলা দরকার যে গান্ধী-আরউইন চুক্তির কোনো অভিঘাতই ছিল না—এমন বললে সেটা হবে খানিক জটিল বাস্তবতার এক অতিসরলীকরণ। গান্ধী যা-ই ছাড় দিয়ে থাকুন, এবং জাতীয়তাবাদীদের বাস্তবিক লাভ যত কমই হোক না কেন, পুরোপুরি এক নতুন ভিত্তিতে, শিষ্টাচার ও সমতার ভাব নিয়ে জাতীয়তাবাদী নেতাদের সঙ্গে আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বড়লাট। মনস্তাত্ত্বিকভাবে ঘটনাটির তাৎপর্য ব্যাপক, আর তাই গোড়া থেকেই ভারতের ব্রিটিশ আমলারা এতে খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা, মনে হয়, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাঁদের গ্রাম বা শহরে ফিরে গিয়েছিলেন প্রায় বিজয়ীর মতো। ১৯২২-এর প্রায় সম্পূর্ণ মোহভঙ্গ তথা হতাশার থেকে এই মেজাজ অনেকখানিই আলাদা। বারডোলি পশ্চাদপসরণের পর কংগ্রেস সংগঠন প্রায় ভেঙেই পড়েছিল : ১৯৩১-এ কিন্তু বহু এলাকায় দলীয় সংগঠনের যথেষ্ট বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। যেমন, মে, ১৯৩১-এর মধ্যে, যুক্তপ্রদেশের রায়বেরেলী জেলাতেই কংগ্রেস অফিস ছিল ৩২টি, কংগ্রেস সদস্য ৮০৪০ জন, ১৩,০৮১ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং ১০১৯টি গ্রামে উড্ডত কংগ্রেস পতাকা (জ্ঞান পাণ্ডে, পৃ. ৪১)। আরও তাৎপর্যপূর্ণ হলো, আর্থনীতিক চাপ, সাধারণ কংগ্রেস কর্মীদের চড়া মেজাজ, কোনোরকম র‍্যাডিকাল কর্মসূচি নেওয়ার ব্যাপারে সরকারি কংগ্রেসের অনীহা এবং সম্ভবত নেতৃত্ব সম্বন্ধে এক ধরনের

মোহভঙ্গ—এই সব মিলে তৈরি হয়েছিল নিচুতলা থেকে নানারকম চাপ। তাই সন্ধি-চুক্তি ক্রমেই হয়ে উঠছিল কমজোরি আর সরকারি আমলাদের গোপন সর্বাত্মক প্রত্যাঘাতের উদ্যোগকেই তা চাঙ্গা করছিল।

তলা থেকে চাপ

দিল্লী চুক্তির ফলে গান্ধীবাদী অহিংসা সম্বন্ধে বাঙলার শিক্ষিত যুবকদের শুধু মোহভঙ্গই বেড়েছিল। ১৯৩১-এ সন্ত্রাসবাদ আগের সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে গেল। ৯টি হত্যাকাণ্ড (তার মধ্যে দুজন জেলাশাসক, এপ্রিলে মেদিনীপুরের পেডি আর ডিসেম্বরে ত্রিপুরার স্টিভেন্স)-সহ ৯২টি (আক্রমণের) ঘটনা ঘটে। স্টিভেন্সকে হত্যা করেন দুজন স্কুলছাত্রী—শান্তি ও সুনীতি চৌধুরী। বিপ্লবী আন্দোলনে মহিলাদের যোগ দেওয়ার এক নতুন স্তরের চিহ্ন হলো এই ঘটনা। সন্ত্রাসবাদ আর শুধু শহরেই টিকে রইল না, অন্তত চট্টগ্রামে, মে মাসের মধ্যে অন্তত ৫২টি গ্রামকে সেখানে উপদ্রুত এলাকা বলে ঘোষণা করা হয়। সত্যি সত্যিই ভীত ব্রিটিশ সরকার অবলম্বন করল বীভৎস উৎপীড়ন পদ্ধতি। চট্টগ্রাম শহরে ১৬ থেকে ২৫ বছর বয়সী 'সমস্ত' হিন্দু 'ভদ্রলোক' যুবকের ওপর নৈশ নিষেধাজ্ঞা (কারফিউ) জারি করা হলো। ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী জেলের বন্দীদের মারা হলো গুলি করে। এই ঘটনার পর কলকাতার প্রতিবাদসভায় ভাষণ দিলেন রবীন্দ্রনাথ, যদিও এই বছরগুলিতে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি থেকে তিনি সাধারণভাবে দূরেই সরে ছিলেন; এবং সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর বৈরিতাও ছিল সুজ্ঞাত। আর সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে সহানুভূতি থাকলেই নির্বিচারে গ্রেপ্তারের অনুমোদন দেওয়া হলো। ২৯ অক্টোবরে এ বাবদে একটি ঢালাও আদেশবিধি জারি করা হয়। ইতোমধ্যে, দেশের অন্য এক প্রান্তে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে খুদা-এ খিদমতগার-রা দ্রুত বাড়তে থাকেন। অগাস্ট ১৯৩১-এ তাঁদের আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসেরই একটি অংশ করে নেওয়া হয়। এতে আবার সরকারি মহলে অভিযোগ ওঠে ঃ কংগ্রেস মার্চ-এর সন্ধিচুক্তি লঙ্ঘন করছে।

এদিকে জিনিসপত্রের পাইকারি মূল্যসূচি কমার রেকর্ড হয়ে গেল [যুক্ত প্রদেশে, পাইকারি মূল্যসূচি, ১৯০১-০৫-এ ১০০ ধরলে, ১৯২৯-এ ২১৮ থেকে কমে ১৯৩০-এ হয় ১৬২ এবং ১৯৩১-এ ১১২ (পাণ্ডে, পৃ. ১৬০)] এবং সেই মতো রাজস্ব, খাজনা ও ঋণের বোঝাও হয়ে উঠল অসহনীয়। গ্রামীণ অসন্তোষ হলো গভীরতম। ব্রিটিশদের কাছে তো বটেই, কংগ্রেস নেতৃত্ব যে আপসমূলক নীতি অনুসরণ করতে চাইছিলেন তার কাছে এটাই ছিল সবচেয়ে ভয়ের ব্যাপার। খেড়া ও বারডোলি-তে বাজেয়াপ্ত জমির ক্রেতা ও নবনিযুক্ত গ্রামীণ আমলাদের সামাজিক বয়কট করা হলো, আর মে মাস থেকে রাজস্ব সংগ্রহও আবার গেল কমে। গুজরাটের গ্রামীণ ভিত যেহেতু ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তাই মার্চ থেকে ২৯ অগাস্ট, দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের অনেকটাই গান্ধী কাটালেন এই দুটি জেলায়। গুজরাটের অবস্থার কোনো প্রতিকার না করলে তিনি বিলেতযাত্রা বাতিল করার ভয় দেখালেন। শেষে ২৫-২৭ অগাস্ট সিমলায় উইলিংডন ও হোম সদস্য এমার্সন-এর সঙ্গে কথা বলে একটি অসাধারণ ঘটনা হিসেবে তিনি বারডোলি কংগ্রেসের অভিযোগগুলি সম্বন্ধে সরকারি তদন্তের বন্দোবস্ত করালেন।

দেখা গেল যে, যুক্ত প্রদেশের গ্রামাঞ্চলের পরিস্থিতি সামলানো আরও দুষ্কর ও তা অনেক বেশি বেকটে পড়ার মুখে। জমিনদার ও রায়তদের মধ্যে কংগ্রেস সালিশ হিসেবে কাজ করার চেষ্টা করে। কিসানদের তারা বলে স্থানীয় কংগ্রেস কার্যালয়ে খাজনা কমানোর দরখাস্ত পাঠাতে। স্বাভাবিকভাবেই, আমলাতন্ত্র এটা খুবই অপছন্দ করছিল। তারা মনে করল, এ হলো 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের সমান্তরাল প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা'। ২৪ মে গান্ধী যুক্ত প্রদেশের কিসানদের উদ্দেশে একটি ইশ্‌তেহার জারি করেন। তাতে এই সমঝওতা প্রস্তাব দেওয়া হয় যে, অ-দখলিস্বত্বের রায়তরা চলতি খাজনার টাকায় আট আনা হারে ন্যূনতম খাজনা দেবেন এবং দখলীস্বত্বের রায়তরা দেবেন বারো আনা। স্পষ্টতই, এই আবেদন ছিল কৃষি-র‍্যাডিকালিজম-এরই বিরুদ্ধে : 'জমিনদার বা তালুকদারদের একেবারেই কোনো খাজনা দিতে হবে না—এই পরামর্শ যদি তোমাদের কাছে পৌঁছে থাকে, তবে আমি সতর্ক করে দিচ্ছি যে, তাতে কান দিও না।' কিন্তু সরকারি আমলারা অচিরেই অভিযোগ করেন যে, চাষীরা গান্ধীর ন্যূনতম হারকে সর্বোচ্চ বলে ধরে নিচ্ছেন এবং প্রায়শ কিছুই দিচ্ছেন না ; আর উঠে আসছেন স্থানীয় নেতা ও কর্মীরা, সকলেই কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করছেন, কিন্তু ছড়াচ্ছেন আরও অনেক র‍্যাডিকাল বাণী। যেমন, রায়বেরেলী-র কালকা প্রসাদ বা ঐ জেলারই অঞ্জনী কুমার, যিনি খাজনা বাকি-পড়া রায়তদের উচ্ছেদের প্রতিবাদে সেওগড়ের রাজবাড়ির সামনে ধর্না দেন। এও যথেষ্ট কৌতূহলজনক যে, সেওগড়ে একটি খাদি বিদ্যালয় খোলা হয়েছিল, যেখানে শিক্ষিকা হিসেবে নিয়োগ করা হয় জওহরলাল নেহরুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, স্থানীয় কংগ্রেস নেতা শীতলা সহায়-এর স্ত্রীকে ('হোম পলিটিকাল', ৩৩/২৪/১৯৩১)। সরকারি তরফে যদিও অভিযোগ ছিল যে কংগ্রেসই উসকানি দিচ্ছে, তাহলেও নেতৃবর্গ—এমনকি জওহরলালও—যে মোটের ওপর রাশ টেনে রেখেছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। জেলা কংগ্রেস থেকে কালকা প্রসাদকে বার করে দেওয়া হয়, আর রায়বেরেলীতে, জুন মাসে জওহরলাল ঘুরে আসার পর, সেখানকার অবস্থা ঝিমিয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্ন একটি দাঙ্গার ঘটনা ছাড়া, আগ্রা ছিল খুবই শান্ত। সেখানে কংগ্রেসের ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী সংগঠন তথা গ্রাম সেবা সঙ্ঘ, যার টাকা জোগাতেন জাতীয়তাবাদী জমিনদার শেঠ অচল সিং। রায়বেরেলী ছাড়া কৃষি র‍্যাডিক্যালিজম-এর অন্যান্য প্রধান কেন্দ্র ছিল বড়া বাঁকি, যেখানে কংগ্রেস সংগঠন ছিল যৎসামান্য আর এলাহাবাদের মন্‌ঝনপুর তহশীল, একাধিক মুসলিম জমিনদার থাকার দরুন জাতীয়তাবাদীরা ১৯৩০-এ সেটিকে পরিহার করেছিলেন। ডিসেম্বর ১৯৩১-এ, যখন গোল টেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনা ভেঙে যাচ্ছে, তখন যুক্ত প্রদেশ কংগ্রেস অবশেষে কোনো কোনো জেলায় খাজনা-বন্ধের অনুমতি দিল। কিন্তু ততদিনে লাট ম্যালকম হেলি-র উৎপীড়ন ও সমঝওতার সুদক্ষ মিশ্রণ (১০৮ লাখ টাকা রাজস্ব ও ৪১২ লাখ টাকা খাজনা শেষ পর্যন্ত মকুব করা হয়), কৃষি-জঙ্গীপনার ধার অনেকটাই ভোঁতা করে দিয়েছিল। তাহলেও যুক্ত প্রদেশের কৃষকরা কিছু অন্তত পেয়েছিলেন, আদায় করে নিয়েছিলেন কিছু মকুব। যতই অপর্যাপ্ত হোক, অন্যান্য প্রদেশে বা আগের বিপর্যয়ের বছরগুলোতে যা মঞ্জুর করা হয়েছিল, তার চেয়ে তাঁরা পেলেন বেশি। আর এইভাবেই, ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনে কৃষি-সম্পর্কিত প্রশ্নের গুরুত্বকে আংশিকভাবে, কিন্তু আরও বেশি করে স্বীকার করে নিতে তাঁরা বাধ্য করলেন কংগ্রেস নেতৃত্বকে। ১৯৩৬ নাগাদ, অন্যান্য

প্রদেশ কংগ্রেসের অনেক আগে, যুক্ত প্রদেশে নেতৃত্ব, অন্তত তত্ত্বগতভাবে, জমিনদারি প্রথা অবলোপের কথা প্রচার করতে থাকেন।

সন্ধির মাসগুলোয় অন্যান্য অনেক অঞ্চলেও আন্দোলন হয়েছিল, যদিও যুক্ত প্রদেশের ঘটনাবলির তুলনায় তার প্রচার হয়েছে অনেক কম। কোনো কোনো রাজন্যশাসিত রাজ্যে দানা বাঁধছিল স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী তথা সামন্ত-বিরোধী আন্দোলন—যেমন কাশ্মীরে, জুলাই ১৯৩১-এ, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রজা এবং একটি হিন্দু শাসক রাজবংশের মধ্যে অনিবার্য সঙ্ঘাতের দরুন যদিও সেখানে কখনও কখনও বেশ কিছুটা সাম্প্রদায়িক ছোপ লেগেছিল, তবুও এই বছরগুলোতেই গড়ে উঠছিল শক্তিশালী ন্যাশনাল কনফারেন্স আন্দোলনের ভিত। শেখ আবদুল্লা-সহ একদল মুসলিম স্নাতক যে-আন্দোলন শুরু করেন তার চূড়ান্ত পরিণতি হয় ১৩ জুলাই শ্রীনগর কারাগারের ওপর গণ-আক্রমণে। পুলিশের গুলিতে মারা যান ২১ জন। পরিণামে এর ঠিক পরেই দেখা দিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। তবুও সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এর পীড়নমূলক ব্যবস্থার ফলে হিন্দুদের বদলে বরং আক্রমণ শুরু হয় পুলিশের ওপর। পরিস্থিতি এমন হয়ে ওঠে যে অচিরে মহারাজকে সাহায্য করার জন্যে ব্রিটিশ সামরিক হস্তক্ষেপের দরকার পড়ে। জম্মু-র মীরপুর, কোট্‌লি ও রাজৌরি তালুকে শুরু হয় মহাজন-বিরোধী আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত ১২ নভেম্বর রাজ্য সরকার কিছু বেসরকারি সদস্য নিয়ে একটি অভিযোগ তদন্ত কমিশন গঠন করেন। ত্রিচিনোপল্লীর কাছে পুডুকোট্টাতে জুলাই মাসের কয়েকদিন ধরে যা চলে, *ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার*-এ তাকে বলা হয়েছিল 'উচ্ছৃঙ্খল জনতার শাসন'। নতুন কর বসানোর প্রতিবাদে জনতা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে, পুড়িয়ে দেয় আদালতের নথিপত্র, কারামুক্ত করে দেয় কয়েদিদের এবং শাসককে বাড়তি কর তখনকার মতো নাকচ করতে বাধ্য করে। বিহারে কংগ্রেস নেতৃবর্গ চূড়ান্ত জমিনদার-পক্ষীয় নীতি আঁকড়ে থাকেন। কিন্তু গয়া জেলায় যদুনন্দন শর্মার নেতৃত্বে উঠে আসছিল শক্তিশালী কিসান সভা আন্দোলন। শর্মা পরে সহজানন্দ-র ঘনিষ্ঠ সহযোগী হয়ে ওঠেন। সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ উৎকল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি সারা ওড়িশা জুড়ে 'কৃষক সঙ্ঘ' স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং সরকারি আমলারা অভিযোগ করেন যে, পুরীর মতো কিছু জেলায় গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেসের কাজের ফলে জমিনদার-রায়ত সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অন্ধ্রের উপকূলবর্তী এলাকায় ১৯৩১-এর শেষদিকে স্থানীয় নেতাদের—যেমন, কৃষ্ণা জেলার দুগ্‌গিরালা বলরামকৃষ্ণায়্যা প্রমুখের নেতৃত্বে রাজস্ব বন্ধ প্রচারের জন্যে চাপ ক্রমেই আরও বাড়তে থাকে। দুগ্‌গিরালা বলরামকৃষ্ণায়্যা-র তেলেগু গাথা *'গান্ধীগীতা'* একই সঙ্গে কৃষক আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে৷ অন্ধ্রের যেসব কৃষক 'জমিনদারি' এলাকায় থাকতেন তাঁদেরও এই প্রথম সংগঠিত করা হচ্ছিল, বিশেষত, নেল্লোর-এর ২১১৭ বর্গমাইল ব্যাপী বিশাল বেঙ্কটগিরি ভূক্ষেত্রে ১৯৩১-এ এখানে চারণ-করের বিরুদ্ধে শুরু হয় অরণ্য সত্যাগ্রহ। এই করের মাধ্যমে 'জমিনদার'-রা পশুখাদ্য ও কাঠের ওপর কৃষকদের পরম্পরাগত অধিকার খর্ব করতে চাইছিলেন। সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এন ভি রামা নাইডু ও এন জি রঙ্গ। কৃষ্ণা ও গুন্টুর জেলায়, সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ মহাজন-বিরোধী দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে, এতে ৪০০০ অবধি লোক জুটে যায়। কেরলের জাতিভেদ প্রথা ছিল সবচেয়ে মারাত্মক। সেখানকার কংগ্রেস নেতা কেলাপ্পন নভেম্বর ১৯৩১-এ যে গুরুবায়ুর মন্দির সত্যাগ্রহ শুরু করেন,

লোককে র‍্যাডিকাল করার দিকে তার অভিঘাত ছিল বিরাট। মালাবারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তথা রাজন্যশাসিত রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে বহু স্বেচ্ছাসেবী 'জাঠা' পায়ে হেঁটে ঘোরে এবং আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হওয়া সত্ত্বেও গুরুবায়ুর মন্দিরে এই সত্যাগ্রহ চলতেই থাকে ; শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বর ১৯৩২-এ গান্ধীর আদেশে তা প্রত্যাহৃত হয়। গুরুবায়ুর-এ সক্রিয় কর্মীদের মধ্যে ছিলেন জনৈক স্কুল-শিক্ষক। নাম এ কে গোপালন। অচিরেই তিনি হয়ে ওঠেন কেরলের সবচেয়ে জনপ্রিয় কমিউনিস্ট কৃষক-নেতা।

সরকারি মনোভাব

সন্ধির মাসগুলোয় ক্রমেই বাড়ছিল জনতার চাপ, আর তাই ব্রিটিশ আমলা মহলেও পূর্বাঘাত করে পুরোদমে প্রতি-আক্রমণের ছক কষার প্রবণতাও হচ্ছিল আরও জোরদার। ব্রিটিশদের মনোভাবের এই পরিবর্তনের দায় সাধারণত চাপানো হয় আরউইন-এর উত্তরসূরি উইলিংডন-এর ওপরে। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধে ডি এ লো দেখিয়েছেন যে, আসলে এর মূল নিহিত ছিল প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের সময়কার সরকারি চিন্তাভাবনার মধ্যে এবং ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৩১-এ গান্ধীর সঙ্গে বড়লাট যে সমানে-সমান আচরণ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে তীব্র আমলাতন্ত্রী প্রতিক্রিয়ায়। আসল কথা ছিল, লো বলেছেন, 'বেসামরিক সামরিক আইন' : সরাসরি সেনাবাহিনী তলব করার বদলে—যেমন হয়েছিল ১৯১৯-এ, অমৃতসরে বেসরকারী কর্মীদের ঢালাও, প্রায় সামরিক বাহিনীর সমান ক্ষমতা দেওয়া (ডি এ লো, *কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*, অধ্যায় ৫)। হোম সদস্য এমার্সন মে ১৯৩১-এ জোর দিয়ে বলেন, দিল্লী চুক্তি যদি আপাতত রক্ষা করতে হয়, তবে 'তার সঙ্গে এই দৃঢ়সঙ্কল্পও থাকা চাই যে চুক্তি যদি ভাঙা হয়, বা যখনই ভাঙা হবে, ঘা দেওয়া হবে সেই মুহূর্তেই ও সজোরে'। জানুয়ারি ১৯৩২-এ যখন সত্যিকারের কোপ মারা হয়, তার মাসখানেক আগেই তৈরি হয়েছিল জ রু রি ক্ষ ম তা অ র্ডি ন্যা ন্স-এর খসড়া।

ওদিকে ব্রিটেনে সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ দলত্যাগী লেবর নেতা র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড-এর নেতৃত্বে টোরি-প্রধান জাতীয় সরকার ক্ষমতায় এল, আর বিশ্ব-অর্থনীতির বিপর্যয় তীব্রতর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো ল্যাঙ্কাশায়ার ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের প্রত্যাঘাত। ব্রিটিশ রাজনীতিতে এই যুগপৎ দক্ষিণমুখী সরণ ভারতে সরকারি আমলাদের মনোভাব কঠোর করে তুলতে সাহায্য করে। আর্থনীতিক সঙ্কটের ফলে আমদানি-শুল্ক, আয়কর, রেলপথ—সমস্ত জায়গা থেকেই রাজস্ব কমে যাওয়ায় ভারত সরকার গুরুতর আর্থিক অসুবিধেয় পড়েন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে তুলোর শুল্ক ২০% থেকে বাড়িয়ে ২৫% করা হবে ; কিন্তু রাজনৈতিকভাবে বিস্ফোরক প্রতিকারী উৎপাদন-শুল্ক বা বিশেষ সাম্রাজ্যিক সুবিধা চাপানো হবে না। এই জন্যে সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ নতুন টোরি ভারত-সচিব স্যামুয়েল হোর অর্থসংস্থান-সংক্রান্ত স্বায়ত্তশাসন প্রথা অগ্রাহ্য করার হুমকি দেন। ল্যাঙ্কাশায়ার-এর প্রতিবাদ সত্ত্বেও হোম কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত নতুন ট্যারিফ মেনে নিলেন। ১৯৩০-এর দশকে প্রায়শই এই জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ ব্রিটেন যখন স্বর্ণ-মান ত্যাগ করল তখনও হোম কর্তৃপক্ষ টাকা (রুপি)-র মূল্যমান স্টার্লিং-এর সঙ্গে ১ শিলিং ৬ পেন্স-এ বেঁধে রাখার ব্যাপারেই জিদ ধরল। স্টার্লিং-এর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না-

রাখলে টাকার মান যথেষ্ট কমে যেত, আর এর ফলে, হোম খাতে খরচ মেটানো তথা মুনাফা দেশে পাঠানোর ওপর প্রতিকূল প্রভাব পড়ত। তাই এইভাবে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর আংশিক স্বার্থের বিনিময়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হলো মহানগরের আর্থিক বিষয়কে। গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩১) ব্রিটিশ সরকারি আমলা তথা ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা জোর দিয়ে বললেন, আর্থিক ব্যাপারে প্রভূত সংরক্ষিত ক্ষমতা অবশ্যই বড়লাটের হাতেই থাকবে। বিড়লা হিসেব করে দেখান, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় 'দায়িত্বশীল' বলে গণ্য ভারতীয় অর্থমন্ত্রী কার্যত নিয়ন্ত্রণ করবেন মোট ১৩০ কোটি টাকা রাজস্বের মধ্যে মাত্র ১৫ কোটি টাকা (সপ্রু-কে বিড়লা, ৩১ অক্টোবর, ১৯৩১, জি ডি বিড়লা, *ইন দি শ্যাডো অফ দি মাহাত্মা* , পৃ. ৪৬)। বেন্টল প্রমুখ ব্রিটিশ ব্যবসায়ী প্রতিনিধিও এ ব্যাপারে জোর দিলেন যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী সরকারের 'বৈষম্যে'র বিরুদ্ধে বিদেশী পুঁজিকে বাণিজ্যিক রক্ষাকবচের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। রাজনৈতিক স্তরেও দেখা দিচ্ছিল 'সাইমনবাদে'র দিকে প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ—'প্রথম গ্রহণীয় পদক্ষেপ হিসেবে' অবশ্যই ভারতীয়দের 'আরও বেশি করে আগের মতো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দিকে *ঠেলে* দিতে হবে', ২ অক্টোবর ১৯৩১-এ হোর উইলিংডনকে একথা জানান (আর জে মুর, পৃ. ২৩২)।

সামগ্রিক পরিস্থিতির ফলে গোল টেবিল বৈঠকে গান্ধীর যোগ দেওয়া একেবারেই ব্যর্থ হয়ে গেল। সংখ্যালঘু প্রশ্নে অচিরেই বৈঠকে সৃষ্টি হলো অচলাবস্থার। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর দাবি শুধু যে মুসলমানরাই জানালেন তা-ই নয়, জানালেন পশ্চাৎপদ জাতি, ভারতীয় খ্রীস্টান, ইঙ্গ-ভারতীয় ও ইওরোপীয়রাও। এই সমস্ত গোষ্ঠীই ১৩ নভেম্বর যৌথ কার্যক্রমের উদ্দেশ্যে 'সংখ্যালঘু চুক্তি'র মাধ্যমে সমবেত হলেন। বিশেষ করে বেন্টল মুসলিম সদস্যদের ভজিয়েছিলেন। 'বাঙলায় তাঁদের আর্থিক দুরাবস্থার কথা আমরা ভুলব না...ইওরোপীয় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোয় তাঁদের চাকরি দেওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব...'—এই প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে বেন্টল তাঁদের সমর্থন আদায় করেন (বেন্টল-এর নোট, উমা কাউরা-এর বইতে উদ্ধৃত, পৃ. ৭৭)। সমস্ত সাংবিধানিক অগ্রগতিকে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের শর্তাধীন করে তোলার এই সমূহ চেষ্টার বিরুদ্ধে গান্ধী লড়াই করলেন মরিয়া হয়ে। তিনি যুক্তি দিলেন, 'এই সমাধান হবে স্বরাজ সংবিধানের কিরীট, ভিত্তি নয়' এবং ৫ অক্টোবর এমনকি এই প্রস্তাবও দিলেন যে, মুসলমানরা যদি কংগ্রেসের স্বরাজের দাবি সমর্থন করেন, তাহলে তাঁদের সমস্ত পাওনা চাহিদা মেনে নেওয়া হবে। কিন্তু মুসলিম প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরাও অবশ্য গান্ধীর বদান্যতার ভাগী ছিলেন না। পাঞ্জাবে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ করে দেবে—শিখদের সঙ্গে একযোগে তাঁরা এমন সব কিছুর তীব্র বিরোধিতা করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্নে রাজন্যবর্গও নানান সুরে গাইতে শুরু করলেন। মনে হলো, ১৯৩০-এর তুলনায় তাঁরা অনেক কম উৎসাহী, কারণ কংগ্রেস আন্দোলন তুলে নেওয়ার পর কেন্দ্রে সেই মুহূর্তে কোনো পরিবর্তনের ভয় তখন কমে গেছে। কেন্দ্রে রদবদল নিয়ে আলোচনা একেবারেই স্থগিত রাখার চেষ্টা করছিল ব্রিটিশরা। তা বরবাদ হয়ে গেল তখনই, যখন অন্যথায় নমনীয় সপ্রু, জিন্না ও আম্বেডকর তা বিরোধিতা করলেন। ম্যাকডোনাল্ড, তাঁর ১৯ জানুয়ারির অবস্থানকেই পুনরাবৃত্তি করে, ১ ডিসেম্বর অধিবেশন শেষ করলেন। ঘোষণা করা হলো : নতুন

দুটি মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হবে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু), গঠিত হবে ভারতীয় শলা-পরামর্শ কমিটি তথা তিনটি বিশেষত রাজন্যশাসিত কমিটি (ভোটাধিকার, অর্থ ও রাজ্য বিষয়ে) এবং সামনে ধরে রাখা হলো এই সম্ভাবনা যে, ভারতীয়রা একমত না-হতে পারলে ব্রিটিশরাই একতরফা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ দেবে। জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল একই সঙ্গে লাঞ্ছনাকর ও বিপজ্জনক।

গোটা ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক অর্থহীন প্রয়াস। এ-ই ছিল অনিবার্য, কারণ, তাঁর দলই যে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধি—এই দাবি (আরউইন-এর ডিসেম্বর ১৯২৯-এর প্রস্তাব যার ফলে বাতিল হয়ে গিয়েছিল) দিল্লী আলোচনার সময়ে গান্ধী ছেড়ে দিলেন। তার বদলে কংগ্রেস মেনে নিল যে, গোল টেবিল বৈঠকে বহু খণ্ডস্বার্থের প্রতিনিধি—যাদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারেই ছোটো ও অ-প্রতিনিধিস্থানীয়, তারাও কংগ্রেসের সমপর্যায়ী। কূটকৌশলে স্পষ্টতই পরাহত হলেন গান্ধী। তিনি ভারতে ফিরলেন ২৮ ডিসেম্বর, দেখলেন নেহরু আর গফ্ফর খাঁ জেলে এবং বাঙলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এ ইতোমধ্যেই নেওয়া হয়েছে ব্যাপক পীড়নমূলক ব্যবস্থা। গান্ধী দেখা করতে চাইলে উইলিংডন রূঢ়ভাবে সে-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। আবার আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ছাড়া [কংগ্রেস] কার্যনির্বাহী কমিটির আর গত্যন্তর রইল না। পূর্বাঘাতের যে-পরিকল্পনা দীর্ঘদিন আগেই করা ছিল তা প্রয়োগ করা হলো ৪ জানুয়ারি ১৯৩২। জারি হলো বেশ কিছু অর্ডিনান্স (জরুরি অবস্থার ক্ষমতা, বেআইনি সমাবেশ, বেআইনি প্ররোচনা ও উৎপীড়ন তথা বয়কট বিষয়ে), সর্বস্তরের কংগ্রেস সংগঠন নিষিদ্ধ করা হলো, গ্রেপ্তার করা হলো সক্রিয় কর্মী ও সমর্থকদের এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। 'এইবার আর যুদ্ধ অমীমাংসিত থাকবে না', ঘোষণা করলেন হোর। প্রথম দিনেই শুধু বাঙলাতেই নিদেনপক্ষে ২৭২টি সংগঠন নিষিদ্ধ করা হলো।

১৯৩২-১৯৩৪ : দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন

উৎপীড়ন ও প্রতিরোধ

কূটকৌশলে পরাস্ত ও নজিরবিহীন মাত্রায় পীড়নমূলক ব্যবস্থার মুখে পড়েও হার স্বীকার করার আগে অবধি কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন বীরের মতো লড়াই চালিয়ে গেল দেড় বছর ধরে। জানুয়ারি ১৯৩২ থেকে মার্চ ১৯৩৩—এই পনেরো মাসের মধ্যে আনুমানিক গ্রেপ্তারের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১২০,০০০; অবশ্য এও বলতে হবে যে, এটি ১৯৩০-৩১-এর তুলনায় আপেক্ষিক শক্তির যথার্থ নিদর্শন নয়। সেইসময় গ্রেপ্তারের সংখ্যা ছিল ৯০,০০০, পীড়ন হয়ে উঠেছিল অনেক বেশি তীব্র ও সুসংবদ্ধ, এবারের গ্রেপ্তারের সংখ্যাও তাই এত বেড়ে যায়। যত দিন গেল, এই সংখ্যা কমতে থাকল তাৎপর্যপূর্ণভাবে ও যথেষ্ট দ্রুত। সরকারি হিসেবে, এপ্রিল ১৯৩৩ অবধি সাজা হয়েছিল ৭৪,৬৭১ জনের। মাসওয়ারি হিসেবে জানুয়ারি, ১৯৩২-এ ১৪,৮০৩ জন, ফেব্রুয়ারিতে ১৭,৮১৮ জন, মার্চে ৬,৯০৯ জন ও এপ্রিলে ৫,২৫৪ জনের সাজা হয়। এরপর কোনো মাসেই এই সংখ্যা ৪০০০ ছাড়ায় নি।

৪ এপ্রিল ১৯৩২-এ উইলিংডন জানান, পরিস্থিতি 'ভালোই আয়ত্তে আছে', আর ঐ বছরই ৬ নভেম্বর লেখেন যে, আইন অমান্য আন্দোলন 'প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায়' (*টেম্পলউড কালেকশন*)। মোট জনসংখ্যার তুলনায় শতকরা দণ্ডাজ্ঞার প্রদেশ-ওয়ারি হিসেবে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (১৪,১০১; ০.০৬৪%), বিহার ও ওড়িশা, (১৪,৯০৩ ; ০.০৪%), যুক্ত প্রদেশ (১৪,৬৫৯ ; ০.০৩%), বাঙলা (১২,৭৯১ ; ০.০২৬%) ও কেন্দ্রীয় প্রদেশ (৪০১৪ ; ০.০২৬%)। এর তুলনায় পাঞ্জাবে এই সংখ্যা হলো ০.০০৮% ও মাদ্রাজে ০.০০৭%। যদিও মুসলমানরা সাধারণভাবে কমই যোগ দিয়েছিলেন, তবুও সারা দেশের মধ্যে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এ দণ্ডাজ্ঞার শতকরা অনুপাত সবচেয়ে বেশি (৬,০৫৩ ; ০.২৫%)। নারীদের সংখ্যা ছিল ৩৬৩০। কংগ্রেস যে সত্যিই কতটা গণ-আন্দোলন হয়ে উঠেছিল আর-একটি হিসেব থেকেও তা বোঝা যায়। ১৯৩২-এর গোড়ার দিকের একটা হিসেবে দেখা যাচ্ছে, মাদ্রাজে ৯০৪ জনের মধ্যে ৭৫৯ জনই ছিলেন নিরক্ষর, আর যুক্ত প্রদেশে ২০০৪ জনের মধ্যে ১৫৫০ জনই তা-ই। যুক্ত প্রদেশের সংখ্যার ১৩৯৭ জনকে বলা হয়েছে রায়ত বা [কৃষি] শ্রমিক। ('হোম পলিটিকাল', এফ এন ৩/১১/১৯৩৩)। জুডিথ ব্রাউন-এর *গান্ধী অ্যান্ড সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স*, পৃ. ২৮৪-৬-তে উদ্ধৃত)।

১৯৩২-৩৩-এর আইন অমান্যের ভেতরে ছিল বহু রকমের কাজকর্ম। অংশত তার কারণ হলো, বহু ব্যাপারকেই ইতোমধ্যে বে-আইনি ঘোষণা করা হয়েছিল, আর নাগরিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল প্রায় পুরোপুরি। ৪ জানুয়ারি আক্রমণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার সময়ে উইলিংডন স্বীকার করেন যে, তিনি অনুভব করতেন যে তিনি 'ভারতের এক মুসোলিনি হয়ে উঠছেন' (হোর-কে লেখা চিঠি, ২০ ডিসেম্বর ১৯৩১)। আইনের পরোয়া না-করার নানা ঘটনার মধ্যে ছিল কাপড় ও মদের দোকানে ধর্না, বাজার বন্ধ করা ও শ্বেতাঙ্গ বা রাজভক্ত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বয়কট, প্রতীকস্বরূপ কংগ্রেস পতাকা তোলা, প্রকাশ্যে বে-আইনি কংগ্রেস অধিবেশন (যেমন এপ্রিল ১৯৩২-এ দিল্লীর চাঁদনি চক ঘড়িবাড়ির কাছে ও পরের বছর কলকাতা ময়দানে), লবণ সত্যাগ্রহ, চৌকিদারি কর না-দেওয়া, খাজনা-বন্ধ তথা রাজস্ব-বন্ধ, অরণ্য-আইন লঙ্ঘন এবং কংগ্রেসের কিছু বিশেষ বে-আইনি কার্যকলাপ (এর মধ্যে এমনকি অগাস্ট ১৯৩২-এ বোম্বাই-এর কাছে গোপন বেতার সম্প্রচারও ছিল) ও বোমার ব্যবহার—শেষ দুটি পন্থাকে গান্ধী ভীষণ নিন্দে করেছিলেন।

৪ এপ্রিল ১৯৩২-এ উইলিংডন-এর চিঠিতে বোম্বাই শহর ও বাঙলাকে 'দুটি কলঙ্ক-চিহ্ন' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বোম্বাই শহরের লাটের কাছে এটি ছিল 'গান্ধীবাদের দুর্গ', যেখানে 'ভারতের যে কোনো জায়গার চেয়ে...কংগ্রেসের প্রভাব অনেক বেশি গভীর' (হোর-কে সাইক্স্, ৬ মার্চ ১৯৩২, *সাইক্স্ কালেকশনস্*, ইউ এফ ১৫০ পাণ্ডুলিপি)। ব্যাপক সংখ্যায় গুজরাটী বণিক সম্প্রদায়, বিশেষ করে, মনে হয় ছোটো ব্যবসায়ীরা যোগ দেওয়ার ফলে, কেন্দ্রীয় মুলজী জেঠে কাঁচা তুলোর বাজারের কাজকর্ম অক্টোবর ১৯৩২ অবধি খুবই বাধা পায়। তারপর সরকারের তরফে ঠিক হয় যে, দেশী সংস্থাগুলোর নামে সফলভাবে ঢ্যাঁড়া কেটে দিয়ে, আর তুলোর ব্যবসার ওপর সরকারি খবরদারি চাপানোর একটা আইন পাশ করিয়ে উঠে-যাওয়ার মতো অবস্থার শ্বেতাঙ্গ সংস্থাগুলোকে সাহায্য করা হবে। কিন্তু ১৯৩০-এর মতোই, কারখানা-

শ্রমিকরা রইলেন নির্বিকার এবং মুসলমানরা কখনও কখনও শত্রুভাবাপন্ন—মে থেকে জুলাই ১৯৩২-এর মধ্যে বোম্বাই শহরে সত্যিই পর-পর কিছু বড় মাপের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়ে গেল। কী বোম্বাই কী অন্যত্র, গ্রামের দিকে ১৯৩০-এর তুলনায়, মনে হয়, সব মিলিয়ে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল কমই, কারণ ১৯৩১-এর সন্ধির সময়ে কংগ্রেস নিজেই নিজের নাক কেটে যাত্রাভঙ্গ করে। সর্বাত্মক রাজস্ব-বন্ধ ও খাজনা-বন্ধ আন্দোলনের উপযুক্ত মুহূর্তটিই তারা কাজে লাগাতে পারে নি। ব্রিটিশরা এইবার বরোদাকে চাপ দিয়ে সীমান্ত বন্ধ করাতে বাধ্য করে। ফলে খেড়া ও বারডোলি অসুবিধেয় পড়ে যায় আর ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ খেড়ার মাত্র ১৫টি গ্রাম রাজস্ব দেওয়া বন্ধ রাখে। খেড়ার রাস বলে গ্রামটি অবশ্য ১৯৩৩ অবধি রাজস্ব দিতে গররাজি ছিল, যদিও এখানকার পাটীদাররা ততদিনে ২০০০ একর জমি হারান ও তাঁদের মধ্যে কাউকে কাউকে পুলিশ উলঙ্গ করে প্রকাশ্যে চাবুক মারে ও বৈদ্যুতিক শক দেয়। কর্ণাটকের কোনো কোনো জায়গায় শক্তিশালী কর-বন্ধ আন্দোলন গড়ে ওঠে, বিশেষত উত্তর কানাড়ার আঙ্কোলা ও সিদ্দাপুর তালুকের প্রায় ২০০টির বেশি গ্রাম কর দেওয়া বন্ধ করে দেয়। সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের বহু জায়গায় বিচ্ছিন্নভাবে অরণ্য সত্যাগ্রহ ফেটে পড়েছে। যেমন, ১ মে ১৯৩২-এ আঙ্কোলায় ৪০০০ গ্রামবাসী তালুক-সদর-দপ্তরে হুড়মুড় করে ঢুকে নিলামের জন্যে সদ্য-কেটে রাখা জ্বালানি কাঠ নিয়ে চলে যান, আর কেন্দ্রীয় প্রদেশের বেতুল-এ ঐ মাসেই জনগোষ্ঠীয় নেতা মঙ্গু গোণ্ড ও চাইটু কোইকু প্রমুখের নেতৃত্বে অরণ্য সত্যাগ্রহ শুরু হয়। কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি তার প্রতিবেদনে অগাস্ট ও অক্টোবর ১৯৩২-এ মালাবারের কাসেরগোড তালুকে অরণ্য সত্যাগ্রহের উল্লেখ করে। (এ আই সি সি, এফ এন ১/১৯৩২)

তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রে আইন অমান্য আন্দোলন ছিল ১৯৩০-এর তুলনায় দুর্বল, যদিও কয়েকটি শহর ছিল ধর্না-র—এর সক্রিয় কেন্দ্র (যেমন, তামিলনাড়ুতে মাদ্রাজ শহর, মাদুরা ও বিরুধানগর)। অন্ধ্রের উপকূলবর্তী এলাকায় ১৯৩৩-এ রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলন ফের শুরু হওয়ার লক্ষণ দেখে ব্রিটিশরা কিছুদিনের জন্যে সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। বিহারের মুঙ্গের ও মজফ্ফরপুর জেলায় ফেব্রুয়ারি ১৯৩২-এ কয়েকটি পুলিশ থানায় গণ-আক্রমণ ঘটে। জনতা সংখ্যায় ৭০০০ পর্যন্ত ছিল। আর ১৯৩৩ অবধি অন্তঃশুল্ক-রাজস্বও কমে যেতে থাকে। আর যুক্ত প্রদেশে, যদিও মার্চ ১৯৩২-এ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি গোপন বুলেটিনে বলা হয় যে, বেশ কয়েকটি জেলায় রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলন হচ্ছে (কেমব্রিজ দক্ষিণ এশিয়া কেন্দ্রে রক্ষিত *আর ই হকিন্স্ পেপার্স*), তাহলেও এ সময়ে আইন-অমান্য হয়ে ওঠে অনেক বেশি শহরকেন্দ্রিক। যেমন—একমাত্র বারৌদা গ্রামে বিচ্ছিন্নভাবে খাজনাবন্ধ আন্দোলন ছাড়া আগ্রা জেলা এ সময়ে শান্তই ছিল ; আর রায়বেরেলীতে, জুলাই ১৯৩২-এর মধ্যে, অর্থাৎ মেয়াদের দু-মাস আগেই, পাওনা ভূমি-রাজস্বের ৮০% আদায় হয়ে গিয়েছিল। (জ্ঞান পাণ্ডে, পৃ. ১৭৭, ১৮৭)

মার্চ ১৯৩২-এ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির একটি বুলেটিনে বলা হয়েছে, বাঙলায় বিভিন্ন উপকূলবর্তী এলাকায় লবণ সত্যাগ্রহ, চৌকিদারি কর না-দেওয়া, বহু জেলায় ইউনিয়ন বোর্ড বয়কট, এবং হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা আর ত্রিপুরা, সিলেট ও জলপাইগুড়ি জেলার কোনা কোনো অংশে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন ফের শুরু হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্ব কিন্তু

(আর্থনীতিক) মন্দার সময়েও কৃষি-র‍্যাডিকালিজম-এর পক্ষ নিতে বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল। তাই, মুসলিম কৃষক-আন্দোলনগুলি আরও বেশি করে বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারায় বেড়ে ওঠার উৎসাহ পাচ্ছিল। এই বছরগুলোতেই প্রজা-আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করে। সমস্ত কর্মজীবন যিনি প্রকৃত কৃষি-জনমুখিতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাবাদী আবেদন মিশিয়েছেন, সেই মৌলানা ভাসানী ডিসেম্বর ১৯৩২-এ সিরাজগঞ্জে এক বড় প্রজা-সম্মিলন সংগঠিত করেন. সেখানে জমিনদারি অবলোপ ও ঋণ কমানোর দাবি ওঠে। সন্ত্রাসবাদের কারণে বাঙলা অবশ্য ব্রিটিশদের কাছে দুঃস্বপ্নই থেকে যায়। যদিও নতুন লাট অ্যান্ডারসন আইরিশ গৃহযুদ্ধের দিনগুলো থেকেই ছিলেন উৎপীড়ন-বিশেষজ্ঞ, তাহলেও সবচেয়ে বেশি সন্ত্রাসবাদী মামলা রজু করা হয় ১৯৩২-এই (১০৪)। এরপর অবশ্য ১৯৩৩-এ তা কমে হয় ৩৩, ১৯৩৪-এ ১৭। মেদিনীপুরে আরও দুজন শ্বেতাঙ্গ জেলাশাসককে খতম করা হয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে গভর্নর জ্যাকসনকে আক্রমণ করেন জনৈকা ছাত্রী আর সূর্য সেনকে ধরতে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ অবধি সময় লাগে। বক্‌সা, হিজলী ও দেওলির বন্দী শিবিরে রাখা হয় ৩০০০-এরও বেশি লোককে আর চট্টগ্রামের বন্দীদের পাঠানো হয় আন্দামানে।

দ্বিতীয় আইন অমান্যের সময়ে একই সঙ্গে দুটি রাজন্যশাসিত রাজ্যে তাৎপর্যপূর্ণ অভ্যুত্থান ঘটে। কাশ্মীরে অভিযোগ তদন্ত কমিশন এপ্রিল ১৯৩২-এ যেসব ছাড়ের প্রস্তাব দিয়েছিল (মুসলমানদের শিক্ষা-বিস্তারের জন্য ব্যবস্থা, সরকার-অধিকৃত মুসলিম ধর্মালয়গুলি ফেরত, আংশিক চারণ-কর বিরতি, আর সরকারের তলব-করা শ্রমের পাওনা মেটানো) তা দিয়ে ক্রমবর্ধমান আন্দোলন থামানো যায় নি। অক্টোবর ১৯৩২-এ মুসলিম কনফারেন্স-এর সূচনা হয়। এর নাম ন্যাশনাল কনফারেন্স হতে অবশ্য সময় লাগে আরও ছ-বছর। এর নেতা শেখ আবদুল্লা কিন্তু ইতোমধ্যেই জম্মুতে পি এন বাজাজ-এর নেতৃত্বাধীন স্বৈরাচার-বিরোধী এক হিন্দু-গোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার কাজ শুরু করেন। রাজস্থানের অলবার রাজ্যে ১৯৩৩-এর গোড়ায় মহারাজ জয়সিং সওয়াই-এর রাজস্ব বৃদ্ধি, বেগার, চারণ-কর ও শিকারের জন্য বন-সংরক্ষণের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অভ্যুত্থান ঘটে। মিওস বলে এক আধা-স্বনির্ভর, আধা-জনগোষ্ঠীয় কৃষক সম্প্রদায় ব্যাপক গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। আনুষ্ঠানিকভাবে এঁদের বেশির ভাগেরই যোগ ছিল ইসলামের সঙ্গে। ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৩ উইলিংডন জানান যে, অলবারের অবস্থা 'যৎপরোনাস্তি খারাপ'। *ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার*-এ যথারীতি কিন্তু ভুলভাবে একে 'সাম্প্রদায়িক উৎপাত' আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তবে *রেজিস্টার* এও জানিয়েছিল যে, তাতে যোগ দিয়েছিলেন ৮০-৯০,০০০ মিওস। পাঞ্জাবের মুসলমান নেতা মহম্মদ্ ইয়াসিন খান অবশ্য মহারাজা-বিরোধী আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক (সেই সঙ্গে ব্রিটিশ-ঘেঁষা) ছোপ দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তারই সঙ্গে এক বিকল্প, সচেতনভাবে র‍্যাডিকাল ধারাও গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সৈয়দ মুতালবি ফরিদাবাদী এবং যথেষ্ট চিত্তাকর্ষকভাবে, কে এম আশরফ, যিনি অচিরেই হয়ে ওঠেন ভারতের প্রথম মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের একজন। লোকের কাছে অপ্রিয় মহারাজকে ব্রিটিশরা শেষে ইওরোপে পাঠিয়ে দেয় আর কয়েক বছরের জন্যে অলবার-প্রশাসন অধিগ্রহণ করে (চৌধুরী আবদুল হাই-এর নিবন্ধ, এইচ ক্রুগার (সম্পা.), *কে. এম. আশরফ*, দিল্লী, ১৯৬৯)।

স্পষ্টতই, ১৯৩২-এর দ্বিতীয় ভাগ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমশ পরাস্ত হয়ে চলেছিল। এ কথা ঠিক যে, গুজরাট, অন্ধ্র বা যুক্তপ্রদেশ যেমন দেখা যায়, আন্দোলনে কৃষকদের সংখ্যা কমে গিয়েছিল। এটা কিন্তু কংগ্রেসের ওপর কোনো রকম আস্থা হারানোর ফলে নয়। তাঁরা নতিস্বীকার করেছিলেন সব দিক থেকেই অনেক বেশি গরীয়ান্ এক শক্তির কাছে। আর ত্যাগ ও শহীদ হওয়ার যে মহিমা কংগ্রেস ১৯৩০-৩৪-এ অর্জন করল, মুখ্যত তার দৌলতেই ১৯৩৪ থেকে পরের পর নির্বাচনে সে জিতে চলল। হার্ডিমান অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, 'ভোট দেওয়া আর আন্দোলন করা এক ছিল না...ধ্রুপদী গান্ধীপন্থী সত্যাগ্রহের দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল।' তাঁর কথায় যুক্তি আছে। বিত্তশালী চাষীরা ভোট দেবেন কংগ্রেসকে, কিন্তু তাঁদের জমি ছাড়তে তাঁরা আর তৈরি ছিলেন না, কারণ ১৯৩১-এ গান্ধী তাঁদের (বাজেয়াপ্ত) জমি ফিরিয়ে দিতে পারেন নি। আর কোনা কোনো এলাকায়, সবচেয়ে লক্ষণীয়ভাবে গুজরাটে (আর্থনীতিক)মন্দার পর যুদ্ধের রমরমার বাজারে (যখন খেড়ায় তামাকের দাম ৫০০% বেড়ে যায়) চাষীরা হয়ে উঠলেন আরও সম্পদশালী এবং সেই অনুপাতে কম জঙ্গী। ১৯৪৭-এর আগে মাত্র কয়েক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে গ্রামীণ পুঁজিবাদের বিকাশ হয়, কৃষক-র‍্যাডিকালিজম-এর সম্ভাবনা রয়ে যায় দেশের বেশির ভাগ জায়গায়, বিশেষত জমিনদারি এলাকায়। অবশ্য ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ক্রমবর্ধমান ভাবে এই র‍্যাডিকালিজম আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিল খোদ কংগ্রেসের বাইরে, বাম-ঘেঁষা কিসান সভা ও কখনও কখনও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির ভেতর দিয়ে।

বাণিজ্য পুনর্বিন্যাস

আইন অমান্য আন্দোলনের প্রতি কৃষকদের প্রতিক্রিয়া ক্রমেই হয়ে উঠছিল বিরোধমূলক, আর শহরে বুর্জোয়াদের মনোভাবেও দেখা যাচ্ছিল যথেষ্ট দোলাচল প্রবৃত্তি। ১৯৩২ জুড়ে গুজরাটী বণিকদের সমর্থনের ফলে বোম্বাই-এর আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঠাকুরদাসের বিরোধিতা করে, ১৯৩২-এর গোড়ায় সেখানকার ভারতীয় বণিকসভা দখল করে নেন এক জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী। আইন অমান্য আন্দোলন ফের শুরু হলে এফ আই সি সি আই সিদ্ধান্ত নেয়, আপাতত তারা সাংবিধানিক আলাপ-আলোচনা থেকে দূরে সরে থাকবে। কিন্তু ১৪ মার্চ ১৯৩২-এ জি ডি বিড়লা তড়িঘড়ি হোর-কে আশ্বাস দিয়ে দিলেন যে, সহযোগিতার দরজা কোনোভাবেই পুরো বন্ধ হয়ে যায় নি, এবং সদস্য-সংস্থাগুলোর বড়রকমের চাপের ফলেই এফ আই সি সি আই-এর নেতারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও গোল টেবিল বৈঠক বয়কটের সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন (*ইন দি স্যাডো অফ দি মহাত্মা,* পৃ. ৫৪-৫)। এই জে ডি বিড়লার সঙ্গেই ১৯৩১-এর গোল টেবিল বৈঠক অধিবেশনে, ব্যক্তিগত আলোচনায় বেন্টল যুগপৎ পুলকিত ও চমৎকৃত হয়েছিলেন এই দেখে যে, তিনি (বিড়লা) মানিয়ে চলতে পারেন। গণ-আন্দোলনে যখন ভাঁটার টান এল, তখন রাজনৈতিক 'বাস্তববাদ' ও সেই সঙ্গে বিশেষ কিছু শাখা-প্রশাখায় আর্থনীতিক হিসেব-নিকেশ কোনো কোনো ব্যবসায়ী গোষ্ঠীকে ঠেলে দিল (ব্রিটিশদের সঙ্গে) সহযোগিতার দিকে। ১৯২২-এর গ্রীষ্মে ওটাওয়া সাম্রাজ্যিক আর্থনীতিক সম্মিলনে ভারত বেশ কয়েকটি ব্রিটিশ পণ্যের ক্ষেত্রে কম হারে আমদানি শুল্ক মেনে নেয়, তার বদলে যুক্তরাজ্য (ইউ কে)

কয়েকটি রপ্তানিকৃত কাঁচামালের ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক আচরণে সম্মত হয়। অবশ্য তার মধ্যে অনেকগুলোর, যেমন চা, চামড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল যৎসামান্য। যদিও জাতীয়তাবাদীরা তীব্রভাবে, এবং বিড়লা জনসমক্ষে, এই চুক্তির বিরোধিতা করেন, তাহলেও আইনসভায় এটি বেশ সহজেই অনুমোদিত হয়। তাকে নিয়ে তাদের এত দুশ্চিন্তা ছিল না। জাপান নিয়ে বোম্বাই-এর বড় বড় বস্ত্রব্যবসায়ীরা ১৯৩২-৩৩-এ অনেক বেশি চিন্তিত ছিল মোটা থান কাপড়ের ক্ষেত্রে জাপানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে। এই দুশ্চিন্তাই ছিল অক্টোবর ১৯৩৩-এর কুখ্যাত লীজ-মোদী চুক্তির ভিত্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ বস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রে বোম্বাই আরও পক্ষপাত দেখাতে রাজি হয়, আর তার বদলে ল্যাঙ্কাশায়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা আরও বেশি করে ভারতীয় কাঁচা তুলো কিনবে। ভারতে আমদানি শুল্কের পাল্টা চাল হিসেবে জাপান ভারতীয় কাঁচা তুলো কেনা কমিয়ে দিয়েছিল, আর তাই জাপ-বিরোধী প্রশুল্কের পাঁচিল খাড়া রাখতে গেলে, ভারতীয় তুলোর জন্যে দরকার হয়ে পড়েছিল এক নতুন নির্গম-পথ। ল্যাঙ্কাশায়ারের ক্ষেত্রে কম হারে প্রশুল্ক মেনে নেওয়ার 'বিশ্বাসঘাতকতা'য় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন জাতীয়তাবাদীরা, আর আহ্‌মেদাবাদের সেই সব বস্ত্র ব্যবসায়ী, যাঁরা ল্যাঙ্কাশায়ার-এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সূক্ষ্ম সুতিবস্ত্র তৈরি করতেন। এঁদের প্রয়োজনীয় বড়-আঁশওয়ালা তুলো ব্রিটেনে উড়ে যাচ্ছে—এটা দেখার কোনো ইচ্ছেই সেই ব্যবসায়ীদের ছিল না। কিন্তু বোম্বাই-এর কারখানা-মালিক ও টাটা-রা (এর অল্প কিছু দিনের মধ্যেই এঁর অনুরূপ চুক্তি করেন ব্রিটিশ ইস্পাত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, যারা তখন বেলজিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে পড়েছিল) একযোগে ছিলেন এক শক্তিশালী জোট। আর রাজনৈতিকভাবেও, জুন ১৯৩২-এ ঠাকুরদাস 'খানিকটা সমঝওতা'র আবেদন জানাচ্ছিলেন, ১৯৩২-৩৪-এ বিড়লা বারবার সরকার ও গান্ধীর মধ্যে মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছিলেন।

কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলির সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ বা নিঃশর্ত সহযোগিতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল কিছু প্রবল বিষয়নির্ভর বাধ্যবাধকতা—আর্থনীতিক তথা রাজনীতিক, দুধরনেরই। ১ শিলিং ৬ পেন্স অনুপাতই রাখা হবে—ব্রিটিশদের এই জিদও হয়েছিল এক স্থায়ী অভিযোগ, কারণ এর ফলে আমদানিতে উৎসাহ দেওয়া হতো, আর বহাল রাখার জন্যে দরকার হতো এক মুদ্রা সঙ্কোচন-মূলক রাজস্ব ও আর্থিক নীতি। পুঁজিবাদী দুনিয়ার অন্যান্য জায়গার সরকার মন্দার সঙ্গে যুঝছিল জনমুখী খরচ অনেক বাড়িয়ে দিয়ে। ভারতের ক্ষেত্রে কিন্তু তথাকথিত 'সুস্থিত আর্থিক ব্যবস্থা'র কোনো নড়চড় হলো না ; রেলপথ ও সেচের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ কমিয়ে দেওয়া হলো অনেকখানিই (বাগচী, পৃ. ১৮, ৪৬-৭)। ১৯৩১ থেকে শুরু হয় ব্যাপক সোনা রপ্তানি। কারণ, স্টার্লিংকে স্বর্ণ-মান মুক্ত করে দেওয়ার ফলে টাকার স্বর্ণমূল্য কমে যায়। আর এই সোনা রপ্তানির ফলে পণ্য রপ্তানি মারাত্মক কমে যাওয়া সত্ত্বেও সরকার হোম ব্যয় ও ঋণশোধের টাকা মেটাতে পারছিল। ভারতের ব্যবসায়ী শ্রেণী ও জনমত অবশ্য এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। তাঁদের মতে, মন্দা-আক্রান্ত কৃষকরা আপৎকালে সম্পত্তি বেচে দেওয়ার ফলেই এটা হতে পেরেছিল। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা বোম্বাই-এ সোনা রপ্তানির দোকানগুলোয় ধর্না দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদীরা অবশ্য এমন সন্দেহও করছিলেন যে, ঠাকুরদাস আর বিড়লার মতো লোকেরা গোপনে 'এই অনৈতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে...লক্ষ

লক্ষ টাকা' কামাচ্ছেন (বোম্বাই কংগ্রেসের বেআইনি বুলেটিন, ১৭ অক্টোবর ১৯৩২, *ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ১০১)। যে লালজী নারায়ণজী ১৯২১-এ প্রকাশ্যেই অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, ২৭ জানুয়ারি ১৯৩২-এ তিনিই উদারপন্থী নেতা জয়করকে সাবধান করে দেন, 'আমার ব্যবসাদারি চিন্তাধারা অনুযায়ী আমি গান্ধীজীর নীতিতেই বেশি বিশ্বাস করি', কারণ 'সরকারি উদাসীনতাই আমাদের, পুঁজিপতিদের' বাধ্য করেছে 'কংগ্রেসের মতো সমাজবাদী সংগঠনের সঙ্গে কাজ করতে...'। তবে সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও তিনি বলে দেন যে, সেটা একেবারেই সাময়িক ও সীমিত ভিত্তিতে। যদি ব্রিটিশরা সোনা রপ্তানি বন্ধ করে, ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে রক্ষা করে, মুদ্রা, শুল্ক ও রাজস্ব নীতি বদল করে, এবং ব্যাঙ্ক, বীমা ও জাহাজ শিল্পের ওপর প্রায়-একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে, তাহলে, তিনি মনে করেন, কংগ্রেস অচিরেই আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেবে। সে আন্দোলন 'তারা পছন্দ করে না...বিশেষত মহাত্মাজী নিশ্চয়ই আন্দোলন তুলে নেবেন—যদি আমরা যা চাই তা পেয়ে যাই'। (*এম আর জয়কর পেপার্স*, এফ এন ৪৫৬)

সবচেয়ে বড় কথা, ১৯৩২-৩৪ জুড়ে ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ প্রত্যাঘাত করছিল পূর্ণমাত্রায়, তাই সহযোগিতা করাটা আরও কঠিন হয়ে পড়ে। বিশেষত, চার্চিল-এর নেতৃত্বাধীন উগ্র-টোরি বিরোধী পক্ষের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে ল্যাঙ্কাশায়ার। সেই বিরোধী পক্ষ তখন ছিল সাইমন কাঠামোর বাইরে কোনোরকম সাংবিধানিক সুযোগ-সুবিধে দেওয়ার বিপক্ষে। দাবি তোলা হয় যে, কেন্দ্রে কোনোরকম পরিবর্তন অনির্দিষ্ট কালের জন্যে স্থগিত রাখা হোক, অথবা তার বিকল্প সুদৃঢ় বাণিজ্যিক তথা আর্থিক রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হোক, যাতে ১৯১৯-এর রাজকোষ বিষয়ক স্বাধিকার কনভেনশন কার্যত বাতিল হয়ে যায়। ডিসেম্বর ১৯৩২-এ প্রশুল্ক বোর্ড-এর সুপারিশগুলো ল্যাঙ্কাশায়ার-এর চাপে পড়ে রদ করতে হয়। ১৯৩৪ জুড়ে লীজ-মোদী [চুক্তির] ছাড় বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা চালানো হয়। জানুয়ারি ১৯৩৫-এ ভারত-ব্রিটিশ পরিপূরক চুক্তিতে তুলোর ওপর শুল্ককে ওটাওয়া ব্যবস্থার অধীনে আনা হয় (আগে তা ছিল না)। আর আর্থিক অবস্থার সুরাহা হলেই আমদানি শুল্ক ২৫% কমানোর কথাও ভাবা হলো (বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যায় ৬)। ১৪ নভেম্বর ১৯৩৪-এ বিড়লা নাটকীয়ভাবে ঠাকুরদাসকে সাবধান করে দেন : 'আমার মনে হয় ল্যাঙ্কাশায়ার মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তারা আর মোদী-লীজ চুক্তিতে খুশি নয়।' (*ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ১২৬)

সহযোগিতা ও সঙ্ঘাতের প্রতি এই বিপরীতমুখী চাপের পরিণতি হলো : কংগ্রেসের নীতি-পরির্তনের সপক্ষে ব্যবসায়ীদের মনোভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ পুনর্বিন্যাস। গণ-আন্দোলন থেকে কংগ্রেস সরে গেল আইনসভার দিকে, আর শেষে মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ায়। ভারতীয় পুঁজিপতিদের নিজেদের মধ্যে প্রায়-রাজভক্ত আর জাতীয়তাবাদীদের ফারাক ছিল যথেষ্ট সুস্পষ্ট। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিক জুড়ে তা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু এই পুনর্বিন্যাসের ফলে সেই ফারাক মিটল। কংগ্রেস নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ গতিবিধির সঙ্গেও ব্যাপারটা খাপ খেয়ে গেল। সর্বাত্মক পীড়নের মুখে আইন অমান্য আন্দোলনে অপ্রাচ্ছন্ন ভাঙনের সঙ্গে তাঁরা ধীরে ধীর নিজেদের মানিয়ে নিলেন।

হরিজনদের মধ্যে প্রচার-অভিযান

১৯৩২-এর দ্বিতীয় ভাগে জেলে বসে গান্ধী সম্ভবত এই ব্যর্থ সঙ্ঘাত থেকে সম্মানজনক পশ্চাদপদসরণের নিরিখে ভাবতে শুরু করেছিলেন। এবারে কিন্তু তার সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনার ব্যাপারে ব্রিটিশরা ছিল পুরোদস্তুর নারাজ। তাই ব্যাপারটা এবার খুবই কঠিন হয়ে উঠেছিল। ১৯২২-এর পরে যেমন, এবারেও তাঁর প্রবৃত্তিজাত প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হলো গ্রামোন্নয়নের দিকে যাওয়া। অগাস্ট ১৯৩২-এ ম্যাকডোনাল্ড-এর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের ফলে অস্পৃশ্যদের জন্যে তৈরি হয় আলাদা নির্বাচকমণ্ডলী। তার ফলে মুখ্যত 'হরিজন' উন্নয়নেই সমস্ত মনোযোগ দিতে গান্ধীর সুবিধেই হয়। ২০ সেপ্টেম্বর অস্পৃশ্যদের আলাদা নির্বাচকমণ্ডলীর বিষয়টি নিয়ে গান্ধী 'আমরণ অনশন' শুরু করেন এবং বর্ণহিন্দু ও অস্পৃশ্য নেতাদের মধ্যে একটা মীমাংসা করাতে সমর্থ হন (পুণা চুক্তি)। ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ সেই অনুযায়ী রদবদল করা হয়; অস্পৃশ্যদের জন্যে করা হয় আসন সংরক্ষণ, আর ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদের চেয়ে তাঁদের প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানো হয়। ১৯৪৭-এর পরেও মূলত এই ব্যবস্থাই রয়ে গেছে। হরিজন উন্নয়নই এখন হয়ে উঠল গান্ধীর প্রধান ভাবনা। এমনকি মুক্তি পাওয়ার আগেই তিনি চালু করলেন সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা-বিরোধী লীগ (সেপ্টেম্বর ১৯৩২); আর সাপ্তাহিক পত্র *হরিজন* (জানুয়ারি ১৯৩৩)। নভেম্বর ১৯৩৩ থেকে অগাস্ট ১৯৩৪-এর মধ্যে তিনি ১২,৫০০ মাইল 'হরিজন পরিক্রমা' করলেন, আর এমনকি এও বললেন যে, ১৫ জানুয়ারি ১৯৩৪-এ বিহারের ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হলো বর্ণহিন্দুদের পাপের ফলস্বরূপ দৈবশাস্তি। এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাক্যচ্ছটা রবীন্দ্রনাথকে খুবই দাগা দেয়। আস্তে আস্তে ভুলে যাওয়া হলো আইন অমান্য আন্দোলনকে। মে ১৯৩৩-এ আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়। ২৩ অগাস্ট ১৯৩৩-এ পাকাপাকি কারামুক্ত হওয়ার পর গান্ধী ব্যক্তিগতভাবে এই আন্দোলন থেকে সরে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর এপ্রিল ১৯৩৪-এ আন্দোলন তুলে নেওয়া হলো আনুষ্ঠানিকভাবে।

অভিপ্রেরণা ও তাৎপর্যের দিক থেকে গান্ধীর অন্যান্য বহু কর্মসূচির মতোই হরিজন প্রচার-অভিযানও ছিল ভীষণরকম দ্বিমুখী। জওহরলাল প্রমুখ র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদীর মনে হয়েছিল, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের মূল কাজ থেকে এই সরে যাওয়াটা ক্ষতিকর। ব্রিটিশরা সাগ্রহে জেল থেকে হরিজনদের মধ্যে কাজ চালাতে দিল—এই ঘটনাও ঐ মনোভাবে ইন্ধন জোগায়। একই সঙ্গে আবার কংগ্রেসের ভেতরকার গোঁড়া হিন্দুরা এই নতুন ঝোঁকটি আরও বেশি করে অপছন্দ করছিলেন। যেমন, মালবীয়। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি তিনি ছিলেন গান্ধীর খুব কাছের লোক, কিন্তু এখন তিনি সরে যেতে থাকেন। ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদ-এর অন্য প্রবিধান অনুযায়ী মুসলমানদের দেওয়া হয় পাঞ্জাবে ৪৯% ও বাঙলায় ৪৮.৬% আসন (অর্থাৎ, এই দুই রাজ্যেই ইওরোপীয় সদস্যদের সঙ্গে মিলে তাঁরা হয়ে যান সংখ্যাগরিষ্ঠ)। গান্ধী কিন্তু এই প্রবিধান নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চান নি। এতে হিন্দু সাম্প্রদায়িকরা আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। পুণা চুক্তিতে পাকাপাকিভাবে বর্ণ হিন্দুদের সংখ্যালঘু অবস্থা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটাকে তীব্র আক্রমণ করেন বাঙলার গোঁড়া হিন্দু মতবাদীরা। কিন্তু জুন ১৯৩৪-এ কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি একটি আপসমূলক 'না বর্জন-না গ্রহণ' সূত্র পাশ করে। এর ফলে

দল ছেড়ে বেরিয়ে মালবীয় তৈরি করেন কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল। এপ্রিল থেকে জুলাই ১৯৩৪-এর মধ্যে বাক্সার, জসিডি ও আজমীরে সনাতনপন্থীরা গান্ধীর হরিজন সভা বানচাল করার চেষ্টা করেন ; এমনকি ২৫ জুন পুনায়, তাঁর গাড়িতে বোমাও ছোঁড়া হয়। আর, যে ব্রিটিশ সরকার দাবি করত যে তাদের প্রভাব আধুনিকীকরণের কাজে লাগে, তাদেরও কিন্তু গোঁড়া মতবাদীদের বিচ্ছিন্ন করার কোনো ইচ্ছেই ছিল না। অগাস্ট ১৯৩৪-এ ব্যবস্থাপক সভার সরকারি সদস্যরা মন্দির প্রবেশ (সংক্রান্ত) বিলটি না পাশ করানোয় সাহায্য করেন।

দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে গান্ধীপন্থীদের হরিজন উন্নয়নের কাজ গ্রামীণ সমাজের সবচেয়ে নিচুতলার ও সবচেয়ে নিপীড়িত অংশের মধ্যে জাতীয়তাবাদের বাণী ছড়াতে অবশ্যই পরোক্ষে সাহায্য করেছিল। আর তাই দেশের বেশির ভাগ জায়গায় হরিজনদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল কংগ্রেসের প্রতি এক পরম্পরাগত আনুগত্য, যা স্বাধীনতার পরেও দলটিকে প্রভূত সাহায্য করে। গান্ধীর অন্যান্য গণ-আন্দোলনের মতো এক্ষেত্রেও প্রসারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল নিয়ন্ত্রণ, কারণ হরিজন প্রচার-অভিযান গান্ধী ইচ্ছে করেই আটকে রেখেছিলেন সীমিত মাত্রার সমাজ-সংস্কারে (কুয়ো, রাস্তা, ও বিশেষ করে মন্দিরে অবাধ অধিকার, আর সেই সঙ্গে মানবসেবামূলক কাজকর্ম)। যদিও বহুসংখ্যক হরিজনই ছিলেন কৃষি-শ্রমিক, তবুও এই প্রচার-অভিযানের সঙ্গে কোনোরকম আর্থনীতিক দাবি-দাওয়ার তিনি কোনো সম্পর্ক রাখলেন না, আর গোটা 'জাত' ব্যাপারটিকে আক্রমণ করতেও নারাজ হলেন। বিভিন্ন বর্ণের একত্র আহার ও অসবর্ণ বিবাহের ব্যাপারে তিনি সাবধানে এগোনোর পরামর্শ দিলেন, আর আদি বর্ণাশ্রম প্রথার সমর্থনও করে চললেন। এর জন্যেই সাপ্তাহিক *হরিজন*-এ বার্তা পাঠাতে অস্বীকার করেন আম্বেদকর। তাঁর যুক্তি ছিল : 'জাতিভেদ প্রথার ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই জাতহারাদের মুক্তি দিতে পারবে না' (টেণ্ডুলকর, খণ্ড ৩, পৃ. ২৩৬-৮)। কৃষক আন্দোলনের মতো, হরিজনদের মধ্যে গান্ধীপন্থী কাজও, মনে হয়, আংশিকভাবে ছিল নিচুতলা থেকে সম্ভাব্য আরও র‍্যাডিকাল চাপের লাগাম ধরার চেষ্টা। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায়, তামিলনাড়ুতে ই ভি রামস্বামী নায়কর-এর আ ত্ম ম র্যা দা আ ন্দো ল ন দ্রুত বাড়তে থাকে। এর থেকে গড়ে উঠছিল ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধিতার এক জনমুখী ধাঁচ, যা রাজভক্ত ও শিরোমণিতন্ত্রী জাস্টিস দলের থেকে একেবারেই আলাদা। ১৯৩২-এ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ঘুরে এসে নায়কর কোয়েম্বাটুরে একটি 'স্তালিন হল্' তৈরি করেন আর তাঁর *কুডি আরাসু* পত্রিকায় প্রবীণ কমিউনিস্ট সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়ারের নিরীশ্বরবাদী ও সমাজবাদী লেখাপত্রের জায়গা করে দেন। যদিও পরে দেখা যায়, নায়করের 'সমাজবাদ' ছিল এক ক্ষণস্থায়ী প্রণয়লীলা, তাহলেও আ ত্ম ম র্যা দা আ ন্দো ল নে র কোনো কোনো কর্মী, যেমন পি জীবানন্দন, পরে কমিউনিস্ট নেতা হয়ে ওঠেন। কেরলেও গান্ধী পড়েন ধর্মবিরোধী মেজাজের মুখে, কারণ এখানে, ১৯৩০-এ গান্ধীপন্থী টি কে মাধবনের মৃত্যুর পর, এজাভাদের জাতভিত্তিক সংগঠন, এস এন ডি পি-যোগম দখল করে নেন সি কেশবন, কে আয়প্পন প্রমুখ নেতারা। এই র‍্যাডিকালরা মনে করতেন, মন্দির-প্রবেশ হলো তুলনায় তুচ্ছ বিষয়। পরে এঁরাই হয়ে ওঠেন জঙ্গী নিরীশ্বরবাদী, বহু লোককে কমিউনিস্ট পথে যেতে অনুপ্রাণিত করেন, যদিও নিজেরা কখনোই মার্কসবাদী হন নি।

সাধারণভাবে অবশ্য, ভারতীয় বামেরা জাত ও শ্রেণীর জটিল আন্তঃসম্পর্ক নিয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিতে পারেন নি। তাই, কংগ্রেস সমাজবাদী দলের খসড়া কর্মসূচিতে অস্পৃশ্যতার বিষয়টি উল্লেখ করতে ভুলে যাওয়ার জন্যে নরেন্দ্র দেবকে গান্ধী যখন ২ অগাস্ট ১৯৩৪-এ ভর্ৎসনা করেন, সেটা বেঠিক নয় (টেন্ডুলকর, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৪৪)।

কাউন্সিল রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন

হরিজন প্রচার অভিযানে বিড়লা টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য তো করলেনই, এমনকি অস্পৃশ্যতা-বিরোধী লীগের সভাপতি হতেও রাজি হলেন। আর (আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর) সাধারণভাবে ব্যবসায়ী গোষ্ঠীগুলি আইনসভায় কংগ্রেসের ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে আরও আগ্রহী হয়ে উঠল—কংগ্রেস সেখানে কার্যকরী চাপদারী গোষ্ঠী হিসেবে তাদের হয়ে তদ্বির করতে পারবে। প্রদেশগুলোয় সম্পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকারের সম্ভাবনায় এই আকর্ষণ আরও বাড়ছিল। কংগ্রেস নেতাদের একটা বড় অংশই বেশি করে সেই টান বোধ করছিলেন। অক্টোবর ১৯৩৩-এ স্বরাজ্য দলকে পুনরুজ্জীবিত করে নির্বাচনী রাজনীতিতে ফিরে আসার পরিকল্পনাটি হাজির করেন সত্যমূর্তি, আর এপ্রিল ১৯৩৪-এ ভুলাভাই দেশাই, আনসারি ও বিধানচন্দ্র রায় অবিলম্বে সেটি লুফে নেন। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদের প্রশ্নে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী মালবীয়-আনে গোষ্ঠী দলছুট হওয়ায় পরিস্থিতি খানিকটা জটিল হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু প্রথাগত রাজনীতির দিকে ফিরে যাওয়ার ঝোঁকটা ছিল স্পষ্ট। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, এপ্রিল ১৯৩৪-এ বিড়লাকে লেখা এক চিঠিতে গান্ধী স্বীকার করেন যে, 'কংগ্রেসের মধ্যে সর্বদাই একটি গোষ্ঠী থাকবে যারা কাউন্সিল-এ ঢোকার ধারণাটির সঙ্গে জুড়ে আছে। কংগ্রেসের হাল ঐ গোষ্ঠীর হাতেই থাকা উচিত' (*ইন দি স্যাডো অফ দি মহাত্মা*, পৃ. ১৩৮)। ১৯৩৪-এ তামিলনাড়ুতে কাউন্সিলে ঢোকার সমর্থকদের মধ্যে যেমন ছিলেন ১৯২০-র দশকের উগ্র পরিবর্তন বিরোধী রাজাগোপালাচারী, তেমনি ছিলেন প্রবীণ স্বরাজী কৃষ্ণমূর্তি। ১৯৩০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে দেখা যায়, বামদের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে, নিষ্ঠাবান গান্ধীপন্থী গঠনমূলক কর্মী আর কাউন্সিলে ঢোকার (ও অচিরেই মন্ত্রিসভা গঠনের) প্রবক্তারা ক্রমেই একজোট হচ্ছেন। একটি সুনির্দিষ্ট দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস গড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় ব্যবসায়ীদের পরামর্শ ও চাপও যে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তারও প্রমাণ আছে যথেষ্ট। ১২ এপ্রিল ১৯৩৪-এ ঠাকুরদাসকে বিড়লা বলেন, 'আমি চাই তুমি ভুলাভাই (দেশাই)-এর সঙ্গে যোগাযোগ রাখো। জিততে গেলে স্বরাজ্য দলকে নতুন নির্বাচন লড়ার জন্যে কিছু তহবিল জোগাড় করতেই হবে; আর আমি প্রস্তাব করছি, ঠিক ধরনের লোকেদেরই পাঠানো হচ্ছে কিনা, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত না-হয়ে বোম্বাই থেকে যেন তাদের টাকা না-দেওয়া হয়।' আবার ৩ অগাস্ট ১৯৩৪-এ তিনি বলেন, 'বল্লভভাই, রাজাজী আর রাজেন্দ্রবাবু, এঁরা সবাই কমিউনিজমের ও সমাজবাদের বিরুদ্ধে লড়ছেন। সুতরাং, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ, যাঁরা সুস্থ পুঁজিবাদের প্রতিনিধি, তাঁরা গান্ধীজীকে যথাসম্ভব সাহায্য করবেন এবং কাজ করবেন একই লক্ষ্য নিয়ে—তার প্রয়োজন আছে' (*ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ১২৬, ৪২ (৬))।

বাম বিকল্প

এইভাবে উদ্ভব হচ্ছিল এক বাম বিকল্পের (আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্যেই নিহিত ছিল এই উত্থানের যৌক্তিকতা) আর স্পষ্টতই তাতে আতঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন ঐ সব লোকেরা, কারণ তা জাগিয়ে তুলেছিল এমন সব আশা, যেগুলো সে-আন্দোলন পূরণ করতে পারে নি। বিশ্ব-ঘটনাবলিরও এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। বিশ্ব-পুঁজিবাদ আক্রান্ত হয়েছিল অতি-উৎপাদনের উদ্ভট সঙ্কটে আর জন্ম দিচ্ছিল নাৎসিদের, যা সমস্ত মানবিক ও গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার পরিপন্থী। অপরপক্ষে, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে এমন একটা জিনিস গড়ে তুলছে বলে মনে হলো, যাকে মার্কসবাদের দুই আজীবন সমালোচক [সিডনি ও বিয়েট্রিস ওয়েব] কিছুদিনের মধ্যেই এক 'নতুন সভ্যতা' বলে অভিনন্দন জানান। তখনও পর্যন্ত স্তালিনবাদী মোকদ্দমা বা নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তির ফলে তার ভাবমূর্তি কলঙ্কিত হয় নি।

যে ১৯৩৩-এ গান্ধী যখন প্রথম আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখলেন, তখন ইওরোপ থেকে সুভাষচন্দ্র বসু ও বিঠলভাই প্যাটেল তাঁর নেতৃত্ব অগ্রাহ্য করে বিবৃতি দেন। ভাবাদর্শগত বিকল্পের সূচক হিসেবে এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো কারাগারে বসে মননের দিক থেকে জওহরলালের র‍্যাডিকাল হয়ে ওঠা। মেয়েকে লেখা তাঁর পত্রাবলি (পরে *গ্লিমসেস্ অফ ওয়ার্লড হিস্ট্রি* নামে প্রকাশিত, ১৯৩৪), এবং তাঁর *অটোবায়োগ্রাফি* (১৯৩৪-৩৫-এ কারাবাসে লেখা)—এ দুটি হলো মার্কসীয় সমাজবাদী ধ্যানধারণা সম্বন্ধে নেহরুর উৎসাহ ও আংশিক দায়বদ্ধতার সর্বোচ্চ নিদর্শন। জুলাই ১৯৩৩ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৪ পর্যন্ত অল্প কিছুকাল কারার বাইরে থাকার সময়ে নেহরু, বিভিন্ন চিঠিপত্র ও রচনায়, গান্ধীর সঙ্গে তাঁর নানা তত্ত্বগত পার্থক্য পরিষ্কার খুলে ধরেন। এগুলিই পরে *হুইদার ইন্ডিয়া* নামে প্রকাশিত হয়। জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যের সঙ্গে র‍্যাডিকাল সামাজিক ও আর্থনীতিক কর্মসূচি যুক্ত করার ব্যাপারে তিনি বারবার জোর দেন এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তীব্র আক্রমণ করেন। (অক্টোবর ১৯৩৩-এ হিন্দু মহাসভার আজমীর অধিবেশনে হিন্দুদের 'আত্মরক্ষা'র ডাক দেওয়া হয়, আর সেই সঙ্গে 'যে-কোনো রকমের আন্দোলন, যাতে পুঁজিপতি তথা ভূস্বামীদের শ্রেণী হিসেবে বিলুপ্ত করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে' তার নিন্দা করা হয়)। নেহরু অবশ্য, প্রতিবারের মতোই, এবারেও গান্ধীর সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কচ্ছেদ করলেন না, আর কেন তিনি 'কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলদের জন্যে মাঠ ফাঁকা করে দেবেন' তার কোনো হেতুই খুঁজে পেলেন না। একটি সমাজবাদী দল গঠনের যে চেষ্টা চলছিল তাতেও তাঁর সায় ছিল না। গান্ধী এতে খুব একটা শঙ্কিত হন নি। তিনি বলেন, 'ওঁর কমিউনিস্ট চিন্তাভাবনা নিয়ে...কারও ভয় পাওয়ার কিছু নেই' (*বম্বে ক্রনিকল*, ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩-এর সাক্ষাৎকার)। কিন্তু বহু ব্রিটিশ আমলাই মনে করতেন, নেহরু হলেন 'কমিউনিজমের মোহন্ত' ; তাই, যখন কার্যত আর সব নেতাকেই মুক্তি দেওয়া হচ্ছিল, তাঁকে তখন আবার পুরে দেওয়া হলো জেলখানায়।

একটি আলাদা সমাজবাদী গোষ্ঠী, যা কংগ্রেসেরই মধ্যে থেকে সংগঠনটিকে বাম-মার্গের দিকে ঠেলে দেব—এমন ধারণা হাজির করা হয় ১৯৩৩-এ নাসিক জেলের এক সভায়, যাতে যোগ দিয়েছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পটবর্ধন, ইউসুফ মেহের আলী, অশোক মেহতা ও মিনু মাসানি প্রমুখ। এপ্রিল ১৯৩৪-এ যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস নেতা সম্পূর্ণানন্দ রচনা করেন

'ভারতের জন্য এক খসড়া সমাজবাদী কর্মসূচি' আর পরের মাসে পাটনায় এক সম্মিলনে নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে পত্তন হলো কংগ্রেস সমাজবাদী দল (সি এস পি)। প্রথম থেকেই এর মধ্যে ছিল অনেক দ্বিমুখিতা, কারণ সি এস পি থাকতে চেয়েছিল কংগ্রেসের মধ্যেই, অথচ তীব্র বিরোধিতা করছিল কংগ্রেস নেতৃত্বের, আর অ-কংগ্রেসি বামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করতেও তৈরি ছিল। এই ভাবাদর্শের রূপকারদের মত ছিল বহু বিচিত্র—অস্পষ্ট তথা পাঁচ-মেশালি র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদ থেকে শুরু করে মার্কসবাদী 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদে'র সপক্ষে মোটামুটি দৃঢ় সমর্থন। পাটনার সভায় নরেন্দ্র দেব নিছক 'সমাজ-সংস্কারবাদে'র সঙ্গে 'বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ'কে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখেন। দক্ষিণ-ঘেঁষা কংগ্রেস নেতারা এই নতুন ঝোঁককে অপছন্দ করছিলেন খুবই। সীতারামাইয়া এমনকি এতদূর গেলেন যে, তিনি ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪-এ প্যাটেলকে লেখা একটি চিঠিতে এর প্রতিষ্ঠাতাদের আখ্যা দিলেন 'আবর্জনা'। আর জুন ১৯৩৪-এ কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি 'ব্যক্তিগত সম্পত্তি 'অধিগ্রহণ ও শ্রেণী-সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত আলগা কথাবার্তা'র নিন্দা করল, কারণ এসব অহিংসার বিরোধী। ব্যাপারটায় নেহরুর সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তিনি কোনোদিনই আনুষ্ঠানিকভাবে সি এস পি-তে যোগ দেন নি। আর এও কৌতূহলজনক যে, ইতোমধ্যেই উদ্ধৃত নরেন্দ্র দেবকে লেখা গান্ধীর ২ অগাস্ট ১৯৩৪-এর চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, গান্ধী মনে করেন, যে-জওহরলাল 'আমাদের সমাজবাদের মন্ত্র দিয়েছেন', 'কারামুক্ত হলে...তিনিই পা চালাতেন শনৈঃ শনৈঃ'। ঐ চিঠিতে এমন ভবিষ্যদ্‌বাণীও করা ছিল যে 'যখন আমি ও অন্য বুড়ো-বুড়িরা অবসর নেব, তখন স্বাভাবিকভাবে নেহরুর মাথাতেই চড়বে কংগ্রেসের কাঁটার মুকুট'। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বল্লভভাই প্যাটেলের উপকারার্থে আবারও গান্ধী এই কথাটিই বলেন। (টেন্ডুলকর, খণ্ড ৩, পৃ. ৩৮৬)

যুক্ত প্রদেশের মতো কিছু প্রদেশে সি এস পি-র দ্রুত অগ্রগতি (ইতোমধ্যেই, সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪-এ একটি সরকারি সূত্রে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি-র ১১ জনের মধ্যে ৭ জন সদস্যকে বলা হয়েছিল সমাজবাদী) ছিল অনেকটাই মায়াময়। সমর্থনের অনেকটাই ছিল বিশুদ্ধ সুবিধাবাদী। তা আসছিল এমন সব গোষ্ঠীর কাছ থেকে যাঁদের সঙ্গে বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস নেতৃত্বের উপদলীয় কোন্দল ছিল। আর, সি এস পি-র অধিকাংশ প্রতিষ্ঠাতৃ-পিতার ভাবী রাজনৈতিক কর্মজীবনের ধারাও ছিল অতীব বিচিত্র, ভবিষ্যতে কখনোই অবিচল বামপন্থী নয়। তাহলেও কংগ্রেস কর্মী ও নেতৃবৃন্দের মধ্যে সি এস পি-র প্রচার চিন্তার খোরাক জোগাল যথেষ্টই—যেমন, আমূল ভূমি-সংস্কার, শিল্প-শ্রমিকদের সমস্যা, রাজন্যশাসিত রাজ্যের ভবিষ্যৎ, এবং লোক সমাবেশ তথা আন্দোলনের অ-গান্ধীবাদী পদ্ধতি ইত্যাদি প্রশ্নে। নরেন্দ্র দেবের 'শ্রমিক কৃষকদের সাধারণ ধর্মঘট'-কে অগাস্ট ১৯৩৪-এ গান্ধীর মনে হয়েছিল 'উত্তেজনাকর' ও 'অত্যন্ত বিপজ্জনক'।

কিসান সভা আন্দোলনও তখন গড়ে উঠছে। সি এস পি কর্মীরা এই আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছিলেন—বিশেষত বিহার ও অন্ধ্রে। ১৯৩৩-৩৪ জুড়ে অন্ধ্রের উপকূলবর্তী জেলাগুলোয় বেশ কয়েকটি কিসান মিছিল সংগঠিত করা হয়। ১৯৩৩-এ এল্লোর জমিনদারি রায়ত সম্মিলনে দাবি তোলা হয় জমিনদারি বিলোপের। আর কিসান কর্মীদের

শিক্ষা দেওয়ার জন্যে সি এস পি নেতা এন জি রঙ্গ নিডুব্রোলু-তে একটি ভারতীয় কৃষক পরিষদ স্থাপন করেন। আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে বিহারে কিসান সভাকে অকেজো হয়ে যেতে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৯৩৩-এ বিহার কংগ্রেস নেতৃবর্গের একাংশ সেটিকে আবার জাগিয়ে তুলতে সহজানন্দকে প্রথম-প্রথম উৎসাহ দিতে থাকেন, কারণ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে তখন চাষীদের মন জয় করার চেষ্টা করছিল রাজভক্ত, জমিনদার-প্রধান ইউনাইটেড পার্টি। ছোটখাটো ব্যাপারে চাষীদের তারা কিছু সুযোগ-সুবিধা দিতে চাইছিল। যেমন, গাছ পোঁতা ও কুয়ো খোঁড়ার অধিকার, 'সালামি' দিয়ে জোতের হাতবদল ইত্যাদি। ইউনাইটেড পার্টিকে ঠেকাতেই কিসান সভাকে আবার জাগানোর চেষ্টা। কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, যেমন খাজনা মকুব, 'জেরেত' (ব্যক্তিগত জোত) ও 'বকশ্‌ৎ' (যে জমিতে মন্দার বছরগুলোয় বংশানুক্রমিক রায়তদের সরিয়ে স্বল্প মেয়াদি ইজারা দেওয়া হয়েছিল) বাড়ানোর জন্য জমিনদারদের প্রয়াস ইত্যাদি প্রশ্নে ইউনাইটেড পার্টি চুপ করে ছিল। মধ্য ও উত্তর-বিহারের কৃষকদের একটা বড় অংশকে এই সব প্রশ্নে সহজানন্দ দ্রুত সংগঠিত করতে পারলেন, আর ১৯৩৫-এ তাঁর কিসান সভার সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮০,০০০। সহজানন্দ প্রথম দিকে জমিনদারি প্রথা লোপ বা সাদাসাপ্টা শ্রেণী-সংগ্রামের ডাক দেওয়ার বিরোধী ছিলেন; কিন্তু সি এস পি-ও লেগে থাকে, চাপ দিয়ে ও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁকে দিয়ে এই র‍্যাডিকাল কর্মসূচি তারা মানিয়ে নেয় এবং গোটা বিহার প্রাদেশিক কিসান সভাই নভেম্বর ১৯৩৫-এ তার তৃতীয় হাজিপুর অধিবেশনে মেনে নেয় ঐ কর্মসূচি। আর এ কথাও বলা দরকার যে, ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে শেষ পর্যন্ত সি এস পি বিষয়গতভাবে এক ধরনের সেতুর কাজ করে গেছে, যে-সেতু পেরিয়ে র‍্যাডিকাল জাতীয়তাবাদীরা পৌঁছেছেন কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ণাঙ্গ মার্কসবাদের পথে। এন জি রঙ্গ পরবর্তীকালে কটু অভিযোগ করেন যে, নিডুব্রোলুতে তিনি যে ২০০০ কৃষক-যুবককে শিখিয়ে-পড়িয়ে তৈরি করেছিলেন, তার তিন ভাগের এক ভাগকে, আর আদত অন্ধ্র সি এস পি সদস্যদের নিদেনপক্ষে ৯০% -কে কব্জা করে নিয়েছে সি পি আই (*রেভলিউশনারি পেজান্টস্*, পৃ. ৭৫-৬)। ১৯৩৪ থেকে ১৯৪২ অবধি সি পি আই ছিল বেআইনি, তাই দৃঢ়প্রত্যয়ী কমিউনিস্টরা ঐ সময়ে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় সি এস পি-কে একটি আইনি 'ফ্রন্ট' বা আড়াল হিসেবে ব্যবহার করছিলেন।

শেষত, ১৯৩৩ ও ১৯৩৪ ছিল শ্রমিক-পুনরুজ্জীবনের বছর হিসেবে তাৎপর্যময়। ১৯২০-র দশকের শেষ ভাগের মতোই এই পুনরুজ্জীবনও ছিল কমিউনিস্ট ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ১৯২০-র পর থেকে সবচেয়ে কম ধর্মঘট হয়েছিল ১৯৩২-এ। পরের বছর থেকে এই সংখ্যা আবার বাড়তে থাকে :

বছর	ধর্মঘটের সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্যা	নষ্ট শ্রমদিবস
১৯৩২	১১৮	১২৮,০৯৯	১,৯২২,৪৩৭
১৯৩৩	১৪৬	১৬৪,৯৩৮	২,১৬৮,৯৬১
১৯৩৪	১৫৯	২২০,৮০৮	৪,৭৭৫,৫৯৯

সি রেভরি, *ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্ট* (১৯৭২), পৃ. ১৮৩-৫

ব্রিটিশ চটকল-মালিকদের মতোই ভারতীয় সুতোকল-মালিকরাও ছাঁটাই, পুনর্বিন্যাস ও মজুরি কমিয়ে শ্রমিকদের ঘাড়েই চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করছিলেন মন্দার বোঝা। যেমন বোম্বাই-এর কাপড়কলগুলোয় জুলাই ১৯২৬-এর তুলনায় ডিসেম্বর ১৯৩৩-এ গড় দৈনিক আয় কমেছিল ১৬.৯৪%। জিনিসের দাম কমে যাওয়ায় একটা পাল্লা সমান অবস্থা তৈরি হলেও এমনকি ১৯৩৪-এ প্রকৃত মজুরিও কমতে শুরু করে (রেডরি, পৃ. ১৭৬ ; বাগচী, পৃ. ১২২)। মিরাট ষড়যন্ত্র মামলা আর ১৯২৯ ও ১৯৩১-এর বারবার ভাঙনের ফলে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন খুবই কমজোরি হয়ে পড়ে। এ আই টি ইউ সি-র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গড়ে তোলা হয় নরমপন্থী জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। অবশ্য কারারুদ্ধ নেতাদের জায়গায় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই উঠে এসেন তরুণতর কমিউনিস্ট জঙ্গীরা। এঁদের নেতা ছিলেন বোম্বাই-এ বি টি রণদিভে ও এস ভি দেশপাণ্ডে, আর কলকাতায় আবদুল হালিম, সোমনাথ লাহিড়ী ও রণেন সেন প্রমুখ। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকের এই 'অতি-বামপন্থা'র ফলে জন্ম নিল অজস্র পরস্পরবৈরী গোষ্ঠী এবং সাধারণভাবে, মূল জাতীয়তাবাদী স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নতা। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর বিষয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের নিজেদের গোষ্ঠী গড়ার চেষ্টা করলেন। পরিস্থিতি তাতে আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। ভি বি কর্নিক, মনিবেন কারা ও রজনী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নেতাদের মাধ্যমে রায়বাদীরা অচিরেই ট্রেড ইউনিয়নের কাজকর্মে যথেষ্ট সফল হন। কলকাতার জনৈক ব্যারিস্টার, নীহারেন্দু দত্ত মজুমদার শুরু করেন 'লেবর পার্টি'। পরে তিনি হয়ে ওঠেন এক যোগ্য ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

১৯৩৪-এর পর থেকে অবশ্য শ্রমিকদের আবার নতুন জঙ্গীপনা এবং কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পুনর্মিলিত হওয়ার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল সুস্পষ্টভাবে। কমিউনিস্ট ও রায়বাদীরা ১৯৩৪-এ সুতো শিল্পে সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করার চেষ্টা করেন ; বড় বড় ধর্মঘট হয় শোলাপুরে (ফেব্রুয়ারি-মে), নাগপুরে (মে-জুলাই), আর সবার ওপরে, এপ্রিল থেকে বোম্বাই-এ সাধারণ ধর্মঘট। শ্রমিক ও কমিউনিস্টদের পুনরুজ্জীবিত জঙ্গীপনা নিয়ে সরকারি মহল যে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দফতরের কাগজপত্র থেকে। ১৯৩৪-এ ঐ বিষয়টি নিয়ে কাগজের বন্যা বয়ে যায়, আর ১৯০৮-এর পুরনো রাজদ্রোহমূলক সমাবেশ-বিরোধী আইন মোতাবেক ২৩ জুলাই সি পি আই-কে আনুষ্ঠানিকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ১৯২৯-এর মতো এবারে কিন্তু উৎপীড়নের ফলে কমিউনিস্ট আন্দোলন গুরুতর রকমে কমজোরি হয়ে পড়ল না। কারণ, নতুন 'যুক্ত মোর্চা' কৌশলের মাধ্যমে কমিউনিস্টরা সি এস পি ও কংগ্রেসের মধ্যেই থেকে যান ও বাম-জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ক্রমপ্রসারী সম্পর্ক গড়ে তোলেন। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই (দুর্বলতার বদলে) বরং দেখা যায় সংহতি ও অগ্রগতির লক্ষণ। ফ্যাসিবাদের পটভূমিতে, ১৯৩৫-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর সপ্তম কংগ্রেসে ডিমিট্রভ-এর প্রতিবেদনে যুক্ত মোর্চার প্রেক্ষিত গড়ে তোলা হয়। সি পি আই-এর কর্মপন্থার আনুষ্ঠানিক দিকবদল স্পষ্টতই এর সঙ্গে জড়িত। কিন্তু একথাও জোর দিয়ে বলা দরকার যে, কিছু অভ্যন্তরীণ চাপও বোধহয় ছিল। কারণ, আইন অমান্য আন্দোলনের পরিণতিতে কোনো কোনো মোহমুক্ত গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের এক

নতুন প্রজন্ম চলে আসেন কমিউনিস্ট আন্দোলনে। এঁদের ছিল ব্যাপকতর গণ-সংযোগ। আর ১৯২০-র দশকের বোম্বাই ও কলকাতার খুদে গোষ্ঠীগুলোর চেয়ে এঁরা সম্ভবত জাতীয়তাবাদী মূলস্রোতের কাছে বেশি সম্মান পেতেন। যেমন, কেরলে ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি পি কৃষ্ণ পিল্লাই, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ ও এ কে গোপালন প্রমুখ নেতারা একই সঙ্গে উৎপীড়নে-দীর্ণ কংগ্রেস সংগঠন আবার গড়ে তুলেছিলেন, তৈরি করেছিলেন সি এস পি-র স্থানীয় ইউনিট এবং পত্তন করেছিলেন কেরল কমিউনিস্ট পার্টির, আর ঐ প্রক্রিয়ায় একাত্ম করে নিয়েছিলেন ত্রিবান্দ্রম কমিউনিস্ট লীগ নামের ছোটো ও কিছুটা সঙ্কীর্ণ মনোভাবের গোষ্ঠীটিকে। এই গোষ্ঠীই ছিল এ অঞ্চলের প্রথম স্বঘোষিত মার্কসবাদী গোষ্ঠী। বাঙলাতেও ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে বিচ্ছিন্ন নানা বন্দী-শিবিরে ও আন্দামানে শুরু হয় সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে তীব্র ভাবাদর্শগত বিতর্ক ও বীরোচিত আত্মসন্ধান। ব্যাপক সংখ্যায় সন্ত্রাসবাদীরা মত বদলে মার্কসবাদে দীক্ষা নেন। আর এইভাবেই জেলায় জেলায় কমিউনিজম সত্যিই ছড়িয়ে পড়ে। সন্ত্রাসবাদীদের মধ্যে থেকেই আসেন ভবানী সেন ও হরেকৃষ্ণ কোঙারের মাপের বাঙলার কমিউনিস্ট নেতারা। এবং তখনকার সবচেয়ে সম্মানিত বিপ্লবী গোষ্ঠী, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নায়কদের একটা বড় অংশকেও কমিউনিস্ট পার্টি তার দলে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

এমনি করেই তৈরি হয় জাতীয় আন্দোলনের দক্ষিণ ও বামের মধ্যে এক বড় সঙ্ঘাতের ক্ষেত্র। ১৯৩৫ থেকেই ব্রিটিশরা নতুন সাংবিধানিক কাঠামো চাপিয়ে দিচ্ছিল, আর এইভাবেই ছড়ানো হচ্ছিল সুযোগ-সুবিধা ও প্রলোভনের ফাঁদ, আরও বেশি বেশি করে তা হয়ে উঠছিল কষ্টিপাথর।

১৯৩৫-১৯৩৭ : সংবিধান ও কংগ্রেস

১৯৩৫-এর আইন

আট বছর আগে সাইমন কমিশন বসানো থেকে যে দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল, অবশেষে তার সমাপ্তি ঘটল অগাস্ট ১৯৩৫-এ ভারত সরকার আইন (গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট)-এ। ১৯৩২ থেকে শুরু করে এই সংবিধান রচনায় ভারতীয়দের সত্যিকারের যোগ দেওয়ার ব্যাপারটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল নগণ্য। অনেকটাই আনুষ্ঠানিক ও গুরুত্বহীন, গোল টেবিল বৈঠকের তৃতীয় ও শেষ অধিবেশনটি বসে নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩২-এ। সেখানে হাজির ছিলেন মাত্র ৪৬ জন প্রতিনিধি (অথচ ১৯৩১-এ ছিলেন ১১২ জন)। এর পরেই ব্রিটিশ সরকার এক শ্বেতপত্র জারি করল (মার্চ ১৯৩৩) আর তৈরি করল সংসদের একটি যুক্ত প্রবর কমিটি। সেখানে থাকল ভারতীয়দের সঙ্গে শুধু 'পরামর্শ করা'র অনুবিধি। ব্রিটিশ সংসদে তীব্র বিতর্কের পর তবে আইনটি চূড়ান্তরূপে বেরিয়ে এল। ১৯৩০-৩১-এ আইন অমান্য আন্দোলনের চাপের মুখে যেসব সুবিধা দিতে চাওয়া হয়েছিল, সেগুলি সীমিত বলেই স্বীকৃত। কিন্তু, এই প্রক্রিয়ায়, স্বাভাবিকভাবেই, তাতেও কাটছাঁট করা হলো। এর ফলে যে-আইনটি হলো, কার্যত ভারতীয় জনমতের সব অংশই তার সমালোচনা করলেন। লিবারেলরা, জিন্না ও কংগ্রেস সবাই বললেন

যে, ১৯১৯-এর আইনের চেয়ে সত্যিকারের এগোনো হয়েছে অল্পই। যেমন, ল্যাঙ্কাশায়ার-এর সমর্থনপুষ্ট, চার্চিল-এর নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী টোরিদের চাপের ফলে, যুক্তরাষ্ট্রীয় স্তরে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের জায়গায় এল পরোক্ষ নির্বাচন এবং সরকারি 'ইচ্ছাধীন ক্ষমতা', 'সংরক্ষণ' ও 'রক্ষাকবচ'-এর বন্দোবস্ত আরও ছড়ানো ও কঠোর করে তোলা হলো।

একমাত্র প্রদেশগুলিতেই ঘটল তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি। তত্ত্বগতভাবে সেখানে সমস্ত বিভাগেই দ্বৈত শাসনের জায়গায় এল দায়িত্বশীল সরকার আর নির্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা ৬৫ লক্ষ থেকে বাড়িয়ে করা হলো প্রায় ৩ কোটি। কিন্তু, আইনসভা ডাকা, বিল-এ সম্মতি দেওয়া, নির্দিষ্ট কয়েকটি বিশেষ এলাকার (অধিকাংশই জনগোষ্ঠীর) শাসনভার—ইত্যাদি বিষয়ে 'ইচ্ছাধীন ক্ষমতা' ছোটোলাটদের হাতেই থেকে গেল। আর এইসব ব্যাপারে মন্ত্রীদেরও পরামর্শ দেওয়ার হক ছিল না। ছোটোলাটদের 'ব্যক্তিগত বিচার প্রয়োগে'র ক্ষমতা ছিল। মন্ত্রীরা পরামর্শ দিতে পারতেন সংখ্যালঘুদের অধিকার, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সুযোগ-সুবিধা, ব্রিটিশ ব্যবসায়িক স্বার্থের বিরুদ্ধে বৈষম্য নিরোধ ইত্যাদি বিষয়ে, 'কিন্তু তাঁদের মতামত বাতিলও করে দেওয়া যেত'। উপরন্তু ১৯৩৫-এর আইনের কুখ্যাত ৯৩নং ধারা অনুযায়ী ছোটোলাট কোনো প্রদেশের শাসনভার অধিগ্রহণ ও অনির্দিষ্টকাল পরিচালনা করতে পারতেন। কেন্দ্র যথেষ্ট শক্তিশালীই রইল, কিন্তু প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ফলে কেন্দ্রীয় প্রশাসনে প্রবর্তিত হলো এক ধরনের দ্বৈত শাসন। অবশ্য, রাজন্যবর্গের ৫০% আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিলে তবেই এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো চালু হওয়ার কথা ছিল। প্রদেশগুলিতে যেমন করা হয়েছিল, তেমনি নির্বাচিত মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে 'হস্তান্তরিত' বিষয়গুলিকে সীমাবদ্ধ করে রাখা হলো, 'রক্ষাকবচ' দিয়ে, আর বৈদেশিক বিষয় ও প্রতিরক্ষা পুরোপুরিই রইল বড়লাটের নিয়ন্ত্রণে। নতুন কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে সাবধানে আইনসভার নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হলো, আর রাখা হলো রেলপথকে। ঋণ পরিশোধ এবং আই সি এস-দের বেতনের ব্যাপারটিও হয়ে রইল সংরক্ষিত বিষয়। আর মুদ্রা ও বিনিময়-সংক্রান্ত আইনের জন্য দরকার হতো বড়লাটের অগ্রিম অনুমতি। একথা ঠিক, এই আইনের ফলে, চূড়ান্ত আর্থিক ক্ষমতা লন্ডনের হাত থেকে পাঠানো হলো নয়া দিল্লীর হাতে। টমলিনসন প্রমুখ কোনো কোনো সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক এ ব্যাপারটায় অত্যধিক জোর দেন। অবশ্য ভারত-সচিবের কাছ থেকে বড়লাটের কাছে (তাঁকেও ব্রিটিশ সরকারই নিয়োগ করছেন) হাতবদলের প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে একটু সন্দেহের অবকাশ রয়েই যায়। দু-কক্ষের কেন্দ্রীয় আইনসভায়, রাজন্যবর্গের মনোনীত সদস্যদের দখলে থাকবে ৩০ থেকে ৪০% আসন (রাজ্য কাউন্সিল-এর ২৭৬-এর মধ্যে ১০৪টি আসন আর যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার ৩৭৫-এর মধ্যে ১২৫টি)। ম্যাকডোনাল্ড রোয়েদাদকে (পুণা চুক্তি অনুযায়ী সংশোধিত) আইনের অন্তর্ভুক্ত করে, কেন্দ্র ও রাজ্য দু-ক্ষেত্রেই, মুসলমান ও অন্যান্য বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হলো ; ব্রিটিশদের সঙ্গে ভারতীয় রাজ্যগুলির সম্পর্কের বিষয়টি পাঠিয়ে দেওয়া হলো 'রাজপ্রতিনিধি'র কাছে। কার্যত বড়লাটের হাতেই গেল এই ক্ষমতা, কিন্তু তিনি দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের মাধ্যমে কাজ না-করে, কাজ করবেন পুরোপুরিভাবে সরকারি রাজনৈতিক বিভাগ, স্থানীয় রেসিডেন্ট ও রাজনৈতিক প্রতিভূদের মারফত। এটাও ছিল এই আইনের অত্যন্ত বিপজ্জনক আর-একটি ধারা আইন অমান্য আন্দোলনে ভাঁটার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয়

সরকার দখল করার বাস্তব সম্ভাবনা কমে গেল, আর যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেওয়ার পরিবর্ত হিসেবে রাজন্য অধিকারাদি খর্ব করার ব্যাপারে ব্রিটিশদের আদৌ কোনো আগ্রহ নেই—এমন একটা ধারণা ছড়িয়ে পড়ায়, রাজন্যবর্গের আর বিন্দুমাত্র উৎসাহ রইল না। তাই দেখা গেল, ১৯৩৫ আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশটুকু গোড়া থেকেই একেবারে অকেজো। মুসলমান রাজনৈতিক নেতাদেরও মনে হলো, প্রস্তাবিত যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো এখনও যথেষ্ট এককেন্দ্রীয়, আর তাই এতে সংখ্যাগুরু হিন্দু আধিপত্যের অধীন হওয়ার বিপদ রয়েই যাচ্ছে। আর কংগ্রেসের সমস্ত অংশই যুক্তরাষ্ট্রের নিন্দা করলেন ধোঁকা বলে। এই অচল অবস্থার ফলে ব্রিটিশরা অবশ্যই তাঁদের তরফে খুব একটা অখুশি হলো না, কারণ এর ফলে ১৯১৯-এর ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্রে যে পরিপূর্ণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছিল তা-ই বিনা পরিবর্তনে অনির্দিষ্টকাল অব্যাহত থাকল। সব শেষে, একথাও জোর দিয়ে বলা দরকার যে, নভেম্বর ১৯২৯-এ প্রচুর ঢাক-ঢোল পিটিয়ে আরউইন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তার ছ-বছর পরে ১৯৩৫-এর আইনে ডোমিনিয়ন মর্যাদা সম্বন্ধে রা কাড়া হলো না। যুক্ত সংসদীয় কমিটির সভাপতি তথা ১৯৩৬ থেকে বড়লাট, লিনলিথগো-ই সম্ভবত এই আইনটির মূল্য সবচেয়ে ভালোভাবে বিচার করেছেন (যদিও স্বভাবতই একান্তে)। তিনি বলেন, আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে, 'কারণ, আমরা মনে করি যে...ভারতে ব্রিটিশ প্রভাব বজায় রাখার এটিই সর্বোৎকৃষ্ট পথ। আমার মনে হয়, দয়াপরবশ হয়ে অবিলম্বে ভারতীয়দের হাতে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেওয়াটা আমাদের নীতির অঙ্গ নয়। দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিতে, সাম্রাজ্যের মধ্যে ভারতকে রাখার জন্য, আমাদের হিসেব মতো যে-গতিতে চললে সবচেয়ে ভালো হয়, তার চেয়ে দ্রুত আমরা কখনই চলব না।' (জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ২১ ডিসেম্বর, ১৯৩৯। *কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ* গ্রন্থে আর জে মুর-এর নিবন্ধ, পৃ. ৩৭৯-এ উদ্ধৃত)।

১৯৩৫-এ, ও বিশেষত ১৯৩৬-এ ভারতীয় রাজনীতির যে-ধাঁচটি গড়ে উঠল, উত্তরকালে—স্বাধীনতার আগে ও পরে—তা প্রায়ই ফিরে ফিরে আসে। বাহ্যত ছিল বামপন্থার দিকে তাৎপর্যপূর্ণ চল-নামার সমস্ত লক্ষণ : সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টদের ক্রমবর্ধমান কার্যকলাপ (যদিও, ১৯৩৪ থেকে সি পি আই ছিল নিষিদ্ধ), বহু শ্রমিক তথা কৃষক সংগ্রাম, বামপন্থী নেতৃত্বে কয়েকটি সর্বভারতীয় গণ-সংগঠনের পত্তন, এবং লখনউ ও ফৈজপুরে কংগ্রেস সভাপতি রূপে নেহরুর ভাষণ (এপ্রিল ও ডিসেম্বর ১৯৩৬), যাতে মনে হলো কার্যত বামপন্থীদের সমস্ত র‍্যাডিকাল আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কর্মসূচিই আনুষ্ঠানিকভাবে অঙ্গীভূত হয়ে আছে। তবুও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের ভেতরকার দক্ষিণপন্থীরা সুদক্ষ ও উপযুক্তভাবে ঘূর্ণির পিঠে সওয়ার হলেন এবং বাস্তবিকই তাকে কাজে লাগাতে পারলেন। যে-সংবিধানকে এত বছর ধরে সবাই নিন্দে করে আসছিলেন, তারই এক তাৎপর্যপূর্ণ অংশ কার্যকর করার জন্যে ১৯৩৭-এর গ্রীষ্মের মধ্যে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা তৈরি শুরু হলো।

শ্রমিক-কিসান আন্দোলন

১৯৩৪ নাগাদ মন্দা খানিকটা কাটল, আর তাই শ্রমিক ফ্রন্টে ট্রেড ইউনিয়ন লড়াই-এর ক্ষেত্রে তুলনায় কিছুটা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলো। কর্মী নিয়োগের সংখ্যাও বাড়ছিল (যেমন, ১৯৩৫-এ চটকলে ১৪,২৪৭ জন নতুন কর্মী নেওয়া হলো। আর তার পরের বছরই আবার চালু

করা হলো সপ্তাহে ৫৪ ঘণ্টা কাজ, শেষ হলো ১৯৩১-এ ধার্য অল্প কাজের সময়)। কিন্তু অন্য যে-কোনো সময়ের চেয়ে এই সময়ে অসন্তোষও হয়ে উঠল আরও তীব্র, কারণ আগের বছরগুলোয় যে মজুরি কমানো হয়েছিল, শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় পুঁজিপতিরা তা-ই বজায় রাখার চেষ্টা করছিলেন। (এই সময়ের) উল্লেখযোগ্য ধর্মঘটগুলোর মধ্যে পড়ে ১৯৩৫-এ কলকাতার কেশোরাম কটন মিল ও আহমেদাবাদের সুতোকল ধর্মঘট, ডিসেম্বর ১৯৩৬ থেকে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৭ অবধি বাঙলা-নাগপুর রেলপথ ধর্মঘট, আর ১৯৩৬ জুড়ে কলকাতার চটকল ও কানপুরের সুতোকলগুলোয় একের পর এক শ্রম-বিরোধ, যার পরিণামে তার পরের বছর ঐ দুটি কেন্দ্রেই হয়ে গেল ব্যাপক সাধারণ ধর্মঘট। ইতোমধ্যে, ১৯২৯ ও ১৯৩১-এর ভাঙনের উত্তরাধিকারও অতিক্রম করা হলো সফলভাবে। এপ্রিল ১৯৩৫-এ কমিউনিস্টদের রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আবার যোগ দিল এ আই টি ইউ সি-তে। তখন এ আই টি ইউ সি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীরা আর কিছু সোশালিস্ট। এর কয়েকমাস পরেই, নরমপন্থী ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন-এর সঙ্গেও যৌথ কাজকর্মের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্যে একটি যুক্ত শ্রমিক বোর্ড গঠন করা হলো। কমিউনিস্ট পার্টির নতুন সাধারণ সম্পাদক, পূরণচন্দ যোশীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট কৌশলের আগ্রহী প্রবক্তা হয়ে উঠল সি পি আই। ১৯৩৫-এর গ্রীষ্মে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর সপ্তম কংগ্রেসে দিমিত্রভ এই নতুন কর্মপন্থা সূত্রবদ্ধ করেন, আর ভারতের ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে মার্চ ১৯৩৬-এ ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পত্রিকা *লেবর মান্থলি*-তে একটি নিবন্ধ লেখেন রজনী পাম দত্ত ও বেন ব্র্যাডলি। এতে কংগ্রেসেরই মধ্যে থেকে সেটিকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-মোর্চা-য় পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার ডাক দেওয়া হয়। (বলা হয় ঃ) ট্রেড ইউনিয়ন ও কৃষক-সংগঠনগুলিকে যৌথভাবে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করতে দিতে হবে, নির্বাচনে লড়তে হবে র‍্যাডিকাল কর্মসূচি নিয়ে, কিন্তু সরকারি কার্যভার নেওয়া একেবারেই বাতিল এবং মুখ্য ইতিবাচক দাবি হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারে নির্বাচিত একটি সংবিধান-রচনা পরিষদ। আসলে ১৯৩০-এই দাবিটি তুলেছিলেন নেহরু, এই নিবন্ধটি লেখার ঠিক আগে দত্ত ও ব্র্যাডলি তাঁর সঙ্গে দেখা করেন লোসান-এ। দু-মাস পরে লখনউ-এ সভাপতির ভাষণে এই দুটি দাবি—যৌথ অন্তর্ভুক্তি ও সংবিধান-রচনা পরিষদ—আবার তোলা হয়।

বাম জাতীয়তাবাদী, সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে এই নতুন ঐক্যের ভাব প্রকাশ পেল কংগ্রেসের লখনউ ও ফৈজপুর অধিবেশনের সময়ে সারা ভারত কিসান সভা গঠনে। গোড়ার উদ্যোগ আসে অন্ধ্র থেকে। সেখানে ১৯৩৩-৩৪ থেকে এন জি রঙ্গ ছিলেন প্রাদেশিক রায়ত সমিতির নেতা। এছাড়াও জমিনদারি রায়তদের অন্য একটি সংগঠন, জমিন রায়ত সমিতি-র নেতা ছিলেন তিনিই। ১৯৩৫ থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্য তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর এলাকায় কিসান আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। আর সেই সঙ্গে কৃষি-শ্রমিকদের বিভিন্ন অংশকেও দলে টানার চেষ্টা চলছিল। এপ্রিল ১৯৩৫-এ পত্তন হয় কৃষক ও কৃষি-শ্রমিকের দক্ষিণ ভারতীয় ফেডারেশন। রঙ্গ ছিলেন তার সাধারণ সম্পাদক ও ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ যুগ্ম সম্পাদক। অক্টোবর ১৯৩৫-এ তার সম্মিলনে অবিলম্বে একটি সর্বভারতীয় কিসান সংগঠন গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। জানুয়ারি ১৯৩৬-এ সোশালিস্টরা তাঁদের মিরাট

সম্মিলনে এই ভাবনাটি বরণ করে নেন। বিহার (গোড়ার দিকে কিসান আন্দোলনের অন্য এক প্রধান ঘাঁটি), মনে হয়, প্রথমে ব্যাপারটিতে উৎসাহী ছিল না, কারণ ভয় ছিল এ হবে নেহাতই এক আনুষ্ঠানিক ঐক্য। তবে শেষ পর্যন্ত এপ্রিল ১৯৩৬-এ লখনউ-তে সর্বভারতীয় কিসান সভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতি হতে রাজি হন সহজানন্দ সরস্বতী। প্রথম দিককার আর-একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন গুজরাটের মোহমুক্ত গান্ধীবাদী, প্রবীণ ইন্দুলাল যাজ্ঞিক। তিনি হন *কিসান বুলেটিন*-এর সম্পাদক। যে-সব কৃষকের কিছু (ক্ষেত্রবিশেষে যথেষ্ট পরিমাণেই) জমি আছে, তাদের সঙ্গে জমিনদার, ব্যবসায়ী, মহাজন ও সরকারের সম্পর্ক বিষয়েই কিসান সভা মূলত জোর দিল। সম্ভবত এ-ই ছিল অনিবার্য। অগাস্ট ১৯৩৬-এর কি সা ন ই শ্ তে হা র-এ জমিনদারি অবলোপ, বর্তমান ভূমি-রাজস্বের জায়গায় ৫০০ টাকার বেশি কৃষিজ আয়ের ক্ষেত্রে স্তরবিশিষ্ট কর চালু করা আর কৃষি-ঋণ মকুবের দাবি তোলা হলো। এর সঙ্গে একটি ন্যূনতম দাবি-সনদও ছিল ঃ রাজস্ব ও খাজনার ৫০% মকুব, সমস্ত রায়তের পুরো দখলি স্বত্ব, বেগার প্রথার লোপ, ঋণ ও সুদের হার কমিয়ে আনা এবং রেওয়াজ-মাফিক অরণ্য-অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া। তত্ত্ব ও প্রয়োগ—দু-দিক থেকেই কিসান সভার (তথা সমস্ত বামপন্থীদেরই) দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীভেদ এবং ভূ-স্বত্বাধিকারী কৃষক ও ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন। কি সা ন ই শ্ তে হা র-এ অবশ্য প্রস্তাব দেওয়া হয়, যাঁদের পাঁচ একরের কম জমি আছে, তাঁদের এবং ভূমিহীনদের হাতে সরকারি ও জমিনদারি অনাবাদী জমি হস্তান্তর করতে হবে ; আর আশা করা হয়, তাঁরা সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হবেন। অবশ্য সাধারণভাবে জমির উর্ধ্বসীমা নির্ধারণের কোনো দাবি ছিল না। *কিসান বুলেটিন*-এর গোড়ার দিকের একটি সংখ্যায় সহজানন্দ চেয়েছিলেন, কৃষি-মজুরির ব্যাপারটা নিয়ে তদন্ত হোক। তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, 'কৃষকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে এবং জমিনদার ও বাগিচা-মালিকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ধর্মঘটে তাঁদের সাহায্য করে' কৃষি-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটানো যেতে পারে। এই ভাগাভাগি আকর্ষণীয়, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়।

কিসান সভাগুলির গোড়ার দিকের কার্যকলাপের মধ্যে ছিল কৃষকদের নিয়ে চোখে পড়ার মতো মিছিল, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৬-এ স র্ব ভা র তী য় কি সা ন দি ব স পালন (যেদিন অন্ধ্রের শুধু গুন্টুর জেলাতেই শ-খানেক গ্রামে জনসভার খবর পাওয়া যায়), এবং অজস্র স্থানীয় লড়াই। যেমন, নভেম্বর ১৯৩৬ থেকে বিহার কিসান সভা মুঙ্গের জেলার বারহাইয়া তাল-এ জমিনদারদের বিরুদ্ধে একটি বড় আন্দোলন শুরু করে। জমিনদাররা সেখানে দখলি রায়তদের উচ্ছেদ করে তাদের জমিকে 'বকশৎ'-এ পরিণত করার চেষ্টা করছিলেন। নতুন নতুন প্রাদেশিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সম্মিলনগুলি প্রভূত উদ্দীপনা জোগাল। যেমন, বাঙলার প্রতিনিধিরা লখনউ থেকে ফিরে ইতোমধ্যেই সক্রিয়, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা স্থানীয় কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগের উদ্যোগ নিলেন এবং মার্চ ১৯৩৭-এ বাঁকুড়া জেলা সম্মিলনে গঠিত হলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিসান সভা।

রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিই ছিল সামন্ততন্ত্রের সবচেয়ে কঠিন তথা উৎপীড়ক কেল্লা। আমরা দেখেছি এই সব জায়গায় ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল অজস্র স্বতঃস্ফূর্ত স্থানীয় কৃষক-

অভ্যুত্থান। তার সবচেয়ে হালের ঘটনা হলো জয়পুরের শিকার 'ঠিকানা' ('জাগির')-এ মন্দা-র দিনগুলোয় রাজস্ব বাড়ানোর বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান, আর পাঞ্জাবের লোহ্‌নু-তে উটের ওপর কর চাপাবার বিরুদ্ধে আন্দোলন। ১৯৩৫-এ সেখানে গুলি চালানো হয়। সারা ভারত স্টেটস পিপলস কনফারেন্স অবশ্য এতদিন যথেষ্ট নরমপন্থী ও শিরোমণিবাদী সংস্থা ছিল। তাদের কাজ ছিল শুধু আবেদনপত্র লেখা আর প্রচারপত্র বার করা। তখনও পর্যন্ত কংগ্রেসও [ঐ] রাজ্যে হস্তক্ষেপ না-করার কড়া নীতি থেকে একচুলও নড়েনি। অনেক পরে, এমনকি ১৯৩৪-এও গান্ধী আবার (ঐ রাজ্যের ক্ষেত্রে) কংগ্রেসের 'অসহায়তা'র কথাই বলেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে, রাজন্যবর্গকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের প্রজাদের ভালো 'অছি'র মতো আচরণ করানো যাবে। কংগ্রেস পরিষদীয় দলের পাক্কা দক্ষিণপন্থী নেতা ভুলাভাই দেশাই ১৯৩৫-এ মাইশোর ভ্রমণের সময় এমনকি এ আশ্বাসও দেন যে, ভবিষ্যতের কোনো যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক নির্ধারণের অধিকার একমাত্র রাজন্যবর্গের হাতেই থাকবে। কিন্তু ১৯৩৬ থেকে পালাবদলের সূচনা দেখা দেয়। স্টেটস পিপলস কনফারেন্স-এর পঞ্চম অধিবেশনে নেহরু বলেন, নিছক আবেদন-নিবেদনের জায়গায় চাই গণ-সংযোগ। এই সম্মিলনেই প্রথম খাড়া করা হলো কৃষিভিত্তিক দাবি-দাওয়ার এক কর্মসূচি : ভূমি-রাজস্ব একের-তিন ভাগ মকুব, ঋণ কমিয়ে আনা আর 'কাশ্মীর, অলওয়ার, শিকার (জয়পুর) ও লোহানু-র মর্মান্তিক ঘটনা'র সূত্রে চাষীদের অভাব-অভিযোগ নিয়ে তদন্ত। পরের বছর কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনের পর, ভারতের রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির এক বিরাট অংশে শুরু হয়ে গেল সত্যিকারের টালমাটাল।

সাহিত্যে বামপন্থা

১৯৩৬-এই স্থাপিত হলো সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন ও প্রগতি লেখক সঙ্ঘ। এ থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে শিক্ষিত যুবক ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর বাড়ছিল বামপন্থার প্রভাব। আইন অমান্য আন্দোলন সাহিত্যজগতে কোনো প্রবল ছাপ ফেলতে পারে নি, যেমন পেরেছিল অসহযোগ আন্দোলন। বরং গান্ধীপন্থী অনড়তা সম্বন্ধে আরও বেশি মোহভঙ্গ এবং আরও র‍্যাডিকাল কোনো পথ সন্ধানের চিহ্নই লক্ষ্য করা যায়। প্রেমচন্দ-এর শেষ ও মহত্তম উপন্যাস *গোদান* (১৯৩৬) চাষীর দুঃখ-দুর্দশার এক নিদারুণ স্বস্তিহীন ছবি। *রঙ্গভূমি* (১৯২৫)-র গান্ধীপন্থী আদর্শবাদ ও আশাবাদ সেখানে একেবারেই নেই। একই সময়ে, তাঁর মৃত্যুর ঠিক আগে লেখা 'মহাজনী সভ্যতা' প্রবন্ধে পুঁজিবাদী মুনাফার ঝোঁকের কটু সমালোচনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোভিয়েত পরীক্ষা-নিরীক্ষার কদর। ১৯৩২-এ গোর্কির *মা* উপন্যাসটি তর্জমা হয় [তেলুগুতে]। তার পরেই অন্ধ্রে শুরু হয় খেটে-খাওয়া মানুষের জীবন নিয়ে বাস্তববাদী উপন্যাস লেখা। কবিতায় প্রথম কথ্য তেলুগু ব্যবহার করেন উদীয়মান কবি শ্রীশ্রী। ভগৎ সিং-এর শহিদ হওয়ার ঘটনায় উদ্দীপ্ত হয়ে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত *মারো প্রপঞ্চম* ("আর-এক দুনিয়া, আর-এক দুনিয়া, আর-এক দুনিয়া দিচ্ছে ডাক")। এই কবিতার শেষে আবাহন করা হয় লাল ঝাণ্ডাকে। বোম্বাই-এ শ্রমিক আন্দোলনের প্রভাবে সুতোকল ধর্মঘট নিয়ে মারাঠিতে গল্প লেখেন মোডখোলকর ও মামা ওয়াড়েকর। বাঙলার নাগরিক বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিনই গান্ধীর প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। রবীন্দ্রনাথ আইন অমান্য আন্দোলন থেকে

সরে থাকেন, আর সন্ত্রাসবাদ বিষয়ে ছিলেন রীতিমতো বিরূপ [তাঁর *চার অধ্যায়* (১৯৩৪) উপন্যাসেই তা দেখা যায়]। কিন্তু তাঁর *রাশিয়ার চিঠি* (১৯৩০)-তে আছে উষ্ণ অভিনন্দন, যদিও তা নির্বিচার নয়। আর একটি দৃষ্টান্ত হলো ১৯৩১ থেকে প্রকাশিত কলকাতার উন্নাসিক মাসিক [প্রথমে ত্রৈমাসিক] সাহিত্যপত্র *পরিচয়*। সেখানে সমকালীন গান্ধীপন্থী জাতীয়তাবাদী ও এমনকি কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে ছিল নানা অনীহা, আর সেই সঙ্গে যুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক ঘটনাবলি, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী সংগ্রাম তথা মার্কসবাদী তত্ত্ব ও প্রয়োগ সম্পর্কে যথেষ্ট আগ্রহ।

বামপন্থা-প্রবণ লেখকদের নিয়ে একটি সর্বভারতীয় মঞ্চ গড়ে তোলার প্রথম উদ্যোগ নেন সাজ্জাদ জাহিরের নেতৃত্বে একদল উর্দূ-ভাষী বুদ্ধিজীবী। ১৯৩৫-এ লন্ডনে পড়ার সময় জাহির একটি ইস্তাহার রচনা করেন। এতে 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্য, সামাজির অনগ্রসরতা তথা রাজনৈতিক অধীনতার সমস্যাবলি'র দিকে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে 'জনগণের সঙ্গে শিল্পের নিবিড়তম সম্পর্ক গড়ে তোলা'র ডাক দেওয়া হয়। এপ্রিল ১৯৩৬-এ লখনউ-এ প্রগতি লেখক সঙ্ঘ-র প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রেমচন্দ এবং ১৯৩৮-এ রবীন্দ্রনাথ পাঠান এক উষ্ণ ও ব্যতিক্রমী আত্মসমালোচনামূলক বাণী, জনসাধারণের সঙ্গে নিজের আপেক্ষিক বিচ্ছিন্নতার জন্যে তিনি সেখানে দুঃখপ্রকাশ করেন। সর্বভারতীয় আন্দোলন হিসেবে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে উর্দূ দুনিয়ায়। নিঃসন্দেহে অংশত তার কারণ হলো ভাষাটি ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়ানো (যদিও বহুলাংশেই নাগরিক এবং কখনও কখনও খানিকটা শিরোমণিবাদী) আর তার অগ্রণী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন হসরত মোহানি (র‍্যাডিকাল রাজনীতিবিদ্, যিনি আবার বিশিষ্ট 'গজল'-রচয়িতা), জোশ মলিহাবাদী, ফিরক গোরখপুরী ও কৃষণ চন্দর। অবশ্য সঙ্ঘ-র বামপন্থী সংগঠকরা যুক্ত মোর্চার পথ নেওয়ায় কিছুটা সুবিধাবাদ আর নামী লোক জোটানোর ইচ্ছেও এসে যায়। তা হলেও সত্যিকারের গণ-সংযোগের কিছু আগ্রহ-জাগানোর চেষ্টাও লক্ষ্যণীয় ঃ যেমন, ১৯৩৮-এর গ্রীষ্মে ফরিদাবাদে (দিল্লীর কাছে) অত্যন্ত সফল এক কৃষক কবি সম্মিলন বা বোম্বাই-এর শ্রমিকদের মধ্যে কায়ফি আজমি-র 'ইনকিলাবি মুশায়রা'। ১৯৪০-এর দশকে কমিউনিস্টরা ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ-র মাধ্যমে লোকসংস্কৃতিকে আবার বাঁচিয়ে তোলার যে বিশাল উদ্যোগ নিয়েছিলেন, এইসব ঘটনা হলো তারই পূর্বসূচনা।

লখনউ ও ফৈজপুর

ইওরোপ থেকে ফিরেই নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি হলেন (১৯২৯-এর মতোই, গান্ধীর জেদাজিদিতে)। তাঁর লখনউ ও ফৈজপুর ভাষণ (এপ্রিল-ডিসেম্বর ১৯৩৬) থেকে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে, এ যেন ঐ সময়ে জাতীয় আন্দোলনে বামপন্থী প্রভাবের পরাকাষ্ঠা। লখনউ-এ নেহরু স্পষ্ট করেই বললেন, যদিও কংগ্রেসের ওপর তাঁর নিজস্ব সমাজবাদী ধ্যানধারণা চাপিয়ে দেওয়ার কোনো মতলবই তাঁর নেই, তবে সমাজবাদ—'দুনিয়ার সমস্যাবলি তথা ভারতের সমস্যাবলি সমাধানের একমাত্র চাবিকাঠি'—শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন 'কোনো ভাসা-ভাসা মানবদরদী ভাবে নয়, বৈজ্ঞানিক, আর্থনীতিক অর্থে'। তার দোষত্রুটি সত্ত্বেও সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি 'নতুন সভ্যতা' বলে অভিনন্দন জানালেন, এবং ঘোষণা করলেন, 'আমরা

যারা স্বাধীন ভারতের জন্যে খাটছি...অবধারিতভাবেই...দাঁড়িয়ে আছি পৃথিবীর সেই প্রগতিশীল শক্তিগুলির সঙ্গে, যাঁরা ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শামিল।' ইতালি ও জাপানের আগ্রাসনকে নিন্দা করে এবং আবিসিনিয়া, চীন ও সাধারণতন্ত্রী স্পেনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে দুটি অধিবেশনেই প্রস্তাব পাশ করানো হয় নেহরুর উদ্যোগে। এ সবই নতুন বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতের প্রতীকস্বরূপ। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে জওহরলালের সবচেয়ে লক্ষণীয় অবদানের মধ্যে এটিও অন্যতম। জাতীয় ক্ষেত্রে তিনি যেসব জিনিসের পক্ষে কথা বলেছিলেন, সেগুলি হলো : একটি র‍্যাডিকাল কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচন লড়া, শাসনভার নিতে অস্বীকার করা, এবং সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান-রচনা পরিষদের এক কেন্দ্রীয় স্লোগান। শেষেরটি সম্বন্ধে লখনউ-এ তিনি এই বলে সাবধান করে দেন যে, একটি 'আধা-বৈপ্লবিক পরিস্থিতি' ছাড়া এটি কখনোই ঘটা সম্ভব নয়। তিনি এমন আশাও প্রকাশ করেন যে, কংগ্রেসকে একটি প্রকৃত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী 'যুক্ত গণ-মোর্চা'য় পরিণত করা যাবে এবং প্রস্তাব করেন, তারই প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ট্রেড ইউনিয়ন ও কিসান সভাগুলিকে 'যৌথ সদস্যপদ' দেওয়া হোক। আগের, বোম্বাই অধিবেশনে (অক্টোবর ১৯৩৪) গান্ধী যেসব বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন, সেগুলিকেও নেহরু কংগ্রেস সংগঠনের ভেতরের 'কর্তৃত্বকামী' ধারা বলে খোলাখুলিই সমালোচনা করেন। বিষয়গুলি হলো : প্রতিনিধি সংখ্যা কমানো, পদাধিকারীদের 'খাদি' যোগ্যতা এবং সভাপতি ও তাঁর মনোনীত কার্যনির্বাহী কমিটির দৃঢ়তর নিয়ন্ত্রণ। লখনউ-এর পর নেহরুর কার্যনির্বাহী কমিটিতে ছিলেন তিনজন সমাজবাদী (জয়প্রকাশ, নরেন্দ্র দেব, অচ্যুত পটবর্ধন), আর কংগ্রেস নির্বাচনী ইশ্‌তেহার (অগাস্ট ১৯৩৬)-এর সামাজিক-আর্থনীতিক ধারাগুলিতে এবং ফৈজপুরে গৃহীত অস্থায়ী কৃষি কর্মসূচিতে মূলত করাচী প্রস্তাবেরই পুনরুক্তি করা হলেও, সারা ভারত কিসান সভা-র কিসান ইশ্‌তেহার-এর ন্যূনতম দাবিগুলিকে তার অন্তর্ভূত করার খানিকটা চেষ্টাও সেখানে করা হয় : রাজস্ব ও খাজনা কমানো, কৃষিজ আয়কর, ভাগ চাষের সময়সীমার স্থিরতা, ঋণ কমিয়ে আনা, বেগার খাটুনির অবসান, অরণ্যের অধিকার ও কৃষকদের ইউনিয়নের স্বীকৃতি। ১৯৩৭-এর নির্বাচনে নেহরুই হয়ে উঠলেন কংগ্রেসের সবচেয়ে উৎসাহী ও সফল প্রচারক ; আর এভাবেই শুরু হলো তাঁর দলের সবচেয়ে কার্যকর ভোট-জোগাড়ে হিসেবে তাঁর এক নতুন কর্মজীবন, যা চলল প্রায় তিন দশক।

দক্ষিণপন্থী জোট ও ব্যবসাদারদের চাপ

তবু আরও খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়ে, ১৯৩৫-৩৭ জুড়ে বামপন্থীদের যে-অগ্রগতি, তা খানিকটা মায়াময় ও বাক্‌সর্বস্ব, অন্তত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তো বটেই। একথা ঠিক যে, ব্যর্থ হলেও বীরোচিত এক জাতীয় সংগ্রামের মর্যাদা যাঁদের ছিল না, কংগ্রেসের বাইরের সেই লিবারেল বা সাম্প্রদায়িক দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠীগুলি সম্ভবত ক্রমেই লোকের আস্থা হারাচ্ছিল। সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ-এর প্রশ্নে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া সত্ত্বেও মালবীয় ও আনে-র কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল ১৯৩৪-এর নির্বাচনে খারাপ ফল করল। যেমন, যুক্ত প্রদেশের আইনসভার আটটি আসনেই তাঁরা হেরে গেলেন কংগ্রেসের কাছে। অথচ (মালবীয় ও লাজপত-এর নেতৃত্বে) ঐ রকমই একটি দলত্যাগী গোষ্ঠী ১৯২৬-এ দখল করেছিল ছ'টি আসন, যেখানে

স্বরাজীরা পেয়েছিল দুটি। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের আগে একটি সারা ভারত মুসলিম সংসদীয় বোর্ড-এর মাধ্যমে, মুসলিম লীগকে বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চালান জিন্না, কিন্তু তা-ও খুব একটা সফল হয়নি। পাঞ্জাব ও বাঙলার দুটি প্রধান কৃষিভিত্তিক আঞ্চলিক দল, ইউনিয়নিস্ট ও কৃষক-প্রজা পার্টিকে তিনি ভেড়াতে পারেন নি। আর ১৯৩৭-এ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলমানদের জন্যে সংরক্ষিত ৪৮২টি আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ দখল করতে পারল মাত্র ১০৯টি।

কিন্তু এই সময়ের ঘটনাবলির সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হলো কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের জোট বাঁধা। প্রথাগত আইনসভা-ভিত্তিক রাজনীতির প্রবক্তা ও গান্ধীপন্থী গঠনমূলক কর্মীদের সমঝওতাই ছিল এর ভিত্তি। আর আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, ১৯৩৪ থেকেই এর পেছনে ছিল ব্যবসাদারদের যথেষ্ট পরিমাণ চাপ ও পোষণ। এই গোটা পর্ব জুড়ে দক্ষিণপন্থীরা জাতীয় আন্দোলনের ওপর তাঁদের আধিপত্য বজায় রাখতে পেরেছিলেন সুকৌশলে কাজকর্ম নির্বাহ করে, এবং চাপের সঙ্গে সঙ্গে (অনেকটাই মৌখিক) কিছু কিছু ছাড় দিয়ে। আসলে আইন অমান্য আন্দোলনে হয়েছিল এক গণ-জাগরণ। আর তাছাড়া নির্বাচকমণ্ডলীও পাঁচ গুণ বেড়ে গিয়েছিল। সেই সূত্রে বামপন্থীদের খানিকটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া ছিল অপরিহার্য। সেটাই দেওয়া হলো সভাপতির র‍্যাডিকাল অভিভাষণ, কর্মসূচি ঘোষণা ও নির্বাচনী ভাষণ-রূপে।

ভারতীয় ব্যবসাদাররা কীভাবে কংগ্রেসি বামপন্থার (নেহরুই ছিলেন সবার ওপরে এই ক'বছরে তার প্রতীক) মোকাবিলা করেছিলেন, ঠাকুরদাসের কাগজপত্র থেকে তার অনেক খোলতাই খুঁটিনাটি জানা যায়। কংগ্রেস যদি 'চরম সমাজবাদী লোকেদের সঙ্গে মাখামাখি' বন্ধ না-করে, তবে এইচ পি মোদী, অগাস্ট ১৯৩৫-এ একটি নতুন, খোলাখুলিই পুঁজিপতি-পুষ্ট, নরমপন্থী পার্টি গড়ার উদ্যোগ নেন। কিন্তু ঠাকুরদাস বা বিড়লা প্রমুখ তাঁর সহ-ব্যবসায়ীরা ছিলেন আরও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও কৌশলী। এতে তাঁদের বিশেষ সায় ছিল না। বরং ভুলাভাই দেশাই বা বল্লভভাই প্যাটেল প্রমুখ কংগ্রেস নেতাদের বিচক্ষণভাবে পরিপোষণ করাকেই তাঁরা আরও ভালো যুদ্ধনীতি বলে মনে করলেন। নেহরুর লখনউ অভিভাষণ অবশ্য গোড়ায় বোম্বাই-এর ২১ জন প্রথম সারির ব্যবসাদারকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল (এঁদের মধ্যে ছিলেন এইচ পি মোদী-র মতো কংগ্রেস-বিরোধী, আবার ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ এবং এ ও শ্রফ-এর মতো জাতীয়তাবাদী)। মে ১৯৩৬-এ রাগত হয়ে তাঁরা একটা ইশ্‌তেহার বার করেন, যেখানে সমস্ত রকমের সম্পত্তি, ধর্ম ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার পক্ষে এক আপদ হিসেবে সমাজবাদের বদনাম করা হয়। বিড়লা অবশ্য ওয়ালচন্দ ও ঠাকুরদাসকে এই বেহদ্দ বেফিকিরির জন্যে কড়া ধমক দিলেন—'কোনো সম্পত্তিশালী লোকের পক্ষে, সে যে সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার বিরোধী, একথা বলাটা অত্যন্ত স্থূল দেখায়...'। এ কাজটা তাদেরই ছেড়ে দেওয়া উচিত 'যারা সম্পত্তি ত্যাগ করেছে', আর 'শুধু যদি আমরা তাদের হাত শক্ত করতে পারি, তাহলেই আমরা সকলকে সাহায্য করতে পারব' (ওয়ালচন্দ হীরাচন্দকে বিড়লা, ২৬ মে ১৯৩৬ *ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ১৭৭)। ঘটনা হচ্ছে, লখনউ-এর ব্যাপারে বিড়লা খুবই খুশি হয়েছিলেন : 'মহাত্মাজী তাঁর কথা রেখেছেন...তিনি খেয়াল রেখেছেন কো নো ন তু ন অ ঙ্গী কা র যা তে না ক

রা হ য়। জওহরলালজীর ভাবণকে একরকম বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া হয়েছে... জওহরলালজীকে মনে হয় সেই মার্কামারা ইংরেজ গণতন্ত্রীর মতো...তাঁর ভাবাদর্শ খুলে বলায় তৎপর, কিন্তু তিনি বোঝেন, সেটা কাজে পরিণত করা অসম্ভব, তাই সে নিয়ে আর চাপাচাপি করেন না... ঘটনা ঠিক দিকেই চলেছে' (ঠাকুরদাসকে বিড়লা, ২০ এপ্রিল ১৯৩৬)। পুঁজিপতিদের মধ্যে বিরোধ ছিল নেহাতই কৌশলগত, কারণ এর উত্তরে ২৩ এপ্রিল ঠাকুরদাস বলেন, 'জ.-এর সদুদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার কখনোই কোনো সন্দেহ ছিল না, আমার শুধু মনে হয় জ.-কে আগাগোড়া ঠিক পথে রাখতে গেলে বিস্তর যত্ন-আত্তি করতে হবে।'

কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে সর্বদাই ছিলেন ভুলাভাই দেশাই বা বিধানচন্দ্র রায়ের মতো লোক। এঁরা ছিলেন এমনকি গান্ধীপন্থী ধাঁচের গণ-আন্দোলনের ব্যাপারেও অনুৎসাহী আর পৌরসভা বা আইনসভার রাজনীতি-চর্চার জগতেই অনেক বেশি স্বচ্ছন্দ। ১৯৩০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে এঁদের ব্যাপক শক্তিবৃদ্ধি হলো—এইটুকুই নতুন। বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ বা রাজাগোপালচারি প্রমুখ লোকেদের মনোভাবে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনই এর কারণ। গ্রামোন্নয়ন কর্মী তথা জননেতা হিসেবে, ১৯২০-র দশকের এইসব পরিবর্তন-বিরোধীদের যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের কারণ অংশত এও হতে পারে যে, যৌবনের উদ্দীপনার জায়গায় এসেছিল মাঝবয়সের সুবিধাবাদ। আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো, গঠনমূলক কাজ তথা শান্তিপূর্ণ, নিয়ন্ত্রিত গণ-সত্যাগ্রহ—গান্ধীর এই যুগল-নীতি, মনে হয়, আর কাজ দিচ্ছিল না। ১৯৩২-এর পর থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সত্যি-সত্যিই কঠোর ও নির্মম সরকারের মুখে পড়লে আইন অমান্য আন্দোলনের জেতার প্রায় কোনো সম্ভাবনাই নেই। আর ১৯৩৪-৩৫-এ গান্ধী যে সারা ভারত গ্রামীণ শিল্প সমিতি (অল ইন্ডিয়া ভিলেজ ইন্ডাস্ট্রিস অ্যাসোসিয়েশন) পত্তন করেন, তা কার্যত গোড়াতেই অকেজো বলে প্রমাণ হয়ে যায়। ডিসেম্বর ১৯৩৫-এ বিহারের জনৈক সরকারি কর্মচারী বলেন, ওটা 'একদম ভেজা ছুঁচোবাজি'। গান্ধী নিজে সম্ভবত ধীরে ধীরে ও দীর্ঘমেয়াদি ভিত্তিতে গ্রামের কাজ ও উন্নয়নকেই কেন্দ্র করার জন্যে তৈরি ছিলেন। ১৯৩৪-এর শেষদিকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস থেকে অবসর নিলেন। ২০ অগাস্ট ১৯৩৬-এ তাঁর সচিব মহাদেব দেশাই বিড়লাকে জানালেন, 'বাপু আরও বেশি বেশি করে তাঁর গ্রামীণ কাজকর্মে ডুবে যাচ্ছেন...ঘটনা এই যে তিনি কংগ্রেস ও বাইরের অন্যান্য সব কাজকর্ম থেকে তাঁর মন সরিয়ে নিচ্ছেন এবং গ্রাম ও তার নানা সমস্যাতেই সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করছেন' (*ইন দি স্যাডো অফ দি মাহাত্মা*, পৃ. ২০৪)। কিন্তু সেই তুলনায় তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মধ্যে অল্প কয়েকজনেরই ছিল সেই ধৈর্য বা আদর্শবাদ। আর দেশব্যাপী এক বিকল্প গণ-আন্দোলনের নীতি হিসেবে, যে নতুন বামপন্থী চ্যালেঞ্জ এই প্রথম দেখা দিচ্ছিল, তাতে সবাই—গান্ধী সমেত—খুবই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। প্রধানত শ্রেণীগত কারণেই তাঁরা ঐ বিকল্পকে গ্রহণের অযোগ্য বলে মনে করতেন।

লখনউ অধিবেশনের পরের মাসগুলিতে বিড়লার দূরদৃষ্টি সুস্পষ্টভাবে প্রকট হলো। জওহরলাল আর কার্যনির্বাহী কমিটির তিনজন সমাজবাদী সদস্য (১৪ জনের মধ্যে) আরও বেশি করে দক্ষিণপন্থীদের কবলে পড়লেন। কার্যত তাঁদের কোনো ক্ষমতাই রইল না অথচ পদাধিকারী হওয়ার দরুন, কংগ্রেস যে-পথে চলেছে তার খোলাখুলি সমালোচনাও করতে

পারলেন না। ২৯ জুন ১৯৩৬-এ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, রাজাগোপালচারী, প্যাটেল ও কৃপালনীর নেতৃত্বে কার্যনির্বাহী কমিটির সাতজন সদস্য পদত্যাগের ভয় দেখালেন। নেহরুর সমাজবাদী ভাষাণবলিই ছিল তার অজুহাত। প্রতিবাদপত্রটির তাঁরা মুসাবিদা করেন ওয়ার্ধায় গান্ধীর সদর দফ্‌তরে বসে। গান্ধী তখন ঝগড়া মিটিয়ে দিলেন, কিন্তু এ-ও স্পষ্ট যে ছাড়টা যথারীতি দিলেন নেহরু-ই। 'অসহিষ্ণুতা'র জন্যে নেহরুকে গান্ধী সত্যিই কড়া ধমকালেন, আর বেশ ভালো করে মনে করিয়ে দিলেন যে 'তুমি এখনও ক্ষমতায় আস নি। অন্যভাবে ক্ষমতায় যেতে যে-সময় লাগবে তার চেয়েও তাড়াতাড়ি যাতে যেতে পার তার জন্যেই তোমাকে [সভাপতির] পদ দেওয়া হয়েছে' (৮ ও ১৫ জুলাই-এর চিঠি, নেহরু, *বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স*, পৃ. ১৯৮, ২০৪)। শ্রমিক ও কৃষক সমিতিগুলির যৌথ সদস্যপদের প্রকল্পটি খোদ লখনউ [অধিবেশন]-এই এত লঘু করে ফেলা হয় যে তাকে আর চেনাই যায় না। ঐ উদ্দেশ্যে স্থাপন করা হয় একটি গণ-সংযোগ কমিটি, যেখানে জয়প্রকাশের চেয়েও বেশি পাল্লা ভারী হবে রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জয়রামদাস দৌলতরামের দিকে। সমাজবাদীরা অবশ্য এর বিরোধিতা করেন। ঐ কমিটি যে ফৈজপুরেও তার চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে পারে নি তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। প্রদেশ কংগ্রেস কমিটিগুলি দেরি করানোর কৌশল নেওয়ায় কৃষি কর্মসূচিও বারে বারে আটকে যাচ্ছিল। সারা ভারত কিসান সভার 'কিসান ইশ্‌তেহার'-এর সমস্ত ধারালো দিক ভোঁতা করে দেওয়া হলো ফৈজপুর খসড়ায় (যেমন, দাবি ছিল যে খাজনা, রাজস্ব ও ঋণভার ৫০% কমাতে হবে ও সুদের ঊর্ধ্বসীমা করতে হবে ৬%। তার জায়গায় বলা হলো ঐ সবই 'অনেকটা কমাতে হবে') আর জমিনদারির অবলোপ এবং সরকারের বা জমিনদারদের অনাবাদী জমি পুনর্বণ্টনের দাবি একেবারেই ছেড়ে দেওয়া হলো। অন্ধ্র কংগ্রেসের নির্বাচনের সময়ে কিসান সভার সমর্থনের পূর্বশর্ত হিসেব, প্রার্থীরা যাতে কিসানদের ন্যূনতম দাবি-দাওয়ার সমর্থনে একটি শপথপত্রে সই করেন, তার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন এন জি রঙ্গ। এই নিয়ে প্যাটেল তাঁর ওপর চোটপাট করেন। রঙ্গকে সমর্থন করার ব্যাপারে পুরোপুরিই ব্যর্থ হলেন নেহরু। গোটা বিষয়টাকেই তিনি 'ভুল বোঝাবুঝি' বলে ঠেলে সরিয়ে দিলেন আর 'বিবাদ মিটিয়ে ফেলা'র পরামর্শ দিলেন তাঁকে। রঙ্গও কংগ্রেস প্রার্থীদের রেহাই দিলেন কিসান শপথপত্র থেকে (*ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার*, জুলাই-ডিসেম্বর ১৯৩৬, পৃ. ২৮৬)। সরকারি পদগ্রহণের প্রশ্নটি ছিল রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। লখনউ-এ, ও তারপরে আবার ফৈজপুরে এটিকে বারেবারে মুলতবি রেখে, দক্ষিণপন্থীরাই শেষ অবধি এ-বাবদে জিতে গেলেন। আর কংগ্রেস সভাপতি সমেত গোটা বামপন্থী শক্তির চড়া র‍্যাডিকাল বাক্যচ্ছটা সত্ত্বেও, একবার নির্বাচনে, জেতার পর মন্ত্রিসভা-গঠনের চাপ আর ঠেকানো গেল না। বিড়লাই আবার হয়ে ওঠেন অভ্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বক্তা : 'যে নির্বাচন হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করবে 'বল্লভভাই গোষ্ঠী', আর লর্ড লিনলিথগো যদি ঠিকভাবে পরিস্থিতি সামলাতে পারেন, তাহলে কংগ্রেসিদের ক্ষমতায় আসার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।' (ঠাকুরদাসকে বিড়লা ২০ এপ্রিল, ১৯৩৬)।

৭

রাজনৈতিক আন্দোলন ও যুদ্ধ ১৯৩৭-১৯৪৫

১৯৩৭-১৯৩৯ ঃ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা [প্রদেশে প্রদেশে]

নির্বাচন ও মন্ত্রিসভা-গঠন

১৯৩৭-এর নির্বাচনে কংগ্রেসের ফল হলো খুবই ভালো। প্রাদেশিক আইনসভার ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে তারা জিতল ৭১১টিতে। আর এগারোটির মধ্যে পাঁচটি প্রদেশে (মাদ্রাজ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশ) পেল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা, আর বোম্বাই-এও সংখ্যাগরিষ্ঠতা-র কাছাকাছি (১৭৫-এর মধ্যে ৮৬টি)। যুক্ত প্রদেশে ছাতারি-র নবাবের জাতীয় কৃষিজীবী দল (ন্যাশনাল এগ্রিকালচারিস্ট পার্টি) ও মাদ্রাজের জাস্টিস দলের মতো ভূস্বামী-ভিত্তিক রাজভক্ত গোষ্ঠীগুলি সরকারি মদত পেয়েছিল, কিন্তু সমূলে উচ্ছেদ হওয়ার হাত থেকে রেহাই পায় নি। মুসলিম কেন্দ্রগুলিতে অবশ্য ফল হলো খারাপ (৪৮২টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে মাত্র ৫৮টিতে লড়াই করে কংগ্রেস জিতল মাত্র ২৬টিতে)। মুসলিম লীগ যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে নিজেদের দাবি করত—স্পষ্টতই সেটা তারা প্রমাণ করতে পারল না। তাতেই কংগ্রেসের হারের পাল্লাও সমান হয়ে গেল। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এ লীগ একটি আসনেও জিততে পারল না, পাঞ্জাবে ৮৪টি সংরক্ষিত আসনের মধ্যে জিতল মাত্র ২টিতে আর সিন্ধুতে ৩৩টির মধ্যে ৩টিতে। তফসিলী জাতিগুলির আসনের বেশির ভাগ জিতল কংগ্রেস-ই; শুধু বোম্বাই-এ হরিজনদের জন্যে সংরক্ষিত ১৫টি আসনের মধ্যে ১৩টিতে জিতল আম্বেডকরের ইন্ডিপেণ্ডেন্ট লেবর পার্টি।

লক্ষ লক্ষ ভারতীয়ের কাছে, বিশেষত হিন্দুপ্রধান সাধারণ কেন্দ্রগুলিতে, 'গান্ধীজীকে আর হলুদ বাক্সয় ভোট দেওয়া' ছিল দেশপ্রেমিক আত্মত্যাগকে শ্রদ্ধা জানানো, আর সেই সঙ্গে ছিল সামাজিক-আর্থনীতিক পরিবর্তনের কিছু আশা। কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশ্‌তেহার ও ফৈজপুর কৃষি কর্মসূচি ছিল বামপন্থীদের আকাঙ্ক্ষার তুলনায় খুবই নগণ্য। তাহলেও, দলের পূর্ববর্তী ঘোষিত নীতির চেয়ে সেগুলি যথেষ্ট অগ্রগতির সূচক। আবার, ব্যাপকতর (কিন্তু কোনো অর্থেই সর্বজনীন নয়) ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের জন্যে একই সঙ্গে দরকার হলো আরও বেশি টাকা আর স্থানীয় প্রভাবশালী সব গোষ্ঠীর—শহরে ব্যবসাদারদের আর গ্রামাঞ্চলে ভূস্বামী ও প্রভাবশালী কৃষক গোষ্ঠীগুলি—সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ বাড়ানোর। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ড (প্যাটেল ছিলেন যার মাথা)-কে বিড়লা দান করেন পাঁচ লাখ টাকা, আর বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি যে ৩৭,০০০ টাকা তুলেছিল তার মধ্যে ২৭,০০০ টাকাই দিয়েছিলেন আর কে ডালমিয়া। স্পষ্টতই ঐ টাকাও যথেষ্ট ছিল না (আসনপিছু নির্বাচনী খরচ দাঁড়াত কমপক্ষে

২০০০ টাকা)। তাই আশা করা হতো, যে, বেশির ভাগ প্রার্থীই নিজেই টাকার ব্যবস্থা করবেন। কার্যত এর মানে দাঁড়াল সম্পত্তিবান লোকেদের প্রতি পরিষ্কার পক্ষপাত। যেমন বিহারে, স্থানীয় জমিনদারদের চাপে পড়ে, কিসান সভার বহু জঙ্গী কর্মীকে মনোনয়ন দেওয়া হলো না, আর কংগ্রেস নেতা এ এন সিংহ স্বীকারই করলেন যে, তাঁর দলের বেশির ভাগ প্রার্থীই এসেছেন জমিনদার শ্রেণী থেকে (টমলিনসন, *ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*, পৃ. ৮২-৫)। সুতরাং সামগ্রিক পরিস্থিতির মধ্যেই নিহিত ছিল একই সঙ্গে 'বাম' - ও 'দক্ষিণ'-মুখী চাপ। গোটা পর্ব জুড়েই একই সঙ্গে কিন্তু পরস্পরবিরোধী এই চাপদুটি কংগ্রেসের ওপর থেকে গেছে।

নির্বাচনী সাফল্যের ফলে কংগ্রেসি মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে চাপ হলো প্রবল আর অচিরেই তা ঠেকানো অসম্ভব হয়ে উঠল। যদি 'কোনো প্রদেশের কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা নিজে বোঝেন আর জনসমক্ষে বলতে পারেন যে লাট তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না', তাহলে 'এই শর্তে পদ গ্রহণ করা' যাবে—এই প্রস্তাব আনেন রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্যাটেল, সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির মার্চ ১৯৩৭-এর অধিবেশনে, আর তা গৃহীতও হয়। জয়প্রকাশের বামসংশোধনী—যাতে দাবি করা হয়েছিল যে, কার্যভার আদৌ গ্রহণ করা চলবে না—সেটি পক্ষে ৭৮ বিপক্ষে ১৩৫ ভোটে হেরে যায়। আর বড়লাট লিনলিথগো-র ব্যক্তিগত সচিবকে লেখা এক চিঠিতে বিড়লা এই সিদ্ধান্তকে 'কংগ্রেসের মধ্যে দক্ষিণপন্থীদের এক বিরাট জয়' বলে হর্ষপ্রকাশ করেন (*ইন দি স্যাডো অফ দি মহাত্মা*, পৃ. ২১৪)। লাট তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না—প্রকাশ্যে এই মর্মে কোনো আশ্বাস দিতে লিনলিথগো নারাজ হলেও, জুলাই ১৯৩৭-এর মধ্যে গান্ধী মনস্থির করে ফেলেন। ১৬ জুলাই মহাদেব দেশাই বিড়লাকে জানান, 'জওহরকে বোঝানো খুব একটা কঠিন হয় নি। কৃতিত্বটা যে তাঁরই [জওহরের] পাওনা' সে কথা বলতেই হয়। কার্যনির্বাহী কমিটি কার্যভার গ্রহণের অনুমতি দেয় এক সপ্তাহ আগেই। তাদের আপাত যুক্তিযুক্ত অজুহাত ছিল এই যে, ব্রিটিশদের আশ্বাস যদিও সন্তোষজনক নয়, তাহলেও পরিস্থিতি থেকে 'একথা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা যায়, বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করাটা লাটের পক্ষে সহজ হবে না'। যুক্ত প্রদেশ, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজে কংগ্রেসি মন্ত্রীরা ক্ষমতায় এলেন, আর এর মাত্র কয়েকমাস পরেই এলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এও। সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ আসামে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হলো। তার জন্যে আইনসভায় কিছু জঘন্য মারপ্যাঁচ আর দল-বদল চলল। যথেষ্ট কৌতূহলের বিষয় এই যে, এতে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করলেন কংগ্রেসের বামপন্থী সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু।

সুতরাং, দেশের বড় অংশেই, কাল যাঁরা ছিলেন উৎপীড়িত, আজ তাঁরাই হলেন মন্ত্রী। নতুন আইনসভা শুরু হলো 'বন্দে মাতারম্'-এর সুরে, আর যে জাতীয় পতাকার জন্যে বহুলোক লাঠি-গুলির মুখোমুখি হয়েছিলেন, সরকারি ভবনগুলির ওপর তাই উড়তে লাগল সগর্বে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলি সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের সব শাখাতেই গোড়ায় একটা বড় ধরনের উদ্দীপনা জুগিয়েছিল। কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ১৯৩৬-এর ৫ লক্ষ থেকে লাফিয়ে বেড়ে গেলো ১৯৩৭-এ ৩১ লক্ষে, আর ১৯৩৮-এ ৪৫ লক্ষে। বামপন্থী ঝোঁকে ছাত্র, শ্রমিক ও কিসান আন্দোলন ও সংগঠনগুলি এগিয়ে চলল তর্‌তর্ করে, আর জনপ্রিয় মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় এসে বিভিন্ন রাজন্যশাসিত রাজ্যে ব্যাপক স্বৈরাচার-বিরোধী ও সামন্ততন্ত্র-বিরোধী অভ্যুত্থানের

উদ্দীপনা জোগাল। মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব নেওয়ার আরও নএঃর্থক ও বিরুদ্ধ দিকগুলিও অবশ্য বেশিদিন না-যেতেই হয়ে উঠল প্রকট। কতক অনিবার্য অসঙ্গতি তো ছিলই : একটি দল যা পূর্ণ স্বরাজের কাছে দায়বদ্ধ ও ১৯৩৫-এর সংবিধানের কটু সমালোচক, তাকে কাজ করতে হচ্ছিল সেই সংবিধানেরই কাঠামোর মধ্যে, সরকারি সংরক্ষণ ও রক্ষাকবচ দিয়ে টানা ছিল তাদের ক্ষমতার গণ্ডি, অর্থসংস্থানের উপায়ও ছিল সীমিত, আর সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হচ্ছিল সেইসব বেসামরিক পরিষেবা ও পুলিশ দিয়ে যাদের সঙ্গে এতদিন পর্যন্ত তার সম্পর্ক ছিল চূড়ান্ত আড়াআড়ির। যদিও গান্ধীর নির্বন্ধে কার্যনির্বাহী কমিটি ঠিক করে দিয়েছিল, মন্ত্রীরা মাসে ৫০০ টাকার বেশি মাইনে নিতে পারবেন না, তাহলেও হঠাৎ ক্ষমতা তথা মুরুব্বিয়ানা হাতে আসায় যথারীতি সুবিধাবাদী সুযোগ সন্ধান ও উপদলীয় কোঁদলের দোষও প্রশ্রয় পেল। বিহারে দলের অবস্থা সম্বন্ধে ১৯৩৮-এ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি-র জনৈক পরিদর্শকের প্রতিবেদনে স্বীকার করা হয়েছিল যে, 'কয়েকটি জেলায় স্থানীয় সংস্থার নির্বাচনে লড়াই করা ছাড়া কংগ্রেসের তরফে আর বিশেষ কিছুই করা হয় নি' (টমলিনসন-এ উদ্ধৃত, ঐ, পৃ. ৮৭)। মধ্য প্রদেশে জুলাই ১৯৩৮-এ এন বি খারে-কে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে হঠিয়ে দেন রবিশঙ্কর শুক্ল। তাঁকে মদত দেন ডি পি মিশ্র। এই ঘটনায় অবশ্য আঞ্চলিক বিরোধের রঙ চড়ানো হয়েছিল : খারে যে-অঞ্চলের নেতা সেই মারাঠি জেলাগুলির সঙ্গে হিন্দীভাষী রায়পুর ও জব্বলপুরের সঙ্ঘাত। তাহলেও মনে হয় গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই ছিল আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ (মাত্র একবছর আগেই শুক্ল-র বিরুদ্ধে খারে-কে সমর্থন করেছিলেন মিশ্র)। কিন্তু, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা ছিল একাধিক সম্প্রদায় ও শ্রেণীর মধ্যে বিবিধ স্বার্থের পাল্লা ঠিক রাখা। জাতীয় ও বহুশ্রেণী-ভিত্তিক আদর্শ সত্ত্বেও কংগ্রেস বুঝতে পারল যে, শাসকদল হিসেবে একই সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমান, ভূস্বামী ও কৃষক, ব্যবসাদার ও শ্রমিকদের তুষ্ট করে চলা প্রায় অসম্ভব। দক্ষিণমুখী সরণই অব্যাহত থাকল, যদিও, মাঝে-মধ্যেই তাকে মুড়ে রাখা হতো 'বাম' বাক্যচ্ছটায়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে ক্রমবর্ধমানভাবে এটাই হয়ে উঠল কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী তথা দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের কার্যধারার চরিত্রলক্ষণ।

কংগ্রেস ও আমলাতন্ত্র

সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ যুদ্ধ শুরু হওয়ায় সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো ; তার আগে অবধি আমলাতন্ত্রের সঙ্গে বড় কোনো সঙ্ঘাত হয় নি। অন্যথায় বিস্ময়কর এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায় কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী সরণ দিয়ে। একটা সঙ্কট অবশ্য হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮-এ : অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দিতে লাটেরা রাজি নন বলে যুক্ত প্রদেশে গোবিন্দবল্লভ পন্থ ও বিহারে শ্রীকৃষ্ণ সিংহ-র মন্ত্রিমণ্ডলী কিছুদিনের জন্যে পদত্যাগ করে। জুলাই ১৯৩৭-এ আন্দামান বন্দীশালায় অনশন ধর্মঘটের পর বন্দীমুক্তির বিষয়টি জাতীয় স্তরে মুখ্য বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। বাঙলায় বিপুল সংখ্যক রাজবন্দীর জন্যে কিছু করছে না বলে অ-কংগ্রেসি ফজলুল হক মন্ত্রিসভাকে কংগ্রেস তীব্র আক্রমণ করছিল, আর হরিপুরায় কংগ্রেস অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে বামপন্থীদের মুখ বন্ধ রাখার জন্যে খানিকটা [অন্যধরনের] ভাব করারও নিশ্চয়ই দরকার ছিল। অধিবেশন শেষ হওয়ার কয়েকদিন পরেই পদত্যাগ প্রত্যাহার করে নেওয়া

হয়, আর অবিলম্বে সকলের মুক্তির বদলে, লাট ব্যক্তিবিশেষকে মুক্তি দিতে পারবেন—এই নীতিই বহাল থাকে।

১৯৩২ থেকে পাওয়া জরুরি অবস্থাকালীন ক্ষমতা বাতিল করেই কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু অক্টোবর ১৯৩৭-এর মধ্যেই মাদ্রাজে রাজাগোপালচারী রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতার জন্যে লোককে সোপর্দ করেছিলেন, আর সমস্ত কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তথা বামপন্থীদের পরিচালিত শ্রমিক-কৃষক আন্দোলনের বিরুদ্ধে একইভাবে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় দমনমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। 'জান-মাল বাঁচানোর জন্যে কংগ্রেস সরকারকে যে সব ব্যবস্থা নিতে হতে পারে' তার সমর্থনে সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি কার্যত ঢালাও ক্ষমতা দেয়, আর নিন্দা করে 'কংগ্রেসি সমেত সেই লোকদের....নাগরিক অধিকারের নামে যারা হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠ আর হিংসাত্মক পদ্ধতিতে শ্রেণীযুদ্ধের কথা প্রচার করে...।' অন্তত আইন-শৃঙ্খলার ব্যাপারে, সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক কুপল্যান্ড শেষ দিককার কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে অন্যান্য সরকারের বা ১৯৩৭-এর আগের আমলাতন্ত্রের 'যৎসামান্য পার্থক্য'-ই দেখেছেন। এ-বাবদে কংগ্রেসকে মুরুব্বির মতো পিঠ চাপড়ে দিতেও তিনি তৈরি ছিলেন : '..বলা যায়, আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে কংগ্রেস সরকারগুলি তাদের ওপর চাপানো পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।' (আর কুপল্যাণ্ড, *দি কন্সটিটিউশনাল প্রবলেম ইন ইন্ডিয়া*, খণ্ড ২, পৃ. ১৩৫)

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

ঐ জাতীয় প্রশংসার সঙ্গে কুপল্যান্ড-এর লেখায় মিশে আছে কংগ্রেস সর্বোচ্চ নেতৃত্বের তথাভিহিত 'সর্বগ্রাসী মনোভাবে'র বিরুদ্ধে কটু আক্রমণ। ঐ মনোভাবই তাঁর মতে 'যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির ভিত পুরোপুরি আলগা করে দেয়। আর এর সঙ্গে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীর কয়েকটি হিন্দু-ঘেঁষা পদক্ষেপ যুক্ত হয়ে মুসলমানদের চূড়ান্তভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেয়' (ঐ, পৃ. ৯৯)। ঘটনা হচ্ছে, মুসলিম লীগেরও এটাই ছিল বাঁধা সমালোচনা। যেমন, লীগের পাটনা অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯৩৮) 'কংগ্রেসি ফ্যাসিবাদ'-এর নিন্দা-সূত্রে এই কথাই বলেছিলেন জিন্না। লীগের মুখপাত্ররা ছাড়া অন্য লোকেও ১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে কংগ্রেসের কিছু মনোভাব ও নীতিকেই মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়ায় মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে ধরেছেন : যেমন আজাদ (তাঁর *ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম* ১৯৫৯-এ) এবং দেশভাগের সময় নিয়ে ব্রিটিশ লেখক, পেণ্ডেরে মুন ও এইচ ভি হডসন।

১৯৩৭-এর পর লীগের বিরাট পুনরুত্থান হয় যুক্ত প্রদেশকে কেন্দ্র করে। কংগ্রেস আবার ঐ রাজ্যেই যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে গররাজি হয়েছিল। এই প্রত্যাখ্যানকে তাই প্রায়শই অদ্ভুতভাবে নির্ধারক বলে ব্যাখ্যা করা হয়। নির্বাচনের সময়ে যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেস-লীগের সম্পর্ক ছিল খুবই বন্ধুত্বের, কারণ দু-দলই লড়ছিল ছাতারি-র জাতীয় কৃষিজীবী দলের বিরুদ্ধে। সর্বভারতীয় স্তরেও, লিগের নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে ১৯৩৫-এর আইন সম্বন্ধে প্রায় কংগ্রেসেরই মতো সমালোচনামূলক ভূমিকা নেওয়া হয়, আর ভাবা হয় লখনউ চুক্তির (১৯১৬) নীতিগুলির ভিত্তিতে সহযোগিতার কথা। নির্বাচনের পর অবশ্য নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে গিয়ে,

খালিকুজ্জামান (লীগের এই নেতাটি এমনকি ১৯৩৪ পর্যন্ত ছিলেন কংগ্রেস সংসদীয় বোর্ডের সদস্য)-এর যুক্ত মন্ত্রিসভা গড়ার প্রস্তাব অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করল কংগ্রেস। নেহরু আর আজাদের কথাবার্তা ভেস্তে গেল অংশত মন্ত্রী বাছাই নিয়ে। কিন্তু আরও গুরুতর কারণ হলো জুলাই ১৯৩৭-এ কংগ্রেস জিদ ধরে যে, মুসলিম লীগ পরিষদীয় দলকে কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। ১৯৩৭-এর মাঝামাঝি এই ধরনের জিদ অস্বাভাবিক তো নয়ই, বা এমনকি অযৌক্তিকও হয়তো ছিল না। খালিকুজ্জামান খোলাখুলিই স্বীকার করেন যে, যুক্ত প্রদেশে লীগ ছিল 'জমিনদারি তথা সামরিক বেসামরিক পরিষেবা'র সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত (*পাথওয়ে টু পাকিস্তান*, পৃ. ১৭৩)। লীগের সর্বভারতীয় নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপের লক্ষ্যমুখী যে-কোনো আন্দোলনে'র নিন্দা করা হয়, আর অক্টোবর ১৯৩৭-এ লীগের লখনউ অধিবেশনে খালিকুজ্জামান মুসলমান চাষীদের অবস্থার উন্নতিবিধানের কথা বলেন, কিন্তু সেই প্রসঙ্গেও ভূমিসংস্কারের কথা খারিজ করে দেন। নেহরু ও নরেন্দ্র দেব বা কে এম আশরফ প্রমুখ কংগ্রেস বামপন্থীরা ফলে ভয় পেয়ে যান যে, লিগ যদি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে তার কমে কোনো শর্তে যুক্ত মন্ত্রিসভা গড়লে, র‍্যাডিকাল সামাজিক-আর্থনীতিক সংস্কার করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। এর বদলে তাঁরা 'গণসংযোগ' অভিযানের মাধ্যমে মুসলমানদের দলে টানার চেষ্টা চালালেন, আর তার দায়িত্ব দেওয়া হলো আশরফকে। এ ছাড়াও যুক্ত প্রদেশে কংগ্রেসের ছিল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা (২২৮-এর মধ্যে ১৩৪টি আসন) এবং দেওবন্দ-এর উলেমা গোষ্ঠীর (জামায়েত উল-উলেমা-এ-হিন্দ ছিল তাদের কব্জায়) সমর্থন। উত্তর ভারতের অহরর পার্টিও ছিল তাদের পেছনে। কয়েক বছর আগেই এই দল গঠন করেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন খিলাফতিরা। মে ১৯৩৭-এ এক অহরর সম্মিলনে জিন্না-কে নিন্দা করা হয় 'বিগত যুগের রাজনীতিবিদ' বলে, শুধু 'সংবিধানতন্ত্রেই যাঁর অচলা আস্থা', আর লীগকে বলা হয় 'গুটিকয়েক নাইট, খান বাহাদুর আর নবাবের চক্র'।

লখনউ অধিবেশনের পর থেকে লীগ আরও জনপ্রিয় এক ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সঙ্কল্প করে ও শেষ অবধি সফলও হয়। মেনে নেওয়া হয় যে, সংখ্যালঘুদের জন্য কার্যকর রক্ষাকবচ-সহ পূর্ণ স্বাধীনতাই হবে তাঁদের [রাজনৈতিক] অঙ্গীকার, 'শ্রেণীগত তিক্ততা ও সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ' সৃষ্টির জন্য কংগ্রেসকে নিন্দা করা হয় ; কয়েক মাসের মধ্যেই যুক্ত প্রদেশে দলে নেওয়া হয় ১০০,০০০ নতুন সদস্যকে ; এবং পাঞ্জাব ও বাঙলার প্রধানমন্ত্রী, ইউনিয়নিস্ট সিকিন্দার হায়াত খান ও কৃষক প্রজা নেতা ফজলুল হকের আনুগত্য (তখনও অবধি যা ছিল অনেকটাই আনুষ্ঠানিক) অর্জন করতেও তাঁরা সমর্থ হন। 'ভারতীয় রাজনীতির ছাত্র মাত্রেই জানেন যে যুক্ত প্রদেশ থেকেই লীগ পুনর্গঠিত হয়' (খালিকুজ্জমান, পৃ. ১৩)। যুক্তি হিসেবে অবশ্য বলাই যায় যে, যুক্ত মন্ত্রিসভা প্রত্যাখ্যানের কারণে নয়, বরং যুক্ত প্রদেশ তথা অন্যত্র সামাজিকভাবে যথার্থ র‍্যাডিকাল কর্মসূচি নিতে ও প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্যেই এই বিপর্যয় ঘটে। মুসলিম 'গণসংযোগ'-এর ব্যাপারটা অনেকটাই রয়ে গেল কাগজে-কলমে, আর ধর্মনিরপেক্ষ ও র‍্যাডিকাল বাক্যজটা শেষ অবধি শুধু মুসলিম কায়েমি স্বার্থকে আতঙ্কিত করে তুলল, মুসলমান জনসাধারণকে জিতে নিতে পারল না।

বাঙলায় মন্ত্রিসভা গঠনের সময়ও ঘটনা একইভাবে গড়াল—যা বোধহয় আরও কম

ন্যায়সঙ্গত। আবুল মনসুর আহ্‌মেদ, শামসুদ্দীন আহ্‌মেদ ও নৌশের আলী প্রমুখ তুলনায়-র‍্যাডিকাল লোকেদের চাপে পড়ে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টি (কে পি পি) এপ্রিল ১৯৩৬-এ একটি নির্বাচনী কর্মসূচি গ্রহণ করে। তাতে বিনা ক্ষতিপূরণে জমিনদারি লোপ ও অবিলম্বে খাজনা কমানো আর আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দাবি তোলা হয়। জমিনদারি লোপের বিষয়টিই ছিল নির্বাচনের আগে জিন্নার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ভেঙে যাওয়ার আংশিক কারণ। প্রমাণ হয়ে যায় যে কে পি পি লীগের জোরালো প্রতিপক্ষ। পটুয়াখালি আসনে মর্যাদার লড়াই-এ খাজা নাজিমুদ্দীনকে হারিয়ে দেন ফজলুল হক। বাংলার কংগ্রেস নেতারা অবর্ণ্য বাক্যচ্ছটা বিস্তারের জন্যেও ভূমিসংস্কারের কথা বড় একটা বলতেন না। তার কারণ মনে হয়, এখানকার জমিনদারদের বেশির ভাগই ছিলেন হিন্দু, অবধ-এর তালুকদারদের মধ্যে মুসলমান ছিলেন প্রচুর। বাঙলার সঙ্গে যুক্ত প্রদেশের এটাই ছিল তফাত। কে পি পি-র সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভার আলোচনা ভেঙে যায়, কারণ কংগ্রেস জিদ ধরে ছিল : অবিলম্বে বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে আর আবুল মনসুর আহ্‌মেদ বলেন, মন্ত্রিসভার রায়তি সংস্কার কর্মসূচির ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত, কারণ বন্দীমুক্তির প্রশ্নে ছোটোলাট শেষ অবধি ভেটো দিতে পারেন আর তার ফলে পদত্যাগ করতে হতে পারে। এইভাবে লীগের সঙ্গে জোট বাঁধতে ফজলুল হককে মোটামুটি ঠেলেই দেওয়া হলো।

প্রদেশগুলোয় কংগ্রেস শাসনের সাতাশ মাস ধরে লীগ জোরদার প্রচারের গোলা দাগতে থাকে—যার চূড়ান্ত রূপ পীরপুর প্রতিবেদন (১৯৩৮-এর শেষে), বিহার নিয়ে শরিফ প্রতিবেদন (মার্চ ১৯৩৯) এবং ফজলুল হকের *মুসলিম সাফারিংস আন্ডার কংগ্রেস রুল* (ডিসেম্বর ১৯৩৯)। অভিযোগগুলির মধ্যে ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে ব্যর্থতা, বকর-ইদ-এ গো-হত্যা সম্বন্ধে স্থানীয় নিষেধাজ্ঞা, সার্বজনিক অনুষ্ঠানে 'পৌত্তলিক' স্তবক সমেত 'বন্দে মাতরম্' গাওয়া এবং উর্দুর বদলে দেবনাগরী লিপিতে হিন্দী ও হিন্দুস্তানীকে উৎসাহ দেওয়া। এসবের অনেক কিছুই স্পষ্টতই অতিরঞ্জিত। আর এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, প্রধান বিচারপতি মরিস গয়ার-কে দিয়ে এসব অভিযোগের তদন্ত করা হোক—কংগ্রেসের এই প্রস্তাবটি লীগ প্রত্যাখ্যান করে। মার্চ ১৯৪০-এ 'পাকিস্তান প্রস্তাব'-এর আগে লীগের নেতারা ছিলেন পরিষ্কার কোনো কর্মসূচিহীন একদল না-খোশ রাজনীতিবিদ, কারণ তাঁদের পুরোনো সব দাবিদাওয়া—যেমন, পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুর পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক মর্যাদা এবং পাঞ্জাব ও বাঙলায় মুসলিম রাজনৈতিক আধিপত্য—মোটামুটি মেনে নিয়েছিল ব্রিটিশ ও কংগ্রেস দুপক্ষই। যে ১৯৩৮-এ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময়ে জিন্না তাই জিদ ধরলেন, লীগকেই মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিতে হবে। ১৯৪০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের আগে পর্যন্ত এই দাবি ছিল সম্পূর্ণ অন্যায্য, কারণ, যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও মাদ্রাজের মুসলমান সংখ্যালঘুদের মধ্যে লীগ শক্তিশালী হলেও বাঙলায় তখনও ছিল যথেষ্ট দুর্বল, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আর পাঞ্জাবে নগণ্য, আর এমনকি সিন্ধু প্রদেশেও তারা সরকার গঠন করতে পারে নি (সেখানে মার্চ ১৯৩৮-এ আল্লা বক্স-এর নেতৃত্বে এক কংগ্রেস-সমর্থিত মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসে)। খালিকুজ্জামান খোলাখুলিই স্বীকার করেছেন, কংগ্রেস যে জিন্নার অবস্থান মেনে নেয় নি, সেটা ছিল 'আমাদের সৌভাগ্য', কারণ 'লীগ যখন

দাবি তুলেছিল তখনই যদি কংগ্রেস সেই অবস্থান মেনে নিত, তাহলে আমরা কোন্ কোন্ ইতিবাচক দাবি করতে পারতাম তা-ই আমি ভাবি'। (খালিকুজ্জামান, পৃ. ১৯২)।

নির্দিষ্ট অভিযোগের প্রসঙ্গে এলে, কংগ্রেস সর্বোচ্চ নেতৃত্বের 'সর্বগ্রাসী মনোভাবে'র কথা পড়তে মজা লাগে, কারণ একটি সর্বভারতীয় দল তার সংগঠনকে সংহত করার চেষ্টা করলে তাকে আদৌ দোষ দেওয়া যায় না। আর ১৯৩৭-৪৭—এই দশ বছরে জিন্না নিজেই তো তাঁর শক্তির অনেকটা ব্যয় করেছিলেন প্রাদেশিক মুসলমান নেতাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার চেষ্টায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে প্রায়ই হতো, কিন্তু সেটা অন্যান্য জায়গার চেয়ে এমন কিছু চোখে পড়ার মতো বেশি নয়। অক্টোবর ১৯৩৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এর মধ্যে ৮টি কংগ্রেস শাসিত রাজ্যে দাঙ্গার ঘটনা ৬০টি, আর ৩টি অ-কংগ্রেসি প্রদেশে ২৫টি (কুপল্যান্ড, পৃ. ১৩১)। অক্টোবর ১৯৩৭-এ কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি 'বন্দে মাতরম্'-এর শেষ, কটি স্তবক বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। স্বীকার করা হয়, 'গানটির বিশেষ কয়েকটি জায়গা সম্বন্ধে মুসলমান বন্ধুরা যে-আপত্তি তুলেছেন, তা যথার্থ'। ওয়ার্ধা-র বুনিয়াদি শিক্ষাপ্রকল্প অতিমাত্রায় হিন্দুভাবিত বলে আক্রমণ করে লীগ, আর পাঠ্যসূচিতে উর্দু রাখার জন্যে ঐ প্রকল্পকেই নিন্দা করে হিন্দু মহাসভা। ওয়ার্ধা প্রকল্প আর বোম্বাই-এর স্কুলগুলির জন্যে উর্দু পাঠ্যপুস্তক তৈরি—দু ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট মুসলমান বুদ্ধিজীবী জাকির হুসেন ছিলেন মুখ্য ভূমিকায়। লীগ আবার সেই বইগুলিকেও ইসলাম-বিরোধী বলে নিন্দা করে।

তবুও ১৮ অক্টোবর ১৯৩৯-এ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে নেহরু স্বীকার করেন, 'সাম্প্রদায়িকতা ও মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাবের বৃদ্ধি যে আমরা রোধ করতে পারি নি তাতে কোনো সন্দেহ নেই' (উমা কাউরা, পৃ. ১২৩)। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছিল কংগ্রেস-শাসিত একমাত্র প্রদেশ যেখানে মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সেখানকার মুসলমান কৃষকদের মধ্যে খান সাহেবের মন্ত্রিসভা সমর্থন হারাতে শুরু করে, কারণ হিন্দু ও শিখ ব্যবসাদার মহাজনদের বিরোধিতার মুখে পড়ে, গ্রামীণ ঋণভার কমানোর জন্যে তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন নি (এ কে গুপ্ত, *নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স : লেজিসলেচার অ্যান্ড ফ্রিডম স্ট্রাগল*, ১৯৩২-৪৭, পৃ. ৯৩)। উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেক জায়গাতেই কংগ্রেস-নেতৃত্বে গ্রামীণ জনমুখিতা যুক্ত ছিল হিন্দুত্ব ও হিন্দী ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে, কারণ মুসলমানরা হতেন অনেক বেশি শহুরে ও সাক্ষর আর উর্দু ছিল উচ্চতর শ্রেণীর সংস্কৃতির ভাষা। ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ওপরতলার কংগ্রেস নেতারা এমন জোর দিতে লাগলেন যা তাঁরা আগে কখনও দেন নি। কিন্তু পার্টির ক্রমপরম্পরার নিচের তলার সব লোক, বা এমনকি সব কংগ্রেসমন্ত্রীও, কোনোভাবেই তাঁদের এই মনোভঙ্গির ভাগীদার ছিলেন না বা আন্তরিকভাবে তা প্রয়োগ করেন নি। ১৯৩৭-এ আজাদ অভিযোগ করেন, মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেসিরা লীগ-এ যোগ দিতে পারেন না, কিন্তু প্রায়ই দেখা যায় তাঁরা হিন্দু মহাসভায় কাজ করছেন। হিন্দুমহাসভার সদস্য হলে কংগ্রেসের সদস্য থাকা যাবে না—কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটি এই ঘোষণা করতে করতে ১৯৩৮-এর ডিসেম্বর হয়ে গেল। এই বছরগুলোয় হিন্দু মহাসভার শক্তি বাড়ছিল। মহাসভার নতুন সভাপতি, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন বিপ্লবী ভি ডি সাভারকর, ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ নাগপুর অধিবেশনে ঘোষণা করেন, 'আমরা হিন্দুরা নিজেরাই

একটি জাতি...হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের যদি কেউ বলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক তাতে [তাঁদের] সঙ্কোচ বোধ করার আদৌ কিছু নেই।' সবচেয়ে অশুভ লক্ষণ ছিল আধা-সামরিক সাম্প্রদায়িক সংস্থার জন্ম : ১৯৩১-এ পাঞ্জাবি মুসলমানদের মধ্যে তৈরি ইনায়েতুল্লা খান মশরিকি-র খাকসার, আর কে বি হেডগেবর-এর রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ [আর এস এস]। টিলকপন্থী মহাসভা নেতা বি এস মুঞ্জে প্রথমদিকে আর এস এস-এর পৃষ্ঠপোষণ করেন। ১৯৩০-এর দশকে আর এস এস তাদের নাগপুরের ঘাঁটি থেকে ছড়িয়ে পড়ে যুক্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব ও দেশের অন্যান্য অংশে। ১৯৪০-এ গোলওয়ালকর যখন নেতা হন, তখন ঐ সংগঠনে ছিল ১০০,০০০ শিক্ষাপ্রাপ্ত তথা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল কর্মী, যারা আপসহীন সাম্প্রদায়িকতার ভাবাদর্শের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে তৎকালীন লোকেদের কাছে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলির যে-তাৎপর্য ছিল, দেশভাগের সময়কার পরবর্তী অভিজ্ঞতার অবস্থান থেকে তাকে দেখলে সম্ভবত তাকে খানিকটা অতিরঞ্জিতই করা হয়। বেশির ভাগ কংগ্রেসিই মুসলিম লীগকে তখনও অবধি নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনো চ্যালেঞ্জ বলে মনে করতেন না ; ক্ষমতাসীন কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে বিচিত্র ও প্রায়শই পরস্পরবিরোধী উপায়ে ব্যবহার করার চেষ্টায়ই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন, যেমন ব্যক্তিগত লাভের সুযোগ হিসেবে, আন্তরিকভাবে বিশ্বাস-করা গান্ধীপন্থী আদর্শগুলি প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, নেতৃস্থানীয় ভারতীয় ব্যবসায়ীদের সহযোগিতায় জাতীয় আর্থনীতিক অগ্রগতির পরিকল্পনার বিকাশ ঘটানোয় আর দলিত মানুষদের অবস্থার উন্নতি করার চেষ্টায়।

গান্ধীপন্থী-সংস্কার

অক্টোবর ১৯৩৭-এ ওয়ার্ধায় এক শিক্ষা সম্মিলনে সম্মতি দেওয়া হয় গান্ধীর প্রস্তাবে : 'বুনিয়াদি শিক্ষা' দেওয়া হবে মাতৃভাষার মাধ্যমে, আর তার সঙ্গে যুক্ত থাকবে উৎপাদনমূলক হাতের কাজ। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে, কিছুটা সরকারি সহায়তায়, এই চিন্তাধারা অনুযায়ী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই বুনিয়াদি শিক্ষায় অঙ্গীভূত ছিল আগ্রহ জাগানোর মতো নানান আদর্শ : যেমন, সাদাসিধে জীবন, কায়িক ও মানসিক শ্রমের পার্থক্য কমানো, আর নিজের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করে স্কুলগুলির স্ব-নির্ভর হয়ে ওঠা। কিন্তু এই বুনিয়াদি শিক্ষা সত্যিসত্যিই কোনোদিন স্কুল-কলেজের প্রথাগত শিক্ষার প্রাণবান বিকল্প হয়ে ওঠে নি। আর কুটিরশিল্পের সঙ্গে যোগ রাখার ব্যাপারটাকে অনেকেই মনে করতেন অবাস্তব ও আদ্যিকালের গান্ধীপন্থী খ্যাপামি। মদ্যপান নিবারণ নিয়েও গান্ধী জিদ ধরেন, যদিও নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে তার কোনো উল্লেখ ছিল না। প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ মদ্যপান নিবারণের উদ্দেশ্যে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্যে (বিশেষত বোম্বাই ও মাদ্রাজে) সর্বোচ্চ নেতৃত্ব কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলীকে খোঁচাতে থাকে। মন্দির প্রবেশ সম্বন্ধেও মাদ্রাজে কয়েকটি আইন পাশ করানো হয়, কিন্তু অন্য কোনোভাবে আর একটি প্রধান গান্ধীপন্থী চিন্তা, হরিজন উন্নয়ন সম্বন্ধে বেশি কিছু করা হয় নি বলেই মনে হয়। ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে আম্বেডকর প্রায় লীগের মতোই কংগ্রেসের কটু সমালোচক হয়ে ওঠেন। জিন্নার সঙ্গে একযোগে, অক্টোবর ১৯৩৯-এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পদত্যাগের দিনটি তিনি পালন করেন 'মুক্তি দিবস' হিসেবে।

ক্রমেই আরও বেশি বেশি কংগ্রেসের লোক মনে করছিলেন, গান্ধীর চিন্তাভাবনা, বিশেষত

ভারী শিল্প সম্বন্ধে তাঁর তত্ত্বগত বৈরিতা, আরও অবাস্তব ও অবান্তর হয়ে উঠছে। প্রদেশগুলিতে কংগ্রেস শাসনকালের একটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো : এই সময়ই স্থাপিত হয় ক্লড মার্কোভিট্স যাকে বলেছেন, ভারতীয় ব্যবসাদার ও কংগ্রেস দলের মধ্যে 'এক দীর্ঘস্থায়ী মৈত্রী'।

পুঁজিপতিবৃন্দ ও কংগ্রেস

প্রক্রিয়াটি স্থান ও কালভেদের বিরোধ-বৈচিত্র্য থেকে মুক্ত ছিল না। বিড়লা বলেছেন, কংগ্রেসের কার্যভার গ্রহণের খবরে 'তিনি আনন্দে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন'। অন্যদিকে আবার, কলকাতার চেয়ে বরং কংগ্রেস-শাসিত বিভিন্ন প্রদেশে যাঁদের কারবার, সেইসব শিল্পপতি প্রথমদিকে এই ভেবে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, জনপ্রিয় সরকারের ওপর হয়তো ট্রেড ইউনিয়নগুলো আরও বেশি চাপ দিতে পারবে। অক্টোবর ১৯৩৭-এ কংগ্রেস শ্রমিক কমিটি কল্যাণমূলক আইন প্রণয়নের জন্য সত্যিসত্যিই একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী কর্মসূচি তৈরি করে। আর ১৯৩৭ ও ১৯৩৮-এ যে-সংগঠন কানপুর সুতোকলে একর পর এক জোরদার ধর্মঘটের নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই মজদুর সভাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকে যুক্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভা। জে পি শ্রীবাস্তব ছিলেন যুক্ত প্রদেশের এক রইস লোক, পরে তিনি বড়লাটের শাসন-পরিষদে যোগ দেন। ইনি কিছুদিন বাদে ওয়াভেলকে বলেন : '১৯৩৭-এ, যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেস...ক্ষমতায় আসার পর প্রথম সারির শিল্পপতিরা—আমার মনে হয় তাঁরা সকলেই হিন্দু—একযোগে ঠিক করেন যে, কংগ্রেসের বিরোধিতা করার জন্য চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে জিন্নার মুসলিম লীগ আর সেইসঙ্গে [হিন্দু] মহাসভাকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা হবে। কারণ তাদের ভয় ছিল আর্থিক মুনাফার ক্ষেত্রে কংগ্রেস একটা বাধা হয়ে উঠতে পারে'—এই কবুলতিতে সত্যিই বোধোদয় হয় (ওয়াভেল, *ভাইস রয়ালস্ জার্নাল*, ৩০ নভেম্বর ১৯৪৪-এর লিখন, পৃ. ৪০২)। সঙ্ঘাতের দ্বিতীয় সম্ভাব্য উৎস ছিল আর্থিক। মদ্যপান নিবারণ সম্বন্ধে গান্ধীপন্থী 'খ্যাপামি'র ফলে যে-ঘাটতি হয় তা মেটাতে বোম্বাই সরকার ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯-এ নগর সম্পত্তি কর ও কাপড়ের ওপর বিক্রয়কর চাপায়। ভারতীয় পুঁজিপতিদের তুষ্ট করার মতো কিছু ব্যবস্থাও নয়া দিল্লী সরকার নেয়। ওটাওয়া চুক্তি তথা ১৯৩৫-এর পরিপূরক বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করে আইনসভায় যে-প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল সেটি গৃহীত হয়। আর ব্রিটেনের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে অগাস্ট ১৯৩৬ থেকে মার্চ ১৯৩৯ অবধি যে জট-পাকানো আলাপ-আলোচনা চলে তাতে 'বেসরকারি উপদেষ্টা' হিসেবে বিড়লা, ঠাকুরদাস ও কস্তুরভাই লালভাইকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। আলোচনার সবচেয়ে প্যাঁচালো গিঁটটি ছিল এমন এক দর-কষাকষি যাতে ভরত আরও বেশি করে রপ্তানি করবে, তার বিনিময়ে ল্যাঙ্কাশায়ার-এর উৎপাদনের ওপর চাপানো হবে আরও কম আমদানি শুল্ক। ভারতীয় রপ্তানি বিস্তারে ভারত সরকারের নিজেরও কিছুটা দায় ছিল, কারণ এর ফলে প্রেষিত ধন (রেমিট্যান্স) বাইরে পাঠানো সহজ হতো। বোম্বাই-এর ব্যবসাদাররা যেহেতু ততদিনে দেশের বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ফেলেছেন, তাই আমদানি শুল্কের ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দিতে তাঁরা পুরোপুরি গররাজি ছিলেন না (বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়, অধ্যায় ৭)।

এইসব সমস্যা সত্ত্বেও ১৯৩৮-এর মাঝামাঝি থেকে ভারতীয় পুঁজিপতিদের সঙ্গে কংগ্রেস

নেতৃত্বের একাংশের আরও পাকাপোক্ত সমঝওতার লক্ষণ প্রকট হতে থাকে। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার নীতি ছিল মজুত করার জন্যে 'স্বাদেশী' মাল কেনা। ব্যবসাদারদের এতে উপকারই হয়, আর পুঁজিপতিদের সঙ্গে গড়ে উঠতে থাকে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, বিশেষ করে বোম্বাই-এ। যেমন, ঠাকুরদাস কাগজপত্র থেকে দেখা যায়, কিলিক নিক্সন-এর কাছ থেকে বোম্বে স্টিম নেভিগেশন কম্পানি কেনার ব্যাপারে ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ-কে সরাসরি সাহায্য করেছেন প্যাটেল (মার্কোভিট্স, পৃ. ২২২), সুতোর ওপর আমদানি শুল্ক বজায় রাখাটা ছিল জাতীয়তাবাদীদের কাছে ইজ্জতের সওয়াল। কংগ্রেসের চাপে পড়ে বেসরকারি উপদেষ্টারা সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ পদত্যাগ করলেন। এগারোটি প্রদেশের মধ্যে আটটিতে যারা শাসন-ক্ষমতায় আসীন, সেই দলকে বিরূপ করাটা ভারতীয় পুঁজিপতিদের কোনো গুরুত্ববান্ অংশেরই আর সাধ্যে কুলোত না। ১৯৩৩-এ তাঁরা সেটা করতে পারতেন। নয়া দিল্লী নিজে থেকেই সুতো আমদানি শুল্কের একটি ক্রমিক মাপ চালু করে : ভারত থেকে ব্রিটিশদের কাঁচা তুলো নেওয়া তথা ভারতে সুতি কাপড় আমদানির সঙ্গে তা সমানুপাতিক। মার্চ ১৯৩৯-এর ভারত-ব্রিটিশ বাণিজ্য চুক্তি এইভাবেই সম্পন্ন হলো। কংগ্রেস তার বিপক্ষে ভোট দিল, আর সেইসঙ্গে যোগ দিলেন সব ব্যবসাদার বিধায়করা। শেষ অবধি বড়লাটের সার্টিফিকেট পদ্ধতিতে সেটি পাশ করাতে হয়।

আরও মৌলিক আর্থনীতিক বিকাশের ফলে ব্যবসাদার ও কংগ্রেস—দু এরই মনোভাবে তাৎপর্যপূর্ণ রদবদল হচ্ছিল আর সম্ভব হচ্ছিল ঘনিষ্ঠতর মৈত্রী। ভারতীয় প্রশুল্ক প্রাচীরের আড়ালে গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ (এবং ততদিনে কিছু মার্কিন) সুবৃহৎ সংস্থার সহায়ক প্রতিষ্ঠান। এটা ছিল বড় ভয়ের কারণ। যেমন, মুখ্য সাবান-উৎপাদক হিসেবে লিভার ব্রাদার্স ১৯৩৭-এ গোদরেজকে হটিয়ে দেয়। ইম্পিরিয়াল টোবাকো চালু করে তাদের সহায়ক সংস্থা ওয়াজির সুলতান। আর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় রাসায়নিক, ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবার শিল্প। *হরিজন* পত্রিকায় ১৯৩৮-এ একগুচ্ছ প্রবন্ধে একেই 'ভারতে সীমাবদ্ধ (ইণ্ডিয়া লিমিটেড)-র বিপদ' বলে নিন্দা করা হয়। এফ আই সি সি আই ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে এপ্রিল ১৯৩৯-এ, আর বোম্বাই-এর কংগ্রেস নেতা এন ভি গডগীল ঐ মাসেই কেন্দ্রীয় আইনসভায় ঐ বিষয়ে একটি প্রস্তাব আনেন।

ইতোমধ্যে, ১৯৩৭ থেকে শিল্পক্ষেত্রে আবার এক মন্দা দেখা দিল। চিনিশিল্পে হলো অতি-উৎপাদন, সিমেন্টে সঙ্কট আর সুতোর ক্ষেত্রে অচলাবস্থা। চিনির ব্যাপারে, উৎপাদকদের সিণ্ডিকেট গঠন করতে বাধ্য করে যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের মন্ত্রিসভা ভালোভাবেই সামাল দিল। ভোগ্যপণ্য শিল্পের ক্ষেত্রে আমদানি-প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সম্ভাব্য বৃদ্ধি ইতোমধ্যেই পৌঁছেছিল তার চূড়ান্ত সীমায়, কারণ ঘটনা এই যে, দেশের গ্রামীণ বাজারের বিরাট বিস্তৃতির জন্যে দরকার ছিল কাঠামোগত পরিবর্তন, যেমন, আদ্যন্ত ভূমি-সংস্কার ইত্যাদি। কংগ্রেস তথা ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী কারও কাছেই এটা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য ছিল না। মধ্যবর্তী তথা পুঁজিনির্ভর মালপত্রের বিকাশের জন্যে দকার ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে প্রচুর বিনিয়োগ, কারিগরি জ্ঞান, আর প্রথমদিকে কম মুনাফা মেনে নেওয়ার প্রস্তুতি। সুতরাং এর যুক্তিসঙ্গত বিকল্প ছিল 'ভারতে সীমাবদ্ধ' জাতীয় সংস্থায় বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া (বিদেশী পুঁজি সত্যি-সত্যিই কম মুনাফার পুঁজিনির্ভর পণ্যে উৎসাহী ছিল না) অথবা রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বিনিয়োগ ও পরিকল্পনার মাধ্যমে

মূল শিল্পবিকাশের চেষ্টা। শিল্পবিকাশ তথা সরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কঠোরভাবে অবাধনীতির মনোভাবের জন্য কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন অর্থবিভাগের সদস্য গ্রিগ প্রমুখ ব্রিটিশ কর্মচারীরা ; আর অন্যদিকে, ১৯৩৪-এই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ডাক দেন মাইশোরের প্রাক্তন দেওয়ান এম বিশ্বেশ্বরায়া। পরবর্তী ঘটনাধারা থেকে বারবার দেখা যাবে যে, একটি অর্ধোন্নত দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে যে-সব অংশের দূরদৃষ্টি বেশি, তারা তাদের নিজেদের বিকাশের অনুকূল একটি পরিকাঠামো সৃষ্টির জন্যে মূল শিল্পে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, পরিকল্পনা ও সরকারি বিনিয়োগের রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপ মেনে নিতে যথেষ্টই তৈরি থাকে। এমনকি, সমাজবাদ বলতে যতদিন-না বৈপ্লবিক পন্থায় আগাগোড়া রাষ্ট্রীয়করণ বোঝায়—ততদিন 'সমাজবাদী' বাক্যাংশটা মানতেও তারা রাজি। তাই সুভাষের উদ্যোগে, নেহরুর পরিচালনায়, অক্টোবর ১৯৩৮-এ যে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (এন পি সি) শুরু হয়, ভারতীয় ব্যবসাদাররা তাকে সাগ্রহে মেনে নিয়েছিলেন। কংগ্রেসি শ্রমমন্ত্রীদের যে সম্মিলনে এন পি সি গঠন করা হয়েছিল, সেখানে বিড়লা, লালা শ্রীরাম ও বিশ্বেশ্বরায়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। এন পি সি-র তৈরি ২৯টি উপ-সমিতিতে ব্যবসাদারদের প্রতিনিধিরা ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। নেহরু তাঁর তরফে স্বীকার করেন যে, 'অন্তত পথান্তরের সূচনাক্ষেত্র হিসেবেও বর্তমান কাঠামোর অনেকটাই' মেনে নেওয়ার প্রয়োজন আছে (১৩ মে ১৯৩৯-এ কে টি শাহ্-কে লেখা চিঠি, মার্কোভিট্স, পৃ. ২৩৬)। 'সমাজবাদী ধাঁচের পরিকল্পিত কাঠামো', বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ওপর নিয়ন্ত্রণ—এসব কথায় ভারতীয় পুঁজিপতিরা খুব বেশি দুশ্চিন্তিত হলেন না; কারণ তাঁরা কংগ্রেসকে বিচার করতেন তার মন্ত্রীদের বেশ অ-সমাজবাদী কাজকর্ম দিয়েই। ১৯৩৮-৩৯ থেকেই তাই নতুন ও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক পুনর্বিন্যাসের লক্ষণ দেখা গেল। প্যাটেল, রাজাজী প্রমুখ গান্ধী-অনুসারী 'দক্ষিণপন্থী'দের সঙ্গে ভারতীয় পুঁজিপতিরা তো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছিলেনই, সেইসঙ্গে কংগ্রেস 'বামপন্থী'দের বিভিন্ন শাখার সঙ্গেও তাঁরা দহরম-মহরম শুরু করলেন। গান্ধীপন্থা যে গ্রামীণ সরলতা ও হস্তশিল্প নিয়ে আসতে চাইছিল, তার চেয়ে নেহরুর আধুনিক শিল্পায়িত ভারতের স্বপ্ন তো বুর্জোয়া আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অনেক খাপ খেত। আরও একটা ব্যাপার ইতোমধ্যেই ভালোভাবে বোঝা গিয়েছিল : নেহরুর সমাজবাদী ঠাটকে চমৎকার বাগ মানানো যায়।

কংগ্রেস ও শ্রমিকরা

বুর্জোয়াদের সঙ্গে বনিবনার ফলে স্বভাবতই শ্রমিকদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব গেল পাল্টে। জননির্বাচিত মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ায় শ্রমিকদের সংগঠন ও জঙ্গীপনা গোড়ায় চাঙ্গা হয়ে উঠল। ১৯৩৭-এর তুলনায় ১৯৩৮-এ ট্রেড ইউনিয়নের সদস্যসংখ্যা বেড়ে গেল ৫০%। আর, এ আই টি ইউ সি ও নরমপন্থী এন এফ টি ইউ কাছাকাছি আসায় শ্রমিক ঐক্যও হলো শক্তিশালী। এপ্রিল ১৯৩৮-এ সংগঠনদুটি নাগপুরে যৌথ অধিবেশন করে। এই সময়ে যেসব প্রধান শিল্প-বিরোধ হয়, তার মধ্যে পড়ে : বাঙলার চটকলগুলিতে বিরাট সাধারণ ধর্মঘট (মার্চ-মে ১৯৩৭), কানপুরের সুতোকলে পরের পর কাজ বন্ধ, অমৃতসর, আহ্‌মেদাবাদ ও বিশেষ করে মাদ্রাজ প্রদেশে (যেখানে ১৯৩৮ সালে ধর্মঘটে জড়িত শ্রমিকদের সংখ্যা বোম্বাইকেও ছাড়িয়ে

গিয়েছিল), বস্ত্রশিল্পে ধর্মঘট, ১৯৩৮ সালে মার্টিন বার্ন-এর কুলটি ও হীরাপুর লোহা ও ইস্পাত শিল্পে ধর্মঘট, আর আসামের ডিগবয় তেল কারখানার ছ-মাস ধরে শ্রমিকদের তীব্র ধর্মঘট (এপ্রিল-অক্টোবর ১৯৩৯)। শ্রমিক-শ্রেণীকে সমবেত করার কিছু কিছু চেষ্টা কংগ্রেস চালাচ্ছিল। যেমন, অক্টোবর ১৯৩৭-এ কলকাতায় এক বিরাট শ্রমিক সমাবেশে জওহরলাল ও সুভাষ শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ, সংগঠিত হওয়ার ও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলানো'র আবেদন জানান। আর ১৯৩৮-এ প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জে বি কৃপালনী প্রমুখ নেতারা গঠন করেন হিন্দুস্তান মজদুর সভা। তা হলেও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের বড় অংশটাই রয়ে গেল উদারপন্থী বা বামপন্থী (অধিকাংশই কমিউনিস্ট) নেতৃত্বের অধীনে। নভেম্বর ১৯৩৭-এ আহ্মেদাবাদের বস্ত্রশিল্প ধর্মঘট থেকে দেখা গেল, এমনকি সেই পুরোনো গান্ধী-সমর্থক ঘাঁটিতেও খানিক কমিউনিস্ট অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

(কংগ্রেস) কার্যনির্বাহী কমিটি বাঙলার চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে সংহতি জানায় (এপ্রিল ১৯৩৭), আর বাঙলার ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ও পাঞ্জাবের সিকিন্দর হায়াত খান-এর ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভা যেসব পীড়নমূলক ব্যবস্থা নিয়েছিল তার নিন্দা করে। কংগ্রেসি মন্ত্রিসভাগুলি গোড়ায় মালিকদের চেয়ে শ্রমিকদেরই পক্ষ নেয়। অচিরেই তাদের কিন্তু পুঁজিবাদীদের জোরদার চাপের মুখে পড়তে হয়। বিড়লা অভিযোগ করেন, কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলোয় চূড়ান্ত 'বিশৃঙ্খলা' চলছে (মহাদেব দেশাইকে লেখা চিঠি, ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৩৭, *ইন দি স্যাডো অফ দি মহাত্মা*, পৃ. ২২৭), আর কংগ্রেস-শাসিত বোম্বাই ও যুক্ত প্রদেশ থেকে দেশীয় রাজ্যে পুঁজি স্থানান্তরের ভয়ও ছিল। রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলিতে কোনো শ্রম-আইন ছিল না বললেই চলে। বুর্জোয়াদের তুষ্ট করতে ও কমিউনিস্টদের সবচেয়ে শক্ত ঘাঁটিতে শ্রমিক বিক্ষোভ বাগে আনতে কংগ্রেস যে আগ্রহী ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় বোম্বাই শ্রমবিবাদ আইন (নভেম্বর ১৯৩৮)-এর অত্যন্ত কঠোর প্রবিধানগুলিতে। বোম্বাই-এর লাট লামলি এই আইনটিকে বলেছিলেন 'তোফা'। প্রবর সমিতিতে আলোচনা না করেই দু-মাসের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে এটি পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। এতে চাপানো হয় বাধ্যতামূলক সালিশি, বেআইনি ধর্মঘটের জন্যে ছ-মাস কারাদণ্ড (অথচ লক-আউট বাবদে ঐ ধরনের কোনো শাস্তি ছিল না), আর ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন বিষয়ে নতুন বিধি। যে সব ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত নয় তাদের অবস্থা তাতে খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। আহ্মেদাবাদের গান্ধীপন্থী শ্রমিক নেতারা (গুলজারিলাল নন্দ ও কুন্দনভাই দেশাই) ছাড়া, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সবাই এই আইনের বিরোধিতা করলেন, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন মুসলিম লীগ সমেত বেশিরভাগ অ-কংগ্রেসি দল। ৬ নভেম্বর বোম্বাই-এ একটি প্রতিবাদ-জমায়েতে ৮০,০০০ লোক যোগ দেন। সেখানে ভাষণ দিয়েছিলেন ডাঙ্গে, ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ও আম্বেডকর। পরের দিন সারা প্রদেশে অংশত সফল এক সাধারণ ধর্মঘট হয়। ১৯৩৯-এ ডিগবয়ে ব্রিটিশ মালিকানাধীন আসাম তেল কম্পানির বিরুদ্ধে ধর্মঘটের সময়ে কংগ্রেস আনুষ্ঠানিক সহানুভূতি জানায়। কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের আমলা যে-রোয়েদাদ দিয়েছিলেন, এন সি বরদোলৈ মন্ত্রিসভা তা প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়—তাতেই ঐ সহানুভূতির পাল্লা অনেকটা হালকা হয়ে গিয়েছিল। আর অক্টোবরে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ধর্মঘট ভাঙার জন্যে নবপ্রবর্তিত যুদ্ধকালীন ভারত রক্ষা আইন

অবাধে ব্যবহার করতে দেয়। কৌতূহলের বিষয় এই যে, শুধু নিবন্ধন বিষয়ক ধারাটির কিছু সমালোচনা ছাড়া, নেহরুর মনে হয়েছিল, বোম্বাই আইনটি 'মোটের ওপর...ভালোই' (মার্কোভিট্স, পৃ. ২১৮)। আর কংগ্রেসের বামপন্থী সভাপতি সুভাষ ব্যক্তিগতভাবে প্যাটেলের কাছে কিছু প্রতিবাদ করলেও, এটিকে প্রকাশ্য সম্পর্কচ্ছেদের বিষয় করতে রাজি হন নি। (নেহরুকে সুভাষ, ২৯ মার্চ ১৯৩৯, *এ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স*, পৃ. ৩৪১)

কংগ্রেস ও কিসান

কংগ্রেস যে দাবি করত তারা মূলত কিসানদেরই একটি দল সেটা অযৌক্তিক নয়। তাই খানিক ভূমিসংস্কারমূলক ব্যবস্থা নিতে তারা বাধ্য ছিল। বেশির ভাগ কংগ্রেসশাসিত প্রদেশে সুদের হার বেঁধে দিয়ে ঋণভার কমানোর চেষ্টা করা হয়। অবধের বিধিবদ্ধ রায়তদের উন্নীত করা হয় বংশানুক্রমিক দখলি স্বত্বধারী রায়তের স্তরে। যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে বাখস্ত জমিতে বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হয় ও খাজনা কিছুটা কমানো হয়। মন্দার সময়ে 'পরের প্রদেশটিকে' (বিহারে) যেসব রায়তকে ঐ জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল, তা 'অংশত ফিরিয়ে দেওয়া হয়', আর বোম্বাই-এর 'রায়তওয়ারি' জমি-মালিকদের 'খোটি' অধীনস্থ-রায়তদের দেওয়া হয় কিছু কিছু অধিকার। বোম্বাই ও মাদ্রাজে গো-চারণ শুল্ক যথাক্রমে অবলোপ ও হ্রাসের ফলে অরণ্য 'সত্যাগ্রহ' অংশত সফল হলো। কুপল্যান্ড মনে করেন, কংগ্রেসের ভূমি সংক্রান্ত আইনের প্রধান গুণ হলো 'ভূস্বামীদের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে এটি অসহ্য রকমের কঠোর নয়—কংগ্রেসের নীতিকে প্রায় রক্ষণশীলই বলা যায়' (পৃ. ১৪০, ১৭৮)। যে দুটি প্রস্তাবকে তিনি সত্যিই র‍্যাডিকাল বলে মনে করেছেন তার মধ্যে একটি হলো মাদ্রাজের প্রকাশম কমিটির সুপারিশ, যাতে 'রায়তি' মালিকানা ও 'জমিনদারি' এলাকায় ১৮০২-এর স্তরে খাজনা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সে সুপারিশ অবশ্য অচিরেই শিকেয় তুলে রাখা হয়। অন্যটি হলো ওড়িশার একটি আইন। তাতে জমিনদারি খাজনা ধার্য করা হয় সংলগ্ন রায়তওয়ারি এলাকার রাজস্বের চেয়ে মাত্র ১২$\frac{১}{২}$% বেশি। লাট অবশ্য এতে ভেটো দেন—আর কংগ্রেসও এই প্রশ্নে তাঁর পদত্যাগ দাবি করে নি। এমনকি ফৈজপুর অধিবেশনেও যেসব নরমপন্থী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল কংগ্রেসি আইন ছিল তার চেয়েও নরম। ১৯৩৬ ও ১৯৩৭-এ যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি জমিনদারি অবলোপের পক্ষে যেসব প্রস্তাব নিয়েছিল, কংগ্রেস দল একবার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গেই তা ভুলে যাওয়া হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৩৭-এ জমিনদাররা 'আইন অমান্য'-এর ভয় দেখালে, বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিসভা তাদের বায়তি বিলকে যথেষ্ট জোলো করে দেয়, এর তিনমাস পরে পাটনায় ভূস্বামীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে আজাদ ও রাজেন্দ্র প্রসাদ একটি গোপন চুক্তি করেন। পরবর্তীকালে ভূস্বামীদের এক সম্মিলনে জনৈক সদস্য বিহার সরকারকে এই বলে প্রশংসা করেন যে, এটি 'যথেষ্ট বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন... বিহারের জমিনদাররা এমন কিছু কিছু ছাড় পেয়েছেন যা অন্য কোনো সরকার দিত না' (ডবলিউ হাউজার, 'দি বিহার প্রভিন্সিয়াল কিসান সভা', অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, শিকাগো ১৯৬১, পৃ. ১২১, ১২৯)। ধাঁচটা সত্যিই অ-কংগ্রেসি প্রদেশগুলোর চেয়ে আলাদা কিছু ছিল না। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা খাজনা বৃদ্ধি ও সুদের হার নিয়ন্ত্রণ করেছিল, কিন্তু জমিনদারি অবলোপের প্রশ্নটি পাঠিয়ে দেয়

ফ্লাউড কমিশন-এর কাছে। ক্ষতিপূরণ দিয়ে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণের যে সুপারিশ কমিশন করেছিল (১৯৪০) তা কার্যকর হয় অনেক দেরিতে, স্বাধীনতার পরে। পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্টরা ১৯০০-র ভূমি হস্তান্তর আইনকে জোরদার করার চেষ্টা চালায়। 'কালা কানুন' বলে তার নিন্দা করেন হিন্দু মহাসভার নেতারা, আর সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হাত না-দেওয়া অবধি স্থানীয় কংগ্রেসও।

১৯৩৭-৩৯-এর সীমিত কৃষি-সংস্কারের পেছনে ছিল প্রবল কিসান আন্দোলনের চাপ। ১৯৩৮-এ কিসান সভার সদস্য সংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে উঠল ৫ লক্ষে। তার মধ্যে শুধু বিহারেরই সদস্য ছিলেন ২৫০,০০০, তারপর পাঞ্জাবে (৭৩,০০০), যুক্তপ্রদেশে (৬০,০০০), অন্ধ্রে (৫৩,০০০) আর বাঙলায় (৩৪,০০০)। প্রায়ই চোখে-পড়ার মতো কিসান মিছিল হতো ; যেমন, বিহারের কিসানরা কংগ্রেস মন্ত্রিসভার প্রথম অধিবেশনের সময়ে মিছিল করে সোজা বিধানসভা ভবনে ঢুকে কিছুক্ষণ আসন দখল করে রাখেন। ঘনশ্যামদাস বিড়লা এতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি অভিযোগ করেন 'নিচুতলার কর্মীরা বোধহয় স্বাধীনতার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতাকে গুলিয়ে ফেলেছে' (*ইন দি স্যাডো অফ দি মহাত্মা*, পৃ. ২২৮)। এখানে-ওখানে হচ্ছিল অজস্র সংগ্রাম। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় বাঙলার বর্ধমান জেলায় সেচের জলের ওপর করের বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯৩৭) ; পূর্ববঙ্গের উত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের গারো পাহাড়ে মণি সিং-এর নেতৃত্বে হাজং জনগোষ্ঠীয় মানুষদের আন্দোলন (১৯৩৭-৩৮), যার ফলে খাজনা (টঙ্ক) কমিয়ে ফসলের অর্ধেক থেকে সিকিভাগ করা হয় ; বাখস্ত জমি ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ অবধি মুঙ্গেরে (বিহার) ভাবী কমিউনিস্ট নেতা কার্যানন্দ শর্মার নেতৃত্বে বারহাইয়া তাল বিক্ষোভ ; অন্ধ্রের কৃষ্ণা জেলায় কালিপত্তনম ও মুনাগল-এ জমিনদারির বিরুদ্ধে আন্দোলন (১৯৩৮-৩৯), এখানেও কমিউনিস্টরাও ছিলেন মুখ্য ভূমিকায় ; লয়ালপুর (পাঞ্জাব) আর সুকুর (সিন্ধু)-এ জল-কর বিরোধী আন্দোলন ; অমৃতসর ও লাহোরে রাজস্ব-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে অভিযান (সবই ১৯৩৮-৩৯-এ) ; আর ওড়িশার উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন। ১৯৩৮-এর শরৎ থেকে ১৯৩৯-এর মাঝামাঝি অবধি বিহারে খাজনা-আদায় মনে হয় প্রায় ভেঙেই পড়েছিল, আর ভূস্বামীদের ফসল বাঁচানোর জন্যে প্রায়ই সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করতে হতো। এখনকার গ্রামে গ্রামে উঠত সহজানন্দ-র জঙ্গী নারার আওয়াজ : 'লগান লেগে কৈসে/ডাণ্ডা হমারা জিন্দাবাদ' (খাজনা আদায় করবে কী করে/আমাদের লাঠি জিন্দাবাদ)। সারা ভারত কিসান সভার যে ব্যাপক মোর্চা, তার মধ্যে ক্রমেই সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা আরও সুপরিচিত হয়ে উঠছিলেন—অক্টোবর ১৯৩৭-এ কিসান সভা যে লাল ঝাণ্ডাকেই তাদের পতাকা করে নেয়, সেটা এই প্রবণতারই সূচক। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির করণকারিত্ব সম্বন্ধে মোহভঙ্গ এবং সি এস পি-র সঙ্গে যোগাযোগের ফলে, সহজানন্দ নিজেই দ্রুত এগোচ্ছিলেন বামপন্থার দিকে, তখনও পর্যন্ত সন্ন্যাসীর পোশাক গায়ে থাকলেও তিনি নাকি ১৯৩৭-এ ঘোষণা করেছিলেন, 'ধর্মের আবরণ ভাঙিয়ে দীর্ঘদিন দেশকে শোষণ করা হয়েছে, তাই এখন থেকে কিসানদের তরফে তিনি সেই ধর্মের আবরণকেই ভাঙাবেন' (হাউজার, পৃ. ৪৬)। লীগ তথা কংগ্রেসিদের একাংশ তীব্র বিরোধিতার মুখে, মুসলমান-অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের প্রাণকেন্দ্রে যে ১৯৩৮-এ সারা ভারত কিসান সভার কুমিল্লা সম্মিলন খুবই সফল হয়। সেখানে গান্ধীপন্থী 'শ্রেণী সমঝওতা'র নিন্দা করা হয়, 'কৃষিবিপ্লব'কেই ঘোষণা করা হয় চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে, আর

শোনা হয় জমিনদারদের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে 'ডাণ্ডা' ব্যবহারের পক্ষে সহজানন্দ-র আবেগ-ভরা সওয়াল।

মাঝে-মধ্যেই ভূমিহীন কৃষকদের সঙ্গে ঐক্যের ডাক দেওয়া হলেও (যেমন দেওয়া হয়েছিল এপ্রিল ১৯৩৯-এ গয়া সম্মিলনে), কিসান সভা মূলত ছিল সেইসব চাষীদেরই সংগঠন, ছোটো জোতদার বা রায়ত হিসেবে যাঁদের অন্তত কিছু জমি আছে। বিহার কিসান সভার নেতাদের—এমনকি কর্মীদের মধ্যেও—প্রধান ছিলেন ভূমিহাররা, হরিজন বা জনগোষ্ঠীয় খেতমজুররা নন, ফ্লাউড কমিশন-এর কাছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিসান সভার স্মারকলিপিতে জমিনদারি অবলোপের ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়, কিন্তু বর্গাদার (ভাগচাষী)-দের জন্যে কোনো নির্দিষ্ট দাবি তোলা হয় নি। অন্ধ্রে প্রথমদিকে কিসান সভার (তথা কমিউনিস্টদের) ভিত ছিল কৃষ্ণা-গোদাবরী ব-দ্বীপের মোটামুটিভাবে সচ্ছল কাম্মা চাষীদের মধ্যে। আর পাঞ্জাবে সব কিসান আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়েছিল প্রায় পুরোপুরিই রাজস্ব-বৃদ্ধি ও সেচ-কর ইত্যাদিতে।

কিসান সভার জঙ্গীপনার বিরুদ্ধে কংগ্রেস মন্ত্রী ও নেতাদের মনোভাব ক্রমেই আরও বিরূপ হয়ে উঠল। ১৯৩৭-এর শেষে সহজানন্দ-র সভায় কংগ্রেসিদের যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিল চম্পারণ, সারণ ও মুঙ্গের জেলা কমিটি। কংগ্রেস-শাসিত বিহার, যুক্তপ্রদেশ, ওড়িশা ও মাদ্রাজে পুলিশ চৌকি ও ১৪৪ ধারা চালু করা হলো যথেচ্ছ। 'ডাণ্ডা'র পক্ষে সহজানন্দের প্রচার নিয়ে খুব হৈ-চৈ হলো, কারণ তা নাকি অহিংসার প্রত্যয়ের বিরুদ্ধে যায়। আর বিশেষভাবে কিসান সভা বিক্ষোভের সূত্রেই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ 'শ্রেণীযুদ্ধ'-র নিন্দা করল এ আই সি সি। এসবই ঘটে যখন প্রথমে নেহরু ও পরে সুভাষ আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতা। কুপল্যান্ড মন্তব্য করেছেন, পার্শ্ববর্তী বিহারের চেয়ে যুক্তপ্রদেশে কৃষিক্ষেত্রের উত্তেজনা যে কম ছিল তার কারণ 'খাজনা দেওয়ার ব্যাপারে...পণ্ডিত নেহরু' মন্ত্রিসভাকে 'মূল্যবান সমর্থন' জানান (পৃ. ১২৭)। যেমন, ২৩ এপ্রিল ১৯৩৮-এ নেহরু এলাহাবাদের কিসানদের উপদেশ দেন : তাঁরা যেন কংগ্রেস মন্ত্রিসভার নির্বিঘ্নে কাজ করায় বাধা না দেন। আর সেপ্টেম্বর ১৯২৮-এর প্রস্তাব (এটি আনেন ভুলাভাই দেশাই আর জোরদার সমর্থন করে গান্ধী) নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ কোনো প্রশ্নই তোলেন নি। পরের বছরই গান্ধীর সঙ্গে তাঁর যে বিচ্ছেদ ঘটে, সেটা কিন্তু শুধু সভাপতি হিসেবে তাঁর নিজের পুনর্নির্বাচন নিয়ে।

দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন

১৯৩৭ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে জাতীয় আন্দোলনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি হয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে। এগুলি ছিল স্বৈরতন্ত্র তথা যথেচ্ছ সামন্ততান্ত্রিক শোষণের ঘাঁটি। ব্রিটিশ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা থেকে ক্রমেই আরও বেশি করে দেখা যাচ্ছিল, ভারতকে খণ্ডিত ও অধীন রাখার প্রয়াসে এরাই সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সহায়। জাতীয় আন্দোলনের অন্যান্য বহু পর্যায়ের মতোই, এক্ষেত্রেও সত্যিকারে উদ্যোগ এসেছিল তলা থেকে, ওপরের কোনো নেতা বা সংগঠনের তরফ থেকে নয় ; সম্পাদক বলবন্তরায় মেহতার নেতৃত্বে সারা ভারত দেশীয় রাজ্য প্রজামণ্ডল আরও সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মূলত এটি ছিল মধ্য শ্রেণীর রাজনীতিবিদ্‌দের মাঝে-মধ্যে মেলবার জায়গা। নাগরিক অধিকার আর দায়িত্বশীল সরকারই ছিল তাঁদের বিবেচ্য, আর কৃষক বা

জনগোষ্ঠী-সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা তো প্রায় উঠতই না। সমস্ত রাজ্যকে (ভারতের সঙ্গে) এক করে দেওয়ার দাবিও তারা তোলে নি। ১৯৩৯-এ লুধিয়ানা অধিবেশনে (সভাপতি ছিলেন নেহরু) শুধু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল যে, নিতান্তই ছোটো যেসব রাজ্যের টিকে থাকা দুষ্কর, তারা প্রতিবেশী প্রদেশের সঙ্গে মিশে যেতে পারে। কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীরা, তাঁদের দিক থেকে, হস্তক্ষেপ না-করার পুরনো নীতিকেই আঁকড়ে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালালেন। গান্ধী নিজেই প্রথম দিকে এ বিষয়ে ছিলেন ব্যতিক্রমী রকমের অনড়। অক্টোবর ১৯৩৭-এ এ আই সি সি-র প্রস্তাবে মাইশোর গণ-সংগ্রামকে 'সর্বতোভাবে সহায়তা ও উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহ ও ব্রিটিশ ভারতের জনগণের কাছে আবেদন জানানো হয়। গান্ধী খোলাখুলিই ঐ প্রস্তাবের ব্যাপারে তাঁর অসন্তোষের কথা জানান। হরিপুরা অধিবেশনে (ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮)-এ একটি আপস প্রস্তাবে এই প্রথম ঘোষণা করা হলো যে, পূর্ণ স্বরাজের ধারণার মধ্যে ব্রিটিশ ভারতের মতোই দেশীয় রাজ্যগুলিও থাকবে। কিন্তু জোর দিয়ে বলা হলো : 'বর্তমানে' দেশীয় প্রজামণ্ডল আন্দোলনের প্রতি কংগ্রেস শুধু 'নৈতিক সমর্থন ও সহানুভূতি'ই জানাতে পারে, কিন্তু কখনোই কংগ্রেসের নামে আন্দোলন পরিচালনা করা চলবে না। কয়েক মাস পরে গান্ধী আভাস দেন যে, রাজন্যবর্গ যদি কিছুটা নাগরিক অধিকার ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা মঞ্জুর করেন আর তাঁদের রাজন্য ভাতা কমান, তাহলেই তিনি খুশি থাকবেন—সংযুক্তির কথা দূরস্থান, এমনকি দায়িত্বশীল সরকারের দাবিও তোলা হলো না (আর এল হাণ্ডা, *এ হিস্ট্রি অফ ফ্রিডম স্ট্রাগ্‌ল ইন প্রিন্সলি স্টেটস্* , নয়া দিল্লী, ১৯৬৮, পৃ. ১১৬-১৭)।

১৯৩৯-এর গোড়া থেকে কার্যত ভারতের সব দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তারই সূত্রে গান্ধী সেই প্রথম ঠিক করেন যে, তাঁর বিশিষ্ট নিয়ন্ত্রিত জন-সংগ্রামের কৌশল কোনো দেশীয় রাজ্যে পরখ করে দেখতে হবে। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী, রইস ব্যবসায়ী যমুনালাল বাজাজকে তিনি জয়পুরে এক সত্যাগ্রহ চালানোর অনুমতি দেন ; আর নিজে বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে একযোগে, রাজকোটের আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে হস্তক্ষেপ করেন। ইউ এন ঢেবর-এর নেতৃত্বে রাজকোটের এই আন্দোলন শুরু করেছিল স্থানীয় প্রজা পরিষদ। জনসাধারণের কাছে অতীব অপ্রিয় রাজকোটের দেওয়ান বিরাওয়ালা এমন অজস্র একচেটিয়া কারবার চাপিয়ে দিয়েছিলেন যা স্থানীয় ব্যবসাদারদের পছন্দ হয়নি। পূর্বগঠিত এক নির্বাচিত উপদেশক পরিষদের অধিবেশন ডাকাও তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর রাজস্বের প্রায় অর্ধেকই খেয়ে নিত রাজকোটের শাসকের রাজন্য-ভাতা। গান্ধীর রাজকোটকেই বেছে নেওয়াটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই ছোট রাজ্যটি ছিল গুজরাটের শক্ত গান্ধীপন্থী ঘাঁটি দিয়ে ঘেরা। এর জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাস করত রাজধানীতে, তাই কৃষিক্ষেত্রের র‍্যাডিকাল পন্থা যে কঠোরভাবে অহিংস সত্যাগ্রহকে ডুবিয়ে দেবে, এমন বিপদের সম্ভাবনাও ছিল কম। ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯-এ গ্রেপ্তার বরণ করেন কস্তুরবা গান্ধী ও মনিবেন প্যাটেল, আর গান্ধী নিজে রাজকোটে গিয়ে অনশন শুরু করেন ৩রা মার্চ—ঠিক ত্রিপুরী কংগ্রেসের মুখে, যেখানে সুভাষের পুনর্নির্বাচন নিয়ে তাঁর নিজের নেতৃত্বই গুরুতর চ্যালেঞ্জ-এর মুখে পড়ে। রাজকোটে হস্তক্ষেপ অবশ্য গান্ধীর অন্যতম ব্যর্থ উদ্যোগ বলেই প্রমাণ হয়। কারণ, বিরাওয়ালা একটা পর্যায়ে যেসব সুযোগ-সুবিধে দিতে চাইছিলেন, তা ফিরিয়ে নেওয়ার জন্যে ব্রিটিশ রাজনৈতিক বিভাগ তাঁকে প্ররোচিত করে,

আর প্রস্তাবিত সংস্কার কমিটিতে আরও বেশি আসনের জন্যে মুসলমান ও অস্পৃশ্যদের দাবিকে সুকৌশলে ইন্ধন জোগায়। যে ১৯৩৯-এ গান্ধী নিজেই রাজকোটের ব্যাপার থেকে মাথা নিচু করে বেরিয়ে আসেন আর ঘোষণা করেন যে, তাঁর নিজের অনশনই ছিল পীড়নমূলক প্রকৃতির, তাই যথেষ্ট অহিংস নয়।

ইতোমধ্যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির অন্যান্য বহু অংশে আরও অনেক বেশি লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলন গড়ে উঠছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মাইশোর, হায়দরাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর ও ওড়িশা-র রাজ্যগুলি। (এ ছাড়াও ছিল রাজপুতনার কোনো কোনো অংশ এবং পাঞ্জাবের পাতিয়ালা, কলসিয়া, কাপুরথালা ও সিরমোর রাজ্য)।

মাইশোরে গান্ধীপন্থী নিয়ন্ত্রণ ছিল বেশ দৃঢ়। সেখানে, অক্টোবর ১৯৩৭-এ কে টি ভাষ্যম-এর রাজ্য কংগ্রেস কে সি রেড্ডি ও এইচ সি দাসাপ্পা-র নেতৃত্বাধীন পিপলস্ ফেডারেশন-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের সমর্থন জানায়। রাজ্য কংগ্রেস গোড়ার দিকে ছিল শহরবাসী ব্রাহ্মণ বৃত্তিজীবী-ভিত্তিক, আর ফেডারেশন ছিল অব্রাহ্মণ গ্রামীণ ভূস্বামীদের। কংগ্রেসকে আইনি করা ও দায়িত্বশীল সরকারের দাবিতে অক্টোবর ১৯৩৭-এ শুরু হয় আন্দোলনের প্রথম দফা। ১১ এপ্রিল ১৯৩৮-এ, আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্বে কোলার জেলার বিদুরসোয়াথা গ্রামে রক্তগঙ্গা বয়ে যায়। সেখানে ১০,০০০ জনতার ওপর গুলি চালানোর ফলে মারা যান ৩০ জন। পরের মাসে দেওয়ান মির্জা ইসমাইলের সঙ্গে প্যাটেল একটি সন্ধি-চুক্তি করেন, যাতে কংগ্রেস আইনি হয়। কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ সংবিধান সংশোধনের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে শুরু হয় আর-এক দফা আইন অমান্য। নিয়ন্ত্রিত গণ-আন্দোলনের যোগ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্ণাটক অঞ্চলে দলকে মজবুত করে গড়ে তোলে। দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খানিক অস্বাভাবিক, ১৯৪৭-উত্তর রাজনীতিতে প্রায়ই যেমন দেখা গেছে।

ওড়িশার আরও পশ্চাৎপদ, আরও অন্তর্বর্তী রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে বেগার-শ্রম, বনজ উৎপাদনের ওপর কর, উৎসব উপলক্ষ্যে জোর করে 'উপহার' আদায় বা রায়তি-র অধিকার ইত্যাদি প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই রাজনৈতিক সংস্কারের দাবির মতোই, বা তার চেয়েও বেশি, গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ সি এস পি নেতা নবকৃষ্ণ চৌধুরীর নেতৃত্বে ঢেঙ্কানলে শুরু হয় সত্যাগ্রহ। নীলগিরি, নয়াগড়, তালচের ও রণপুরে গড়ে ওঠে শক্তিশালী আন্দোলন। হানাহানির ঘটনা ঘটে অজস্র। রাজাদের অস্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তীর-ধনুক নিয়ে লড়াই চালিয়ে যান। তালচের থেকে হাজার-হাজার লোক কংগ্রেস-শাসিত ওড়িশার অনগুল ও কোশলে পালিয়ে আসেন। আর ৫ জানুয়ারি ১৯৩৯-এ রণপুরের ব্রিটিশ রাজনৈতিক এজেন্ট মেজর বারজেলগেট রাজপ্রাসাদের সামনে জনতার ওপর গুলি চালালে তাঁকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়। ঢেঙ্কানল ও তালচেরে যৎসামান্য রাজনৈতিক সংস্কারের বদলে ওড়িশার আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন গান্ধী। ওড়িশার সব গান্ধীপন্থী (যাদের নেতা ছিলেন গোপবন্ধু চৌধুরী) আর সোশালিস্ট ও কমিউনিস্টদের মধ্যে এই প্রশ্নটি বিরোধের বিষয় হয়ে ওঠে। এদেশে কিসান সভার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তাঁরাই।

বৃহত্তম রাজন্যশাসিত রাজ্য হায়দরাবাদে মুসলমান শিরোমণিদের একটি ছোটো গোষ্ঠী ৯০% সরকারি চাকরি কুক্ষিগত করে রেখেছিল। আর ঐ রাজ্যে সরকারি ভাষা তথা শিক্ষার

একমাত্র মাধ্যম হিসেবে রাখা হয়েছিল উর্দুকে। অথচ সেখানে ৫০% ছিল তেলুগু, ২৫% মারাঠি ও ১১% কন্নড়-ভাষী। বুনিয়াদি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারও একেবারেই ছিল না, আর তেলেঙ্গানা অঞ্চলে চলত অত্যন্ত স্থূল ধরনের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, যেমন 'ভেট্টি' বা বেগার-শ্রম এবং জিনিসে খাজনা দিতে বাধ্য থাকা ইত্যাদি। গোড়ায় গণজাগরণ মধ্য শ্রেণীর ভাষা-ভিত্তিক সাংস্কৃতিক সমিতির রূপ নিয়েছিল—তেলেঙ্গানায় অন্ধ্র মহাসভা ও মারাঠাওয়াড়ায় মহারাষ্ট্র পরিষদ্। এঁরা কিঞ্চিৎ রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য আবেদন-নিবেদন করতেন। কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ না-করা নীতির ফলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি—আর্যসমাজ ও হিন্দু মহাসভা—নিজামের স্বৈরাচার ও ইত্তাহাদ-উল-মুসলমান-এর বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর সুযোগ পেয়ে গেল—এমনকি যখন হিন্দু রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা 'দায়িত্বশীল সরকারের আপাত ন্যায্য স্লোগান' তুলে কংগ্রেসি হস্তক্ষেপের নিন্দা করছিল (নাগপুর অধিবেশন, ডিসেম্বর ১৯৩৮)। অক্টোবর ১৯৩৮-এ, আর্যসমাজের নেতা পণ্ডিত নরেন্দ্রজী হায়দরাবাদ শহর ও মারাঠাওয়াড়া অঞ্চলে (মধ্যপ্রদেশ-সংলগ্ন মারাঠিভাষী কয়েকটি জেলা, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এক শক্ত ঘাঁটি) পুরোপুরি হিন্দু সত্যাগ্রহ শুরু করেন। তার দাবি ছিল হিন্দুদের জন্যে আরও চাকরি। প্রায় একই সময়ে ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে স্থাপিত হয় রাজ্য কংগ্রেস। তার উদ্যোক্তা ছিলেন মারাঠাওয়াড়া-র স্বামী রামানন্দ তীর্থ ও গোবিন্দদাস শ্রফ, তেলেঙ্গানার রবি নারায়ণ রেড্ডি, আর সিরাজুল হাসান তিরমিজি প্রমুখ হায়দরাবাদ শহরের কয়েকজন মুসলমান। ২৪ অক্টোবর ১৯৩৮ থেকে রাজ্য কংগ্রেস শুরু করল পাশাপাশি আরও ফলদায়ক সত্যাগ্রহ। তাদের দাবি ছিল নিজেদের সংগঠনের আইনি স্বীকৃতি ও দায়িত্বশীল সরকার। ওসমানিয়ার ছাত্রদের মধ্যেও গড়ে উঠছিল শক্তিশালী 'বন্দে মাতরম্' আন্দোলন। নিজাম ঐ দেশাত্মবোধক গানটি গাওয়া নিষিদ্ধ করলে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। গান্ধীর চাপাচাপিতে কংগ্রেসের আন্দোলন অবশ্য ডিসেম্বর ১৯৩৮-এ তুলে নেওয়া হয়। বাইরে বলা হয়েছিল তার কারণ নাকি এই যে, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে এটি গুলিয়ে যেতে পারে। রামানন্দ তীর্থ পরে স্বীকার করেছেন, 'আমরা এই সিদ্ধান্তের ঔচিত্য বুঝতে পারি নি' (*মেমোয়ার্স অফ হায়দরাবাদ ফ্রিডম স্ট্রাগল,* বোম্বাই, ১৯৬৭, পৃ. ১০৭)। অচিরেই 'অন্ধ্রের যে সব কর্মী নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের সেরা অংশটি', (*ঐ,* পৃ. ৮৭) রবি নারায়ণ রেড্ডির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেয়। ১৯৩৯-এ গোপনে গঠিত হয় সি পি আই-এর নিজাম রাজ্য কমিটি। উপকূলবর্তী অন্ধ্রের ইতোমধ্যেই-প্রবল আন্দোলনই গোড়ায় এঁদের পথ দেখায়। অন্ধ্র মহাসভার ব্যাপক মোর্চাকে ব্যবহার করে কমিউনিস্টরা তেলেঙ্গানার গ্রামাঞ্চলে আশ্চর্য ক্ষিপ্রভাবে ঢুকে পড়ে। কয়েক বছরের মধ্যেই গড়ে ওঠে তাঁদের সেই ঘাঁটি—ভারতে এখনও অবধি দেখা বৃহত্তম কৃষক গেরিলা যুদ্ধকে (১৯৪৬-১৯৫১) যা বাঁচিয়ে রেখেছিল।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ও তার সংলগ্ন মালয়ালি জেলা মালাবার-এ জাতীয় আন্দোলনের অনেকটাই গড়ে উঠেছিল বামপন্থীদের নেতৃত্বে ও নির্দেশে। এ কে গোপালন তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন কীভাবে ১৯৩০-এর দশকের মধ্য ও শেষভাগে কৃষ্ণ পিল্লাই, ই এম এস নাম্বুদ্রিপাদ প্রমুখ কর্মীরা এবং তিনি নিজে প্রতিষ্ঠা করেন সি এস পি, এই প্রথম

একটি প্রকৃত গণসংগঠনে পরিণত করেন কংগ্রেসকে, আর একই সঙ্গে এগিয়ে চলেন কমিউনিজমের দিকে (*ইন দি কজ্ অফ দি পিপলস*, মাদ্রাজ, ১৯৭৩)। নাম্বুদ্রিপাদ শেষ অবধি কেরল প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক হন। প্রায় ১৯৪০-এর দশক অবধি এটি ছিল বামপন্থীদের নিয়ন্ত্রণে। অগাস্ট ১৯৩৮-এ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য কংগ্রেস সেখানকার দেওয়ান সি পি রামস্বামী আয়্যারের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জোরদার বিক্ষোভ শুরু করে। পাশবিক অত্যাচার (দু-মাসে ১২টি গুলিচালনার ঘটনা ঘটে) সত্ত্বেও ছাত্ররা বিপুল সংখ্যায় সত্যাগ্রহে যোগ দেন, কেরলের বিভিন্ন অংশ থেকে জাঠা আসে ত্রিবাঙ্কুরে (যার একটির নেতৃত্বে ছিলেন এ কে গোপালন) আর এইভাবেই আঞ্চলিক-ভাষাগত ঐক্য-চেতনার বিকাশে তা প্রভূত সাহায্য করে। শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকাই বিশেষ করে মনে দাগ কাটে। আলেপ্পে-র ছোবড়া শ্রমিকরা অক্টোবর ১৯৩৮-এ কৃষ্ণ পিল্লাই-এর নেতৃত্বে ধর্মঘট করেন। শুধু মজুরি বাড়ানো ও ইউনিয়নের স্বীকৃতিই নয়, রাজবন্দীদের মুক্তি ও সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকারের দাবিও ছিল। আলেপ্পে-র জঙ্গী শ্রমিকদের বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে দেওয়ান কংগ্রেস সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে দমনমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। অন্য সব জায়গার মতো এখানেও গান্ধী ও কংগ্রেস সর্বোচ্চ নেতৃত্বের ভূমিকা ছিল একই : নামমাত্র কয়েকটি ছাড় পাওয়া মাত্রই সত্যাগ্রহ তুলে নেওয়ার উপদেশ দেওয়া।

কংগ্রেসের ভেতরের বামপন্থীরা

শ্রমিক ও কিসান সংগঠন এবং রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির অভ্যুত্থানে এমন সব প্রশ্ন জড়িয়ে ছিল যে কংগ্রেসের মধ্যেই গড়ে উঠতে পেরেছিল এক ব্যাপক বাম-বিকল্প। কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ও সর্বোচ্চ নেতৃত্বের বেশির ভাগের ক্রমবর্ধমান রক্ষণশীল ধরন-ধারণের পক্ষে এটা হয়ে উঠেছিল একটা চ্যালেঞ্জ। এই পর্বের বামপন্থীদের মধ্যে ছিলেন বহু সোশ্যালিস্ট, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের অনুগামীরা (তখনও এঁরা ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন) আর বে-আইনি সি পি আই, যেটি সি এস পি-র মাধ্যমে কাজ করত। ঘটনা এই যে, সি পি আই-এর বহু যোগ্যতম গণ-নেতাই (কেরলের কৃষ্ণ পিল্লাই, নাম্বুদ্রিপাদ ও গোপালন, তামিলনাড়ু-র জীবনানন্দন, অন্ধ্রের সুন্দরাইয়া, পাঞ্জাবের সোহন সিং যোশ) এসেছিলেন সি এস পি থেকে। এই সময়কার দুই কংগ্রেস সভাপতি, নেহরু ও সুভাষ বসুর কাছ থেকে তাঁরা অনিশ্চিত ও অনেকটাই মৌখিক সমর্থনমাত্র পেতেন—তবুও এই সমর্থনকে তখনও মূল্যবান মনে করা হতো। ভেতর-ভেতর কিছু টোরাটানও ছিল। জয়প্রকাশ নারায়ণ, মিনু মাসানি, এন জি রঙ্গ প্রমুখ সোশ্যালিস্টরা ক্রমেই আরও বেশি শঙ্কিত হয়ে উঠছিলেন, কারণ, খানিকটা বেহাঁদ যে-দলকে তাঁরা নেতৃত্ব দিতেন, সেখানে দ্রুত ঢুকে পড়ছিলেন সমর্পিতপ্রাণ ও সুশৃঙ্খল কমিউনিস্ট কর্মীরা। তাঁদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না, কারণ, ১৯৩৯-৪০-এ সি এস পি-র পুরো কেরল শাখা আর তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রের বেশির ভাগ সদস্যকে নিয়ে সি পি আই বেরিয়ে যায়। তবুও মোটামুটি ১৯৩৯ অবধি, কোনো-কোনো ভাবে ১৯৪২ অবধিও, খানিকটা ব্যাপক ঐক্য রক্ষা করা গিয়েছিল। বামপন্থীদের সমস্ত অংশই একমত ছিলেন যে, কংগ্রেসের মধ্যে থাকাটা ঠিক, আর কিছু অনিবার্য সমঝওতা সত্ত্বেও, মনে হয়, এতে ভালোই লাভ হচ্ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন

ও কিসান সভাগুলিতে পরিষ্কার প্রাধান্য স্থাপিত তো হয়েইছিল ; এছাড়াও একটা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, কোনো কোনো জায়গায়—যেমন বাঙলায়—ছাত্ররা এখন আকৃষ্ট হচ্ছিলেন কোনো-না-কোনো ধরনের বামপন্থার দিকে (সন্ত্রাসবাদ অবশেষে নির্বাপিত, আর গান্ধীবাদের আবেদন ছিল সামান্যই)। ১৯৩৭-৩৮-এ বন্দীমুক্তি প্রচার-অভিযানের মধ্য দিয়ে কমিউনিস্ট-পরিচালিত সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশন-এর বাঙলা শাখা ছড়িয়ে পড়ে কলকাতা থেকে মফস্বলের স্কুল-কলেজে। এর পরেই শুরু হয় নির্বাচিত ছাত্র-সংসদের দাবিতে আন্দোলন, বয়স্কদের মধ্যে সাক্ষরতার প্রয়াস, তার সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রচার আর স্পেন ও চীনের প্রতি সংহতি জানিয়ে শোভাযাত্রা। গড়ে উঠছিল ছাত্র র‍্যাডিকালিজমের একটা ধাঁচ যা রইল অন্তত এক প্রজন্ম (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলার ছাত্র-সমাজ*, কলকাতা, ১৯৮০)।

ট্রেড ইউনিয়ন ও কিসান সভাগুলির প্রতি আরও সহানুভূতিসূচক অবস্থান নেওয়া ও দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনকে খোলাখুলি সমর্থন জানানোর জন্যে কংগ্রেস নেতৃত্বকে রাজি করাতে চেষ্টা করছিলেন গোটা বামপন্থী শক্তিই। কিন্তু খুব একটা সফল হন নি। বড়লাটের সংরক্ষিত ক্ষমতা ও দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে রাজন্যবর্গের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে এক কেন্দ্রীয় আইনসভার ভিত্তিতে ব্রিটিশরা ফেডারেশনের পরিকল্পনা করেছিল। কিছুদিন পর-পরই কংগ্রেস সে সম্বন্ধে ঘোষণা করছিল তাদের বিরোধিতা। কিন্তু বামপন্থীরা এই প্রশ্নে যে গণ-আন্দোলনের দাবি করছিলেন তাঁরা তা মানেননি, বরং সাময়িকভাবে প্রদেশগুলির মন্ত্রিত্ব পেয়েই খুশি ছিলেন।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির রক্ষণশীল কার্যধারার ব্যাপারে, নেহরু বারবারই ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে জানাচ্ছিলেন তাঁর সুগভীর অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা। এমনকি এও বলেছিলেন যে, সেগুলো 'প্রতিবিপ্লবী' আর আগের সরকারগুলির ঐতিহ্যই (সামান্য কিছু হেরফের করে) বহন করে চলেছে' (জি বি পন্থ-কে নেহরু, ২৫ নভেম্বর ১৯৩৭, *এ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স*, পৃ. ২৬৩)। কিন্তু কথার (বিশেষত অপ্রকাশ্য সন্দেহের) চেয়ে কাজটাই বড়, আর এইখানেই, আমরা বারেবারেই দেখেছি, দক্ষিণপন্থী সরণকে রুখতে নেহরু ও সুভাষ শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন।

এরই ঠিক উল্টোদিকে, আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির প্রশ্নে, সুরটা বেঁধে দিচ্ছিলেন বামপন্থীরা—জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকে তাঁরা যে অবিচল সমর্থন ও নেতৃত্ব পেয়েছিলেন, তারই সুবাদে। আসলে জওহরলাল ক্রমেই আরও বেশি করে স্বদেশে ফলপ্রসূ বামপন্থী কাজকর্মের এক ধরনের বিকল্প খুঁজছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী হাবভাবে—'আমার মনে হয়েছে আমি খানিকটা বেমানান ও বেখাপ্পা। আমার ইওরোপ চলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের ... একটা কারণ এ-ই' (গান্ধীকে লেখা চিঠি, ২৮ এপ্রিল, ১৯৩৮, *এ বাঞ্চ অফ ওল্ড লেটার্স*, পৃ. ২৮৪)। মহাযুদ্ধের মেঘ তখন জমছে। তার সূত্রে জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থীরা সাধারণভাবে একমত ছিলেন যে, এবার আর ব্রিটিশ বিদেশ-নীতিকে নিঃশর্তে সমর্থন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আবিসিনিয়া, স্পেন, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও চীনে ফ্যাসিবাদ আগ্রাসনের প্রতি চেম্বারলেন-এর তোষণই ছিল ১৯৩০-এর দশকের শেষভাগে সে বিদেশ-নীতির চরিত্রলক্ষণ। ইতোমধ্যেই, ১৯৩৮-এ পাঞ্জাবের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্টরা নারা তুলেছিলেন : 'না এক পাই, না এক ভাই'। অবশ্য সেনাবাহিনীতে ভর্তির ব্যাপারে তার খুব একটা ছাপ পড়ে নি,

কারণ পাঞ্জাবের কৃষককুলের তুলনায়-সম্পন্ন অবস্থার প্রধান ভিতই ছিল সামরিক মাইনে ও অবসর-ভাতা। ব্রিটেন আক্রমণকারীদের পরিষ্কার মদত দিচ্ছিল, আর সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাতাচ্ছিল জার্মানিকে। তখনও পর্যন্ত ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবাদ আর ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না। কংগ্রেসের সবাই বারবার ফ্যাসিবাদী আক্রমণের নিন্দা করে, মাদ্রিদ-রক্ষারত আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে সহমর্মিতা জানাতে নেহরু ১৯৩৮-এ স্পেনে যান, আর সাহায্যের জন্য চু তে-র আবেদনে সাড়া দিয়ে কংগ্রেস চীনে একটি চিকিৎসক দল পাঠায় (এই দলেরই একজন সদস্য, ডা. কোটনিশ, ভারত-চীন মৈত্রী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংহতির স্বার্থে, শহিদের মৃত্যুবরণ করেন। তিনি কমিউনিস্টদের অষ্টম রুট সেনাবাহিনীর গেরিলাদের সঙ্গে কাজ করছিলেন। রবীন্দ্রনাথও বারবার সাধারণতন্ত্রী স্পেনকে সমর্থন করতে বলেন ও চীনের ওপর জাপানি আক্রমণের নিন্দা করেন)। ফ্যাসিবাদ তথা আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের ছায়া তাঁর এই সময়কার কিছু কিছু কবিতায় এনে দিল এক নতুন সুর। কবিতাগুলির বিষয়বস্তু তথা নিরাভরণ রচনারীতিই, প্রায়-আশি বছরের মানুষটির অসামান্য পালাবদলের নির্দেশ।

ত্রিপুরীর সঙ্কট

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঐক্যমত্যের জন্যে তখনও অবধি হাবভাবে কিছু সংহতি জানানোর বেশি কার্যত কিছু দরকার পড়ত না। দেশের ভেতরকার আরও জরুরি সব সমস্যার জন্য দরকার ছিল র‍্যাডিকালপন্থা। প্রথমটি কখনোই দ্বিতীয়টির বিকল্প হতে পারে না। আর এইখানেই ১৯৩৯-এর গোড়ায় ত্রিপুরী অধিবেশনের মুখে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। সভাপতির পদে পুনর্নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন সুভাষ। এই প্রস্তাব অবশ্য প্রথমে এনেছিলেন সি এস পি-র আটজন নেতা (প্রসঙ্গত, তাঁদের সকলের সঙ্গেই কমিউনিস্টদের যোগ ছিল)। আর সুভাষও তাঁর প্রার্থীপদের সঙ্গে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন একটি র‍্যাডিকাল ডাক : স্বরাজের 'জা তী য় দা বি', যার রূপ হবে ব্রিটিশদের কাছে একটি সময়-বাঁধা চরমপত্র। তা হলেও এমন ধারণাও না-হয়ে যায় না যে, ব্যাপারটার অনেকটাই ছিল ব্যক্তিঘটিত। হরিপুরার পর সুভাষ যে কার্যনির্বাহী কমিটি মনোনীত করেছিলেন তাতে জওহরলাল ছাড়া আর একজনও বামপন্থী ছিলেন না (১৯৩৬-এ নেহরুর মনোনীত সদস্যদের মধ্যে কিন্তু ছিলেন)। আর শ্রমিক ও কিসান জঙ্গীপনার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব মন্ত্রিসভাগুলির ক্রমবর্ধমান বিরূপ ধরন-ধারণ রোধ করার কোনো চেষ্টাই তিনি করেন নি। তবুও সীতারামাইয়া নির্বাচনী মোকাবিলার সময় সমস্ত বামপন্থীরাই সুভাষের পাশে দাঁড়ালেন। তৃতীয় প্রার্থী মৌলানা আজাদ সরে দাঁড়ানোর পর, সীতারামাইয়াকেই গান্ধী তাঁর মনোনীত প্রার্থী বলে খোলাখুলি ঘোষণা করেছিলেন। ২৯ জানুয়ারি ১৯৩৯-এ সুভাষ নির্বাচিত হলেন ১৫৮০ ভোট পেয়ে, বিপক্ষে ভোট পড়েছিল ১৩৭৭। বাঙলা আর পাঞ্জাবে সুভাষ বিপুল গরিষ্ঠতা পেয়েছিলেন, আর যথেষ্ট এগিয়ে ছিলেন কেরল, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, যুক্ত প্রদেশ ও আসামে। মহারাষ্ট্র আর মহাকোশলে (মধ্যপ্রদেশ হিন্দুস্তানী) লড়াই হয়েছিল প্রায় সমানে-সমানে। সীতারামাইয়াকে মোটামুটিভাবে সব ভোট দিয়েছিল একমাত্র গুজরাট, বিহার, ওড়িশা ও অন্ধ্র।

প্রভৃত উন্নততর কৌশলে ও বামপন্থী ঐক্য না-থাকায়, আপাত চূড়ান্ত পরাজয়ের কবল থেকেও গান্ধী ও কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীরা ছিনিয়ে নিয়ে গেলেন জয়। তৎক্ষণাৎ গান্ধী ব্যাপারটাকে তাঁর ব্যক্তিগত ইজ্জতের ব্যাপার করে তুললেন। তিনি ঘোষণা করলেন, সীতারামাইয়া-র পরাজয়, 'ততটা তাঁর নয়, যতটা আমার' (৩১ জানুয়ারি)। সুভাষ প্রকাশ্যে তাঁদের সমালোচনা করেছেন—এই কারণে পুরনো কার্যনির্বাহী কমিটির ১৫ জন সদস্যের মধ্যে ১৩ জনই পদত্যাগ করলেন ২২ ফেব্রুয়ারি। এঁদের মধ্যে নেহরুও ছিলেন, অবশ্য যথারীতি তিনি দোনামনা করেন, আর তাঁর অছিলাও ছিল আলাদা। ত্রিপুরী অধিবেশনের সময় (৮-১২ মার্চ) সুভাষ অসুখে ভুগে প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছিলেন ; আর গান্ধী এসেছিলেন রাজকোটে সদ্য অনশন সেরে, যেখানে সাময়িক কিছু ছাড় অন্তত পাওয়া গিয়েছিল। দক্ষিণপন্থীরা হানা দেন গোবিন্দবল্লভ পন্থের তোলা বিখ্যাত প্রস্তাবটির মধ্যে দিয়ে। সেই প্রস্তাবে পুরনো কার্যনির্বাহী কমিটির ওপর আস্থা জানানো হয়, বিগত ২০ বছরে অনুসৃত গান্ধীপন্থী নীতিগুলোর ওপর আবার বিশ্বাস ঘোষণা করা হয়, আর 'গান্ধীজীর ইচ্ছাবলির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে' সুভাষকে তাঁর (কমিটির) নতুন সদস্য মনোনয়ন করতে বলা হয়। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে প্রস্তাবটি পাশ হয় পক্ষে ২১৮, বিপক্ষে ১৩৩ ভোটে, আর প্রকাশ্য অধিবেশনে হাত গুনে পাশ হয় সুবিশাল গরিষ্ঠতায়। নেহরুর সমর্থন অপ্রত্যাশিত নয়। গান্ধীর প্রতিই তাঁর চূড়ান্ত আনুগত্য ছাড়াও, সুভাষের সঙ্গেও তার ব্যক্তিগত সমতার সম্পর্ক কোনোদিনই ভালো ছিল না। কিন্তু সোশালিস্ট রায়পন্থী ও কমিউনিস্ট (বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙলার গুটিকয়েক সদস্য ছাড়া)-রাও পন্থ প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারলেন না, কারণ পুরোপুরি ভাঙন তাঁরা এড়াতে চেয়েছিলেন। এমনকি জা তী য় দা বি-র প্রস্তাবে অনেকখানি জল মিশিয়ে জয়প্রকাশ একটি প্রস্তাব আনেন এবং তা সমর্থন করেন নেহরু ও কমিউনিস্ট-ভরদ্বাজ। তাতে সময়-বাঁধা চরমপত্র সম্বন্ধে সুভাষের ভাবনাটি বাদ পড়ে, আর শুধু কংগ্রেসকে শক্তিশালী করে সংবিধান-রচনা পরিষদ্‌ অর্জনের উদ্দেশ্যে লড়াই-এ তৈরি হওয়ার ডাক দেওয়া হয়।

বামপন্থীদের পক্ষে বাছাই করে ওঠা ছিল দুষ্কর, কারণ সুভাষের আগের খতিয়ান এমন ছিল না যাতে নিঃশর্ত আস্থা জাগে ও সম্পূর্ণ ভাঙনের ঝুঁকি নেওয়া যায়। এমনও বলা যায় যে, বামপন্থীদের তরফে আরও মৌলিক ত্রুটি ছিল এই যে, ত্রিপুরীর আগে কিংবা পরে, কোনো সময়েই, কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-বিরোধী, কিসান-বিরোধী নীতি রুখতে তাঁরা সফল হন নি। এ-ই ছিল যুক্তফ্রন্ট বিষয়ে ধারণার পরিণাম, যে-কোনো মূল্যে কংগ্রেসের উঁচুতলার নেতাদের সঙ্গে ঐক্য রক্ষা করার বাসনা—এর সঙ্গে কার্যত কোনো কোনো সময়ে তার কোনো তফাত ছিল না। যেমন সি পি আই-এর সাধারণ সম্পাদক পি সি জোশী এপ্রিল ১৯৩৯-এ দলীয় মুখপত্র 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট'-এ যুক্তি দেখান যে, 'আজকের দিনের বৃহত্তম শ্রেণী সংগ্রাম হচ্ছে আমাদের জাতীয় সংগ্রাম', কংগ্রেসই তার 'প্রধান মুখপত্র (অর্গ্যান)'—তাই কংগ্রেস-কিসান ঐক্য রক্ষা করতেই হবে।

ইতোমধ্যেই ৩ ফেব্রুয়ারি সুভাষ ঘোষণা করেন, তিনি যদি 'ভারতের মহত্তম মানুষটির আস্থা অর্জনে' ব্যর্থ হন, তাহলে তিনি মনে করেন, তাঁর নির্বাচনী বিজয় অর্থহীন। ত্রিপুরীর পর দু-মাস ধরে তিনি একটি সর্বসম্মত কার্যনির্বাহী কমিটি গড়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু,

বিশেষভাবে বামপন্থীদের মধ্যে অনৈক্যের সূত্রে বোঝা যায়, মূলেই তাঁর অবস্থা ছিল দুর্বল। ২৯ এপ্রিল এ আই সি সি-র কলকাতা অধিবেশনে গান্ধী তাঁকে চ্যালেঞ্জ করেন, 'তুমি স্বচ্ছন্দে তোমার নিজের কমিটি তৈরি করে নিতে পারো'। সুভাষ কিন্তু সে-চ্যালেঞ্জ নিতে পারলেন না। তিনি পদত্যাগ করাই শ্রেয় মনে করলেন, আর তাঁর জায়গায় এলেন কট্টর গান্ধী-অনুসারী দক্ষিণপন্থী রাজেন্দ্র প্রসাদ। ৩ মে সুভাষ তাঁর ফরওয়ার্ড ব্লক তৈরির কথা ঘোষণা করেন। প্রথমে তিনি ভেবেছিলেন কংগ্রেসের মধ্যেই কাজ করবেন ও বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করবেন। সেই উদ্দেশ্যে জুন ১৯৩৯-এ ফরওয়ার্ড ব্লক একটি বামপন্থী সংহতি কমিটি গঠন করে। কমিউনিস্টরা একে সমর্থন করেন। কিন্তু রায়পন্থীরা ও জয়প্রকাশ প্রমুখ সোশালিস্ট নেতারা কংগ্রেসের ঐক্যকেই অগ্রাধিকার দেন। ফরওয়ার্ড ব্লক গঠনের বিষয়ে তাঁরা বিরূপ ছিলেন। শেষপর্যন্ত ফরওয়ার্ড ব্লক হয়ে ওঠে ইতোমধ্যেই ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বামেদের আর-একটি খণ্ডগোষ্ঠী। ততদিনে বাঙলায় সুভাষ অভূতপূর্ব রকমের জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন : এক আঞ্চলিক নায়ক যাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে—এই হিসেবে। অন্যত্রও তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের ছোটো ছোটো এলাকা ছিল, বিশেষত, বিহার, পাঞ্জাব, বোম্বাই ও তামিলনাড়ুতে। সর্বোচ্চ নেতৃত্ব অবশ্য কংগ্রেসের ভেতরে একটি শক্তি হিসেবে তাঁকে খতম করতে বদ্ধপরিকর ছিল। তাই এ আই সি সি-র একটি সাম্প্রতিক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ৯ জুলাই তিনি সর্বভারতীয় প্রতিবাদ দিবস ডাকলে, তৎক্ষণাৎ তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্যাটেলের আনা ঐ প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল : প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আগাম অনুমতি ছাড়া কোনো কংগ্রেসি আইন-অমান্য করতে পারবে না। ১১ জুলাই এ আই সি সি বাঙলার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি-পদ থেকে সুভাষকে সরিয়ে দেয়, আর বলে দেয়, তিন বছরের জন্যে তিনি কংগ্রেসের কোনো পদাধিকারী হতে পারবেন না। বাঙলায় কংগ্রেসের কাজকর্ম চালানোর জন্যে পরে একটি অ্যাড হক (অস্থায়ী) কমিটি গঠন করা হয়। তাতে ছিলেন মৌলানা আজাদ ও প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ গান্ধীপন্থী। আর ছিলেন একসময় সুভাষের প্রধান আর্থিক পৃষ্ঠপোষক, কলকাতার রইস লোকদের 'পঞ্চ প্রধানে'র দুজন (বিধানচন্দ্র রায় ও কিরণশঙ্কর রায়)।

সুভাষকে একেবারে তাড়িয়ে দেওয়া হলো বটে, কিন্তু বামপন্থীদের সঙ্গে পুরোপুরি ছাড়াছাড়ি করাটা সর্বোচ্চ নেতৃত্বের চোখেও আদৌ বুদ্ধিমত্তার কাজ হতো না। মন্ত্রিসভায় থাকার ফলে ভেতরকার চোরাটান বাড়ছিল আর দলের ভাবমূর্তিও ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল। তাই ১৯৩৯-এর শেষাশেষি কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় থাকাটা হয়ে উঠছিল খানিকটা প্রতিঘাতী। মন্ত্রিসভাগুলি ক্রমশই আরও বেশি করে যে-সমস্যার মুখে পড়ছিল তা হলো : একদিকে তারা শ্রমিক, কিসান তথা দলের মধ্যে সমস্ত বামপন্থীদের সঙ্গে যোগ হারিয়ে ফেলেছিল, অথচ ভূস্বামী তথা ব্যবসাদার-গোষ্ঠীগুলোকেও তারা সত্যি-সত্যিই খুশি করতে পারেনি (বোম্বাই-এর নগর-সম্পত্তির ওপর কর চাপানোর মতো ঘটনায় ব্যবসাদাররা ক্ষুব্ধ হয়েছিল, অথচ যে কঠোর আর্থিক বিধিনিষেধের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কাজ চলত তাতে এ-ই ছিল অনিবার্য)। জুলাই ১৯৩৯-এ প্যাটেল আভাস দেন যে, আয়করের ভাগ প্রদেশগুলি আরও বেশি না-পেলে সব মন্ত্রিসভাকেই পদত্যাগ করতে হতে পারে। সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও এক বিপদ হলো : তাঁদের নিজেদের কর্মীদের যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার জন্যেই কংগ্রেস মন্ত্রীদের হয়তো নতুন

আপৎকালীন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হতে পারে। তাই ২৯-৩০ অক্টোবর ১৯৩৯-এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগ ছিল যুক্তিসঙ্গত ও অনিবার্য। পদত্যাগের কারণ অবশ্য জুগিয়ে দিল লিনলিথগো-র বেকিকির একগুঁয়েমি।

১৯৩৯-১৯৪২ ঃ যুদ্ধ ও ভারতীয় রাজনীতি—প্রথম পর্ব

আমলাতান্ত্রিক প্রত্যাঘাত

জার্মানির বিরুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধ ঘোষণা করল। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ বড়লাট একতরফাভাবে ভারতকেও তার সঙ্গে জুড়ে দিলেন। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা বা কোনো ভারতীয় নেতার সঙ্গে পরামর্শ করার কথাও তিনি ভাবলেন না। ব্রিটেন নিজে এতদিন যা করেছে, তার চেয়ে কংগ্রেসের ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন-বিরোধিতা ছিল অনেক বেশি স্পষ্ট ও অবিচল। ন্যূনতম কিছু শর্ত মেনে নিলে, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় কংগ্রেসের তরফে পূর্ণ সহযোগিতার অজস্র প্রস্তাব ছিল। লিনলিথগো সে সবই নাকচ করে দিলেন। শর্তগুলি এই ঃ যুদ্ধের পর স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো স্থির করার জন্যে এক সংবিধান-রচনা পরিষদের প্রতিশ্রুতি, আর সেই মুহূর্তে কেন্দ্রে প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার জাতীয় একটা কিছু গড়ে তোলা। কংগ্রেস যথেষ্ট ন্যায্যতই বলেছিল, ১৯৩৯-এ (আর ডিসেম্বর ১৯৪১-এর জাপানি আক্রমণ অবধি) যে-যুদ্ধ ছিল অনেক দূরের ব্যাপার, তার পক্ষে ভারতীয় জনমতকে যদি সত্যি-সত্যিই সংগঠিত করতে হয়, তাহলে ঐ ধরনের শর্তপূরণ না-করলেই নয়। এই যুদ্ধ স্বৈরাচার ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ও জাতিসমূহের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ নীতির লড়াই—মিত্রশক্তির এই প্রচার নইলে একেবারেই ফাঁপা বলে মনে হতে বাধ্য। ১৭ অক্টোবর ১৯৩৯-এ লিনলিথগো-র বিবৃতিতে শুধু এক অনির্দিষ্ট ও, ধরেই নেওয়া যায় সুদূর ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ন মর্যাদার পুরনো প্রস্তাবেরই পুনরুক্তি করা হয় ; আর গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংবিধান-রচনা পরিষদের কথা না-বলে, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, যুদ্ধের পরে, ১৯৩৫-এর আইন রদবদলের জন্য 'কয়েকটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় বসা হবে'। সেইসঙ্গে তখনকার মতো ভারতীয় রাজনীতিবিদ্ ও রাজন্য-প্রতিনিধিদের নিয়ে একেবারেই পরামর্শকারী একটি গোষ্ঠী গঠন করা হবে, যাদের হাতে সত্যিকারের কোনো কার্যনির্বাহী ক্ষমতাই থাকবে না। 'কংগ্রেসের পেছনে' না 'ছুটে' 'এখন গা এলিয়ে থাকার' বাসনাটি বড়লাট বারবারই একান্তে ব্যক্ত করেন (ভারত-সচিব জেটল্যান্ডকে লিনলিথগো, ৩ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪০)।

১৯৩৭ বা তার আগে থেকে শ্বেতাঙ্গপ্রধান কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাকুল কংগ্রেসের কাছে যে-জমি হারিয়েছিল, যুদ্ধের মওকায় তা ফিরিয়ে নেওয়াই ছিল সাধারণভাবে ব্রিটিশদের নীতি। লিনলিথগো-র মনোভাবও এই নীতিরই অংশবিশেষ, তা থেকে কোনো বিচ্যুতি নয়। এমনকি যুদ্ধ ঘোষণার আগেই, ১৯৩৫-এর আইনের একটি সংশোধনী ব্রিটিশ সংসদে তাড়াহুড়ো করে পাশ করানো হয়। তাতে প্রাদেশিক বিষয়গুলির ক্ষেত্রে নয়া দিল্লীর হাতেই তুলে দেওয়া হয় আপৎকালীন ক্ষমতা। যুদ্ধঘোষণার দিনই বলবৎ করা হয় ভারত রক্ষা অর্ডিনান্স। এর বলে

নাগরিক অধিকার খর্ব করা হয়। আর প্রথম সুযোগেই কংগ্রেসকে খণ্ড করে দেওয়ার মতো অগ্রাঘাত করার লক্ষ্য নিয়ে মে ১৯৪০-এর মধ্যেই সরকার একটি অতি-গোপনীয় 'বিপ্লবী আন্দোলন অর্ডিনান্স'-এর খসড়া খাড়া করে ফেলে। ১৯৩১-এর মতোই, ব্রিটিশ সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী এখনও কংগ্রেসকে মোকাবিলায় প্ররোচিত করতে আগ্রহী ছিলেন। সরকারের হাতে দোর্দণ্ড ক্ষমতা, আর (১৯৪২-এর গোড়ার দিক থেকেই) ভারতে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ব্রিটিশ ও মিত্রশক্তির যত সেনাবাহিনী ছিল, দরকারে তাদের তলব করা যেত, আর এ-ও আশা করা যেত যে, যদি দেখানো যায় আন্দোলনটি ইচ্ছানিরপেক্ষভাবে জাপান ও জার্মানিকে সাহায্য করছে, তাহলে সেটা দমন করলে সারা পৃথিবীর উদারপন্থী ও এমনকি বামপন্থীদের (জুন ১৯৪১-এ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে নাৎসি হামলার পর) কাছ থকে পাওয়া যাবে অ-সাধারণ সহানুভূতি।

মে ১৯৪০-এ এক জাতীয় বহুদলীয় সরকারের প্রধান হয়ে উইনস্টন চার্চিল ক্ষমতায় এলেন। ততদিনে জার্মান 'ব্লিৎসক্রিগ' (ঝটিকা-আক্রমণ) পশ্চিম সীমান্ত তছনছ করে দিয়েছে, ব্রিটিশদের ডুবিয়েছে ডানকার্ক-এ, আর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই পদানত করেছে ফ্রান্সকে। ব্রিটিশ ভারতের প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলি চার্চিল-এর কাছে পেল প্রবল সমর্থন ও উৎসাহ। মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে নতুন ভারত-সচিব আমেরি একবার ওয়াভেলকে চুপি-চুপি বলেছিলেন যে, মার্কিন উপনিবেশগুলি সম্বন্ধে তৃতীয় জর্জ যতটা জানতেন, ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধে চার্চিল ততটাই ওয়াকিবহাল (ওয়াভেল, *ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ২১)। নভেম্বর ১৯৪২-এ চার্চিল ঘোষণা করেন, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিসমাপনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমি রাজার প্রথম মন্ত্রী হই নি।' মন্ত্রিসভায় অ্যাটলি, ক্রিপ্‌স্-এর মতো লেবর নেতারা ঢুকেছিলেন, কিন্তু চার্চিল প্রধানমন্ত্রী হওয়ায় এ দিকের পাল্লাই ভারী হয়ে যায়। জুন ১৯৩৯-এ ফিলকিন্‌স্-এ ক্রিপ্‌স্-এর গ্রামের বাড়িতে, এক ব্যক্তিগত আলোচনায় ঐ দুই লেবর নেতা নেহরু ও কৃষ্ণ মেননকে কথা দিয়েছিলেন যে, পরের লেবর সরকার সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত সংবিধান-রচনা পরিষদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করবে—অবশ্য এই শর্তে যে অন্তর্বর্তী সময়ে ভারতে ব্রিটিশ দায় ও স্বার্থরক্ষা করার জন্যে স্বাক্ষর করতে হবে একটি ভারত-ব্রিটিশ চুক্তি (পি এস গুপ্ত, *ইম্পিরিয়ালিজম্ অ্যান্ড ব্রিটিশ লেবার*, পৃ. ২৫৭-৯)। অগাস্ট ১৯৪০-এ 'ব্রিটেন-এর যুদ্ধ' যখন ছেয়ে ফেলেছে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপের আকাশ, তখন আমেরি, এমনকি লিনলিথগো-ও ভারতের সমর্থন লাভের জন্যে কিছুটা ছাড় দিতে তৈরি ছিলেন, কিন্তু তাঁদের প্রস্তাব প্রচণ্ড কাটছাঁট করে দিলেন চার্চিল। ফলে লিনলিথগো-র 'অগাস্ট প্রস্তাব' (৮ অগাস্ট ১৯৪০) তাঁর ১৭ অক্টোবর ১৯৩৯-এর বিবৃতির পুনরুক্তির বেশি কিছু ছিল না : কোনো এক অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ডোমিনিয়ন মর্যাদা, যুদ্ধের পর সংবিধান প্রণয়ন করার জন্যে একটি সংস্থা গঠন (স্পষ্টতই, তখনও তা ব্রিটিশ সংসদের অনুমোদনের অধীন ; আর সর্বজনীন ভোটাধিকার-ভিত্তিক নির্বাচনেরও কোনো উল্লেখ নেই), আরও কিছু ভারতীয়কে ঢুকিয়ে অবিলম্বে বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্প্রসারণ, আর একটি যুদ্ধকালীন উপদেশক পর্ষদ্। জুলাই ১৯৪১-এ বড়লাটের শাসন-পরিষদের সম্প্রসার ঘটানো হলো। ভারতীয়রা এই প্রথম সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন (১২ জনের মধ্যে ৮ জন, কিন্তু প্রতিরক্ষা, অর্থ ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভার শ্বেতাঙ্গদের হাতেই

থাকল)। তাছাড়া, একটি জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদ্-ও গঠন করা হলো, যার ভূমিকা হলো একেবারেই উপদেশকের। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপর্যয়ের আগে অবধি, অন্যান্য বিষয়গুলির ক্ষেত্রে আর কোনো উদ্যোগই নেওয়া হয় নি। তার পরে বাধ্য হয়েই, মার্চ-এপ্রিল ১৯৪২-এ নাটকীয়ভাবে ক্রিপ্স্ মিশন-এর আবির্ভাব। তাও, আমরা পরে দেখব, চার্চিল-লিনলিথগো জুটি এটিকে কার্যত কাঁচিয়ে দিয়েছিল।

মুসলিম লীগ ও পাকিস্তান

যুদ্ধকালীন সাম্রাজ্যবাদী রণনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল মুসলিম লীগের দাবিকে আরও বেশি করে ইন্ধন জোগানো। ১৭ অক্টোবর ১৯৩৯-এর বিবৃতিতে 'কয়েকটি সম্প্রদায়ের' প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। আর অগাস্ট প্রস্তাবে পরিষ্কারভাবেই বলা হয় যে, 'ভারতের জাতীয় জীবনের একটা বড় ও শক্তিশালী অংশ যাদের কর্তৃত্ব সরাসরি অস্বীকার করে, তেমন কোনো ধরনের সরকারের কাছেই ব্রিটিশরা দায়িত্ব হস্তান্তর করবে না। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই যা কিছু ছিল জিন্না-র কেন্দ্রীয় দাবি, ফলত এতে তা-ই মেনে নেওয়া হলো ঃ লীগ শুধু ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্রই নয়, ভবিষ্যতের সাংবিধানিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও লীগের এক ধরনের ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে।

মার্চ ১৯৪০-এ মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের নারা গৃহীত হয়। এই দাবির বিবর্তনের শেষ ক'টি পর্বে ব্রিটিশদের প্ররোচনাও যে একেবারেই ছিল না, তা নয়। ১৯৩০-এ মুসলিম লীগের সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে ইকবাল এক 'উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র'-র প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। কখনও কখনও ধরা হয়, এই ভাষণ থেকেই পাকিস্তান দাবির সূচনা। কিন্তু যে-প্রসঙ্গে এই মহান উর্দু কবি ও দেশপ্রেমিক কথাগুলি বলেছিলেন তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, তিনি সত্যি-সত্যিই কোনো দেশভাগের কথা ভাবেন নি। এটা ছিল নেহাতই এক দুর্বল ভারতীয় ফেডারেশনের ভেতরেই উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে এক স্বায়ত্তশাসিত এককের পুনর্গঠন। বরং কেমব্রিজে পাঞ্জাবের মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে চৌধুরী রহমত আলীর যে-গোষ্ঠী ছিল, এই ভাবনার আদি প্রবক্তা হিসেবে তাঁদের দাবি অনেক জোরালো। ১৯৩৩ ও ১৯৩৫-এ লেখা দুটি পুস্তিকায় রহমত আলী নতুন এক সত্তার জন্যে আলাদা জাতীয় মর্যাদার দাবি করেন। তিনি তার নাম চয়ন করেন 'পাকস্তান' (পাঞ্জাব, আফগান প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বালুচিস্তান মিলিয়ে এই নামকরণ)। সে-সময়ে কেউই ব্যাপারটাকে খুব একটা গুরুত্ব দেন নি ; গোল টেবিল বৈঠকের লীগ ও অন্যান্য মুসলিম প্রতিনিধিরা তো নয়-ই। ছাত্রের অলস স্বপ্ন বলেই তাঁরা ধারণাটিকে উড়িয়ে দেন। কিন্তু, আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, ১৯৩৭-এর পর থেকে লীগের পক্ষে জরুরি দরকার ছিল এক ধরনের ইতিবাচক মঞ্চ। ১৯৩৫-এর আইনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ধারাগুলি পরিপালনের কাছাকাছি আসার লক্ষণও ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে আসছিল। আর, যে-ভাবেই হোক, মুসলমান নেতাদের মনে হয়েছিল, তাঁরা মনশ্চক্ষে এক জোরদার ও হিন্দু-প্রবল কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখতে পাচ্ছেন, যাকে মানা যায় না। এরই পরিণামে ১৯৩৮-৩৯-এ

এল কয়েকটি বিকল্প প্রস্তাব ; আর মার্চ ১৯৩৯-এ বিভিন্ন প্রকল্প বিচার করতে লীগ এক উপ-সমিতি বসাল। জাফরুল হাসান ও হুসেন কাদরি-র আলীগড় প্রকল্পে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল চারটি স্বাধীন রাষ্ট্রের : পাকিস্তান, বাঙলা, হায়দরাবাদ ও হিন্দুস্তান। অন্যান্য বেশির ভাগ পরিকল্পনাই কিন্তু পরিপূর্ণ দেশভাগ অবধি যায়নি ; এক আলগা ভারতীয় মহাসঙ্ঘের মধ্যেই গঠন করতে চাওয়া হয়েছিল পৃথক স্বায়ত্তশাসিত কয়েকটি মুসলিম ব্লক। যেমন পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট প্রধানমন্ত্রী সিকন্দর হায়াত খান এক ধরনের ত্রি-স্তর কাঠামোর প্রস্তাব দেন। সেখানে স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশগুলিকে সাতটি অঞ্চলে সমষ্টিবদ্ধ করা হয়। প্রত্যেকেরই নিজস্ব আঞ্চলিক আইনসভা থাকবে, আর সেগুলিকে নিয়ে গঠন করা হবে এক আলগা মহাসঙ্ঘ। কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক বিষয়, সীমাশুল্ক (কাস্টম্‌স্) ও মুদ্রা-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের ভার—এ যেন ১৯৪৬-এর ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার পূর্বসূচনা। হঠাৎই এই বিকল্প সন্ধানের পেছনে ছিল ব্রিটিশদের যথেষ্ট ইন্ধন ও খোঁচানি। খালিকুজ্জামান জানিয়েছেন, ২০ মার্চ ১৯৩৯-এ ভারত-সচিব জেটল্যান্ড সহানুভূতি নিয়ে রহমত আলী পরিকল্পনার কথা শোনেন। তাতে দুটি মুসলিম ফেডারেশনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল—একটি উত্তর-পশ্চিমে, অন্যটি পূর্বে (বাঙলা ও আসামকে নিয়ে) (*পাথওয়ে টু পাকিস্তান*, পৃ. ২০৫-৭)। লিনলিথগো ও জেটল্যান্ড-এর যেসব কাগজপত্র সম্প্রতি গোচরে এসেছে তার থেকে ব্রিটিশদের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪০-এ, লাহোর প্রস্তাবের ছ-সপ্তাহ আগে, জিন্নাকে বড়লাট বলেন, 'যে-দলের নীতি শুধুই নেতিবাচক' তাদের জন্যে ব্রিটিশের সহানুভূতি আশা করা বৃথা। 'যদি তিনি ও তাঁর বন্ধুরা চান যে মুসলমানদের বিষয়টি যুক্তরাজ্যে (ইউ কে) হেলায় হারিয়ে যাবে না, তাহলে সত্যিই যা না-হলেই নয় তা হলো অদূর ভবিষ্যতে তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করা' (উমা কাউরা, পৃ. ১৪৯-এ উদ্ধৃত)।

২৩ মার্চ ১৯৪০-এর বিখ্যাত প্রস্তাবটি মুসাবিদা করেন সিকন্দর হায়াত খান। সেটি (বেশ কিছু অদল-বদল করে) উত্থাপন করেন ফজলুল হক আর সমর্থন করেন খালিকুজ্জামান। ঐ প্রস্তাবে দাবি করা হয়, 'ভৌগোলিকভাবে সন্নিহিত এককগুলির সীমানা নির্দিষ্ট করে, এবং সেইসঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থানগত পুনর্বিন্যাস করে এমনভাবে অঞ্চল গঠন করতে হবে, যাতে মুসলমানরা যেসব এলাকায় সংখ্যাগুরু (যেমন ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল) সেগুলিকে একত্র করে 'কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র' গঠন করা যায়, যাদের অন্তর্ভূত এককগুলি হবেঁে স্বায়ত্তশাসিত ও সার্বভৌম'। চোখে-পড়ার মতো জবরজং শব্দ প্রয়োগের ফলে অস্পষ্টতা, বিভ্রান্তি ও দ্ব্যর্থকতার সুযোগ রয়ে গেল প্রচুর—সম্ভবত এটা ইচ্ছাকৃত। পাকিস্তান বা দেশভাগ—খোলাখুলি কোনোটিরই উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি ১৯৪০-এর দশকের গোড়ায় কোনো কোনো মুসলমান রাজনীতিবিদ্ এও বলেন যে, হিন্দু পত্র-পত্রিকা ও রাজনীতিবিদ্‌রা প্রস্তাবের ভুল ব্যাখ্যা করে পাকিস্তানের ধুয়ো তুলেছেন, যাতে মুসলমানদের ন্যায্য কিন্তু আরও কম উচ্চাকাঙ্ক্ষী দাবি রোখা যায়। 'স্থানগত পুনর্বিন্যাসে'র কোনো সংজ্ঞার্থ দেওয়া হয় নি। আর, 'কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র'—উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যের এই শব্দগুলির নিহিতার্থ মনে হয় বিচ্ছিন্নতাই, কিন্তু সম্ভবত এর অর্থ একটা আলগা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের বেশি কিছু না-ও হতে পারে। বহুবচনের ব্যবহার এবং এককগুলির সার্বভৌমত্বের ওপর গুরুত্বটা দেশভাগের

পরে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, কারণ পাঞ্জাবী আধিপত্যসহ এককেন্দ্রীয় পাকিস্তানের ধারণার বিরুদ্ধে ফজলুল হকের নেতৃত্বে আওয়ামি লীগের যে আন্দোলন শুরু হয়, এ-ই ছিল তার তাত্ত্বিক ভিত্তি। শেষ পর্যন্ত এই আন্দোলন মারফতই পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসে বাংলাদেশ।

পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট ব্লক-এ কিছু শিখ ও ছোটুরাম প্রমুখ কিছু হিন্দু জাঠও ছিলেন। তার নেতা ছিলেন সিকন্দর হায়াত খান। ১১ মার্চ ১৯৪১-এ পাঞ্জাব বিধানসভায় তাঁর বহু-উদ্ধৃত বক্তৃতায় তিনি ঘোষণা করেন, এমন কোনো পাকিস্তানের তিনি বিরোধী যার অর্থ হবে 'এখানে মুসলিম রাজ ও অন্য সব জায়গায় হিন্দু রাজ...পাকিস্তান মানে যদি হয় পাঞ্জাবে নিখাদ মুসলিম রাজ, তাহলে আমি তার মধ্যে থাকব না' (ভি পি মেনন, *ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া,* পৃ. ৪৬৩)। তিনি আবার আলগা মহাসঙ্ঘের কথা তোলেন, এবং দাবি করেন যে, লাহোরে তাঁর মূল প্রস্তাবে 'কেন্দ্র তথা বিভিন্ন এককের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয়ে'র কথাও ছিল। আসলে প্রথমদিকে গুটিকয়েক মুসলমান নেতাই শুধু পাকিস্তান ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্ব-সহকারে বা আক্ষরিক অর্থে নিয়েছিলেন। এমনকি গোড়ায় জিন্নার কাছেও সম্ভবত এটি ছিল দর-কষাকষির জায়গা। ব্রিটিশরা যদি কংগ্রেসকে সাংবিধানিক ছাড় দিতে চায়, তাহলে তা আটকানো, আর মুসলমানদের জন্যে বাড়তি কিছু দাক্ষিণ্য আদায়—এ দু-এর ক্ষেত্রে এটির দরকার ছিল। তবুও সিকন্দর-এর বক্তৃতায় স্বীকার করা হয় যে, যদিও 'শিক্ষিত মুসলমানদের একটা বিরাট অংশ...এই ধরনের কোনো পরিকল্পনায় (অর্থাৎ দেশভাগে) বিশ্বাস করেন না', তাহলেও এর অস্পষ্টতা ও নমনীয়তা ক্রমেই পাকিস্তানকে করে তুলছে 'মুসলমান জনতাকে দোলা দেওয়ার পক্ষে এক সুবিধানজক নারা' (*ঐ,* পৃ. ৪৫৩)। ইউনিয়নিস্টরা পাঞ্জাবে যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ডাক দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে জড়িত ছিল সাধারণভাবে সামাজিক-রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা রক্ষা আর ব্রিটিশের সঙ্গে খোলাখুলি জোট বাঁধা। সিকন্দরের উত্তরসূরি খিজর হায়াত খান-ই ভারতের প্রথম রাজনীতিবিদ্ ওয়াভেল যাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন। ফলে পাঞ্জাবে, এবং বাঙলা-তেও, পাকিস্তানের নারাকে কেন্দ্র করে কয়েক বছরের জন্যে গড়ে ওঠে এক লোক-খ্যাপানো গলাবাজির সাম্প্রদায়িকতা। বলা হয় একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রই হলো যাবতীয় সমস্যার সেরা দাওয়াই। এও অবশ্য কয়েক বছর পরের কথা। সেই মুহূর্তে ভারতে সাংবিধানিক অচলাবস্থা কায়েম রাখার জন্যে ব্রিটিশের কাছে পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল। অবশ্য জিন্না-কে কিছুদূর পর্যন্ত উৎসাহ দিলেও তাঁর সমস্ত দাবির কাছে নতি স্বীকার করার কোনো ইচ্ছাই তাদের ছিল না। ৯৩নং ধারা অনুযায়ী প্রদেশগুলিতে মুসলমান বে-সরকারি উপদেষ্টা নিয়োগ, সম্প্রসারিত শাসন-পরিষদে আরও আসন, কংগ্রেস যদি ভবিষ্যতে শাসন-পরিষদে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেখানে তাদের সমান সংখ্যক আসন—লীগের এইসব দাবির কোনোটাই মানা হয় নি। তার ফলে জিন্না বাতিল করলেন অগাস্ট প্রস্তাব, আর পরের বছর সিকন্দর হায়াত খান ও ফজলুল হক-কে বাধ্য করলেন জাতীয় প্রতিরক্ষা পর্ষদের সদস্যপদ প্রত্যাখ্যান করতে।

কংগ্রেসের ভেতরের বিভিন্ন প্রবণতা

১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে কংগ্রেসের ভেতরে বিভিন্ন শক্তিবিন্যাসের যে-ধাঁচটি গড়ে উঠছিল

১৯৪১-৪২-এর শীত অবধি তা-ই রয়ে গেল। গান্ধী তথা দক্ষিণপন্থীপ্রধান সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন, ব্রিটিশের সঙ্গে বারবার একটা রফায় আসার চেষ্টা করেছেন, আর তারপরে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এমন এক আন্দোলনের মত দিয়েছেন যার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হলো লক্ষণীয় রকমের খাদে-বাঁধা সুর ও সীমিত প্রকৃতি। সব বামপন্থীরাই চাইছিলেন জঙ্গী যুদ্ধ-বিরোধী ও সরকার-বিরোধী আন্দোলন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলো পদত্যাগ করার অল্প কিছুদিন পরেই গান্ধী বলে দিলেন, যদিও 'কংগ্রেসিরা একটা বড় চালের আশা করছেন', তাহলেও অবিলম্বে আইন-অমান্যের কোনো সম্ভাবনাই নেই। তাঁর অহিংসা-নীতি মেনে যুদ্ধকে সরাসরি সমর্থন করা যায় কিনা—সে সম্বন্ধে গান্ধী নিজেই মাঝে-মধ্যে সন্দেহপ্রকাশ করেন। (এমনকি পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও ব্রিটেনকেও তিনি ন্যালাখ্যাপার মতো অহিংস প্রতিরোধের পরামর্শ দেন!)। কার্যনির্বাহী কমিটি কিন্তু বারবারই স্পষ্ট বলে দেয় (যেমন, ১৭ জুন ১৯৪০-এ) যে, ব্রিটিশরা যদি দুটি মূল দাবির ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দেয় তাহলে যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে সমর্থন করতে তারা পুরোপুরি রাজি আছে। দাবিদুটি ছিল : যুদ্ধের পর স্বাধীনতার অঙ্গীকার আর অবিলম্বে কেন্দ্রে একটি 'জাতীয় সরকার'।

ব্রিটিশদের একগুঁয়েমি আর লড়াই-এর জন্যে বামপন্থীদের চাপ—এ দুএর ফলে শেষে অবশ্য আরও জঙ্গীনীতি নেওয়ার মতো খানিকটা ভাব দেখাতেই হলো। রামগড় কংগ্রেসে (মার্চ ১৯৪০) বলা হয় যে, 'যে-মুহূর্তে কংগ্রেস সংগঠনকে উদ্দেশ্যের পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত বলে মনে করা হবে', তখনই শুরু হবে আইন-অমান্য আন্দোলন। কিন্তু তা কখন হবে, কীভাবে হবে—তার সবকিছুই ছেড়ে দেওয়া হয় গান্ধীর ব্যক্তিগত বিবেচনার ওপর। অগাস্ট প্রস্তাবের হতাশার পর গান্ধী অবশেষে আইন-অমান্যের অনুমতি দিলেন, কিন্তু সেও অদ্ভুতভাবে সীমিত, আর ইচ্ছাকৃতভাবে অকেজো ধরনের। আন্দোলনের অদ্বিতীয় বিষয় হলো বাক্-স্বাধীনতা—আরও নির্দিষ্টভাবে বললে, প্রকাশ্যে যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য রাখার অধিকার। কংগ্রেসিরা ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধবিরোধী বক্তৃতা দিয়ে কারাবরণ করবেন (প্রথমে গান্ধী যাঁদের মনোনীত করবেন শুধু তাঁরাই—১৭ অক্টোবর শুরু করবেন বিনোবা ভাবে, তারপর ৩১ অক্টোবর জওহরলাল, তারও পরে আরও ব্যাপকভাবে)। জুন ১৯৪১-এ আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। প্রায় ২০,০০০ জন কারাবরণ করেন। কিন্তু ১৯৪১-এর শরতের মধ্যেই আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে যায়, বেশির ভাগ বন্দীকেই ছেড়ে দেওয়া হয়। গান্ধীপন্থী সব জাতীয় প্রচার-আন্দোলনের মধ্যে নিশ্চিতভাবে এটি-ই ছিল সবচেয়ে দুর্বল ও অকেজো। এর ঠিক একবছর পরে অগাস্ট ১৯৪২-এ যা ঘটবে তার যতটা উল্টো হওয়া সম্ভব, এই আন্দোলন ছিল ততটাই উল্টো। স্পষ্টতই, ব্রিটিশকে গুরুতররকমে বিব্রত করা তার লক্ষ্য ছিল না। লক্ষ্য ছিল নেহাতই কংগ্রেসের হাজিরা দাখিল করা ও ভারতীয়দের সঙ্গে আলোচনা না-করেই ঘোষিত এক যুদ্ধের প্রতি বিরূপতা জানানো, আর সেইসঙ্গে, লিনলিথগো-কে কোনো বড়রকমের আঘাত হানার সুযোগ না-দেওয়া। ব্রিটিশরা যে যুদ্ধকালীন ক্ষমতা ব্যবহার করতে অতিমাত্রায় আগ্রহী ছিল তার নিদর্শন পাওয়া যায় নেহরুকে দেওয়া উদ্ভট শাস্তি থেকে—প্রথমেই তাঁকে চার বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। জানুয়ারি ১৯৪১-এ বিড়লার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে গান্ধী পরিষ্কার জানিয়ে দেন, তাঁর এই আন্দোলনের ফলে সরকার যত কম বিব্রত হোক' এটাই তিনি চান (যেমন, খ্রীস্টমাসের সময়ে,

রবিবার ও সকাল ৯-টার আগে কোনো সত্যাগ্রহ হবে না)। সেই সঙ্গে 'আমাদের তরুণদের মানসিকতা' সম্বন্ধেও উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন 'দুর্ভাগ্যবশত, কমিউনিজমের আবেদনই তাদের কাছে বেশি' (*ঠাকুরদাস পেপার্স*, এফ এন ১৭৭)। আগেও যেমন প্রায়ই হতো, এবারেও, মনে হয়, সম্ভাব্য আরও জঙ্গী চাপ এড়ানোর বাসনাই গান্ধীর রণনীতির নানা আঁক-বাঁকের জন্যে অংশত দায়ী।

১৯৪১-এর শেষ অবধি সমস্ত বামপন্থীই জঙ্গী যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলনের জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিলেন—ব্যতিক্রম শুধু মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর গোষ্ঠী। তাঁদের মনে হয়েছিল : এটি ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধ, তাই একে নিঃশর্তে সমর্থন করা চাই। ব্রিটিনের অসুবিধেকেই যে ভারতের সুযোগে পরিণত করতে হবে—তাতে সুভাষচন্দ্রের কোনো সন্দেহই ছিল না। রামগড় সম্মিলনের পাশাপাশি যে আপস-বিরোধী সম্মিলন হয়, তার সভাপতিত্ব করেন তিনিই। এ সম্মিলনে গান্ধীর নরমপন্থার তীব্র নিন্দা করা হয়। সোশালিস্টরাও ক্রমেই আরও জঙ্গী মেজাজের হয়ে উঠছিলেন। যেমন, জয়প্রকাশ নারায়ণ। ১৯৪১-এ জেলে থাকার সময় তিনি ভাবছিলেন সশস্ত্র সংগ্রামের নিরিখে। সোশ্যালিস্টদের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক অবশ্য ইতোমধ্যেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল, কারণ সি এস পি-র সেরা নেতা ও শাখার অনেক ক'টিই চলে গিয়েছিল সি পি আই-এর দখলে। তাহলেও, ১৯৪১-এর শেষ অবধি, যুদ্ধ বিষয়ক মনোভাব নিয়ে অন্তত কোনো বড় রকমের রাজনৈতিক মতভেদ ঘটে নি। অগাস্ট ১৯৩৯-এ নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তির পর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নীতি পুরো উল্টে গেল। ইওরোপের কমিউনিস্টরা এতে খুবই বিব্রত হয় পড়েন, কিন্তু তাঁদের ভারতীয় কমরেডদের কাছে এটাই হয়ে ওঠে এক পরিসম্পদ, কারণ এতে সোভিয়েতনীতির প্রতি 'আন্তর্জাতিকতাবাদী' সমর্থনের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধের প্রতি জাতীয়তাবাদী বৈরিতাকে এক সুরে বাঁধা সহজ হয়ে যায়। ২২ জুন ১৯৪১-এ হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলে পরিস্থিতি হয়ে যায় ঠিক উল্টো।

তবু তীব্র বিটিশ উৎপীড়নের মুখে পড়ে বামপন্থীরা সাকুল্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তুলতে পারলেন না। জুলাই ১৯৪০-এ সুভাষ কলকাতায় হলওয়েল স্মৃতিস্তম্ভ (তথাভিহিত অন্ধকূপ-হত্যায় নিহত ব্রিটিশদের স্মৃতির উদ্দেশে নিবেদিত) অপসারণের দাবিতে একটি সফল সত্যাগ্রহ পরিচালনা করেন। বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা-র ইজ্জতের সঙ্গে জড়িত থাকায়, এই একবার মুসলমান ছাত্ররা দলে দলে আন্দোলনে যোগ দেন। কিন্তু শুধু হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়া গোটা ব্যাপারটার তাৎপর্য ছিল স্পষ্টতই খুব সামান্য। জানুয়ারি ১৯৪১-এ সুভাষ গৃহবন্দী অবস্থা থেকে পালিয়ে যান, এবং আফগানিস্তান থেকে রাশিয়া অবধি কমিউনিস্টদের গুপ্ত যোগসূত্র ধরে পৌঁছে যান জার্মানি। শুরু হলো তাঁর স্বদেশব্রতের শেষ ও সবচেয়ে নাটকীয় অধ্যায়, কিন্তু মূলত ব্রিটেনের শত্রুদের সাহায্যের ওপরেই নির্ভর করাটা এক অর্থে অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলির দুর্বলতারই স্বীকৃতি। এ যেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের পদ্ধতিতেই ফিরে যাওয়া। মাইশোর রাজ্য কংগ্রেস (সমাজবাদী-প্রধান কর্ণাটক প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সঙ্গে যুক্ত) সেপ্টেম্বর ১৯৩৯-এ তিন মাস ধরে শক্তিশালী সত্যাগ্রহ করেন। এই আন্দোলন কৃষকদের কাছ থেকে লক্ষণীয় রকমের সমর্থন পেয়েছিল। মোট ২৮০১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, এঁদের মধ্যে ৬৪১ জনই কৃষিজীবী, আইনজীবী মাত্র

২৩ জন (জেমস ম্যানর, *পলিটিকাল চেঞ্জ ইন অ্যান ইন্ডিয়ান স্টেট*, দিল্লী, ১৯৭৭, পৃ. ১২৪)। আর একটি বাম-নিয়ন্ত্রিত প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ছিল কেরলে। ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০-এ তাঁরা এক সফল নিপীড়ন-বিরোধী দিবস সংগঠিক করেন। ঐ দিন তেল্লিচেরি, মত্তানুর, ও মোরাজহা-য় পুলিশ গুলি চালায়। মার্চ ১৯৪১-এ উত্তর মালাবারে কৃষক-ভূস্বামী সঙ্ঘর্ষের পরিণামে চারজন কিসান-কিশোরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। এই 'কাইয়ুর শহিদ'-দের নাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া-য় এবং উত্তরবঙ্গের দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমায় কমিউনিস্ট-পরিচালিত কিসান আন্দোলন অর্জন করে এক নতুন ধরনের জঙ্গীপনা। এই প্রথম মধ্য-কৃষকদের স্তর ছাড়িয়ে আন্দোলন পৌঁছল জনগোষ্ঠীয় বা আধা-জন-গোষ্ঠীয় (সাঁওতাল, রাজবংশী) ভাগচাষীদের পর্যায়ে। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনকে দেশব্যাপী চ্যালেঞ্জ জানানোর পক্ষে ঐ ধরনের বিক্ষিপ্ত ও স্থানবিশেষে জঙ্গীপনা ছিল অবশ্যই সুদূরপরাহত।

বিভিন্ন আর্থনীতিক পরিণাম

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ অবধি জাতীয় আন্দোলনের আপেক্ষিক দুর্বলতার মূলে সম্ভবত কয়েকটি আর্থনীতিক ব্যাপারও ছিল। যে-যুদ্ধ তখনও অনেক দূরের ব্যাপার, তাতে জনসাধারণের একটা বড় অংশের হরে-দরে লোকসানের চেয়ে লাভই হচ্ছিল বেশি। কৃষিপণ্যের দাম তখনও খুব একটা চড়ে নি, আর দীর্ঘ এক দশকের মন্দার পর চাষীদের বিরাট অংশই এতে বেশ খানিকটা স্বস্তি পান। যুদ্ধকালীন চাহিদা, আমদানি এবং দেশজ পণ্যের ওপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হওয়ার ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো এবারেও, ভারতীয় শিল্পের বিকাশে একটা বড় রকমের জোয়ার আসে। যদিও মোটর গাড়ি, জাহাজ ও বিমান নির্মাণের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের প্রয়াস যেমন ওয়ালচন্দ হীরাচন্দ ও মাইশোর-এর দেওয়ান্ মির্জা ইসমাইল-এর চেষ্টাকে—নিবৃত্ত করার জন্যে ব্রিটিশরা তখনও আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। ১৯৩৯ থেকে ১৯৪২-এর মধ্যে কারখানায় নিয়োগের সংখ্যা ৩১% বেড়ে যায়, যেখানে ১৯২২ থেকে ১৯৩৯-এর মধ্যে সংখ্যা ১,৩৬১,০০০ থেকে বেড়ে হয়েছিল মাত্র ১,৭৫১,০০০ (ওয়াডিয়া ও মার্চেন্ট, *অওয়ার ইকনমিক প্রবলেম*, ষষ্ঠ সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯৫৯, পৃ. ৩৫৫)। বড় বড় শহরে শ্রমিক-বিক্ষোভের যে-সমস্যা যুদ্ধপ্রস্তুতির ক্ষেত্রে গুরুতর আশঙ্কার কারণ হতে পারত, পর্যাপ্ত মহার্ঘ ভাতা আর ভর্তুকি হারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহ করে তাকে ঠেকিয়ে রাখা হয়। ভারতীয় ব্যবসায়ী ও বণিকদের কাছে যুদ্ধ মানে ছিল অকল্পনীয় রকমের দ্রুত মুনাফা লাভের একটা সুযোগ—বিশেষত যতদিন যুদ্ধ মানে একটা দূরের ব্যাপার, আর, বোমারু বিমানের হানা বা উদ্‌বাসনের ফলে সম্পত্তি নাশের আশঙ্কা নেই। খালিকুজ্জামান বেশ একটা কৌতূহল-জাগানো কথা বলেছেন। ব্রিটিশের সঙ্গে আরও বেশি সহযোগিতার পথে মুসলিম লীগকে *ঠেলে* দিয়েছিল ধনী ব্যবসায়ীরা, আর সেই সঙ্গে 'আমাদের মুসলিম তালুকদার ও জমিনদাররা...কাঠ, কাঠকয়লা বা অন্যান্য ছোটখাটো জিনিসের খুচরো ঠিকাদারি পেতে যাঁরা ছিলেন আগ্রহী। জীবনে একবার পাওয়া এই মওকা তাঁরা ছাড়বেন, এমন আশা প্রায় করাই যায় না' (*পাথওয়ে টু পাকিস্তান*, পৃ. ২৪৩)। কংগ্রেসের ওপরেও যে একই রকমের চাপ ছিল এমন সন্দেহ করাটা নিশ্চয়ই অন্যায্য হবে না।

যুদ্ধের নতুন পর্ব

১৯৪১-এর জুন-ডিসেম্বরে দুটি বিশ্বপ্রভাবী ঘটনার বিকাশ পাল্টে দিল ভারতের পরিস্থিতি ঃ হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করলেন ; আর ডিসেম্বর ১৯৪১-এ নাটকীয়ভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঢুকে পড়ল জাপান, চারমাসের মধ্যে তারা মালয়, সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ থেকে ব্রিটিশদের হঠিয়ে দিল, আর আশঙ্কা দেখা দিল ভারতেও তাদের সাম্রাজ্য আচমকা শষ হয়ে যাবে।

জার্মানরা রাশিয়া আক্রমণ করায় ভারতীয় কমিউনিস্টদের পক্ষে বাছাই করাটা হয়ে উঠল পীড়াদায়ক। ভারতে ব্রিটিশের নীতি তখনও আগের মতোই দমনমূলক ও প্রতিক্রিয়াশীল, অথচ বেঁচে থাকার জন্যে জীবন-পণ সংগ্রামে রত, বিশ্বের একমাত্র সমাজবাদী রাষ্ট্রের সে-ই তখন মিত্র। জানুয়ারি ১৯৪২-এ ছ-মাস ধরে দ্বিধা ও অভ্যন্তরীণ বিতর্কের পর সি পি আই শেষ অবধি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যান্যদের সঙ্গে একসারিতে দাঁড়িয়ে ফ্যাসিবিরোধী 'জনযুদ্ধে' পূর্ণ সমর্থনের ডাক দেয়। অবশ্য স্বাধীনতার অঙ্গীকার ও অবিলম্বে জাতীয় সরকার— কংগ্রেসের এই দুই বাঁধা দাবিও আবার আওড়ানো হয় (সমর্থনের পূর্বশর্ত হিসেবে এ-দুটিকে মূল্যবান মনে করা হলেও তখন আর অপরিহার্য মনে করা হতো না)। রাশিয়ার সম্বন্ধে সহানুভূতি আর উদ্বেগ শুধু কমিউনিস্টরাই দেখান নি। অগাস্ট ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথ তাঁর মৃত্যুশয্যায় জানতে চান রাশিয়ার খবর, ঘোষণা করেন যে একমাত্র সোভিয়েতরাই 'দানবদের' রুখতে পারবে। নেহরুর আন্তর্জাতিকতাবাদী ও ফ্যাসি-বিরোধী দায়বোধ ছিল গভীর। তিনি ছিলেন যুদ্ধরত রাশিয়া ও চীনের গুণগ্রাহী। তাই, একটা রফায় আসার জন্যে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন, যাতে ক্রিপ্‌স্‌ মিশন নিয়ে আলাপ-আলোচনার সময়ে যুদ্ধের প্রতি ভারতের সমর্থন পাওয়া যেতে পারে। জাপ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গেরিলা প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার— একথা প্রকাশ্যেই তিনি বলেন। আর গোড়ার দিকে ভা র ত ছা ড়ো আন্দোলনের পথ সম্পর্কে তাঁর বেশ বাধো-বাধো ভাব ছিল। ভারতের দেশপ্রেমিকদের গরিষ্ঠ অংশের (সে তাঁরা কংগ্রেসি দক্ষিণপন্থী, গান্ধীপন্থী, সোশালিস্ট বা সুভাষের অনুগামী যা-ই হোন না কেন) কাছ থকে অবশ্য ঐ ধরনে বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত আশা করা যায় না। তাঁদের মধ্যে অনেকে ক্রমেই আরও বেশি করে ভাবছিলেন ঃ ব্রিটেন হারতে চলেছে, এসে গেছে স্বাধীনতার জন্যে জোরদার আঘাত হানার দিন।

ক্রিপ্‌স্‌ মিশন

যুদ্ধ ভারতের দিকে দিনে দিনে এগিয়ে আসতে লাগল (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২-এ সিঙ্গাপুরের পতন হলো, ৮ মার্চ রেঙ্গুনের, ২৩ মার্চ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের)। ভারতের জনমতকে নিজের পক্ষে পাওয়ার জন্যে কিছু (সদিচ্ছার) ভাব দেখাতে ব্রিটিশরা অবশেষে বাধ্য হলো। ডিসেম্বর ১৯৪১-এ ওয়াশিংটন-এ চার্চিল-এর সঙ্গে আলোচনার সময়ে ভারতের রাজনৈতিক সংস্কারের প্রশ্নটি তুললেন রুজভেল্ট। ২ জানুয়ারি সাপ্রু, জয়কর প্রমুখ ভারতীয় লিবারেল নেতারা অবিলম্বে ডোমিনিয়ন মর্যাদা ও বড়লাটের শাসন পরিষদ সম্প্রসারণ করে এক জাতীয় সরকার গঠনের আবেদন জানালেন ; আর ফেব্রুয়ারিতে ভারত ভ্রমণের সময়ে, 'ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা'র প্রতি প্রকাশ্যেই চিয়াং-কাই-শেক জানালেন তাঁর সহানুভূতি। এসবের ফলে

আপেক্ষিকভাবে ভারত-সমর্থক যেসব গোষ্ঠী ব্রিটেনে ছিল তারা একটা সুযোগ পেল। যেমন যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় লেবর পার্টির সদস্য ক্রিপ্‌স্ ও অ্যাট্‌লি আর আগাথা হ্যারিসন-এর নেতৃত্বে প্রধানত কোয়েকার-দের নিয়ে গড়া ইন্ডিয়া কনসিলিয়েশন গ্রুপ। (১৯৩১-এ গান্ধীর বিলেত ভ্রমণের সময় এই গোষ্ঠীটি গঠন করা হয়, ১৯৩৮-এ নেহরু এঁদের সঙ্গে বন্ধুত্বের যোগ গড়ে তোলেন)। ডিসেম্বর ১৯৩৯-এ ক্রিপ্‌স্ বেসরকারিভাবে ভারতে এসেছিলেন। যুক্ত প্রদেশের উদীয়মান লীগ নেতা লিয়াকত আলীখানের সঙ্গে আলোচনার পর তিনি সিদ্ধান্ত নেন, জুন ১৯৩৮-এর যিন্দ্‌খিল্‌স্ সূত্রের কিছু রদবদল দরকার। 'কিছুটা আলগা একটা ফেডারেশন-এর ছবি বেরিয়ে আসছে...ইচ্ছা করলে প্রদেশগুলির বেরিয়ে যাওয়ার অধিকারও থাকবে'—দু-বছর পরে, 'প্রদেশগুলির স্ব-ইচ্ছা'য় যে ধারণা ক্রিপ্‌স্ পরিকল্পনার ভিত্তি হয়, এ হলো তারই সূত্রপাত। (আর জে মুর, *চার্চিল, ক্রিপ্‌স্ অ্যান্ড ইন্ডিয়া,* ১৯৩৯-৪৫, অক্সফোর্ড, ১৯৭৯, পৃ. ১২)

মার্চ ১৯৪২-এর প্রথম সপ্তাহে ক্রিপ্‌স্ যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভাকে বুঝিয়ে একটি খসড়া ঘোষণাপত্র মেনে নিতে রাজি করান। সেখানে, যুদ্ধের পর, বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সমেত ডোমিনিয়ন মর্যাদার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রাদেশিক বিধায়করা নির্বাচন করবেন এক 'সংবিধান-প্রণয়ন সংস্থা'। প্রতিটি রাজ্যকেই তাতে যোগ না-দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়, আর প্রতিনিধি নিয়োগের আমন্ত্রণ জানানো হয় দেশীয় রাজ্যগুলিকে। অনুচ্ছেদ (ঙ)-তে জরুরি সব বিষয়ে 'ভারতীয় জনগণের প্রধান প্রধান অংশের নেতৃবৃন্দকে, তাঁদের দেশের ব্যাপারে পরামর্শের জন্য অবিলম্বে তথা কার্যকরভাবে যোগদানে'র ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু এ-কথাও জোর দিয়ে বলা হয় যে, যুদ্ধের সময়ে 'ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা'র ভার ব্রিটিশের হাতেই রাখা থাকবে। ঘোষণাপত্রটি তক্ষনই প্রকাশ করা হয় নি, কিন্তু এরই ভিত্তিতে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে ২৩ মার্চ ক্রিপ্‌স্ ভারতে রওনা দেন। লিনলিথগো পদত্যাগ করার হুমকি দেন, কিন্তু চার্চিল তাঁকে বোঝান : 'দুর্ভাগ্যজনক সব গুজব ও প্রচার, আর মার্কিনদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিশুদ্ধ নেতিবাচক মনোভাবের ওপর দাঁড়ানো হবে অসম্ভব। আমাদের উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করার জন্যেই ক্রিপ্‌স্ মিশন অপরিহার্য...ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি যদি একে প্রত্যাখ্যান করে...তাহলে দুনিয়ার কাছে আমাদের ঐকান্তিকতা প্রমাণ হবে' (লিনলিথগো-কে চার্চিল, ১০ মার্চ, ১৯৪২, এন ম্যানসার (সম্পা), *ট্রান্সফার অফ পাওয়ার,* খণ্ড ১, লণ্ডন, ১৯৭০, পৃ. ৩৯৪-৫)।

অজস্র দ্বিমুখিতা আর ভুল-বোঝাবুঝি ক্রিপ্‌স্ মিশনকে সর্বক্ষণ জর্জরিত করে আর শেষ অবধি ডুবিয়ে ছাড়ে। চার্চিল লিনলিথগোকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'অবশ্যই তিনি (ক্রিপ্‌স্) খসড়া ঘোষণাপত্রের চৌহদ্দির মধ্যে বাঁধা, ওটাই আমাদের সর্বশেষ সীমা'। কিন্তু নেহরু ও মৌলানা আজাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে ক্রিপ্‌স্, মনে হয়, ঐ চৌহদ্দির অনেকটাই বাইরে চলে গিয়েছিলেন, কারণ তাঁর নিজেরও একটা ফয়সালা করার ইচ্ছে ছিল, আর প্রথমদিকে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াও প্রতিকূল ছিল না। দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধি মনোনয়ন করবেন রাজারাই, আর প্রদেশগুলির স্ব-ইচ্ছা সংক্রান্ত যেসব ধারা ছিল, সেগুলো সম্বন্ধে স্বভাবতই কংগ্রেস ছিল খুবই সমালোচনামুখর। শেষের ধারাটি সম্বন্ধে ২ মার্চ আমেরি একান্তে স্বীকার করেন, 'এটাই প্রথম প্রকাশ্যে পাকিস্তান সম্ভাবনার স্বীকৃতি' (ঐ, পৃ. ২৮২-৩)। ক্রিপ্‌স্ যতদিন ভারতে ছিলেন

ততদিন গান্ধী ইচ্ছে করেই অনেকটা পেছনে সরে থাকেন। কংগ্রেসের হয়ে সরকারিভাবে কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন নেহরু ও দলের সভাপতি মৌলানা আজাদ। গোটা আলোচনা তাঁরা কেন্দ্রীভূত করেন অনুচ্ছেদ (ঙ)-তে—যেখানে অবিলম্বে কিছু পরিবর্তনের ব্যবস্থার ইঙ্গিত ছিল। আপাতভাবে মনে হয়, ক্রিপ্‌স্ তাঁদের বলেছিলেন, নতুন শাসন-পরিষদ্ মোটামুটি মন্ত্রিপরিষদ্-শাসিত সরকারের মতোই হবে—আনুষ্ঠানিকভাবে নয়, কারণ যুদ্ধের সময় ১৯৩৫-এর আইন পাল্টানো যাবে না, কার্যত প্রচলন অনুযায়ী—ঠিক যেমন লাটের বিশেষ ক্ষমতার ফলে প্রদেশগুলিতে ১৯৩৭-৩৯ অবধি কার্যকর কংগ্রেস শাসনের ক্ষেত্রে সত্যিই কোনো বাধা দেখা দেয় নি। ৪ এপ্রিল চার্চিলকে ক্রিপ্‌স্ যে-তারবার্তা পাঠান, তাতে এই 'নতুন বন্দোবস্ত'র উল্লেখ করেন, যাতে 'শাসন-পরিষদ্ হবে মোটামুটি মন্ত্রিপরিষদেরই মতো...' (ঐ, পৃ. ৬৩৬)।

ফলে আলোচনা চলতে থাকে প্রতিরক্ষার প্রশ্ন নিয়ে। ৯ এপ্রিল মনে হলো এ-ব্যাপারেও বুঝি মতের মিল হয়ে যাবে। তার জন্যে কর্নেল জনসন-এর মধ্যস্থতার প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ দিতে হয়। রুজভেল্ট-এর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি হিসেবে, সামরিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্যে তিনি নয়াদিল্লীতে আসেন। একটা আপস-সূত্র বার করা হয়। তাতে ঠিক হয় প্রতিরক্ষা বিভাগের ভার থাকবে একজন ভারতীয়ের হাতে। রণক্ষেত্রের কাজকর্ম কিন্তু ব্রিটিশ সর্বাধিনায়ক-ই নিয়ন্ত্রণ করবেন, আর তিনি হবেন এমন একটি যুদ্ধ বিভাগের প্রধান, যার কাজকর্ম সুনির্দিষ্ট। এইবার কিন্তু লিনলিথগো ও সর্বাধিনায়ক ওয়াভেল গুরুতরভাবে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন : প্রকৃত ক্ষমতা অনেকটাই ক্রিপ্‌স্ কংগ্রেসকে ছেড়ে দিচ্ছেন। চার্চিল-এর সঙ্গে একযোগে তাঁরা শেষ মুহূর্তে আটকে দিলেন মীমাংসার রাস্তা। ৯ এপ্রিল যুদ্ধমন্ত্রক ক্রিপ্‌স্-কে একটি তারবার্তা পাঠান। সেখানে, লিনলিথগো ও ওয়াভেল-এর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা না-করার এবং জনসনকে বড্ড বেশি সুযোগ দেওয়ার জন্যে তাঁকে ভর্ৎসনা করা হয়। 'জাতীয় সরকারের উল্লেখ' করার জন্যেও তাতে দুঃখ করা হয়, আর জোর দিয়ে বলা হয় : 'আপনি যা নিয়ে কথা বলতে গেছেন সেই ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার মধ্যে গোটা ব্যাপারটাকে ফিরিয়ে আনা' চাই (ঐ, পৃ. ৭০৭-৮)। সেইদিন সন্ধেবেলা আলোচনায় কংগ্রেসের তরফের লোকেরা দেখলেন : ক্রিপ্‌স্ পুরো উল্টো সুর গাইছেন, আর তাই আলোচনাও হঠাৎ ভেস্তে গেল।

মরিয়া হয়ে নেহরু চাইছিলেন একটা মীমাংসা। অনেক অংশেই তার কারণ হলো, ফ্যাসি-বিরোধী যুদ্ধের সঙ্গে ভারতীয়দের সত্যিকারের ও কার্যকর সমর্থন সামিল করার বাসনা তাঁর ছিল। কিন্তু কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটির বেশির ভাগ সদস্য ও গান্ধী নিজেও ছিলেন খানিকটা অনাগ্রহী বা সন্দিহান। এইবার নেহরুর অবস্থা খুবই ঢিলে হয়ে গেল। আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পুরো দোষটাই ক্রিপ্‌স্ অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দিলেন কংগ্রেসের ঘাড়ে। নিঃসন্দেহে খানিকটা তাঁর নিজের রাজনৈতিক কর্মজীবন বাঁচাতেই তিনি এটা করেন। তাতে নেহরুর কোনো সুবিধে হলো না। ১৩এপ্রিল কৃষ্ণ মেনন-কে নেহরু সাঁটে লেখা যে-তারবার্তা পাঠান, কংগ্রেসের দিকের ব্যাপারটা তাতেই বলে দেওয়া আছে : 'গোড়ার দিকে ক্রিপ্‌স্ পরিষ্কারভাবেই এক জাতীয় মন্ত্রিপরিষদের কথা ভাবেন, যেখানে বড়লাট হবেন রাজার মতোই সাংবিধানিক প্রধান (!) প্রতিরক্ষা (থাকবে) সংরক্ষিত। সুতরাং প্রতিরক্ষা নিয়েই আলোচনা চলতে থাকে...শেষে ক্রিপ্‌স্ বললেন, যৌথ দায়িত্বসহ কোনো জাতীয় মন্ত্রিপরিষদ সম্ভব নয়, আর বড়লাট যে হস্তক্ষেপমূলক

ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না—এমন আশ্বাস দেওয়া যাচ্ছে না। ক্রিপ্‌স্ প্রথমে যেমন আভাস দিয়েছিলেন এটা তার পুরো উল্টো ছবি। একে জাতীয় সরকার বলা অসম্ভব, বা জনসাধারণের উদ্দীপ্ত হওয়ার কারণ নেই' (আর জে মুর, পৃ. ১২৯-৩০)। এখানে ব্রিটিশের তরফে যে খানিক ভাঁওতা বা দু-মুখো কাজ করা হয়নি এমন সন্দেহ না-করাই কঠিন—যদিও, ক্রিপ্‌স্ নিজে এই খেলা স্বেচ্ছায় খেলেছিলেন না অচেতনভাবে—এ নিয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। চার্চিল-এর কাছে অবশ্যই 'কিছু যে করতেই হবে তাতে তেমন কিছু আসত যেত না, কিছু একটা করার যে চেষ্টা করা হয়েছে সেটা দেখাতে পারলেই হলো' (টমলিনসন, *ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*, পৃ. ১৫৬)। ১১ এপ্রিলের প্রচেষ্টার জন্য তিনি ক্রিপ্‌স্‌কে সাদর অভিনন্দন জানান, কারণ তাতে প্রমাণ হয়েছে 'একটা মীমাংসায় পৌঁছনোর জন্যে ব্রিটিশদের বাসনা কতটা বেশি...সারা ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফল হয়েছে সম্পূর্ণ হিতকারী।' (ম্যানসার, খণ্ড ১, পৃ. ৭৩৯)

ক্রিপ্‌স্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পুরো দায়িত্ব অবশ্যই ব্রিটিশের। তাহলেও, একথাও সত্যি যে, কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের একটা বড় অংশেই সম্ভবত গোড়া থেকেই ছিলেন অনুৎসাহী। বাস্তবিকই ঘটনাচক্র এর পর থেকেই গড়াতে থাকে সম্পূর্ণ সঙ্ঘাতের—ভা র ত ছা ড়ো আন্দোলনের—দিকে।

১৯৪২-১৯৪৫ : ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের শেষ পর্যায়

বিদ্রোহের মূল

১৯৪২-এর গ্রীষ্মে গান্ধীকে দেখা গেল এক বিচিত্র তথা অনন্য জঙ্গী মেজাজে। ভারতকে সঁপে দাও ভগবানের, অথবা অরাজকতার হাতে—তিনি বারবার ব্রিটিশদের জানান—'এই সুশৃঙ্খল নিয়মানুগ অরাজকতার বিদায় নেওয়াই উচিত, আর তার ফলে যদি চূড়ান্ত বেকানুনি আসে তো আমি সে ঝুঁকি নেব' (আমেরি-কে লিনলিথগো, ১৬ মে, সংবাদপত্রে গান্ধীর সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে প্রতিবেদন, ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৯৬)। ব্রিটিশরা চলে গেলে 'জাপানিরা তাদের পরিকল্পনা পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হবে' (*হরিজন* পত্রিকায় প্রবন্ধ, ৩ মে)। আর যা-ই হোক না কেন, সে-সমস্যা সামাল দেওয়ার কাজ নিজের মতো করে ভারতীয়দের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। অহিংসার প্রয়োজনীয়তার কথা অবশ্য বারবারই বলা হয়। ৮ অগাস্ট ১৯৪২-এ এ আই সি সি-র বোম্বাই অধিবেশনে যে বিখ্যাত 'ভা র ত ছা ড়ো' প্রস্তাব নেওয়া হয়, তারপরেই ডাক দেওয়া হয়, 'যতদূর সম্ভব বড় মাত্রায়, অহিংস পন্থায় গণ-সংগ্রামের'। সেটা হবে 'অবধারিতভাবেই' গান্ধীর নেতৃত্বে। কিন্তু, এর সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ধারা ছিল যেটি তাৎপর্যপূর্ণ : কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে যদি গ্রেপ্তার করে সরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে 'প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী এবং তার জন্যে সংগ্রামরত ভারতীয়কে অবশ্যই নিজেকে নিজের দিশারি হতে হবে...।' 'প্রত্যেক ভারতীয়কে ভাবতে হবে তিনি মুক্ত মানুষ...শুধু জেলে গেলেই কাজ হবে না'—ঐ একই দিনে গান্ধী বললেন তাঁর আবেগময় 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' ভাষণে। গান্ধীর

আর-একটি চূড়ান্ত চরিত্র-বিরোধী মন্তব্য হলো : '...যদি একটা সাধারণ ধর্মঘট ঘোর প্রয়োজন হয়ে ওঠে, তাহলেও আমি পিছিয়ে যাব না'—তিনি বলেন ৬ অগাস্টের এক সাক্ষাৎকারে। এখানে প্রসঙ্গত লক্ষ্য করা যায় যে, (জীবনে) এই প্রথম গান্ধী রাজনৈতিক ধর্মঘট সইতে রাজি হলেন এমন একটা সময়ে, যখন কমিউনিস্টরা তার থেকে দূরে থাকতে বাধ্য। ১৯২৮-২৯-এ বা ১৯৩০-এর দশকের শেষ দিকে এবং ১৯৪০-এর দশকের গোড়ায় বাম-পরিচালিত শ্রমিক জঙ্গীপনার আগের পর্বগুলোয় তাঁর মনোভাব ছিল একেবারেই উল্টো। ১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাবেও দেখা দিল সামাজিক র‍্যাডিকালিজম-এর অপ্রত্যাশিত সুর : 'কলে-কারখানায় ও অন্যত্র কর্মরত শ্রমজীবীদের থেকেই রাজন্যবর্গ, "জাগীরদার", "জমিনদার" আর সম্পত্তিবান ও অর্থবান শ্রেণী আহরণ করে তাদের ধন-সম্পদ। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, অবশ্যই শেষ অবধি তাঁদের [শ্রমজীবীদের]-ই হতে হবে' (ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৩৮৮)।

এই নতুন বাঁক ওলট-পালট করে দিল কংগ্রেসের ভিতরকার পুরোনো সমস্ত বিন্যাস। ক্রিপ্‌স্ মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর ২৭ এপ্রিল থেকে ১ মে অবধি কার্যনির্বাহী কমিটির যে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয় তাতে গান্ধীর কড়া নীতিকে একযোগে সমর্থন করেন প্যাটেল, রাজেন্দ্র প্রসাদ, কৃপালনী প্রমুখ দক্ষিণপন্থী এবং সোশালিস্টরা (অচ্যুত পটবর্ধন ও নরেন্দ্র দেব) আর নেহরু দেখলেন, বিচিত্রভাবে তিনি পড়ে গেছেন পাক্কা নরমপন্থী রাজাগোপালচারী আর ভুলাভাই দেশাই-এর দলে। ১৯৪২-এর গোড়ার দিক থেকে রাজাজী মুসলিম লীগের সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়ার প্রয়োজনের ওপর জোর দিচ্ছিলেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর, মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যাগুরু সেগুলি আলাদা হয়ে যাবে কিনা তা গণভোটের মাধ্যমে নির্ণয় করার অধিকার মেনে নিতে হবে। ঘটনাবলির আর এক বিচিত্র পুনর্বিন্যাস হলো : এ আই সি সি-র বোম্বাই অধিবেশনে কমিউনিস্টরাও খানিকটা একই অবস্থান নিলেন। জনসমষ্টির 'মোটামুটি সমরূপ কোনো অংশের' বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারের ভিত্তিতে লীগের সঙ্গে একটা যৌথ ফ্রন্ট গড়ে তোলার পক্ষে তাঁরা যুক্তি দেন। (৮ অগাস্ট-এর প্রস্তাবের ওপর ড. কে এম আশরফ ও এস জি সরদেসাই-এর সংশোধনী)। নেহরু শেষ অবধি, আগের অনেকবারের মতো, তাঁর সব সন্দেহ চেপে গিয়ে ভা র ত ছা ড়ো প্রস্তাব উত্থাপন করলেন, আর এ আই সি সি-তে তার বিরোধিতা করলেন একমাত্র কমিউনিস্ট সদস্যরা (ভুলাভাই আর রাজাজী জুলাই-এই পদত্যাগ করেছিলেন)।

ভা র ত ছা ড়ো অভ্যুত্থান চলাকালীন ও তার পরের ব্রিটিশ নথিপত্রে—যেমন টোটেনহ্যাম-এর *কংগ্রেস রেস্‌পনসিবিলিটি ফর দি ডিস্টারব্যানসেস* (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৩)-এ, বারবারই বলা হয়েছে যে, কংগ্রেসের এই মত-পরিবর্তনের কারণ হলো অক্ষশক্তির প্রতি গোপন সহানুভূতি। ১৯৪২-এর গণ-বিদ্রোহ নিঃসন্দেহে ছিল ব্যাপক ; আর তাকে দমনও করা হয় নৃশংসভাবে। তার সপক্ষে সারা দুনিয়ার ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনমতের সমর্থন আদায় করতে গেলে এই গোটা বিস্ফোরণকে 'পঞ্চম বাহিনী'র ইচ্ছাকৃত চক্রান্ত বলে চিত্রিত করাই ছিল সর্বোত্তম পন্থা। কলঙ্ক প্রচারের জন্য কিছু কিছু কথা ইচ্ছে করেই উপেক্ষা করা হয়েছে। যেমন, ব্রিটিশরা যখন স্পেন, অস্ট্রিয়া আর চেকোস্লোভাকিয়া-কে ফ্যাসিবাদীদের কাছে বেচে দিচ্ছিল, সেই ১৯৩০-এর দশক জুড়ে কংগ্রেস আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অবিচল ফ্যাসিবিরোধী ভূমিকা নিয়ে গেছে, আর রাশিয়া

ও চীনের প্রতি সহানুভূতি ও মিত্রশক্তিকে সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাবও নিয়েছে বহুবার—যেমন, ১ মে, ১৪ জুলাই ও ৮ অগাস্ট-এ যথাক্রমে এলাহাবাদ, ওয়ার্ধা ও বোম্বাই-এ। এমনকি তাঁর 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বক্তৃতাতেও গান্ধী ঘোষণা করেন যে, 'আমি রাশিয়া বা চীনের পরাজয়ের কারণ হতে চাই না', আর পি সি জোশীকে লেখা জনৈক কমিউনিস্টের একটি চিঠিতে (চিঠিটি পুলিশ মাঝপথেই গায়েব করে দিয়েছিল। আই বি নোট, ২৬ মে, ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ১২৭-৩২) দেখা যায়, মে মাসে এক একান্ত আলোচনায় তিনি পরিষ্কারভাবেই বলেছিলেন, জাপানকে যারা মুক্তিদাতা মনে করে তিনি তাদের সঙ্গে একমত নন। 'বস্তুতপক্ষে আমি মনে করি সুভাষ বসুকে আমাদের আটকাতে হবে।' কিন্তু তাহলেও দু-পক্ষের মধ্যে একটা সত্যিকারের তফাত ছিলই। একদিকে ছিলেন নেহরু সমেত এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী। তাঁদের কাছে এমন এক পৃথিবীর কল্পনাও ছিল আক্ষরিক অর্থেই অসহ যেখানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র বিধ্বস্ত আর হিটলার ও তোজো বিজয়ী। আর অন্যদিকে ছিলেন অধিকাংশ ভারতীয় দেশপ্রেমিক। ব্রিটিশদের একগুঁয়েমি আর অপশাসন তাঁদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। এর প্ররোচনায় তাঁরা ভাবতেন ঃ মিত্রশক্তির পরাজয় হলে ভারতের জাতীয় স্বার্থের হিসেবনিকেশ করাটাই হবে বিচক্ষণের কাজ। কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রে অগাস্ট ১৯৪২-এর পর, এই ব্যবধান হয়ে ওঠে অসেতুসম্ভব। এপ্রিলে, এলাহাবাদ-এ কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে গান্ধীর মূল খসড়াটিতে একটি বাক্য ছিল, 'ভারত যদি স্বাধীন হয়, তাহলে তার প্রথম কাজই হবে সম্ভবত জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা...জাপানের সঙ্গে ভারতের কোনো শত্রুতাই নেই'। নেহরুর চাপাচাপিতে এই অংশটি বাদ দেওয়া হয়। সম্মিলনে জওহরলাল যুক্তি দেখান যে, 'গান্ধীজী মনে করেছেন জাপান আর জার্মানি জিতবে। তাঁর এই মনে-হওয়াই অচেতনভাবে তাঁর সিদ্ধান্তকে চালিত করেছে'। জওহরলালের কথায় সম্ভবত একটুও ভুল নেই ('গোলমালের পেছনে কংগ্রেসের দায়িত্ব', পরিশিষ্ট ১)। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ১৯৪২-এর মাঝামাঝি, স্তালিনগ্রাদে পাশার দান উল্টে যাওয়ার আগে অবধি মিত্রশক্তির পরাজয়ই অনিবার্য মনে হয়েছিল।

কিন্তু তাহলেও, ৯ অগাস্ট ভোরে নেতাদের গ্রেপ্তার করে সরিয়ে দেওয়ার পর যে প্রাথমিক ও স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভ হয়েছিল, কংগ্রেসি নেতাদের হিসেবনিকেশ দিয়ে তার শুধু আংশিক ব্যাখ্যাই করা যায়। এখানে একটা কথা জোর দিয়ে বলা দরকার যে, এমনকি 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবও ছিল আসন্ন আন্দোলনের খুঁটিনাটির ব্যাপারে খুবই অস্পষ্ট। আরও আলাপ-আলোচনার রাস্তা আদৌ বন্ধ করে দেওয়া হয়নি, বরং মনে হয়, গোটা ব্যাপারটাই ছিল বিশেষ কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে শেষ সীমায় পৌঁছনোর একটা প্রয়াস, আর সেইসঙ্গে দরকষাকষিরও একটা জায়গা। কিন্তু এর পরেই যে-বিস্ফোরণ হয় তার একমাত্র কারণ হলো, ব্রিটিশদের সর্বাত্মক দমননীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত। আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্রিটিশরা এই অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যে, ৯ অগাস্ট-এর আগে কংগ্রেস সত্যিই এক হিংসাত্মক বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিল। যেমন, টোটেনহ্যাম-এর প্রতিবেদনে, ২৯ জুলাই ১৯৪২-এ অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির যে গোপন বিজ্ঞপ্তিটি উদ্ধৃত হয়েছে, তাতে কংগ্রেসিদের শুধু এইটুকু বলা হয়েছে, 'তৈরি হও, এই মুহূর্তে সঙ্ঘবদ্ধ হও, সজাগ থাকো, কিন্তু কখনোই কিছু কোরো না...যতক্ষণ-না মহাত্মাজী সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।' এই বিজ্ঞপ্তিপত্রে যে ছ-দফা কার্যক্রমের রূপরেখা আছে, তাতে জোর দেওয়া হয়েছে

মূলত চিরাচরিত গান্ধীপন্থী বিষয়ে, যেমন, নুন, আদালত, স্কুল ও সরকারি চাকরি বয়কট, বিদেশী কাপড় আর মদের দোকানে ধর্না ও 'কার্যত শেষ পর্যায়ে' কর-বন্ধ আন্দোলন (এবং তার সঙ্গে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন, কিন্তু 'জমিনদাররা যদি আন্দোলনে যোগ না দেন' তাহলেই)। অবশ্য 'শ্রমিক ধর্মঘট সংগঠিত করা'-র কথাও বলা হয়েছিল। আর যেসব ব্যাপারে 'নিষেধ করা হয়নি, কিন্তু উৎসাহও দেওয়া হয়নি', তার মধ্যে আছে, 'শুধু চেন টেনে' ট্রেন থামানো, বিনা টিকিটে ভ্রমণ আর টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কাটা। কিন্তু ভারতের বহু অংশেই ৯ অগাস্ট-এর পর থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রশক্তির যাবতীয় নিদর্শনের ওপর যে বিপুল ও তীব্র আক্রমণ নেমে আসে, তার তুলনায় ঐ নথিটিও, খানিকটা উগ্র হলেও, নেহাতই তুচ্ছ।

সুতরাং ব্রিটিশরা যে প্ররোচনা দিয়েছিল তার দিকটা অত্যন্ত স্পষ্ট। আমরা আগেই দেখেছি যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকেই, আমলারা সমস্ত রকম আপস মীমাংসার পথ বর্জন করেন, আর অবশ্যই একটা সঙ্ঘাতের মধ্যে যেতে চান এবং এইভাবেই, ১৯৩২-এর ধাঁচে কংগ্রেসের ওপর এক সর্বাত্মক আঘাতের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ব্রিটিশরাও আশাতীত পেয়ে যায়। ১৯৩২-এ যে-মাত্রায় আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল, তাকে দমন করা গিয়েছিল তুলনায় সহজে। কিন্তু, ৯ অগাস্ট থেকে যেসব ঘটনা ঘটতে থাকে, ৩১ অগাস্ট লিনলিথগো অপ্রকাশ্যে সে সম্বন্ধে বলেছিলেন, '১৮৫৭ থেকে আজ অবধি সবচেয়ে গুরুতর বিদ্রোহ। সামরিক নিরাপত্তার খাতিরে এর গুরুত্ব ও প্রসারকে আমরা এযাবত পৃথিবীর কাছ থেকে গোপন করে রেখেছি' (চার্চিলকে পাঠানো তারবার্তা, ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৮৫৩)। আমাদের যেটা বুঝতে হবে, সেটা হলো অগাস্ট ১৯৪২-এ মানুষের এই নতুন মেজাজের পেছনে কী কী গভীরতর উপাদান ছিল। গান্ধী অবশ্যই সেটা অনুভব করেছিলেন আর কমিউনিস্টদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে তা নিয়ে চিন্তা করেছিলেন। তত্ত্বগতভাবে কমিউনিস্টদের জনযুদ্ধের নীতি অযৌক্তিক ছিল না।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শ্বেতাঙ্গরা উৎখাত হয়ে গেল, জয় হলো এক এশীয় শক্তির। এতে শুধু শ্বেতাঙ্গদের সম্মানই যে ভূ-লুণ্ঠিত হলো তা-ই নয়, আবারও দেখা গেল ভারতীয় শাসকদের স্থূল বর্ণবিদ্বেষ। মালয়, সিঙ্গাপুর ও বর্মার ইওরোপীয়রা, যুদ্ধের নামে জোর করে সমস্ত রকম যানবাহন দখল করে নির্লজ্জের মতো পালিয়ে এল। সেখানকার আবাসী ভারতীয়দের প্রচণ্ড দুরাবস্থার মধ্যে পাহাড়-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে ফিরতে হলো। ফলে, শ্বেতাঙ্গ-বিরোধী ক্রোধের সঙ্গে মিশে গেল এই আশা : ব্রিটিশ শাসন শেষ হতে চলেছে—এটাই অগাস্ট ১৯৪২-এ জনসাধারণের মনোভাবের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের মধ্যে 'অগাস্ট বিদ্রোহ'-র তীব্রতা সবচেয়ে বেশি হয়েছিল যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চল আর পশ্চিম ও উত্তর-বিহারে। ব্যাপারটি সম্ভবত নেহাতই আপতিক নয়। প্রধানত যেসব অঞ্চল থেকে ভারতীয় অভিবাসী শ্রমিকরা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও পৃথিবীর অন্যান্য অংশে যেতেন, ঐ অঞ্চলটি চিরাচরিতভাবে তারই একটি। যেমন, আজমগড় জেলায় বিদেশ থেকে পাঠানো মানি-অর্ডার আসত বছরে ৩০ লক্ষ টাকার (আর এইচ নিবলেট, *কংগ্রেস রিবেলিয়ন ইন আজমগড়*, এলাহাবাদ, ১৯৫৭, পৃ. ২)। বাস্তুচ্যুতদের সাহায্য করার ব্যাপারে ব্রিটিশরা দুঃখজনকভাবে ব্যর্থ হয়। ফলে বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন।

আর বর্মার রণক্ষেত্র থেকে ফিরলেন ট্রেন-ভর্তি আহত সৈন্যরা। এঁরা সবাই মিলে ছড়িয়ে দিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে ক্রোধ ও বিরূপ মনোভাব। ঐ যুদ্ধ অধিকাংশ ভারতীয়ের কাছেই ছিল অপরিচিত ও অর্থহীন, যাতে শুধু দুর্দশাই আসে। আর ঐ মনোভাবের সঙ্গে যুক্ত হলো এই আশা যে, এই বিদেশী শাসনের পরিসমাপ্তি আসন্ন। যেসব ব্রিটিশ, মার্কিন ও অস্ট্রেলীয় সৈন্য ভারতে ছিল, তাদের বেশির ভাগের আচার-আচরণে কখনোই মনে হয় নি যে তারা এক 'জন-যুদ্ধ'র আদর্শবাদী ধর্ম-যোদ্ধা। জাতিগত দুর্ব্যবহার, বিশেষত ধর্ষণের সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস বারবার এই বলে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল যে বিদেশী সৈন্যরা শ্লীলতাহানি করছে। ইতোমধ্যে জিনিসপত্রের দামও চড়ে যাচ্ছিল (যেমন, যুক্ত প্রদেশের পূর্বাঞ্চলের ১৯৪২-এর এপ্রিল থেকে অগাস্ট-এর মধ্যে খাদ্যশস্যের দাম বাড়ে ৬০ পয়েন্ট)। আর ছিল ঘাটতি—বিশেষ করে চালের (যেখানে যেখানে বর্মা থেকে আমদানি বন্ধ হয়ে যায়) আর নুনের। নিজেদের দেশে ব্রিটিশরা কঠোর সমতামূলক রেশন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে অত্যন্ত দক্ষভাবে এক যুদ্ধকালীন অর্থনীতি পরিচালনা করছিল। কিন্তু তাদের উপনিবেশগুলিতে ঢালাও কালোবাজারি রোধ করার ব্যাপারে তারা তেমন গা করেনি। ১৯৪৩-এ খাদ্য নিয়ে বাঙলায় মুনাফাবাজি থেকেই সরকারিভাবে ভয়াবহ আকাল দেখা দেয়। দামের উর্ধ্বগতি ও ঘাটতির সঙ্গে সঙ্গে মিত্রশক্তির বিপুল সংখ্যক সৈন্য এসে যাওয়ায়, লোকের মনে আশঙ্কা হয়েছিল, দেশের মজুত খাদ্য বোধহয় সেনাবাহিনীকে খাওয়াতেই চলে যাচ্ছে। এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। যুদ্ধের সময়ে আমলাতান্ত্রিক অব্যবস্থা চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছয় বাঙলায়। সেখানে সমস্ত দেশী নৌকো বাজেয়াপ্ত করে, নষ্ট করে দেওয়ার হুকুম হয়। পুরোদস্তুর জাপ-আক্রমণ হলে বাঙলা ও আসামকে রক্ষা করা যাবে কিনা, সে সম্বন্ধে ১৯৪২-এর মাঝামাঝি ব্রিটিশদের নিজেদের সামর্থ্য বিষয়ে নিজেদেরই আশা ছিল অল্প। তাঁরা পেছিয়ে গিয়ে ছোটোনাগপুরের মালভূমি থেকে লড়াই চালানোর কথা ভাবছিলেন। 'পোড়া জমি'-র নীতি সফলভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছিল রাশিয়ায়। সেখানে সোভিয়েতের জনগণ লড়ছিলেন এক প্রকৃত দেশপ্রেমিক জনযুদ্ধ। তাই তাঁরা তাঁদের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গর্ব নিপার বাঁধও উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এক অধীন দেশের ওপর আমলাতান্ত্রিক হুমকির মাধ্যমে ঐ ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে যাওয়ার চেষ্টা ছিল এক বিরাট ভুল তথা প্ররোচনা। বাঙলার বহু অংশে বর্ষাকালে এমনকি এ-বাড়ি থেকে ও-বাড়ি যেতেও নৌকো লাগত। গান্ধী বলেন, 'পূর্ববঙ্গের লোকেদের নৌকো কেড়ে নেওয়া তাদের দেহের প্রয়োজনীয় অঙ্গ কেটে নেওয়ারই শামিল' (*হরিজন* পত্রিকা, ৩ মে ১৯৪২)।

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, ভারতীয় জনগণের একাধিক অংশ যুদ্ধের প্রথম দফায় লাভবান হয়েছিলেন। বিশেষত শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বণিকরা সাধারণভাবে যুদ্ধের ঠিকাদারি থেকে মুনাফা করছিল। ১৯৪২-এর অল্প কিছুদিন বাদ দিয়ে, যুদ্ধের পুরো সময়টা জুড়েই মুনাফা লোটা হয়। ঠিকাদার আর কালোবাজারিদের অন্তত একটা বড় অংশই ছিল ভারতীয়। কিন্তু ১৯৪২-এর ঐ একটা সময়ে ভারতীয় বণিক সম্প্রদায়ের বেশ বড় এক অংশের হিসেবে, মনে হয়, অন্য ধরনের কিছু বিচার-বিবেচনাও বেশ গুরুত্ব পেয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের লাট ২৫ মে ১৯৪২-এ লিনলিথগো-কে লেখেন যে, দু-বছর আগেও ভারতীয় ব্যবসাদাররা ভালোভাবেই যুদ্ধের পক্ষে ছিলেন, কিন্তু 'মালয় ও বর্মায় যা ক্ষতি হয়েছে, তাতে বানিয়া আর মারোয়াড়িদের অন্তরাত্মা

কেঁপে উঠেছে...অ তি রি ক্ত মু না ফা ক র-এর জন্যে যে-যুদ্ধ থেকে কোনো লাভ হচ্ছে না এবং সেইসঙ্গে সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুন-এ যে ক্ষয়ক্ষতির অভিজ্ঞতা হয়েছে—এর কোনোটাই তাদের পছন্দসই নয়...একটা ব্যাপার যথেষ্ট পরিষ্কার যে কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটিতে যেসব পুঁজিপতি আছেন, সম্ভাব্য জাপানি আক্রমণের ক্ষতি থেকে নিজেদের সম্পত্তি বাঁচাবার জন্যে যতদূর যাওয়া যায় তাঁরা প্রায় ততদূরই যাবেন' (ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ১১৭-১৯)। এ বিষয়ে এখনও কোনো গবেষণা হয় নি। কিন্তু এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, ভারতীয় ব্যবসাদাররা অল্প কিছুদিনের জন্যে হয়তো সেই আন্দোলনকে গোপনে মদত জুগিয়েছিলেন, যে-আন্দোলন (সহিংস হলেও) ব্রিটিশদের দ্রুত বার করে দিতে পারে। আর তার পরেই আসবে অন্য এক শান্তির সময়। এর বিকল্প ছিল পোড়া জমির নীতি, বোমাবর্ষণ আর প্রকৃত যুদ্ধের ফলে বাস্তুচ্যুতি তথা সম্পত্তিনাশ। অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ জামশেদপুর ও আহ্‌মেদাবাদের শিল্পাঞ্চল ধর্মঘটে পঙ্গু হয়ে গেলেও কর্তৃপক্ষের দার্শনিকসুলভ নির্লিপ্ততা ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু আন্দোলন যেই পরাস্ত হলো, আর জাপানিদের অগ্রগতিও আসাম সীমান্তে এসে স্পষ্টতই থেমে গেল, স্বাভাবিকভাবে হিসেবও গেল পাল্টে। ভারতীয় ব্যবসাদাররা ব্রিটিশের যুদ্ধপ্রয়াসকে 'সমর্থন' জানিয়ে সানন্দে ফিরে গেলেন তাঁদের আরও নিত্যকর্মে, অর্থাৎ ফাটকা ও মুনাফার পেছনে দৌড়নোয়।

অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলনের তুলনায় 'অগাস্ট বিদ্রোহ' সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখনও বেশ কম। তাহলেও, আন্দোলনের সর্বভারতীয় ধাঁচ তথা সামাজিক গঠন বিশ্লেষণ করে, ঐ ধরনের তথ্য সাজানোর চেষ্টা আমরা করতে পারি। তারপর আসবে বিশ্লেষণ।

সর্বভারতীয় ধাঁচ

৯ অগাস্ট খুব ভোরে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তারের পরই সারা দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব গণ-রোষের এক বন্যা বয়ে গেল। আগের আন্দোলনের মতো এবারেও, প্রতিষ্ঠিত নেতাদের সরিয়ে দেওয়ার ফলে, আরও তরুণ ও জঙ্গী কর্মীদের চলতে হলো তাঁদের নিজেদের উদ্যোগে, আর নিচুতলা থেকে চাপ দেওয়ার সুবিধেও হলো বেশি। যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ ও অন্তর্ঘাতী কাজ করতে চায় কংগ্রেস—আমেরি-র এই মিথ্যা প্রচার শতগুণ জোরে তাদের ওপরেই ফিরে এল। কারণ, অনেকেই বিশ্বাস করেছিলেন, এটাই হয়তো সত্যিসত্যিই ছিল কার্যনির্বাহী কমিটির পরিকল্পনা। যেমন, মহাদেব দেশাই গ্রেপ্তার হওয়ার পর কে জি মুসুরওয়ালা *হরিজন* পত্রিকার খুব জঙ্গী দুটি সংখ্যা বার করেন। পরবর্তীকালে বিভিন্ন আত্মগোপনকারী গোষ্ঠী বেশ কিছু নির্দেশনামা জারি করে—সবই এমন এক এ আই সি সি-র নামে যার অধিকাংশ সদস্যই কারান্তরালে।

ভা র ত ছা ড়ো আন্দোলনের পরিষ্কার তিনটি বড় পর্ব চিহ্নিত করা যায়। প্রথম দিকের ব্যাপক ও উগ্র আন্দোলন ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। এর মধ্যে পড়ে হরতাল, ধর্মঘট এবং অধিকাংশ শহরে পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ। এই পর্বের আন্দোলন দ্রুত দমন করা হয়। আগের অনেক বারের মতোই এবারেও ৯-১৪ অগাস্ট অবধি, বোম্বাই ছিল ঝড়ের কেন্দ্র। কলকাতায় হরতাল হয় ১০ থেকে ১৭ অগাস্ট। দিল্লীতে হিংসাত্মক সঙ্ঘর্ষের পর বহু

লোক হতাহত হন। আর পাটনায়, ১১ অগাস্ট সচিবালয়ের সামনে বিখ্যাত সঙ্ঘর্ষের পর দুদিনের জন্যে শহরের নিয়ন্ত্রণ কার্যত হারিয়ে যায়। দিল্লীতে সঙ্ঘর্ষের জন্যে দায়ী ছিলেন 'মূলত ধর্মঘটী মিল-শ্রমিকরা' (আমেরি-কে লিনলিথগো, ১২ অগাস্ট), আর পরের দিনই বড়লাট তাঁর প্রতিবেদনে 'লখনউ, কানপুর, বোম্বাই, নাগপুর ও আহ্‌মেদাবাদে' ধর্মঘটের কথা জানাল (ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৬৬৯, ৬৮২-৩)। ২০ অগাস্ট থেকে ১৩ দিন টাটা ইস্পাত কারখানা ছিল সম্পূর্ণ বন্ধ। শ্রমিকদের একমাত্র স্লোগান ছিল, 'জাতীয় সরকার গঠন না-হওয়া অবধি তারা কাজ শুরু করবে না' (আমেরি-কে লিনলিথগো, ২১ অগাস্ট, *ঐ*, পৃ. ৭৭৭)। আহ্‌মেদাবাদের সুতোকলে ধর্মঘট চলেছিল সাড়ে তিন মাস। জনৈক জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক পরে এই শহরটিকে 'ভারতের স্তালিনগ্রাদ' আখ্যা দিয়েছেন (গোবিন্দ সহায়, *'৪২-রিবেলিয়ন*, দিল্লী, ১৯৪৭, পৃ. ১২৮)। আন্দোলনের এই প্রথম পর্বে শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপস্থিতি ছিল খুবই লক্ষণীয়, প্রথম সারিতে ছিলেন ছাত্ররা।

অগাস্ট-এর প্রায় মাঝামাঝি থেকে আন্দোলনের ভরকেন্দ্র সরে গেল গ্রামে। বেনারস, পাটনা, কটক প্রভৃতি কেন্দ্র থেকে জঙ্গী ছাত্ররা দলে দলে বাইরে ছড়িয়ে পড়লেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করা হলো বিপুল মাত্রায়, এবং শ্বেতাঙ্গ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁরা যথার্থই এক কৃষক বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিলেন। কোনো-কোনোভাবে এই বিদ্রোহ ১৮৫৭-র কথা ভীষণ মনে করিয়ে দেয়। উত্তর তথা পশ্চিম-বিহার আর পূর্ব যুক্ত প্রদেশ, বাঙলার মেদিনীপুর ও মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং ওড়িশার কোনো কোনো অঞ্চল ছিল দ্বিতীয় পর্বের মূল কেন্দ্র। এই পর্বে বেশ কয়েক জায়গায় আঞ্চলিক 'জাতীয় সরকার' গঠন করা হয়। সাধারণত সেগুলি ছিল অল্পায়ু।

এই পাশবিক অত্যাচারে (১২ সেপ্টেম্বর ভারত সরকার ভারত-সচিবকে জানায় যে, আন্দোলন দমনের কাজে কম করেও ৫৭ ব্যাটেলিয়ন সেনা ব্যবহার করা হয়েছে, ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৯৫২-৩) হীনবল হয়ে, সেপ্টেম্বর-এর শেষ দিক থেকে আন্দোলন প্রবেশ করে তার দীর্ঘতম কিন্তু সবচেয়ে কম শক্তিশালী পর্বে। এই পর্বের বৈশিষ্ট্য হলো, যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর ঘাঁটির বিরুদ্ধে শিক্ষিত যুবকদের সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ। কখনও কখনও এটা গেরিলা যুদ্ধের স্তর অবধিও উঠেছিল (যেমন ঘটেছিল উত্তর-বিহার-নেপাল সীমান্তে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে)। কোথাও-কোথাও আংশিক সময়ের কৃষক-বাহিনী দিনের বেলা চাষ করতেন, আর রাত্তিরে করতেন অন্তর্ঘাতমূলক কাজ (তথাকথিত 'কর্ণাটক পদ্ধতি')। আর কোনো কোনো অঞ্চলে গোপনে কাজ করতে শুরু করেছিল সমান্তরাল 'জাতীয় সরকার'। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মেদিনীপুরের তমলুক, মহারাষ্ট্রের সাতারা আর ওড়িশার তালচের। যে-কোনো মানদণ্ডেই অত্যন্ত মনোগ্রাহী ও বীরোচিত হলেও, এইসব কাজকর্ম অবশ্য ব্রিটিশ শাসন বা মিত্রপক্ষের যুদ্ধ-পরিকল্পনার কাছে আর খুব একটা ভয়ের ব্যাপার ছিল না। ছোটোখাটো 'জাতীয় সরকার'গুলি শেষ অবধি এসে ঠেকল নেহাৎই বিচ্ছিন্ন জেলা মেদিনীপুরের একপ্রান্তে। কিন্তু কলকাতায় তা নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ ঘটেনি এবং আরাকান ও আসাম সীমান্তের যোগাযোগ ব্যবস্থাও তাতে ভেঙে পড়ে নি। সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ অবধি 'তমলুক জাতীয় সরকার' টিকে থাকার নিঃসন্দেহে এটাও একটা কারণ।

আন্দোলনের ব্যাপ্তি, আর এই আন্দোলন গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে যে দমন-পীড়নের বন্যা

বইয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার তীব্রতা—এ-দু-এর সম্বন্ধেই খানিকটা আঁচ করা যায় সরকারি পরিসংখ্যান থেকে। ১৯৭৩-এর শেষাশেষি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ৯১,৮৩৬ জন। গ্রেপ্তারের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (২৪,৪১৬), যুক্ত প্রদেশ (১৬,৭৯৬) ও বিহার (১৬,২০২)-এ। ২০৮টি পুলিশ চৌকি, ৩৩২টি রেল স্টেশন আর ৯৪৫টি ডাকঘর ভাঙচুর বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় ; এবং ৬৬৪টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। উত্তেজিত জনতার পুলিশ স্টেশনে ঢুকে পড়ার ঘটনা বিহারে সবচেয়ে বেশি (২০৮টির মধ্যে ৭২টি) ; কিন্তু সেই তুলনায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা কম, মাত্র ৮টি—তুলনায় বোম্বাই-এ বোমার ঘটনা ৪৪৭টি। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিহারে জনগণ যোগ দিয়েছিলেন অনেক বেশি মাত্রায়, আর বোম্বাই-এ সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম ছিল অনেক বেশি সংগঠিত। পুলিশ বা সেনাবাহিনীর গুলিতে মারা যান ১০৬০ জন (প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় সংখ্যাটা অনেক কমানো)। আর পুলিশদের মধ্যে, অভ্যুত্থান রুখতে গিয়ে ৬৩ জন প্রাণ হারান আর ২১৬ জন চাকরি ছাড়েন, তার মধ্যে ২০৫ জনই বিহারে ('হোম পলিটিকাল', ৩/৫২/১৯৪৩। ওয়াই বি মাথুর, *কুইট ইন্ডিয়া মুভমেন্ট*, দিল্লী, ১৯৭৯, পৃ. ১৯০-৯২-এ উদ্ধৃত)। একটি কংগ্রেস সূত্রে, সরকারি বর্বরতা সম্বন্ধে তমলুক মহকুমায় ৭৪টি ধর্ষণের ঘটনা তালিকাভুক্ত করা হয়েছে, তার মধ্যে ৯ জানুয়ারি ১৯৪৩-এ একটিমাত্র গ্রামেই ৪৬টি (সতীশ সামন্ত ও অন্যান্য, *অগাষ্ট রেভলিউশন অ্যান্ড টু ইয়ারস্ ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ইন মেদিনীপুর* কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ. ৪০)। পূর্ব-যুক্ত প্রদেশের আজমগড়ের জেলাশাসক আর এইচ নিবলেট-কে অত্যন্ত নরম হওয়ার অপরাধে, সরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তাঁর চমকপ্রদ রোজনামচায় এমন অজস্র ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা 'একেবারেই অপ্রয়োজনীয়...শ্বেত সন্ত্রাস'। 'কয়েক মাইলের মধ্যে সমস্ত গ্রামে আগুন লাগানোর জন্যে', ব্রিটিশরা 'অগ্নিসংযোগকারী পুলিশবাহিনী' নামিয়ে দিয়েছিল। নিবলেট বলেছেন, 'দফায় দফায় সরকারি আতঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে 'অত্যাচারই ছিল সে-দিনের নিয়ম' ঃ আর যৌথ জরিমানা-কে তিনি বলেছেন 'সরকারি ডাকাতি'। নিবলেট তাঁর লোকজনকে বৃথাই এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন ঃ 'মনে রেখো তোমরা শিকার বা তাণ্ডব করতে বেরোও নি'। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা কীভাবে ব্যর্থ হয় সে-কথাও তিনি স্মরণ করেছেন (আর এইচ নিবলেট, পৃ. ২৬, ৪০, ৪৪, ৪৯)। গণ-হারে বেত মারা হয় অবাধে। তার সঙ্গে চলে অন্যান্য পরিশুদ্ধ অত্যাচারের পদ্ধতি, যেমন গুহ্যদ্বারে ডাণ্ডা ঢোকানো। আবারও এর সঙ্গে সত্যিকারের তুলনা করা চলে একমাত্র ১৮৫৭-র। তফাত শুধু এই যে, এখন ব্রিটিশদের হাতে ছিল আধুনিক সমরবিজ্ঞানের যাবতীয় সরঞ্জাম আর জনগণ প্রায় পুরোপুরিই নিরস্ত্র। পাটনার আশেপাশে যে-জনতা যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল, অনেক আগেই ১৫ অগাস্ট লিনলিথগো তাদের ওপর 'আকাশ থেকে মেশিনগান চালাতে' বলেন। বিহারের ভাগলপুর ও মুঙ্গের, বাঙলার নদীয়া ও তমলুক আর ওড়িশার তালচের-এও বিমান ব্যবহার করা হয়।

সামাজিক গঠন

আমরা আগেই দেখেছি, আন্দোলনের সামাজিক দিকটি বিশ্লেষণ করতে দেখা যায়, শ্রমিকরা গোড়ার দিকে এই আন্দোলনে যোগ দিলেও তাঁদের ভূমিকা ছিল কিছুটা অল্পমেয়াদি ও সীমিত।

১৪ অগাস্ট-এর মধ্যেই লিনলিথগো জানাচ্ছিলেন, 'মিল কর্মীরা বসে যাচ্ছে'। আর অরবিন্দ সহায়-এর মনে পড়েছে যে, বোম্বাই শহরে 'সাধারণভাবে শ্রমিকদের এবং বিশেষভাবে সুতোকল-শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল খুবই অল্প...' (ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৬৯১ ; গোবিন্দ সহায়, পৃ. ৮৯)। কলকাতার শিল্পাঞ্চলও মোটামুটি শান্তই ছিল। আর এই দু-জায়গাতেই মনে হয় শ্রমিকদের রাশ অনেকটাই টেনে রেখেছিল কমিউনিস্টদের আন্দোলন-বিরোধিতা। জামশেদপুর, আহ্‌মেদাবাদ ছাড়া ছোটো-ছোটো কেন্দ্রগুলোতে—যেমন আহ্‌মেদনগর ও পুণায়—কয়েক মাসের জন্যে শ্রমিকরা বেশ যথেষ্ট পরিমাণেই যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সব জায়গায় কমিউনিস্টদের কাজকর্ম ছিল সামান্য। আর গান্ধীপন্থী প্রভাবের ফলে, 'শ্রম ও পুঁজির মধ্যে ছিল হার্দ্য সম্পর্ক'—'কর্মীরা কাজে না আসায় মিল-মালিকরা বিক্ষুব্ধ হননি' (গোবিন্দ সহায়, পৃ. ১১০)। বাঙ্গালোরে ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিলেন কংগ্রেস নেতা কে টি ভাষ্যম। সেখানে ৩০,০০০ শ্রমিক অল্প কিছুদিনের জন্যে ধর্মঘট করেন (জেমস ম্যানর, পৃ. ১৩৬-৪৬)। ব্যবসাদাররা কতটা যোগ দিয়েছিলেন সে নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো বিশদ আলোচনা হয় নি, কিন্তু সহায় লক্ষ্য করেছেন যে বোম্বাই-এ তা ছিল যথেষ্টই (পৃ. ৮৮)। কৌতূহলের ব্যাপার হলো, ডিসেম্বর ১৯৪২-এর একটি বেআইনি সমাজবাদী ইশ্‌তেহার *দি ফ্রিডম স্ট্রাগল ফ্রন্ট*-এ সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে, 'শ্রেণীর প্রশ্নে সতীত্ব নাশের কুমারীসুলভ আতঙ্ক' যেন 'ধনী মিল-মালিক ও ব্যাঙ্ক-মালিকদের' কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য 'চাওয়া ও নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় না হয়'। ১৯৪২-এর গোপন জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপে উচ্চশ্রেণী তথা উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের প্রচ্ছন্ন সমর্থনের গল্পও চালু আছে। জাতীয়তাবাদী কর্মীদের অধিকাংশেরই গোপন কাজকর্মের অভিজ্ঞতা একেবারেই ছিল না, যেমন ছিল সন্ত্রাসবাদী বা সি পি আই-এর কর্মীদের ; কিন্তু ঐ ধরনের সমর্থন পেয়ে তাঁরা গড়ে তুলতে পেরেছিলেন যথেষ্ট কার্যকর এক বেআইনি সংগঠন যন্ত্র। এর মধ্যে এমনকি একটি গোপন বেতার কেন্দ্রও ছিল। উষা মেহ্‌তার পরিচালনায় এটি বোম্বাই-এ চলেছিল তিন মাস ধরে।

আইন অমান্য আন্দোলনের সময়ে মধ্যশ্রেণীর ছাত্ররা তেমন একটা যোগ দেননি। ১৯৪২-এ, কী শহরের সঙ্ঘর্ষে, কী অন্তর্ঘাতের সংগঠক হিসেবে বা কৃষক আন্দোলনের উদ্দীপক হিসেবে, তাঁরাই ছিলেন প্রথম সারিতে। কিন্তু, অগাস্ট আন্দোলন যে-কারণে দুর্দম হয়ে উঠেছিল তা হলো : কোনো কোনো অঞ্চলের ব্যাপক কৃষক-অভ্যুত্থান। এর ফলে সরকারি কর্মকর্তারা কিছু কিছু বিচিত্র জিনিস আবিষ্কার করে বসলেন। যেমন, বিহারের একটা গোটা অঞ্চলই (সারন) নাকি 'অপরাধপ্রবণ জেলা হিসেবে কুখ্যাত', বা 'বিহারের গ্রামের ব্যাপক অপরাধীদের মধ্যে' ছাত্ররা নাকি 'খুবই ইচ্ছুক মিত্র খুঁজে পেয়ে যাচ্ছে' (লিনলিথগো-কে বিহারের লাট, স্টুয়ার্ট-এর চিঠি, ২২ অগাস্ট ১৯৪২, ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৭৯০)। *কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ* গ্রন্থে ম্যাক্স্ হারকোর্ট-এর যে লেখাটি আছে, তাতে তিনি পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ-পশ্চিম-বিহার অঞ্চলের 'জনতা'র সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাতে অবশ্য দেখা যায় (আগের সব জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের মতোই)। ১৯৪২-এর আন্দোলনেও মূলত যোগ দিয়েছিলেন ছোটো জোতমালিক চাষীরা, নিত্য 'অপরাধী' বা ছিন্নমূল 'দাঙ্গাবাজ'-রা নন। যাঁরা গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর লোকই ছিলেন বেশি (নমুনা হিসেবে যে ১২১৪ জনকে নেওয়া

হয়, তার মধ্যে ১৭% ব্রাহ্মণ, ২৭.৫% রাজপুত ও ভূমিহার, আর তার তুলনায় ৭.৪% অস্পৃশ্য ও ৪.২% জনগোষ্ঠীয়)। আর একটি নমুনায় দেখা যায়, ২৪২ জনের মধ্যে ৩৬.৫% কিসান, ০.৮% জমিনদার আর ৩.৫% কৃষি-শ্রমিক। দুঃখ এই যে, নমুনাগুলি সংখ্যায় কম, আর বর্গগুলিও অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট এবং গোটা লেখাটিতেই এমন কতক চমকে ওঠার মতো ভুল আছে যা সন্দেহ জাগিয়ে তোলে (যেমন, আজমগড়-এর বদলে নিবলেট-এর বিবরণটিকে বলা হয়েছে বালিয়া-র)। এ-নিয়ে গবেষণার একটা বিরাট এলাকা অবশ্যই পড়ে আছে।

ব্রিটিশ-বিরোধী জঙ্গীপনার মাত্রার হিসেবে, ১৯৪২ স্পষ্টতই আগের সমস্ত কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। ১৮৫৭-র মতোই, বিদেশী বিরোধী মনোভাবের বিস্তারই সম্ভবত অভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও সামাজিক র‍্যাডিকাল ভাব অনেক কমিয়ে দেয়। 'স্বাধীনতা সংগ্রাম মোর্চা'-য় কিছুটা যেন ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলা হয়েছে, 'শ্রেণী সংগ্রাম হয়তো আসবেই, কিন্তু সেটা এখন নয়, বিদেশী শোষণ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আগে অবধি নয়।' আর, এ আই সি সি বা 'গান্ধীবাবা'-র নামে যেসব গোপন নির্দেশনামা জারি হতো, তাতে বারবার বলা হচ্ছিল যে, খাজনা-বন্ধ আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখতে হবে শুধু সেইসব ক্ষেত্রেই যেখানকার জমিনদাররা রাজভক্ত ('গোলমালের পেছনে কংগ্রেসের দায়িত্ব', পরিশিষ্ট ৫, ৬, ৭, ৮ ও ১৩)। 'এই আন্দোলনের একটা বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর কোনো আক্রমণ হয়নি' (গোবিন্দ সহায়, পৃ. ৯৬)। এমনকি ১৯৩০-৩৪-এর মতো রাজস্ব-বন্ধ আন্দোলনও তত সর্বব্যাপক হয় নি। আজমগড়-এর ক্ষেত্রে, নিবলেট মনে রেখেছেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার হলো রাজস্ব আদায় করতে বিশেষ কোনো অসুবিধে হয় নি', আর 'পাটোয়ারিদের কাগজপত্র ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে মাত্র দু-তিনটি'। জেলায় একটিমাত্র ক্ষেত্রেই শুধু 'ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর আক্রমণ হয়েছে', তাও এক অনুপস্থিত শ্বেতাঙ্গ জমিনদারের সম্পত্তির ওপর, আর অন্যত্র 'এমনকি বীজ-ভাণ্ডারও তছনছ করা হয়নি' (নিবলেট, পৃ. ২৯-৩১, ১৭)। নিবলেট-এর জীবন্ত বিবরণ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 'এবার স্বরাজ পাওয়া গেছে' (ঐ, পৃ. ১৩)—এই বিশ্বাসের উদ্দীপনায় জনতা থানা দখল করেছিল। ব্রিটিশদের অত্যাচারে একবার যখন সেই বিশ্বাস নির্মমভাবে ভেঙে গেল, তখনই কৃষকদের আরও অব্যবহিত প্রয়োজন-অনুসারী কোনো সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাবে কৃষক-অভ্যুত্থানও অচিরেই মিলিয়ে যেতে থাকল। কেবল উন্নততর পদ্ধতি দিয়ে আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার যে চেষ্টা আত্মগোপনকারী নেতারা করছিলেন (যেমন, 'সমস্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্দেশে' প্রচারপত্রে একটি প্রকৃত বিপ্লবী গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার জন্যে জয়প্রকাশ নারায়ণের ডাক বা নাসিক পুলিশের বাজেয়াপ্ত-করা প্রচারপত্র 'বিপর্যস্ত করে দেওয়ার অ আ ক খ') তাতেও শেষ অবধি পরিস্থিতির কোনো হেরফের হয় নি। কৌতূহল জাগানোর মতো ব্যাপার হলো (পরে আমরা দেখব): 'জাতীয় সরকার'গুলি সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল সেইসব জায়গায়, যেখানে স্থানীয় পরিস্থিতি, মনে হয়, জঙ্গী নেতাদের আরও সুনির্দিষ্ট ও র‍্যাডিকাল সামাজিক-আর্থনীতিক কর্মসূচি গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল—যেমন, তমলুক, তালচের বা সাতারায়।

আঞ্চলিক রকমফের

১৯৪২ নিয়ে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা প্রায় নেই বললেই চলে। তাহলেও আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও প্রকৃতির রকমফের নিয়ে সাধারণভাবে কয়েকটি দিকের আলোচনা করাই যায়। পাঞ্জাব আর এমনকি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-ও ছিল অস্বাভাবিক রকমের শান্ত। গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে মাত্র দুটি, আর প্রায় ২৫০০ লোক গ্রেপ্তার হন। পাঞ্জাবের রাজনীতি ইতোমধ্যেই হিন্দু, মুসলমান বা শিখ সাম্প্রদায়িকতার ছাঁচে পাকা ঢালাই হয়ে গিয়েছিল, আর যুদ্ধের সময়ে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ ও শস্যের দাম বেড়ে চলার ফলে কৃষককুলও ছিল চুপচাপ। তাদের মধ্যে গড়ে উঠছিল কুলাক-জাতীয় এক সমৃদ্ধিশালী উচ্চতর স্তর। আর ক্রমাগত মুসলমান সমর্থন হারিয়ে চলার যে প্রবণতা, তারই প্রতিফলন হলো উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এ কংগ্রেসের দুর্বলতা। ৪২-এর আন্দোলন থেকে মুসলমানরা প্রায় সর্বত্রই দূরে সরে ছিলেন, যদিও সক্রিয়ভাবে বিরোধী বা ব্রিটিশদের পক্ষে ছিলেন না—আন্দোলন চলার সময়ে কোনো বড় সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষ হয় নি। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতেও আন্দোলন ছিল তুলনায় দুর্বল। ব্যতিক্রম হলো কয়েকটি বিক্ষিপ্ত অঞ্চল, যেমন উপকূলবর্তী অন্ধ্রের গুণ্টুর ও পশ্চিম গোদাবরী জেলা আর কোয়েম্বাটুর ও তামিলনাড়ু-র ক্ষেত্রে মনে হয় রাজাজী-র বিরোধিতা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ উপনিমিত্ত আর কমিউনিস্টদের বিরূপতার ফলে কেরলে তার সুর ছিল খাদে। আত্মগোপনকারী কংগ্রেস ও সমাজবাদী নেতারা দেশীয় রাজ্যের জনগণের কাছে আবেদন জানালেও (যেমন, 'এ আই সি সি-র বারো দফা কর্মসূচি —গোলমালের পেছনে কংগ্রেসের দায়িত্ব', পরিশিষ্ট ৫) ঐসব জায়গায় এই আন্দোলনের তীব্রতা ১৯৩৮-৩৯-এর চেয়ে ছিল সাধারণভাবে অনেক কম। বড় বড় রাজ্যের মধ্যে গুরুতর রকমে প্রভাবিত হয়েছিল একমাত্র মাইশোরই। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের মতোই, আমরা ইতোমধ্যেই যেমন দেখেছি, এখানকার আন্দোলনেও ছিল ত্রি-স্তর ধাঁচ : বাঙ্গালোর শহরে বিক্ষোভ ও ধর্মঘট, গ্রামীণ আন্দোলন (বিশেষত হাসান ও শিমোগা জেলায়) আর গুপ্ত ছাত্রগোষ্ঠীগুলির অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ।

ঝড়ের চারটি মূল কেন্দ্র ছিল বিহার-পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ, মেদিনীপুর, ওড়িশা, আর মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক। এইসব জায়গায় পাওয়া যায় পুরোপুরি আলাদা এক ছবি : সত্যিকারের দুর্দম গণ-বিদ্রোহ। বিহারে আন্দোলনের তীব্রতা ও বিস্তার দুই-ই ছিল সর্বাধিক। ১৯৩০-এর দশকে এই প্রদেশটিই হয়ে উঠেছিল কিসান সভার মুখ্য ঘাঁটি; আর কমিউনিস্টরা ও সহজানন্দ যুদ্ধের পক্ষে দাঁড়ানো সত্ত্বেও এখানকার কিসান সভার কর্মীরা দলে দলে যোগ দিলেন সমাজবাদীদের দিকে। একমাত্র বায়ুপথে ছাড়া কিছুদিনের জন্যে পাটনা শহরের সঙ্গে গয়া ছাড়া অন্য সব জেলার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর উত্তর ও মধ্য-বিহারের দশটি জেলায় ৮০% থানা বেদখল হয়ে যায় বা সাময়িকভাবে ছেড়ে চলে যেতে হয়। জনগোষ্ঠীর লোকেরাও যথেষ্ট পরিমাণে যোগ দিয়েছিলেন, কারণ একটি কংগ্রেস সূত্রে হিসাব দেওয়া হয়েছে, হাজারিবাগ জেলায় নিহতের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক (১৭৬১ জনের মধ্যে ৫৩৩; তারপরেই সারনে —৫১৭, ভাগলপুরে —৪৪৭, গোবিন্দ সহায়, পৃ. ১৩৫)। ভোজপুরী-ভাষী পশ্চিম-বিহার থেকে আন্দোলনের ঢেউ দ্রুত আছড়ে পড়ল আর্থনীতিক-সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চিম যুক্ত প্রদেশের অনুরূপ অঞ্চল বেনারসে। বালিয়া-র দশটি পুলিশ থানাই বেদখল হয়ে যায়, আর স্থানীয় কংগ্রেস

নেতা চিতু পান্ডে-র নেতৃত্বে গঠন করা হয় একাধিক অস্থায়ী জাতীয় সরকার। পাশের জেলা গাজিপুরেও জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল। ১৫-১৭ অগাস্ট আজমগড়ের মধুবন পুলিশ থানা দখলের মনোমুগ্ধকর বিবরণ দিয়ে গেছেন নিবলেট। ৫০০০ লোকের এক মিছিল থানায় আসে, তাদের সঙ্গে শুধু লাঠি আর বল্লমই ছিল না, ছিল 'লাঙলের ফাল, হাতুড়ি, করাত ও কোদাল ... দূর থেকে তাদের লাঠি আর বল্লম দেখে মনে হচ্ছিল এক "সরপত" [শরের] জঙ্গল এগিয়ে আসছে।' আসলে এ ছিল সত্যিই গ্রামীণ জনগণের সমস্ত সক্ষম ব্যক্তিকে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা, যদিও দুজন জমিদার আটকে পড়া [ব্রিটিশ] বাহিনীকে গোপনে খাবার জুগিয়েছিল (নিবলেট, পৃ. ১৩-১৮)। পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ ও বিহারের ১৬টি গুরুতরভাবে আক্রান্ত জেলায় শৃঙ্খলা ও স্বাভাবিক যোগাযোগ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে বেশ কয়েক সপ্তাহ লাগে আর সত্যিই বিপুল সংখ্যায় সেনা ও পুলিশবাহিনী ব্যবহার করতে হয়। তবুও ১৯৪৪ অবধি এখানে-ওখানে গেরিলা কার্যকলাপ চলেছিল, বেশ কয়েকটি স্থানীয় সমান্তরাল সরকারও। সেগুলি আবার আলগাভাবে যুক্ত ছিল নেপাল-সীমান্তে ঘাঁটি গাড়া জয়প্রকাশ নারায়ণ ও রামমনোহর লোহিয়ার অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে।

বিদ্রোহী 'জাতীয় সরকার'-এর সবচেয়ে ভালো বিবরণ পাওয়া যায় মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমা থেকে। এর ইতিবৃত্ত লিখেছেন সতীশ সামন্ত প্রমুখ স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ। সতীশ সামন্ত ছিলেন তমলুক জাতীয় সরকারের প্রথম সর্বাধিনায়ক। তমলুক ও তার পাশের মহকুমা কাঁথি ছিল গান্ধীপন্থীদের পুরনো ঘাঁটি। সেখানে দীর্ঘস্থায়ী গঠনমূলক কাজের একটা ঐতিহ্য ছিল। বিহার ও পূর্ব-যুক্ত প্রদেশের তুলনায় এখানে ১৯৪২-এ স্বতঃ উৎসারিত শক্তিপ্রয়োগ ও হিংসার মাত্রা ছিল কম, কিন্তু এখানকার আন্দোলন ছিল অনেক বেশি সুসংগঠিত ও দীর্ঘস্থায়ী। আর বিশেষ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই তাঁদের খানিকটা র‍্যাডিকাল পন্থা নিতে হয়। বিশেষ পরিস্থিতি বলতে : ব্রিটিশদের 'নারাজ' নীতি কিংবা নৌকো ও সাইকেল নষ্টের পোড়া জমি-নীতি প্রতিরোধ করার প্রয়োজনীয়তা আর ১৬ অক্টোবর ১৯৪২-এ প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও তার পরের বছরেই দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণকার্য চালানো। কংগ্রেস ১৯৪২-এর মাঝামাঝি থেকে নারাজ নীতির প্রতিরোধ তথা এই অঞ্চল থেকে খাদ্যশস্য রপ্তানি বন্ধ করার স্লোগান তুলে প্রচার চালিয়ে আসছিল। তমলুক মহকুমার প্রথম সঙ্ঘর্ষটি হয় ৮ সেপ্টেম্বর। ঐদিন দানিপুরের এক মিল-মালিক যখন খাদ্যশস্য পাচার করছিল, তখন গ্রামবাসীরা নিজে থেকেই রাস্তা আটকান, ও তারপর জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্য চান। ২৯ সেপ্টেম্বর যথেষ্ট পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে তমলুক, মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে (আর সেইসঙ্গে কাঁথির ভগবানপুরে) যোগাযোগ ব্যবস্থা ও পুলিশ থানাগুলোর ওপর একযোগে আক্রমণ চালানো হয়। বিশাল জনতা মিছিল করে থানায় যায়। কার্যত শুধু সুতাহাটা থানাই দখল করা হয়েছিল ; অন্যত্র বয়ে যায় রক্তগঙ্গা। মাত্র একদিনে ৪৪ জন নিহত হন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা—তমলুকের ৭৩ বছরের বিধবা বৃদ্ধা কৃষক রমণী, যিনি গুলিবিদ্ধ হয়েও জাতীয় পতাকা খাড়া রাখেন। দু'সপ্তাহ পরে ঘূর্ণিঝড়ে ৫০% শস্য ও ৭০,০০০ গবাদি পশু নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তমলুক মহকুমাতেই নিহত হন ৪০০০। পর্যাপ্ত সরকারি ত্রাণের অভাবে (সম্ভবত ইচ্ছাকৃত) কংগ্রেস স্বেচ্ছা-সেবকদের বিরাট মাত্রায় স্বাবলম্বনের পথ নিতে হয়, আর এটাই হয়ে ওঠে গোপন

তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের প্রধান কাজ। ১৭ ডিসেম্বর ১৯৪২-এ এই সরকার গঠন করা হয়েছিল ; পরে সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম ও মহিষাদলেও এর অধীনে শাখা খোলা হয়। সেপ্টেম্বর ১৯৪৪ অবধি জাতীয় সরকার টিঁকে ছিল। এঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এক সশস্ত্র বিদ্যুৎবাহিনী ; আর এঁরা স্তরবিভক্ত সালিশি আদালত চালিয়েছিলেন। দাবি করা হয়েছে যে, সেখানে ১৬৮১টি মামলার ফয়সালা করা হয়। স্কুলগুলিকে অনুদান দেওয়া হয়, ৭৯,০০০ টাকা লাগানো হয় ত্রাণ-সংগঠনের কাজে, আর, সবচেয়ে কৌতূহলের বিষয় হলো—'সম্পন্ন লোকেদের উদ্বৃত্ত ধান...গরিব গ্রামবাসীদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়।' জাতীয় সরকার নোটিশ জারি করে ধনী মজুতদার ও মুনাফাখোরদের শোষণ বন্ধ করতে বলে এবং তাদের বাধ্য করে মোটা অঙ্কের টাকা ও ধান দিতে, যা আবার নিপীড়িত মানুষদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয় (সতীশ সামন্ত ও অন্যান্য, *অগাস্ট রেভলিউশন অ্যান্ড টু ইয়ারস ন্যাশনাল গভর্নমেন্ট ইন মিদনাপুর,* কলকাতা, ১৯৪৬, পৃ. ৩২, ৩৯)।

মেদিনীপুরের সীমান্তবর্তী জেলা ওড়িশার বালেশ্বরে কংগ্রেস নুনের গুদাম লুঠ করে, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটায় আর খাদ্যশস্য পাচার বন্ধ করার জন্যে গ্রামে 'স্বরাজ পঞ্চায়েত' বসায়। ২৮ সেপ্টেম্বর এরম-বাসুদেবপুর-এ পুলিশ থানার ওপর গণ-আক্রমণের সময়ে ৩৫ জন নিহত হন। গুরপাল অঞ্চলেও কিছুদিনের জন্যে একটি জাতীয় সরকার কাজ করে। এরম-বাসুদেবপুরের গুলি চালানোর ঘটনার সরকারি তদন্ত রিপোর্টে বলা হয়, গুজব ছড়িয়েছিল 'এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বরাজ পাওয়া যাবে...স্বরাজ সরকারের অধীনে কোনো কর দিতে হবে না, আর বড়লোকদের ধান পেয়ে যাবে গরিবরা।' ঝড়ের আর-এক কেন্দ্র ছিল কটক যদিও এখানে কিছুদিনের মধ্যেই গণ-আন্দোলনের চেয়ে স্থানীয় 'রক্ত বাহিনী'র সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপই প্রধান হয়ে ওঠে। কোরাপুট-এর বিরাট সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বিশাল গণ-অভ্যুত্থান হয়। তার মধ্যে ছিল জেপুর-এর জমিনদারি-র বিরুদ্ধে খাজনা-বন্ধ আন্দোলন, সংরক্ষিত অরণ্যে অনুপ্রবেশ ও থানা আক্রমণ। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জনৈক নিরক্ষর গ্রামবাসী লক্ষ্মণ নায়েক। এজন বনরক্ষীকে হত্যার অপরাধে ১৬ নভেম্বর তাঁর ফাঁসি হয় (হরেকৃষ্ণ মহতাব ও অন্যান্য, *হিস্ট্রি অফ ফ্রিডম মুভমেন্ট ইন ওড়িশা,* খণ্ড ৪, কটক, ১৯৫৭-৫৯, পৃ. ৮৮-৯৪, ৬৮)। তালচের রাজ্যে ১৯৪৩-এর মে অবধি গেরিলা কার্যকলাপ চলে। এক 'চাষী-মৌলিআ (কৃষক-শ্রমিক) রাজ' নিয়ন্ত্রণ করে প্রায় ৪০০ বর্গমাইল এলাকা এবং ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এ তাঁরা তালচের শহর আক্রমণ করেন। তাঁদের পরাস্ত করতে বিমানের সাহায্য নিতে হয়। তালচেরে ইতোমধ্যেই সেপ্টেম্বর ১৯৩৮-এ বেগারশ্রম ('*বেথি*') অরণ্য-আইন ও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে এক বিরাট সংগ্রাম হয়েছিল। আর এবারের গণ-অভ্যুত্থানের অব্যবহিত কারণ হলো একটি গুজব : রাজ্য প্রজামণ্ডলের সভাপতি পবিত্রমোহন প্রধানকে খুন করা হয়েছে (গোবিন্দ সহায়, পৃ. ৪২০-২, *অল ইন্ডিয়া স্টেট পিপলস্ কনফারেন্স পেপার্স,* ফাইল নং ১৬৪)

শহরগুলিতে প্রথমেই যে-অভ্যুত্থান হয়েছিল তা দমন করার পর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির আন্দোলন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা রূপ পরিগ্রহ করে। অল্প কয়েকটি ছোটো ছোটো অঞ্চলে চলে কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ ; আর একদিকে বিস্তৃততর সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ও অন্তর্ঘাত—যা চালাচ্ছিলেন মূলত শিক্ষিত কর্মীরা, কিন্তু তার পেছনে অবশ্য বিরাট জনসমর্থনও ছিল। কৃষক

বিদ্রোহের মূল কেন্দ্র ছিল মহারাষ্ট্রের পূর্ব-খান্দেশ ও সাতারা এবং গুজরাটের ভরুচ-জেলার জম্বুসর তালুক। কংগ্রেসি ঐতিহাসিক গোবিন্দ সহায় সলজ্জভাবে যেসব মন্তব্য করেছেন তাতে মনে হয়, সাতারা ও জম্বুসরের আন্দোলনের হয়তো কিছু সামাজিকভাবে র‍্যাডিকাল সম্ভাবনা ছিল। সহায় বলেছেন, সাতারা-র নানা পাটিলের পরিচালনায় বিদ্রোহের সুযোগ নিয়েছিলেন 'জেলার অপরাধী উপাদান [লোকজন]' আর সাতারা ও জম্বুসর—দু-জায়গাতেই বিস্তর 'ডাকাতি' হয়েছিল। জম্বুসরের আন্দোলনকে সাহায্য করেছিল স্থানীয় 'দস্যু' মেগজি। তার ফলেই এই অঞ্চলে মাস তিনেকের জন্যে গড়ে ওঠে এক ধরনের মুক্তাঞ্চল (সহায়, পৃ. ১১৮, ১৩৩)। সাতারা-র 'প্রতি-সরকার'-এর সঙ্গে ছিলেন এমন লোকেদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে গেল ওমভেট সম্প্রতি একটি বিশদ আলোচনা করেছেন। তার থেকে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বেরিয়ে আসে। সাতারা-র আন্দোলনের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল কৃষক-ভিত্তিক অব্রাহ্মণ 'বহিয়াজন সমাজ' পরম্পরার। এই অঞ্চলে সেটি ছিল খুবই প্রবল। সমান্তরাল সরকার বরং কিছুটা দেরিতেই গড়ে ওঠে—১৯৪৩-এর মাঝামাঝি। এমনকি ১৯৪৫-৪৬ অবধিও এটি কোনো-না-কোনোভাবে টিঁকে ছিল। গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ছাড়াও এর কাজের মধ্যে ছিল : গণ-আদালত ('ন্যায়দান মণ্ডল') চালানো এবং গান্ধীপন্থী ধারায় গঠনমূলক কাজ। ১৯৪২-এ অন্যত্র যেমন হয়েছিল, এখানেও তেমনি জাতীয়তাবাদী জঙ্গীপনা সম্ভবত অনেকটাই ভোঁতা করে দিয়েছিল সামাজিক র‍্যাডিকালিজমের ধার, কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে যদিও গরিব চাষীদের বন্ধকি জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, আর মহিলাদের ধর্ষণ ও শোষণ করার জন্যে গ্রামের চাঁইদের দেওয়া হয় কঠোর শাস্তি, তাহলেও কর্মীদের মনে আছে যে, 'আমরা সম্পত্তি-সম্পর্কে হাত দিইনি।' এও কৌতূহলজনক যে 'প্রতি-সরকার' স্থানীয় ডাকাতদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিয়েছিল। সম্ভবত তা নিচুতলার সামাজিক দস্যুদের বিরুদ্ধে সম্পন্ন, কিন্তু তখনও পর্যন্ত নিপীড়িত চাষীদের দরকারেরই প্রতিফলন। সাতারা পার্বত্য অঞ্চলে ঐ সব দস্যুরা বেশ ভালোভাবেই আস্তানা গেড়েছিলেন। মনে পড়ে, ফরাসি বিপ্লবের সময়েও ১৭৮৯-এর কৃষক সমাবেশে তার লক্ষ্য স্থির করেছিল একই সঙ্গে 'অভিজাতদের ষড়যন্ত্র'-র গুজব ও 'দস্যুদের' বিরুদ্ধে (জি লেফেভ্‌র, *দি গ্রেট ফিয়ার অফ ১৭৮৯*)। এই প্রেসিডেন্সির অন্যত্র সমাজবাদীরা কার্যকরভাবে গোপন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ সংগঠিত করেন। অরুণা আসফ আলি প্রমুখ নেতারা বোম্বাই শহর থেকে এটি নিয়ন্ত্রণ করতেন। কর্ণাটকে যেসব 'বিপর্যয়' হয়েছিল তার মধ্যে আছে ১৬০০ টেলিগ্রাফ লাইনের ওপর আক্রমণ আর ২৬টি রেলস্টেশন ও ৩২টি ডাকঘরে হামলা। কিন্তু 'এবারে আর কোনো কর-বন্ধ প্রচার চালানো হয় নি' (গোবিন্দ সহায়, পৃ. ৯৬)। এমনকি খেড়া ও বারডোলি-তেও রাজস্ব-বন্ধের কথা ওঠে নি। ঐসব এলাকায় উঁচুতলার পাটীদার যুবকদের কিছু কিছু সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায়। হার্ডিম্যান যুক্তি দেখিয়েছেন যে, 'সমৃদ্ধি ফিরে আসায় নিচুতলার পাটীদারদের উদ্দীপনা শুকিয়ে গিয়েছিল'। পূর্ব আফ্রিকায় অভিবাসী ভারতীয়দের টাকা পাঠানো, তামাক চাষের বৃদ্ধি, যুদ্ধের সময়ে কৃষিপণ্যের চড়া দাম, আর সেইসঙ্গে ১৯২৮ থেকে রাজস্ব না-বাড়ার ফলেই তাঁদের অবস্থা ফেরে (*কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*, পৃ. ৭০)। সাধারণভাবে, সাহস করে একটা কাজ-চালানো গোছের প্রকল্প খাড়া করা যায় যে, যেসব অঞ্চলে কৃষির কিছুটা উন্নতি হয়েছিল, এবং দেখা

দিয়েছিল ধনী কৃষকদের এক সমৃদ্ধিশালী ও বিস্তৃত উঁচুতলার স্তর, সেইসব জায়গা ১৯৪২-এর আন্দোলন থেকে দূরে সরে ছিল। যেমন, পাঞ্জাব, পশ্চিম-যুক্ত প্রদেশ, গুজরাট ও তামিলনাড়ুর তাঞ্জাবুর ব-দ্বীপ। উল্টোদিকে, কৃষি-বিদ্রোহের মূল কেন্দ্রগুলি ছিল পূর্ব-ভারতে। ব্লিন-এর দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, ঐসব জায়গার মাথাপিছু কৃষি উৎপাদন বাড়ে নি, বা এমনকি কমেও গিয়েছিল। আধুনিক ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে 'প্রাধান্যশীল চাষীদের' কথা খুব শোনা যাচ্ছে (তু. *কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ,* গ্রন্থে লো-র ভূমিকা)। সম্ভবত, কংগ্রেসি জাতীয়তাবাদ থেকে শেষ পর্যন্ত এঁরাই লাভবান হয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। যেমন হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে, ব্যবসাদাররা। অথচ কর্মীদের বেশিরভাগই এসেছিলেন সামাজিক-আর্থনীতিক মাপকাঠিতে নিচুতলা থেকে।

বিদ্রোহের পরিণাম

১৯৪২-এর শেষাশেষি, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সেই মুহূর্তের সর্বাত্মক মোকাবিলায় ব্রিটিশরাই নিশ্চিতভাবে জয়ী হয়ে বেরিয়ে এল। যুদ্ধের বাকি আড়াই বছরের মধ্যে, দেশের ভেতর আর তাঁদের তেমন গুরুতর কোনো চ্যালেঞ্জ-এর মুখে পড়তে হয় নি। তবুও এই 'জয়' ছিল ঝাপসা ও ভীষণ সীমিত, আর যুদ্ধের পরিস্থিতিতে সত্যি সত্যিই নির্মমভাবে শক্তি ব্যবহারের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। ব্রিটিশরা যে কখনোই আবার ঐ ধরনের একটা মোকাবিলার ঝুঁকি নেবে না, আর ১৯৪৫-এর আলাপ-আলোচনা মারফত নিষ্পত্তির সিদ্ধান্ত যে শুধুই নতুন লেবর সরকারের দান নয়—সেটা বোঝা যায় ওয়াভেল-এর মনোভাব থেকে। অক্টোবর ১৯৪৩-এ এই সেনানায়ক—যিনি কোনো দিক দিয়েই অতি উদারপন্থী ছিলেন না—হলেন বড়লাট। ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪-এ চার্চিল-কে লেখা একটি চিঠিতে ওয়াভেল বলেই দিয়েছিলেন, যুদ্ধের পর সম্ভাব্য বিশ্ব জনমত এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ বা এমনকি সেনাবাহিনীরও যে-মনোভাব হবে তাতে গায়ের জোরে ভারতকে ধরে রাখা সম্ভব হবে না (এর সঙ্গে তিনি আর্থনীতিকভাবে ব্রিটেনের নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার কথাও যোগ করতে পারতেন)। 'এই ধরনের বিদ্রোহী, যেমন ডি ভ্যালেরা, জগলুল [পাশা]—এদের সঙ্গে আগেও আমাদের আলাপ-আলোচনা করতে হয়েছে', আর বাস্তবিকই এখনই আলোচনা শুরু করে দেওয়া হবে বুদ্ধিমানের কাজ। কারণ যুদ্ধ শেষ হলেই বন্দীরা মুক্তি পাবেন এবং সেনাবাহিনী ভেঙে দেওয়া ও বেকারির ফলে আসবে অশান্তি, আর তাতেই তৈরি হবে 'বিক্ষোভ দেখানোর এক উর্বর ক্ষেত্র ; যদি-না তার আগেই আমরা কংগ্রেসের শক্তিকে ঘুরিয়ে দিতে পারি আরও লাভজনক কোনো খাতে, যেমন ভারতের প্রশাসনিক সমস্যা সংক্রান্ত কাজকর্ম বা সাংবিধানিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টায়' (ওয়াভেল, *দি ভাইসরয়স্ জার্নাল,* অক্সফোর্ড, ১৯৭৩, পৃ. ৯৭-৮)। চার্চিল-এর গোঁয়ারতুমির জন্যে এই প্রক্রিয়া খানিকটা বিলম্বিত হলো বটে, কিন্তু ১৯৪৫-এর পর ব্রিটিশরা কংগ্রেস নেতৃত্বকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক এই জিনিসটাই করাতে পারল।

কংগ্রেস নেতাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, কারাবাস ও পরাজয় কিছুটা বিপরীতে হিতের ব্যাপারই হয়ে দাঁড়ায়। বিচ্ছিন্ন হয়ে জেলে থাকার ফলে, জনসমক্ষে জাপানি যুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো স্পষ্ট অবস্থান নেওয়ার দায় তাঁরা এড়িয়ে যেতে পেরেছিলেন—তা না-হলে, ১৯৪৪-এর

কয়েক মাসের জন্যে এই প্রশ্নটি সত্যিই খুব অস্বস্তিকর হয়ে উঠত। সেই সময়ে সুভাষের আজাদ হিন্দ্ ফৌজ আসাম সীমান্তে এসে হাজির হয়, যখন পৃথিবী জুড়ে পরিষ্কারই যুদ্ধে জিতছিল মিত্রশক্তি। ১৯৪৬-এ, সমকালীন ইতিহাস-রচনার এক অনবদ্য নমুনায় ডি ডি কোসাম্বী দেখিয়েছেন যে, 'কার্যভার গ্রহণের পর কংগ্রেস মন্ত্রিসভাগুলির মামুলিভাবে কাজ চালানোর খতিয়ান মুছে দিল জেলখানা ও বন্দীশিবিরে থাকার গৌরব। সংগঠনটি এইভাবেই আবার ফিরে পেল জনগণের মধ্যে পূর্ণ জনপ্রিয়তা' ('দি বুর্জোয়াস কামস্ অফ এজ ইন ইন্ডিয়া, পুনর্মুদ্রণ, কোসম্বী, *এক্সজাসপারেটিং এসেস্*, পুণা, তারিখ নেই, পৃ. ১৭)। যেসব দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতা ১৯৩০-এর দশকের শেষদিক থেকেই ব্রিটিশের সঙ্গে আরও বেশি সহযোগিতার কথা বলছিলেন, আর মন্ত্রী হিসেবে ক্রমেই আরও বেশি করে অনুসরণ করছিলেন দক্ষিণপন্থী নীতি, তাঁরাও এখন, সমাজবাদীদের মতোই, স্বাদেশিক আত্মত্যাগের গৌরবচ্ছটায় দীপ্ত হয়ে উঠলেন। অথচ ১৯৪৩-এর আসল লড়াই-এর বেশির ভাগটাই লড়েছিলেন সমাজবাদীরা—আর কমিউনিস্টরা, যাঁরা এই দু-পক্ষেরই সমালোচনা করেছিলেন, জাতীয়তাবাদী জনমতের একটা বিরাট অংশের কাছে তাঁরা চিহ্নিত হয়ে গেলেন দালাল ও বেইমান হিসেবে।

ভা র ত ছা ড়ো আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশরা শেষ অবধি বুঝতে পারল যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যদিকে, কংগ্রেসি দক্ষিণপন্থীদের সম্মান নতুন করে বাড়িয়ে দিয়ে, ১৯৪২-এর এই বিদ্রোহ ও তার পরিণাম জাতীয়তাবাদীদের আপসকামী অংশের শক্তিকেই আরও বাড়িয়ে তুলল। ১৯৪২-এ যে বিপুল যুদ্ধসম্ভার ব্রিটিশদের হাতে ছিল, তার প্রেক্ষিতে মনে হয়, যতই বীরোচিত ও স্বাভাবিক হোক না কেন, সম্ভবত সে-বিদ্রোহ ঘটেছিল খানিকটা অসময়ে আর পরাজয়ই ছিল তার নিয়তি। এই আন্দোলনের ফলে বাম বিকল্প বাস্তবিকই দুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথমত, দীর্ঘদিন ধরে গান্ধীবাদী গঠনমূলক কাজ বা কিসান সভার র‍্যাডিকাল ক্রিয়াকলাপের ফলে যেসব কিসান ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল, নৃশংস অত্যাচারের ফলে তার অনেকটাই নিশ্চয়ই নিঃশেষ হয়ে যায়। এও তাৎপর্যপূর্ণ যে, ১৯৪৫-৪৬-এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থানে বিহার, পূর্ব-যুক্ত প্রদেশ, আর মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও ওড়িশার গ্রামাঞ্চলের প্রায় কোনো ভূমিকাই ছিল না বা থাকলেও ছিল নগণ্য। আর যুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তর বছরগুলিতে মেদিনীপুর ও হুগলির গ্রামীণ গান্ধীবাদীদের বেশির ভাগই দেখলেন যে, তাঁরা বাঙলার কংগ্রেসি রাজনীতিতে একঘরে হয়ে গেছেন। দ্বিতীয়ত, বামপন্থীদের নিজেদের মধ্যে অভূতপূর্ব ভাঙন দেখা দেয়, যা আগে কখনও হয় নি। একদিকে সমাজবাদী ও সুভাষের অনুগামীরা, অন্যদিকে কমিউনিস্টদের মধ্যে গড়ে ওঠে এক পাঁচিল। ১৯৪২-এ দু-পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে 'বিশ্বাসঘাতকতা' ও 'পঞ্চম বাহিনী'-সুলভ কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছিলেন। এক পুরুষ পরেও সেই স্মৃতির দগদগে ঘা পুরোপুরি মিলিয়ে যায় নি।

যুদ্ধ ও ভারতীয় অর্থনীতি : আকাল ও অতি-মুনাফা

জনশক্তি এমনিতেই ফুরিয়ে এসেছিল, যুদ্ধকালীন অর্থনীতির অভিঘাতে তা আরও নিঃশেষ হয়ে যায়, যদিও এই অভিঘাতের ফলেই আবার ১৯৪৫-৪৭ এ তীব্র অসন্তোষ ও মাঝে-মধ্যেই বিক্ষিপ্তভাবে প্রায় বিপ্লবী বিস্ফোরণ ঘটছিল। ১৯৪৪-এ কোহিমা ইম্ফল সীমান্তের সঙ্ঘর্ষ ও

মাঝে-মধ্যে বিমান হানা ছাড়া ভারতে অবশ্য আসল সামরিক তাণ্ডব ঘটে নি। তাহলেও জনগণকে কম কষ্ট সইতে হয় নি, কারণ যুদ্ধের মানে ছিল ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি (১৯৩৯-এ বাজারে ছাড়া ছিল ২৩০ কোটি টাকার নোট, ১৯৪৫-এ সেটাই বেড়ে হয় ১২১০ কোটি টাকা), সর্বাত্মক দুর্নীতি, ঘাটতি ও কালোবাজারি দাম, আর পরিণামে ১৯৪৩-এর সর্বক্ষয়ী দুর্ভিক্ষ। মূলত, বর্মা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে চাল আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়া আর তার সঙ্গে প্রচুর বাড়ানো সেনাবাহিনীকে খাওয়ানোর জন্যেই খাদ্যসঙ্কট হয়েছিল। কিন্তু চূড়ান্ত অব্যবস্থা আর ইচ্ছাকৃত মুনাফাবাজির ফলে পরিস্থিতি হয়ে ওঠে আরও ঘোরালো। রেশন ব্যবস্থাও চালু করা হয় অনেক পরে, তাও কয়েকটি মাত্র বড় শহরে। এমনকি ওয়াভেলও ভারতের খাদ্য সমস্যার প্রতি লন্ডনের ঔদাসীন্য সম্বন্ধে একান্তে তিক্ত অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ইওরোপে অনাহার হলে সেখানকার বুভুক্ষু জনতাকে খাওয়াতে সম্পূর্ণ অন্য মনোভাব নেওয়া হয়' (১৯৪৫-এর গোড়ায় হল্যান্ড-এ যে পর্যাপ্ত খাবার পাঠানো হয়েছিল, এখানে তিনি তার কথাই উল্লেখ করেছেন। *ভাইসরয়স্ জার্নাল*, ৯ এপ্রিল, ১৯৪৫-এর লিখন, পৃ. ১২৩)। ১৯৪৩-এর দুঃসহ গ্রীষ্মে ও শরতে লক্ষ লক্ষ লোক পায়ে হেঁটে কলকাতায় চলে আসেন। তখন আর তাঁরা ভাত ভিক্ষে করছেন না, চাইছেন ফ্যান। কলকাতার রাস্তায় অনাহারে তাঁদের মৃত্যু হলো। মূলত মানুষেরই তৈরি এই দুর্ভিক্ষে মারা গেলেন বাঙলার ১৫ থেকে ৩০ লক্ষ লোক। দুর্ভিক্ষ আর অপুষ্টির ফলে দেখা দিল ম্যালেরিয়া, কলেরা ও গুটি-বসন্তের বড় বড় মহামারি। তাই ১৯৪৩-এর পরেও বেশ কয়েক বছর ধরে বাঙলার মৃত্যুসংখ্যা হয়ে রইল স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি। ব্রিটিশ শাসন সরাসরি শুরু হয় ১৭৭০-এর দুর্ভিক্ষ দিয়ে ; আর এখন তেমনই এক বিপর্যয় দিয়েই ঘনিয়ে আসতে থাকে তার অন্তিম লগ্ন। সবচেয়ে বেশি দুর্ভিক্ষ-পীড়িত এলাকা ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম বাঙলার তমলুক-কাঁথি-ডায়মন্ডহারবার অঞ্চল এবং ঢাকা, ফরিদপুর, ত্রিপুরা ও নোয়াখালি জেলা। বাঙলার ক্ষুদ্র চাষীভিত্তিক অর্থনীতি এক বিরাট ধাক্কা খায়। ১৯৪৩-এ প্রায় ৬০০,০০০ রায়ত তাঁদের জোত-জমি হারান, আর মাত্র এক বছরে গবাদি পশু-সম্পদ কমে যায় ২০%। যা হয়ে থাকে, কৃষি-শ্রমিকরাই ভুগেছিলেন সবচেয়ে বেশি। ১৯৪৪-এ ফরিদপুরের পাঁচটি গ্রামে সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে, সেখানে তাঁদের ৪০.৩% 'মুছে গেছেন' ; যেখানে মোট মৃত্যুহার হলো ১৫.২% (অমর্ত্যকুমার সেন, 'ফেমিন মরটালিটি : এ স্টাডি অফ দি বেঙ্গল ফেমিন অফ ১৯৪৩' হব্‌স্‌বম ও অন্যান্য, *পেজেন্ট ইন হিস্ট্রি*)।

তাহলেও কারও কারও কাছে যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের মানে দাঁড়িয়েছিল অতি মুনাফা। ১৯১৪-১৮-র মতো, ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর কাছে এটাও ছিল একটা বিরাট অগ্রগতি। ভারত-ব্রিটিশ আর্থিক সম্পর্কেও লক্ষণীয় রদবদল হলো, ১৯৪৪-৪৫ নাগাদ ব্রিটেনের জায়গায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হয়ে উঠল ভারতে আমদানির প্রধান উৎস। আর যুদ্ধের সময়ে ব্রিটিশরা ভারত থেকে যুদ্ধ সামগ্রী কেনার ফলে, ভারতের স্টার্লিং-ঋণও আস্তে আস্তে কমে গেল। ১৯৪৫-এর মধ্যে ভারত জমিয়ে ফেলল ১০০ কোটি পাউন্ডেরও বেশি স্টার্লিং। সেই মুহূর্তে তার মানে অবশ্য ছিল : যুদ্ধের সময় ভারতের দ্রব্যসামগ্রী বিপুল পরিমাণে চালানোর বদলে প্রমিসরি নোট দেওয়া। তাহলেও, এতে করে স্বাধীনতার পর ভারতের বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং, 'সম্পদ নির্গম' তত্ত্বের একটি চিরাচরিত বিষয়—ঋণবাবদ ব্যয়—আর থাকল না।

দ্বিতীয়ত যুদ্ধকালীন চাহিদা তথা আমদানির বিকল্প উৎপাদনে বাধ্য হওয়ার ফলে কাপড়, লোহা ও ইস্পাত, সিমেন্ট ও কাগজ শিল্পের উন্নতি হলো, আর কিছু কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং ও রসায়ন শিল্পেরও সূচনা হলো। ব্রিটিশরা কিন্তু এ-দেশী জাহাজ, মোটরগাড়ি ও বিমান শিল্পের উন্নয়নে তখনও বাধা দিয়ে যাচ্ছিল ; শিল্পের বিকাশ অবশ্য হচ্ছিল শম্বুকগতিতে। ১৯৩৭-কে ভিত্তিবর্ষ ধরলে ১৯৪৫-এ মোট উৎপাদনে বৃদ্ধি হয়েছিল মাত্র ১২০ (যদিও ইস্পাত শিল্পে বৃদ্ধি হয়েছিল ১৪২.৯, রাসায়নিক শিল্পে ১৩৪১ সিমেন্ট-এ ১৯৬.৫ : ওয়াডিয়া ও মার্চেন্ট, পৃ. ৩৬০)।

কিন্তু সত্যিই চমকপ্রদভাবে যা বেড়েছিল তা কিন্তু উৎপাদন নয়, তা হলো মুনাফা—বিশেষত, ফাটকাবাজি করে খাদ্যে মুনাফা, শেয়ার কেনা-বেচা ও সাধারণভাবে কালোবাজারির মাধ্যমে। ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী এক বিশেষ জাতের বুর্জোয়াশ্রেণী। তার চরিত্রলক্ষণ হলো 'বুভুক্ষু লোভ', আর তার বাতিকই হলো ফাটকাবাজি, উৎপাদন বাড়ানোর কাজে উদ্যোগ নেওয়া বা পারদর্শিতা নয় (কোসাম্বী, পৃ. ১৪)। প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাৎপদ হওয়ার জন্যে তাকে হাত বাড়াতে হলো বিদেশী সহযোগিতার দিকে। ততদিনে এমন একটা সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে যে, খানিকটা কম অসম জায়গা থেকে আলাপ-আলোচনা চালানোর জন্যে তাঁদের কিছু বাড়তি সুযোগ করে দিচ্ছে পরিবর্তিত আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক অবস্থান। ১৯৪৫-এর গ্রীষ্মে বিড়লা ও টাটা-র নেতৃত্বে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদের একটি প্রতিনিধিদল ব্রিটেন ও আমেরিকায় যায়। সেই বছরেই হিন্দুস্থান মোটরস্ স্থাপন করা নিয়ে বিড়লার সঙ্গে নাফিল্ড-এর চুক্তি হয়, আর টাটা-র সঙ্গে চুক্তি হয় ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালস্-এর। যদিও রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের নির্দিষ্ট ধরন-ধারণ, খুব কম বা খুব বেশি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অভিযোগ ইত্যাদি তুচ্ছ বিষয়ে বিবাদ-বিসংবাদ লেগেই ছিল, একই সঙ্গে আবার ভারী শিল্প, শক্তি, সেচ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভারতের রাষ্ট্রীয় পুঁজি বিনিয়োগ মেনে নিতে, বা এমনকি বিনিয়োগের পক্ষেই যুক্তি দেখাতে বুর্জোয়াদের চাঁইরা যথেষ্টই আগ্রহী ছিল, কারণ ঐসব জায়গায় প্রাথমিক মুনাফা কম হতে বাধ্য। ভারতের অগ্রণী ব্যবসায়ীরা জানুয়ারি ১৯৪৪-এ 'বোম্বাই পরিকল্পনা' খাড়া করেন (তাঁদের মধ্যে ছিলেন জে আর ডি টাটা, জি ডি বিড়লা, পি ঠাকুরদাস, শ্রীরাম ও কস্তুরভাই লালাভাই)। সেখানে মূল শিল্পের দ্রুত বিকাশের মাধ্যমে পনেরো বছরের মধ্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় দু-গুণ করার কথা ভাবা হয়। পরিকল্পনাটি নেহাতই ছিল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বিষয়ক বিবৃতি। বন্টন ও নিয়ন্ত্রণের মাত্রার প্রশ্নেও তা ছিল অস্পষ্ট। তবে উন্নয়নের স্বার্থে 'স্বাধীন উদ্যোগের' 'সাময়িক রাহুগ্রাস' মেনে নিতে সেটি প্রস্তুত ছিল ; আর সেখানে বেশ কয়েকবার 'রুশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা'-রও সপ্রশংস উল্লেখ দেখে চমৎকৃত হতে হয়। কোসাম্বীর সমকালীন বিশ্লেষণ থেকে আবার উদ্ধৃতি দিয়ে [বলা যায়], বুর্জোয়াদের দরকার ছিল 'নেহরুর নেতৃত্ব'। ঠিক যেমন আগেকার গণ-আন্দোলনের পর্বে 'মহাত্মার শিক্ষার মধ্যে যা কিছু লাভজনক সেগুলি নিজের স্বার্থে ব্যবহার করে নেওয়া এবং সমস্ত বিপজ্জনক সুবচনকে নঞর্থক দার্শনিক বিষয়ে পরিণত করে দেওয়ার পক্ষে' তারা ছিল যথেষ্ট বুদ্ধিমান (*ঐ*, পৃ. ১৮)।

চারদিকে তখন এক অভূতপূর্ব গণ-দুর্দশা, কিন্তু তারই মধ্যে বুর্জোয়াদের এমন রমরমা হয়েছিল, যা আগে কখনও হয় নি। কাজে কাজেই আর-এক দফা গণ-আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁরা ছিলেন স্বভাবতই বিরূপ, কারণ তার ফলাফল এমন র‍্যাডিকাল হতে পারত, যা আর সামলানো

যেত না। আর তাই ১৯৪৫-এর পর আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা আপস-মীমাংসায় যাওয়ার পক্ষে তাঁরা তাঁদের শক্তিশালী প্রভাব খাটালেন পুরোপুরি। ১৯৪৫-৪৭-এর ঘটনাবলী অবশ্য করুণভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 'ক্ষমতা হস্তান্তরে'র জন্যে দাম দিতে হলো বিভেদকামী শক্তিগুলিকে উৎসাহ দিয়ে—যার ফল ঃ দেশভাগ। এক 'রক্তপাতহীন' স্বাধীনতা জয়ের পরেই অকল্পনীয় রক্তাক্ত এক সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব।

মুসলিম লীগের অগ্রগতি

বস্তুতপক্ষে, যুদ্ধের শেষদিকের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক বিকাশ হলো মুসলিম লীগের দ্রুত অগ্রগতি। কংগ্রেসকে দমন করার ফলে যে-সুযোগ আসে, লীগ তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করছিল। ১৯৪৩-এর মধ্যে আসাম (অগাস্ট ১৯৪২), সিন্ধু (অক্টোবর ১৯৪২), বাঙলা (মার্চ ১৯৪৩) ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (মে ১৯৪৩)-এ লীগ মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় বসানো হয়। লীগের নেতারা প্রাদেশিক শাখাগুলিকে কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণে রাখেন। গড়ে তোলা হয় এক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী (জাতীয় রক্ষী), আর মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা করার দিকে বেশ ভালোভাবেই এগোতে থাকেন জিন্না। এর পরেই তিনি গান্ধীর নেতৃত্বাধীন 'হিন্দু' কংগ্রেসের সঙ্গে সমমর্যাদার দাবি তোলেন। এই অগ্রগতির পথ সুগম করে দেওয়ায় ব্রিটিশদের ভূমিকা ছিল বেশ স্পষ্ট। কংগ্রেসের বেশির ভাগ বিধায়ক জেলে থাকার জন্যেই আসামে সাদউল্লাহ্ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এ ঔরঙ্গজেব খানের মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হয়েছিল। সিন্ধু-র কংগ্রেস-ঘেঁষা মুসলমান প্রধানমন্ত্রী আল্লা বক্স সরকারি খেতাব ত্যাগ করেছিলেন বলে সিন্ধুর লাট তাঁকে বরখাস্ত করেন আর নাজিমুদ্দীন মন্ত্রিসভাকে ঠেকা দিয়ে রাখেন বাঙলার ইওরোপীয় বিধায়করা। দুটি বৃহত্তম মুসলমান-প্রধান প্রদেশ, পাঞ্জাব ও বাঙলা, তখনও জিন্না-কে বেশ ভোগাচ্ছিল। কিন্তু মার্চ ১৯৪৩-এ লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা ফজলুলহক-কে সরিয়ে দিতে পারলেন। তিনি ক্রমেই আরও বেশি করে জিন্না-র সমালোচক হয়ে উঠছিলেন। আর ডিসেম্বর ১৯৪১-এ তিনি এক অভাবনীয় মোর্চা তৈরি করলেন হিন্দু মহাসভা-র নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তাঁকে সরাতে ইস্পাহানীদের আর্থিক শক্তির সাহায্য নেওয়া হয়। কলকাতা-ভিত্তিক এই মুসলমান ব্যবসায়ী পরিবারের যোগাযোগ ছিল সারা ভারত জুড়ে। এইভাবেই বাঙলার মুসলমান রাজনীতিবিদ্‌দের বাধ্য করা হলো সারা-ভারত মুসলিম লীগের পথে চলতে। কংগ্রেসের মধ্যেও এর আগে একই ব্যাপার দেখা গিয়েছিল ঃ সেখানে সুভাষকে বার করে দিয়েছিল কংগ্রেসের যে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব, তাদের সঙ্গে বিড়লার মতো কলকাতার মারোয়াড়িদের যোগ ছিল ঘনিষ্ঠ। ডিসেম্বর ১৯৪২-এ সিকন্দর হায়াত খান-এর মৃত্যুর পর পাঞ্জাবে জিন্নার ঢোকার পথ সুগম হয়ে যায়। মুসলমান-জাঠ ইউনিয়নিস্ট মোর্চা ভেঙে দেওয়ার জন্য তাঁর দুর্বলতর উত্তরবর্তী খিজির হায়াত খান-কে লীগ চাপ দিতে থাকে। ১৯৪৫ অবধি তিনি অবশ্য সেই চাপের কাছে নতিস্বীকার করেন নি।

লীগ-এর এই অগ্রগতিতে অবশ্য নেহাতই সংসদীয় চক্রান্ত বা সরকারি সহায়তা ছাড়াও আরও বেশি কিছু ছিল। নানাবিধ কারণে ভারতীয় মুসলমানদের একটা বড় অংশের মধ্যে পাকিস্তান-এর নারা বেশ মনে ধরেছিল। পাকিস্তান হলেই হিন্দু জমিনদার আর বানিয়াদের

শোষণ শেষ হয়ে যাবে—বাঙলা ও পাঞ্জাবের চাষীদের কাছে ব্যাপারটা এইভাবে হাজির করা হচ্ছিল। নভেম্বর ১৯৪৩ থেকে বাঙলার মুসলিম লীগ-এর করিতকর্মা সম্পাদক আবুল হাশেম তাঁর দলের র‍্যাডিকাল ভাবমূর্তি গড়ে তোলার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। ১৯৪৪-এ প্রচারিত একটি ইশ্‌তেহারে খাজনা-গ্রাহী সুদ লোপ করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার সম্ভবত এই যে পাকিস্তান প্রস্তাবে 'ভারতের একটা অংশকে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ব্যবসায়ী বা বৃত্তিজীবী শ্রেণীর হাত থেকে আলাদা করে রাখার' প্রতিশ্রুতি ছিল ঃ 'যাতে ছোটো মুসলিম ব্যবসায়ী শ্রেণী বেড়ে উঠতে পারে, আর উদীয়মান মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা পায় চাকরি' (অমিয় বাগচী, পৃ. ৪৩২-৩৩)। যুক্ত প্রদেশ ও বোম্বাই-এর মতো প্রদেশ, যেখানে মুসলমানরা ছিলেন একেবারেই সংখ্যালঘু, বিশেষত সেখানকার বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী ও রাজনীতিবিদ্‌দের কাছেই ঐ জাতীয় সম্ভাবনার আবেদন ছিল বেশি। পাঞ্জাব আর বাঙলায় এর আকর্ষণ ছিল তুলনায় কম। ঐ সব জায়গায় পাকিস্তান হওয়ার মানে ছিল (শেষে হলোও তাই) সুপ্রতিষ্ঠিত স্থানীয় একতার বন্ধন ছিন্ন হওয়া আর অমৃতসর ও কলকাতার-র মতো মূল্যবান জায়গা হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। একটা কথা জোর দিয়ে বলা দরকার ঃ মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের পেছনে আর্থিক শক্তি আর সেই পুরনো ধাঁচের তালুকদার বা জমিদাররা জোগাচ্ছিলেন না, যেমন তাঁরা জোগাতেন আলীগড় আন্দোলন বা ঢাকার নবাব সলিমুল্লার সময়ে। লীগের পত্রপত্রিকার (কলকাতার সান্ধ্য খবরের কাগজ *স্টার অফ ইন্ডিয়া* আর ১৯৪২-এ দিল্লী থেকে প্রকাশিত দৈনিক *ডন*)। টাকা জোগাতেন ইস্পাহানী ও আদমজী ব্যবসায়ী পরিবার। জিন্নার আশীর্বাদ নিয়ে এপ্রিল ১৯৪৫-এ গঠিত হয় মুসলিম বাণিজ্য ও শিল্প সভাগুলির ফেডারেশন (ফেডারেশন অব মুসলিম চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ), আর যুদ্ধের পরেই মুসলিম ব্যাঙ্ক ও বিমান কম্পানি তৈরির পরিকল্পনা করা হয়। ভারতীয় বুর্জোয়ারা কখনই সাম্প্রদায়িকতার টান ছাড়তে পারেনি (যেমন, হিন্দু ব্যবসাদারদের বেশির ভাগই ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া এবং প্রায়ই পুনরুত্থানবাদী, গো-রক্ষাবাদী ও হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত)। আর সত্যিকারের বড় মুসলিম পুঁজিপতিরা যে সংখ্যায় অল্প ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। পশ্চিম-পাঞ্জাবে ১৯৪৭-এর আগে বড় শিল্প প্রায় ছিলই না। তবে ঐ অঞ্চলের বর্ধিষ্ণু কৃষির সঙ্গে তাল রেখে গড়ে উঠছিল কিছু ছোটোখাটো উদ্যোগ। ঐ সব লোকের কাছে দেশভাগ ছিল সত্যিই একটা বড় আর্থিক আশীর্বাদ, কারণ বড় বড় প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রেহাই পাওয়া গেল।

আজাদ হিন্দ

যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই হলো ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থান, যদিও শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থই হয়েছিল। কিন্তু ঐ অভ্যুত্থান দেখিয়ে দিল যে, শুধু জনশক্তির ফুরিয়ে যাওয়া আর সমঝওতা ও বিভেদের প্রবণতাই ১৯৪২-উত্তর ভারতের পুরো ছবি নয়। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার প্রধান উদ্দীপনা এসেছিল বিদেশে সুভাষের অভিযান থেকে। ১৯৪১-এ তিনি বার্লিনে একটি ভারতীয় সেনাদল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু জার্মানরা রুশদের বিরুদ্ধে ঐ বাহিনীকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করলে সুভাষের সঙ্গে তাদের মতান্তর হয়। তখন তিনি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় চলে যেতে মনস্থ করেন। জুলাই ১৯৪৩-এ জার্মানি থেকে ডুবোজাহাজ

চড়ে তিনি জাপানি-নিয়ন্ত্রিত সিঙ্গাপুরে পৌঁছান। সেখান থেকেই তিনি তাঁর বিখ্যাত 'দিল্লী চলো' ডাক দেন আর ২১ অক্টোবর ১৯৪৩-এ আজাদ হিন্দ সরকার ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করার কথা ঘোষণা করেন। পুরনো বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী পরম্পরার সঙ্গে যোগসূত্রের ওপর জোর দেওয়া হলো। রাসবিহারী বসু—১৯১৫ থেকে যিনি জাপানে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন—তাঁকে দেওয়া হয় সরকারের একটি সম্মানজনক পদ। আর গান্ধীর সঙ্গে যাবতীয় বিবাদ সত্ত্বেও, সুভাষ তাঁর উদ্যোগের শুরুতে 'জাতির জনক'-এর কাছ থেকে আশীর্বাদ চাইতে ভোলেন নি। তখুনি আজাদ হিন্দ ফৌজ-এ যোগ দেওয়ার জন্য হাতের কাছেই পাওয়া গেল জাপানি বন্দীশিবিরের ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের। ৬০,০০০ যুদ্ধবন্দীর মধ্যে যোগ দিলেন প্রায় ২০,০০০। আর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পাওয়া গেল আর্থিক সহায়তা ও স্বেচ্ছাসেবক। আজাদ হিন্দ ফৌজ ছিল দৃশ্যতই অসাম্প্রদায়িক। অফিসার ও সেনাদের অনেকেই ছিলেন মুসলমান। আর ঝাঁসির রানীর নামে গঠন করা হয়েছিল এক নারী-বাহিনী, এটি একটি অভিনব ব্যাপার। ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধ চালায় ১৯৪৪-এর মার্চ থেকে জুন অবধি। জাপ বাহিনীর সঙ্গে একটি অভিযান চালিয়ে তাঁরা ইম্ফলে ঘাঁটি গাড়েন। শেষ অবধি তা অবশ্য পুরোপুরি ব্যর্থই হয়েছিল। পরের বছর জাপানের পতন হওয়ায় আজাদ হিন্দের লোকেরা আবার বন্দী হয়ে গেলেন। সুভাষ অন্তর্হিত হলেন রহস্যজনকভাবে। বলা হয়, তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা গেছেন, যদিও কিছু লোক এখনও বিশ্বাস করেন যে দুর্ঘটনাটি সাজানো।

সুভাষের কর্মজীবনের এই শেষ পর্বের তাৎপর্য নিরূপণের ক্ষেত্রে অব্যবহিত প্রাপ্তি আর চূড়ান্ত অভিঘাত (মূলত মানসিক)—এ দু-এর মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। নিছক সামরিক শক্তির দিক দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ কোনোদিনই খুব একটা কিছু ছিল না। যদি তা ফলদায়ী হতোও, তাহলেও স্পষ্টতই সেটি এসেছিল অনেক দেরিতে। কারণ, ১৯৪৪-এ অক্ষশক্তি হারছিল সর্বত্রই। ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লক-এর গোপন সংগঠন থাকলে তাও হয়তো ইম্ফল-কোহিমা আক্রমণের সময়ে কাজে লাগতে পারত। কিন্তু তাকেও আগেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয় (৩০ অগাস্ট ১৯৪৫-এ ফরওয়ার্ড ব্লক বিষয়ে ভারত-সচিবের স্মারকলিপি, ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ১৮৩-৮৮)। তাহলেও যত নিস্ফলভাবেই হোক, দেশের মুক্তির জন্যে একটিসেনাবাহিনী সত্যিসত্যিই লড়ছে—দেশপ্রেমী কল্পনায় তার অভিঘাতকে কখনোই খাটো করে দেখা উচিত নয়। তার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন এক বাঙালি—ব্রিটিশদের চিরাচরিত বাঁধাগত অনুযায়ী ভারতের 'জাতি' (রেস)-গুলির মধ্যে যারা সবচেয়ে কম 'সামরিক'। নভেম্বর ১৯৪৫-এ ব্রিটিশরা আজাদ হিন্দ ফৌজিদের বিচার শুরু করার উদ্যোগ নিলে দেশ জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ। কিন্তু আরও তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার হলো, ১৯৪৫-৪৬-এর শীতকালে ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যে অসন্তোষের ঢেউ বয়ে যায়, তার সঙ্গেও সম্ভবত আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর অভিজ্ঞতার যোগ ছিল। এই অসন্তোষেরই চূড়ান্ত রূপ হলো ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ বোম্বাই-এর নৌ-ধর্মঘট। ব্রিটিশদের দ্রুত পাততাড়ি গোটানোর সিদ্ধান্তের পেছনে এটিই সম্ভবত এককভাবে প্রধানতম নির্ধারক কারণ।

কমিউনিস্টরা ও জনযুদ্ধ

বিচিত্রভাবে, যুদ্ধোত্তরকালে, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থানের আর-একটা বড় উপনিমিত্ত হলো—আপাতবিরোধী শোনালেও—কমিউনিস্টদের সাংগঠনিক অগ্রগতি, যদিও ১৯৪২-৪৫ অবধি তাঁরা ছিলেন সুভাষ ও তাঁর সমর্থকদের তীব্রতম বিরোধী। 'জনযুদ্ধ' নীতি সি পি আই-কে অবশ্যই বিচ্ছিন্ন ও প্রবলভাবে বেইজ্জত করে তুলেছিল। তার ওপর অগাস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ 'পাকিস্তান ও জাতীয় ঐক্য' বিষয়ে আশ্চর্য 'অধিকারী তত্ত্ব' (থিসিস) গ্রহণ করে তাঁরা নিজেদের ঝামেলা আরও বাড়ালেন। ভারত যে বহু-ভাষী, আর তাই বহু-জাতিক দেশ, এই ব্যাপারটাতে জোর দিয়েই ঐ থিসিস শুরু করা হয়েছিল। কথাটা নেহাত অযৌক্তিক নয়। ফলত, বলা হলো, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের মতো এখানেও বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন আছে, কারণ তাতেই গড়ে উঠবে এক প্রকৃত গণতান্ত্রিক ও স্বেচ্ছা-সংযুক্ত যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তারপরেই থিসিসটি এক লাফে হাজির হলো 'সিন্ধি, বালুচি, পাঞ্জাবি (মুসলমান), পাঠান ইত্যাদি মুসলিম জাতি-সত্তাগুলির' বিচিত্র ধারণায়, এবং শেষ করল এই বলে যে, মুসলিম লীগ নেতৃত্ব এখন 'কতকটা জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বের মতোই সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এক বিরোধী ভূমিকাই পালন করছেন' (গঙ্গাধর অধিকারী, 'ন্যাশনাল ইউনিটি নাও!' *পিপলস্ এজ*, ৮ অগাস্ট ১৯৪২)। এরই ফলে কমিউনিস্টরা কয়েক বছর ধরে লীগের মধ্যে 'প্রগতিশীল' খুঁজে বেড়ালেন (আবুল হাশেমের মতো), বারবার গান্ধী আর জিন্নার মধ্যে সমঝওতার আবেদন জানালেন, আর বিপজ্জনকভাবে, পাকিস্তান প্রস্তাব প্রায় মেনে নিতে যাচ্ছিলেন। এই মেনে নেওয়ার ব্যাপারটা ছিল সম্ভবত একটা সুবিধাবাদী চাল—তখন কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরায় আরেকটা বড় জাতীয়তাবাদী শক্তির কাছে ঘেঁষার চেষ্টা। নিরপেক্ষতার খাতিরে একথাও অবশ্য বলা উচিত (যদিও তা প্রায়ই বলা হয় না) যে, ১৯৪২-এ এমন অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠী ছিলেন, যাঁদের মনে হতো কমিউনিস্টদের মতোই 'অ-দেশভক্ত'। দক্ষিণ ভারতের গান্ধীপন্থী তথা কংগ্রেস দক্ষিণপন্থী নেতা রাজাগোপালচারী ভা র ত ছা ড়ো আন্দোলনের বিরোধিতা করেন, ও পাকিস্তান দাবি নিয়ে আলাপ-আলোচনার পক্ষে আর্জি জানান। গোলওয়ালকর-এর আর এস এস অগাস্ট বিদ্রোহে একেবারেই যোগ দেয় নি। ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪২-এ সাভারকর বলেন, স্থানীয় সংস্থা, সংসদ বা চাকরি-বাকরিতে যেসব হিন্দু মহাসভার সদস্য আছেন, তাঁরা যেন 'তাঁদের পদ না ছাড়েন ও নিয়মিতভাবে তাঁদের কাজ করে যান'। আর মেদিনীপুরের নির্মম দমন-পীড়ন চলার সময়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তো সত্যিসত্যিই বাঙলার মন্ত্রী ছিলেন। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত নথিপত্র থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, [যুদ্ধপ্রস্তুতিতে] কমিউনিস্টদের হঠাৎ-দেওয়া সমর্থন-প্রস্তাবকে বহু সরকারি আমলাই গভীর সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, বিশেষত জাপ-বিরোধী গেরিলা শিক্ষণের অনুরোধকে : 'বাহ্যত ওরা ফ্যাসি-বিরোধী ও যুদ্ধের পক্ষে, কিন্তু তলায় তলায় সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ; এবং এই দিক থেকে চিন্তা করলে ওদের দাবির ব্যাপারে একটার সঙ্গে অন্যটার যোগ থাকতেই পারে' (লিনলিথগো-কে বিহারের লাট স্টুয়ার্ট, ৬ মে ১৯৪২, ম্যানসার, খণ্ড ২, পৃ. ৪৬)। অন্যদিকে মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর ইন্ডিয়ান ফেডারেশন অফ লেবর-এর জন্যে সরকারি সাহায্য পেয়েছিলেন। এটি ছিল পুরোপুরি কমিউনিস্ট-নিয়ন্ত্রিত এ আই টি ইউ সি থেকে বেরিয়ে যাওয়া একটি সংস্থা। রায় অবশ্য ওয়াভেল-এর কাছ থেকে বড়লাটের কার্যনির্বাহী

কাউন্সিল-এ একটি আসন চেয়েও পান নি (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৪, পৃ. ৫৫)।

কমিউনিস্টদের ভুলগুলো ছিল স্পষ্ট। তার মধ্যে কয়েকটা উদ্ভট, যেমন সুভাষকে কুইসলিং বলা। তার ফলে তারা জনপ্রিয়তাও যথেষ্টই হারিয়েছিল। কিন্তু তাহলেও, ১৯৪২-পরবর্তীকাল কোনোমতেই ভারতীয় কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরোপুরি নঞর্থক অভিজ্ঞতা নয়। জুলাই ১৯৪২-এ পার্টি আইনি হওয়ায় অবশ্যই কিছু কিছু সাংগঠনিক সুযোগ-সুবিধে পাওয়া গেল। কারণ, ১৯২০-র দশকের গোড়ায় প্রথম কমিউনিস্ট গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠার পর থেকেই ব্রিটিশরা কমিউনিস্টদের পেছনে লেগে ছিল। আর ১৯৩৪ থেকে পার্টিও ছিল বেআইনি। সদস্য সংখ্যা ১৯৪২-এ মাত্র ৪০০০ থেকে লাফিয়ে বেড়ে উঠে ১৯৪৩-এর মে মাসে হয় ১৫,০০০, ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি ৫৩,০০০ এবং ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮-এর দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের সময় ১,০০,০০০-র বেশি ; আর ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪-এর মধ্যে এ আই টি ইউ সি-র সদস্য-সংখ্যাও হয় দ্বিগুণ, আড়াই লাখ থেকে পাঁচ লাখ (রজনী পাম দত্ত, *ইন্ডিয়া টুডে*, পৃ. ৩৫৩)। বিচ্ছিন্নতার ফলে সদস্যদের মধ্যে লালিত হয়েছিল এক ধরনের জঙ্গীপনা, আত্মত্যাগ ও আদর্শবাদের ভাব। বিশেষত, দলের বাঙলা শাখার কর্মীরা মন্বন্তরের সময়ে দক্ষ ও অত্যন্ত সমর্পিতপ্রাণ হয়ে কাজ করেন। তার সুবাদে ১৯৪২-এর পরে পার্টি নিজেকে পুনর্বাসিত করে। ফ্যাসি-বিরোধী জনযুদ্ধের স্লোগান জনগণের (বিশেষত চাষীদের) কাছে যতই অবোধ্য হোক না কেন, বিশ্ব-ঘটনাবলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল বুদ্ধিজীবীদের কাছে এর সত্যিই একটা আবেদন ছিল। আর এই সময়টাতেই কলকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর মার্কসবাদের তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়ে। লোকশিল্পের মাধ্যম তথা সাংস্কৃতিক আঙ্গিক ব্যবহার করার ক্ষেত্রে দলের তদানীন্তন সম্পাদক পূরণচন্দ্র জোশী-র কল্পনা-ঋদ্ধ পন্থা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯৪৪-৪৫-এর লক্ষণীয় সাফল্য হলো ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। তাঁদের একটি কেন্দ্রীয় দল ভুখা বাঙলার জন্যে সারা দেশ ঘুরে তহবিল সংগ্রহ করে। গণনাট্য সঙ্ঘ ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ঘটাতে পেরেছিল সত্যিকারের প্রতিভাবান্‌দের এক নক্ষত্র সমাহার : বলরাজ সাহানি, খাজা আহ্‌মেদ আব্বাস, কায়ফি আজমি, সলিল চৌধুরী, শম্ভু মিত্র, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মুখোপাধ্যায় [পরে 'মিত্র'], সুকান্ত ভট্টাচার্য—অনেকের মধ্যে এঁরা মাত্র কয়েকজন। বাঙলায় জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-র 'নবজীবনের গান' বা বিজন ভট্টাচার্য-র 'নবান্ন' সাংস্কৃতিক জগতের একটা বড় দিক্‌বদল। আর কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিক কমিউনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন বা দলে যোগ দেন। যেমন ঔপন্যাসিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বা কবি বিষ্ণু দে, সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

গ্রামাঞ্চলেও, যেসব জায়গায় ১৯৪২-এর তিক্ত দায়ভাগ অতটা প্রকট হয় নি, সেইসব জায়গায় প্রসারিত হচ্ছিল কিসান সভা এবং ভাগচাষী ও কৃষি-শ্রমিকদের সংগঠন : কেরল, উপকূলবর্তী অন্ধ্র তথা তেলেঙ্গানা ও উত্তরবঙ্গে এবং পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ুর কোনো কোনো অঞ্চলে। যুদ্ধের শেষাশেষি, সি পি আই কতকটা ন্যায্যতই, দেশের তৃতীয় বৃহত্তম দল বলে নিজেদের দাবি করতে পারত। যদিও তখনও তারা ছিল অনেকটাই দুর্বল—কংগ্রেস ও লীগ-এর সঙ্গে তুলনায়ই আসে না।

৮

স্বাধীনতা ও দেশভাগ ১৯৪৫-১৯৪৭

ব্রিটিশ শাসনের শেষ দু-বছরের ঘটনাবলির গোলকধাঁধার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে দুটি মৌলিক দিক। (এক) ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও লীগ রাজনীতিবিদ্‌দের মধ্যে অতীব জটিল আলাপ-আলোচনা, আর সেই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং শেষ অবধি স্বাধীনতা ও তার সঙ্গে ট্রাজিক দেশভাগ ; আর (দুই) বিচ্ছিন্নভাবে, স্থানীয় কিন্তু প্রায়শই অত্যন্ত জঙ্গী তথা সঙ্ঘবদ্ধ গণ-সংগ্রাম—আজাদ হিন্দ বাহিনীর মুক্তির দাবিতে আন্দোলন ও ১৯৪৫-৪৬-এ নৌ-বিদ্রোহ, গোটা পর্ব জুড়ে অজস্র ধর্মঘট, ১৯৪৬-৪৭-এ বাঙলায় তেভাগা অভ্যুত্থান, ত্রিবাঙ্কুরে পুন্নপ্র-বয়লার এবং হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানায় সশস্ত্র কৃষি-অভ্যুত্থান। প্রথম বিষয়টি নিয়ে অজস্র ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর আছে কিছু কিছু নথিপত্রের সঙ্কলন। প্রথম সারির লেখাপত্রের মধ্যে কয়েকটি হলো—ভি পি মেনন, ক্যামবেল জনসন, এইচ ভি হোডসন, পেন্ডেরেল মুন-এর লেখা বই, ওয়াভেল-এর রোজনামচা, ম্যানসার-এর খণ্ডাবলি, গান্ধীর শেষ বছরগুলি সম্বন্ধে প্যারেলাল-এর আনুপুঙ্খিক আলোচনা, ১৯৪৫ থেকে সর্দার প্যাটেল-এর চিঠিপত্র ইত্যাদি। গণ-আন্দোলনগুলি সম্বন্ধে লেখালিখির ব্যাপারে কিন্তু ছবিটা একেবারেই উল্টো। আন্দোলনের ভাগীদারদের স্বরচিত কিছু কিছু বিবরণ আছে। সেগুলি খুব কাজের। কিন্তু সেগুলি নিয়ে সুসংবদ্ধ ঐতিহাসিক গবেষণা এখনও পর্যন্ত প্রায় হয়ই নি। তাহলেও নিচুতলার চাপের ফলে তৈরি বিসুরটিকে বাদ দিলে, ব্রিটিশ বা ভারতীয় নেতাদের সিদ্ধান্ত তথা ক্রিয়াকলাপ সত্যিই বোঝা যাবে না। আধুনিক ভারতের গোটা ইতিহাসের ক্ষেত্রেই এটা প্রযোজ্য। সবচেয়ে বড় কথা, গণ-আন্দোলনের ফলেই ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব হয়ে উঠেছিল অসম্ভব, জনসাধারণের 'বাড়াবাড়ি'র ভয়েই কংগ্রেস নেতারা আঁকড়ে ছিলেন আলাপ ও আপসের রাস্তা আর দেশভাগকেও মেনে নিয়েছিলেন অবধারিত দাম হিসেবে ; এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণ-আন্দোলনের ফলেই সম্ভব হয়েছিল অগাস্ট ১৯৪৭-এর খণ্ডিত মীমাংসা।

১৯৪৫-১৯৪৬ ঃ 'আগ্নেয়গিরির কিনারা'

আলাপ আলোচনার প্রস্তুতি

যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েকমাস আগে থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল যুদ্ধোত্তর আলাপ-আলোচনার সূত্রপাত, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামোর মধ্যেই যাতে কংগ্রেস ও লীগ যোগ দেয়—ব্রিটিশরা মাঝে-মধ্যেই তার চেষ্টা চালাচ্ছিল। আর পাকিস্তানের ব্যাপারে গান্ধী ও জিন্নার মধ্যে

কিছু নিস্ফল কথা হয়েছিল। যুদ্ধপ্রয়াসে আরও নিশ্চিতভাবে ভারতীয়দের সহযোগিতা পাওয়ার, এবং আরও যেটা গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন ছাড়া 'অন্য কোনো লাভজনক খাতে' ভারতীয়দের শক্তি ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে কংগ্রেস-লীগ সমঝওতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে 'একটি সাময়িক রাজনৈতিক সরকার' গঠনের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন ওয়াভেল। এমনকি কার্যভার গ্রহণের আগেই, সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এ, তিনি অনির্দিষ্টভাবে এ কথা বলেন ; আরও নির্দিষ্টভাবে বলেন ৫ মে, ১৯৪৪-এ অসুস্থতার কারণে গান্ধী কারামুক্ত হওয়ার পর (দ্র. ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪-এ চার্চিল-কে লেখা তাঁর চিঠি, ইতোমধ্যেই পৃ. ৪০৪-এ উল্লিখিত)। জুলাই-অগাস্ট ১৯৪৪-এ গান্ধী ও ওয়াভেল-এর মধ্যে যে চিঠি চালাচালি হয় তাতে অচিরেই নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল কংগ্রেসের ন্যূনতম দাবির চেয়ে বড়লাটের প্রস্তাবে অনেকটাই কম পড়ছে। কংগ্রেস চেয়েছিল সংসদের কাছে দায়িত্ববদ্ধ এক 'প্রকৃত জাতীয় সরকার' ; ব্রিটিশদের হাতে সাময়িকভাবে থাকবে শুধু যুদ্ধসংক্রান্ত কার্যকলাপ, আর, অবিলম্বে যুদ্ধোত্তরকালে স্বাধীনতার অদ্ব্যর্থ প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সে যা-ই হোক, ওয়াভেল-এর প্রস্তাবে যদি কিছু পাওয়ার কোনো লক্ষণ থাকত, তাহলে ১৯৪২-এর ক্রিপস প্রস্তাবের মতোই, কোনো-না-কোনো স্তরে, চার্চিল অবশ্যই অতর্কিতে তার দফা রফা করতেন। ৫ জুলাই ১৯৪৪-এ চার্চিল 'একটি ক্ষিপ্ত তারবার্তা পাঠিয়ে জানতে চান গান্ধী এখনও মরেন নি কেন'। আর ভারতের ব্যাপারে তিনি বারবার যে-'মনোভাব' প্রকাশ করেন আমেরি অপ্রকাশ্যে তাকে বলেছেন 'হিটলার-সুলভ'। চার্চিল মার্চ ১৯৪৫-এ ওয়াভেলকে বলেন, সমস্যাগুলি যতকাল সম্ভব 'বরফ চাপা দিয়ে রাখা' উচিত। 'মনে হয় তিনি পাকিস্তান, হিন্দুস্তান, প্রিন্সস্তান, ইত্যাদি নানাভাবে ভাগ করে দেওয়ারই পক্ষপাতী...' (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ৭৮, ৮৯, ১২০)।

হিন্দু মহাসভার তীব্র বিরোধিতা উপেক্ষা করে জুলাই ১৯৪৪-এ গান্ধী জিন্নার সঙ্গে কথা বলার প্রস্তাব দেন। আলোচনার ভিত্তি হবে বিগত এপ্রিলে ঘোষিত 'রাজাগোপালচারী সূত্র'। এই সূত্রে বলা হয় : উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের লাগোয়া যেসব জেলায় মুসলমানদের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেগুলি চিহ্নিত করার জন্যে যুদ্ধের পর একটি কমিশন গঠন করা হবে ; ঐ এলাকার অধিবাসীরা পৃথক পাকিস্তান রাষ্ট্রে যেতে চান কিনা সে বিষয়ে গণ-ভোট (প্লেবিসিট) নেওয়া হবে ; আলাদা যদি হতেই হয়, তাহলে প্রতিরক্ষা বা যোগাযোগ-জাতীয় অত্যাবশ্যক পরিষেবা পরিচালনার ক্ষেত্রে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকবে ; এবং গোটা প্রকল্পটি রূপায়িত হবে ব্রিটিশরা পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর করার পর তবেই, আর লীগ স্বাধীনতার জন্যে কংগ্রেসের দাবিতে সম্মতি দেবে ও মাঝখানের সময়টায় একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে সাহায্য করবে। ৩০ জুলাই জিন্না অবশ্য একটু এদিক-ওদিক করে পুরো ছ-টি প্রদেশেরই (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বালুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাঙলা ও আসাম) আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবি আবার পেশ করেন। ঐ সূত্রকে তিনি এই বলে আক্রমণ করেন যে, তাতে দিতে চাওয়া হয়েছে শুধু 'ছায়া ও ভূষি, এক বিখণ্ডিত তথা কীটদষ্ট পাকিস্তান'। তিনি আরও বলেন যে, স্বাধীনতা না-হওয়া অবধি দেশভাগ স্থগিত রাখা যাবে না, সাধারণ পরিষেবামূলক ব্যবস্থার কোনো প্রয়োজন নেই এবং তাঁর মতে হিন্দু-মুসলিম যৌথ গণভোটের অর্থ একটি সুস্পষ্ট জাতিসত্তা হিসেবে মুসলমানদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অন্তর্নিহিত অধিকারের মূল নীতি লঙ্ঘন করা। ফলত,

সেপ্টেম্বর ১৯৪৪-এ গান্ধী-জিন্নার আলোচনা ভেঙে গেল, কিন্তু তাতে লীগ ও কংগ্রেস কেন্দ্রীয় সংসদীয় দলের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতায় কোনো ব্যাঘাত ঘটল না। আর জানুয়ারি ১৯৪৫-এ জোর গুজব ছড়িয়ে পড়ল (পরে জিন্না এটি খারিজ করে দেন) যে, দু-দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় নেতা ভুলাভাই দেশাই ও লিয়াকত আলী খান-এর মধ্যে একটা চুক্তি হয়েছে যে, যুদ্ধকালীন ব্যবস্থা হিসেবে কংগ্রেস ও লীগ, তদানীন্তন সংবিধানের মধ্যেই, কেন্দ্রে ও রাজ্যে মোর্চা গঠন করবে। মনে রাখতে হবে, ১৯৪৫-এর গোড়ায় লীগের অবস্থা বরং খানিকটা বেহালই হয়ে গিয়েছিল। কংগ্রেস এম এল এ-রা জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ-এর লীগ মন্ত্রিসভার জায়গায় গঠিত হলো ড. আবদুল গফ্ফর খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা ; ১৯৪৪-এর মাঝামাঝি খিজর হায়াত খান-এর পাঞ্জাব ইউনিয়নিস্ট-রা খোলাখুলিই জিন্নার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলেন ; মার্চ ১৯৪৫-এ বাঙলায় নিজামুদ্দীন মন্ত্রিসভার পতনের পর জারি করা হলো লাটের শাসন, আর এমনকি সিন্ধু ও আসাম-এর লীগ মন্ত্রিসভাও কংগ্রেসের নীরব সম্মতির ওপর ভরসা করে কোনোরকমে টিঁকে রইল। লীগ যে পাকিস্তান দাবির পেছনে প্রকৃত গণ-সমর্থন সংগঠিত করতে পারবে তার বিশেষ কোনো লক্ষণ তখনও অবধি (বস্তুতপক্ষে অগাস্ট ১৯৪৬ অবধি) পাওয়া যায় নি। গণ-আন্দোলন কোনোদিনই লীগের শক্তির জায়গা ছিল না, আর বহু-উচ্চারিত 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর নারা, মনে হয়, অনেকটাই ছিল মৌখিক।

সিমলা সম্মিলন

ব্রিটেন-এ নির্বাচন হতে যখন আর মাত্র মাসখানেক বাকি, তখন, জুন ১৯৪৫-এ চার্চিল শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করার অনুমতি দিলেন ওয়াভেল-কে। ১৪ জুন ওয়াভেল কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতি-র সমস্ত সদস্যকে ছেড়ে দেওয়ার আদেশ দেন আর এক নতুন শাসন পরিষদ গঠন নিয়ে কথাবার্তার প্রস্তাব রাখেন। খোদ বড়লাট আর সামরিক সর্বাধিনায়ক ছাড়া ঐ পরিষদ হবে পুরোপুরি ভারতীয়। 'বর্ণহিন্দু' ও মুসলমানদের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে, শাসনবিভাগ প্রচলিত সংবিধানের মধ্যেই কাজ করবে (অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সংসদের কাছে দায়িত্ববদ্ধ থাকবে না), কিন্তু যুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভের পর, নতুন সংবিধান নিয়ে আলাপ আলোচনার দরজা খোলাই থাকবে। ১৯৪৫-এর ২৫ জুন থেকে ১৪ জুলাই অবধি চলে সিমলা সম্মেলন। সেখানে সংগ্রেসকে পুরোপুরি একটি 'বর্ণহিন্দু'দের দলে পর্যবসিত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে স্বভাবতই তাঁরা প্রতিবাদ করেন, এবং দাবি করেন যে, শাসন পরিষদের জন্যে মনোনীত কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে সমস্ত সম্প্রদায়ের লোককেই মনোনীত করার অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু সম্মিলন আসলে ভেঙে যায় জিন্নার দু-টি অনমনীয় দাবির জন্যে। প্রথমত, সমস্ত মুসলিম সদস্য মনোনীত করার নিরঙ্কুশ অধিকার থাকবে লীগের, আর দ্বিতীয়ত, শাসন পরিষদে এক ধরনের সাম্প্রদায়িক ভেটোর ব্যবস্থা রাখতে হবে : মুসলমানরা যেসব সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করছেন সেগুলি (পাস করাতে) দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে। তদানীন্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম দাবিটি ছিল অকল্পনীয়, কারণ কংগ্রেসের দাবি ছাড়াও (প্রসঙ্গত, সিমলায় কংগ্রেস প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন মৌলানা আজাদ)

ইউনিয়নিস্টদের ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছে ব্রিটিশদেরও ছিল না। তখনও পর্যন্ত পাঞ্জাব সরকার ছিল ইউনিয়নিস্টদের নিয়ন্ত্রণে, উপরন্তু তাঁরা সর্বদাই ছিলেন রাজভক্ত ও লীগের চেয়ে অনেক কম ঝঞ্ঝাটের। তবুও লীগের এই দুটি দাবির চাপে পড়ে সম্মিলন ভেঙে দিয়ে, ওয়াভেল কার্যত জিন্না যে-ভেটো চাইছিলেন তা-ই মেনে নিলেন, কারণ লীগকে তাদের ধাপ্পা প্রমাণ করতে বলার, বা প্রয়োজনে তাদের বাদ দিয়েই শাসন পরিষদ গঠনের কোনো চেষ্টাই করা হলো না।

জুলাই ১৯৪৫-এ লেবর দল বিপুলভাবে জিতে ক্ষমতায় এল। তার ফলে, যে সমস্ত রাজনীতিবিদ্ ১৯৩৮-এ নেহরু-র সঙ্গে ফিল্‌কিন্‌স্ আলোচনায় বা ১৯৪২-এ ক্রিপস প্রস্তাবে যুক্ত ছিলেন, তাঁরা এলেন ক্ষমতায়। গোড়ায় ওয়াভেল খানিকটা নার্ভাস ভাব দেখিয়েছিলেন : লেবর দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 'খুবই বেশি', তাঁরা 'ভারতকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁদের কংগ্রেসি বন্ধুদের হাতে' তুলে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, আর বড়লাটকে হয়তো 'অ্যাক্সিলেটর' ছেড়ে ধীরে কিন্তু দৃঢ়ভাবে...ব্রেক পেডাল-এ' পা রাখতে হবে (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ১৫৯, ১৬৯-৭১)। কিন্তু তিনি খুব তাড়াতাড়িই বুঝতে পারলেন যে দু-দলের দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ীগত পার্থক্য সামান্যই। বহু লেবর নেতাই—যেমন পররাষ্ট্র-সচিব বেভিন—'বাস্তবিকই সাম্রাজ্যবাদী' এবং 'আমাদের ভারত ছেড়ে দিতে হবে এই চিন্তাকে (তিনি) আর সকলের মতোই ঘৃণা করেন, কিন্তু আর সকলের মতোই...এ ব্যাপারে তাঁর কোনো বিকল্প প্রস্তাবও নেই' (২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৬-এর লিখন, *ঐ*, পৃ. ৩৯৯)। অবশ্য যে-ব্যাপারটা দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল তা হলো বিষয়গত পরিস্থিতি : যেমন বিশ্বে, তেমনি ভারতে। নাৎসি জার্মানি ধ্বংস হয়ে গেল। অগাস্ট ১৯৪৫-এ হিরোশিমার পর আত্মসমর্পণ করল জাপান। কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে বা সহযোগিতায় গোটা পূর্ব-ইওরোপে গড়ে উঠতে লাগল সামাজিকভাবে র‍্যাডিকাল জমানা। এমনকি মনে হলো, ফ্রান্স আর ইতালিতেও তাঁরাই ক্ষমতায় চলে আসবেন। চীন বিপ্লব এগিয়ে চলছিল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া জুড়ে এক বিশাল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী তরঙ্গ বইছিল, আর ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া-য় ফরাসি ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদী শাসন পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টার বিরুদ্ধে চলছিল প্রতিরোধ। যুদ্ধক্লান্ত সেনা ও জনতা আর এক দীর্ণ অর্থনীতি নিয়ে ব্রিটেনকে ফিরে যেতেই হতো। লেবর দল জিতে যাওয়ায় সেই প্রক্রিয়াই একটু ত্বরান্বিত হলো।

ওয়াভেল-এর যতই ভয় থাক, অ্যাটলি মন্ত্রিসভা প্রথমেই তাঁকে যেসব পদক্ষেপ নিতে বলল, সেগুলোকে কোনোমতেই খুব র‍্যাডিকাল বলা যায় না। ২১ অগাস্ট ১৯৪৫-এ ঘোষণা করা হলো যে, আগামী শীতে নতুন নির্বাচন হবে। যুদ্ধ চুকলে এটা অবশ্যই করতে হতো। কারণ কেন্দ্রে শেষ নির্বাচন হয়েছিল ১৯৩৪-এ, আর রাজ্যগুলিতে ১৯৩৭-এ। 'বিক্ষোভকারীদের জন্যে সাংবিধানিক কাজকর্মের' ব্যবস্থা করার 'প্রথম পদক্ষেপ' হিসেবে এটি ছিল অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ১৪ অগাস্ট ওয়াভেল-কে ঠিক এই কথাই বলেছিলেন যুক্তপ্রদেশের লাট হ্যালেট (ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ৬৮)। 'সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের সত্বর রূপায়ণ'-এর ('স্বাধীনতা' শব্দটি তখনও এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছিল) যে-প্রতিশ্রুতি আগেই দেওয়া হয়েছিল, ১৯ সেপ্টেম্বর ইংল্যান্ডে কথাবার্তা বলে ওয়াভেল আবার তারই পুনরাবৃত্তি করলেন। নির্বাচনের পর 'সংবিধান-প্রণয়নকারী সংস্থা' গঠন করা নিয়ে বিধায়কদের ও দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া

হলো। ফিল্‌কিন্‌স্‌ আলোচনায় যে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা পর্ষদ গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, তার চেয়ে এটি যথেষ্ট পশ্চাদপসরণ। আরও বলা হলো যে, প্রধান প্রধান ভারতীয় দলের সমর্থন থাকবে এমন শাসন পরিষদ গঠনের চেষ্টাও করা হবে (*ভাইসরয়স্‌ জার্নাল*, পৃ. ১৭০-৭১)।

আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর বিচার

ব্রিটিশ নীতির চূড়ান্ত দিক্‌বদল হলো আসলে ১৯৪৫-৪৬-এর শরৎ ও শীতে, গণ-আন্দোলনের চাপে। ওয়াভেল-এর জার্নাল (অধ্যায় ৮) সম্পাদনা করার সময় পেন্ডেরেল মুন যথার্থই এই ক'টি মাসকে অভিহিত করেছেন 'আগ্নেয়গিরির কিনারা' বলে। ব্রিটিশরা গোড়ার দিকে অত্যন্ত বোকার মতো, ২০,০০০ আজাদ হিন্দ বন্দীর মধ্যে বেশ কয়েক-শ জনকে প্রকাশ্য বিচারের সিদ্ধান্ত নেয় (সেই সঙ্গে যতজনকে চাকরি থেকে বরখাস্ত ও বিনা বিচারে আটক করা হয় তার সংখ্যাও ৭০০০-এর কম হবে না। ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৯-৫১)। নভেম্বর ১৯৪৫-এ দিল্লীর লালকেল্লায় প্রথম বিচার শুরু করে, এবং কাঠগড়ায় একই সঙ্গে একজন হিন্দু, একজন মুসলমান ও একজন শিখ-কে একত্রে দাঁড় করিয়ে (পি কে সেহগাল, শাহ্‌ নাওয়াজ, গুরবক্‌শ্‌ সিং ধীলন), ব্রিটিশরা তাদের মূর্খামি আরও বাড়াল। আসামীদের পক্ষে দাঁড়ালেন ভুলাভাই দেশাই, তেজ বাহাদুর সপ্রু ও নেহরু। এঁদের মধ্যে নেহরু তাঁর ব্যারিস্টারি শামলা গায়ে চাপালেন ২৫ বছর পর। দেশব্যাপী প্রতিবাদে যোগ দিল মুসলিম লীগও। গোয়েন্দা দপ্তরের ২০ নভেম্বরের নোট-এ স্বীকার করা হলো যে 'এরকমভাবে ভারতীয় জনগণের আগ্রহ, বা বরং বলা নিরাপদ, সহানুভূতি আকর্ষণ করার মতো ব্যাপার কদাচিৎ ঘটেছে...এই বিশেষ ধরনের সহানুভূতি সমস্ত সাম্প্রদায়িক গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে।' ঐ একই দিনে বি শিব রাও নামে জনৈক সাংবাদিক লালকেল্লায় বন্দীদের দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেন, 'তাঁদের মধ্যে বিন্দুমাত্র হিন্দু-মুসলমান বোধ নেই...এখন যাঁরা লালকেল্লায় বিচারের অপেক্ষায় রয়েছেন তাঁদের একটা বড় অংশই মুসলমান। জিন্না সাহেব যে পাকিস্তান নিয়ে বিবাদ জিইয়ে রেখেছেন, তাতে এঁদের অনেকেই ক্ষুব্ধ' (*ঐ*, পৃ. ৫১৪, ৫৬৪)। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর উদ্দীপনা ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ায় ব্রিটিশরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। জানুয়ারি মাসে পাঞ্জাবের লাট জানান যে, লাহোরে মুক্ত আজাদ হিন্দ বন্দীদের সংবর্ধনায় উর্দি-পরা সৈন্যরা হাজির ছিলেন (*ঐ*, পৃ. ৮০৭)।

দ্বিতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল : ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ায় ফরাসি ও ওলন্দাজ ঔপনিবেশিক শাসন পুনঃস্থাপনের চেষ্টায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিভিন্ন শাখার ব্যবহার। জন-মানসে (অন্তত শহরের মানুষের মনে) তথা সেনাবাহিনীর একাধিক অংশের ওপর এই ঘটনার অভিঘাত থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় : যুদ্ধের ফলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনা কী প্রচণ্ডভাবে এগিয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ঐভাবে ব্যবহার করায় ওয়াভেল ভীষণ বিচলিত বোধ করেছিলেন, কিন্তু ১৯৪৫-এর অক্টোবরে মিত্রবাহিনীর প্রধান কমান্ডার মাউন্টব্যাটেন তাঁর আপত্তি নাকচ করে দেন (*ঐ*, পৃ. ৩০৫-৬, ৩৬০ এ.)। ইতোমধ্যে, যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে, যথারীতি এসে গিয়েছিল বেকারি ও মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা। গুরুতর খাদ্যসঙ্কটের ফলে তা হয়ে ওঠে তীব্রতর।

বোম্বাই আর বাঙলায় ঘটে আংশিক শস্যহানি, মাদ্রাজে ঘূর্ণিঝড়, আর উদ্বৃত্ত রাজ্য পাঞ্জাবে যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহ করা যায় নি। ২৯ জানুয়ারি ১৯৪৬-এ ওয়াভেল হিসেব করেন ঃ প্রায় ৩০ লক্ষ টন ঘাটতি আছে। আমেরিকা থেকে আমদানিও ছিল অনিশ্চিত। তাই রেশনে মাথাপিছু ক্যালরি হঠাৎ কমিয়ে ১২০০ করে দেওয়া হলো (১৯৪৩-এ যুদ্ধের সময়েও লন্ডন পেত ২৮০০ ক্যালরির বেশি, *ঐ*, পৃ. ৮৬৮-৯, ১০০৬)।

১৯৪৫-এর শরতে সরকারপক্ষ আশঙ্কা করছিল যে, কংগ্রেস আবার বিদ্রোহ করবে। আবার ফিরে আসবে ১৯৪২। আর, যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ, ব্যাপক কৃষি-বিদ্রোহ, শ্রমিক-বিক্ষোভ, সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ ও খানিক সামরিক দক্ষতাসম্পন্ন আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকেদের উপস্থিতি—এই সব মিলিয়ে এবারের অবস্থা হবে আরও ভয়াবহ (যেমন, তু. ১০ নভেম্বর ১৯৪৫-এ ওয়াভেলকে লেখা কেন্দ্রীয় প্রদেশের লাট টুইনহ্যাম-এর চিঠি এবং ১ ডিসেম্বর ১৯৪৫-এ অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সর্বাধিনায়ক অচিনলেক-এর বিশ্লেষণ, *ঐ*, পৃ. ৪৬৮, ৫৭৭-৮৩)। ১৯৪২-এর বীর শহিদদের মহিমান্বিত ক'রে আর সরকারি বর্বরতার বিরুদ্ধে কড়া শাস্তি ও অবিলম্বে আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তির দাবি তুলে, কংগ্রেস নেতারা যে উত্তেজক বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, ওয়াভেল সে-ব্যাপারে তীব্র অভিযোগ করেন (এই ধরনের বক্তৃতা সবচেয়ে বেশি দিচ্ছিলেন নেহরু। তবে গোড়ায় প্যাটেল, আর পরে, বিহার, কেন্দ্রীয় প্রদেশ, যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য জায়গার স্থানীয় নেতারাও ঐ জাতীয় বক্তৃতা দেন)। ব্রিটিশরা কিন্তু বেশ তাড়াতাড়িই বুঝতে আরম্ভ করল যে, এই তরোয়াল-ঝনঝনানি আসলে নির্বাচনী প্রচার, লোকের মেজাজের সঙ্গে খানিকটা খাপ খাওয়ানোর দরকার থেকেই তা করা হচ্ছে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে ১৯৪২ ছিল কংগ্রেসের রঙের টেক্কা। আর আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব বিষয়ে আসফ আলী-র মন্তব্যটিও চিত্তাকর্ষক। অক্টোবর মাসে একান্তে কথাবার্তার সময়ে তিনি নাকি বলেছিলেন যে, তাঁর দল যদি বিষয়টি নিয়ে লড়ে না-যায়, তাহলে তারা 'দেশে অনেকটা জমিই হারাবে', কিন্তু কংগ্রেস যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে তারা আজাদ হিন্দ ফৌজের লোকদের অবশ্যই সেনাবাহিনী থেকে সরাবে আর এমনকি 'তাঁদের কয়েকজনকে কাঠগড়াতেও দাঁড় করাতে' পারে (*ঐ*, পৃ. ৩৮৭)। এর আর-একটা লক্ষণ হলো কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তীব্র বিষোদ্গার, যাতে নেহরু সক্রিয় ভূমিকা নেন। এরই পরিণতিতে সি পি আই-এর সদস্যরা ৫ অক্টোবর কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করলেন এবং ডিসেম্বর মাসে এ আই সি সি-র সদস্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে বহিষ্কার করা হলো। কমিউনিস্টদের ওপর আক্রমণের কয়েকটি ঘটনাও ঘটল। নেহরু-র বক্তৃতায় উত্তেজিত হয়ে একদল কংগ্রেসি পার্টির বোম্বাইস্থিত সদর দফতর আক্রমণ করল। সি পি আই-এর যুদ্ধকালীন নীতির বিরুদ্ধে ন্যায্য ক্রোধ ছাড়াও এতে যে আরও বেশিই কিছু ছিল তার আভাস পাওয়া যায় হিন্দু মহাসভা বা রাজাগোপালচারী-র প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব থেকে। এঁদের বিরুদ্ধে ঐ ধরনের কোনো সঙ্ঘবদ্ধ প্রচার করা হয়নি। অথচ অগাস্ট ১৯৪২-এ ভা র ত ছা ড়ো ও পাকিস্তান প্রসঙ্গে রাজাগোপালচারী-র মনোভাব ছিল একেবারে কমিউনিস্টদেরই মতো। তিনি কিন্তু কংগ্রেসের বড় মাপের নেতাই রয়ে গেলেন।

যে সমস্ত শক্তি অতীতে কংগ্রেস জঙ্গীপনার রাশ টেনে ধরত, আবার তারা সক্রিয় হয়ে উঠল। জি ডি বিড়লা যে 'কংগ্রেস বক্তৃতার উগ্রতায় শঙ্কিত হয়ে উঠছেন' আলাদা আলাদাভাবে

তার উল্লেখ করেন ৩ নভেম্বর সিন্ধু-র লাট, ১৭ নভেম্বর অর্থ বিভাগীয় সদস্য রোলান্ডস্ এবং ৩০ নভেম্বর ভারত-সচিব পেথিক-লরেন্স (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ১৮৫ ; ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ৪৩৮, ৫৭২)। আর ততদিনে 'বাপুর জায়গায়' সর্দার প্যাটেল-ই হয়ে উঠেছেন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের সঙ্গে বিড়লার সরাসরি যোগসূত্র (*ইন দি স্যাডো অফ মহাত্মা*, পৃ. ৩২৮)। 'ইদানীং কিছু লক্ষণ দেখা যাচ্ছে যে, কংগ্রেস নেতারা রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমিত করতে চাইছেন। স্পষ্টতই, তাঁরা চান না নির্বাচনের আগে কোনো গণ-আন্দোলন হোক'। ৫ ডিসেম্বর ওয়াভেল পেথিক-লরেন্স-কে জানান—'কংগ্রেসের পেছনে যে কট্টর পুঁজিবাদীরা আছে তারা ক্রমেই তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা সম্বন্ধে বিচলিত হয়ে উঠছে'। আর তার পরদিনই স্বয়ং বিড়লা লন্ডন-এর এক বড়কর্তাকে এই বলে আশ্বস্ত করেন ঃ 'জওহরলাল নেহরু সমেত এমন একজনও রাজনৈতিক নেতা নেই, যিনি সঙ্কট বা হিংসা দেখতে চান...গণ-অস্থিরতা ও বিদ্যমান প্রতিবেশের ফলেই ঐ ধরনের উগ্র বক্তৃতা দিতে হচ্ছে। এমনকি নেতাদেরও অনেক সময়ে পরিচালিত হতে হয়। কিন্তু আমার মনে হয় লাগামছাড়া ভাষা ভবিষ্যতে ক্রমেই আরও কম শোনা যাবে' (ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ৬০২-৩, ৬১৫)।

আজাদ হিন্দ ফৌজ নিয়ে ২১-২৩ নভেম্বর ১৯৪৫-এ কলকাতায় এক গণবিস্ফোরণ হয়ে গেল। আর এটাই হলো ঘটনার সেই 'বাঁক' যাতে 'অন্তত সাময়িকভাবে মনোমালিন্যের অবসান হলো' (ষষ্ঠ জর্জকে ওয়াভেল, ৩১ ডিসেম্বর, *ঐ*, পৃ. ৭১৩)। ঐ ঘটনার পর প্রায় এক দশক ধরে কলকাতা শহরে মাঝে-মধ্যেই গণ-বিক্ষোভের একটা ধাঁচ তৈরি হয়ে যায়। মনে পড়ে খানিকটা সেই ফরাসি বিপ্লবের সময়ে পারি-র বিখ্যাত 'জুরনে' বা 'দিনগুলি'র কথা। আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্ররা একটি মিছিল করেন। গোড়ায় এর আয়োজন করেছিল ছাত্র কংগ্রেস। ছাত্রদের ডালহৌসি স্কোয়্যার-এ ঢুকতে বাধা দিলে সারারাত তারা ধর্মতলা স্ট্রিট-এ বসে থাকে। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় কমিউনিস্ট ছাত্র ফেডারেশন-এর কর্মীরা—এতদিন অবধি যাদের সবচেয়ে কটুশত্রু বলেই ভাবা হতো। আর আসে লীগের সবুজ পতাকা নিয়ে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্ররা। অথচ, পুরো উল্টো দিকে, শরৎ বসু—সুভাষের দাদা বলে যাঁকে সম্মান করা হতো—ওই সমাবেশে ভাষণ দিতে রাজি হলেন না। হিংসা খুঁচিয়ে তোলার জন্যে তিনি পরে, কমিউনিস্টদের দোষ দেন। ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সর্বাত্মক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কংগ্রেস, লীগ ও লাল পতাকা একসঙ্গে বেঁধে দেয়। পুলিশের প্রথম দফার গুলিতে দুজন ছাত্র মারা যান (একজন হিন্দু, একজন মুসলমান)। তারপরেই ২২ ও ২৩ নভেম্বর সারা শহরে গণ্ডগোল ছড়িয়ে পড়ে। শিখ ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ও কমিউনিস্ট-পরিচালিত ট্রাম শ্রমিকরা ধর্মঘট করেন। বহু কল-কারখানাতেও ধর্মঘট হয় (কলকাতা পৌরসভার কর্মীরা ইতোমধ্যেই আর্থনীতিক দাবি-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করছিলেন)। গাড়ি-লরিতে আগুন লাগানো হয়। জনতা ট্রেন ও রাস্তা অবরোধ করেন। পরবর্তী পুলিশি তদন্তে একটা নতুন লক্ষণের উল্লেখ করা হয় ঃ 'জনতার ওপর গুলি চালালেও তারা দাঁড়িয়েই থাকছে, বড় জোর একটু পিছিয়ে গিয়ে আবার আক্রমণ করছে' (ওয়াভেল-কে লাট কেসি, ২ জানুয়ারি ১৯৪৬, *ঐ*, পৃ. ৭২৫)। ১৪টি গুলি চালনার ঘটনায় ৩৩ জন নিহত হন। আহত হন প্রায় ২০০ সাধারণ নাগরিক। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর ১৫০টি গাড়ি চুরমার করা হয়। ৭০ জন

ব্রিটিশ ও ৩৭ জন মার্কিন সৈন্য আহত হন। তারপরে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। এর প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ২৪ নভেম্বর বোম্বাই-এর এক নির্বাচনী জনসভায় পুলিশের সঙ্গে 'তুচ্ছ বিবাদে' শক্তি 'খইয়ে ফেলা'র নিন্দা করেন প্যাটেল (*ইন্ডিয়ান অ্যানুয়াল রেজিস্টার*)। বাঙলার লাটের সঙ্গে যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণ এক আলোচনা শুরু করলেন গান্ধী। আর ৭-১১ ডিসেম্বর কলকাতায় কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতির বৈঠকে আবার অহিংসায় দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করা হলো। অথচ, সেপ্টেম্বরের এ আই সি সি-র অধিবেশনে বহু সদস্যই ১৯৪২-এর আন্দোলনের প্রতিটি দিকের মহিমাকীর্তন করেছিলেন—যে আন্দোলন কোনোমতে অহিংস ছিল না। ব্রিটিশরা তাদের দিক থেকে উপলব্ধি করল যে, কিছু ছাড় দেওয়া দরকার। ১ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হলো, যেসব আজাদ হিন্দ সদস্যের বিরুদ্ধে হত্যা বা সহ-বন্দীদের সঙ্গে নৃশংস ব্যবহারের অভিযোগ আছে, এখন থেকে শুধু তাদেরই বিচার হবে (প্রথমে মামলায় 'রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা'র যে ঢালাও অভিযোগ আনা হয়েছিল, তা আর আনা হবে না)। আর প্রথম দফার বন্দীদের যে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল জানুয়ারি মাসে তাও মকুব করা হলো। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর মধ্যেই ইন্দো-চীন ও ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রত্যাহার করে নেওয়া হলো ভারতীয় সেনা। ২৮ নভম্বর ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় ভারত বিষয়ক উপ-সমিতি একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। আর ২২ জানুয়ারি ১৯৪৬-এ নিল আরও তাৎপর্যপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত : ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্যে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠানো হবে। ওয়াভেল অবশ্য ইতোমধ্যেই 'ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা' খাড়া করতে শুরু করেছিলেন। মে ১৯৪৬-এ এটি ক্যাবিনেট মিশন-এর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এতে ভাবা হয়েছিল : ব্রিটিশ সেনা ও সরকারি কর্মচারীদের উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলমান-অধ্যুষিত প্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে আর দেশের বাকিটা তুলে দেওয়া হবে কংগ্রেসের হাতে। এটাই হবে 'দমন-পীড়ন' ও 'অসম্মানজনক পশ্চাদপসরণ'-এর 'মধ্যপথ'। ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে এটি অবশ্য চাপা পড়ে যায়। কিন্তু তাহলেও, ভবিষ্যতে কংগ্রেসের নেতৃত্বে কোনো আন্দোলন দমন করা যে অসম্ভব হবে—সেটা স্বীকার করা হয়েছিল, আর সরকারি বড়কর্তাদের একটা উঁচু মহলে যে পাকিস্তানকে এক ভারতীয় উত্তর-আয়ারল্যান্ড তৈরি করার বাসনা ছিল—এটা বোঝার ক্ষেত্রে ঐ 'পরিকল্পনা' এখনও এক কৌতুহলজনক প্রমাণ।

শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশরা ভারতীয় নেতাদের আলাপ-আলোচনার নিরাপদ ঘাটে ভেড়াতে পারলেন। কিন্তু তার আগে, ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ তাঁদের দ্বিতীয় একটা বড় সঙ্কটের মুখোমুখি হতে হয়। আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর আবদুল রশিদ-কে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এরই প্রতিবাদে ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি কলকাতা আবার ফেটে পড়ে। লীগ-এর ছাত্র শাখা ধর্মঘটের ডাক দেয়। তাতে যোগ দেয় ছাত্র ফেডারেশন। আর নভেম্বরের মতোই রাস্তায় রাস্তায় ছাত্র-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দ্রুত গড়ে ওঠে লক্ষণীয় একতা। ১২ ফেব্রুয়ারি কমিউনিস্টদের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে কলকাতার শিল্পাঞ্চল অচল হয়ে যায়। ঐ একই দিনে ওয়েলিংটন স্কোয়্যার-এ এক বিশাল সমাবেশে ভাষণ দেন সুরাবর্দী, গান্ধীবাদী কংগ্রেসি সতীশ দাশগুপ্ত ও কমিউনিস্ট সোমনাথ লাহিড়ী। পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাহায্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দু-দিন লাগে। এই দু-দিনের পথ-সঙ্ঘর্ষে সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৮৪ জন নিহত ও

৩০০ জন আহত হন (গৌতম চট্টোপাধ্যায়, 'দি অলমোস্ট রেভলিউশন', *এসেস্ ইন অনার অফ এস সি সরকার*, নয়া দিল্লী, ১৯৭৬)। ইতোমধ্যে জিনিসপত্রের দাম বাড়া ও জানুয়ারি থেকে রেশন কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে রেল শ্রমিক ও ডাক-তার বিভাগের কর্মচারীরা ধর্মঘটের হুমকি দিচ্ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই সরকারি কর্মচারীরাও তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। সারা দেশের ঘাঁটি এলাকাগুলিতে এই ধরনের কার্যকর শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠায় ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনে নতুন শক্তির সঞ্চার হলো। ১৯২০-র ও ৩০-এর দশকের ধর্মঘটগুলি সীমাবদ্ধ ছিল মূলত একটিই শিল্পকেন্দ্রে—প্রধানত বোম্বাই ও কলকাতার সূতিবস্ত্র শিল্পে। লীগ ও কংগ্রেস নেতারা অবশ্য রেশন-কাটার ব্যাপারটা মেনে নেন। (৩ মার্চ আজাদ এমনকি এটিকে 'দূরদর্শী' [পদক্ষেপ] বলে অভিনন্দন জানান, এবং ঘোষণা করেন যে, 'যেহেতু ব্রিটিশরা এখন তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করছেন', তাই ধর্মঘট করা 'আজকের দিনে অবান্তর' ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ১১-১৭)। গণ-বিস্ফোরণ তাতে থেমে থাকে নি। যেমন, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি এলাহাবাদে ৮০,০০০ বিক্ষোভকারী রশন দোকান আক্রমণ করেন (*ঐ*, পৃ. ১০০৬)।

নৌ-বিদ্রোহ

ব্রিটিশদের সবচেয়ে বড় ত্রাস অবশ্য ছিল ১৮-২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহ—আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের উপাখ্যানগুলির মধ্যে যা সত্যিই সবচেয়ে বীরোচিত, যদিও অনেকটাই বিস্মৃত। রাজনৈতিকভাবে অনগ্রসর 'সামরিক জাতিগুলি' (মার্শাল রেসেস)-র থেকে নিয়োগ করাই ছিল পুরনো সামরিক প্রথা। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে রাজকীয় ভারতীয় নৌবাহিনীর (রয়াল ইন্ডিয়ান নেভি, সংক্ষেপে আর আই এন) যে বিস্তার হয় তাতে দেশের সব জায়গার লোকই আসেন। তার ফলে সে-প্রথা আলগা হয়ে যায়। সাম্রাজ্যের এই শেষদুর্গে জাতিগত (রেস) বিভেদ তখনও বহাল ছিল, অথচ বিদেশে চাকরিসূত্রে পৃথিবীর ঘটনাবলির সঙ্গে যোগ গড়ে উঠছিল, আর পড়ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর বিচার ও ভারতের যুদ্ধ-পরবর্তী গণ-বিক্ষোভের ক্রমবর্ধমান প্রভাব। ১৮ ফেব্রুয়ারি নৌ-সঙ্কেত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান 'তলোয়ার'-এর রেটিংরা খারাপ খাবার ও বর্ণবৈষম্যগত অপমানের বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। পরের দিন তীরবর্তী ক্যাস্‌ল্ ও ফোর্ট ব্যারাকস্ এবং বোম্বাই বন্দরের ২২টি জাহাজে ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহী জাহাজগুলির মাস্তুলে তেরঙ্গা, চাঁদ-তারা ও কাস্তে-হাতুড়ি আঁকা ঝান্ডা একসঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া হয়। রেটিংরা একটি নৌ-ধর্মঘট কমিটি নির্বাচন করেন ; তার নেতা এম এস খান। তাঁদের দাবি ছিল দু-ধরনের। প্রথমত, ভালো খাবার, শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় নাবিকদের বেতনের সমতা ইত্যাদি। আর সেই সঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক স্লোগান, যেমন, আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তি, ইন্দোনেশিয়া থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার ইত্যাদি। কিন্তু শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট আর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিদ্রোহের সীমারেখায় দাঁড়িয়ে তাঁরা মারাত্মক দোলাচলে পড়লেন। ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেলে আদেশ মেনে তাঁরা ফিরে গেলেন নিজেদের জাহাজ অথবা ব্যারাকে, এবং গিয়ে দেখলেন সেনারক্ষীরা তাঁদের ঘিরে ফেলেছে। পরদিন ক্যাস্‌ল্ ব্যারাকস্-এ শুরু হলো লড়াই। রেটিংরা গণ্ডি ভেঙে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। জাহাজগুলো সাহায্য করল গোলা দেগে। ওদিকে অ্যাডমিরাল গডফ্রে বোমারু বিমানে

উড়ে এসে নৌ-বাহিনী ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিলেন। ঐ দিন বিকেলে দেখা গেল ভ্রাতৃত্বের চমকপ্রদ নজির। গেটওয়ে অফ্ ইণ্ডিয়া-য় জনতা রেটিংদের জন্যে খাবার নিয়ে এলেন, আর দোকানদাররা তাঁদের আমন্ত্রণ জানালেন যা দরকার তাই নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আসলে, ঘটনার ধাঁচ অচেতনভাবেই হয়ে উঠল কৃষ্ণসাগর নৌ-বিদ্রোহ ধারার প্রতিধ্বনি, ১৯০৫-এ প্রথম রুশ বিপ্লবের সময়ে এই বিদ্রোহ হয়। সেখানেও অখাদ্য খাবার দিয়েই বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল, আর ভ্রাতৃত্বের কাজে নিযুক্ত জনতাকে মারা হয়েছিল গুলি করে। (পরবর্তীকালে, আইজেনস্টাইন-এর চিরায়ত চলচ্চিত্র 'যুদ্ধজাহাজ পটেমকিন'-এর বিখ্যাত 'ওডেসার ধাপ' দৃশ্যপর্যায়ে এটি অমর করে রাখা আছে)। ২২ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশের নৌ-ঘাঁটিগুলিতে ও কয়েকটি সমুদ্রের জাহাজে। ধর্মঘট পুরোদমে চলার সময় ৭৮টি জাহাজ, ২০টি তীরবর্তী দফ্তর ও ২০,০০০ রেটিং এতে জড়িত ছিলেন। ঐদিন সকালে করাচীতে 'হিন্দুস্তান' জাহাজটি গোলাযুদ্ধ ক'রে তবে আত্মসমর্পণ করে। ওদিকে হিন্দু ও মুসলমান ছাত্র ও শ্রমিকরা পুলিশ তথা সেনাবাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘর্ষের মাধ্যমে তাঁদের সমর্থন জানান।

ঘটনাবলির এই নাটকীয় বিস্তারে ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বোম্বাই তথা অন্যত্র ভারতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দুটি পরিষ্কার বিপরীত মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোম্বাই-এ সি পি আই সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেয় ; অরুণা আসফ আলী, অচ্যুত পটবর্ধন প্রমুখ কংগ্রেস সোশালিস্ট নেতারা সেটি সমর্থন করেন। পুরোপুরি উল্টোদিকে, সর্দার প্যাটেল জনগণকে 'যথারীতি তাঁদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়া'র উপদেশ দেন। আর কংগ্রেস ও লীগ-এর প্রাদেশিক শাখার নেতা এস কে পাটীল ও চুন্দ্রিগড়, শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্যে এমনকি স্বেচ্ছাসেবক পাঠানোরও প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস ও লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৩০০,০০০ লোক কাজ বন্ধ করে দেন। প্রায় সব কারখানাই বন্ধ হয়ে যায়। দু-দিন ধরে রাস্তায় রাস্তায় খণ্ডযুদ্ধ চলে। জনতা 'পথ অবরোধ করে ও কাছাকাছি বাড়িগুলি থেকে সেগুলি বাঁচাতে থাকে' (বিশেষত, সর্বহারা-প্রধান জেলা প্যারেল ও ডেলাইন রোড-এ)। বোম্বাই শহরে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে দু-ব্যাটেলিয়ন সেনা তবল করতে হয়। সরকারি হিসেবে ২২৮ জন সাধারণ নাগরিক নিহত ও ১০৪৬ জন আহত হন। এ-ছাড়াও ৩ জন পুলিশ নিহত ও ৯১ জন আহত হন (*দি আর আই এন স্ট্রাইক*, একদল কর্মচ্যুত রেটিং, দিল্লী, ১৯৪৫, পৃ. ৯৩ ; ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৮২-৩)।

২৩ ফেব্রুয়ারি প্যাটেল রেটিং-দের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আত্মসমর্পণ করান। জিন্না, অন্তত এই একবার, তাঁকে সাহায্য করেন। রেটিং-দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনোরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে জাতীয় দলগুলি তা আটকাবে। এই প্রতিশ্রুতি অবশ্য অচিরেই নিঃশব্দে ভুলে যাওয়া হয়, কারণ ১ মার্চ ১৯৪৬-এ অন্ধ্র কংগ্রেস নেতা বিশ্বনাথন-কে প্যাটেল লেখেন, 'সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলায় কোনরকম নড়চড় করা যায় না...স্বাধীন ভারতেও আমাদের সেনা দরকার হবে' (*সর্দারস্ লেটারস্*, খণ্ড ৪, আহ্মেদাবাদ, ১৯৭৭, পৃ. ১৬৫)। নেহরু-কে বোম্বাই আসার আমন্ত্রণ জানান অরুণা আসফ আলী। নেহরু তা স্বীকারও করেন। কিন্তু অচিরেই তিনি 'হিংসার উন্মত্ত বহিঃপ্রকাশ রোধ করার প্রয়োজন অনুভব করেন'। পরে অবশ্য তিনি সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যের 'লৌহপ্রাচীর' ভেঙে ফেলার জন্যে নৌ-ধর্মঘটকে

অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন (ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৮৪, ১১১৭-১৮)। প্যাটেলের মতো গান্ধীও ছিলেন [নৌ-বিদ্রোহের] প্রতি দ্ব্যর্থহীন শত্রুভাবাপন্ন, 'ভারতের পক্ষে একটি অশুভ ও অশোভন দৃষ্টান্ত' স্থাপনের জন্যে ২২ ফেব্রুয়ারি তিনি রেটিংদের নিন্দা করেন, আর চাকরি নিয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে, তাঁদের শান্তিপূর্ণভাবে পদত্যাগ করার উপদেশ দেন। আর একটি কৌতূহলজনক মন্তব্যও তিনি করেন : 'হিংসাত্মক কাজকর্মের জন্য হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্যদের মিলন অপবিত্র...।' উত্তরে অরুণা আসফ আলীর মন্তব্য খুবই উপযুক্ত। 'কংগ্রেসিরা নিজেরাই আইনসভায় যাচ্ছেন। রেটিং-দের কাজ ছেড়ে দিতে বলার কথা তাঁদের মুখে একদমই সাজে না'। তিনি আরও একটি দুর্ভাগ্যজনক রকমের সঠিক ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন : 'সাংবিধানিক ফ্রন্টের চেয়ে ব্যরিকেডে হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা' হবে অনেক বেশি সহজ (*সর্দারস লেটারস্* পৃ. ১৬২-৩)। গান্ধীর ২২ ফেব্রুয়ারির বিবৃতির পাশে ওয়াভেল-এর একটি অপ্রকাশ্য মন্তব্য রাখতে লোভ হয়। ৩০ মে ১৯৪৬-এ তিনি বলেন : 'যে-কোনো মূল্যেই আমরা একইসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকব' (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ৪৮৫)।

আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর লোকদের জাতীয় বীরের মর্যাদা দেওয়া হয়। কিন্তু এর পুরোপুরি উল্টোদিকে ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর নৌ-বাহিনীর রেটিংদের কোনোদিন সে-মর্যাদা দেওয়া হয় নি। অথচ কোনো কোনো দিক থেকে তাঁদের কাজে আরও বেশি বিপদের সম্ভাবনা ছিল। আর, আজাদ হিন্দ ফৌজ-এর লোকেদের সামনে ফৌজে-এ যোগদানের বিকল্প ছিল : জাপানের বন্দীশিবিরে দুর্বিষহ জীবনযাপন। কেন্দ্রীয় নৌ-ধর্মঘট কমিটি-র শেষ কথাগুলি যেভাবে মনে রাখা হয়, তার চেয়ে আরও ভালোভাবে তা স্মরণীয় : 'আমাদের ধর্মঘট জাতির জীবনের এক ঐতিহাসিক ঘটনা। এই প্রথম সামরিক বাহিনী আর সাধারণ মানুষের রক্ত একই সঙ্গে রাস্তায় বয়ে গেল একই কারণে। আমরা (সামরিক) বাহিনীর লোকেরা কোনোদিনই একথা ভুলব না। আমরা এও জানি যে, তোমরা, আমাদের ভাই-বোনেরাও কোনোদিনই ভুলবে না। আমাদের মহান্ জনগণ জিন্দাবাদ। জয় হিন্দ!' (দি *আর. আই. এন. স্ট্রাইক*, পৃ. ৭৫)।

১৯৪৬ (মার্চ-অগাস্ট) : ক্যাবিনেট মিশন

নির্বাচন

১৯৪৫-৪৬-এর শীতকালে কংগ্রেস নেতারা দৃঢ়ভাবে সব জনসঙ্ঘর্ষ ত্যাগ করে তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন নির্বাচন-যুদ্ধে। ১৯৩৭-এ বক্তা হিসেবে নেহরুই ছিলেন মুখ্য আকর্ষণ। কিন্তু প্রার্থী নির্বাচনের কলকাঠি নাড়তেন আসলে প্যাটেলই। নেহরু কখনও কখনও সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, 'যেসব লোক অতীতে আমাদের সঙ্গে মিথ্যাচারণ করেছে' তাদেরও মনোনয়ন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তিনি এ বিষয়ে বিশেষ কিছুই করেন নি : 'এইসব স্থানীয় ঝগড়াঝাঁটিতে ঢোকার মতো সময় বা ঝোঁক আমার নেই' (প্যাটেলকে নেহরু, ৩১ অক্টোবর ১৯৪৫, দুর্গা দাস (সম্পা.), *সর্দার প্যাটেলস্ করেসপণ্ডেন্স*, খণ্ড ২, পৃ. ৬৬)। সাধারণ (অর্থাৎ অ-মুসলিম)

নির্বাচনকেন্দ্রগুলিতে কংগ্রেস ব্যাপকভাবেই জিতেছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১০২ টি আসনের মধ্যে ৫৭ টি আসন (১৯৩৪-এ যা ছিল ৩৬টি) এবং ৯১.৩% অ-মুসলিম ভোট তারা দখল করেছিল। বাঙলা, সিন্ধু ও পাঞ্জাব ছাড়া অন্যান্য সব প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। হিন্দু মহাসভা গো-হারান হেরে গিয়েছিল এবং কমিউনিস্টরাও ফল করেছিল খুব খারাপ। প্রাদেশিক আসনগুলির মধ্য তাদের দখলে আসে মুষ্টিমেয় ক'টি আসন (শ্রমিক কেন্দ্র থেকে পাওয়া জ্যোতি বসুর আসন সমেত বাঙলায় ৩টি, বোম্বাই-এ ২টি ও মাদ্রাজে ২টি)। কিন্তু কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেসের প্রধান প্রতিযোগী-রূপে কমিউনিস্টদের আবির্ভাব ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। 'অত্যন্ত কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতায়' 'কমিউনিস্টদের সর্বত্র পরাজিত করা'র জন্যে প্যাটেল অন্ধ্রের এক কংগ্রেস নেতাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন (এ কামেশ্বর রাওকে প্যাটেল, ২৭ মার্চ ১৯৪৬, *ঐ*, পৃ. ২৪৩)। মাদ্রাজের লাট জানিয়েছিলেন যে 'কংগ্রেস দক্ষিণপন্থীরা' পরের বারে কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা বিষয়ে 'বিষণ্ণভাবে ভবিষ্যদ্‌বাণী' করছে (ওয়াভেলকে নাইট, ৫ এপ্রিল ১৯৪৬, ম্যানসার, খণ্ড, ৭, পৃ. ১৫২)।

মুসলিম আসনগুলিতে লীগের সাফল্যও ছিল সমানভাবে চোখে পড়ার মতো। ৮০.৬% মুসলিম ভোট পেয়ে কেন্দ্রের ৩০টি সংরক্ষিত নির্বাচনকেন্দ্রের সবক'টি, এবং প্রদেশের ৫০৯টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৪৪২ টি আসন তারাই পায়। এবারে মুসলমানদের মধ্যে প্রধান দল রূপে লীগ নিজেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারল, ১৯৩৭-এ যা পারে নি। কিন্তু পাঞ্জাবে বড় রকমের অগ্রগতি সত্ত্বেও (১৭৫টি আসনের মধ্যে ২ টির জায়গায় ৭৯টা) ঐ গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারল না, আর খিজার হায়াত খান কংগ্রেস ও আকালির সঙ্গে রফা করে আরও এক বছরের জন্য ক্ষমতায় থেকে গেলেন। পাকিস্তানের অঙ্গ হিসেবে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের ওপর দাবি রাখা হয়েছিল। কংগ্রেস এই দুটি প্রদেশেই ভালোরকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। যে দুটি জায়গায়—বাঙলা ও সিন্ধুতে—লীগ মন্ত্রিসভা স্থাপিত হয় সেখানে তা ছিল সরকারি ও ইওরোপীয় সমর্থনের ওপর নির্ভরশীল।

নির্বাচনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ লক্ষণ ছিল সাম্প্রদায়িক ভোটের প্রাবল্য। এই মাসগুলোতে কলকাতা, বোম্বাই, এমনকি করাচীর রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষিপ্ত কিন্তু খবুই লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ-বিরোধী ঐক্য গড়ে উঠেছিল, এ ছিল তার একেবারেই উল্টো। পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর কারণ ছাড়াও, অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক ভোটাধিকারের (প্রদেশগুলিতে জনসংখ্যার প্রায় ১০%, কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১%-এরও কম) কারণেই হয়তো এই বৈষম্য কিছুটা ঘটে থাকতে পারে। ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এ উত্তর পশ্চিম সিমান্ত প্রদেশ-এর লাট যেমন ওয়াভেলকে জানিয়েছিলেন যে মুসলিম সরকারি কর্মচারী আর 'বড় বড় খান' বা ভূস্বামীরা লীগের পক্ষে আছে, তবুও কংগ্রেস 'কম সচ্ছল' মুসলমানদের সমর্থন পাচ্ছে। তার কারণ কংগ্রেস আর্থনীতিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয়—১৯৩৭-এর পরে বা ১৯৪৬-৪৭-এও সেসব প্রতিশ্রুতি অবশ্য পালন করা হয় নি (ম্যানসার, খণ্ড ৬, পৃ. ১০৮৫)। ১৯৩০-এর দশকের শেষদিকে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় স্লোগানে বলা হয়েছিল—সার্বিক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংবিধান-রচনা পরিষদ্ নির্বাচন করা হোক। এখন কংগ্রেস চুপিচুপি সেই স্লোগান ছেড়ে দিল। সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ বোঝাবার প্রসঙ্গে এই বিষয়টি খুবই তাৎপর্য অর্জন করে। সমস্ত ভারতীয় রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে একমাত্র

কমিউনিস্টরাই ১৯৪৫-৪৬-এ এই দাবি আন্তরিকভাবে রেখেছিল। যেমন, পি সি জোশীর নির্বাচনী পুস্তিকা *ফর দি ফাইনাল বিড ফর পাওয়ার,* (১৯৪৫)-এ 'সার্বভৌম জাতীয় সংবিধান-রচনা পরিষদগুলি'কেই মূল রাজনৈতিক স্লোগান হিসেবে হাজির করা হয়। বিভিন্ন ভাষাগত অঞ্চলের ভিত্তিতে, সর্বজনীন ভোটাধিকারের প্রয়োগে সেগুলি নির্বাচিত হবে ; তারা আবার একটি সর্বভারতীয় সংবিধান-রচনা পরিষদ্ নির্বাচন করবে ; প্রত্যেক অঞ্চলে বা 'জাতিসত্তা'র বিচ্ছিন্ন হবার অধিকারও বহাল থাকবে। ঐ পুস্তিকায় ব্রিটিশের সদিচ্ছা কংগ্রেস ও লীগের 'উদারপন্থী মোহ' নিয়ে তীব্র সমালোচনা করা হয়। 'আমাদর সকলের গৌরবের জন্য, আমাদের সবার লজ্জা ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে শেষ যুদ্ধে' 'কংগ্রেস-লীগ-কমিউনিস্ট যুক্ত মোর্চা'র আবেগভরা ডাক দিয়ে পুস্তিকাটি শেষ হয়। ১৭ এপ্রিল ১৯৪৬-এ ক্যাবিনেট মিশনের সঙ্গে একটি সভায় পি সি জোশী সর্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে এই সব দাবি আবারও রাখেন (ম্যানসার খণ্ড ৭, পৃ. ২৯১-৩)। এর একেবারে উল্টোদিকে, সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে বর্তমান প্রাদেশিক আইনসভাগুলোই সংবিধান-রচনা পরিষদের নির্বাচন করবে—কংগ্রেস এতেই নীরবে সম্মত হয়েছিল। বিমূর্ত গণতান্ত্রিক নীতির প্রশ্ন ছাড়াও এক্ষেত্রে জড়িত ছিল আরও অনেক কিছু। সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নির্বাচন অথবা সরকারি নিপীড়নের (প্রায়শই সরকারি মদতপুষ্ট যেসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মাঝেমধ্যেই ঘটত তার থেকে এটা আলাদা) মুখে ক্রমাগত গণ-আন্দোলনের পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে না-গিয়েই লীগ পাকিস্তানের দাবি জিতে নিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের তারাই প্রতিনিধি—এই অধিকার তার প্রাপ্য কিনা তা সত্যিই পরখ করা হলো না (কংগ্রেসের ক্ষেত্রে যেমন তার পরখ হয়েছিল)। ১৯৪৭-এর পরে সর্বভারতীয় নির্বাচনে কংগ্রেস ৩০ বছর ধরে জেতে। আর সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সংঘটিত প্রথম নির্বাচনেই (১৯৫৪-য়) লীগ পূর্ব পাকিস্তানে বিপুলভাবে হেরে যায়, এবং এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও তারা রাজনৈতিক স্থায়িত্ব দিতে পারে নি।

ক্যাবিনেট মিশন

ভারত-সচিব পেথিক-লরেন্স, ক্রিপস্ ও আলেকজাণ্ডার—এই তিনজন ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের সদস্য ওয়াভেল-এর সঙ্গে একত্রে ২৪ মার্চ থেকে জুন ১৯৪৬ অবধি ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ ও প্রায়ই যথেষ্ট প্যাঁচালো আলাপ-আলোচনা চালান। ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্যে, প্রথমত অন্তর্বর্তী সরকার এবং দ্বিতীয়ত একটি নতুন সংবিধান গঠনের আদর্শ ও পদ্ধতি—মূলত এই দুটি বিষয় নিয়েই আলোচনা চলেছিল। সংসদের নিম্নকক্ষের এক বিবৃতিতে ১৫ মার্চ অ্যাটলি ভারতকে দ্রুত ও পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন। তিনি ঘোষণা করেন 'যদিও সংখ্যালঘুর অধিকার সম্বন্ধে আমরা সচেতন...কিন্তু সংখ্যাগুরুর অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘুর 'ভেটো' প্রদানে আমরা কখনোই সম্মত হতে পারি না' (ভি পি মেনন, *ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া,* পৃ. ২৩৭)। এতে কংগ্রেসের আশা যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে অতি বন্ধুত্বের কারণে ক্যাবিনেট মিশন সম্পর্কে ওয়াভেল খুবই সন্দিহান ছিলেন। যেমন, ক্রিপস্ একবার গান্ধীর জন্যে নিজেই এক গেলাস জল এনে দেওয়ায় ওয়াভেল আঁতকে উঠেছিলেন। এমনকি *ভাইসরয়স্ জার্নাল*-এ মিশনকে 'কংগ্রেসের কুক্ষিগত'

বলে দোষারোপ করা হয়েছে (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ২৩৬, ৩২৪-৫)। তবে ক্যাবিনেট মিশনকে কখনও কখনও যদি কিঞ্চিৎ কংগ্রেস-ঘেঁষা বলে মনে হতো, তার মূল কারণ অবশ্য জাতীয়তাবাদের প্রতি লেবর পার্টির সহানুভূতি নয় বা ক্রিপস্-এর সঙ্গে নেহরু-র পুরনো যোগাযোগও নয়। এর কারণ ছিল, স্বয়ং ওয়াভেল ২৯ মার্চ যা বলেছিলেন,—'কংগ্রেস যে গণআন্দোলন বা বিপ্লব শুরু করার ক্ষমতা রাখে এবং আমরা যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারব বলে নিশ্চিত নই তা এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা' (*ঐ*, পৃ. ২৩২), দ্রুত এবং সহজে ক্ষমতালাভের আগ্রহ এবং যে কোনো মূল্যে সামাজিক বিন্যাসকে রক্ষা করার ইচ্ছায় কংগ্রেস যে আরও একবার ধনুকে ছিলা পরাল না—এই সিদ্ধান্ত এড়ানো কঠিন। এপ্রিলে হলো ব্যাপক পুলিশ ধর্মঘট (মালাবার, আন্দামান, ঢাকা, বিহার ও দিল্লীতে), সারা গ্রীষ্মকাল জুড়েই একটা সর্বভারতীয় রেল বন্ধের ভয় ছিল, জুলাইতে হলো ডাক ধর্মঘট। ১৬ অগাস্ট কলকাতার ভয়ঙ্কর গণহত্যার দিন থেকে তিন সপ্তাহেরও কম আগে, ২৯ জুলাই কলকাতায় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে, ডাক বিভাগের কর্মীদের সমর্থনে একটি 'বন্‌ধ' হলো। তা ছিল সর্বাত্মক , পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ ও লক্ষণীয় রকমের ঐক্যবদ্ধ। হোম সদস্য ৫ এপ্রিল সাবধান করে দিয়ে বলেন যে, কংগ্রেসি বিদ্রোহকে দমন করা যাবে কিনা' সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ আছে, বিশেষত এই কারণে যে 'সাধারণ ধর্মঘটের ডাকও ব্যাপক ভাবে মানা হয়, শ্রমিকরাও বেশির ভাগই কমিউনিস্ট ও কংগ্রেসি নেতৃত্বের কথায় চলে' (ম্যানসার, খণ্ড ৭, পৃ. ১৫১)। ঘটনা এই যে, ১৯৪৬-এর ধর্মঘটের ঢেউ আগের সব নজির ছাপিয়ে যায়। ১৬২৯টি কর্মবিরতিতে ৯,৪১,৯৪৮ জন শ্রমিক শামিল হয়েছিলেন, নষ্ট হয়েছিল, ১২,৭১,৭৭৬২টি জনদিবস। অগাস্টে কার্যনির্বাহী কমিটির প্রস্তাবে কংগ্রেস সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মনোভাব ভালোভাবে ধরা পড়েছে। সেই প্রস্তাবে শ্রমিকদের তরফে ক্রমবর্ধমান উচ্ছৃঙ্খলতা ও দায়দায়িত্বের ব্যাপারে অনাগ্রহকে নিন্দা করা হয় (শ্রমিকদের সম্পর্কে জে বি কৃপালনীর 'নোট', এ আই সি সি জি ২৬/১৯৪৬)। তবুও কংগ্রেস নেতৃত্ব আলাপ-আলোচনা ও মন্ত্রিত্ব গড়ার মধ্যেই পুরোপুরি ডুবে থাকল। '(রেলকর্মীদের) অযৌক্তিক মনোভাব এবং তাদের কাছে নতি স্বীকারের বিপদ' নেহরু 'বুঝতে পেরেছেন মনে হয়'—এতে ওয়াভেল অনেকখানি স্বস্তি পেয়েছিলেন। সেপ্টেম্বরে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রী হলেন শরৎ বসু। দিল্লীর বিদ্যুৎ শ্রমিকদের ধর্মঘট ঘোষণার প্রথম আভাসেই তিনি সেনাদল ও ব্রিটিশ প্রযুক্তিবিদদের আমন্ত্রণ জানান। এই দেখে বড়লাট মজা পেয়েছিলেন, (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ২৭৯, ৩৫২)। ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা ও অন্তর্বর্তী সরকারের মারপ্যাঁচ অবশেষে সাম্প্রদায়িক তাণ্ডব ও দেশভাগ ছাড়া আর কিছুর পথ প্রশস্ত করতে পারে নি।

পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারে জিন্নাও জেদ ধরে রইলেন, সেই পাথরে ধাক্কা খেয়ে প্রাথমিক আলাপ-আলোচনা যথারীতি থেমে যায়। তারপর ১৬ মে ক্যাবিনেট মিশন একটি পরিকল্পনা হাজির করলে অল্প সময়ের জন্যে এই অচলাবস্থা কাটার সম্ভাবনা দেখা দিল। জিন্নার সামনে বাছাই করার জন্য রইল : (এক) 'ঘুনধরা' পাকিস্তান অথবা (দুই) তখনও পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ দেশের উত্তর পশ্চিম ও উত্তর পূর্ব প্রদেশে মুসলিম প্রাধান্যের সম্ভাবনা থাকবে এমন একটা শিথিল ত্রি-স্তর যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো। ক্যাবিনেট মিশন বলে দিয়েছিল, পুরো পাকিস্তান সম্ভব নয়, কারণ এক বিরাট সংখ্যক অ-মুসলমান তার মধ্যে পড়ে (যেমন, বাঙলা ও আসামে

৪৮.৩%) সাম্প্রদায়িক আত্মনির্ধারণের নীতিতে অত্যুৎসাহী লীগ (কলকাতা সমেত, যেখানে মুসলমানরা ছিলেন মাত্র ২৩.৬%) হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ এবং শিখ ও হিন্দু-প্রধান পাঞ্জাবের আম্বালা ও জলন্ধর বিভাগের ভাগ দাবি করেছিল। (ইতোমধ্যেই কিছু শিখ নেতা দাবি জানাতে শুরু করেছিলেন যে, যদি সত্যিই দেশভাগ হয় তবে তাঁদের জন্যেও আলাদা একটি রাষ্ট্র চাই), বাঙলা ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ দৃঢ়মূল আঞ্চলিক বন্ধনের পরিপন্থী হবে, প্রচুর আর্থনীতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে, আর সব সত্ত্বেও লীগকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। এর বিকল্প ছিল : বৈদেশিক বিষয়, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী এক দুর্বল কেন্দ্র। এর সঙ্গে ছিল প্রাদেশিক আইনসভা বা সংবিধান-রচনা পরিষদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনটি শাখায় বিন্যস্ত ছিল। হিন্দু-প্রধান প্রদেশের জন্য ক বিভাগ, আর (উত্তর-পশ্চিম ও আসাম সহ) উত্তর-পূর্বের মুসলমান প্রধান প্রদেশগুলির জন্য খ ও গ বিভাগ। মধ্যবর্তী স্তরের শাসনবিভাগ ও আইনসভা স্থাপনের ক্ষমতা তাদের থাকবে।

দুটি প্রধান দলই এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা মেনে নিল (৬ জুন লীগ ও ২৪ জুন কংগ্রেস)। মৌলানা আজাদ পরবর্তীকালে একে 'গৌরবময় ঘটনা' বলে বর্ণনা করেছেন (*ইন্ডিয়া উইনস্ ফ্রিডম*, পৃ. ১৫১)। আসলে চুক্তিটি ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য ছিল, কারণ তা ছিল পরিকল্পনার পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যার ওপর নির্ভরশীল। লীগ চেয়েছিল এই বিন্যাস বাধ্যতামূলক হোক, যাতে ভবিষ্যতে বিচ্ছিন্ন পাকিস্তান সৃষ্টির উদ্দেশে খ ও গ বিভাগ অখণ্ড সত্তায় পরিণত হতে পারে। সেই সঙ্গেই জিন্না ভেবেছিলেন, কংগ্রেস হয়তো এই পরিকল্পনা বাতিল করে দেবে, আর সেক্ষেত্রে ব্রিটিশরা হয়তো লীগকে এককভাবে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্যে ডাকতে পারে। ওয়াভেলও এই আশা পুরোপুরি পোষণ করতেন, কিন্তু কংগ্রেস যখন এই দীর্ঘস্থায়ী প্রস্তাব মেনে নিল, তিনি খুবই হতাশ হলেন (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, ২৫ জুন, পৃ. ৩০৫)। কংগ্রেসের যুক্তি ছিল : এই বাধ্যতামূলক বিন্যাস প্রাদেশিক স্বাধিকারের ব্যাপারে বহু-পুনরুক্ত নির্বন্ধের বিরোধী আর এ-বাবদে মিশনের বিশদ ব্যাখ্যাও তার কাছে সন্তোষজনক হয় নি। মিশনের ব্যাখ্যা (২৫ মে) ছিল : প্রাথমিকভাবে বিন্যাস বাধ্যতামূলক হলেও সংবিধান চূড়ান্ত হলে পর প্রদেশগুলি তার থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে, আর সেই অনুযায়ী নতুন নির্বাচন করা হবে। প্রস্তাবিত সংবিধান-রচনা পরিষদে রাজন্যশাসিত রাজ্য থেকে নির্বাচিত সদস্যের কোনো ব্যবস্থা না থাকার জন্যেও কংগ্রেস তার সমালোচনা করে। কংগ্রেসের নতুন সভাপতি নেহরু ১০ জুলাই একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে তাঁর দলের একমাত্র অঙ্গীকার হলো : তাঁরা সংবিধান-রচনা পরিষদের নির্বাচনে যোগ দেবেন। 'একটা বড় সম্ভাবনা হলো...কোনো বিন্যাসই থাকবে না', কারণ খ ও গ বিভাগে যোগ দিতে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের আপত্তি থাকবে। এর পাল্টা চাল হিসেবে লীগ ২৯-৩০ জুলাই এই দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা থেকে প্রাথমিক স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নিল আর পাকিস্তান গঠনের লক্ষ্যে ১৬ অগাস্ট থেকে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রামে' অবতীর্ণ হওয়ার জন্যে 'মুসলিম জাতি'কে ডাক দিল (ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ২৫-৬, ১৩৯)।

ইতোমধ্যে এর পাশাপাশি স্বল্পমেয়াদি সংযুক্ত অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য ওয়াভেল-এর চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। পাঁচজন কংগ্রেসভুক্ত হিন্দু, পাঁচজন লীগভুক্ত মুসলমান, একজন শিখ,

একজন তফসিলী জাতিভুক্ত—জিন্না এই অনুপাত চেয়েছিলেন। সিমলা অধিবেশনের থেকেও পিছু হটা হবে বলে কংগ্রেস এই ধরনের 'সমতা' বাতিল করে দেয়। মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁরা মুসলমান ও হরিজনদের অন্তর্ভুক্ত করার অধিকার চেয়েছিলেন, আর ১৯৪২-এর মতো দাবি জানিয়েছিলেন যে নতুন সরকার যেন প্রকৃত মন্ত্রিসভার মতন হয়, কখনোই যেন তা পুরনো বড়লাটের শাসন-পরিষদের ধারা বেয়েই না চলে। ফলত ওয়াভেলকে ৪ জুলাই একক ভাবেই (সরকারি) কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি তদারকি সরকার গড়তে হয়েছিল। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই যে-কোনোভাবে কংগ্রেসকে অন্তর্বর্তী সরকারে নেওয়াটা দরকারি বলে বড়লাট পিড়াপিড়ি করতে শুরু করেন—এমনকি লীগ যদি তাতে বেরিয়ে যায়, তবুও। সিমাল সম্মিলনে তাঁর অবস্থান ও ঠিক এক মাস আগে তাঁর পছন্দ-অপছন্দের থেকে বড় একটা পথান্তর হলো। এ ক্ষেত্রেও তার ব্যাখ্যা নিহিত আছে সম্ভাব্য গণ-সংগ্রামের ভয়ে : জুলাই মাসেই সারা-ভারত রেল ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া হয়েছিল, আর ডাক বিভাগের কর্মীরা সত্যিসত্যিই কাজ ছেড়ে উঠে গিয়েছিলেন। 'যদি কংগ্রেস দায়িত্ব নেয় তবে তারা বুঝবে যে অবাধ্য লোকদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। তারা হয়তো কমিউনিস্টদেরও দমিয়ে রাখতে পারবে এবং নিজেদের বাম ধারাকে সংযত করতে চেষ্টা করবে। আমি এও আশা করি যে, প্রশাসনের ব্যাপারে আমি তাদের এতে ব্যস্ত রাখতে পারব যাতে রাজনীতির ব্যাপারে তাদের আরও কম সময় থাকে' (ভারত-সচিবকে ওয়াভেল, ৩১ জুলাই ১৯৪৬, ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ১৫৪)। ৯ অগাস্ট গোয়েন্দা সংস্থার অধিকর্তা একই কথা বলেন : '...শ্রমিক-পরিস্থিতি উত্তরোত্তর বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। যতক্ষণ-না কেন্দ্রে কোনো দায়িত্বশীল ভারতীয় সরকার প্রবর্তন করা হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত বিশেষ কিছুই করা যাবে না।...আমি নিশ্চিত, যদি কোনো দায়িত্বশীল সরকার পাওয়া যায়, তবে, এখন যতটা সম্ভব তার চেয়ে অনেক সুনিশ্চিতভাবে সেটি শ্রমিকদের মোকাবিলা করতে পারবে' ('হোম পলিটিকাল' (১) ১২/৭/১৯৪৬)। কংগ্রেস আবারও একবার ফাঁদে পা দিল। ৫ অগাস্টের আগেই ওয়াভেল জানতে পেরেছিলেন, 'দেশে বিশৃঙ্খলার বিস্তার রোধ করার জন্যে কংগ্রেসের অবশ্যই সরকারে যোগ দেওয়া উচিত'—প্যাটেল এ বিষয়ে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, এমনকি তাঁর মত না মানা হলে কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে পদত্যাগ করার হুমকি দিতেও তৈরি ছিলেন (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ৩২৯)। ২৭ অগাস্ট নেহরু ও গান্ধীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে বড়লাট সংবিধান-রচনা পরিষদ তলব না করার ভয় দেখান ও হম্বিতম্বি করে কংগ্রেসকে দিয়ে বাধ্যতামূলক বিন্যাস মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু গান্ধী যখন ওয়াভেল-এর 'হুমকি'র সুরের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিক্রিয়া জানান ('যদিও আমরা সকলেই হয়তো সৈন্য নই, আর যদিও আমাদের কেউ কেউ আইন জানতে পারেন, তবুও আমরা সকলেই সাধাসিধে মানুষ', ওয়াভেলকে গান্ধী, ২৮ অগাস্ট ; ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ৩২২) ভারত-সচিব তখন একটি 'ত্বরার্ত তারবার্তা'য় যে-কোনো রকমে ভাঙন এড়ানোর ওপর জোর দেন (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ৩৪৩)। ২ সেপ্টেম্বর নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস-প্রধান অন্তর্বর্তী সরকার শপথ গ্রহণ করল। নেহরু পরিষ্কার জানিয়ে দেন যে, তাঁর দল তখনও বাধ্যতামূলক বিন্যাসের বিরোধী, যদিও তিনি ব্যাপারটিকে যুক্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ে (ফেডেরাল কোর্ট) পাঠাবার প্রস্তাবও দেন, ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাতেও যার কথা ভাবা হয়েছিল।

১৯৪৬-১৯৪৭ ঃ সাম্প্রদায়িক মহামারণ ও কৃষক বিদ্রোহ

কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব

১৬ই অগাস্ট ১৯৪৬ থেকে নজিরহীন মাত্রায় দাঙ্গার ফলে গোটা ভারতের প্রেক্ষাপট অতি দ্রুত পাল্টাতে থাকে। ১৬ থেকে ১৯ অগাস্ট কলকাতায় শুরু হয় দাঙ্গা। তারপর ১ সেপ্টেম্বর থেকে বোম্বাই ছুঁয়ে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালি (১০অক্টোবর), বিহার (২৫ অক্টোবর), যুক্ত প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বরে (নভেম্বর) এবং মার্চ ১৯৪৭ থেকে পাঞ্জাবকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলে। সাম্প্রদায়িক ভাবাবেগের উস্কানি ছিল সর্বত্র দাঙ্গার উপাদান। দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত প্রত্যক্ষ দায়িত্বের প্রশ্নে, বিস্তারে ও আকারে, আগের থেকে এইসব দাঙ্গার চরিত্র ছিল লক্ষণীয়ভাবে আলাদা। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে লীগ মন্ত্রিসভা কলকাতায় ছুটি ঘোষণা করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী সুহ্‌রাবর্দি সেখানে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন, ময়দানের সেই জমায়েতের পরই ব্যাপক মুসলিম আক্রমণ শুরু হয়। সুহ্‌রাবর্দি প্রায়শই তাঁর কিছু সমর্থক-পরিবেষ্টিত হয়ে দীর্ঘ সময় লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে কাটান আর 'নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের দুর্দশার জন্য হতাশ্বাসকর ব্যতিব্যস্ততা দেখান' (ওয়াভেলকে লাট বারোজ, ২২ অগাস্ট, ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ২৯৭-৩০০)। হিন্দু ও বিশেষত শিখ গুণ্ডারা জোরদার পাল্টা আক্রমণ চালায়। ফলে 'কলকাতার নিচের মহলের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সৈন্যের মধ্যে তা এক গণহত্যালীলা'য় পরিণত হয়। পরিণামে ১৯ অগাস্ট ৪০০০ নিহত ও ১০,০০০ আহত হন। রাস্তায় পড়ে-থাকা বহু সংখ্যক গলিত শব সরানোটা একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দেয় (*ঐ*, পৃ. ৩০২)। আগেকার দাঙ্গার মতো মন্দির বা মসজিদ অপবিত্র করা, ধর্ষণ বা অন্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সুবিধাভোগী শ্রেণীর সম্পত্তির ওপর চড়াও হওয়া নয়, কলকাতা-দাঙ্গার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল—খুন, মনে হয়, হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই এতে নিহত হয়েছিলেন বেশি, শুধু ওয়াভেলই নয় (*ঐ*, পৃ. ২৭৪), প্যাটেলও এই মত পোষণ করেছিলেন ('কলকাতায় হিন্দুরাই জিতেছে। কিন্তু সেটা কোনো সান্ত্বনা নয়', ক্রিপসকে লেখা চিঠি, ১৯ অক্টোবর, *ঐ*, পৃ. ৭৫০)। ব্রিটিশদের দায়িত্বও ছিল সমান স্পষ্ট ঃ নভেম্বর ১৯৪৫ অথবা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬-এর একেবারে বিপরীতে, ২৪ ঘণ্টা পেরনোর আগে সেনাবাহিনী রাস্তায় নামেনি, যদিও ১৭ অগাস্ট ভোরে সফর করার সময়ে লাটসাহেবের মনে পড়ে গিয়েছিল তাঁর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার কথা। ২৬ মার্চ ও ১ এপ্রিল ১৯৪৭-এর মধ্যে কলকাতায় দ্বিতীয় দফা দাঙ্গা বাধে। স্বাধীনতার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত মাঝে মধ্যেই হাঙ্গামা ও ছুরি মারার ঘটনা চলতেই থাকে, শহরের বড় বড় এলাকায় কয়েক মাস যাবৎ এক অথবা অন্য সম্প্রদায়ের লোকের চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

বোম্বাই শহরে শুরু থেকেই ধাঁচটা ছিল বড় আকারে দাঙ্গা নয়, ইতস্তত ছুরি মারার ঘটনা, যদিও তা হয়েছিল ব্যাপকভাবে ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এ ১৬২ জন হিন্দু ও ১৫৮ জন মুসলমান এতে নিহত হন (ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ৫৩২, ৬৪৮)। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা—পূর্ববঙ্গের এই দুটি জেলায় কৃষিজীবনে অস্থিরতার একটা ঐতিহ্য ছিল। সেখানে কৃষকরা ছিলেন প্রধানত মুসলমান আর হিন্দুরা ছিলেন মূলত ভূস্বামী ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাদার গোষ্ঠী। তাই

দাঙ্গার মধ্যে বিকৃত সামাজিক উপাদানও চোখে পড়ে। অক্টোবরের হাঙ্গামায় উত্তর-পশ্চিম কোণে খুনোখুনির চেয়ে সম্পত্তির ওপর চড়াও হওয়া আর ধর্ষণের ঘটনাই ছিল প্রধান। এটা ছিল কলকাতা দাঙ্গার ঠিক উল্টো। নিহতের সংখ্যা ছিল মোটামুটিভাবে ৩০০ ; কিন্তু সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল কোটি কোটি টাকার। জমিদার, আইনজীবী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির ওপর আক্রমণের কথাই হিন্দুতরফের গোড়ার অভিযোগগুলোয় বড় করে এসেছিল। বারোজ-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী 'দক্ষিণ-পূর্ব বাঙলার অস্থিরতা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের কোনো সাধারণ অভ্যুত্থান নয়, বরং এটি একদল গুণ্ডার (স্পষ্টতই সংগঠিত) কাজ। সে সাম্প্রদায়িক অনুভূতি বহাল ছিল সেটাকেই তারা কাজে লাগিয়েছে।' নিহতের সংখ্যা ছিল তুলনায় 'কম' কিন্তু 'সম্ভবত সম্পত্তি নাশের পরিমাণ প্রচুর বলে দেখা যাবে'। লীগ প্রশাসন আবারও জোর করে নির্লজ্জ পক্ষপাত দেখাল। গ্রেপ্তার হয়েছিল ১০৭৪ জন, তার মধ্যে এপ্রিল ১৯৪৭ অবধি ৫০ জন মাত্র জেলে বন্দী ছিল। (ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ৭২৫, ৭৪৫, ৭৫৩ ; নির্মলকুমার বসু, *মাই ডেজ উইথ গান্ধী,* পৃ. ৩৩, ৪৮, ৩০২)

২৫ অক্টোবর 'নোয়াখালি দিবস' উদ্‌যাপনের পরপরই বিহারের দাঙ্গায় অন্য এক ধাঁচ দেখা দিল যা ব্যাখ্যা করা আরও কঠিন : মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দু কৃষকদের গণ-অভ্যুত্থান। ফল হলো নোয়াখালি দাঙ্গার চেয়ে সত্যিই আরও অনেক বেশি ভয়ঙ্কর এক হত্যাকাণ্ড, নিহতের সংখ্যা অন্তত ৭০০০। আতঙ্কিত, হতবুদ্ধি নেহরু জানালেন, যে-জায়গাটি ছিল কংগ্রেসের (সেই সঙ্গে কিসান সভারও) পুরনো ঘাঁটি, সেখানে 'জনগণকে গ্রাস করেছে এক উন্মত্ততা'। তিনি সন্দেহ করেন, এর পেছনে কিছু ভূস্বামীরও প্ররোচনা ছিল, 'কৃষি সমস্যা থেকে তাদের প্রজাদের মনোযোগ সরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে'। আর তিনি লক্ষ্য করেন যে, কংগ্রেস-চালিত প্রশাসন ও দলের অনেক সদস্যও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কাছে নতিস্বীকার করেছিলেন। 'সত্যিকারের যে ছবি এখন দেখতে পাচ্ছি তা বেশ খারাপ ; এমনকি ওরাও (লীগ নেতৃত্ব) যা আভাস দিয়েছে তার চেয়েও খারাপ' (প্যাটেলকে নেহরু, ৫ নভেম্বর ১৯৪৬, দুর্গা দাস, খণ্ড ৩, পৃ. ১৬৫)। বিহারের পরের ঘটনা যুক্ত প্রদেশের গড়মুক্তেশ্বর। যেখানে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা এক হাজার মুসলমানকে খতম করে। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডের খবর উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেসের এ-তাবৎ অটল অবস্থাকে দ্রুত দুর্বল করে দেয়। অক্টোবর ১৯৪৬-এর শেষদিকে ঐ প্রদেশ সফরের সময় নেহরুকে বেশ কিছু বৈরী জনগোষ্ঠীর বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। জানুয়ারি ১৯৪৭-এ হাজারায় দাঙ্গার পরে মারদানের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায়।

ইতোমধ্যে মুসলমান, হিন্দু ও শিখরা একইভাবে তৈরি হচ্ছিল তার জন্যে যেটি সবচেয়ে বড় মহামারণ বলে প্রমাণিত—সেটি ঘটল পাঞ্জাবে। ১৯৪২-এর জানুয়ারিতে হরিয়ানার হিন্দু জাঠ নেতা ছোটুরামের মৃত্যুতে ইউনিয়নিস্ট ব্লক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বলদেও সিং-এর কলকাঠি নাড়ায় কংগ্রেস ও শিখ সমর্থনের মধ্যে দিয়ে খিজার হায়াত খানের মন্ত্রিসভা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এমনকি নির্বাচনেও লীগ যেখানে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতা আর পাকিস্তানপন্থী মনোভাবকে উস্কানি দিয়ে ৭৯টি আসন লাভ করে, ইউনিয়নিস্টরা সেখানে মাত্র ১০টি আসন পায়। জানুয়ারি ১৯৪৭ থেকে লীগের আইন অমান্য আন্দোলনের দরুন ৩ মার্চ খিজার মন্ত্রিসভার

পতন ঘটে। পরদিন লাহোরের আইনসভা কক্ষের সামনে প্ররোচনামূলক শিখ বিক্ষোভ (তলোয়ার ঘুরিয়ে তারা সিং জিগির তোলেন : 'রাজ করেগা খালসা', খালসা রাজত্ব করবে) দেখানোর পরই লাহোর, অমৃতসর, মুলতান, আটোক ও রাওয়ালপিণ্ডিতে, আর সেইসঙ্গে শেষ তিনটি জেলার গ্রামাঞ্চলেও বড় মাপের দাঙ্গা বাঁধে। মুসলমানপ্রধান এই অঞ্চলগুলিতে দাঙ্গার মুখ্য লক্ষ্যই ছিল শিখ ও হিন্দু ব্যবসায়ী আর মহাজনরা। অগাস্ট ১৯৪৭-এ প্রায় ৫০০০ মানুষ নিহত হন। কিন্তু স্বাধীনতার পর সীমান্তের দু'ধারের নিধন-যুদ্ধের তুলনায় এও নিতান্তই উপক্রমণিকা বলে প্রমাণ হয়। শরণার্থীদের ট্রেনগুলি তখন মাঝে মাঝে শুধু মৃতদেহই আনত। পেন্ডেরেল মুন-এর হিসাব মতো নিহত হয়েছিলেন আনুমানিক ১৮০,০০০, তার মধ্যে ৬০,০০০ ছিলেন পশ্চিমের আর পূর্বের ১২০,০০০। মার্চ ১৯৪৮-এর মধ্যে শরণার্থীতে পরিণত হন ৬০ লক্ষ মুসলমান এবং ৪৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ। তার ফলে কার্যত সম্পূর্ণ ও বাধ্যতামূলক জনবিনিময় ঘটে গেল, পূর্ব পাঞ্জাবে পড়ে রইল ৪৭০,০০০ ও পশ্চিমে ৬৭০,০০০ একর জমি। সামগ্রিকভাবে 'মুসলমানরাই প্রাণ হারিয়েছিলেন বেশি আর হিন্দু ও শিখরা হারিয়েছিলেন তাদের সম্পত্তি'। ১৯৪৭-এ মুন যেখানে কাজ করছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাবের সেই বাহাওয়ালপুরে 'সাধারণ মুসলিমরা (মূলত কৃষক) রক্তের চেয়ে হিন্দু সম্পত্তি ও হিন্দু তরুণী উপভোগেই বেশি উৎসাহী ছিল'। মধ্য ও পূর্ব-পাঞ্জাবে বিরোধী সম্প্রদায়গুলি অনেক বেশি সমবলী ছিলেন। বিশেষত শিখরা মুসলমানদের সরিয়ে দেওয়া বা তাড়িয়ে দেওয়ায় এক নির্দয় সংকল্পের পরিচয় দেন, যাতে পশ্চিম থেকে চলে-আসা কুড়ি লক্ষ শিখের জন্যে যথেষ্ট জায়গা পাওয়া যায়। (পেন্ডেরেল মুন, *ডিভাইড অ্যান্ড কুইট*, অধ্যায় ১৪)।

অনেক দেরিতে, জুন ১৯৪৬-এর শেষাশেষি যে ব্রিটিশরা কংগ্রেসের সম্ভাব্য আন্দোলনের সূত্রে পাঁচ বাহিনী সেনা ভারতে আনার পরিকল্পনা করেছিল (ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ১৩-১৫) মানুষের এহেন ভয়াবহ করুণ পরিণতির দায় যখন তাদের ওপর বর্তায় তখন তারা এ ব্যাপারে তেমন কিছুই করেনি। দুটি দৃষ্টান্ত—দুটিই ব্রিটিশ সূত্র থেকে নেওয়া—সরকারি নিষ্ক্রিয়তার—যদি না ইচ্ছাকৃত যোগসাজসের হয়—মাত্রা বোঝানোর পক্ষে যথেষ্ট। দাঙ্গা থামাতে বিমান থেকে বোমাবর্ষণের জন্য বিহারের মুসলমানরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সেই প্রসঙ্গে ৯ নভেম্বর ১৯৪৬-এ ওয়াভেল মন্তব্য করেন : 'বাধ্য না-হলে কেউ আকাশ থেকে মেশিনগানের মতো অস্ত্র চালায় না, যদিও খানিকটা লজ্জার ব্যাপার এই যে, মুসলমানরা বলছেন, ১৯৪২-এ এর ব্যবহার করতে আমরা দ্বিধা করিনি' (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, পৃ. ৩৭৪)। মার্চ ১৯৪৭-এ অমৃতসরের দুটি প্রধান বাজার ধ্বংস হয়ে যায়, 'পুলিশ (সেখানে) একটি গুলিও ছোঁড়ে নি'—এবং পেন্ডেরেল মুন সঠিকভাবেই স্মরণ করেছেন, এটিই ছিল জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের শহর (মুন, পৃ. ৭৮, ৮০-১)।

নেহরুর অন্তর্বর্তী সরকার এই ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক নারকীয়তার সামাল দিতে অসহায় হয়ে পড়েছিল। 'অন্তর্বর্তী সরকার' এই নাম সত্ত্বেও এটি প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের জের টানার বেশি কিছু ছিল না। ১৯ মার্চ ১৯৪৭-এ ওয়াভেল তাঁর মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠকে আজাদ হিন্দ ফৌজ বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে মন্ত্রীদের মত বাতিল করে দেন। ২৬ অক্টোবর তিনি যখন জিন্নাকে বোঝালেন যে, লীগের তফসিলী মনোনীত সদস্য (যোগেন মণ্ডল)

কংগ্রেসের মুসলিম সদস্যের পাল্লা সমান করবে, এই ভিত্তিতে তাঁর সরকারে যোগ দেওয়া উচিত—তখন যৌথভাবে যা কোনোভাবেই কাজকর্ম করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি বাতিল না-করলেও, ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বর্জন না-করলেও একটি গোটা অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমর্থিত বাধ্যতামূলক সমন্বয়ের (এর ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে পাকিস্তান-বিরোধীরা কমে গিয়ে অসহায় সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়) ব্যাপারে তার জিদ না ছাড়লেও লীগকে সরকারে যোগ দিতে দেওয়া হলো। ৯ ডিসেম্বর সংবিধান-রচনা পরিষদের যে-সভা শুরু হয়েছিল লীগ তাতেও হাজির হতে অস্বীকার করে, যার ফলে শুধুই একটি সাধারণ 'লক্ষ্যবস্তু'-বিষয়ক প্রস্তাব পাশ করানো ছাড়া ঐ সভা সেই মুহূর্তে আর কিছু করতে পারল না। নেহরুর করা এই খসড়ায় 'স্বাধীন সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রে'র আদর্শ বিধৃত ছিল। এর মৌলিক লক্ষ্য ছিল স্বশাসিত একক, সংখ্যালঘুর পর্যাপ্ত নিরাপত্তা, আর সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক গণতন্ত্র। অন্তত কংগ্রেসের চোখে লীগের বাধাদান-নীতির মধ্যে ছিল : নেহরু-র 'চা-এর আসরের মন্ত্রিসভাগুলো'য় (বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার আগে বিভিন্ন নীতি সমন্বয়ের জন্য বেসরকারি অধিবেশন) যোগ দিতে গররাজি হওয়া, আর ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ অর্থমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের বাগাড়ম্বরে ভরা অর্থসংস্থান (বাজেট) উত্থাপন যাতে বড় ব্যবসাদারদের (এঁদের মুখ্য অংশই ছিলেন হিন্দু) ওপর অত্যধিক কর চাপানো হয়। ওয়াভেল এটিকে 'এক চতুর পদক্ষেপ' বলে মনে করেন, কারণ 'কংগ্রেস আর বিড়লার মতো তার ধনী ব্যবসায়ী সমর্থকদের মধ্যে (এটি) কীলক গুঁজে দেয়, আর কংগ্রেসও এই ব্যবস্থায় আপত্তি করতে পারে না' (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭, পৃ. ৪২৪)।

কলকাতা, নোয়াখালি, বিহার ও পাঞ্জাবের মুখোমুখি হয়ে কংগ্রেসের সাধারণ কর্মী ও নেতৃত্বের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শগুলি উবে যাওয়ার উপক্রম হলো। নেহরু একই রকমে বিহার ও অন্যত্র হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেছিলেন। সুহ্‌রাবর্দির লাগাম-ছেড়ে-দেওয়া 'কলকাতার নিচের মহলের গুণ্ডাদের' দমন করার জন্য ওয়াভেল কলকাতায় অবিলম্বে সেনাবাহিনী তলব না-করায় আজাদ তাঁকে দোষী করেছিলেন (ওয়াভেল-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ১৯ অগাস্ট ১৯৪৬, ম্যানসার, খণ্ড ৮, পৃ. ২৬১)। কিন্তু নেহরু যে বিহারের নিন্দা করেছিলেন, বৈরীভাবাপন্ন বিভিন্ন হিন্দু প্রতিক্রিয়ার সঙ্গেই তাঁর সহানুভূতি দেখিয়েছিলেন প্যাটেল : 'আমরা বিহারের জনগণ ও মন্ত্রিসভাকে লীগ নেতাদের হিংস্র ও ইতর আক্রমণের মুখে ছেড়ে দিলে মারাত্মক ভুল করব' (রাজেন্দ্রপ্রসাদকে প্যাটেল, ১১ নভেম্বর ১৯৪৬, দুর্গা দাস, খণ্ড ৩, পৃ. ১৭১)।

কেন্দ্রে কংগ্রেস-লীগ সংযুক্তির সুস্পষ্ট অকার্যকারিতার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মিলে ১৯৪৭-এর প্রথমদিকে অনেককেই ভাবতে বাধ্য করাল দেশ ভাগের কথা—এমন সব নিরিখে এ-যাবৎ যা মেনে নেওয়ার কথা ভাবাই যেত না। অচিরেই নেহরু প্যাটেলও তাদের মধ্যে পড়ে গেলেন। বাধ্যতামূলক সমন্বয়ের ফলে মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে পরে পাকিস্তান গঠিত হতে পারে—এই ভয়ে বাঙলা ও পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি থেকেই সবচেয়ে একরোখা দাবি আসতে শুরু করল : অস্ত্রোপচারের সমাধান। যেমন, হিন্দু মহাসভা

পশ্চিমবঙ্গে স্বতন্ত্র হিন্দু প্রদেশ গঠনের কার্যকর সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার জন্যে একটি কমিটি গঠন করে (ভি পি মেনন, পৃ. ৩৪৮)। ১০ মার্চ ১৯৪৭-এ নেহরু অপ্রকাশ্যে ওয়াভেলকে বলছিলেন, 'যদিও রূপায়িত করতে পারলে ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনাই সবচেয়ে ভালো সমাধান ছিল—এছাড়া বাঙলা ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদই একমাত্র বাস্তব বিকল্প' (*ভাইরয়স্ জার্নাল,* পৃ. ৪২৬-২৭)। একমাস পরে কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী মাউন্টব্যাটেনকে জানালেন : 'একটা যুদ্ধের চেয়ে আমরা বরং ওদের পাকিস্তান ওদেরই ছেড়ে দেব, যদি উচিতভাবে বাঙলা ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদে আপনি রাজি হন' (এইচ ভি হডসন, *দি গ্রেট ডিভাইড,* লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ২৩৬)।

মহাত্মার মাহেন্দ্রক্ষণ

ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগের মূল্যে সেই উঁচু পর্যায়ের দরাদরি, যাতে দেশের বড় অংশে কংগ্রেস ক্ষমতা অর্জন করতে পারে—এই ধারণাটা তখনও একজন মানুষের কাছে অকল্পনীয় আঘাতের কারণ ও গ্রহণের অযোগ্য বলে মনে হতো। ব্যক্তিগত দূত সুধীর ঘোষের মাধ্যমে নিষ্ফল প্রয়াস ছাড়া ১৯৪৫-এর পর থেকে গান্ধী ক্রমশই প্যাঁচালো আলাপ-আলোচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। প্রথমে ক্যাবিনেট মিশনকে ও পরে মাউন্টব্যাটেনকে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন জিন্নাকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া উচিত, ও ভূমিকা বদলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্রিটিশরা কিছুদিন থেকে যাক। এ সবই কংগ্রেসের অন্যান্য নেতাদের চোখে কুইকসোটসুলভ [কিম্ভূত] ঠেকেছিল। ক্রমশ কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ৭৭ বছরের বৃদ্ধ মানুষটি অক্ষয় সাহসে স্থির করেছিলেন, নোয়াখালির গ্রামে গ্রামে, বিহারে, আর কলকাতা ও দিল্লীর দাঙ্গা-বিধ্বস্ত বস্তিতে তাঁর সারাজীবনের আদর্শ—হৃদয়ের পরিবর্তন ও অহিংসা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবেন। হাতে-গোনা কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে তিনি বৈরীভাবাপন্ন মুসলমান-প্রধান গ্রামে থাকতেন। বিহারে হিন্দুরা তাদের আচরণ না-পাল্টালে আমৃত্যু অনশনের হুমকি দিয়েছিলেন তিনি (৬ নভেম্বর ১৯৪৬) এবং জানুয়ারি ১৯৪৭ থেকে তিনি খালিপায়ে নোয়াখালির গ্রামের পথে-পথে বার হলেন। তাঁর পথে ক্রুদ্ধ মুসলমানদের ছড়ানো ময়লা তিনি একবার নিজের হাতে পরিষ্কার করেছিলেন, আর প্রতিদিন সকালে হাঁটা শুরু করতেন রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে' দিয়ে। সেটি হয়ে উঠেছিল তাঁর প্রিয় স্তোত্র। গান্ধীর অনন্য ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং সত্যিকারের মহত্ত্ব তাঁর জীবনের শেষ মাসগুলিতে যত স্পষ্ট হয়েছিল, তার আগে কখনও এত বেশি স্পষ্ট হয়নি। তা হলো : রাজনৈতিক ক্ষমতার সমস্ত প্রথাগত রূপের প্রতি সম্পূর্ণ বিরাগ, ভারত যখন স্বাধীন হতে চলেছে তখন চাইলেই সে ক্ষমতা তিনি পেতে পারতেন। দেশবিভাগের একমাস পরে দাঙ্গা যখন পাঞ্জাবকে ছারখার করে দিচ্ছে, তখন এক সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আবেগে তিনি লীগের এক নেতার উদ্দেশে ঘোষণা করেছিলেন—'আমার জীবন দিয়ে আমি এর সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাই। ভারতের রাস্তায় রাস্তায় মুসলমানদের হামাগুড়ি দেওয়াটা আমি বরদাস্ত করব না। তাঁরা অবশ্যই আত্মমর্যাদার সঙ্গে হাঁটবেন (খালিকুজ্জামান, *পাথওয়ে টু পাকিস্তান,* পৃ. ৪০৪)। হিন্দু-মুসলমান দুটো আলাদা জাতি—এই ধারণাকে তিনি কীভাবে

অসম্মতির মৃদু হাসি দিয়ে সাধারণত সরিয়ে দিতেন তাঁর প্রার্থনাসভাগুলিতে—তা স্মরণ করেছেন একজন কলকাতাবাসী—অন্যথায় যিনি আদৌ গান্ধীর অনুগত নন।

কখনও কখনও গান্ধীর উপস্থিতি সত্যিই অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটিয়ে দিত বলে মনে হয়। যেমন দাঙ্গাবিধ্বস্ত বেলেঘাটায় সুহ্‌রাবর্দিকে তাঁর সঙ্গে থাকতে রাজি করানোর পর পরই ১৫ অগাস্টের প্রাক্কালে কলকাতায় শান্তি ফিরে আসে। ৩১ অগাস্ট শহরে সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের পুনরাবির্ভাব হঠাৎই থেমে গিয়েছিল ১ থেকে ৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ তাঁর আমৃত্যু অনশনের ফলে। পাঞ্জাবের বদলা হিসেবে হিন্দুরা মুসলমানদের ওপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালায়। এর অল্প কিছুদিন পরেই দিল্লিতে দাঙ্গা বাঁধে। জানুয়ারি ১৯৪৮-এ আবার একবার গান্ধীর অনশন সাময়িক প্রভাব ফেলল। এই শেষ অনশন, মনে হয়, অংশত পরিচালিত হয়েছিল প্যাটেলের ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িক মনোভঙ্গির বিরুদ্ধে (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পাঞ্জাবের সম্পূর্ণ জনবিনিময়ের নিরিখে ভাবতে শুরু করেছিলেন, আর যে পূর্বতন চুক্তি অনুসারে দেশভাগপূর্ব ভারত সরকারের ৫৫ কোটি টাকার আর্থিক সম্পদ পাকিস্তানকে দিতে বাধ্য ছিল, তা পালন করতে অস্বীকার করেছিলেন)। অনশনের সময়ে গান্ধী নাকি মন্তব্য করেছিলেন, 'একদা আমি যাকে চিনতাম তুমি সে সর্দার নও।' মুসলমানদের একটা প্রজন্মকে শেখানো হয়েছিল এই মানুষটিকে সবচেয়ে বিপজ্জনক হিন্দু নেতা হিসেবে ঘৃণা করতে। তাঁকেই তাঁরা ২৭ জানুয়ারি ১৯৪৮-এ দিল্লীর কাছাকাছি একটি ধর্মস্থান থেকে কিছু বলার জন্যে আমন্ত্রণ জানান। তিনদিন পরে মহাত্মার মৃত্যু হয়। মূলত বিনায়ক দামোদর সাভারকর—অনুপ্রাণিত পুণার এক ব্রাহ্মণগোষ্ঠী যে ষড়যন্ত্রের মতলব করেছিল, তারই চরম পরিণতিতে ধর্মোন্মাদ হিন্দু নাথুরাম গডসে-র হাতে তিনি নিহত হন। যথেষ্ট হুঁশিয়ারি থাকা সত্ত্বেও, এই ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করতে বোম্বাই ও দিল্লীর পুলিশ কিছু করেনি।

খুবই গভীরে নাড়া-দেওয়ার মতো ও বীরোচিত গান্ধীপন্থা ১৯৪৬-৪৭-এ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত উদ্যোগের বেশি কিছু ছিল না। তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী ও আঞ্চলিক। কী হতে পারত তা অনুমান করা বৃথা ও বিপজ্জনক। কিন্তু এ যুক্তি দেওয়াই যায় যে, এই পথের একমাত্র সত্যিকারের বিকল্প ছিল সাম্রাজ্যবাদ ও তার ভারতীয় মিত্রদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী গণসংগ্রাম। আমরা বারবার দেখেছি, এই একটি জিনিসকে ব্রিটিশরা সত্যিই ভয় করত। দাঙ্গার ফলে অবধারিত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কখনোই, এমনকি ১৯৪৬-৪৭-এর শীতেও, এই সম্ভাবনা পুরোপুরি রুদ্ধ হয় নি। অগাস্টের দাঙ্গার পাঁচ মাস পরে ফরাসি বিমানের দমদম বিমানবন্দর ব্যবহারের প্রতিবাদে কলকাতার ছাত্ররা 'ভিয়েতনাম থেকে হাত ওঠাও' বিক্ষোভ নিয়ে ২১ জানুয়ারি ১৯৪৭-এ আবার রাস্তায় নামে। ঐ একই দিনে শুরু হলো কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত ৮৫ দিন ব্যাপী ট্রাম ধর্মঘট। সম্পূর্ণ ঐক্যবদ্ধ ও শেষ পর্যন্ত জয়ী এই ধর্মঘটে সমস্ত সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, মনে হয়, মুছে গিয়েছিল। অল্প কিছুদিন পরেই বন্দরকর্মী ও হাওড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকরা সেই পথই অনুসরণ করলেন, বাস্তবিকই জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে ধর্মঘটের এক নতুন ঢেউ দেখা যায়। এর মধ্যে কানপুরের সুতোকল থেকে ১০০,০০০ লোক বেরিয়ে আসেন কয়লা বন্ধের হুমকি দেওয়া হয় এবং 'অনেকটাই কমিউনিস্ট বিক্ষোভে'র ফলে কোয়েম্বাটুর, করাচী ও অন্যত্র ধর্মঘট শুরু হয় (ওয়াভেল শ্রমমন্ত্রী জগজীবন রামের কথা উদ্ধৃত করেন, ১৪ জানুয়ারি ১৯৪৭, *ভাইসরয়স্ জার্নাল,* পৃ. ৪১০)। 'সর্বত্র ধর্মঘট...সবাই চাইছে বেশি মজুরি

আর কম কাজ'—১৮ জানুয়ারি গান্ধীর সচিব প্যারেলালকে অভিযোগ করেন বিড়লা (জি ডি বিড়লা, *বাপু*, পৃ. ৪৩৪)। যা-ই হোক, সব ধর্মঘটই ছিল একান্তই আর্থিক দাবি-দাওয়া নিয়ে। অভাব রয়েছিল যথেষ্ট প্রভাবশালী ও দৃঢ়সঙ্কল্প রাজনৈতিক নেতৃত্বের।

দেশের বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত বাঙলায়, কেরলের একাধিক অংশে ও হায়দরাবাদ রাজ্যের তেলেঙ্গানায় গ্রামাঞ্চলের অভ্যুত্থান ছিল ৪৬-৪৭-এর নতুন ঘটনা, সর্বত্রই কমিউনিস্ট-পরিচালিত কিসান সভা সংগ্রামের আরও জঙ্গীরূপের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর পৌঁছচ্ছিল রাজস্ব বা খাজনা-প্রদায়ী ভূমি-অধিকারী কৃষক স্তরের নিচে, ভাগচাষী, ভূমিহীন কৃষক ও জনগোষ্ঠীর মানুষদের দিকে।

১৯৪৫ থেকে শামরাও ও গোদাবরী পারুলেকর-এর মতো কমিউনিস্ট কর্মীরা বোম্বাই-এর কাছে থানা জেলার দাহানু তালুক এবং উমবারগাঁওতে জঘন্যভাবে শোষিত ও পেছিয়ে থাকা ওয়ারলি জনগোষ্ঠীর মধ্যে বাস করতে শুরু করলেন। ঋণ-দাসত্ব, বেঠ অথবা বেঠি (বেগার শ্রম) আর গাছ বা ঘাসকাটা ও ফসল তোলার জন্যে কম মজুরি ইত্যাদি কারণে জঙ্গলের ঠিকাদার, ব্যবসায়ী মহাজন ও বাইরের ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে তাঁরা পরপর সফল আন্দোলন সংগঠিত করেছিলেন।

তেভাগা

জোতদারের কাছ থেকে ভাড়া-নেওয়া জমিতে কর্মরত ভাগচাষীর (বর্গাদার, ভাগচাষী অথবা অধিয়ার) জন্যে অর্ধেক বা তার কমের পরিবর্তে তিনভাগের দু'ভাগ শস্য বরাদ্দ : ফ্লাউড কমিশনের এই তেভাগার সুপারিশ গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কার্যকর করার জন্যে সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এ ডাক দিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিসান সভা। শহরাঞ্চলের বহু জঙ্গী ছাত্র সমেত কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্রাম-গ্রামান্তরে বেরিয়ে পড়েছিল বর্গাদারদের সংগঠিত করার জন্যে। মন্দা ও আকালের ফলে যেহেতু গরিব চাষীরা জমি হারিয়েছিলেন, আর নেবে গিয়েছিলেন ভাগচাষীদের স্তরে, তাই গ্রামীণ জনসংখ্যার একটা বড় ও ক্রমবর্ধমান অংশ পরিণত হয়েছিলেন বর্গাদারে। তেভাগার শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল যেসব এলাকা তার কয়েকটিতে তাঁদের সংখ্যা ছিল গ্রামবাসীর ৬০%। তেভাগা বলবৎ করার জন্যে আগের মতো জোতদারের বাড়িতে না গিয়ে ভাগচাষীরা নিজেদের খামারে ধান নিয়ে তুললেন : 'নিজ খামারে ধান তোলো' এই কেন্দ্রীয় স্লোগান তুলে নভেম্বরে ফসল তোলার সময়ে হঠাৎই আন্দোলনের সূত্রপাত হলো। উত্তরবঙ্গ, বিশেষত দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহকুমা ও রংপুর, মালদা ও জলপাইগুড়ির সংলগ্ন এলাকা হয়ে উঠল ঝড়ের কেন্দ্রবিন্দু। ময়মনসিংহ (কিশোরগঞ্জ), মেদিনীপুর (মহিষাদল, সুতাহাটা ও নন্দীগ্রামে) আর ২৪পরগনাতেও (কাকদ্বীপ) গড়ে ওঠে তেভাগার ঘাঁটি। উত্তর ময়মনসিংহের হাজং-রা ১৯৩৭-৩৮-এ টঙ্কা (উৎপন্নের ওপর খাজনা) কমানোর আন্দোলনে জয়ী হয়েছিলেন, এখন তাঁরা পুরো টঙ্কাই নগদে দেওয়ার দাবি করছিলেন, যাতে তাঁরা বেশি দাম পেতে পারেন। উত্তরবঙ্গের ভিত্তি ছিল প্রধানত জনগোষ্ঠী-সম্ভূত নিচু-জাতের রাজবংশীদের মধ্যেই ; তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন আধিয়ার ও গরীব চাষী, কিন্তু কিছু বড় জোতদারও তার মধ্যে ছিলেন। তাঁদের ক্ষেত্রে শ্রেণী অনুযায়ী সংগঠন ইতোমধ্যেই ক্ষত্রিয় মর্যাদার দাবিতে

পূর্ববর্তী সংস্কৃতায়নের আন্দোলনে ছেদ ঘটিয়েছিল (১৯৪৬-এ কংগ্রেস ও ক্ষত্রিয় সমিতির প্রার্থী—দুজনকেই পরাজিত করে দিনাজপুরের আসনে জয়লাভ করেন কমিউনিস্ট রূপনারায়ণ রায়)। কলকাতা ও নোয়াখালির ঘটনা সত্ত্বেও, মুসলমানেরা যথেষ্ট সংখ্যায় তেভাগার ঘাঁটিগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে থেকেই উঠে আসেন হাজি মহম্মদ দানেশ বা নিয়ামত আলীর মতো নেতা, এমনকি কিছু মৌলবীও *কোরান* উদ্ধৃত করে জোতদারদের অত্যাচারের নিন্দা করেন। ত্রিপুরায় পুরনো কিসান সভার শক্ত ঘাঁটি সমেত গোটা দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে এর কোনো ছাপ পড়ে নি—এই ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ ও তার কারণও বোঝা যায়। স্বেচ্ছাসেবকেরা লাঠি দিয়ে জোতদার ও ক্রমবর্ধমান পুলিশি সন্ত্রাস রোধের চেষ্টা করেছিলেন। 'গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে মূক...তাকে (বর্গাদার) তার সঙ্গীদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে মাঠ পেরোতে দেখলে অনুপ্রেরণা জাগে। মিছিলের মাথায় লাল পতাকা সমেত প্রতিটি মানুষ লাঠিকে রাইফেলের মতো করে, কাঁধে নিয়ে চলেছে' (*স্টেট্‌স্‌ম্যান*, ১৯ মার্চ ১৯৪৭ ; সুনীল সেন, *অ্যাগ্রারিয়ান স্ট্রাগল* ১৯৪৬-৪৭, পৃ. ৩৮-এ উদ্ধৃত)।

কিন্তু লাঠি তো আর রাইফেল নয়, এবং তখন মন্ত্রিসভা এঁদের শান্ত করার জন্য বর্গাদার বিল (১৯৫০-এর আইনে পরিণত হয় নি এবং তখনও কদাচিৎ প্রয়োগ হতো) দিয়ে, আর ফেব্রুয়ারি থেকে অত্যাচার তীব্রতর করে পাল্লা সমান রেখেছিল। আন্দোলন যে-সঙ্কটের মুখে পড়ে তা মারাত্মক বলে প্রমাণ হয়। পুলিশের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষে বালুরঘাটের কাছে ২০ জন সাঁওতাল নিহত হন। সুনীল সেন সবসমেত ৪৯ জন কৃষক শহিদের তালিকা দিয়েছেন। কিছু জঙ্গী কৃষক এরপর চাইলেন অস্ত্র, কিন্তু কমিউনিস্টরা তাঁদের তা দেন নি এবং কোনো অবস্থাতেই একটি সর্বাত্মক সশস্ত্র সংগ্রামের চেহারা তাঁরা সত্যিই দেখতে পান নি। সামাজিকভাবেও নানান সীমাবদ্ধতা দেখা দিচ্ছিল : আরও বেশি জঙ্গী হওয়ার জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন জনগোষ্ঠীর লোকেরা (জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলের কিছু চা-বাগানের কুলিও তার মধ্যে ছিলেন), কিন্তু মধ্য ও গরিব চাষীদের সমর্থন কমে যাচ্ছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান অবলম্বন ছিল যেসব বৃত্তিজীবী গোষ্ঠী, তাঁরা তখন উত্তরবঙ্গের শহরগুলিতে অত্যন্ত বৈরীভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন (অনেকেরই জমি ছিল, সাধারণভাবে যা চাষ করতেন বর্গাদাররা)। ২৮ মার্চ কমিউনিস্টরা একটি সাধারণ ধর্মঘটের পরিকল্পনা করেন, কিন্তু ইতোমধ্যেই বাঙলা ভাগের জন্য হিন্দু মহাসভার প্রচার শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, আর ২৭ মার্চ থেকে কলকাতায় নতুন করে দাঙ্গা শুরু হলে শহরাঞ্চলে সহানুভূতিসূচক ক্রিয়াকর্মের সমস্ত সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়।

পুন্নপ্রা-বয়লার

ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে শেরতলৈ—আলেপ্পে—আম্বালাপুজা অঞ্চলে কমিউনিস্টরা ১৯৪৬ নাগাদ নারকোল ছোবড়া তৈরির কারখানার শ্রমিক, জেলে, পাসী (তাড়ি সংগ্রাহক) ও কৃষি-শ্রমিকদের (কুট্টানড়ের কাছাকাছি অঞ্চলের বড় 'জেন্‌মি' বা ভূস্বামীরা তাঁদের নিয়োগ করতেন) মধ্যে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন। কৃষি-বিষয়ক বৃত্তির সঙ্গে ছোটো শহরে শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর সূত্রটি অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় এখানে আরও অনেক বেশি বাস্তব হয়ে ওঠে। নারকোল ছোবড়া তৈরির কারখানায়

নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ বেসরকারি কিন্তু খুবই জনপ্রিয় সালিশ আদালত প্রতিষ্ঠায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। আবার (জুলাই ১৯৪৬-এ একটি ধর্মঘটের পরে) এমন কি নিজেদের রেশন দোকান চালু-রাখার অধিকার তারা জিতে নিয়েছিল। মহারাজার নিযুক্ত দেওয়ানের নিয়ন্ত্রিত শাসনবিভাগ ও সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত বিধানসভা নিয়ে 'মার্কিন ধাঁচ'-এ সংবিধানের পরিকল্পনা করেন দেওয়ান সি পি রামস্বামী আয়ার। ইতোমধ্যে জানুয়ারি ১৯৪৬-এ তাঁর এই পরিকল্পনার ঘোষণা ও চরম খাদ্যাভাবের ঘটনা মিলে এক বিস্ফোরক রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এটা পরিষ্কার যে ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে যাওয়ার পর স্বাধীন ত্রিবাঙ্কুরকে নিজের কব্জায় রাখার জন্যে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দেওয়ান কাজ করে চলছিলেন, আর বাস্তবে জুন ১৯৪৭-এ তিনি নিজের মতলব হিসেবেই এ কথা ঘোষণা করেন। রাজ্য কংগ্রেস যখন চুপ করে বসেছিল, পট্টম থানু পিল্লাই-এর মতো কিছু নেতা স্পষ্টতই রামস্বামী আয়ারের সঙ্গে আপস করতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, কমিউনিস্টরা 'আমেরিকান মোডাল—আরাবীয়ান কাতলিল' (মার্কিন ধাঁচ—আরব সাগরে ছুঁড়ে ফেলো) এই স্লোগান তুলে এক ব্যাপক প্রচার শুরু করে, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ থেকে পুলিশ চৌকি, ব্যাপক ধরপাকড় ও কারাগারের মধ্যে নিষ্ঠুর নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকার কমিউনিস্ট ও আলেপ্পে অঞ্চলের শ্রমিক ইউনিয়নগুলির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান চালাতে আরম্ভ করে। সশস্ত্র উত্থানের পরিকল্পনার জন্যে ততটা নয়, যতটা আত্মরক্ষার তাগিদেই বেশ কিছু শিবির স্থাপন করা হয়। নির্যাতিত কর্মীরা যেখানে আশ্রয় নিতেন, তাঁদের রক্ষা করতেন কিছুটা প্রাথমিক সামরিক শিক্ষাপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকরা। ২২ অক্টোবর থেকে আলেপ্পে-শেরতলৈ অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক সধারণ ধর্মঘট শুরু হয়। দুদিন পর আলেপ্পে-র চার মাইল দক্ষিণে পুন্নপ্র পুলিশচৌকিতে একটি আংশিকভাবে সফল আক্রমণ চালানো হয়। অপরিমিতি গুলিবর্ষণ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাসেবকরা কাঠের বল্লম নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে থাকেন পুলিশকে হাতাহাতি যুদ্ধে বাধ্য করার জন্য। এখানে ন-টি রাইফেল দখল করা হয়, কিন্তু আপাতভাবে সেগুলির কোনো ব্যবহার দেখা যায় নি। ২৫ অক্টোবর সামরিক আইন জারি হয় এবং ২৭ অক্টোবর সেনাবাহিনী যথার্থই রক্তগঙ্গা বইয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের বয়লার-স্থিত (শেরতলৈ-এর কাছাকছি) সদর দফতরটি দখল করে নেয়। কমিয়ে দেখানো হিসেবে বলা হয়, পুন্নপ্র-বয়লারের স্বল্পস্থায়ী অথচ ভীষণ রক্তাক্ত এই উত্থানে প্রায় ৮০০ জন নিহত হন। সম্পূর্ণ অপদস্থ দেওয়ান ও কংগ্রেসের মধ্যে যে কোনো জোট গঠনকেই বাধা দেয় এই হত্যাকাণ্ড, যদিও কংগ্রেস পরের বছর অবাধ গণ-সংগ্রামের বদলে চাপ প্রয়োগের কৌশলের মাধ্যমে ত্রিবাঙ্কুরকে ভারতের অন্তর্গত করার ব্যাপারে যত্ন নেয়। কৌশলটি সফল হয়েছিল কারণ রামস্বামী আয়ার বুঝতে পেরেছিলেন, শান্তিপূর্ণ আত্মসমর্পণের বিকল্পটি হয়ে উঠতে পারে সশস্ত্র বিপ্লব, এই অর্থে পুন্নপ্র-বয়লারই প্রকৃতপক্ষে বিখণ্ডীকরণের পথ বন্ধ করে ভারতের সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের সংযুক্তি ঘটিয়েছে, দারুণ কষ্টভোগ এবং তাৎক্ষণিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও কমিউনিস্টদের কাছে বীর শহিদের গৌরবময় আত্মবলিদানের আর এক নাম পুন্নপ্র-বয়লার। ১৯৫৭-র পর থেকে কমিউনিস্ট মন্ত্রীরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের আগে এই দুটি গ্রামে একবার গিয়ে থাকেন—তার থেকেই এর প্রতীকী মূল্য বোঝা যায় (কে সি জর্জ, *ইম্মরটাল পুন্নপ্র-বয়লার*, নয়া দিল্লী, ১৯৭৫; *কংগ্রেস অ্যান্ড দি রাজ*, গ্রন্থে রবিন জেফ্রি-র প্রবন্ধ)।

তেলেঙ্গানা

সশস্ত্র সংগ্রামের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছেছিল তেভাগা ও পুন্নপ্র-বয়লার কিন্তু তা পেরোতে পারে নি। জুলাই ১৯৪৬ থেকে অক্টোবর ১৯৫১-র মধ্যবর্তী তেলেঙ্গানায় দেখা দিয়েছিল আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসের এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় গেরিলা কৃষক যুদ্ধ। তুঙ্গমুহূর্তে তিরিশ লক্ষ অধিবাসী সমেত ১৬,০০০ বর্গমাইল বিস্তৃত প্রায় ৩০০০ গ্রামে দাগ কেটেছিল এই আন্দোলন। ধর্মীয় ও ভাষাগত আধিপত্যের মিশ্রণ (তেলেগু, মারাঠি, কন্নড় ভাষাগোষ্ঠীর সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ওপর অল্প কিছু উর্দুভাষী মুসলমান শিরোমণি আধিপত্য বিস্তার করেছিল), বিশেষত তেলেঙ্গানা অঞ্চলে রাজনৈতিক ও নাগরিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব, আর অতি স্থূল রূপে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, মুসলমান ও উঁচুজাতের হিন্দু দেশমুখ (ভূস্বামীতে পরিণত রাজস্বসংগ্রাহক) ও জাগীরদারদের নিচু জাত, জনগোষ্ঠীয় কৃষক ও ঋণদাসদের কাছ থেকে জুলুম করে 'বেটি' বা বেগার শ্রম ও পাওনা আদায়—এই ছিল, আসফজাহি নিজামের তাঁবে থাকা হায়দরাবাদের লক্ষণ, দোরা-রা (প্রভু-ভূস্বামীদের প্রচলিত নাম) অবৈধভাবে জমি দখল করায় চাষীদের অবস্থা মন্দার সময়ের চেয়েও খারাপ হয়েছিল। তেলেঙ্গানার আন্দোলন তেভাগার মতো ছিল না, আবার ত্রিবাঙ্কুরের চেয়ে এটি ছিল বহুল পরিমাণে বিস্তৃত। কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন এই কৃষি-বিদ্রোহ নিজাম ও তার রাজাকারের দলের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বৃহত্তর মাত্রাগুলিকে বজায় রেখেছিল, শ্রমিক শ্রেণীর একটি বড় অংশ সমেত শহরবাসী মুসলমানরা এর থেকে দূরে সরে ছিলেন বা বৈরীভাব পোষণ করতেন। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এ ভারতীয় সেনাবাহিনী ঢোকার আগে পর্যন্ত, তাঁরা ঐ সংগ্রাম চালাতে থাকেন। অস্ত্র আইন যেমন বিনা কড়াকড়িতে বলবৎ করা হয়েছিল ঐ রাজ্যে, সেটিও ছিল বিরাট সুবিধের দিক। ব্রিটিশ ভারতে এটি ঠিক উল্টো ; 'প্রচুর সংখ্যায় দেশী বন্দুক, গাদা বন্দুক—পাওয়া যেত আর সাধারণ ব্যবহারেও লাগত'। সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ পর্যন্ত অস্ত্র কেনার জন্যে প্রতিবেশী অন্ধ্র ও মাদ্রাজের জেলাগুলি থেকে অল্পবিত্তর খোলামেলাভাবেই তহবিল সংগ্রহ করা যেত, কংগ্রেস সমেত সকলেই রাজাকারদের বাধা দিতে চেয়েছিল ও নিজামের মুসলমান-প্রধান স্বাধীন রাজ্য গড়ার চেষ্টা আটকাতে চেয়েছিল। সুন্দরাইয়া স্মরণ করেছিলেন—তাই শুধু বিজয়ওয়াড়া থেকেই তিনদিনে উঠে এসেছিল ২০,০০০ টাকা (পি সুন্দরাইয়া, *তেলেঙ্গানা পিপলস্ স্ট্রাগল অ্যান্ড ইটস্ লেসনস্*, কলকাতা, ১৯৭২, পৃ. ২, ৭-৯, ৪০)।

অন্ধ্র মহাসভা-র মধ্যে দিয়ে কাজ করে আর যুদ্ধকালীন অন্যান্য আদায়, রেশনব্যবস্থার অপব্যবহার, অপরিমিত খাজনা ও 'বেঠি' ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে বিস্তর আঞ্চলিক সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়ে কমিউনিস্টরা যুদ্ধের বছরগুলোতে তেলেঙ্গানার গ্রামগুলিতে শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিলেন। পরম্পরা অনুসারে, অভ্যুত্থানের সূচনা ধরা হয় ৪ জুলাই ১৯৪৬ থেকে। এক গরিব ধোপানির এক চিলতে জমি রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন ডোড্ডি কোমারায়া। নালগোণ্ডার জনগাওঁ তালুকে গ্রামের সেই জঙ্গী কর্মীকে বিসনুরের দেশমুখের (৪০,০০০ একর জমির মালিক এবং তেলেঙ্গানার অত্যন্ত অত্যাচারী ও বৃহৎ ভূস্বামীদের একজন) লাগানো গুণ্ডাবাহিনী সে-সময়ে খুন করে। নালগোণ্ডার জনগাওঁ, সূর্যপেট ও হুজুরনগর তালুকগুলি ছিল প্রতিরোধের প্রাথমিক কেন্দ্র, কিন্তু অচিরেই ওয়ারাঙ্গাল ও খাম্মামের প্রতিবেশী জেলাগুলিতে আন্দোলন

ছড়িয়ে পড়ে। চাষীরা গ্রামের 'সঙ্গম'গুলিতে সংগঠিত হন আর লাঠি সোঁটা, গুলতি-পাথর ও গুঁড়ো লঙ্কার ব্যবহার শুরু করেন। নৃশংস অত্যাচারের মুখোমুখি হয়ে ১৯৪৭-এর গোড়া থেকে যথাযথ সশস্ত্র গেরিলা বাহিনী গঠিত হতে শুরু করে। কিছুকালের জন্যে প্রতিটি বাহিনী তৈরি হতো ১০০ থেকে ১২০ জনের একটা দল নিয়ে। তার তুঙ্গ মুহূর্তে ১০,০০০ গ্রাম প্রতিরক্ষা স্বেচ্ছাসেবী আর জঙ্গী বাহিনীতে ২০০০ নিয়মিত সদস্য ছিল। অগাস্ট ১৯৪৭ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এর মধ্যে আন্দোলন সবচেয়ে তীব্রতা ও শক্তি লাভ করে, রাজ্য কংগ্রেস নেতাদের (ভারতীয় ভূখণ্ড থেকেই যারা মুখ্য কাজকর্ম চালাতেন, কমিউনিস্ট গেরিলারা যা করতেন না) নিজাম-বিরোধী স্লোগানকে দক্ষভাবে ব্যবহার করে আরও র‍্যাডিক্যাল আকার দিয়েছিলেন কমিউনিস্টরা। রাজস্ব কর্মচারীদের ইস্তফার ডাককে পরিণত করা হয়েছিল রাজস্ব ও খাজনার কাগজপত্র ধ্বংস করার প্রচারে। সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এ পুলিশ অভিযানের ঠিক আগেই তেলেঙ্গানার অনেক গ্রামাঞ্চলেই কমিউনিস্টদের 'চীকাটি ডোরালু' (রাতের রাজা) বলে মেনে নিয়েছিল তাঁদের শত্রুরাও। গেরিলা-নিয়ন্ত্রিত গ্রামগুলিতে 'বেঠি' ও খৎবন্দী-শ্রমিক লোপ পেল, (অন্যথায় সহমর্মী ধনী চাষীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও) কৃষি-মজুরি বাড়ানো হলো। অন্যায়ভাবে অধিকৃত জমি ফিরিয়ে দেওয়া হলো প্রাক্তন ভূমি-অধিকারী কৃষকদের হাতে, আর অহল্যাভূমি ও ১০০ একর শুকনো জমি ও ১০ একর জলা জমির উর্ধ্বসীমার ওপরে সমস্ত জমি পুর্নবন্টনের ব্যবস্থা নেওয়া হলো (এই সীমা ছিল যথেষ্ট উঁচু, সম্পন্ন চাষীরা যাতে বিরূপ না হয় তার জন্য এটি স্থির করা হয়েছিল, তা হলেও পরবর্তী কংগ্রেস সরকারী উর্ধ্বসীমার চেয়ে এটি ছিল অনেক কম)। সশস্ত্র সংগ্রামের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, সুন্দরাইয়া মুক্তাঞ্চলগুলির জীবনযাত্রার সুস্পষ্ট ও নাড়া-দেওয়ার মতো বর্ণনা দিয়েছেন ঃ সেচের উন্নতি ও কলেরা প্রতিরোধের ব্যবস্থা, বহু চাষীর ও পরিবারের বিরোধের আপস মীমাংসা, মেয়েদের মর্যাদার কিছু উন্নতি, অস্পৃশ্যতা ও কুসংস্কার কমানো, আর বিপ্লবী মূল্যবোধগুলি প্রচারের জন্যে লোক-সঙ্গীত ও নাটকের ব্যবহার।

সেপ্টেম্বর ১৯৪৮-এর পরে অবস্থার দ্রুত বদল ঘটে। আসলে কমিউনিস্ট অগ্রগতিকে রোখার চেষ্টা হিসেবেই সম্ভবত বড় আকারে পুলিশি অভিযানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অন্যথায় নতুন দিল্লী, বিশেষত প্যাটেল মনে হয় নিজামের সঙ্গে একটা রফা করতে খুবই ইচ্ছুক ছিলেন—সে জন্যেই রাজ্য কংগ্রেস নেতা রামানন্দ তীর্থ মন্তব্য করেন, 'আমি অবাক হয়েছিলাম ভারত সরকার কেন নিজামকে মাত্রাছাড়া দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছে' (*মেময়ার্স অফ হায়দরাবাদ ফ্রিডম স্ট্রাগল,* পৃ. ১৯০)। রাজাকারদের ছত্রভঙ্গ হয়ে পালানোর ফলে গেরিলারা প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পেতেন, কিন্তু এখন তাঁদের আরও অনেক উন্নত অস্ত্রসমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল নিয়মিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হতে হলো। আগেকার নিজাম-বিরোধী সংগ্রামের চেয়ে সদ্য-স্বাধীন ভারতের সরকারকে উৎখাত করার স্লোগান স্বাভাবিকভাবেই অনেক কম সাড়া জাগায়। কমিউনিস্টরা পরে বুঝেছিলেন, ১৯৪৮-এর পরে সশস্ত্র সংগ্রামকে কেবল কৃষি-সংস্কারের সীমিত লক্ষ্যের গণ্ডিতে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হতো। তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আলোচনার মধ্যে দিয়ে মীমাংসার একটা সম্ভাবনা থেকে যেত। রবি নারায়ণ রেড্ডীর মতো কয়েকজন এমনকি এও বলেছেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী একবার এসে পড়ার পর গেরিলা সংগ্রাম চালিয়ে

যাওয়াটাই ভুল হয়েছিল (সুন্দরাইয়া, পৃ. ১২১-২, ১৩৫ ঃ রবি নারায়ণ রেড্ডী, *হিরোইক তেলেঙ্গানা-রেমিনিসেন্সেস্ অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স,* নয়া দিল্লী ১৯৭৩, পৃ. ৬০)। এরপর কমিউনিস্টরা সম্পন্ন চাষীদের সক্রিয় সমর্থন দ্রুত হারান। উত্তেজক ও কখনও কখনও নির্মম সেনা-আক্রমণ তাঁদের নালগোণ্ডা, ওয়ারঙ্গল ও খাম্মামের আবাসিক সমতল থেকে কৃষ্ণা ও গোদাবরী অঞ্চল পেরিয়ে দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্বে নাল্লামাল্লাই পাহাড়ের ঘন জঙ্গলে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। এখানে কমিউনিস্টরা চেঞ্চু ও কোয়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে কতক নতুন ঘাঁটি তৈরি করেন। এঁদের তাঁরা বনবিভাগের সরকারি কর্মচারী ও ব্যবসায়ী মহাজনদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু ১৯৫০-১ নাগাদ গেরিলা সংগ্রাম ব্যক্তি-বিশেষের হঠাৎ আক্রমণ ও হত্যায় পর্যবসিত হয়। তীব্র রাজনৈতিক অন্তর্বিরোধ দেখা দেয় এবং কোনোমতে বেঁচে থাকাই হয়ে ওঠে প্রচণ্ড সমস্যা। এও কৌতূহলের যে তেলেঙ্গানা গেরিলাদের শেষ প্রতিরোধ-ক্ষেত্রছিল গোদাবরীর বনাঞ্চলে, যেখানে এক প্রজন্ম আগেই লড়াই করেছিলেন আল্লুরি সীতারাম রাজু।

পরাজয়ের পরেও কমিউনিস্টরা নালগোণ্ডা ও ওয়ারঙ্গলের প্রতিটি বিধানসভা আসনে জিতে কয়েক বছর ধরে প্রচুর সমর্থন পেয়ে চলেছিলেন আর ১৯৫২-তে নেহরুর থেকেও বেশি ভোটে জিতিয়ে সংসদে পাঠিয়েছিলেন রবি নারায়ণ রেড্ডীকে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তেলেঙ্গানা সংগ্রামের ইতিবাচক সাফল্য তুচ্ছ করার মতো ছিল না। অন্য যে-কোনো উপনিমিত্তের চেয়ে কৃষক গেরিলারাই ভারতের সবচেয়ে বড় রাজন্যশাসিত রাজ্যের স্বৈরাচারী-সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটান। প্যাটেল ও ভি পি মেননের করা ন যযৌ ন তস্থৌ চুক্তির আপস-উদ্যোগকে তাঁরা ব্যর্থ করে দেন। রাজন্যশাসিত রাজ্য হায়দরাবাদ ধ্বংসের ফলে কয়েক বছর পর ভাষাভিত্তিক অন্ধ্রপ্রদেশ গঠনের পথ পরিষ্কার হয়। এর মধ্যে দিয়ে এই অঞ্চলের জাতীয় আন্দোলনের আর-একটি পুরনো লক্ষ্য সিদ্ধ হয়। চাষীরা তাঁদের কাজকর্মের মধ্যে দিয়ে কতকগুলি স্থায়ী সংস্থান অর্জন করেন ঃ 'বেট্টি' আর ফিরিয়ে আনা যায় নি, সমস্ত পুনর্বন্টিত জমি হারাতে হয় নি, ১৯৪৯-এ কংগ্রেস রাজত্বে জাগীরদারি বিলোপ করতেই হয় (যদিও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ সমেত) আর অন্তত নাম কা ওয়াস্তে জমির উর্ধ্বসীমা আরোপ করা হয়। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে বিনোবাভাবের ভূদান আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঐ নালগোণ্ডাতেই। এটা ঠিক যে, আংশিক লাভ অন্ধ্রের সম্পন্ন চাষীদের ১৯৫০-এর মাঝামাঝি থেকেই রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল হয়ে ওঠার দিকে নিয়ে যায়—কিন্তু বহু কৃষক-বিপ্লবী-আন্দোলনই ঐ সমস্যায় পড়েছে।

১৯৪৭ ঃ স্বাধীনতা ও দেশভাগ

সামাজিক দিক থেকে যেসব র‍্যাডিকাল আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ ছিল তেলেঙ্গানা—সেগুলি কখনোই একত্রে দেশব্যাপী কোনো সংগঠিত ও কার্যকর রাজনৈতিক বিকল্প হয়ে ওঠে নি। নিঃসন্দেহে তারা যে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল তা-ই আবার সাহায্য করেছিল অন্তিম আপস ঘটাতে। এর ফলে দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক মহামারণের মূল্য দিয়েই কেনা হয় ক্ষমতার 'শান্তিপূর্ণ' হস্তান্তর। ভি পি মেনন ছিলেন প্রবীণ আমলা। তিনি প্যাটেলের আস্থাভাজন ব্যক্তি

আর সেই সঙ্গে প্রথমে ওয়াভেল ও পরে মাউন্টব্যাটেন-এর বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসেবে ১৯৪৭-৪৮-এ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭-এর প্রথমদিকে ধর্মঘটের ঢেউ উঠলে তিনি বড়লাটকে জানিয়েছিলেন 'যে কংগ্রেসি নেতারা জনপ্রিয়তা হারাচ্ছে...কংগ্রেসের ভেতরে ভেতরে গভীর গোলযোগ ও বামপন্থা সম্পর্কে ভীষণ ভয় রয়েছে, আর শ্রমিক অসন্তোষের বিপদও মারাত্মক'। এক সপ্তাহ পরে ওয়াভেল এর *জার্নাল*-এ 'কমিউনিস্ট বিপদ সম্বন্ধে' একটি আলাপের বিবরণ রয়েছে। 'আমার ধারণা হলো তিনি দলটিকে বেআইনি ঘোষণা করতে চান'। স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যে মার্চ ১৯৪৮-এ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী [প্যাটেল] তাঁর এই ইচ্ছে পূরণ করেছিলেন (*ভাইসরয়স্ জার্নাল*, ৯ ও ১৫ জানুয়ারি ১৯৪৭-এর লিখন, পৃ. ৪০৮, ৪১১)। লীগ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ সংবিধান রচনা পরিষদে যোগ দিতে ও মন্ত্রিসভার কাজকর্মে সহযোগিতা করতে নারাজ হলো। তার থেকে এক প্রধান রাজনৈতিক সঙ্কটের সূচনা হয়। সেই সঙ্গে কংগ্রেসও লীগ মন্ত্রীদের পদত্যাগ দাবি করে এবং তা না মিটলে অন্তর্বর্তী সরকার থেকে নিজেদের মনোনীত ব্যক্তিদের প্রত্যাহার করে নেওয়ার ভয় দেখায়। এ-সময়ে ব্রিটিশ সরকারও নাটকীয় ভঙ্গিতে দ্রুত সামনে চলে আসে। জুন ১৯৪৮-কে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিষ্পত্তি সীমা ধার্য করে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৭-এ সংসদের নিম্নকক্ষে অ্যাটলি-র বিখ্যাত বক্তৃতার এটাই ছিল অব্যবহিত প্রসঙ্গ। এমনকি ভারতীয় রাজনীতিকরাও যদি ঐ তারিখের মধ্যে কোনো সংবিধানের ব্যাপারে একমত না হন, তবুও ব্রিটিশ ক্ষমতা ত্যাগ করে যাবে, 'সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ ভারতের জন্য কোনো কেন্দ্রীয় সরকারের আকারে না-হলে, কোনো কোনো অঞ্চলে বহাল-থাকা প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে অথবা এমন কোনোভাবে যেটিকে সবচেয়ে যৌক্তিক বলে মনে হয় এবং ভারতীয় জনগণের স্বার্থের পক্ষে যা সবচেয়ে অনুকূল।' ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ ক্ষমতা ও রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির বিষয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব শেষ হবে। কিন্তু এগুলি ব্রিটিশ ভারতের উত্তরাধিকারী কোনো সরকারের হাতে হস্তান্তরিত হবে না। দেশ বিভাগের ইঙ্গিত, এমনকি বহুসংখ্যক রাজ্যে বিখণ্ডীকরণের (বল্‌কানাইজেশন) সম্ভাবনাও ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু নির্দিষ্ট ও মোটামুটি কাছাকাছি সময়ের মধ্যে ক্ষমতার পূর্ণ হস্তান্তরের টোপ সামলানো সম্ভব ছিল না। বিশেষ করে কংগ্রেসের কাছে সত্যিকারের বিকল্প ছিল আর-একটি গণসংঘর্ষের মধ্যে ঝাঁপ দেওয়া। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রেক্ষিতে তা ছিল কঠিন, যাকে ক্রমবর্ধমান বামমুখী আশঙ্কা বলে মনে হচ্ছিল তার দিক দিয়ে সামাজিকভাবে খুব বিপজ্জনকও বটে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতিতে ওয়াভেল-এর বদলে [বড়লাট হিসেবে] মাউন্টব্যাটেন-এর নিয়োগও ঘোষণা করা হয়।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা

মাউন্টব্যাটেনকে ঘিরে এক ধরনের ভজনারীতি গড়ে উঠেছে, কলিন্‌স্ ও লাপিয়ের-এর সাংবাদিকধর্মী বহুবিক্রীত *ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট* (১৯৭৬)-এ তো বটেই, সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ও এমনকি ভারতীয় মহলেও তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনায়ক-তথা-মোহন রাজকুমার বলে, অভাবনীয় কম সময়ে যিনি সামরিক ঋজুতা, নেহাতই ব্যক্তিত্ব ও কৌশলের সমবায়ে উপমহাদেশের সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এক্ষেত্রে বিশাল অতিরঞ্জন আছে। আগের

বড়লাটদের—ওয়াভেল-এর মতো—থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মাউন্টব্যাটেন অনেক দৃঢ় ও তৎপর ছিলেন বলে যদি প্রমাণও হয়, তবে সেক্ষেত্রে তার কারণ ছিল অকুস্থলেই কোনো কিছুর মীমাংসা করার জন্যে ব্রিটিশ সরকার বেসরকারিভাবে তাঁকে তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে অনেক বেশি ক্ষমতা দিয়েছিল। এর পেছনে আবার ছিল যত দ্রুত সম্ভব [ভারত] ছেড়ে যাওয়ার দৃঢ় সিদ্ধান্ত। অ্যাটলি-র বক্তব্যের ওপর সংসদের নিম্নকক্ষে বিতর্কের সময়ে ক্রিপস পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছিলেন যে, একমাত্র বাস্তব বিকল্প হলো পুরোপুরি নিপীড়নের পথে যাওয়া এবং কয়েক বছর ধরে ভারতে বিপুল সংখ্যায় ব্রিটিশ বাহিনী মোতায়েন করার জন্যে তৈরি হওয়া। কিন্তু 'এটা নিশ্চিত যে এই দেশের (ব্রিটেনের) জনগণ—আমরা সকলেই জানি আমাদের জনশক্তি এত অল্প—(তাতে) রাজি হতো না।' সেই সঙ্গে 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় দৃষ্টিকোণ থেকেই তা করা রাজনৈতিকভাবে অসাধ্য হতো এবং ভারতের সমস্ত দলের অত্যন্ত তিক্ত বিদ্বেষ জেগে উঠত আমাদের বিরুদ্ধে' (ভি পি মেনন, *ট্রান্সফার অফ পাওয়ার ইন ইন্ডিয়া,* পৃ. ৩৪৬-এ উদ্ধৃত)। ইতোমধ্যেই ওয়াভেল সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এ তাঁর 'ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা'র চূড়ান্ত খসড়ায় ৩১ মার্চ ১৯৪৮-এর মধ্যে পুরোপুরি প্রত্যাহারের পরামর্শ দিয়েছিলেন (*ভাইসরয়স্ জার্নাল,* পৃ. ৩৪৪)। মাউন্টব্যাটেন কার্যভার বুঝে নেওয়ার আগেই দেশবিভাগ সমেত স্বাধীনতার সূত্রটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়েছিল। একটিই বড় অভিনবত্ব ছিল—(বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার সমেত) ডোমিনিয়ন মর্যাদা মঞ্জুরির ভিত্তিতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তর) মাউন্টব্যাটেন নয়, জানুয়ারি ১৯৪৭-এ ভি পি মেনন ভারত-সচিবকে এই পরামর্শ দেন যাতে নতুন নতুন রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর সংবিধান-রচনা পরিষদের মতৈক্যের জন্যে অপেক্ষা করার প্রয়োজন দূর হয়। যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে প্যাটেল ব্যক্তিগতভাবে এই ভাবনা মেনে নেন, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে এর অর্থ দাঁড়াত ১৯২৯-এর লাহোর প্রস্তাব থেকে পিছু হটে আসা, কারণ ডোমিনিয়ন মর্যাদা শান্তিপূর্ণ ও খুব দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করে ব্রিটেনে ভারতের জন্যে প্রভাবশালী বন্ধু অর্জন করবে, আর আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীতে খানিক ধারাবাহিকতার সুযোগ থাকবে (মেনন, পৃ. ৩৬৩-৪)। অতি দ্রুত গতিতে হস্তান্তরের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি যে সম্পন্ন হয় তার জন্যে অনেকাংশে মাউন্টব্যাটেনই দায়ী। কিন্তু এতে দেশভাগের আনুপুঙ্খিক আয়োজনে অনেক গরমিল রয়ে যায় আর পাঞ্জাবের গণহত্যা রোধে এটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। মোটের ওপর পেন্ডেরেল মুন-এর এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত হওয়ারই ঝোঁক হয় যে, 'আমাদের ভারত ছেড়ে আসার ব্যাপারে যে বিরাট কৃতিত্ব মাউন্টব্যাটেন দাবি করেন তা খানিকটা ফাঁপা শোনায়' (*ডিভাইড অ্যান্ড কুইট,* পৃ. ২৮৩)।

২৪ মার্চ ও ৬ মে-র মধ্যে রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে ১৩৩টি বৈঠকের পর্বটি দ্রুত সেরে মাউন্টব্যাটেন স্থির করলেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের কাঠামোটি অব্যবহার্য হয়ে গেছে এবং 'প্ল্যান বলকান' (বলকান পরিকল্পনা) বলে যথার্থ সাঙ্কেতিক নাম সমেত বিকল্প সূত্রটি তিনিই দেন। এই পরিকল্পনায় আলাদা আলাদা প্রদেশকে (বা সংযুক্ত প্রদেশগুলির হাতে, ক্ষমতা হস্তান্তরের আগেই যদি সেগুলি গঠিত হয়) ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ভাবা হয়। বাঙলা ও পাঞ্জাবে আইনসভাকে তাদের প্রদেশ ভাগের জন্যে ভোট দেওয়ার বিকল্প দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে গড়ে ওঠা বিভিন্ন একক ও সেই সঙ্গে [ব্রিটিশ] সর্বাধিপত্য খারিজের পর যে রাজন্য-শাসিত

রাজ্যগুলি স্বাধীন হয়ে যাবে তারা ভারত না পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ দেবে, না আলাদা থাকবে—তখন তা বেছে নিতে পারবে। ১০ মে সিমলায় মাউন্টব্যাটেন অপ্রকাশ্যে নেহরুকে এ বিষয়ে জানানোর পর তিনি এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখান, পরিকল্পনাটি অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। তার বদলে ডোমিনিয়ন মর্যাদা মঞ্জুরের ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে পরামর্শ ভি পি মেনন তথা প্যাটেল দিয়েছিলেন তা-ই গৃহীত হয়। ২ জুন এটি কংগ্রেস, লীগ ও শিখ নেতাদের সমর্থন পায় ও পরের দিন ঘোষিত হয়। এর ভিত্তিতেই 'ভারত স্বাধীনতা আইন' ১৮ জুলাই ব্রিটিশ সংসদ ও রাজার অনুমোদন পায় আর ১৫ অগাস্ট বলবৎ হয়। 'একেবারেই আন্দাজে' নেহরুকে আগেই প্রথম পরিকল্পনাটি অপ্রকাশ্যে দেখানোর সিদ্ধান্তটি সুখ্যাতি করায় মাউন্টব্যাটেন স্বয়ং ও তাঁর গুণগ্রাহীরা পঞ্চমুখ হয়েছেন। অবশ্যই ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত তাৎপর্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ব্রিটিশ বড়কর্তারা যে পরিকল্পনাটির জন্য কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ করছিলেন মাউন্টব্যাটেনকে সেটি পরিত্যাগ করানোর পেছনে নেহরুর বিরোধিতাই ছিল যথেষ্ট। কংগ্রেসি নেতারা দ্রুত ও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতায় আসীন হতে চেয়েছিলেন। তাই বারবার তাঁরা তাঁদের সম্ভাব্য শক্তিকে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। কংগ্রেসি অবস্থানের সেই নিহিত শক্তি আরও একবার প্রকাশ পেল। এর সঙ্গে যোগ করা উচিত যে, খণ্ডীকরণের প্রস্তাবে ভারতকে সাম্রাজ্যবাদী ছকে কতকগুলো ছোটো ছোটো তাঁবেদার রাজ্যের সমষ্টি হিসেবে গড়ে তোলা ও তার ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডের মতো একটা সমস্যা তৈরি হওয়ার ব্যাপারটায় নেহরু অবশ্য ঠিকই আঁচ করেছিলেন। যে বিকল্পটি গৃহীত হয় তাও কিছু আগ্রহজনক অসাম্প্রদায়িক আঞ্চলিক সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে দেয়। বাংলায় লীগের অনেকেই সুদূর পাঞ্জাবের শাসনে থাকতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না। সুহ্‌রাবর্দী ও আবুল হাশেম অখণ্ড ও স্বাধীন বাঙলার একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে আসেন। (মুসলিম-প্রধান রাজ্য হয়ে উঠতে পারে বলে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মতবাদের কটু-বিরোধিতা সত্ত্বেও) শরৎ বসুর মতো কিছু কংগ্রেসি নেতা ঐ পরিকল্পনা বিবেচনা করতে তৈরি ছিলেন বলে মনে হয়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ-এ আজাদ-পাঠান রাজ্যের দাবি ক্রমশই বেড়ে উঠছিল, আর আবদুল গফ্‌ফর খানের নেতৃত্বে আঞ্চলিক কংগ্রেস নেতৃত্ব অনুভব করেছিল এ ধরনের স্লোগানই শুধু পাকিস্তানের জন্যে লীগের প্রদেশ দখলের মতলবকে পাল্টা জবাব দিতে পারে। হিন্দু-প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমান-বিরোধী দাঙ্গার জন্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সেই পুরনো একাত্মভাবও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে ভারত ও পাকিস্তান দুটি ডোমিনিয়নের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বাধ্য করার মধ্যে দিয়ে ৩ জুনের পরিকল্পনা এই সমস্ত ঘটনাবলির বিকাশকে রুদ্ধ করে। ১৯২০-র শেষ থেকে যে পাঠানরা এমন বিনা ব্যত্যয়ে জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন, কংগ্রেস নেতারা ১৯৪৭-এ সত্যিই তাঁদের খুব খারাপভাবে পথে বসালেন—এই সিদ্ধান্ত এড়ানো কঠিন। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ-এ তদানীন্তন আইনসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল ও সংবিধান-রচনা পরিষদের সংযুক্তির পক্ষেই ভোট পড়েছিল। তবুও ভারত অথবা পাকিস্তানের মধ্যে একটির সঙ্গে সংযুক্তি বেছে নেওয়ার প্রশ্নে ঐ প্রদেশটির ওপরে প্লেবিসিট (জনমত গ্রহণ) চাপিয়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব এর প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু সেটিকে

আলোচনা ভেঙে যাওয়ার বিষয় করে তোলেননি (বলকান পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নেহরু যা সফলভাবে করেছিলেন)। সর্বজনীন ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত করা বা স্বাধীন পাখতুনিস্তানের বিকল্পটি ভোটদাতাদের সামনে বাছাই-এর তালিকায় যুক্ত করার ব্যাপারেও তাঁরা পেড়াপিড়ি করেন নি। শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদস্বরূপ উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-প্রদেশ-এর কংগ্রেস প্লেবিসিট বর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। অত্যন্ত সীমিত সংখ্যক ভোটদাতার—৫৭২,৭৯৮ জনের (প্রদেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৯.৫২%-এর মতামতে) সমগ্র ভোটের ৫০.৯৯%-এর সমর্থনে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানে চলে যায়। সীমান্ত গান্ধী পরে ন্যায্যতই ঘোষণা করেন, কংগ্রেস নেতৃত্ব তাঁকে ও তাঁর আন্দোলনকে 'নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে' দিয়েছিল।

দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি

সর্বময় ব্রিটিশ কর্তৃত্ব রদ আসন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজন্যশাসিত রাজ্যগুলির ভবিষ্যতের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। আরও উচ্চাশী শাসক অথবা তাদের দেওয়ানরা (হায়দরাবাদ, ভূপাল অথবা ত্রিবাঙ্কুরের মতো) এমন একটা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন যা তাঁদের আগের মতোই স্বৈরাচারী রাখবে। মাউন্টব্যাটেন আরও বাস্তববাদী একটি নীতি বলবৎ করার আগে পর্যন্ত এ ধরনের আশা কনরাড কোরফিল্ড-এর অধীনে ভারত সরকারের রাজনৈতিক দফ্‌তরের কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহও পেয়েছিল। ইতোমধ্যে ১৯৪৬-৪৭-এ রাজনৈতিক অধিকার ও সংবিধান-রচনা পরিষদে নির্বাচনভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের দাবিতে সর্বত্র দেশীয় রাজ্যগুলির গণ-আন্দোলনের এক নতুন অভ্যুত্থান শুরু হয়। এর আগে, ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দরাবাদের ঘটনায় আমরা যেমন দেখেছি, তেমনি কোনো কোনো জায়গায় এর মধ্যে সামাজিক দিক থেকে যথেষ্ট র‍্যাডিকাল সম্ভাবনা ছিল। দেশীয় রাজ্যগুলি থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের না-নেওয়ার জন্যে কংগ্রেস ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনার সমালোচনা করে। দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণের সারা ভারত সম্মিলনের উদয়পুর ও গোয়ালিয়র অধিবেশনে (ডিসেম্বর ১৯৪৫ ও এপ্রিল ১৯৪৭) সভাপতিত্ব করেন নেহরু। গোয়ালিয়রে তিনি ঘোষণা করেন যে, সংবিধান-রচনা পরিষদে যোগ দিতে অনিচ্ছুক দেশীয় রাজগুলিকে শত্রুভাবাপন্ন বলে ঘোষণা করা হবে। জুলাই ১৯৪৭-এ সর্দার প্যাটেল নতুন দেশীয় রাজ্য দফ্‌তরের (রাজনৈতিক দফ্‌তরের জায়গায়) কার্যভার নিয়েছিলেন, আর ভি পি মেনন হয়েছিলেন তার সচিব। কিন্তু মৌখিক হুমকি ও বক্তৃতা ছাড়া কংগ্রেস নেতৃত্ব—আরও নির্দিষ্টভাবে সর্দার প্যাটেল—ও ভি পি মেনন যেভাবে অবস্থার মোকাবিলা করেন, পরবর্তীকালে সেটাই দলের বাঁধা রীতি হয়ে ওঠে। জন-আন্দোলনকে চাপ দেওয়ার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে রাজন্যবর্গের কাছ থেকে জোর করে সুবিধে আদায় ও সেই সঙ্গে তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করা (বা রাজা একবার শায়েস্তা হলে বলপ্রয়োগ করে তাঁকে দমন করা, যেমন ঘটেছিল হায়দরাবাদে)—এই ছিল প্যাটেলের নীতি। ইতিপূর্বে ১৯৪৬-এই কাশ্মীরে এই ছকের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। মুসলমান-প্রধান একটি প্রদেশে সাধারণের অপ্রিয় স্বেচ্ছাচারী হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে 'কাশ্মীর ছাড়ো' আন্দোলনে জাতীয় কনফারেন্সকে নেতৃত্ব দেবার সময়ে ২০ মে শেখ আবদুল্লা গ্রেপ্তার হন। গোড়ার দিকে কাশ্মীর নেতাদের সমর্থনে নেহরু দ্রুত এগিয়ে আসেন, ঐ রাজ্যে তাঁর প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের জন্যে ২০ জুন অল্পকালের জন্য

গ্রেপ্তারও হন। প্যাটেল অবশ্য ওয়াভেলকে আশ্বস্ত করেন যে, নেহরু তাঁর পরামর্শের বিরুদ্ধেই গিয়েছিলেন (প্যাটেলের সঙ্গে ওয়াভেল-এর সাক্ষাৎকার, ২৭ জুন ১৯৪৬, ম্যানসার, খণ্ড ৭, পৃ. ১০৬৮-৯)। অচিরেই কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী কাক-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু হলো। এবং তারই পরিণতিতে অক্টোবর ১৯৪৭-এ পাকিস্তান থেকে হানাদাররা ঐ রাজ্য আক্রমণ করার পরে মহারাজা ভারত-চুক্তিতে সম্মত হন। দেশীয় রাজ্যগুলির নতুন দফতর পরিচালনা করার জন্যে প্যাটেল ও মেননের নিয়োগের কথা শুনে ভূপালের নবাব ঘোষণা করেন, 'দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে গোটা দৃষ্টিভঙ্গিটাই এতে বদলে গেল'। ৫ জুলাই ১৯৪৭-এ প্যাটেল রাজন্যবর্গকে আশ্বাস দেন : 'কংগ্রেস রাজন্য-ব্যবস্থার শত্রু নয়, কিন্তু অন্যদিকে কংগ্রেস তাঁদের এবং তাঁদের আশ্রিত জনগণের সর্বদা সুখ, সম্পদ ও সন্তুষ্টি কামনা করে' (ভি পি মেনন, *দি স্টোরি অফ দি ইন্টিগ্রেশন অফ ইন্ডিয়ান স্টেট*, পৃ. ৯৬)।

প্রলোভন ও গণচাপের হুমকি—এ দু-এর দক্ষ সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে ভারতীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তি সম্পন্ন হয় দুটি পর্যায়ে। প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় বিষয় ও যোগাযোগ—এই তিনটি এলাকায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব মেনে নিয়ে ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭-এর মধ্যে কাশ্মীর, জুনাগড় ও হায়দরাবাদ ছাড়া সমস্ত দেশীয় রাজ্য ভারতে (বা, বহাওয়ালপুরের মতো কয়েকটি ক্ষেত্রে, পাকিস্তানে) অন্তর্ভুক্তির চুক্তিতে সই করতে রাজি হয়। রাজন্যবর্গ বেশ সহজেই এতে সম্মত হন, কারণ তাঁরা যা 'সমর্পণ' করেছিলেন (ব্রিটিশ সর্বময় কর্তৃত্বের অংশ ছিল যে তিনটি কাজ) তা কোনোদিনই তাঁদের ছিল না, এবং তখনও পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামোরও কোনো পরিবর্তন হয়নি। বরং কাথিয়াবাড় ইউনিয়ন, বিন্ধ্য ও মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান বা হিমাচল প্রদেশের মতো নতুন এককগুলি অথবা যেসব রাজ্য আরও কয়েক বছর তাদের পুরনো সীমা বজায় রেখেছিল (হায়দরাবাদ, মাইশোর, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন) তাদের অভ্যন্তরীণ শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন সমেত প্রতিবেশী প্রদেশগুলির সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলির 'সংযুক্তি'-প্রক্রিয়া আরও বেশি কঠিন ছিল। কিন্তু এসবই মাত্র এক বছরের চেয়ে একটু বেশি—লক্ষণীয় রকমের অল্প সময়ে—সম্পন্ন হয়। রাজন্য-ভাতার টোপটাই ছিল এক্ষেত্রে প্রধান, তাছাড়া কোনো কোনো রাজাকে রাজ্যপাল কিংবা রাজপ্রমুখও করা হয়। ভারতের দ্রুত ঐক্যবিধানই নিঃসন্দেহে সর্দার প্যাটেলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। কিন্তু একথা অবশ্যই ভোলা যায় না যে, গণচাপের অস্তিত্ব বা অন্তত এর প্রচ্ছন্ন উপস্থিতিও এক্ষেত্রে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। নীলগিরি, ঢেঙ্কানল, তালচেরের মতো ওড়িয়া রাজ্যগুলিতে শক্তিশালী প্রজামণ্ডল (সেইসঙ্গে কিছু জনগোষ্ঠীয়) বিক্ষোভের মুখোমুখি হয়ে ডিসেম্বর ১৯৪৭-এ অনিচ্ছুক রাজন্যবর্গের তৈরি পূর্বাঞ্চলীয় রাষ্ট্রসঙ্ঘ ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কাথিয়াবাড়ের অন্তর্ভুক্ত জুনাগড়ের মুসলমান শাসক পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, ভারতীয় পুলিশি হানা ও গণ-বিক্ষোভ মিলিয়ে তাঁকে শায়েস্তা করা হয়। ১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকে কংগ্রেস অ-সাধারণ শক্তিশালী ছিল মাইশোরে, তারা নিজ উদ্যোগে সেপ্টেম্বর ১৯৪৭-এ মোটামুটি অবাধ এক 'মাইশোর চলো' বিক্ষোভের সূচনা করে। ১২ অক্টোবর নাগাদ এই আন্দোলন সত্যিকারের রাজনৈতিক পরিবর্তনকে গণতান্ত্রিক দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য করে। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান সি পি রামস্বামী আয়ার 'মার্কিন ধাঁচে' ব্যক্তিগত ক্ষমতা ধরে রাখার যে-স্বপ্ন দেখতেন 'কমিউনিস্ট জুজুর ভয়' দেখিয়ে ভি পি মেনন তাঁকে তা ত্যাগ করতে রাজি

করান (ঐ, পৃ. ১১১)। তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রাম যেমন নিজামকে দুর্বল করেছিল, তেমনি সামরিক হস্তক্ষেপেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ জুগিয়েছিল। '...আমাদের প্রথম কাজ হবে রাজাকারদের ধরা...গুরুত্বের নিরিখে দ্বিতীয় নয়, কিন্তু যেহেতু একসঙ্গে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া যায় না, তাই আমাদের পরবর্তী কাজ হবে কমিউনিস্টদের দমন করা ও তাদের নির্মূল করা'। (ভি পি মেনন, ফৌজি শাসক জে এন চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর আলাপের কথা স্মরণ করেছেন, ঐ, পৃ. ৩৬২)।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনার খুঁটিনাটি নিষ্পত্তির কাজ ব্রিটিশ শাসনের শেষ আড়াই মাসে লক্ষণীয় দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। লীগ নেতাদের চেয়ে বাঙলার হিন্দুদের এবং পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের রাজনৈতিক নেতারা তখন দেশভাগের উৎসাহী সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন। 'গণ-নিধনের দিকে সোজা গিয়েছে যে-রাস্তা, তার ওপর দিয়ে সকলে মিলে যাত্রা করল এক সম্পূর্ণ অভূতপূর্ব মতৈক্য নিয়ে' (পেন্ডেরেল মুন, পৃ. ৭০)। যেমন আশা করা গিয়েছিল, বাঙলা ও পাঞ্জাব আইনসভার সংখ্যালঘু সদস্যের পৃথকভাবে মিলিত হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল ; তাঁরা দেশভাগের পক্ষে ভোট দেন। সিন্ধু আইনসভা পাকিস্তানের পক্ষেই মত দিল। আসামের মুসলমান-প্রধান সিলেট জেলায় প্লেবিসিট-এর হুকুম হয়েছিল (আবার সেই বহাল সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে), লীগ তাতে জিতে যায়। দুটি কমিশন আবার প্রচণ্ড গতিতে কখনও কখনও আঞ্চলিক খুঁটিনাটি বিষয়কে অবহেলা করেই সীমারেখা টানে। দু-এরই কর্তা ছিলেন এক ব্রিটিশ আইনজ্ঞ (র‍্যাডক্লিফ) ; ভারতের অবস্থা বা ভূগোল সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল শূন্যের চেয়েও কম। কিছু আর্থনীতিক ও কৌশলগত গুরুত্বের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতাকে মেলানোর উদ্যোগই ছিল একাধিক গরমিলের কারণ ঃ পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর ও বাংলার মুর্শিদাবাদ, নদীয়া (সেইসঙ্গে কলকাতা) হারিয়ে মুসলমানরা ক্ষুণ্ণ হন, আর হিন্দু ও শিখরা ক্ষুণ্ণ হন লাহোর ও ক্যানাল কলোনি, খুলনা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল হারিয়ে। কিন্তু প্রতিবাদগুলি খুব সোচ্চার হলো না, কারণ কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের ক্ষমতার দিকে দিগ্‌-বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছোটার পথে বাধা হতে পারে এমন কোনো কিছুকেই বরদাস্ত করা হচ্ছিল না। কংগ্রেসের অনুরোধে মাউন্টব্যাটেন নতুন ভারতীয় ডোমিনিয়ন-এর গভর্নর-জেনারেল হিসেবে কাজ করতে সদয় সম্মতি জানান। তিনি পাকিস্তানেরও গভর্নর-জেনারেল হতে পারতেন, কিন্তু সেই পদ নিতে জিন্নারও বাসনা থাকায় তা আর হয়ে ওঠেনি।

পনেরোই অগাস্ট

এইভাবে উপমহাদেশে স্বাধীনতা এল। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের উদার স্বপ্নের সঙ্গে যদি তুলনা করা হয় তবে অবশ্যই অনেকের কাছে এটি একটি খেদের বিষয় মনে হয়েছিল। ভারতের মুসলমান ও পাকিস্তানের হিন্দুদের মধ্যে খুবই বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে এর অর্থ ছিল, বা বছরের পর বছর ধরে অর্থ দাঁড়িয়েছিল এক নিষ্ঠুর বাছাই ঃ আকস্মিক হানাহানির হুমকি এবং চাকরি ও আর্থনীতিক সুযোগ-সুবিধার সঙ্কোচন অথবা বাধ্য হয়ে প্রাচীন শিকড় উন্মূল করে উদ্বাস্তুর স্রোতে মিশে যাওয়া—এই দু-এর মধ্যে বেছে নেওয়া। বহুবিধ মানবিক ট্র্যাজেডির সমস্তই অত্যন্ত জীবন্তভাবে চিত্রিত হয়েছে বলরাজ সাহানির শেষ চলচ্চিত্র 'গরম হাওয়া'য়।

অন্য---কিন্তু পুরোপুরি অসম্পর্কিত নয়—এমন এক স্তরে জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার গভীরতর শিকড় জোগান দিয়েছিল যেসব আর্থিক ও সামাজিক বিরোধ, সেগুলিরও নিষ্পত্তি হয়নি, কারণ শহর ও গ্রামে সুবিধাভোগী গোষ্ঠীরা আমূল সামাজিক পরিবর্তন থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকে পৃথক করার কাজে সফল হয়েছিল। ব্রিটিশ চলে গেল, কিন্তু যে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ তারা গড়ে তুলেছিল, প্রায় অপরিবর্তিত রূপে তা অব্যাহত রইল ; সেগুলো আগের মতোই (হয়তো বা কখনও কখনও তার চেয়েও বেশি) অত্যাচারী ও নির্মম বলে প্রমাণ হতে পারত। শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাই মহাত্মার জীবনের শেষ কয়েক মাসের বিচ্ছিন্নতা ও যন্ত্রণার জন্য দায়ী ছিল না। নিহত হওয়ার ঠিক আগে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন যে, দেশকে এখনও 'সামাজিক, নৈতিক ও আর্থনীতিক স্বাধীনতা লাভ করতে হবে ৭০০,০০০ গ্রামের নিরিখে', কংগ্রেস 'কতক পচা শহর তৈরি করেছে যা নিয়ে যায় দুর্নীতির দিকে আর...কতক প্রতিষ্ঠান, যেগুলি শুধু নামেই সাধারণের জন্য গণতান্ত্রিক'। ফলত রাজনৈতিক দল হিসেবে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়া উচিত ও তার জায়গায় সত্যিকারের উৎসর্গিত, আত্মত্যাগী ও গঠনমূলক গ্রামকর্মীদের নিয়ে একটি লো ক সে ব ক স ঙ্ঘ তৈরি করা উচিত (নির্মল কুমার বসু, *মাই ডেজ্ উইথ গান্ধী,* কলকাতা ১৯৫৩, পৃ. ৩০৫, ৩০৭)। অনেক দায়বদ্ধ বামপন্থীর কাছেই এ ধরনের স্বাধীনতা বিদ্রূপের চেয়ে ভালো কিছু বলে মনে হয়নি

'ধোঁকায় জব্দ [আর আই এন-এর] জাহাজেরা বন্দরে স্তব্ধ',
'বাঙলায় বিহারে গড় মুক্তেশ্বরে

মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে ;
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—
বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান' ;

আর 'যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে'।---ক্ষমতালোলুপ রাজনীতিবিদ্ হিসেবে দেশপ্রেমিকদের ভোল-পাল্টানো প্রসঙ্গে নির্দয়, কিন্তু পুরোপুরি অন্যায় মন্তব্য নয় (সমর সেন, তাঁর লেখা শেষ দুটি কবিতায়)।

তাহলেও, 'নিয়তির সঙ্গে' ভারতের 'অভিসার' বিষয়ে নেহরুর মধ্যরাতের ভাষণ শুনে পুলকিত হয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। গোটা উপমহাদেশ জুড়ে তাঁরা আনন্দ করেছিলেন এবং ১৫ অগাস্টকে করে তুলেছিলেন এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা—এমনকি তার পক্ষেও যে তখনও নেহাতই শিশু। সেই মানুষরা পুরোপুরি প্রতারিত হননি। ১৯৪৮-৫১-তে কমিউনিস্টরা ঠেকে শিখেছিলেন যে, 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হৈ' (এই স্বাধীনতা নকল) এই স্লোগান বিশেষ দাগ কাটে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ছিল উপনিবেশ ভাঙার প্রক্রিয়ার সূচনা, যা অপ্রতিরোধ্য ছিল বলে প্রমাণ হয়েছে, অন্তত রাজনৈতিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে। ভারত তো ব্রিটেন অথবা আমেরিকার হাতের পুতুল হলোই না, উপরন্তু জোট-নিরপেক্ষতা, সমাজবাদী দেশ ও উদীয়মান তৃতীয় বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী---সে সময়ের এই নতুন ধারণার ভিত্তিতে নেহরুর নেতৃত্বে ভারত ধীরে ধীরে গড়ে তুলল একটি স্বাধীন বিদেশ-নীতি। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জানুয়ারি ১৯৫০-

এ মোটের উপর গণতান্ত্রিক একটি সংবিধান প্রবর্তিত হয়। শেষ দিন পর্যন্ত যে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলি সার্বিক ভোটাধিকার এড়িয়ে যাচ্ছিল তার তুলনায় এটি ছিল বড় অগ্রগতি। রাজন্যবর্গ ও জমিনদারদের ক্রমশ সরিয়ে দেওয়া হয়। ধার্য হয় জমির উর্ধ্বসীমা (যদিও কদাচিৎ তা কার্যকর হয়েছে)। রাজ্যগুলির ভাষাভিত্তিক পুনর্গঠনের পুরনো আদর্শ ১৯৫৬-তে অর্জিত হয়। সরকারি উদ্যোগে পরিকল্পিত উন্নয়নের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে বুনিয়াদি শিল্প। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধের প্রায় জড়তার একেবারে বিপরীতে, খাদ্য উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। অগাস্ট ১৯৪৭-এর কারণে এ সব কিছুই আপনা-আপনি ঘটেনি, কঠিন গণসংগ্রামের মধ্যে দিয়েই এর অনেক কিছু বাস্তবে রূপ পেয়েছিল—তাহলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভই ছিল নিঃসন্দেহে তার আবশ্যিক পূর্ব-প্রয়োজন। সম্ভবত আগের চেয়েও অনেক স্পষ্টভাবে দ্বন্দ্বগুলো রয়ে গেল, মোটের ওপর পুঁজিবাদী বিকাশের পথ বেছে নেওয়ার মধ্যেই তার মূল নিহিত রয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান ধাঁচই সে-পথ ঠিক করে দিয়েছিল, যার ওপর বুর্জোয়া শ্রেণী তার সাধারণ নেতৃত্ব কায়েম করতে ও বহাল রাখতে সমর্থ হয়।

ভারতের ছয় দশকের যে ইতিহাস আমরা পর্যালোচনা করলুম, তার অর্থ ও তাৎপর্য পাওয়া যাবে যদি তাকে বিচার করা হয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পরিবর্তনের একটি জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে যা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি। ইতিহাস ও তার দ্বন্দ্ব বিষয়ে এক ব্রিটিশ সমাজবাদী লেখকের মন্তব্যটি সম্ভবত উপযুক্ত বিদায়বাণী হতে পারে :

'...ভেবে দেখুন, কত মানুষ যুদ্ধ করেন ও হেরে যান, যার জন্যে তাঁরা যুদ্ধ করেন তাঁদের পরাজয় সত্ত্বেও তা ঘটে। তাঁরা যা চেয়েছিলেন তা না-হয়ে যখন অন্য কিছু হয়, তখন তাঁরা যা চেয়েছিলেন তার জন্যে অন্য লোকে যুদ্ধ করেন অন্য-এক নামে' (উইলিয়াম মরিস, *এ ড্রিম অফ জন বল,* ১৮৮৮)।